হযরত মাওলানা

শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ)

স্মারক গ্রন্থ

ব্যবস্থাপনা
মাওলানা মুহাম্মাদ সালমান

সম্পাদনা
মাওলানা লিয়াকত আলী

হযরত মাওলানা
শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ)
স্মারক গ্রন্থ

ব্যবস্থাপনা
মাওলানা মুহাম্মদ সালমান
প্রিন্সিপাল, মাদ্রাসা দারুর রাশাদ
মিরপুর-১২, ঢাকা।

সম্পাদনা
মাওলানা লিয়াকত আলী
শিক্ষাসচিব, মাদ্রাসা দারুর রাশাদ
মিরপুর-১২, ঢাকা

www.pathagar.com

মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ)
স্মারক গ্রন্থ

: প্রকাশক :
মাওলানা মুহাম্মদ সালমান
১২/ধ, বাসা-৮৯, মিরপুর, ঢাকা।

: প্রকাশকাল :
জুমাদাল উলা ১৪২০হিজরী
সেপ্টেম্বর ১৯৯৯ ঈসায়ী
ভাদ্র ১৪০৬ বাংলা

: প্রচ্ছদ :
বশির মেছবাহ
: কম্পিউটার গ্রাফিক্স :
ডটপ্লাস লিঃ

: কম্পিউটার কম্পোজ :
ইন্টারলিংক কম্পিউটার সেন্টার
ও দারুর রাশাদ কম্পিউটার্স

: মুদ্রণ :
চৌকস প্রিন্টার্স

: শুভেচ্ছা বিনিময় :
অফসেট- ৩০০.০০ টাকা
সাদা- ২৫০.০০ টাকা

: পরিবেশক :
আল- কাউসার প্রকাশনী
৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা

Hazrat Maulana Shamsul Haque (Rh) Smarak Grantha
(Memorial Book in Bangla)
Published by Maulana Mohammad Salman & Edited by Maulana Liaquat Ali
Price : Tk. White 250.00 Offset 300.00 or US $ 10.00

www.pathagar.com

ছাইয়্যেদী ছনদী মওলানা শামছুল হক (রঃ) ১৯৫৬ সনে হজ্জ করিতে যান। সেই বৎসরই রমযান মাসে বোখারী শরীফ অনুবাদের কাজ নরাধমের হাতে আরম্ভ হয়। চরম ও পরম সৌভাগ্য যে, তিনি হজ্জ উপলক্ষে পবিত্র মক্কা-মদীনায় দোয়া কবুল হওয়ার প্রত্যেক স্থানেই এ বিষয়ে নরাধমের জন্য দোয়া করিয়াছিলেন এবং লিখিত অনেক কিছু আমাকে প্রদান করিয়াছিলেন। হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দরবারে-তাঁহার পবিত্র মসজিদের বিশিষ্ট স্থানে বসিয়া তাহাজ্জুদের সময় তিনি যে দোয়া করিয়াছিলেন, সৌভাগ্যক্রমে তাহা লিখিতরূপে পাইয়াছি। ইহা আমার নিকট নিঃসন্দেহে এক অতুলনীয় পরম সম্পদবিশেষ। তাই বরকতের জন্য নিম্নে উহারই ফটো ব্লক দেওয়া হইল।

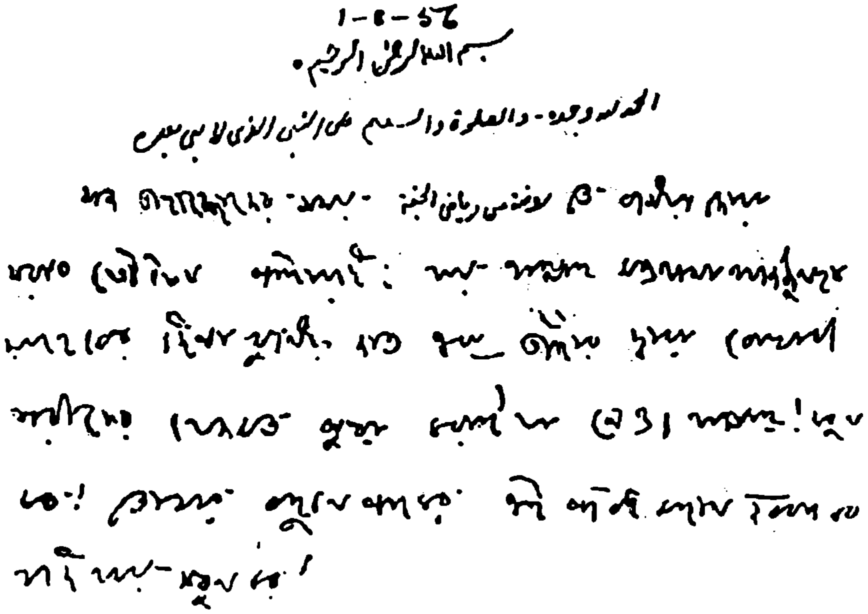

www.pathagar.com

সদর সাহেব (রহঃ) কর্তৃক জামাতার কাছে লিখিত পত্র

[illegible]

www.pathagar.com

ব্যবস্থাপকের কথা

আল্লাহ পাকের অসীম মেহেরবানীতে হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ) স্মারক গ্রন্থ তাঁর মৃত্যুর ৩০ বছর ৭ মাস পর প্রকাশিত হচ্ছে। তিনি ১৯৬৯ সনের ২১শে জানুয়ারী ইন্তেকাল করেন। এমন একখানি স্মারক গ্রন্থ অনেক পূর্বেই বের করা প্রয়োজন ছিল। আর সংগত কারণে সে উদ্যোগ গ্রহণ করা সমীচীন ছিল তাঁরই ঘনিষ্ঠজনদের পক্ষ থেকে। কিন্তু যা সমীচীন তা আমাদের দেশে কমই বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। কেননা, আমরা আমাদের মুরব্বীদের প্রতিভা সমূহের তেমন কোন কদর করতে জানি না এবং তাদের সঠিক মর্যাদা দিতেও যথেষ্ট কার্পণ্য করে থাকি। অথচ আমরা জানি, "যে জাতি তাদের মহৎ ব্যক্তিবর্গের নেক কীর্তির কথা স্বীকার করতে, তাদের জীবনাদর্শকে ভবিষ্যত প্রজন্মের সামনে তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়, তাদের জীবনে দূর্দশা ও হতাশা নিত্যকার সাথী হয়ে থাকে। সে জাতির ইতিহাসে মহৎ প্রাণের আবির্ভাব কমই ঘটে থাকে।" হযরত ফরিদপুরীসহ অনেক খ্যাতনামা আলিমের কথা ভাবলে উপরোক্ত বাক্যগুলির বাস্তব চিত্র আমাদের সামনে ফুটে ওঠে।

মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ) ছিলেন অসামান্য প্রতিভার অধিকারী। বিভিন্নমুখী কর্মকান্ডের মাধ্যমে গোটা জাতির ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য তিনি সব সময় ব্যাকুল থাকতেন। মাঝে মাঝে উম্মতের ব্যথায় শিশুর মত কেঁদে উঠতেন। কাজের ময়দানে যোগ্য লোক না পেয়ে হা-হুতাশ করে নীরবে অশ্রু ঝরাতেন। এতদসত্ত্বেও তার সংস্কারিক কর্মকাণ্ডকে মূল্যায়ন না করে অনেকে তাঁর সমালোচনা করতেও কুণ্ঠিত হত না। এমন কি তার হাম মাশরাব লোকেরাও তাঁর কাজে সহযোগিতা করতে তেমন একটা এগিয়ে আসেনি। বরং অনেক ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করেছিল।

তাই হযরত ফরিদপুরী আক্ষেপ করে বলতেন, "এই কওমের মঙ্গলের জন্য চেষ্টার ত্রুটি করি নাই। আমার ঈমানী গায়রতের কারণে সরকারী কোপানলে পড়িয়া বহু বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছি। পাশ্চাত্য শিক্ষিত বাংলার মানুষ প্রকৃত মানুষের কদর করিতে জানে না। আমি যদি ইউপি বা সিপিতে জন্মগ্রহণ করিতাম এবং আমার এই খেদমত তাহারা পাইত তাহা হইলে সেখানকার মুসলমানরা আমার জাগ্রত মস্তিষ্কের কদর করিত।" সত্যই আমরা তাঁর খেদমতের যথার্থ মূল্যায়ন করতে পারিনি। তাঁর মিশনকে এগিয়ে নিতে সত্যিকার অর্থে আমরা ব্যর্থ হয়েছি। এমনকি উপযুক্ত একখানা জীবনী লিখেও তাঁর প্রতি কর্তব্যের ঋণ শোধ

www.pathagar.com

করতে আমরা তৎপর হইনি। তাঁর ইন্তেকালের পরপরই এ ধরণের উদ্যোগ গ্রহণ করলে অনেক মণি-মাণিক্যের ভাণ্ডার সমতূল্য দেড়-দু'হাজার পৃষ্ঠার স্মারক গ্রন্থ বের করা সম্ভব হত এবং তা এ জাতির জন্য হত একটা মাইল ফলক।

মাওলানাকে স্বচক্ষে দেখার সৌভাগ্য এ অধমের হয়নি। ইন্তেকালের কয়েকমাস পর কলেজ জীবন ত্যাগ করে তাঁরই প্রতিষ্ঠিত গওহারডাঙ্গা মাদ্রাসায় ভর্তি হই। দীর্ঘ ৮ বছরের গওহারডাঙ্গা মাদ্রাসা জীবনে হযরতের উপর দু'একখানা জীবনী গ্রন্থ এবং স্মরণিকা বের হতে দেখেছিলাম। কিন্তু তা তাঁর ব্যাপক কর্ম জীবনের জন্য যথেষ্ট ছিল না। বিধায়, তাঁর হাজার হাজার গুণমুগ্ধের মত আমার মনের গহীনেও প্রচারবিমূখ এ মুখলিস বুযুর্গের বর্ণাঢ্য কর্মজীবনের উপর একখানা স্মারক গ্রন্থ প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তার কথা তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছিল।

দীর্ঘ দুই যুগেরও বেশী সময় অপেক্ষা করার পরও তাঁর ঘনিষ্ঠজনদের, এ ব্যাপারে এগিয়ে আসতে না দেখে এবং তাঁরই হাতে গড়া কয়েকজন বিশিষ্ট আলেমের ইন্তেকালে এ কথা চিন্তা করে শঙ্কিত হয়ে পড়ি যে, এখনও কাজ শুরু না করলে হযরতকে দেখা লোকের সংখ্যাও একদিন কমে যাবে। তদুপরি, তাঁরই সমসাময়িক কয়েকজন পাকিস্তানী এবং হিন্দুস্তানী বিখ্যাত আলিমের ইন্তেকালের পর তাঁদের জীবনের উপর সাত শত, আট শত, সাড়ে তের শত এমনকি দেড় হাজার পৃষ্ঠার স্মারক গ্রন্থ বের হতে দেখে কয়েক বছর পূর্বে আল্লাহপাকের উপর ভরসা করে এবং মক্কা-মদীনা শরীফের দোয়া কবুল হওয়ার স্থান সমূহে এ স্মারক গ্রন্থের মকবুলিয়াতের জন্য দোয়া করে ও হযরত ফরিদপুরীর ঘনিষ্ঠজনদের সাথে পরামর্শ করে এর বাস্তবায়নের স্বপ্ন লালন করতে থাকি। আল-হামদুলিল্লাহ! আপনাদের হাতে তুলে দেয়া এ স্মারক গ্রন্থ খানি সে সকল লালিত স্বপ্নেরই বাস্তব রূপ।

এ ধরণের কাজ ভারত এবং পাকিস্তানে সহজসাধ্য হলেও এ দেশে যে কত কঠিন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কারণ, আমাদের এখানে বুযুর্গদের জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে তাঁদের জীবদ্দশায় কোন তথ্য সংগ্রহ করে রাখা, তাদের জীবনের স্মরণীয় ঘটনাবলী, চিঠি-পত্র সংরক্ষণ করা, সন তারিখ ঠিক রাখা, ডাইরী মেইনটেন করা ইত্যাদি সাধারণতঃ খুবই কম হয়। এ সম্পর্কে পূর্বে একটা মোটামুটি ধারণা থাকলেও হযরত ফরিদপুরীর উপর প্রবন্ধ, চিঠি-পত্র ইত্যাদি সংগ্রহ করতে যেয়ে এ কাজ যে কত কঠিন তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পেরেছি। অনেক সময় হতাশ হয়ে গিয়েছি কিন্তু নিরাশ হইনি। আল্লাহ পাকের রহমত এবং সাথী-সঙ্গীদের উৎসাহ আমাকে আশার আলো দেখিয়েছে। তাই এই দুরূহ কাজটিতে অনেক শ্রম দেওয়ার পরও সংকলনটি তথ্যগত ও

www.pathagar.com

অন্যান্য ভুল ভ্রান্তি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়েছে এ কথার বলার সাহস আমার নেই। সহৃদয় পাঠক মহলের কাছে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হলে আমাকে তা অবগত করালে খুশী হব এবং তা সংশোধনের চেষ্টা করব।

এ সংকলনের সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেছেন বিশিষ্ট আলিম তরুণ সাংবাদিক ও আমাদের মাদ্রাসার শিক্ষা সচিব জনাব মাওলানা লিয়াকত আলী। প্রকাশনার কাজে মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে আমাকে ঋণী করেছেন আমাদেরই মাদ্রাসার শায়খুল হাদীস এবং আল-কাউসার প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী মাওলানা হাবীবুর রহমান। কপি তৈরীতে আমার ছোট ভাই মিরপুরের শাহ আলী মাদ্রাসার প্রভাষক মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল করিম এবং মাওলানা মাজহারুল ইসলাম যথেষ্ট পরিশ্রম করেছে। কয়েকটি সাক্ষাতকার গ্রহণে ও অন্যান্য ভাবে জনাব দবিরউদ্দীন আজাদ এ গ্রন্থ প্রণয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন।

আমাদের মাদ্রাসার ইদারাতুল মা'আরিফ (সাহিত্য ও সাংবাদিকতা) বিভাগের ছাত্র স্নেহাস্পদ মুহাম্মদ ইদ্রিস আলী ফরিদপুরী, ইদ্রিস ইবনে জহুর ও নাকীব আশরাফ প্রুফ দেখা এবং অন্যান্য কাজে যে কঠোর শ্রম দিয়েছে তার তুলনা হয় না। কম্পোজের কাজে সাহায্য করেছে আমার ছাত্র মুহাম্মদ ওয়াসি উদ্দীন ও শেখ আব্দুল হান্নান। ইন্টারলিংক কম্পিউটার সেন্টারের জনাব শাহেদ আনজুম (জনভাই) এবং আল-আমীন কম্পিউটার্সের মোহসীন সাহেবের অবদানও অনস্বীকার্য।

যে সকল প্রবন্ধকার সংকলনের জন্য মূল্যবান প্রবন্ধ দিয়ে এবং সামর্থবান ব্যক্তিবর্গ প্রকাশনার কাজে আর্থিক সহযোগিতা দিয়ে এ সংকলনটি প্রকাশ করার সকল ব্যবস্থা তরান্বিত করেছেন আমি আন্তরিক ভাবে তাদের সকলের শুকরিয়া আদায় করছি।

দোয়া করি আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যেন এ গ্রন্থ প্রণয়নে সকলের সহযোগিতা কবুল করে নেন এবং হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরীর (রহঃ) ঈমানদীপ্ত এ স্মারক গ্রন্থখানি পড়ে তাঁরই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আমাদের সবাইকে তাঁরই মত নিঃস্বার্থ, মোখলেস এবং মর্দে মুজাহিদ আলেম হিসেবে গড়ে ওঠার তৌফিক দেন। আমীন।

দারুর রাশাদ — বিনীত

তারিখ: ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৯৯ইং — মুহাম্মদ সালমান

www.pathagar.com

"আমার মনে চায় আমার হৃদপিণ্ড কাটিয়া টুকরা টুকরা করিয়া আপনাদের দেই। যেই রূপ তরমুজ কাটিয়া ফালি করিয়া ফেরিওয়ালারা বিক্রি করে সেই রূপ আমার হৃদয় ফালি করিয়া দিতে মন চায়। আছ কেহ খরিদদার? আমার এখন অন্তিম সময়। আহ্ এই যিকিরের আশেক পাইলাম না।"

মালফূজাতে ফরিদপুরী (রহঃ)

"যাহারা মাদ্রাসায় পড়িয়া আলিম হইয়াছে, অন্তত ১০ বছর লাগে দরসে নিযামী এলেম হাসিল করিতে। এলেম হাসিল করিয়া চলিয়া যায় অথচ কেহ আমল শিক্ষা করিতে, উস্তাদের জুতা-খড়ম আগাইয়া দেওয়ার খেদমত আঞ্জাম দিতে প্রয়োজন বোধ করে না। জীবন ভর রান্না করা শিখিল কেহই খাইয়া গেল না।"

— হযরত ফরিদপুরী (রহঃ)

www.pathagar.com

بسم الله الرحمن الرحيم

সম্পাদকীয়

সকল প্রশংসা বিশ্ব জাহানের মালিক মহান আল্লাহর, যিনি তাঁর প্রিয়সৃষ্টি বনি আদমকে সুপথে চালিত করবার জন্য পবিত্র গ্রন্থ নাযিল করেছেন এবং উক্ত গ্রন্থের বাস্তব অনুশীলন পেশ করবার জন্য প্রেরণ করেছেন মনোনীত পুরুষগণকে। অসংখ্য দরূদ ও সালাম সেই মহামনবের প্রতি, যিনি জগত প্রভূর করুণারূপে ধূলির ধরায় তাশরীফ এনেছেন এবং বিশ্ব মানবতার সামনে রেখে গিয়েছেন সর্বোত্তম আদর্শ।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানব জাতির ইহ ও পরকালীন সাফল্য ও কল্যাণের নিয়ামক হিসাবে যে চূড়ান্ত বিধান প্রদান করেছেন শেষনবীর (সাঃ) মাধ্যমে, তা সর্বোতি সংরক্ষণের অঙ্গীকারও তিনি ঘোষণা করেছেন। মানবতার মুক্তির দিশা এই মহা দর্শন তথা ইসলামের বাণী পৃথিবীর কোণায় কোণায় অবশ্যই পৌঁছে যাবে বলে জানিয়েছেন মহানবী (সাঃ) এবং তা সজীব সচল অনাবিল রাখবার জন্য প্রতি যুগে প্রতি প্রজন্মে আগমণ ঘটবে দৃঢ়চেতা সাধক ও অসাধারণ ব্যক্তিবর্গের। আল্লাহ প্রদত্ত বিধি ও রাসূল (সাঃ) প্রদর্শিত আদর্শের মর্যাদা সমুন্নত রাখতে এবং তা ব্যাপক প্রসারের ঐকান্তিক প্রয়াসে জীবনব্যাপী তৎপর থাকবেন তাঁরা।

বাংলার আলেমকুল শিরোমণি মুজাহিদে আ'যম হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ) ছিলেন এমনই এক অনন্য সাধারণ মনীষী। জাগতিক সাফল্যের সমূহ সম্ভাবনার দ্বার যাকে হাতছানি দিয়ে আহবান জানাচ্ছিল, তিনি তা উপেক্ষা করে বেছে নিয়েছিলেন উলুমে ইলাহী অর্জন ও নবুবী আখলাকে জীবন গঠনের সাধনাকে। অতঃপর মাতৃভূমির সর্বত্র সর্বস্তরে দ্বীনি প্রবাহ সৃষ্টির জন্য কর্ম জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ব্যয় করেন। বাংলার মুসলমানদের জন্য যাঁর অবদানের তুলনা বিরল, তাঁকে স্মরণীয় রাখবার কিংবা তাঁর আরব্ধ কর্মসূচী

www.pathagar.com

এগিয়ে নিতেও খুব কম যত্নবান হতে দেখা যায় তাঁর উত্তরসূরিদের। বাঙালী মুসলিম সমাজের দুর্ভাগ্য ও অশুভ বৈশিষ্ট্য, তারা গুণিজনদের যথার্থ মূল্যায়নে ব্যর্থ হয়।

মুজাহিদে আ'যম হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ) স্মারকগ্রন্থ অনেক জনের অনেক দিনের সাধনার ফসল। এ মনীষীর উপর স্মারকগ্রন্থ প্রকাশিত হচ্ছে তাঁর ইন্তেকালের তিরিশ বছর পর তারই ভাবশিষ্য গওহারডাঙ্গা মাদ্রাসায় শিক্ষা প্রাপ্ত ও দারুর রাশাদের প্রিন্সিপাল মাওলানা সালমান সাহেবের উদ্যোগ ও ব্যবস্থাপনায়। তথাপি সম্পাদক হিসাবে আমার নাম ব্যবহার মাওলানা সালমান সাহেবের মহানুভবতা। কারণ এ স্মারক গ্রন্থ প্রণয়নে আমার ভূমিকা ও সক্রিয়তা নিতান্তই অনুল্লেখ্য। তাই এতে যে সব সৌন্দর্যের সন্ধান পাওয়া যাবে, তা ব্যবস্থাপক সাহেব ও ইদারাতুল মা'আরিফ (সাহিত্য ও সাংবাদিকতা বিভাগ)-এর শিক্ষার্থীদের কৃতিত্ব। আর যা কিছু অবাঞ্ছণীয় বিচ্যুতি কিংবা বিকার পরিলক্ষিত হবে তার জন্য একান্ত আমারই দুর্বলতা দায়ী। অধিকাংশ লেখাই স্মৃতিচারণ মূলক। তাই অনেক বিষয়েরই পুনরাবৃত্তি হয়েছে। একই কারণে যদি তথ্যগত অসামঞ্জস্য দেখা যায়, তাহলে তা লেখকদেরই ব্যাপার। তাছাড়া হযরতের উপর এ প্রথম স্মারক গ্রন্থ প্রণীত হচ্ছে তাঁর ঘনিষ্ঠ জনদের অনেকের চির বিদায়ের পর। তাই সবকিছু যাচাই করা যায়নি। তবে এটিকে মডেল বা প্রাথমিক প্রয়াস গণ্য করে পরবর্তীতে আরো সমৃদ্ধ ও সুন্দর স্মারকগ্রন্থ প্রণয়নের সুযোগ সৃষ্টি হলো এ থেকে। লেখকদের লেখা যথা সম্ভব অবিকল রাখা হয়েছে, কোনরূপ কাটছাঁট বা পরিবর্তন না করার চেষ্টা করা হয়েছে।

এ গ্রন্থ যখন প্রকাশনার শেষ ধাপে এগিয়ে চলেছে, তখনও হযরতের শুভানুধ্যায়ী ও অনুরক্তদের লেখা ও স্মৃতিচারণ আসা অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু কাজ শুরুর পর থেকে এ পর্যন্ত যে দীর্ঘসূত্রিতা চলেছে, তাতে নতুন মাত্রা যোগ না হওয়াই সমীচীন বিবেচনা করে অনেক লেখা রেখে দিতে হয়েছে পরবর্তী সংস্করণের উদ্দেশ্যে। সুতরাং আরো যারা লিখতে আগ্রহী তাদেরকে স্বাগত জানাতে আমরা প্রস্তুত।

পরিশেষে, মহান আল্লাহর নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা, আমাদের এ শ্রম সাধনা কবুল হোক, নতুন প্রজন্ম উজ্জীবিত হোক মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরীর লালিত স্বপ্ন ও চেতনায়।

দারুর রাশাদ
তারিখ: ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৯৯ইং

বিনীত
সম্পাদক

www.pathagar.com

সূচীপত্র

✪ হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরীর (রহঃ)
সংক্ষিপ্ত জীবন পঞ্জী------------১৯
- মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল করিম

প্রথম অধ্যায়
স্মৃতিচারণমূলক প্রবন্ধ

✪ হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী ছিলেন আমার ছেরতাজ------৩১
-মাওলানা মোহাম্মদুল্লাহ হাফেজ্জী (রহঃ)
✪ আমার জীবনে হযরত সদর সাহেব (রহঃ) ------------------------৩৪
-শায়খুল হাদীস মাওলানা আজিজুল হক
✪ আব্বাজীকে যেমন দেখেছি - হাফেয মাওলানা মোহাম্মদ ওমর-----------৩৮
✪ আমার মোর্শেদ মাওলানা ফরিদপুরী (রহঃ) ------------------------৫০
-মাওলানা ফজলুর রহমান (রহঃ)
✪ যে রতন হারিয়ে খুঁজি -অধ্যক্ষ আব্দুর রাজ্জাক -----------------------১০১
✪ হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ)
স্মৃতিপটে যা এঁকেছি ------------------১১৯
- মাওলানা সিদ্দীকুর রহমান
✪ মাওলানা ফরিদপুরী (রহঃ) কে যেমন দেখেছি-------------------- ১৩৮
-মাওলানা তাকী উসমানী
✪ তবিবুল মিল্লাত হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ) --১৪২
- মাওলানা শাহ্ আব্দুল হক আব্বাসী।
✪ মুজাহেদে আযমকে যেমন দেখেছি - আব্দুল লতীফ মাহমুদী ---------- ১৫৩
✪ বাংলার থানভী মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ) ----------- ১৬৬
- অধ্যাপক আব্দুল গফুর
✪ উস্তাদে মুহতারাম হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ)--- ১৭২
- মুফতী ফজলুল হক আমিনী

www.pathagar.com

✪ আকাশের মত উদার সাগরের মত গভীর সেই মহামানব ------------ ১৮৯
- আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী
✪ হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ)-কে যেমন দেখেছি -- ২০৯
- মাওলানা আমিনুল ইসলাম
✪ মানুষ গড়ার কারখানা- মাওলানা আব্দুল মতীন বিন হুসাইন -------------২১৪
✪ অনন্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ)-- ২৩৮
-মাওলানা শামছুদ্দীন কাসেমী (রহঃ)
✪ বাংলাভাষা ও সাহিত্যের ইসলামী রূপকার- মাওলানা মুহীউদ্দীন খান-- ২৪৪
✪ এক বিরল ব্যক্তিত্বের বিকাশ- গোলাম মোস্তফা---------------------- ২৪৯
✪ হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ): কিছু অভিব্যক্তি ---- ২৫৯
-মাওলানা খলিলুর রহমান
✪ আত্মত্যাগী মহাপুরুষ- গোলাম সোবহান সিদ্দীকী--------------------- ২৬৩
✪ স্মৃতির আয়নায় হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ)----- ২৭৫
-মাওলানা আবদুল জব্বার জাহানাবাদী
✪ খৃষ্টান মিশনারীদের অপ-তৎপরতার বিরুদ্ধে
মুজাহিদে আযমের ভূমিকা ------------------------------------ ২৮১
-মাওলানা আবদুল আউয়াল (খুলনাভী)
✪ যে সূর্যের অস্ত নাই- মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাঈল---------------------- ২৮৯
✪ মুজাহিদে আ'যম সম্পর্কে জৌনপুরী পীর সাহেবের উক্তি ----------- ৩০২
-মাওলানা আবু সাঈদ কাশিয়ানী
✪ মাওলানা ফরিদপুরী (রহঃ)-কে যেমন দেখেছি---------------------৩০৭
- অধ্যাপক গোলাম আযম
✪ এক বিস্ময়কর প্রতিভার অধিকারী
মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী ------------------------৩১৪
- অধ্যাপক সৈয়দ সিরাজুল ইসলাম
✪ উম্মতের কল্যাণ কামনায় আজন্ম ব্যাকুল ------------------------- ৩২০
- এইচ.এম হাসান মাহমুদ
✪ ইদারাতুল মা'আরিফ ও মাওলানা
শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ) ---------------------------------৩২৩
-অধ্যক্ষ আবদুর রাজ্জাক
✪ মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ) ও
খাদেমুল ইসলাম জামাআত ---------------------৩২৬
-মাওলানা ফজলুর রহমান (রহঃ)
✪ স্মৃতির মণিকোঠায় মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ)---------৩৩৬
-মাওলানা আবদুর রাজ্জাক

www.pathagar.com

✪ এমন মানুষ মিলবে না আর- মাওলানা আজীমুদ্দীন ------------------- ৩৫৪
✪ মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ)
একটি জীবন একটি ইতিহাস ------------------------------------ ৩৬৯
-মাওলানা মোস্তফা আজাদ
✪ হযরত সদর সাহেব (রহঃ) যোগ্য ও সার্থক নায়েবে রাসূল --------- ৩৭৩
- আবদুল জলীল
✪ মাতৃভাষায় ইসলামী সাহিত্য চর্চার অগ্রপথিক --------------------- ৩৮৭
- আব্দুস সাত্তার কিশোরগঞ্জী
✪ ইসলামী রেনেসাঁর বীর সেনানী - শাহ্ ওয়ালি উল্লাহ্----------------- ৩৮৯
✪ মুজাহিদে মিল্লাত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী ----------------- ৪০০
- মাওলানা উবায়দুল হক
✪ হযরত ফরিদপুরীর (রহঃ) সান্নিধ্যে কিছুক্ষণ------------------------- ৪০৪
- মাওলানা আতাউর রহমান খান
✪ মরহুম আবদুল হক সাহেবের ডায়েরী হতে------------------------- ৪০৮

দ্বিতীয় অধ্যায়

হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ) সম্পর্কে কয়েকজন খ্যাতনামা আলেমের সাক্ষাৎকার

✪ শায়খুল হাদীস মাওলানা আজিজুল হক--------------------------- ৪১৩
✪ শায়খুল হাদীস মাওলানা আবদুল মান্নান------------------------- ৪২৪
✪ শায়খুল হাদীস মাওলানা কাজী মু'তাসিম বিল্লাহ ------------------- ৪৩৮
✪ মাওলানা কারী উবায়দুল্লাহ্------------------------------------- ৪৪৯
✪ হযরত মাওলানা আবদুল হাই ----------------------------------- ৪৫৪

তৃতীয় অধ্যায়

হযরত ফরিদপুরীর (রহঃ) রচনাবলী হতে

✪ তাফসীরে কোরআনুল কারীম হতে---------------------------- ৪৭১
✪ হাদীস শরীফ হতে--- ৪৭৩
✪ জীবনের পণ --- ৪৭৪
✪ মসজিদ --- ৪৭৯
✪ শক্তির উৎস কোথায়? ----------------------------------- ৪৮৭
✪ আমপারার ভূমিকা -------------------------------------- ৪৯০

www.pathagar.com

- পাঞ্জসূরার ভূমিকা ---------- ৪৯২
- বোখারী শরীফের ভূমিকা ও পরিচিতি ---------- ৪৯৪
- মাওলানা নূর মোহাম্মদ আযমী (রহঃ) অনুদিত
  মেশকাত শরীফ সম্পর্কে সদর সাহেব (রহঃ)-এর অভিমত ---------- ৪৯৬
- হায়াতে মাদানী গ্রন্থের ভূমিকা ---------- ৪৯৮
- হায়াতুল মুসলিমীন গ্রন্থের ভূমিকা ---------- ৫০৩
- হায়াতুল মুসলিমীন গ্রন্থের পূর্বাভাষ ---------- ৫০৫
- বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে নারী গ্রন্থের ভূমিকা ---------- ৫১৫
- এলমের ফযীলতের অবতরণিকা ---------- ৫২৩

চতুর্থ অধ্যায়

মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ)- এর অমিয় বাণী ---------- ৫২৫

পঞ্চম অধ্যায়

মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ)- এর লিখিত চিঠিপত্র, আবেদন ইত্যাদি ---- ৫৪৯

ষষ্ঠ অধ্যায়

সমসাময়িক বুযুর্গানে দ্বীনের দৃষ্টিতে এবং তৎকালীন পত্র পত্রিকায় হযরত ফরিদপুরী (রহঃ)

সমসাময়িক বুযুর্গানে দ্বীনের দৃষ্টিতে মাওলানা ফরিদপুরী (রহঃ)

- হযরত মাওলানা ইউসুফ বিননূরী (রহঃ) ---------- ৫৫৯
- হযরত মাওলানা যাফর আহমদ উসমানী (রহঃ) ---------- ৫৫৯
- খতীবে আ'যম হযরত মাওলানা সিদ্দিক আহমদ (রহঃ) ---------- ৫৫৯
- হযরত মাওলানা মুফতী দ্বীন মুহাম্মদ খান (রহঃ) ---------- ৫৬০

তৎকালীন বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত মাওলানা ফরিদপুরীর (রহঃ)

- মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ) মাসিক মদীনা– জানু,৬৯ --- ৫৬১
- "মাওলানা শামছুল হক সাহেবের এন্তেকালে শোকপ্রকাশ" ---------- ৫৬৩
- 'পরলোকে শামছুল হক ফরিদপুরী' -উপসম্পাদকীয় আরাফাত ------ ৫৬৪
- একজন মর্দে মুমেনের কর্মময় জীবনের অবসান -আরাফাত ---------- ৫৬৬
- Maulana Shamsul Huq dead – THE PAKISTAN OBSERVER -- ৫৬৬

www.pathagar.com

- দারুল উলুম মাদ্রাসায় শোক সভা অনুষ্ঠিত –দৈনিক আজাদী ------- ৫৬৭
- মওলানা শামছুল হকের এন্তেকালে শোকসভা–প্রাচীনতম আজাদ --- ৫৬৭
- মাওলানা শামছুল হকের এন্তেকালে বিভিন্ন মহলের শোক প্রকাশ---- ৫৬৭
- মাওলানা ফরিদপুরীর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ– প্রাচীনতম আজাদ ---- ৫৬৮
- মাওলানা শামছুল হকের এন্তেকালে শোক সভা -প্রাচীনতম আজাদ-- ৫৬৯
- মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরীর ইন্তেকাল– জাহানে নও --------- ৫৬৯
- মাওলানা শামছুল হকের এন্তেকালে বিভিন্ন মহলের শোক প্রকাশ- দৈনিক আজাদ ------------------------------------ ৫৬৯
- মাওলানা শামছুল হকের এন্তেকালে শোকসভা- দৈনিক আজাদ ----- ৫৭০
- মাওলানা শামছুল হকের এন্তেকালে শোকসভা-দৈনিক আজাদ ------ ৫৭০
- মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ) –দৈনিক আজাদ ---------- ৫৭১
- ১৪০৫ হিজরীর ইসলামিক ফাউন্ডেশন ------------------------------- পুরস্কার প্রাপ্তদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি হতে -------------------------- ৫৭১

সপ্তম অধ্যায়

হযরত ফরিদপুরী (রহঃ) স্মরণে কয়েকটি কবিতা

- আলোকময়ের আলো- অধ্যাপক আখতার ফারুক ------------------ ৫৭৭
- হযরত ফরিদপুরী (রহঃ) স্মরণে- খন্দকার ওমর আহমদ------------ ৫৭৮
- বিপ্লব সূর্য- যুল হাসানাইন --- ৫৭৯
- দানবীর হে শামছুল হক ফরিদপুরী- এম.এ. জলীল ---------------- ৫৮০

পরিশিষ্ট

- লেখক পরিচিতি -- ৫৮১
- হযরত ফরিদপুরী সম্পর্কিত কিছু আলোকচিত্র -------------------- ৬১৩

===ooo===

www.pathagar.com

"আরো কিছু সংখ্যক কেতবাড়ী বলদ অর্থাৎ ভুলাভালা কর্মী সংগ্রহ কর, পাহাড় টলিবে তো তাঁহারা টলিবে না। আমি কিছু শিক্ষা দিয়া যাইব। ইনশাআল্লাহ্! সেই শিক্ষায় কওম ও মিল্লাতের সঠিক দিক নির্দেশনা হইবে। বেশী বড় আলিম ও ডিগ্রীধারীদের দ্বারা কাজ করান যায়না। নিজের রায় ফানা করিতে পারেনা। কান্য,হেদায়া পর্যন্ত পড়া কিছু আলিম এবং আন্ডার গ্রাজুয়েট কতিপয় যুবক ধরিয়া আন। আমার লেখা বইগুলির ব্যাপক প্রচার কর।"

মালফুযাতে হযরত ফরিদপুরী

www.pathagar.com

আপন পরিচয়ে হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ)

(বেদয়াত ও এজতেহাদ গ্রন্থ থেকে)

আমি কে?

[সুধী পাঠক, কোরানে পাকের কিছু ব্যাখ্যা আমি আপনাদের সামনে পেশ করিয়াছি। কাজেই আপনাদের আগে আমাকে চেনা দরকার। নতুবা আল্লাহর কালামের ব্যাখ্যা অচেনা লোকের কাছ থেকে গ্রহণ করা আপনাদের জন্য ঠিক হবে না। হয়ত ধোকাও খাইতে পারেন। দুনিয়া ধোকায় ভরা। সুতরাং ধোকা হইতে আত্মরক্ষা করার চেষ্টা করা প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তির জন্যই কর্তব্য।]

আমি শুধু ইংরেজী শিক্ষিত বা শুধু আরবী শিক্ষিত লোক নই। আমি প্রথম জীবনে স্কলারশিপসহ কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে ইংরেজী পড়িয়াছি। তারপর হইতে শেষ পর্যন্ত আরবী পাঠ্য কিতাবগুলি যোগ্য ও দক্ষ উস্তাদগণের নিকট পড়িয়াছি। আরবীসহ পাঠ্য পুস্তকগুলি পড়িয়া পাস করিয়াই ক্ষান্ত হই নাই। অন্ততঃ ৩০ (ত্রিশ) বৎসর পর্যন্ত অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার কাজে এবং অনুশীলন কাজে নিজেকে ব্যাপৃত রাখিয়াছি। শুধু অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও অনুশীলন কাজেই নিজেকে ব্যাপৃত রাখি নাই, অন্ততঃ ২২ (বাইশ) বৎসর যাবত কোরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী জীবনের চরিত্রের ভিতর বাহির গঠন করার জন্য কোরআন-হাদীসের গভীরতম দেশ পর্যন্ত পৌছার জন্য কঠোর সাধনা সহকারে যামানার সর্বাধিক জনমান্য, ত্যাগী, জাহের-বাতেনের আলেম, আরেফ ও আমেল প্রজ্ঞা বিশিষ্ট অভিজ্ঞ পারদর্শী ব্যক্তির সোহবতে নিজেকে নিবদ্ধ রাখার সৌভাগ্যও আল্লাহ পাক আমাকে দান করিয়াছেন।

আমার এই আধ্যাত্মিক উস্তাদ ও পীর হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) ব্যতীত বাংলার প্রসিদ্ধ পীর ফুরফুরার হযরত মাওলানা আবুবকর সিদ্দীকীর সোহবত এবং শর্ষিণার হযরত মাওলানা নেছারউদ্দীন সাহেবের সোহবতও আল্লাহ পাক নসীব করিয়াছেন। ইঁহারা সবাই কোরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী জীবন যাপন ও জীবন গঠনের জন্যই পরাধীন যুগেও নিজেকে কোরবান করিয়া রাখিয়াছিলেন। বাংলাভাষাও আমি সংস্কৃত ভাষায় পারদর্শী জ্ঞানী হিন্দু পণ্ডিতের কাছে শিখিয়াছি এবং তারপর ৪০ (চল্লিশ) বৎসর যাবত বাংলা সাহিত্যের সেবা বিভিন্নভাবে করিয়া আসিতেছি।

www.pathagar.com

"আরো কিছু সংখ্যক কেতাবাড়ী বলদ অর্থাৎ ভুলাভালা কর্মী সংগ্রহ কর, পাহাড় টলিবে তো তাঁহারা টলিবে না। আমি কিছু শিক্ষা দিয়া যাইব। ইনশাআল্লাহ! সেই শিক্ষায় কওম ও মিল্লাতের সঠিক দিক নির্দেশনা হইবে। বেশী বড় আলিম ও ডিগ্রীধারীদের দ্বারা কাজ করান যায়না। নিজের রায় ফানা করিতে পারেনা। কানয,হেদায়া পর্যন্ত পড়া কিছু আলিম এবং আন্ডার গ্রাজুয়েট কতিপয় যুবক ধরিয়া আন। আমার লেখা বইগুলির ব্যাপক প্রচার কর।"

মালফূযাতে হযরত ফরিদপুরী (রহঃ)

www.pathagar.com

হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ)

সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জী : ১৮৯৫—১৯৬৯

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল করিম

জন্মস্থান: গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গীপাড়া থানার পাটগাতি ইউনিয়নের গওহারডাঙ্গা গ্রাম।

পিতা : মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ। মাতা: মুসাম্মাৎ আমিনা খাতুন।

জন্ম : ১৮৯৫ মোতাবেক ১৩০২ বাং ২রা ফাল্গুন রোজ শুক্রবার।

১৯১০—১২ : প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় শ্রেণী যথাক্রমে পাটগাতির জনৈক পন্ডিত পূর্ণ চন্দ্রবাবু ও মুন্সী আজিজুল হকের পাঠশালায় পড়েন।

১৯১৩—১৫ : নাজিরপুরের (পিরোজপুর) সুটিয়াকাঠি স্কুলে চতুর্থ এবং নোয়াপাড়ার ভাগুটিয়া স্কুলে পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণী পড়েন। সেখানে অবসর সময়ে মাওলানা কাসেমের নিকট গভীর আগ্রহের সাথে আরবী শিক্ষা শুরু করেন এবং বিজাতীয় হিন্দুদের ইউনিফর্মের (ধূতি ইত্যাদি) বিপরীতে গৌরবের সাথে মুসলিম ইউনিফর্ম (পায়জামা, পাঞ্জাবী ও টুপি) পরিধান করা আরম্ভ করেন।

১৯১৬—১৭ : কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় এ্যাংলো পার্শিয়ান বিভাগে ভর্তি হয়ে সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণী পড়েন। অষ্টম শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষায় মেধা তালিকায় প্রথম স্থান অধিকার করে স্বর্ণপদক পান। তখন থেকে সাধারণ শিক্ষায় আত্মতৃপ্ত ও আস্থাশীল হতে পারেননি। তাই কলিকাতা মহানগরীর সময়কালকে মোক্ষম সময় মনে করে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি কুরআন-হাদীসের শিক্ষার প্রতি অধিক ঝুঁকে পড়েন। নিজেকে গঠন করার মানসে আবদুর রউফ দানাপুরীর নিকট এলমেতীব, জনৈক ইমাম সাহেবের নিকট শরহে বেকায়া এবং অপর এক মাওলানার নিকট কুদুরী পড়তে থাকেন। ইতিপূর্বে তিনি ভাল আরবী, উর্দু জানতেন না। তাই প্রাইভেট পড়িয়ে কিছু অর্থের (৩০ টাকা) ব্যবস্থা করতেন এবং শিক্ষকদের কিছু কিছু হাদীয়া দিয়ে উক্ত গ্রন্থসমূহ আয়ত্ব করেন।

পাঠ্যপুস্তকের বাইরে তিনি অনেক কিতাব পড়তেন। যেমন, সীরাতে নো'মান, জিমানুল ফিরদাউস ইত্যাদি। শেষোক্ত বইটি তিনি 'ফিরদাউসের পথে' নাম দিয়ে তখনই অনুবাদ করেছিলেন। এটি তাঁর জীবনের সর্বপ্রথম অনুবাদ।

www.pathagar.com

১৯১৮—১৯ : বৃত্তি ও স্বর্ণপদক প্রাপ্তির পর নবম শ্রেণীতে হোস্টেলসহ সবকিছু ফ্রী হয়ে যায়। কৃতিত্বের সঙ্গে নবম শ্রেণী সমাপ্ত করেন। এ বছর কলিকাতায় হযরত মাওলানা থানভী (রহঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাত হয়। তাঁর নিকট তিনি মনের ব্যাকুলতা ও প্রতিবন্ধকতার কথা বলে কেঁদে দেন। এ সময় ইসলামী শিক্ষা ও গবেষণার প্রতি ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। তাই স্কুলের শিক্ষা একরূপ বাদ দিয়ে আরবী উর্দু কিতাব-পত্র পড়াশুনায় মনোযোগ দেন।

প্রস্তুতি ব্যতীত প্রবেশিকা পরীক্ষায় অংশ নিয়ে মাত্র এক ঘন্টা লিখবেন এবং অকৃতকার্য হয়ে সাধারণ শিক্ষা ত্যাগ করে মাদ্রাসা শিক্ষার পথ সুগম করতে চেয়ে ছিলেন তিনি। কিন্তু সবাইকে তাক লাগান ফলাফল (পাঁচ বিষয়ে লেটারসহ স্টারমার্ক পেয়ে স্কলারশীপ) লাভ করায় আশা পূরণ হয়নি। উপরন্তু পিতার চাপে কলেজে ভর্তি হতে বাধ্য হন।

১৯২০ : অনিচ্ছা সত্ত্বেও কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হন। কিছু দিন পড়ার পর স্বপ্নে দেখেন কে যেন তাঁকে দেওবন্দ পড়তে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দিচ্ছে।

১৯২১—২৪ : তখন গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের আহবানে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় তথা সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায়। সে সুযোগে তিনি দেওবন্দ মাদ্রাসায় চলে যান। কিন্তু শিক্ষাবর্ষ শেষ হতে একমাস বাকী ছিল বিধায় থানাভবনে থানভীর দরবারে আগমণ করেন এবং দুই মাসের অধিক সময় তাঁর নিকট আধ্যাত্মিক সাধনায় মগ্ন হন। আরবী শিক্ষাবর্ষ শুরু হলে তিনি থানভীর অনুমতিক্রমে সাহারানপুর মাজাহেরে উলূম মাদ্রাসায় ভর্তি হন এবং চার বছরে কাফিয়া হতে মেশকাত পর্যন্ত পড়েন। সপ্তাহান্তে ৩৫ মাইল পথ পায়ে হেঁটে থানা ভবন যেতেন এবং রূহানী শিক্ষা নিতেন।

১৯২৫—২৬ : দুই বছর দেওবন্দে সিহাহ সিত্তা পড়াশুনা করেন এবং এলেমের পিপাসা মিটান। এ সময় তাঁর পরম শ্রদ্ধাভাজন উস্তাদ ছিলেন মাওলানা এজাজ আলী (রহঃ) ও শায়খুল ইসলাম মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী (রহঃ)। কওমী মাদ্রাসা শিক্ষার সর্বোচ্চ ডিগ্রী দাওরায়ে হাদীস অর্জন করেন।

অতঃপর ১৯২৭ খৃঃ তিনি পুনরায় একনিষ্ঠভাবে মাওলানা থানভীর দরবারে ডুবে যান এবং আধ্যাত্মিক সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। কঠোর রিয়াজাত ও মোজাহাদার পর অবশেষে তিনি পরিপূর্ণতা অর্জন করে

www.pathagar.com

খিলাফত প্রাপ্ত হন। অবশ্য তাঁর খেলাফত প্রাপ্তির বিষয়টি তাঁরই বিশেষ অনুরোধে হযরত থানভী (রহঃ) গোপন রাখেন।

১৯২৮ : শিক্ষা সমাপ্তির পর মাওলানা মাদানীর মাধ্যমে তার নিকট হায়দারাবাদ উচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতি হওয়ার প্রস্তাব এলে তিনি এমন সুবর্ণ সুযোগ ত্যাগ করে বাংলাদেশের মানুষের মাঝে দ্বীনের খেদমত করার মনোভাব ব্যক্ত করেন। ঠিক তখনই জামিয়া ইউনুসিয়ার মুহতামিম হযরত মাদানীর নিকট একজন সুযোগ্য শায়খুল হাদীস চাইলে তিনি মাওলানা ফরিদপুরীকে যোগ্যতম প্রার্থী হিসেবে মনোনীত করেন এবং সেখানে যাওয়ার পরামর্শ দেন।

১৯২৯ : দেশে প্রত্যাবর্তন করে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার জামিয়া ইউনুসিয়ায় সদরুল মুদাররিস হিসেবে যোগদান করনে। পাঁচ বছরে মাদ্রাসাটিকে দাওরায়ে হাদীস স্তরে উন্নীত করেন।

১৯৩৫ : কুরআন ও হাদীসের শিক্ষাকে বাংলার ঘরে ঘরে পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে পদ্মার দক্ষিণ পাড়ে বাগেরহাটের গজালিয়ায় মাদ্রাসা স্থাপন করেন।

১৯৩৬ : মহৎ উদ্দেশ্য ও দ্বীনের আন্দোলনকে ব্যাপকতর ও সুচারুরূপে বাস্তবায়ন করার জন্য গ্রাম ছেড়ে তিনি ঢাকা মহানগরীতে চলে আসেন। সদর ঘাটের স্টীমার ঘাট মসজিদ ও আশেপাশে কিছুদিন কাজ করার পর জিনজিরার হাফেয হুসাইন আহমদের সহযোগিতায় বড় কাটারায় মাদ্রাসা কায়েম করেন। এখানে তিনি দীর্ঘ পনের বছর প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপ্যাল হিসেবে কাজ করেন।

১৯৩৭ : বিপ্লবী আন্দোলনের নেতা দ্বীনের একনিষ্ঠ সেবক আল্লামা ফরিদপুরী কেন্দ্রীয় খেদমতের পাশাপাশি এ বছর তাঁর জন্মভূমি গওহারডাঙ্গায় একটি বিরাট মাদ্রাসা কায়েম করেন।

১৯৪৩ : কয়েকমাস কলকাতায় অবস্থান করে হযরত থানভী (রহঃ)এর অসুস্থতার কথা শুনে থানা ভবন চলে যান। এবং তার মৃত্যু পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করেন।

১৯৪০–৪৪ : ঐতিহাসিক সিমলা কনফারেন্সে প্রদত্ত এক জিহাদী ভাষণে কায়েদে আ'যম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ খুশি হয়ে তাকে (তৎকালীন) বাংলাদেশের মুসলিম লীগের সভাপতি করার প্রস্তাব দেন। কিন্তু মাওলানা তাতে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন।

www.pathagar.com

- ন্যাশনাল গার্ড ও আনসার বাহিনীতে জনবল সঞ্চার করেন।
- রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা দ্বারা ইসলামী আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন।
- জাতীয় খেদমতের দিকনির্দেশনার আলোক বর্তিকা হিসেবে খাদেমুল ইসলাম জামায়াত প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯৪৫ : জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম গঠনে ভূমিকা রাখেন। কলিকাতার মোহাম্মদ আলী পার্কে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত উলামা কনফারেন্সের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন।

১৯৪৬–৪৭ : পাকিস্তানের স্বাধীনতায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। তখন মাওলানা যাফর আহমদ উসমানীর ডানহাত হিসেবে তিনি কাজ করেন। সিলেট রেফারেন্ডামের ঝটিকা সফরেও তিনি শরীক ছিলেন। ভারতের সর্বত্র সফর করে পাকিস্তানের পক্ষে জনমত গড়ে তোলেন। রাজনৈতিক আন্দোলন ও তৎপরতায় ব্যস্ত থাকেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তিনি জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের সভাপতি ছিলেন।

১৯৪৮ জুন-জুলাই : ৪দফা আদর্শ প্রস্তাবের সমর্থনে তাঁর নেতৃত্ব ও উদ্যোগে সম্মেলন হয়। হাদীসে আরবাইন (অনুবাদ) প্রকাশিত হয়।

১৯৪৯ : ঐতিহাসিক ২২দফা ইসলামী শাসন তান্ত্রিক মূলনীতি প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। পাকিস্তানের স্বাধীনতার পর কিছুদিন মুসলিম লীগের পার্লামেন্টারী পার্টির সদস্যও ছিলেন।

- নয়া পাক সরকারের শিক্ষা কমিশন মাদ্রাসা শিক্ষাকে অর্থের অপচয় আখ্যায়িত করলে এবং অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত আরবী শিক্ষা বাদ দেওয়ার সুপারিশ করলে ফরিদপুরী গর্জে উঠেন এবং সারাদেশে দুর্বার প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। ফলে সরকার কমিশন বাতিল করতে বাধ্য হয়।
- কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ পাঁচজন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদকে পরামর্শ সভায় আহবান করেন। তিনি ছিলেন তাঁদের অন্যতম।
- গওহার ডাঙ্গা মাদ্রাসায় দাওরায়ে হাদীস খোলেন।

১৯৫০ : মাদ্রাসা শিক্ষিতদের যুগোপযোগী করে গড়ার লক্ষ্যে বৃহত্তর পরিকল্পনা নিয়ে ঢাকার লালবাগে জামিয়া কুরআনিয়া আরাবিয়া (আরবী ইসলামী

www.pathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয়) প্রতিষ্ঠা করেন। মৃত্যুর দু'এক বছর পূর্ব পর্যন্ত তিনি অত্র প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন। তখন ইহা ছিল সর্বপ্রকার দ্বীনী আন্দোলনের সদর দফতর বা হেড অফিস।

- প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের শাসনতান্ত্রিক মূলনীতির সমালোচনা করেন।

১৯৫১ : (২১-২৪) জুন করাচীতে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় উলামা সম্মেলনে ঐতিহাসিক ২২দফা শাসনতান্ত্রিক মূলনীতির রচয়িতাদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম।

- জনগণকে বিভ্রান্ত করে সরকারীভাবে যাকাত আদায়ের প্রচেষ্টাকে যুক্তিপূর্ণ বিজ্ঞাপন প্রচার ও মসজিদে মসজিদে সভা করে বানচাল করে দেন।

১৯৫৪ : সাধারণ নির্বাচনে বিজয়ী যুক্তফ্রন্ট সরকার ইসলমী শাসনতন্ত্র কায়েম করতে না পারায় মাওলানা ফরিদপুরীর আশঙ্কা ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতাই ফুটে উঠে।

১৯৫৫ : ফেতনায়ে এনকারে হাদীসের বিরুদ্ধে সংগ্রামী প্রতিবাদী ভূমিকা পালন করেন।

১৯৫৬ : এ বছর তিনি হজ্জ্ব পালন করেন।

১৯৫৭ : মজলিসে তামীরে মিল্লাতের তিনদিন ব্যাপী সেমিনার উদ্বোধন করাসহ বিভিন্ন সময় এর প্রতি সহযোগিতা করেছেন।

১৯৫৮ : ৭ই অক্টোবর প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান সামরিক শাসন জারী করলে এবং ১৯৫৬ সালের আইনানুগ শাসনতন্ত্র বাতিল করলে আন্দোলন ঝিমিয়ে পড়ে। কেউ মুখ খোলার সাহস করেনি। কিন্তু নির্ভীক ফরিদপুরী মার্শাল 'ল' ভঙ্গ করে ঢাকার মসজিদে সেমিনার করেন।

- প্রেসিডেন্ট আইয়ূবের পারিবারিক আইন ও জন্মনিয়ন্ত্রণের বিরোধিতা করেন এবং প্রেসিডেন্ট হাউজে রীতিমত বাক যুদ্ধে লিপ্ত হন।
- নির্লোভ খোদাভীরু এ মর্দে মুজাহিদকে বশে আনার জন্য প্রেসিডেন্ট আইয়ূব দশ লাখ টাকার চেক তার হাতে তুলে দিলে তিনি ঘৃণাভরে তা প্রত্যাখ্যান করেন।

১৯৫৯ : গওহারডাঙ্গা থেকে ব্রিটিশ শাসনের বিষফল প্রকাশিত হয়।

www.pathagar.com

১৯৬১ : হেলাল কমিটির হঠকারি সিদ্ধান্ত- প্রত্যাখ্যান করে পরের দিন স্বতঃস্ফূর্তভাবে আপামর জনসাধারণকে সাথে নিয়ে ঈদের নামায পড়েন। বঙ্গানুবাদ বেহেশতী জেওর প্রকাশিত হয় এমদাদিয়া লাইব্রেরী হতে।

১৯৬২ : এ সময় খৃষ্টান জগত শান্তির দ্বীপ ও সেবার নামে দুর্বল দেশবাসীকে খৃষ্টান বানাবার ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করলে ফরিদপুরী হুঙ্কার দিয়ে উঠেন। কিতাবপত্র রচনা করে, প্রকাশ্যে চ্যালেঞ্জ করে আঞ্জুমানে তাবলিগুল কুরআন কমিটি গঠন করে ও ব্যাপক সভা-সমিতি করে তাদের কণ্ঠ রুদ্ধ করেন। ফলে তারা যাবতীয় ষড়যন্ত্র ও অপতৎপরতা বন্ধ করতে বাধ্য হয়।

১৯৬৩ : ঢাকায় বিরাট ছাত্র-জনতার শোভা যাত্রা থেকে ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবী উঠলে আযম খান ছাত্রদের দাবী মেনে নিয়ে ড: সৈয়দ মুয়াজ্জম হোসেনের নেতৃত্বে ১১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করেন। মাওলানা ফরিদপুরীকেও কমিটির অন্যতম সদস্য হিসেবে গণ্য করা হয়।

১৯৬৪ : উলামাদের সংগঠিত ও ইসলামী দাবী-দাওয়া আদায়ের ব্যাপারে সকলকে এক প্লাটফর্মে আনার জন্য ইত্তেহাদুল উলামা গঠন করেন। ফরিদপুরী ছিলেন এ সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি।

১৯৬৫ : নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান হযরত ফরিদপুরীর নিকট সমর্থন জানাতে অনুরোধ করলে তিনি তখনই তা প্রত্যাখ্যান করেন এবং তাঁর ইসলাম ও শরীয়ত বিরোধী কার্যকলাপের কঠোর সমালোচনা করেন।

- এ বছর সৌদি বাদশাহ রাবেতা-এ-আলমে আল-ইসলামীর মহাসম্মেলনে পূর্ব পাকিস্তানের একমাত্র ফরিদপুরীকে দাওয়াত দিলে তিনি প্রস্তুতি নেন এবং বিষয়বস্তু ঠিকও করেন। কিন্তু প্রেসিডেন্ট আইয়ূব তাকে বিদেশে যাওয়ার অনুমতি দিতে নিষেধ করে রাখেন।
- মুসলিম সাহিত্যিক এবং মুসলিম সাংবাদিক তৈরী করার জন্য ফরিদাবাদ মাদ্রাসায় ইদারাতুল মা'আরিফ নামে একটি গবেষণা মূলক প্রতিষ্ঠান কায়েম করেন।

www.pathagar.com

১৯৬৬ : খুলনার টাউন মসজিদে উলামা কনফারেন্স আহ্বান কারে আয়েম্মায়ে মাসাজিদ বা ইমাম সমিতি গঠন করেন।

- তিনি মাদ্রাসা শিক্ষা ও সাধারণ বা আধুনিক শিক্ষা তথা ধর্মহীন কর্মশিক্ষা ও কর্মহীন ধর্মশিক্ষার মাঝে সমন্বয় সাধন করার চিন্তাধারা লালন করেছিলেন।

১৯৬৮ জানুয়ারী : জামিয়া কুরআনিয়া আরাবিয়া লালবাগ হতে হযরত ফরিদপুরী বিদায় নেন।

১৯৬৯ : ২১ জানুয়ারী মোতাবেক বাংলা ১৩৭৫ সনের ৭ মাঘ মঙ্গলবার বেলা ২:৩০ মিনিটে চির বিদায় নেন।

পারিবারিক জীবন: হযরত ফরিদপুরীর (রহঃ) মরহুমা প্রথম স্ত্রীর ১ ছেলে এবং ১মেয়ে জীবিত আছেন। ছেলে মাওলানা হাফেয মুহাম্মদ ওমর। দ্বিতীয় স্ত্রীর ২মেয়ে এবং ১ছেলে। ছেলে হাফেয মাওলানা মুহাম্মদ রুহুল আমীন। দ্বিতীয়া স্ত্রী এখনও বর্তমান।

এক নজরে
হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরীর (রহঃ)–এর রচনাবলী

তাসাউফ	সমাজ সংস্কার
১. তওবা নামা	১. মসজিদ
২. তাসাউফ তত্ত্ব	২. বিশ্বকল্যাণ
৩. কছদুচ্ছাবিল	৩. মুক্তির পথ
৪. ইসলাহে নফস্	৪. জীবন্ত মসজিদ
৫. দোসরা সবক	৫. জামাআতী জিন্দেগী
৬. আল্লাহর পরিচয়	৬. ইংরেজী পড়িব না কেন ?
৭. প্রশ্নোত্তরে তাসাউফ	৭. আদর্শ ইসলামী পরিচয়
৮. তাসাউফ কাহাকে বলে	৮. খাদেমুল ইসলামের কর্মসূচী
৯. জীবনের পণ বায়াত নামা	৯. কন্যার বিবাহে পিতার উপহার
১০. পীরের পরিচয় মুরীদের কর্তব্য	১০. শরীয়াতের দৃষ্টিতে পারিবারিক আইন

www.pathagar.com

বাতিলের মোকাবিলা	তরজমা তফসীর
১. সতর্কবাণী	১. হক্কানী তফসীর
২. ভুল সংশোধন	২. সূরা ইয়াসিন পাঞ্জসূরা
৩. পাদ্রীদের গোমর ফাঁক	৩. সূরা ফাতেহা পাঞ্জসূরা
৪. অসৎ আলেম ও পীর	৪. সূরা ইয়াসিনের তফসীর
৫. বেদআত ও ইজতেহাদ	৫. আমপারার তফসীরসহ বঙ্গানুবাদ
৬. বৃটিশ শাসনের বিষফল	
৭. শত্রু থেকে হুঁশিয়ার থাক	হাদীস
৮. পবিত্র কুরআনের অপব্যাখ্যা	১. মিয়াতু হাদীস
৯. আল্লাহর প্রেরিত ইঞ্জিল কোথায় ?	২. হাদীসে আরবাইন
১০. শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট সমালোচনা	৩. হাদীস রত্ন ভান্ডার বা শাসন পদ্ধতি শিক্ষা
১১. কুরআনের উপর হস্তক্ষেপ বরদাশ্‌ত করা যাইবে না	৪. বিদায় হজ্জে বিশ্বমুসলমানের প্রতি রাসূলের (সাঃ) বাণী
ফিকাহ ও ফারায়েজ	আকাইদ
১. হজ্জের মাসায়েল	১. ফুরউল ঈমান
২. বেহেশ্‌তী জেওর	
৩. বাংলা ফরায়েজ	রাজনীতি
৪. তেজারতের ফযিলত	১. নেতার কর্তব্য
৫. জুমআর খুৎবা আরবীতে কেন?	২. ভোটারের দায়িত্ব
৬. আযান ইকামাতের হাকীকত বা আলকওলুল মতিন	৩. এই জামানায় ইসলামী নিজাম সম্ভব নয় কি?
৭. আদর্শ প্রস্তাব বা খুৎবায়ে ছদারত	৪. ভোট সম্পর্কে শরীয়তের নির্দেশ
ইবাদত	জিহাদ
১. নামাজের অর্থ	১. জিহাদের আহবান
২. খেদমতে খলক	২. জিহাদের ফযিলত
৩. রোযার ফযিলত	৩. যুদ্ধের সময় দেশবাসীর কর্তব্য
৪. নামাজের ফযিলত	
৫. জিকিরের ফযিলত	

www.pathagar.com

ইসলামী শিক্ষা ও আদর্শ ১. মুক্তির পথ ২. তালিমুদ্দিন ৩. চরিত্র গঠন ৪. নামায শিক্ষা ৫. মুনাজাতে মকবুল ৬. সংক্ষেপে ইসলাম ৭. এলমের ফযিলত ৮. কোরআনের তাজিম ৯. জেমানুল ফিরদাউস ১০. ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা **মুয়ামেলা ও মুয়াশারাত** ১. হালাল হারাম ২. সাফাইয়ে মুয়ামেলাত **ইসলাম প্রচার** ১. তাবলীগ বা ইসলাম ২. তাবলীগে দ্বীন	**দর্শন** ১. তোহফা ২. মানুষের পরিচয় ৩. হায়াতুল মুসলিমীন ৪. ধর্মের আসল উদ্দেশ্য **ইতিহাস** ১. ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ **অর্থনীতি** ১. ইসলামের অর্থনীতি **মানব কল্যাণ** ১. বিশ্ব কল্যাণ ২. জন্মনিয়ন্ত্রণ বা আযল ৩. মা বাপ ও সন্তানের হক

==== X ====

www.pathagar.com

"আরে মিয়া! এলমে মা'রেফাতের দৌলত তো সাধিয়া দেওয়ার বস্তু নহে। এ দৌলত তো খুঁজিয়া নিতে হয়। মুজাহাদা করিয়া নিতে হয়। ইহা বাজারের কোন সস্তা বস্তু নহে। জান-জীবন ক্ষয় করিয়া ইহা অর্জন করিতে হয়। ইহা পাওয়াও কষ্টসাধ্য, রক্ষা করাও অতি কষ্টসাধ্য।"

মালফূজাতে ফরিদপুরী (রহঃ)

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়

স্মৃতিচারণমূলক প্রবন্ধাবলী

www.pathagar.com

মানুষকে যে জ্ঞান বা চিন্তা শক্তি, ধারণা শক্তি, কল্পনা শক্তি দান করা হইয়াছে সে শক্তি সীমাবদ্ধ। সুতরাং আখেরাতের মহাসত্যের সন্ধান পাওয়া তাদের নাগালের বাইরে। আখেরাতের কর্ম ফলের মহাসত্য, সত্যের সন্ধান পাওয়ার জন্য সয়ং আল্লাহ যাহাকে বাছিয়া নিয়া তাহাকে সেই মহাসত্যের সন্ধান বিশেষ ভাবে দান করিয়াছেন, তাহার শরনাপন্ন হওয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় নাই।

মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ)

www.pathagar.com

হযরত ফরিদপুরী (রহঃ) ছিলেন আমার ছের-তাজ

মাওলানা মোহম্মদুল্লাহ্ হাফেজ্জী হুযুর (রহঃ)

[২৩শে এপ্রিল শনিবার ১৯৮৩ইং ইসলামিক ফাউন্ডেশন হলে মুজাহিদে আযম মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ)-এর জীবনী আলোচনা সভায় প্রদত্ত প্রধান অতিথির ভাষণ]

হযরত ফরিদপুরী (রহঃ) ছিলেন আমার "ছের-তাজ"। পানিপথে হেফ্‌জ করিবার পর আমি যখন সাহারানপুরে মাজহারুল উলূম মাদ্রাসায় পড়িতে গিয়েছিলাম, তাহার প্রায় এক বৎসর পরে সদর সাহেব (রহঃ) সাহারানপুর গিয়েছিলেন। তিনি রমজানের পরে আমার সঙ্গে সাহারানপুরে একত্রিত হইলেন। রমজানের আগে হযরত সদর সাহেব কলিকাতার কলেজ থেকে থানা ভবনে আসিলেন। রমজানের পর মাজহারুল উলূম মাদ্রাসায় আমরা দুইজনে একসঙ্গে "কাফিয়া" জামাতে ভর্তি হই। ঐ সময় থেকেই তাঁহার হালত, তাঁহার চলাফেরা আমাকে বিশেষ ভাবে মুগ্ধ করিয়া তোলে।

হযরত হাফেজ্জী হুযুর তাহার বক্তব্যে উল্লেখ করেন, আমি হযরত শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ)-এর নিকট হইতে মনুষ্যত্ব হাছিল করিয়াছি। যদিও আমরা হাম ছবক বা একই সাথের ছাত্র ছিলাম তথাপি তিনি ছিলেন আমার উস্তাদের মত। তাকওয়া ও পবিত্রতার এক অদ্ভূত নমুনা ছিলেন তিনি। আমরা উভয়ে "জালালাইন" পর্যন্ত একত্রে পড়ি। তাহার চলা-ফেরা, কথা-বার্তা এবং আচার-আচরণ থেকে আমি সব সময় ছবক হাসিল করিতাম। ইহার পরে তিনি দেওবন্দে চলিয়া গেলেন। আমি যদিও সাহারানপুরেই থাকিয়া গেলাম কিন্তু আমাদের মধ্যে সম্পর্ক পূর্বের মত রহিল।

তিনি কোন সময় পড়িবার সময় নষ্ট করিতেন না। গভীর অধ্যবসায় ও মনোযোগের সহিত পড়িবার কারণে সকল আসাতিজা তাঁহাকে গভীর ভাবে ভালবাসিতেন। অনেক সময় দেখা গিয়াছে তাঁহার জামার কোন কোন জায়গা ছেড়া, ফাটা কিন্তু সেদিকে তাঁহার বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ নাই। নিজের পড়া-শুনা লইয়াই তিনি সদা-সর্বদাই ব্যস্ত থাকিতেন। থানভী (রহঃ)-এর রেছালা অর্থাৎ ছোট ছোট কিতাবের কোন না কোনটি অথবা তাহার কোন মাওয়ায়েজ বা ওয়াজ সংকলন তাঁহার সঙ্গে সব সময় থাকিত। থানভী (রহঃ)-এর ছোহবত লাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষা লইয়া ছুটির দিনে সব সময়ই তিনি ছুটিয়া যাইতেন থানা ভবনে। বিশেষ ভাবে রমজান মাসে। শামছুল হক (রহঃ)-এর ওছিলায়ই আমার প্রথম থানা ভবনে যাওয়ার সৌভাগ্য হইয়াছিল। মাওলানা আশরাফ আলী থানভী

www.pathagar.com

(রহঃ)-এর সহিত যদিও আমার পরিচয় হইয়াছিল অনেক পূর্বেই কিন্তু থানা ভবনে যাওয়ার সৌভাগ্য হইয়াছিল শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ)-এর সঙ্গে।*

তাহার কারণেই আমি এই যে সৌভাগ্যের অধিকারী হইলাম তাহার শুকরিয়া আদায় করিয়া শেষ করিতে পারিব না। আমি সাহারানপুর হইতে ফারেগ হইলাম এবং চারমাস থানা ভবনে একত্রে ছিলাম। ইহার পর দেওবন্দে গিয়া আমরা দু'জনে আবার একত্রিত হইলাম। ওখানে আমরা বেশ কিছু কিতাব একত্রেই পড়িলাম। আমরা এক নাগাড়ে ১৮ মাইল পথ পায়ে হাঁটিয়া থানা ভবনে আসা-যাওয়া করিতাম। অন্য সকলে দেখিয়া বলিত, "উহারা দুইজন যেন এক জোড়।" পড়া-শুনা শেষ হওয়ার সময় আমি, সদর সাহেব (রহঃ) এবং পীরজী হুযুর (রহঃ) একত্রে আমাদের যা কিছু এলেম নছীব হইয়াছে তাহা কিভাবে হেফাজত করিব সে সম্পর্কে মাশওয়ারা করিলাম। আমাদের তিনজনের সহিত আমজাদ আলী সাহেবও ছিলেন। আমরা সবাই অঙ্গীকার করিলাম যে দেশে ফিরিয়া এক সঙ্গে থাকিব, কোন তালেবে ইলম পাইলে তাহাকে পড়াইব। তাহা না হইলে নিজেরাই চর্চা করিব।

ঐ বৎসর মাওলানা আনোয়ার শাহ্ কাশ্মিরী (রহঃ) চলিয়া যান এবং মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী (রহঃ) তাশরীফ আনিলেন। এই অবস্থায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া হইতে উস্তাদ পাঠানোর জন্য চিঠি গিয়াছিল। হুসাইন আহমদ মাদানী (রহঃ) সদর সাহেবকে পাঠাইলেন। আমি এবং পীরজী হুযুর থানা ভবনে রহিয়া গেলাম। ছয় মাস পর সদর সাহেব (রহঃ) চিঠির মাধ্যমে আমাদেরকে দেশে আসিবার জন্য অঙ্গীকার করাইলেন। সেই মোতাবেক একদিন দুপুরবেলা মাওলানা থানভী (রহঃ)-এর কাছে ফরিদপুরী (রহঃ)-এর চিঠির কথা বলিয়া দেশে চলিয়া যাইবার জন্য এজাজত চাহিলাম। তিনি 'আচ্ছা ভাই চলে যাও' বলিয়া অনুমতি দান করিলেন। আমি পরের দিনই তৈয়ার হইলাম। আমার কোন পথ খরচ ছিল না। থানভী (রহঃ)-এর কাছে দোয়া চাহিয়া বিদায় নিলাম। পানিপথে যাওয়ার সময় যে দেড় টাকা ছিল উহার দশ আনা এখনও বাকী। দশ

* টিকা ঃ (মাওলানা মোহম্মদুল্লাহ্ হাফেজ্জী হুযুর মাত্র দেড় টাকা সাথে নিয়া পানিপথে চলিয়া যান। আল্লাহতা'আলা এক অদ্ভুত পন্থায় তাঁহাকে পানিপথে পৌঁছাইয়া দেন। সেখানে ক্বারী আব্দুস্ সালাম মোল্লা আনসার-এর কাছে তিনি উঠলেন। এখানে হেফজ করার সময় মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ) একবার পানিপথে তাশরীফ আনিলেন। সেই সময় ক্বারী আব্দুস্ সালাম সাহেব হাফেজ্জী হুযুরকে থানভী (রহঃ)-এর কাছে নিয়া যান এবং পরিচয় করাইয়া দিয়া বলিলেন, হুযুর এই ছেলে বাঙ্গালী। বাপ-মা ছেড়ে আমার এখানে এসে পড়ে আছে। ইহা শুনিয়া থানভী (রহঃ) হাফেজ্জী হুযুরকে আদর করেন। এই ভাবে থানা ভবনে না যেয়েই হযরত হাফেজ্জীর, হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভীর (রহঃ) সাথে পরিচয় ঘটিয়াছিল)।

www.pathagar.com

আনা দিয়া টিকিট ক্রয় করিয়া সাহারানপুর পৌছিলাম। সাহারানপুরে পৌছিবার সঙ্গে সঙ্গেই এক পুরাতন পরিচিত ব্যক্তির সহিত দেখা হইল। তিনি পাঠ্যাবস্থায় আমার সাথে পড়াশুনা করিয়াছিলেন। তিনি আমাকে বার মাসের ওজিফা বাবদ ২০ টাকা দিয়াছিলেন। অতঃপর আমি সরাসরি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার টিকিট করিলাম।

দেশে ফিরিয়া গোয়ালন্দ ষ্টীমারে চাঁদপুর হইতে লাকসাম হইয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়া চলিয়া গেলাম। মাওলানা ফরিদপুরী (রহঃ) আমাকে কিছু প্রাথমিক কিতাব পড়াইতে দিলেন। এইখানে জায়গীর থাকিতাম এবং পড়াইতাম। এই স্থানে কিছু ঘটনাপ্রবাহ এমন হইল যে পরে আমরা তিনজনই ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে চলিয়া গেলাম। এর পর খুলনার গজালিয়ায় কয়েক মাস থাকিবার পর পরামর্শ করিলাম আমরা ঢাকায় চলিয়া যাইব। ঢাকা ছিল মুসলমানদের পুরাতন শহর। এ কারণে আমরা তিনজনই ঢাকায় চলিয়া আসিলাম। পীরজী হুযুর (রহঃ) শামছুল হক (রহঃ) ও আমি জিনজিরার হাফেয মোহাম্মদ হুসাইন সাহেবের ওছিলায় বড় কাটারায় আসিলাম। এখানে আমরা থাকিলাম এবং আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে বড় কাটারা বড় মাদ্রাসা রূপে জায়গা নিল। মাওলানা শামছুল হক (রহঃ)-এর অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রচেষ্টার ফলেই বড় কাটারা মাদ্রাসা। এখান থেকেই অনেক মাদ্রাসা গড়িয়া তুলিবার ব্যাপারে তাঁহার ভূমিকা কার্যকরী ছিল।

তাঁহার সাথে থাকিয়া আমার অনেক ফায়দা হইয়াছে। আমি পাইয়াছি আখলাকী, জাহেরী, বাতেনী অনেক তরক্কী। তাহার সাথে সম্পর্ক থাকিবার কারণেই হয়ত আল্লাহ পাক আমাকে কিছু নছীব করিয়াছেন। তিনি আজ দুনিয়া হইতে চলিয়া গিয়াছেন। হাদীস ও তফসীরে তিনি মাহের (বিশেযজ্ঞ) ছিলেন। অনেক বিষয়ে বিভিন্ন প্রশ্নের সদুত্তর পাইতাম তাহার নিকট হইতে এবং এইভাবে অনেক জটিল বিষয়ের সমাধান করিতে সক্ষম হইতাম। ইহার পর দুইজন বড় কাটারা থেকে লালবাগ চলিয়া আসি এবং লালবাগ হইতে বহু মাদ্রাসা কায়েমের ব্যাপারে ভূমিকা রাখি।

রাজনৈতিক অঙ্গণে মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ)-এর অবদান সবাই জানেন। দ্বীনকে কায়েম রাখার জন্য তাঁহার কোরবাণী সম্পর্কে আপনাদের যথেষ্ট জানা আছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁহার ফয়েজ ও বরকতকে জারী রাখুন। থানা ভবন হইতে আসিয়া মৃত্যু পর্যন্ত আমরা দুইজনে এক সঙ্গেই থাকিয়া দ্বীনের কাজ করিয়াছি। আল্লাহ পাক যেন তাঁহার উপর অশেষ রহমত নাজিল করেন; মাওলানা ফরিদপুরী (রহঃ)-এর ফয়েজ ও বরকতকে কিয়ামত পর্যন্ত বাকী রাখেন, তাঁহার দরজাকে বুলন্দ করেন। আমীন।

www.pathagar.com

আমার জীবনে হযরত সদর সাহেব (রহঃ)

মাওলানা আজিজুল হক

মুজাহিদে আযম হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী সদর সাহেব হুযুর (রহঃ)-এর গোটা জীবনটাই ছিল ইখলাছে পরিপূর্ণ। হযরতের বাড়ী ঘর দেখলেই যে কেউ অনুমান করতে পারবে তিনি কোন পর্যায়ের মুখলিস বান্দা ছিলেন। গোটা দেশে তাঁর এত বিপুল পরিমাণ ভক্ত অনুরাগী ছিল, তিনি যদি কোনদিন তাঁর ব্যক্তিগত প্রয়োজনের প্রতি সামান্যতম ইশারাও করতেন, তবে বাদশাহী হালে জীবন কাটিয়ে দিতে পারতেন। গওহারডাঙ্গাতে তাঁর বাড়ী ছিল এত বেশী সাদামাটা, এটা যে সদর সাহেব হুযুরের বাড়ী তা বিশ্বাস করতে কষ্ট হত। ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে অবস্থানকালেও তাঁর বাসার অবস্থা ছিল তদ্রুপ। ব্যক্তি হিসাবে তাঁর অবস্থান এত ঊর্ধ্বে ছিল কিন্তু চাল-চলন ছিল অতি সাধারণ একজন মানুষের মত। তাঁর খাওয়া-দাওয়া, উঠা-বসা, চাল-চলন সব কিছুই ছিল একেবারে সাধারণের চেয়ে সাধারণ। আমি জীবনে অনেক মানুষ দেখেছি কিন্তু এমন নিঃস্বার্থ মানুষ দ্বিতীয়টি পাইনি।

হাদীসের বিশুদ্ধতম কিতাব বুখারী শরীফের বঙ্গানুবাদ করার পিছনে মূল প্রেরণা দানকারী হিসাবে কাজ করেছেন হযরত সদর সাহেব হুযুর (রহঃ)। প্রথম যখন আমার মনে এই স্পৃহা জন্ম নিল, তখন আমি একদিন হুযুরকে বললাম, আমার তো বুখারী শরীফের বাংলা অনুবাদ করতে মনে চায়। হুযুর বললেন- এখন নয়, পরে দেখা যাবে। হুযুরের কথায় তখনকার মত নিবৃত্ত হলেও মনের স্পৃহাকে দমন করতে পারলাম না। নিরিবিলিতে থাকার জন্য হুযুর বেগম বাজার মসজিদের ইমামের কামরায় থাকতেন। তখন রমজান মাস।

বুখারী শরীফের শুরুর দিকে একটি হাদীস আছে। হাদীসটি হলো- "আন ইবনে আব্বাসিন (রাযিঃ) ক্বালা কানা রাসূলুল্লাহি (সাঃ) আজওদান্নাস ওয়া কানা আজওদা মা ইয়াকুনু ফী রমাযানা হীনা য়ালকাহু জীবরাঈল (আঃ) ওয়া কানা য়ালকাহু ফী কুল্লি লাইলাতিম মিন রমাযানা ফীহি উরসিলাল কুরআন ফালা রাসূলুল্লাহি (সাঃ) আজওয়াদু বিল খায়রি মিনার রীহিল মুরসালাতি।"

হাদীসের তরজমা এবং মতলব একটু কঠিন। তাই আমার মনে পড়ে, হাদীসের অনুবাদ একটি কাঠপেন্সিল দিয়ে লিখেই বেগম বাজার মসজিদে গেলাম। প্রথমে আমার ব্যাখ্যা অনুবাদ না দেখিয়ে হুযুরের নিকট হাদীসটির ব্যাখ্যা জানতে চাইলাম। হুযুর তাকরীর করার পর আমার লেখাটি দেখালাম। হুযুর অত্যন্ত মনোযোগের সাথে পড়ে খুব খুশী হয়ে বললেন- ঠিক আছে, তুমি

www.pathagar.com

অনুবাদ লেখা শুরু কর। আমি প্রথম দিকের সব লেখা হুযুরকে দেখিয়ে ঠিক করে নিতাম। যা কিছু সংশোধনের তা তিনি করে দিতেন।

তা ছাড়া দুইটি হাদীস পুরাটা হুযুরের লেখা। একটি হল- হাদীসে জিবরাঈল, দ্বিতীয়টি হল- আল হালালু বায়্যিনুন ওয়াল হারামু বায়্যিনুন। এভাবে উৎসাহ বা প্রেরণাই শুধু নয়, এ ব্যাপারে আগাগোড়া তিনি আমাকে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। এই সময় হুযুর হজ্বে গেলেন। তখন আমি নিয়মিত লিখছি। ছাপার কাজ আরম্ভ হয়নি। হজ্ব থেকে ফিরে এসে হুযুর আমাকে কিছু কাগজ দিয়ে বললেন, দেখ তো এর ভিতর তোমার প্রয়োজনীয় কোন কাগজ থাকলে বেছে নাও। আমি দেখলাম, এর ভিতর বুখারী শরীফের হাদীসের অনুবাদ করা আছে। এমনিভাবে হুযুর আগাগোড়াই আমার এই কাজে সাহায্য করেছেন।

সদর সাহেব হুযুরের অমূল্য কীর্তি হক্কানী তাফসীর বাংলাভাষী পাঠকদের জন্য নিঃসন্দেহে এক অমূল্য অবদান। এই তাফসীর ধারাবাহিকভাবে না লিখে বিভিন্ন স্থান থেকে হুযুর ১৫ পারার মত লিখেছিলেন। বলেছিলেন, কোরআন শরীফে যেহেতু একই ধরনের আয়াতের কয়েকবার করে আলোচনা আছে, তাই আমি যতটুকু লিখেছি, তারপর যে কেউ আমার এটাকে অনুসরণ করে পুরা করে নিতে পারবে।

হুযুরের তাফসীর লেখার পদ্ধতিও ছিল অভিনব। লালবাগ মাদ্‌রাসার নিচের কামরার বারান্দায় জানালার পাশে ফজরের পর তিনি বসতেন। অন্য কোন কিতাব বা তাফসীর নিয়ে বসতেন না। শুধু কোরআন শরীফ নিয়ে হুযুর দীর্ঘ সময় চুপ করে বসে থাকতেন। কিছুক্ষণ লিখতেন। আবার বসে থাকতেন। আবার লিখতেন। এই ভাবেই তিনি তাফসীরের কাজ করতেন। অসুস্থ অবস্থাতেও তাঁর নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটত না।

সদর সাহেব ছিলেন মানুষ গড়ার একটি কারখানা। আমার নিজের কথাই বলি। আমার প্রতি হুযুরের এক খাছ নজর ছিল। ব্রাহ্মণবাড়িয়া মাদ্‌রাসায় আমার আব্বা আমাকে হুযুরের কাছে দিয়ে আসলেন। তখন আমার বয়স সাত বছর, বেহেশ্‌তী জেওর পড়ি। মালিবাগ মাদ্‌রাসার বর্তমান উস্তাদ মাওলানা ইয়াহইয়ার আব্বা মাওলানা সিদ্দিকুর রহমান তখন সেখানে দাওরা পড়তেন। হুযুর তাকে ডেকে বলে দিলেন, এই ছেলেটিকে বেহেশ্‌তী জেওর পড়িয়ে দাও। তা ছাড়া, তখন মাদ্‌রাসার ময়দানে প্রতিদিন মক্তব বিভাগের ছাত্রদের জোহরের নামাযের প্রশিক্ষণ হত। আমাকে তার ইমাম বানাতেন। নামাযে ক্বিরাআত তাজবীদসহ সব কিছু জোরে আওয়াজ করে পড়তে হত। পুরা নামাযের সময় হুযুর পাশে দাঁড়িয়ে থাকতেন। এভাবে হুযুর ছোটকাল থেকেই ছাত্র গড়ে তুলতেন।

www.pathagar.com

এরপর হুযুর বড় কাটারা মাদ্‌রাসায় চলে আসলেন। রমজানের পর তাঁরা মাদ্‌রাসা শুরু করলেন। আমি ঈদের পর চলে আসলাম। এখানে আসার পর হুযুর আমাকে ফার্সী কি পহলী কিতাব পড়ালেন। এরপর অসুস্থতার কারণে আর পড়াতে পারেননি। অবশ্য এর আগে বি, বাড়িয়া মাদ্‌রাসায় সিহাহ সিত্তাহ পড়িয়েছেন। লালবাগ মাদ্‌রাসাতেও কয়েক বছর হাদীসের দরস দিয়েছেন। এরপরও হুযুর আমাকে প্রতিদিন মাগরিবের পর বিভিন্ন কিতাব পড়াতেন। 'নাশ্‌রুত্তীব' নামক জটিল কিতাব এবং মুনাজাতে মাকবুল হুযুর আমাকে আগাগোড়া বিশেষভাবে পড়িয়েছেন। তাছাড়া হুযুর বিভিন্ন প্রশ্ন করতেন। একটি প্রশ্ন এখনো মনে আছে, তোমার বাবার সাথে পীরজী হুযুরের যদি বিরোধ হয়, তবে তুমি কার পক্ষে থাকবে। এধরনের নানান প্রশ্ন করতেন। আমার বুঝ মত উত্তর দিতাম। কিছু বলার থাকলে হুযুর বুঝিয়ে দিতেন।

রমযানে হুযুর আমাকে প্রায়ই বাড়ী যেতে দিতেন না। কান্নাকাটি করেও লাভ হতনা। তখন হুযুরের মুতায়াল্লেকীনরা আসত। আমি তাদেরকে মুনাজাতে মকবুল পড়ে শুনাতাম। হুযুর প্রায়ই সভা সমিতিতে যেতেন। কিন্তু অসুস্থতার কারণে বয়ান করতে পারতেন না। আমাকে সাথে নিয়ে যেতেন। বয়ান করতে বলতেন, হুযুর পাশে বসে থাকতেন। কিন্তু এক ঘন্টার বেশী বয়ান করতে নিষেধ করতেন। শ্রোতারা অনুরোধ করলে, তাদের বুঝাতেন। অসুস্থতার কারণে হুযুর পড়াতে পারতেন না, তাই আমি প্রতিদিন মিশকাত শরীফের ইবারত পড়ে হুযুরকে শুনাতাম। সপ্তাহে দু'একটি শব্দ বলতেন, কিন্তু সেই কথাগুলোর ইল্‌মী মাকাম এত বুলন্দ ছিল, যা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। আমি যখন ভারত থেকে দেশে আসলাম, তখন হুযুর আমাকে গওহারডাঙ্গা মাদ্‌রাসার সালানা জলসায় নিয়ে গেলেন। ঐ সময় মাদ্‌রাসার যে মসজিদ ছিল তাতে ঐদিন জুমা উদ্বোধন করা হবে। হুযুর আমাকে ডেকে বললেন, জুমা তোমার পড়াতে হবে। খুৎবা মুখস্থ বলবে। মুহতামিম সাহেবকে ডেকে বললেন, এলান করে দিন, জুমআ আজিজুল হক পড়াবে। আর নামাযে যাওয়ার আগে আমার মাথায় হুযুর নিজ হাতে পাগড়ি বেধে দিলেন। এই ঘটনা বলছি মানুষ গড়ায় হুযুর কত আন্তরিক ছিলেন তা বুঝানোর জন্য।

মাওলানা ফজলুল হক আমিনী ও মাওলানা আব্দুল হাইকে হুযুর ছেলের মত মনে করতেন। এই দুইজনকে হুযুর নিজের কামরায় রেখে খাস ভাবে দেখা শুনা করতেন। এ সম্পর্কে একটি ঘটনা মনে পড়ছে। মিশকাত শরীফ দীর্ঘদিন যাবত হযরত মাওলানা হিদায়াতুল্লাহ সাহেব (রহঃ) পড়াতেন। একজনের কাছেই দীর্ঘদিন যাবৎ কিতাবটি আটকে আছে। তাই উস্তাদদের অনেকেই কিতাবটি পরিবর্তনের পক্ষে ছিলেন। এ নিয়ে মিটিং বসল। কিন্তু কোন

www.pathagar.com

মুদাররিসই মুহাদ্দিস সাহেব হুযুরের কিতাব নিতে সাহস পাচ্ছিলেন না। আমি তখন বুখারী শরীফ জিলদে ছানী পড়াই। আমি বললাম, মুহাদ্দিস সাহেব যদি বুখারী শরীফ নেন, তবে আমি মিশকাত শরীফ পড়াতে রাজি আছি। আমার কথায় সবাই রাজি হলেন। ছদর সাহেব হুযুর বাড়ী থেকে এসে জানতে পেরে খুশী হলেন। ঐ বৎসর পড়ালাম। দ্বিতীয় বৎসর কিতাবটি পড়ানোর আমার আর ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু হুযুর আমাকে বিশেষভাবে ডেকে বললেন, তুমি এ বৎসর মিশকাতটা পড়াও। আমার দুটি ছেলে আছে মিশকাত পড়বে। হুযুর ছেলে বলতে মাওলানা আমিনী আর মাওলানা আব্দুল হাইকে বুঝিয়ে ছিলেন। তাই বলছিলাম, যাদের প্রতি হুযুরের দৃষ্টি পড়ত তাদের এভাবে আপন করে নিতেন। ভালবাসতেন, গড়ে তুলতেন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জামেয়া ইউনুছিয়া মাদ্‌রাসার প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা ইউনুছ সাহেব (রহঃ) ছিলেন শাইখুল ইসলাম হযরত মাদানী (রহঃ)-এর অন্তরঙ্গ বন্ধু মানুষ। তিনি একবার মাদানী সাহেবের কাছে মুদাররিস চাইলেন। তখন হযরত মাদানী (রহঃ) সদর সাহেব (রহঃ), পীরজী হুযুর (রহঃ) এবং হাফেজ্জী হুযুর (রহঃ) এই তিন জনকে পাঠালেন। তিন জনেরই থানভী দরবারের সাথে সম্পর্ক ছিল। হযরত সদর সাহেব বলতেন, আমি তখন হযরত থানভী (রহঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, মাদানী সাহেব বি,বাড়িয়া যেতে বলছেন, কি করব? উত্তরে হযরত বললেন- শিক্ষক যখন বলেছেন তখন পরামর্শের প্রয়োজন কি ? তখন তাঁরা সকলেই বি,বাড়িয়া মাদ্‌রাসায় যোগ দেন এবং সদর সাহেবকে 'সদরে মুদাররিস' হিসাবে নেয়া হয়। এখান থেকেই সদর সাহেব হিসাবে তার নাম প্রসিদ্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীতে বড় কাটারা এবং লালবাগ মাদ্‌রাসায় আসার পরও এই নামেই তাঁকে সবাই ডাকতে শুরু করেন।

'মুজাহিদে আযম' বলা হত মূলত: রাজনৈতিক ময়দানে তাঁর আপোষহীন ভূমিকার কারণে। তৎকালে মুসলিম লীগের পক্ষে প্রচারণা চালানোর জন্য যখন 'জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম' গঠিত হয়, তখন তার আট আনা কৃতিত্ব ছিল ছদর সাহেবের। পরে নির্বাচনের সময় হুযুর অপরিসীম মেহনত করেছেন। এসব কারণে হুযুরের নামের সাথে 'মুজাহিদে আযম' যুক্ত হয়ে যায়।

তা ছাড়া সামাজিক ক্ষেত্রে হুযুরের অবদান তো সকলেরই জানা। ইসলাম ও মুসলমানদের যে কোন দুর্দিনে হুযুর ত্রাণকর্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেন। খৃষ্টান মিশনারী এবং পাদ্রীদের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে হুযুর প্রচার-প্রচারণা এবং সভা-সমাবেশ করে মুসলমানদের সতর্ক ও সজাগ করেছেন।

[আলোর কাফেলার সৌজন্যে]

= ০০০ =

www.pathagar.com

আব্বাজীকে যেমন দেখেছি

মাওলানা হাফেয মুহাম্মাদ ওমর

"আব্বা ওমর! আমার কাছে এক সপ্তাহ থাক। সত্তরটি বছর ধরে যা আমি সংগ্রহ করেছি তা তোমাকে সাত দিনে দিয়ে যাব। আমার কাছে খাতা কলম নিয়ে তুমিও বস।" এখন লিখে রাখ। এখন বুঝবেনা- এক একটি কথা বিশ বছর, ত্রিশ বছর পর যখন বুঝে আসবে, তখন আফসোস করে কাঁদবা আর পাছাড় খাবা।"

ইং ১৯৬৮ সনের শেষের দিকে উপরের সোনালী অক্ষরে লিখে রাখার মত কথাগুলি বলেছিলেন আমারই আব্বাজান হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ)।

বাস্তবিকই এতবড় ধ্রুব সত্য কথা তখন কিছুই বুঝিনি। এতবড় ওজনী তাত্ত্বিক কথা বোঝার মত বয়সও তখন হয়নি। এমন করে কেন যে একথাগুলি তখন বলেছিলেন- তাও বুঝতে পারিনি। এত সত্ত্বর যে তিনি আল্লাহর পেয়ারা হবেন, "আল্লাহুম্মাগ ফিরলি ওয়ার হামনি ওয়াল হেক্‌নি বির রফিকিল আ'লা"দোয়াটি, পড়বেন, তা আমার মত অনেকেরই ধারণারও অতীত ছিল।

আজ দীর্ঘ ত্রিশ বছর পরে মাওলানা মুহাম্মাদ সালমান সাহেবের প্রচেষ্টায় আব্বাজীর কর্ম বহুল জীবনের উপর এক খানী স্মারক গ্রন্থ প্রকাশিত হতে যাচ্ছে শুনে অত্যন্ত খুশী হই। মাওলানার অনুরোধে এক দিন মিরপুরের দারুর রাশাদ মাদ্রাসায় উপস্থিত হই এবং স্মারক গ্রন্থের সংগৃহিত পান্ডুলিপি চেয়ে নিয়ে একান্ত আপন মনে পড়তে থাকি। মাওলানা সালমান সাহেবের বার বার অনুরোধে আমার স্মৃতি পটে এঁকে থাকা আব্বাজানের কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা অত্র প্রবন্ধে উল্লেখ করার প্রয়াস পেলাম।

আমার জন্ম ইং ৫০ সালের দিকে। ছোটবেলায় আব্বাজীকে বেশী কাছে পাইনি। কেননা তিনি থাকতেন ঢাকায় কিংবা সফরে। তবে লালবাগ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার পর কিল্লার মোড়ে একটি টিনসেড ঘর ভাড়া করে কিছু দিনের জন্য আমাদের নিয়ে এসেছিলেন। তখনই কিছুদিন তাঁর ছোহবত পেয়েছি। তিনি ভোর রাতে উঠে মাদ্রাসায় চলে আসতেন। মাদ্রাসায় এসেই সাধারণত: তাহাজ্জুদ পড়তেন। নাশ্‌তা বাসা থেকে পাঠানো হত। তিনি মাদ্রাসায় বসে খেতেন। এগারোটা থেকে সাড়ে এগারোটার মধ্যে তিনি বাসায় গিয়ে গোসল করতেন। আমাকে সঙ্গে নিতেন। বুড়িগঙ্গায় গিয়ে আমরা গোসল করতাম। আসবার সময় গামছার একমাথা আমাকে ধরিয়ে দিয়ে অন্য মাথা নিজে ধরতেন। বাসায়

www.pathagar.com

আসতে আসতে বাতাসে গামছা প্রায় শুকিয়ে যেত। তারপর তিনি একটু বিশ্রাম নিতেন। যোহরের আজান হলে উঠে উযু করে নামাযে যেতেন। তখন তাঁর মাথায় ছিল বাবরি চুল, পরতেন সবুজ লুঙ্গি, পায়ে টায়ারের সেন্ডেল।

আমি হিফজ শেষ করেছি। রমযানে তারাবীহ পড়ানোর জন্য জিনজিরা বড় মসজিদ থেকে লোক এলো হাফেয নিতে। এই মসজিদেই আব্বাজী দীর্ঘদিন ছিলেন। আমি হাফেয হয়েছি জেনে তারা আমাকে নেবেন বলে আগ্রহ করলেন। আব্বাজীও রাজী হলেন। কিন্তু ইতোমধ্যে হাফেয আব্দুর রব (বর্তমানে লালমাটিয়া মাদ্রাসার মুহতামিম) এসে আব্বাজীকে বললেন: হুযুর! আমার কোন মসজিদ ঠিক হয় নি। আব্বাজী তখন তাকেই জিনজিরার মসজিদের জন্য ঠিক করে দিলেন। আমি খুব দুঃখ পেলাম। তারাও মানতে চাইছিলেন না। আব্বাজী তাদেরকে এই বলে বুঝ দিলেন যে, ওমর ছেলে মানুষ, ওকে আমার কাছে রাখা দরকার।

এদিকে তিনি আমাকে বুঝালেন যে, তুমি আমাকে শোনাবে। রমযানের মাত্র একদিন আগে আমলী গোলা মসজিদের ইমাম মোস্তফা সাহেব এসে জানালেন, তার মসজিদে হাফেয দরকার। আমি মনোনীত হলাম। ওই মহল্লায় আমার দুলাভাই আব্দুল হালীম সাহেবও থাকতেন। প্রথম তারাবীতে আব্বাজীর উপস্থিতিতে আমি ঘোষণা দিই যে, কেউ পয়সার কথা চিন্তা করে থাকলে আমার পিছনে তার এক্তেদা সহীহ হবে না। আমি পয়সার চিন্তা করলে আমার ইমামতিও সহীহ হবে না। আব্বাজীই আমাকে এরূপ ঘোষণা দিতে আদেশ করেছিলেন। তিনি দু' তিন দিন গিয়েছিলেন। আর গিয়ে ছিলেন খতমের দিনে। আমি প্রতিদিন পারা শোনাতাম হাফেজ্জী হুযুরকে। আর আতাউল্লাহ শোনাতেন আব্বাজীকে। উনি লালবাগ শাহী মসজিদে তারাবীহ পড়াতেন।

আব্বাজী ছিলেন বৈষয়িক ব্যাপারে অত্যন্ত বিচক্ষণ। একবার তিনি তাঁর খাদেম ফজলুল হককে একটি স্যুটকেস কিনে আনতে বলেন। তিনি এমন এক স্যুটকেস আনলেন যা খুলতে গেলে খুব শব্দ হয়। আব্বাজী বললেন- ভালই হয়েছে। চোর কোন কিছু নিয়ে সারতে পারবে না। বাড়ীতে সেই স্যুটকেসটি ছিল। একদিন তিনি আমাকে সেটি আনতে বললেন। আমি আনলাম। আব্বাজী তাতে কি যেন খুঁজলেন। তারপর বন্ধ করতে বললেন। আমি বন্ধ করতে যাচ্ছি। তিনি বললেন- টিপ তালা! বন্ধ করছ, চাবি কোথায়?

- আমি চাবি পাই না।

তিনি বললেন- তালাশ কর।

- কোথাও পাই না।

www.pathagar.com

বললেন- ভিতরে পড়েছে কি না দেখ।

আমি ভিতরের জিনিসপত্র সব নামিয়ে খুঁজলাম। তারপর আবার সেগুলো রাখতে লাগলাম।

আব্বাজী বললেন- কোথায় কোন জিনিযটি ছিল, তা কি মনে রেখেছ? যেভাবে সাজানো ছিল সেভাবেই রাখবে।

চাবির গোছা পেয়ে বললাম- এই যে চাবি।

তিনি বললেন- কোনটি?

আমি বললাম- এইটি।

তিনি বললেন- বাক্স থেকে আলাদা করে তালাটা বন্ধ কর। তারপর এই চাবি দিয়ে খোল। যখন নিশ্চিত হবে যে, এইটিই ওর চাবি, তখনই বাক্সে লাগাবে। টিপতালার ব্যাপারে অনেকেরই ভুল হয়।

একদিন তিনি খানকায় বসে আছেন। আমি সামনে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি। তিনি আমাকে ডাকলেন,বললেন-কোথায় যাও? আসলে তিনি কাউকে কোন কাজের আদেশ দেয়ার আগে তার ব্যস্ততা আছে কি না, সময় আছে কি না তা জেনে নিতেন। আমি যদিও ছোট, তবুও তিনি আমার উপর চাপ দিয়ে কোন কাজ করাতে চাইতেন না। তাই জিজ্ঞেস করলেন। আমি বললাম- কোথাও যাই না। তিনি বললেন- একটি চিঠি ছেড়ে আসতে পারবা? বাক্স নাগালে পাবা? আমি জী হ্যাঁ বলে চিঠি নিয়ে রওয়ানা হলাম। তখন গওহারডাঙ্গা মাদ্রাসায় পোষ্ট অফিস হয়নি। তাই চিঠি ছাড়তে পাটগাতী যেতে হত। তিনি আমাকে আবার ডাকলেন। বললেন- আমার সবকথা শুনে তারপর যাবে। চিঠি বাক্সে ফেলার পর আবার দেখবে ভিতরে পড়েছে কি না। অনেক সময় আটকে থাকে। আমি গেলাম এবং চিঠি ছেড়ে এলাম।

সেদিন বিকালে আমাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন- চিঠি ছেড়েছ? বললাম- ছেড়েছি। তিনি বললেন- তোমাকে কষ্ট দিলাম। কিন্তু তোমার উচিত ছিল- চিঠি ছেড়ে এসে আমাকে জানানো যে, চিঠি ছাড়া হয়েছে। তাহলে আমি এতমিনান থাকতাম। আব্বাজীর কথার মর্ম তখন বুঝি নাই। কিন্তু এখন বুঝি- এসব কথা কত বাস্তব। তিনি কত দূরদর্শী ছিলেন।

সব ব্যাপারেই তিনি পরিপাটি সুশৃংখল ও মার্জিত রুচির অধিকারী ছিলেন। একদিন আমি গোসল করে এসে গামছা রোদে দিয়েছি। কিন্তু দু'দিকে সমান হয়নি। একদিকে এক কোণা বেশী ঝুলে রয়েছে। দেখতে সুন্দর লাগছে না। আব্বাজী বললেন- এভাবে বেঢঙ্গা করে নেড়েছ কেন? ঠিক করে দাও। আমি দু'দিক সমান করে দিলাম। তিনি বললেন- এখন দেখতো কেমন লাগছে?

www.pathagar.com

আল্লাহর প্রতি ভরসা ও নামাযের একাগ্রতা তাঁর কেমন ছিল- তা একটি ঘটনা থেকে অনুমান করা যায়। তিনি বাড়ী থেকে ঢাকা আসবেন। তখন স্টীমার ভীড়তো লেবু তলা স্টেশনে। দুপুরের পরেই স্টীমার আসতো। আমার চাচাত ভাই বজলুর রহমান মুনশীসহ কয়েক জনে একটি নৌকায় করে আব্বাজীকে স্টীমারে তুলে দিতে যায়। লেবুতলায় তখন কয়েকটি টিনের ঘর ছিল। এগুলো আড়ৎ বা গুদাম হিসাবে ব্যবহার করা হত। যোহরের ওয়াক্ত হয়ে গেলে তিনি নামাযে দাঁড়ালেন। অন্যরা বসে রইলো। ভাই বজলুর রহমান বলেন- তিনি নামায পড়ছেন এমন সময় হঠাৎ ঘরের একটি আড়া যা তাঁর মাথার বরাবর উপরে ছিল- খুলে পড়লো। ঠিক তাঁর মাথার উপরে পড়ার কথা। আমরা তো চীৎকার করে উঠলাম। কিন্তু তা তাঁর মাথায় না পড়ে পড়লো একটু পাশে। তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না। নামায শেষ হলে তিনি শুধু বললেন- বজলু, দেখতো, একটা আড়া মনে হয় পড়ে গেছে। সরিয়ে রাখ।

তার জীবন যেমন ছিল পরিপাটি তেমনি সুশৃংখল। তিনি যেদিন ইন্তেকাল করেন, সেদিন ফজরের সময়ে তাকে উযু করাচ্ছেন আম্মা। তাঁর ব্যবহারের জন্য দু'টি বদনা ছিল- একটি দস্তার, আরেকটি তামার। তামার বদনা বেশ বড়, প্রায় পাঁচ কেজি পানি ধরত তাতে। এখনও সেটি সংরক্ষিত রয়েছে। আম্মা সেই বদনা দিয়ে পানি ঢেলে দিচ্ছেন। একবার তিনি হাত টেনে নেয়ার পরও আম্মা পানি ঢালতে থাকায় কয়েক ফোঁটা পানি বাইরে পড়ে যায়। তিনি বিরক্তি প্রকাশ করলেন কয়েক ফোঁটা পানি অতিরিক্ত ব্যয় বা অপচয় হবার কারণে। আমি সামনেই ছিলাম।

এই ঘটনা আমার জীবনে বিরাট প্রভাব ফেলেছিল। আমি সর্বদা তা মনে রেখেছি, কাউকে উযু করানোর এই নিয়ম। পরবর্তী জীবনে আমি হযরত মাওলানা হাকীম মুহাম্মাদ আখতার সাহেবের করাচীস্থ খানকায় থাকা কালে হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক সাহেব দামাত বারাকাতুহুম সেখানে তাশরীফ নিলেন। তাঁকে উযু করানোর জন্য হাকীম সাহেব আমাকেই এগিয়ে দিলেন। হযরত মাওলানা আবরারুল হক সাহেব আমাকে আগে থেকেই চিনতেন। বললেন- উযু করা সাকতে হোঁ, উযু করায়া কেসি কো? আমি তাঁকে উযু করালাম, খুব সতর্ক থাকলাম যেন একফোঁটা পানিও বাইরে না পড়ে। তিনি খুশী হলেন।

১৯৬৬ সালের কথা। মাওলানা আব্দুল মান্নান সাহেব (কাশিয়ানী হুযুর) করাচী যাবেন মাওলানা ইউছুফ বিন্নোরী সাহেবের কাছে পড়তে। কাকরাইলে সে বছরই তাবলীগের প্রথম ইজতেমা হয়। হযরতজী ইউসুফ (রহ:ঃ) সেবারই প্রথম ও শেষবারের মত ঢাকার ইজতেমায় আসেন। তখন রমনা পার্ক ছিল না। ছিল

www.pathagar.com

বিরাট মাঠ। সকালে আব্বাজী লালবাগ থেকে কাকরাইল এলেন। সঙ্গে মাষ্টার আব্দুর রাজ্জাক। আমিসহ কাশিয়ানী হুযুর গেলাম আব্বাজীর সাথে দেখা করতে। হযরত মাওলানা মোশাররফ হোসেন সাহেব (বগুড়ার হুযুর) তার আগেই লাহোরে গিয়েছেন। তিনি ঢাকায় এসেছেন। আবার যাবেন কাশিয়ানী হুযুরের সাথে। পিআই-এর টিকেট ছিল- ২৫০.০০টাকা। তিনি ছাত্র হিসাবে কনসেশনে ১৭৫.০০ টাকায় টিকিট করেছেন। আব্বাজী তখন কাশিয়ানী হুযুরকে বিদায় ও দুয়া নেয়ার জন্য পাঠালেন মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ'যমীর কাছে। আ'যমী সাহেব তখন ফরিদাবাদ ইদারাতুল মা'আরিফে কর্মরত ছিলেন। থাকতেন ইমদাদিয়া লাইব্রেরীর গুদামে। দেখা করলে তিনি কাশিয়ানী হুযুরকে একটি পাইলট কলম উপহার দিলেন। অতঃপর কাশিয়ানী হুযুর রওয়ানা হয়ে গেলেন। ওখানকারই ঘটনা :-

কাকরাইলেই আমি আব্বাজী কে বললাম আমার একটি ব্যাগ লাগবে। কে কিনে দেবে? ফজলু ভাই কিনে দিবেন। বগুড়া হুযুর বললেন, আমারও একটা ব্যাগ দরকার। ঠিক আছে এক সাথে কেনা যাবে। ফজলুকে নিয়ে আমরা ইসলামপুর গেলাম। খুব সুন্দর চামড়ার ফোল্ডিং ব্যাগ পেলাম। মূল্য প্রতি ইঞ্চি পাঁচ আনা। পছন্দ করে কিনে আনলাম। আব্বাজীর সামনে নিয়ে খুব আনন্দ প্রকাশ করলাম, কিন্তু তিনি মোটেই খুশী হলেন না। বললেন, চোর কিনে এনেছ একটা। তোমার পিছনে চোর লাগবে। তুমি ছাত্র মানুষ। তোমার দরকার একটা কাপড়ের বড় ব্যাগ, যাতে প্রয়োজনীয় সবকিছু রাখা যায়। আব্বাজীর অসন্তুষ্টির কারণে সে ব্যাগ আর ব্যবহার করতে মনে সায় দেয়নি। বাড়ীতে নিয়ে রেখেছিলাম। আমের মওসুমে বড়মামা এলেন। বাড়ীর জন্য আম কিনেছেন। নিয়ে যাবেন কিসে করে? আমি ব্যাগটা দিয়ে দিলাম। তিনি আমাকে আরেকটি ব্যাগ কেনার জন্য টাকা দিতে চাইলেন। আমি নিলাম না। আব্বাজী বাড়ীতে এলে প্রথমেই তাঁকে সংবাদ দিলাম ব্যাগটি বড় মামাকে দিয়ে দিয়েছি। পরে একটি ক্যানভ্যাসের ব্যাগ কিনলাম। আব্বাজী বললেন- এটাই হয়েছে তোমার জন্য উপযুক্ত ব্যাগ।

চামড়ার ব্যাগ আব্বাজী কেন পছন্দ করেননি আমার জন্য, তা পরে বুঝেছি একটি ঘটনা থেকে। রমযানের তারাবীহ পড়ানোর পর আমি ও বরিশালী হুযুরের (মাওলানা আব্দুল মুকতাদের সাহেব) শ্যালক এক সাথে লঞ্চে বাড়ী যাচ্ছি। আব্বাজী ঢাকায় রয়ে গেলেন। কারণ ছোট হযরতজী (মাওলানা জাফর আহমদ উছমানী (রহঃ)) রমযানের যে পনের দিন ঢাকায় থাকতেন আব্বাজীও সে পনের দিন ঢাকায় থাকতেন। আমরা বরিশালের কাছাকাছি গিয়ে আমাদের ব্যাগ ইত্যাদি পরীক্ষা করলাম। বরিশালী হুযুরের শ্যালকের ছিল একটি সুন্দর চামড়ার

www.pathagar.com

ব্যাগ। তাতে ছিল একটি তুষ চাদর। দেখলাম ব্যাগটি একপাশ দিয়ে কাটা। খুলে দেখা গেল ব্যাগের সাথে তুষ চাদরটিও পরতে পরতে কাটা। আমি তখন আব্বাজীর কথার মর্ম বুঝলাম। তিনি চামড়ার ব্যাগ দেখে বলেছিলেন, "চোর কিনে এনেছ।"

১৯৬৭ সালের ডিসেম্বরের দিকে আব্বাজী ঢাকা থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ীতে চলে যান। ছোট হযরতজী তখন ঢাকায়। আব্বাজী গেলেন তাঁর নিকট বিদায় নিতে। তিনি তাঁর মেয়ের বাসায় ছিলেন। আমিও গেলাম আব্বাজীর সাথে। হযরতজীকে আব্বাজী বলতে লাগলেন- হযরত, দুয়া কীজিয়ে- খাতেমা বিল খায়ের নসিব হো। হযরতজী বার বার তাকে সোফায় বসতে ইশারা করছিলেন এবং বলছিলেন- মেরী উমর তো তুমছে যেয়াদাহ হায়। তোম এতনা মায়ূস কিউ হুয়ে? কিন্তু আব্বাজী নীচে বসে এক কথাই বলে যাচ্ছিলেন- দুয়া কীজিয়ে খাতেমা বিল খায়ের নসিব হো। প্রথম ও দ্বিতীয় বার হযরতজী তাকে একথা থেকে নিবৃত্ত করতে চাইলেও তৃতীয় বার যখন আব্বাজী একই কথা আবার বললেন, তখন হযরতজী গম্ভীর হয়ে গেলেন এবং তাঁকে উঠে বসতে বললেন। আব্বাজী খুব জড়সড় হয়ে কোনমতে উঠে বসলেন। এরপর হযরতজীর কাছ থেকে দুয়া নিয়ে চলে এলেন।

আব্বাজী নিজে যেমন ছিলেন অত্যন্ত হিসেবী, তেমনি সকলকে জোর তাগিদ দিতেন খরচ পত্রের পুরোপুরি হিসাব রাখতে। আব্বাজী তখন বাড়ীতে। কাশিয়ানী হুযুর করাচী থেকে হজ্জে গিয়ে ফিরে করাচী এসেছেন। আম্মা কী এক স্বপ্ন দেখে তাঁর এই জামাতা (কাশিয়ানী হুযুর) সম্পর্কে পেরেশান হলেন। বারবার আব্বাজীকে বলছিলেন করাচীতে টেলিফোন করে আব্দুল মান্নান (কাশিয়ানী হুযুর) কে একটু ঘুরে যেতে বলুন। আব্বাজী আম্মাকে বুঝাতে পারছিলেন না যে, এ মুহূর্তে তার পক্ষে আসা সম্ভব নয়। তবুও অন্ততঃ টেলিফোন করার জন্য আমাকে পাঠালেন।

ঢাকার হুযুর (মাওলানা আব্দুর রউফ সাহেব) তখন করাচীতে ইউছুফ বিন্নূরী সাহেবের মাদ্রাসায় পড়ছেন। তার কাছে টেলিফোন করব আমি। উর্দূতে কি কি বলতে হবে, টেলিগ্রাম করতে হলে ইংরেজীতে কি কি লিখতে হবে সবই আমাকে তিনি- শিখিয়ে দিলেন। আমাকে খরচের জন্য দিলেন পাঁচশত টাকা। আসবার সময় আম্মা বলে দিলেন তোযকের কাপড় নিয়ে যেতে। আব্বাজী বলে দিলেন সব খরচের হিসাব রাখতে। আমি ঢাকায় এলাম। কিন্তু টেলিফোন করতে পারলাম না। অগত্যা টেলিগ্রাম করে অন্যান্য কাজ সেরে বাড়ী ফিরে গেলাম। বাড়ীতে গিয়ে আম্মার কাছে হিসাব দিলাম। পাঁচশত টাকা থেকে একশত টাকার কিছু বেশী আমার কাছে অবশিষ্ট ছিল। আমি তা আম্মার কাছে জমা দিলাম।

www.pathagar.com

আব্বাজী জিজ্ঞাসা করলেন আম্মাকে, হিসাব নেয়া হয়েছে কি না। আম্মা বললেন- হ্যাঁ নেয়া হয়েছে। তথাপি আব্বাজী আমার কাছে হিসাবের খাতা চাইলেন। আমি ডাইরিতে হিসাব লিখে রেখে ছিলাম। সেটি তাঁর সামনে উপস্থিত করলাম। তিনি বললেন- ডাইরিতে রাখতে হয় ব্যক্তিগত ঘটনার বিবরণ। আর হিসাব রাখতে হয় নোটবুকে। তিনি ডাইরিটা নিজের কাছে রেখে দিলেন।

পরে জানতে পারলাম তিনি সেটি দিয়েছেন মাষ্টার আব্দুর রাজ্জাক সাহেবের কাছে পরীক্ষা করে দেখবার জন্য- কোন অহেতুক খরচ আছে কি না এবং আধ মাইলের কমপথ রিক্সায় গিয়েছি কি না। আসলে তেমন কিছু পাওয়া যায়নি। আমি বিস্তারিত হিসাব লিখে রেখেছিলাম। এমনকি দুই পয়সা দিয়ে এক হালি ডয়রা কলা কিনেছিলাম, তাও লিখে রেখেছি। পরবর্তী কালে আমার ছোট ভগ্নিপতি এডভোকেট মোসলেম এই নিয়ে কত যে রসিকতা করেছে! কিন্তু আমার এই বিস্তারিত হিসাব এবং যথার্থ খরচের বিবরণ পেয়ে আব্বাজী এত খুশী হলেন যে, আমার বেঁচে যাওয়া টাকা থেকে এক শত টাকা আমাকে পুরস্কার দিলেন। আমি বললাম-পঞ্চাশ টাকা আমার, আর পঞ্চাশ টাকা আমার ভাই রূহুল আমীনের। আব্বাজী আরো খুশী হলেন এবং আমার জন্য দুয়া করলেন। এ টাকা আমি কোথায় রাখি! তাই শাহাদাত মাষ্টারের (পোস্ট অফিসের) সাথে পরামর্শ করে সেভিংস একাউন্ট খুলে তাতে রেখে দিই।

তিনি প্রতিভার খুব মূল্য দিতেন। কারো মধ্যে কোন বিশেষ প্রতিভা থাকলে তা বিকাশের ব্যবস্থা নিতেন। একবার ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসায় আরবী বক্তৃতা প্রতিযোগিতা হবে বলে ঘোষণা হয়। মাওলানা ফজলুল হক আমিনী ও মাওলানা আব্দুল হাই তখন ছাত্র। তাদের দু'জনকে এতে অংশ নিতে বললেন- এবং প্রস্তুতির জন্য গাইড নিযুক্ত করলেন মাওলানা সালাহুদ্দীন সাহেবকে। সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু ঠিক প্রতিযোগিতার দিন (মাওলানা) আব্দুল হাই এর চোঁখ উঠলো। আব্বাজী বললেন- তবুও তোমাকে যেতেই হবে, প্রতিযোগিতায় অংশ নিতেই হবে। প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হলো।

ফলাফল ঘোষণা করা হলো- লালবাগ মাদ্রাসার আব্দুল হাই প্রথম, লালবাগেরই ফজলুল হক দ্বিতীয়, আর তৃতীয় স্থান অধিকার করলো ঢাকা আলিয়া থেকে। কিন্তু পরের দিন দৈনিক আজাদ এ সংবাদ ছাপা হলো-লালবাগ প্রথম, ঢাকা আলিয়া দ্বিতীয়, লালবাগ তৃতীয়। আব্বাজী প্রতিবাদ জানিয়ে সংশোধনীর জন্য আজাদে লোক পাঠালেন। পরের দিন সংশোধনী ছাপা হয়।

এমনি আরেক ঘটনা। শহীদুল্লাহ নামে এক নওমুসলিম কে নিয়ে আসে মাওলানা ফজলুর রহমান সাহেব। ছেলেটি খুব সম্ভব ইন্টারমিডিয়েট পাশ ছিল।

www.pathagar.com

মিশনারীরা তাকে ফুসলিয়ে খৃস্টান বানায়। পরে এক পর্যায়ে তাকে নাকি কুরআন শরীফের উপর উঠে হলফ্ করতে বলা হয়। এতেই সে ক্ষেপে যায় এবং তার মধ্যে ফিতরী ঈমান জেগে উঠে। সে সেখান থেকে পালিয়ে মাওলানা ফজলুর রহমান সাহেবের কাছে এসে তওবা করে পুনরায় মুসলমান হয়। আব্বাজীর কাছে আনা হলে তিনি তাকে প্রথমে নারায়ণগঞ্জ গিয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে এফিডেভিট করে আসতে বলেন। তারপর নিজের কাছে রেখে তার তরবিয়ত করতে থাকেন। বায়তুল মোকাররমে কোন উপলক্ষে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা হবে বলে দৈনিক আজাদে বিজ্ঞাপন বের হয়। আব্বাজী তাকে উৎসাহিত করেন তাতে অংশ নিতে। ছেলেটি তাতে অংশ নিয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। পুরস্কার হিসাবে পায় স্বর্ণের মেডেল।

ছাত্রদের প্রতি তাঁর ছিল অসাধারণ মায়া। তাদেরকে গড়ে তোলার, সংশোধনের প্রতি তিনি যত্নবান থাকতেন। ব্রাহ্মণবাড়িয়া মাদ্রাসায় থাকবার সময় তিনি রোযা রেখেছেন। খুব সম্ভব শাওয়াল মাসের নফল রোযা। ইফ্তার করার জন্য তার ছাত্র মাওঃ আব্দুল আজিজকে (বর্তমানে আশরাফিয়া লাইব্রেরীর মালিক) দুইটি পয়সা দিয়েছেন। এক পয়সার বেল, আরেক পয়সার চিনি আনবার জন্য। বাজারে গিয়ে পাওয়া গেল খুব বড় এক বেল। লোভ সামলাতে না পেরে আব্দুল আজিজ তাই নিয়ে এলেন দুই পয়সা দিয়ে। আর নিজের পকেট থেকে এক পয়সা দিয়ে চিনি কিনে আনলেন। আব্বাজী ইফ্তারের সময় বুঝতে পারলেন এত বড় বেল এক পয়সায় পাওয়া যায়নি। আব্দুল আজিজ সাহেবও স্বীকার করলেন। আব্বাজী তখন তাকে চার পয়সা দিতে চাইলেন। তিনি নিতে চাইলেন না। আব্বাজীও বেল খেতে চাইলেন না। বললেন- তুমি আমার পয়সা নিতে না চাইলে আমি তোমার বেল খাব না।

ছাত্রদের চাল চলন সংশোধনের দিকে তিনি নজর রাখতেন সব সময়। মাওলানা নূরুল হক (বর্তমানে খুলনার এক জুট মিলের মসজিদের ইমাম) যখন ঢাকায় পড়তে আসেন, তখন তার মন যাতে অস্থির না হয়, সে জন্য আব্বাজী তাকে ঢাকায় বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান ঘুরে ঘুরে দেখতে পাঠাতেন। আব্বাজীর কামরায় তাঁর ছিল অবাধ আসা যাওয়া। আসলে তিনি একা নন। এরূপ আরো ছিলেন মোস্তফা আজাদ, ফজলুল হক আমিনী, আব্দুল হাই বরিশালীসহ অনেকে। এদেরকে তিনি নিজ পুত্রের মত স্নেহ করতেন। তাছাড়া সিট কাটা, খানা কাটা বা অন্যান্য দন্ডে দন্ডিতদের আশ্রয় ছিল আব্বাজীর কামরা। আব্বাজীর মুরীদ ও ভক্তরা অনেক সময় খাবার দাবার ফলমূল নিয়ে আসত। সেগুলো রেখে যেত। আর এই ছাত্ররা মুখ বুঝে তা খেয়ে নিত। আব্বাজী খোঁজও নিতেন না। কিছু বলতেনও না। কারণ তারা ছিল তার স্নেহের। একদিন

www.pathagar.com

মাওলানা নূরুল হক হঠাৎ আব্বাজীর কামরায় ঢুকলেন। তিনি হয়ত মনে করেন নাই যে, ভিতরে হুযুর আছেন। কিন্তু ঢুকে অপ্রস্তুত হলেন। আব্বাজীও প্রশ্ন করলেন- কে? আমি নূরুল হক। কেন এসেছ? এমনি এমনি। কোন তালেবে ইলম কি কখনও এমনি এমনি আসে? যাও, পুনরায় সালাম দিয়ে অনুমতি নিয়ে এসো। আমি যদি প্রশ্ন করি কেন এসেছ? তাহলে বলবে- একটু দরকারে এসেছি। নূরুল হক বের হয়ে আবার এলো।

আব্বাজী কাউকে ধমক দিলেও ছাত্ররা তাতে আতংকিত না হয়ে বরং আরও অনুরক্ত হত তাঁর প্রতি। পুনরায় তার কাছে যেতে চাইত। মাওলানা নূরুল হক বলল- আমি চিন্তায় পড়ে গেলাম। আবারতো যেতেই হবে। কিন্তু কি দরকারের কথা বলব! কিছুই ভেবে পাচ্ছিলাম না। তবুও না গিয়ে উপায় ছিল না। ভয়ে ভয়ে দরজার কাছে গিয়ে সালাম দিলাম। কে? আমি নূরুল হক। কেন এসেছ? হুযুরের কাছে একটু দরকার আছে। আমার এখন সময় নেই। পরে এসো।

আমি হাফ ছেড়ে বাঁচলাম। হুযুর, আমাকে সংশোধনও করলেন, লজ্জা থেকেও বাঁচালেন। এ-ই ছিল তাঁর উদার বিচক্ষণ দূরদর্শী মনের পরিচয়। এতো গেল ছাত্রদের ব্যাপার। কেউ মুরীদ হতে চাইলে তাকে তিনি মুরীদ করার আগেই এছলাহ্ করে নিতেন। কেননা তাসাউফের মূল উদ্দেশ্য হলো মোয়ামালা মোয়াশারার এসলাহ্।

ভাওয়ালের জামালপুর থেকে পন্ডিত আলাউদ্দিন নামে এক ব্যক্তিকে মাষ্টার আব্দুল হক সাহেব এনেছেন আব্বাজীর কাছে মুরীদ করবার জন্য। আব্বাজী তাকে সময় দিলেন। লোকটি সারারাত ঘুমালো না। কিন্তু সঠিক সময়ে তার এমন এক সমস্যা হলো যে, তখন হাজির হতে পারলো না। সে তখন ভয়ে কাঁপতে লাগলো। কেননা আব্বাজী সময়ের ব্যাপারে খুবই কঠোর ছিলেন। মাষ্টার আব্দুল হক সাহেব ও মাওলানা ফজলুর রহমান সাহেব তাকে পরামর্শ দিলেন মাফ চাওয়ার জন্য। তিনি নরম হলেন ঠিকই। কিন্তু বললেন গওহারডাঙ্গায় গিয়ে দেখা করবে। লোকটি সে মতে গওহারডাঙ্গায় যায়। আব্বাজী তখন বাড়ীতে গেছেন।

আইয়ুব খান প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের জন্য গ্রামে গ্রামে ১৯,৫০০.০০টাকা বরাদ্দ করছেন স্কুল প্রতিষ্ঠান জন্য। আঠার হাজার টাকার বিল্ডিং এবং দেড় হাজার টাকা ফার্নিচার বাবত। এই গওহারডাঙ্গার জন্য এরূপ একটি বরাদ্দ পাওয়া যায়। এই সীমিত টাকায় যে, ভাল ভাবে এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হতে পারে তা প্রমাণ করতে চাইছিলেন আব্বাজী। অথচ নিউ মেম্বাররা তো সে টাকায় কিছুই করতে পারেনি। যাই হোক, আব্বাজী পরামর্শ দিলেন কোন পুরাতন বিল্ডিং খুজে দেখতে, তাহলে অল্প পয়সায় ভাল ইটা পাওয়া যাবে।

www.pathagar.com

পাওয়া গেল একটি পুরানা দালান। তার ইট দিয়েই গওহারডাঙ্গা মাদ্রাসার সংলগ্ন প্রাইমারী স্কুল ভবন হয়। এ ব্যাপারেই আব্বাজী মিটিং করছিলেন বাড়ীতে বসে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন মুহতামিম সাহেব, বাশবাড়িয়ার হুযুর, মাষ্টার আব্দুল জব্বার, মাষ্টার আব্দুর রাজ্জাক ও কুটি মিয়া মেম্বার। সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলো পন্ডিত আলাউদ্দিন। কে? আমি আলাউদ্দিন। আমরা কন্‌ফিডেনশান মিটিং করছি। বিনা অনুমতিতে কেন এলে? যাও, আবার অনুমতি নিয়ে এসো। লোকটি বেরিয়ে গেল, আবার সালাম দিয়ে অনুমতি প্রার্থনা করলো। আব্বাজী তখন মাষ্টার আব্দুর রাজ্জাককে বলে দিতে বললেন যে, আমরা একটি জরুরী মিটিং এ আছি। পরে আসতে হবে। এই ছিল তার সংশোধনের নমুনা। লোকটি পরে ভাওয়াল এলাকায় যথেষ্ট কাজ করেছে। তাহজিবুল কুরআন ফান্ড গঠনের পিছনে তার অবদান ছিল বিরাট।

সেই মিটিং এরই ঘটনা। রেজলুশন লিখলেন মাষ্টার আব্দুল জব্বার সাহেব। তিনি অনেক প্রবীণ ও জ্ঞানী মানুষ। কিন্তু তার লেখার বেশ কয়েক জায়গায় আব্বাজী ভুল ধরলেন। অতঃপর মাষ্টার আব্দুর রাজ্জাক সাহেবকে বললেন লিখতে। আব্দুর রাজ্জাক সাহেব বলেন- আমি তো হুযুরের সংশোধনী গুলো মনে রেখেছি। তারপর নিজের বুদ্ধি যোগ করে আবার লিখলাম। বললেন- পড়ে শোনাও। আমি পাঠ করলাম। তিনি আমাকে বাহাবা দিলেন। মুসলিম জাতির চিন্তায় তিনি বিভোর থাকতেন।

৬৫ সালের যুদ্ধের সময় তিনি বাড়ীতে ছিলেন। যুদ্ধের কয়দিন তিনি খুবই বিচলিত থাকতেন এবং পাটগাতি বাজার থেকে রেডিও নিয়ে প্রতিদিন সংবাদ শুনতেন। তিনি সীমান্ত এলাকার মুসলমানদেরকে সচেতন করার প্রতি তাগিদ দিতে থাকেন। আইয়ুব খান ইসলামের নামে জেহাদের ডাক দিক- এটাই চাইছিলেন। অবশেষে আইয়ুব খান তা-ই করে। আব্বাজী একটু আশ্বস্ত হলেন।

আইয়ুব খানের জারী করা মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ সম্পর্কে মাওলানা আহমদ হাসান সিলেটী আব্বাজীকে প্রশ্ন করলে তিনি তাকে এব্যাপারে লিখিত প্রশ্ন করতে বলেন এবং তার জবাবেই লিখলেন- "কুরআনের উপর হস্তক্ষেপ বরদাশ্‌ত করা যাইবেনা" নামে। সিলেটে এই বই মাহফিলে পাঠ করে শোনানো হয়।

তিনি যখন চিকিৎসার জন্য লাহোরে ছিলেন, তখন সেখানকার কোহিস্তান পত্রিকায় এক চাঞ্চল্যকর খবর ছাপা হয় যে, সাড়ে দশ হাজার মুসলমান যুবক খৃস্টান হয়ে গেছে। তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হন এবং ঢাকায় উক্ত কোহিস্তান পত্রিকার বরাত দিয়ে হ্যান্ডবিল ছাড়েন এবং মুসলমানদের কে সাবধান করেন।

www.pathagar.com

১৯৬৫ এর যুদ্ধের পর ইলেকশনের সময় আইয়ুব খানকে সমর্থন করা যায় কি না তা নিয়ে চকবাজার শাহী মসজিদে ওলামায়ে কেরামের এক সভা হয়। মাওলানা আহমদ হোসেন সিলেটী, শর্ষিণার পীর মাওলানা আবু জাফর মুহাম্মদ সালেহ, মাওলানা নূর মুহাম্মদ আ'যমী, মুফতী দীন মুহাম্মদ খান, মাওলানা মোসলেহ উদ্দীন দুদু মিয়া প্রমুখ এবং লালবাগের উস্তাদগণ উপস্থিত ছিলেন। আমি উক্ত সভায় সেই হ্যান্ডবিল বিতরণ করেছিলাম। সভায় সভাপতিত্ব কে করবে না তা নিয়ে জটিলতা হয়। আসলে সকল আয়োজন ও পরিশ্রম ছিল আব্বাজীর। তাই নূর মুহাম্মদ আ'যমী সাহেব পীড়াপীড়ি করছিলেন আব্বাজীকেই সভাপতিত্ব করতে। কিন্তু আব্বাজী তাকে এই বলে বুঝাতে সক্ষম হন যে, আমাদের মূল উদ্দেশ্য কাজ হওয়া। কে সভাপতি হলো তা দেখা নয়। অতঃপর আ'যমী সাহেবের সাথে পরামর্শ করে আব্বাজী সভাপতি নির্বাচন করেন- একদিনের জন্য শর্ষিণার পীর সাহেব এবং একদিনের জন্য মুফতী দীন মুহাম্মদ খান সাহেবকে।

উল্লেখ্য, যে কোন ব্যাপারে আব্বাজী চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতেন আ'যমী সাহেবের সাথে পরামর্শ করে। সভায় এমর্মে চুক্তি হলো যে, কেউ কাউকে না জানিয়ে সরকারের সাথে আলোচনায় যাবেন না। শর্ষিণার পীর সাহেব উক্ত চুক্তি মেনে চলেননি। কিছুদিন পরে আব্বাজী বাড়ী থেকে ঢাকায় এসে জানতে পারেন যে, শর্ষিণার পীর সাহেব প্রেসিডেন্টের দাওয়াতে রাওয়াল পিন্ডি গিয়েছেন। সেই যে তিনি তাঁর উপর অসন্তুষ্ট হলেন তা আর কোনদিন মিটেনি। একারণেই ইন্তেকালের কিছু দিন পূর্বে শর্ষিণার পীর সাহেব আব্বাজীর সাথে দেখা করতে গওহারডাঙ্গায় গেলে তিনি তারঁ সাথে দেখা দেননি।

তিনি আপন স্বার্থ বড় করে দেখেননি কখনও। ফরিদাবাদ মাদ্রাসার জায়গাটি আব্বাজীর নামেই রেজিস্ট্রি করে দেয়া হয়েছিল। তিনি তা মাদ্রাসা করার জন্য দিয়ে দেন। তাছাড়া একবার তার শুভাকাঙ্ক্ষীরা চাঁদনী ঘাটে প্রায় ১০কাঠা জায়গা, একটি ছোট একতলা বিল্ডিংসহ কিনে দেন থাকার জন্য। তিনি গড়িমসি করতে থাকেন ফ্যামিলি নিয়ে আসতে। একদিন তার এক স্টাফ এসে বাড়ী থেকে আসা যাওয়ার অসুবিধার কথা জানালে তিনি তাকে ফ্যামিলি নিয়ে আসতে বলেন। তাকেই তিনি উক্ত বাসায় তুলে দেন। তিনি থাকা অবস্থায় কিছুদিন আমরাও সেখানে ছিলাম। অতঃপর আর আমরা ছিলাম না। পরবর্তীতে আব্বাজী সেই বাড়িটি উক্ত স্টাফের নামেই স্থায়ী ভাবে দেয়ার ব্যবস্থা করে থাকবেন।

বটতলীর মাওলানা আব্দুল কবীর সাহেব বর্ণনা করেছেন নরসিংদির জনৈক হযরত আলী, আব্বাজীর খুব ভক্ত, এক কাঁদি সাগর কলা এনেছিল। এতবড়

www.pathagar.com

কাঁদি যে, গাছের সমান লম্বা। তার নিয়ম ছিল কেউ নিজের বাড়ীর কোন কিছু আনলে তা রাখতেন, আর কিনে এনে দিলে তা রাখতেন না। বরং তাকে বুঝিয়ে বুজিয়ে ফেরত দিতেন। তিনি কলার কাঁদিটি রাখলেন। কিন্তু পরের দিন মাওলানা সালাহুদ্দীন সাহেবকে বললেন- ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যে কলাগুলো বিতরণ করবার জন্য। প্রত্যেক শিক্ষক দুইটি করে এবং প্রত্যেক ছাত্র একটি করে পায়। দুইটি কলা থেকে যায় তার নিজের জন্য। সে দু'টি তার কামরায় ছিল। দুলা ভাই আব্দুল হালীম আসেন সেদিন। তিনি জামাতাকে দিয়ে দেন কলা দুইটি। নিজে কিছুই খেলেন না, বাড়ীর জন্যও রাখলেন না। একটি নিজের মেয়ের জন্য দু'টির বেশীও দিতে পারলেন না। অথচ তার জামাতা আগের দিন তার কামরায় এই কলার কাঁদি দেখে গিয়েছিলেন।

নরসিংদির লোকটি পরে জানতে পারেন ঘটনাটা। তাই আব্বাজীর বাড়ীতে যাবার সময় হলে তিনি নিজের বাগান থেকে একটা কাঁঠাল আনেন। বিরাট কাঁঠাল। আব্বাজী মোটেই রাজী হচ্ছিলেন না নিতে। কিন্তু হযরতও নাছোড় বান্দা। বললেন- এরূপ কাঁঠাল আমার বাগানে আরো আছে। আমি এনেছি আম্মার জন্য। ছাত্র-শিক্ষকদের জন্য নয়। আম্মার কথা বললে আব্বাজী তা আর বিতরণ করলেন না। কাঁঠালটি তিনি বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। পাটগাতী থেকে সেটি বয়ে নিয়ে যায় মনতাজ আলী নামে আমাদের এলাকার এক শক্তিশালী গরীব লোক। কাঁঠালটি এত বড় যে, লোকটি ঘেমে যায়। আমার মনে হয় মণ দেড়েক হবে। বাড়ীতে নিয়ে গেলে আম্মাকে জিজ্ঞেস করেন সেটি পেকেছে কি না। দেখা গেল পাকেনি। তাই তিনি মনতাজ আলীকে কাঁঠালের দাওয়াত দিয়ে দিলেন। লোকটিও বলছিল হুযুর, আমি পয়সা নিব না। আমায় কয়েকটি কোষ দেবেন। কিন্তু তাকে তিনি পাঁচ টাকা দেন। আর কাঁঠালের দাওয়াত দেন আলাদাভাবে। দু'দিন পর লোকটি এলে প্রথমে তাকে তিনটি কোষ দেয়া হয়। এক একটি কোষ প্রায় পেঁপের মত। সে তিনটি কোষই খেয়ে ফেলে। তারপর তার বাচ্চাদের জন্য আলাদা করে দেয়া হয়।

এমনি আরো কত যে ঘটনা রয়েছে তাঁর। তিনি আমাকে কাগজ কলম নিয়ে এক সপ্তাহ তার কাছে বসতে বলেছিলেন কেন, তা এখন বুঝি। আল্লাহ তাঁকে জান্নাতের সুউচ্চ মাকামে স্থান দিন। আমীন।

=ooo=

www.pathagar.com

আমার মোরশেদ
হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ)

মাওলানা ফজলুর রহমান (রহঃ)

আমার আব্বা ইংরেজী ১৮৮৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পূর্বপুরুষগণ দ্বীনদার ছিলেন। মধ্য এশিয়া হইতে তাঁহারা এই অঞ্চলে আসেন। বৃটিশ আমলে প্রাথমিক অবস্থায় জনাব চাঁদ মুন্সী তৎকালীন সরকারের বিশ্বস্ত ব্যক্তি হিসেবে চাঁদ বিশ্বাস নামে খ্যাতি লাভ করেন। তাঁহার পুত্র হাজী মতিউল্লাহ বিশ্বাস নৌকায় হজ্ব করিতে মক্কা শরীফ গিয়াছিলেন। তাঁহার তৃতীয় নিম্নপুরুষ (পৌত্র) ছিল মুহাম্মদ হুসাইন বিশ্বাস। তাঁহার পুত্রই হইলেন আমার আব্বা।

তিনি চট্টগ্রামের সীতাকুন্ড মাদ্রাসায় হাশ্‌তম (অষ্টম) জামাত পর্যন্ত লেখাপড়া করিবার পর ইউ.পি-র সাহারানপুর মাজাহেরে উলুম মাদ্রাসায় গিয়া ১৯১০ ইং সনে ভর্তি হন এবং ১৯১৮ সনে দাওরা-ই-হাদীস ফারেগ হইয়া দেশে ফিরিয়া আসেন। তাঁহার প্রধান উস্তাদ ও পীর ছিলেন হযরত মাওলানা খলীল আহমদ আম্বেঠবী (রহঃ)। আব্বার নাম ছিল বাহরুল্লাহ। হযরত মাওলানা খলীল আহমদ সাহেব তাঁহার নাম রাখিলেন খলীলুর রহমান। আব্বা অত্যধিক মেধাবী ও সাহসী বীরপুরুষ ছিলেন। তাঁহাকে কাবুলীদের মত দেখা যাইত। বাংগালী বলিলে কেহ বিশ্বাস করিতে চাহিত না।

১৯১৮ ইং সনে পূর্ব বাংলার কৃতীসন্তান গওহারডাঙ্গার হযরত মাওলানা শামছুল হক সাহেব সাহারানপুর পড়িবার জন্য উপস্থিত হইলে আব্বার সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। তখন উভয়ের মধ্যে অতিশয় মহব্বত হইল। পরে আব্বা ১৯২০ সনে দেশে ফিরিলে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। মাওলানা খলীলুর রহমান সাহেব নিজের এলাকায় আসিয়া দ্বীনী মাদ্রাসার খেদমতে লাগিলেন। আর "বৃটিশ খেদাও", "বিলাতি দ্রব্য বর্জন কর" ইত্যাদি আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। ঐ যামানায় রাজধানী কলিকাতা থাকায় ঢাকার সহিত তেমন কোন যোগাযোগ ছিল না। সমস্ত আন্দোলন কলিকাতা হইতে জারি হইত।

শায়খুল হিন্দ ও আমিরে মাল্টা হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী জেলে যাওয়ার পর আন্দোলন তীব্ররূপ ধারণ করে এবং মাওলানা খলীলুর রহমান সাহেব গ্রেফতার হইয়া কলিকাতা আলীপুর সেন্ট্রাল জেলে দুই বৎসর আটক থাকেন। তাহার পর আর হযরত মাওলানা শামছুল হক সাহেবের সহিত যোগাযোগ সম্ভব হয় নাই।

www.pathagar.com

মাওলানা শামছুল হক সাহেব হযরত মাওলানা থানভী (রহঃ)-এর সোহবতে দীর্ঘদিন থাকিয়া সাহারানপুর ও দেওবন্দ হইতে লেখাপড়া সমাপ্ত করিয়া দেশে আসিলেন। প্রথমে ব্রাহ্মণবাড়িয়া মাদ্রাসায় দুই বৎসর থাকিলেন। অতঃপর ঢাকা আশরাফুল উলূম মাদ্রাসা স্থাপন করিলেন।

হযরত মাওলানা শামছুল হক সাহেব হযরত মাওলানা থানভীর পূর্ণ অনুসরণ করিতেন। এই জন্য ঐ আন্দোলনে তিনি সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন নাই। এশায়াতে দ্বীন তথা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা এবং লিখনী, বয়ান ও ওয়াজ-নসীহতের মাধ্যমে তিনি গোমরাহী দূর করিতে হক্কানী তরিকতের তালীম তরবীয়ত করিতেন। যাহা দ্বারা ব্যক্তি গঠন ও সমাজ সংশোধন হইতো।

দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর পরে পাকিস্তান অর্জনের পর সিলেট যাওয়ার পথে স্টীমারে হযরত মাওলানা শামছুল হক সাহেবের সহিত মাওলানা খলীলুর রহমান সাহেবের দেখা হয়। সদর সাহেব ঢাকা যাইতেছিলেন। আলাপ আলোচনার পর তিনি সিলেট রওয়ানা হইলেন। হযরত মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী ওলামা সম্মেলন করিবার জন্য সিলেট আসিতেছিলেন। ইহা ছিল ১৯৪৯ সনের ঘটনা। তাহার পর হইতে মাওলানা খলীলুর রহমান সাহেবের সহিত সদর সাহেবের ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়া যায়। পাকিস্তানে শরীয়তের শাসন কায়েম করাইবার জন্য তাহারা উভয়ে প্রচেষ্টা চালাইতে লাগিলেন।

আমি আমার আব্বাকে ছোটবেলা হইতে শেষ রাতে তাহাজ্জুদ নামায ও বার তাসবিহ-এর যিকির আদায় করিতে দেখিয়াছি। রাত্রে যিকির করিবার সময় তিনি কাঁদিয়া চোখের পানিতে বুক ভাসাইতেন। শাজরা পড়িতেন, শে'র (কবিতা)গুলি তন্ময় হইয়া পড়িতেন। সে এক অপূর্ব দৃশ্য! দেশে শরীয়তের বিচার শালিসীতে যাইয়া রাত্র বারটা পর্যন্ত জাগ্রত থাকিয়াও পরে আবার তাহাজ্জুদের সময় নিয়মিত মা'মুলাত (বন্দেগী) আদায় করিতেন। বেলা দশটায় আবার ঠিক সময় মাদ্রাসায় পড়াইতে হাজির হইতেন। নাগেরপাড়া আহমদীয়া কওমী মাদ্রাসায় তিনিই ছিলেন মোহতামিম। দারুল একামাহ (ছাত্রাবাস) ছিল না বলিয়া পরিবেশটা কওমী মাদ্রাসার মতো হইয়া উঠে নাই। তিনি সেখানে শরহে বেকায়া পর্যন্ত পড়াইতেন।

আমার ছাত্র জীবনে আমার আব্বা হযরত সদর সাহেব হুযুরের কথা খুব শুনাইতেন। সেই সময় হইতে আমার মনে হযরত সদর সাহেবের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগ ছিল।

১৯৪৮ সাল হইতে আমি হযরত সদর সাহেব (রহঃ)-এর সোহবতে আসা-যাওয়া করিতাম। হুযুরের স্নেহের পরশে থাকিবার জন্য আমার মন সর্বদা ব্যাকুল

www.pathagar.com

থাকিত। তাঁহার পরামর্শক্রমে আমি উর্দূ ডিপ্লোমা পড়ি এবং বিক্রমপুরের বজ্রযোগিনী স্কুলে চাকুরী পাই। তাহার পর প্রায় প্রতি সপ্তাহে বৃহস্পতিবার স্থানীয় লোকদের নিয়া লালবাগে হুযুরের নিকট যাইতাম এবং মুরীদ করাইয়া আনিতাম। ঐ সময় তিনি মাওলানা আজিজুল হক সাহেবের দ্বারা বোখারী শরীফ অনুবাদের কাজ করাইতে আরম্ভ করেন। ভাষাজ্ঞান কম থাকায় এবং ভাবের বিকাশ না হওয়ায় হুযুর প্রায় সব লেখা কাটিয়া নতুন করিয়া লিখিয়া দিতেন।

১৯৪৯ সনে লালবাগ শাহী মসজিদের উত্তরদিকে টিনের ঘর নির্মাণ করিয়া মাদ্রাসা আরম্ভ করিলেন। মসজিদের দক্ষিণ-পূর্ব পার্শ্বে মাদ্রাসার দফতর ছিল। সেখানে দোতলা ভবন নির্মাণ করিয়া দক্ষিণ পার্শ্বে হেফযখানা আরম্ভ হইল। দীর্ঘ দশ বৎসর চেষ্টার পর উত্তর পার্শ্বের দালান তৈরী হইল এবং পূর্ব পাশের কামরায় হুযুর অবস্থান করিতে লাগিলেন। পেশাব-পায়খানার দুর্গন্ধে থাকা অত্যন্ত কষ্টকর ছিল। তবুও তিনি কষ্ট করিয়া ঐ ঘরেই থাকিতেন। আমরা বলিতাম, হুযুর! দক্ষিণ দিকের কামরাটা উত্তম। আপনার নিকট অনেক বড় বড় মেহমান আসেন, আপনি দক্ষিণ দিকের কামরায় অবস্থান করিলে ভাল হইত। হুযুর বলিলেন, আহ্! দশ-বার বৎসর পর্যন্ত মাওলানা হেদায়েতুল্লাহ ও মুফতী আবদুল মুয়েজ সাহেব এই দুর্গন্ধ সহ্য করিয়া এইখানেই থাকিয়াছেন। এখন আল্লাহপাক পাকা বিল্ডিং করিবার তৌফিক দিয়াছেন। মোহাদ্দেস সাহেব দক্ষিণ দিকে থাকিয়া একটু শান্তি লাভ করুক। আমি এই স্থানে থাকাই পছন্দ করি। সবেমাত্র ইলেক্ট্রিক পাখা হুযুরের কামরায় এক ভক্ত লাগাইয়া দিয়াছেন। আমি পাখা চালাইয়া দিলাম আর আমাকে ধমকাইতে লাগিলেন, “এই পাখা আমার জন্য নয়। ইহা মেহমানদের জন্য। আমার তো তালপাতার পাখা আছে, কিয়ামতের মাঠে যদি আল্লাহ আমাকে প্রশ্ন করেন যে, তুমি ব্যক্তিগত আরামের জন্য মাদ্রাসার কারেন্ট কেন খরচ করিয়াছ? তখন আমি কি জবাব দিব? সুতরাং তালপাতার পাখাতেই আমি বাতাস করি।” আহ্! তাকওয়া কাহাকে বলে!

আমরা পাকিস্তান আন্দোলনের সময় জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের পক্ষে ছিলাম এবং সেইরূপে মন-মস্তিষ্ক গঠিত হইয়াছিল। ১৯৪১ সন হইতে ’৪৩ সন পর্যন্ত হাটহাজারী অতঃপর ১৯৪৩ সন হইতে ’৪৭ সন পর্যন্ত দেওবন্দে লেখাপড়ার সময় পাকিস্তানের পক্ষে কোন আন্দোলন দেখি নাই। ১৯৪৭ সনে পাকিস্তান ও হিন্দুস্তান স্বাধীন হওয়ার পর সারা হিন্দুস্তানে মুসলমানরা নির্যাতিত হইতে লাগিল। শিখরা মুসলমানদের ব্যাপকভাবে কতল করিতে আরম্ভ করিল। হত্যা, লুন্ঠন, মারধর শুরু হইল। তখন দেশে আসিবার পর হুযুরের কাছে ঘনিষ্ঠ হইতে লাগিলাম। পাকিস্তানে দ্বীন-ঈমান কিভাবে মজবুত করা যায় এই জন্য তিনি পরামর্শ দিতেন।

www.pathagar.com

যেহেতু সুলুকের পথে চরিত্র সংশোধন ব্যতিরেকে মানুষ খাঁটি আল্লাহ প্রেমিক হইতে পারে না সেহেতু হুযুরের লিখিত জীবনের পণ, দোসরা সবক, তওবানামা, কসদুস-সাবিল, তালীমুদ্দীন, হায়াতুল মুসলিমীন প্রভৃতি কিতাবগুলি আমি ব্যাপকভাবে প্রচারের কাজে লিপ্ত হই। চাকুরী করিয়া দ্বীনের প্রচারের কাজ পূর্ণরূপে করিতে পারি না। সেই জন্য চাকুরী ছাড়িবার জন্য হুযুরের কাছে পরামর্শ চাহিয়াছিলাম, হুযুর নিষেধ করিলেন। অবশেষে মনের মধ্যে খেয়াল আসিল যে আহলুল্লাহর সোহবত ব্যতীত আল্লাহকে পাইব না। সুতরাং ঘরসংসার ত্যাগ করিতেই হইবে।

আমার আব্বা মাওলানা খলীলুর রহমান সাহেব আমাকে একদিন বলিলেন, দেখ! ফজলুর রহমান! আমি যে দৌলত হযরত খলীল আহমদের নিকট হইতে পাইয়াছি তিনি তাহা হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গঙ্গুহী হইতে ও হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী হইতে লাভ করিয়াছেন। তাহা আমি তোমাকে দিয়া যাইতে পারিলাম না। কারণ তোমার দিল এখনও উপযুক্ত হয় নাই। আমার অবর্তমানে তুমি এই তরীকতের সিলসিলা, এমদাদিয়ার দৌলত, মাওলানা শামছুল হক সাহেবের নিকট হইতে অর্জন করিও।

আহ্! আমার দিল উপযুক্ত হয় নাই? আমার আব্বা আমাকে শিক্ষা দিতে পারিলেন না। ১৯৬১ সনের ২১শে জানুয়ারী আমার আব্বা ইন্তেকাল করেন। তিন দিন পরে আমি সংবাদ পাইলাম। আহ্ আমার আব্বা সিলসিলায়ে এমদাদিয়ার দৌলত আমাকে দিতে চাহিয়াছিলেন। আজ আমার আব্বা নাই। এক বৎসর পাগলের মতো কাটাইলাম। হুযুরের কাছে লালবাগ আসিয়া আব্বার অবর্তমানে আমার জিন্দেগীর মোড় কোন দিকে নিব জিজ্ঞাসা করিলাম। উত্তরে বলিলেন, চাকুরী ছাড়া যাইবে না, ইস্তেখারা করিতে থাক।

১৯৬২ সালের অক্টোবর মাসে হযরত মাওলানা যাফর আহমদ উসমানী লালবাগ মাদ্রাসায় হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা ও মসনবী শরীফ আলেমদিগকে পড়াইয়া দিবেন বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছিল। ব্যস সিদ্ধান্ত নিলাম আমি আর চাকুরীতে যাইব না। উক্ত তারিখের পূর্বেই স্ত্রী-পুত্র সকলকে বলিয়া লালবাগে আসিলাম এবং বলিলাম, আমি সব ছাড়িয়া যাইতেছি। মানুষ হইতে পারিলে ফিরিব, না হইলে আর আমাকে পাইবে না। স্ত্রীকে অনেক পূর্ব হইতে ঠিক মতো বুঝাইয়া রাখিয়াছিলাম। ফলে তিনিও আমাকে হৃষ্টচিত্তে খুশীমনে বিদায় দিলেন এবং বলিলেন— যান, আল্লাহ আপনাকে দেখিবেন।

লালবাগ জামেয়ার উত্তরদিকের বিল্ডিংয়ে বড় বড় ওলামাগণে পরিপূর্ণ। দরস শুরু হইল।

www.pathagar.com

বেলজিয়ামের পাদ্রী পায়ারের ঘটনা

একবার খবরের কাগজ পড়িয়া চোখের পানি মুছিতে মুছিতে হযরত সদর সাহেব কাগজটা আমাদের হাতে দিলেন আর বলিলেন, এই খবরের কাগজ পড়িয়া কি বুঝিলে? মতামত ব্যক্ত কর। উহাতে ছিল বেলজিয়ামের পাদ্রী পায়ার পঞ্চাশ লাখ টাকা লইয়া চট্টগ্রামে শান্তির দ্বীপ স্থাপনের জন্য আসিতেছে। সমুদ্র উপকুলের লোক ঘূর্ণীঝড়ে সমুদ্রের পানির উচ্ছ্বাসে ডুবিয়া গিয়া জানমাল হারাইয়াছে তাহাদের জন্য নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিতে আসিতেছে। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান তাহাকে আরও পঞ্চাশ লক্ষ টাকা দিয়াছে শান্তির দ্বীপ স্থাপন করিতে! ঐ যামানায় এতো টাকা নিয়া পাদ্রী পায়ার গহীরায় স্থান নিয়া সেবা মূলক কাজ আরম্ভ করে। উদ্দেশ্য ছিল জনসেবার রূপ ধরিয়া মুসলমানদের ছলে-বলে, কলে-কৌশলে খৃষ্টান ধর্মে রূপান্তরিত করা। আমরা কিছুই করিতে পারিলাম না। তিনি আরও বলিলেন, চট্টগ্রামের অপর নাম ইসলামাবাদ। এই দেশকে খৃষ্টানাবাদে পরিণত করাই পাদ্রীদের উদ্দেশ্য। আজ আমাদের স্বাধীন পাকিস্তানে তাহারা খৃষ্টধর্ম প্রচারের জন্য সেবা মূলক কাজের নামে অত্যন্ত বেপরোয়া হইয়া উঠিয়াছে।

কে আছ হে মুসলিম যুবক? আল্লাহর ওয়াস্তে দ্বীনের খেদমতে জানমাল উৎসর্গ করিবার মতো? আমি বলিলাম, হুযুর আমি আছি। হুযুর বলিলেন, সোডা ওয়াটারের যোশ নিয়া আসিয়াছ নাকি? সোডা লেমুনেটর বোতলের ছিপি খুলিলে উৎরাইয়া পড়ে, পরে ঝাঁকাইলেও ফেনা হয়না। সেরূপ নয় তো? আমি বলিলাম, না হুযুর। হয় শরীরের পাতন না হয় মন্ত্রের সাধন। জীবন দিতেও প্রস্তুত।

চট্টগ্রামসহ পূর্বাঞ্চলের খৃষ্টান তৎপরতা দেখিয়া তাহাদের অপচেষ্টা হইতে মুসলমানদের সতর্ক করিবার জন্য ১৯৬২ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে হুযুর আমাকে পার্বত্য চট্টগ্রামে পাঠাইলেন। অতি তাড়াতাড়ি পাদ্রীদের গোমর ফাঁক, আল্লাহর প্রেরিত ইঞ্জিল কোথায়, শত্রু থেকে হুশিয়ার থাক ইত্যাদি পুস্তক ছাপাইয়া নিয়া বাহির হইলাম। আনোয়ারা থানার গহীরা এলাকা সামুদ্রিক প্লাবনে ধ্বংস হইয়াছে অথচ পাদ্রী পায়ার রাউজান থানার গহীরায় আদর্শ গ্রামের নামে মহিলাগণকে নামাইয়াছে। ঐ এলাকার লোকদিগকে পাদ্রীদের অপকীর্তির কথা ও অশুভ তৎপরতা হইতে সতর্ক করিবার কাজ ব্যাপকভাবে করিতে আরম্ভ করিলাম। দুই বৎসর পর পাদ্রীরা গহীরা ছাড়িয়া যাইতে বাধ্য হয়।

সুন্দরবন এলাকা ও দক্ষিণ খুলনা অঞ্চলের জন্য মাষ্টার ইয়াসিন সাহেবকে, ঢাকাসহ উত্তর অঞ্চলের গারো এলাকা মাষ্টার আবদুল হক সাহেবকে এবং রাজশাহী এলাকার জন্য মৌলভী আবদুস সালাম সাহেব (নেয়ামতের এডিটর)-কে দায়িত্ব দিলেন।

www.pathagar.com

খৃষ্টানদের বাইবেলের প্রচার রাস্তা-ঘাটে ব্যাপক আকারে হইতেছিল। হযরত দর সাহেব কোরআনের শিক্ষা প্রচারের জন্য 'আঞ্জুমানে তাবলীগুল কোরআন' ামে একটি সমিতি গঠন করিলেন। খৃষ্টান তথা বাতিল প্রচারের বিরুদ্ধে জোর ান্দোলন শুরু করিলেন। মাত্র তিন বৎসরের প্রচেষ্টায় সরকার বিদেশী পাদ্রীদের াকিস্তানে প্রবেশ নিষেধের উপর নোটিশ দিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু প্রচার কাশ্যে বন্ধ হইলে কি হইবে? পাদ্রীরা গোপনে বিভিন্ন যোগ্যতার নাম দিয়া যমন- কেহ ইঞ্জিনিয়ার, কেহ ডাক্তার কেহবা কোন বিষয়ের বিশেষজ্ঞ পরিচয় দিয়া এদেশে আসিতেই থাকে। যাহা হউক তাহাদের অশুভ তৎপরতা কিছুটা বন্ধ হইল বটে।

এই দিকে সরকার নিজেই আল্লাহর কোরআনের বিরুদ্ধে শরীয়তের আইনের খেলাপ পারিবারিক আইন পাশ করাইয়া এক জঘন্য কাণ্ড করিয়া বসিল। ইহার বিরুদ্ধে আবার নূতন আন্দোলন করিতে হইল। "সতর্কবাণী" এবং "শরীয়তের দৃষ্টিতে পারিবারিক আইন" নামক পুস্তকদ্বয় রচনা ও প্রকাশ করিয়া জনসাধারণকে হুশিয়ার করা হইল। আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে ব্যাপক গণআন্দোলনও শুরু হইল। ১৯৬৫ সনের নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানে আইয়ূব খান অনেক কম ভোট পাইয়াছিল। তাহার কারণ জানার জন্য পূর্ব পাকিস্তানে আসিয়া সেই যামানার বড় বড় আলেম ও পীর মাশায়েখকে প্রেসিডেন্ট হাউজে ডাকাইলেন।

আইয়ূব খানের সহিত তর্ক ও তাহার ফল

মাওলানা শামছুল হক সাহেবও দাওয়াত পাইলেন কিন্তু তিনি যাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। বলিলেন, এত বড় জালেম যে, কোরআনের উপর হস্তক্ষেপ করিয়াছে। তাহার চেহারা আমি দেখিতে রাজি নই। কিন্তু মাওলানা নূর মুহাম্মদ আযমী সাহেবের অনুরোধে শেষ পর্যন্ত তিনি গেলেন।

মাওলানা মুফতী দ্বীন মুহাম্মদ তো আগেই গিয়া পৌঁছিয়াছেন। প্রেসিডেন্ট আইয়ূব খান শর্ষিণার পীর সাহেবের সঙ্গে গল্প করিতেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে কিছু টিপ্পনিও কাটিতেছিলেন। প্রেসিডেন্ট আইয়ূব শর্ষিণার পীর মাওলানা আবু যাফর সালেহ সাহেবকে বলিলেন, দেখেন পীর সাহেব আপনি অনেক মোটা হইয়া যাইতেছেন। খাবার কিছু কম খাইবেন। পীর সাহেব হাসিতে হাসিতে বলিলেন, আল্লাহ খাওয়ান তাই খাই। আইয়ূব খান বলিলেন, মানুষ পীর হয় তো খাওয়ার জন্যই।

www.pathagar.com

এই বাক্য শোনার সাথে সাথেই হযরত সদর সাহেব গোস্বাভরে কর্কশ স্বরে বলিয়া উঠিলেন, দেখুন প্রেসিডেন্ট সাহেব, আপনি মনে করিবেন না যে আমি একা আপনার নিকট আসিয়াছি। বরং পাকিস্তানের দশ কোটি মুসলমানের পক্ষ হইতে আসিয়াছি। তাই আমিও দায়িত্ব ও মর্যাদায় প্রেসিডেন্ট সমতুল্য। দুইশত বৎসরের বৃটিশ শাসন মুসলমানদের যে ক্ষতি করিয়াছে, আপনি তাহার চাইতে বেশি করিয়াছেন। আইয়ূব খান বলিলেন, কি ভাবে? সদর সাহেব বলিলেন আপনি কুরআনের খেলাফ আইন পাশ করিয়া শরীয়ত পরিবর্তন করিয়া ফেলিয়াছেন। আপনি পারিবারিক আইন বাতিল করিয়া দিন। আইয়ূব খান উত্তরে বলিলেন, তাহা তো কেবিনেট পাশ করিয়াছে। এই ব্যাপারে যাহা কিছু করিবার কেবিনেটই করিবে।

সদর সাহেব বলিলেন, আপনি ইচ্ছা করিলে অর্ডিন্যান্স জারি করিয়া যে কোন আইন রদ (বাতিল) করিতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ আপনি মুসলিম ছাত্রদের ধর্মীয় শিক্ষা বন্ধ করিয়াছেন। বৃটিশ যুগে দীনীয়াত পড়াইত এবং সপ্তম শ্রেণী হইতে দশম শ্রেণী পর্যন্ত আরবী সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ হিসাবে পড়িয়া কোরআন হাদীসের জ্ঞান অর্জন করিত। তাহা আপনি বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

আইয়ূব খান বলিলেন, না আমি তৃতীয় শ্রেণী হইতে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত ধর্মশিক্ষা বাধ্যতামূলক করিয়াছি।

সদর সাহেব বলিলেন, তাহা মিথ্যা কথা। ইহা ধোকা। কারণ যে বিষয়ের এক্সামিনেশন নাই, কন্টিনিউয়েশন নাই, তাহা কি কেহ পড়ে? আমার দাবী প্রথম শ্রেণী হইতে ডিগ্রী পর্যন্ত ধর্মশিক্ষা বাধ্যতামূলক করিতে হইবে। আমার দেশের শিক্ষিত লোকেরা এক দিকে আদালতের জজ হইবেন, অন্যদিকে মসজিদে ইমামতি করিবার যোগ্যতা অর্জন করিবেন। আমি ধর্মহীন কর্মশিক্ষা ও কর্মহীন ধর্মশিক্ষায় মোটেই সন্তুষ্ট নই। আমি শিক্ষার পাঠ্যসূচী ও নীতিমালা দিয়াছি তাহা সরকার গ্রহণ করে নাই।

তখন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন এ. টি. এম. মোস্তফা। আইয়ূব খান বলিলেন, এ.টি.এম. মোস্তফাকে ডাক। আমি তো দ্বীনী শিক্ষা বাধ্যতামূলক করিবার হুকুম দিয়াছি।

মন্ত্রী সাহেব আসিলেন এবং সদর সাহেবকে বলিলেন, "মাওলানা সাহেব আমরা নির্বাচিত হইয়া মন্ত্রী হইয়াছি। আমরা অস্থায়ী আর সেক্রেটারীগণের চাকুরী স্থায়ী। আমাদের কোন হুকুম পাইলে মনোপুত হইলে তাহারা তাহা জারী করে, অন্যথায় ফাইলে চাপা পড়িয়া থাকে। আপনার দেওয়া পরিকল্পনা মোতাবেক কিছুটা সংশোধনের চেষ্টা করিয়াছি কিন্তু এখন সেই ফাইলই গায়েব। আর আমাদের আয়ুষ্কালও শেষ।

www.pathagar.com

কি বলিলেন? দেশ শাসন হয় সেক্রেটারীদের দ্বারা, তাহাদের মন-মগজ তৈরী হইয়াছে—ম্যাগজিল, ক্যালিফোর্নিয়া আর আমেরিকার খৃস্টান পাদ্রীদের দ্বারা। তাহারাই ইসলামের দুশমনিতে প্রথম নম্বরে আছে। হুযুর পুনরায় আইয়ূব খানকে বলিলেন, আপনি পারিবারিক আইন বাতিল করুন। অন্যথায় আপনার সাথে আর কোন কথা নাই। আপনি ইসলামের দুশমন প্রমাণিত হইয়াছেন। আইয়ুব খান অমনি রাগে-ক্ষোভে ফাটিয়া পড়িয়া বলিলেন, আপনি আমাকে অনেক বেশী বলিয়াছেন। একটি চেক দিয়া বলিলেন, ইহা লইয়া চলিয়া যান। হুযুর উহা খুলিয়া দেখিয়া বলিলেন, সাত লক্ষ টাকা ? চৌদ্দ লক্ষ লোকের নিকট হইতে আট আনা করিয়া চাঁদা উঠাইবো এবং তাহাদের দিল আল্লাহর সহিত জুড়িয়া দিবো। আপনার দেওয়া টাকা দ্বারা দ্বীনের খেদমতের জন্য ঠেকা নই। এই বলিয়া তিনি সেখান হইতে চলিয়া আসিলেন।

১৯৬৫ সনের ঐ ঘটনার পূর্বে ঢাকা চকবাজার জামে মসজিদে এক ওলামা সম্মেলন ডাকিয়া সদর সাহেব পূর্ব পাকিস্তানের মশহুর পীর মাশায়েখ ও ওলামাগণকে বলিলেন, দ্বীন ইসলামের হেফাজতের জন্য আমাদের একতাবদ্ধ থাকিতে হইবে। সরকার যেন ইসলাম বিরোধী কোন আইনের ধারা-উপধারা পাশ করিতে সাহস না করে। খবরদার মনে রাখিবেন! আমরা কেহ যেন সরকারের কাছে কোন বিষয়ের জন্য ব্যক্তিগতভাবে না যাই। যাইবো তো একত্রে যাইবো।

ওলামা সম্মেলনের বিরুদ্ধে অপচেষ্টা

কিন্তু আফসোস শর্ষিণার পীর সাহেব আইয়ূব খানকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য ভিন্নভাবে ওলামা সম্মেলন করিয়া নিজেদের দাবী-দাওয়া পেশ করিলেন। তখন সদর সাহেব বলিলেন, শর্ষিণার পীর সাহেবের ঢাকায় কোন পরিচিতি ছিল না। আমি তাঁহাকে ডাকিয়া আনিয়া মর্যাদার আসনে বসাইয়া দিলাম। অথচ তিনি আমাকে এবং আমার সাথীদিগকে বাদ দিয়া কি করিয়া ভিন্ন সংস্থা গঠন করিয়া সরকারের নিকট ধর্না দিলেন!

হকের আওয়াজ বুলন্দ হওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি হইল। পারিবারিক আইন বলবৎই রহিল। কোরআনের উপর হস্তক্ষেপ বরদাশত করিবো না বলিয়া পুস্তক লিখিয়া তিনি জনগণকে অবহিত করিলেন।

ঐ যুগে কেবিনেটের মিটিংয়ে রাওয়ালপিন্ডীতে বাহাদুরপুরের পীর দুদু মিঞা এল.ডি.এফ. পার্টির সদস্য ছিলেন। তিনি মিটিংয়ে উপস্থিত হইলে আইয়ূব খান জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা পীর সাহেব! আমি ঢাকায় ওলামা সম্মেলন আহ্বান

www.pathagar.com

করিয়াছিলাম। তাহাদের মধ্যে এক ব্যক্তি আমাকে বদনাম করিয়াছিল। সে ব্যক্তি কে?" পীর দুদু মিঞা বলিলেন, "মাওলানা শামছুল হক তাঁহার নাম।" তখন তিনি বলিলেন, "তিনি একজন ভয়ঙ্কর লোক। আমাকে এত বেশী দুর্নাম দিয়াছিল যে, আজ পর্যন্ত কেহ এরূপ করে নাই।"

তখন হইতে হযরত সদর সাহেবকে পাকিস্তানের শত্রু আলিম বলিয়া চিহ্নিত করিয়া রাখা হইল। ১৯৬৬ সালে বিশ্ব মুসলিম কনফারেন্সে মক্কা শরীফ যাওয়ার জন্য বাদশাহ ফয়সাল হুযুরকে দাওয়াত দিলেন এবং সেখানে যাওয়ার জন্য বিমানের টিকেট পর্যন্ত পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি যাওয়ার জন্য প্রস্তুতিও গ্রহণ করিলেন। "মুসলিম উম্মার মুক্তির উপায় কি?" এই বিষয়ে বক্তৃতা করিবার জন্য বিষয়বস্তুও ঠিক করিলেন।

শেষ পর্যন্ত পাক সরকার তাঁহাকে যাইতে দেয় নাই। বার বার গভর্ণর মোনএম খানের কাছে পাসপোর্টের জন্য গেলেন। কিন্তু পাসপোর্ট পান নাই। আর মাত্র তিন দিন বাকী। তখন মোনএম খান বলিলেন, আপনার পাসপোর্ট কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে, আমাদের হাতে ক্ষমতা নাই।

এই দিকে মুফতী শফী' সাহেব সদর সাহেবের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। কিন্তু পাসপোর্ট কেন দেয় না? জানার জন্য মুফতী শফী সাহেবের নিকট ফোন করিলেন। মুফতী সাহেব রাওয়াল পিন্ডিতে আইয়ূব খানের পিএ-এর নিকট ফোন করিলেন। উত্তর এল, "মাওলানা শামছুল হক সাহেবকে যাইতে দেওয়া হইবে না। তিনি পাকিস্তানের শত্রু আলিম বলিয়া ব্লাক লিস্টে তাঁহার নাম লিখিত রহিয়াছে। তাঁহাকে যাইতে দিলে পাকিস্তানের অপমান হইবার আশঙ্কা রহিয়াছে। আমাদের দেশের ত্রুটি বর্হিজগতে প্রকাশ পাইবে। সুতরাং তাহাকে যাইতে দেওয়া হইবে না।"

ফোনে এই জওয়াব পাইয়া সদর সাহেব আক্ষেপে দীর্ঘশ্বাস ছাড়িলেন আর মনের ব্যথায় দো'আ করিলেন। অতঃপর হুযুরের বেশী অসুস্থতা বোধ হইতে লাগিল। তাই, নভেম্বর '৬৭ ঢাকা হইতে বিদায় নিয়া দেশের বাড়ি গওহারডাঙ্গা চলিয়া গেলেন। ১৯৬৯ সনে আইয়ূব খানের পতন ঘটে এবং ঐ সনেই পাকিস্তান বিভক্ত হওয়ার প্রায় দুই বৎসর পূর্বেই হুযুর ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

১৯৬৩ সালে "জামাআতি জিন্দেগী" কিতাব লিখিয়া তবলীগের উসূল প্রকাশ করিলেন। তাহার মধ্যে এক স্থানে লিখিয়াছেন, "আমার উত্তরাধিকারীগণ তোমরা স্মরণ রাখিও, আমি যে পাকিস্তান আন্দোলনে শরীক হইয়াছিলাম তাহা বর্তমানের এই গায়রে ইসলামী তরীকায় পরিচালিত ক্ষুদ্র পাকিস্তানের উপর সন্তুষ্ট

www.pathagar.com

হইয়া নয়। বরং দিল্লীর লাল কেল্লায় তথা সারা ভারতে ইসলামের ঝাণ্ডা উত্তোলনের নিয়তে। জানি না কবে সে আশা পূরণ হইবে, কবে বাস্তবায়িত হইবে।" জামাআতী জিন্দেগী পুস্তকে কিছুটা বাদ পড়িয়াছে অথচ মূল পাণ্ডুলিপিতে এইভাবে লিখিত আছে। পাকিস্তানে খৃষ্টান পাদ্রীদের অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হইয়া বহু সংখ্যক মুসলমান খৃষ্টান হইয়া গিয়াছে। সদর সাহেব তাহার তথ্য সংগ্রহ করিয়া সরকারকে জানাইয়া প্রতিকারের দাবী তুলিয়াছেন। বহু বড় বড় জনসভা করিয়াছেন, অঞ্চলে অঞ্চলে সমিতি করিয়া বাতিল মতবাদের স্রোত বন্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। শিক্ষক প্রশিক্ষণ দিয়া, মক্তব-মাদ্রাসা স্থাপন করিয়া এলাকায় এলাকায় দ্বীন প্রচারের ব্যবস্থা করিয়াছেন। মোবাল্লিগ ট্রেনিং দিয়া শিরক-বিদআতে আক্রান্ত এলাকায় দ্বীনের প্রচারের কাজ জারী করিয়াছেন।

পাদ্রীদের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ

১৯৬৪ সনে উত্তর বঙ্গের প্রাণকেন্দ্র রাজশাহীর সাহেব বাজার মসজিদকে কেন্দ্র করিয়া এক বিশাল জনসভায় হুযুর বলিলেন- বিশাল ঘন বসতিপূর্ণ পাকিস্তানের মুসলমানদের বিভ্রান্ত করিবার জন্য বিদেশী পাদ্রীগণ এই দেশকে প্রধান প্রচার কেন্দ্রে পরিণত করিয়াছে। তাহাদের কাছে কোন ধর্ম নাই। সেবা, শিক্ষা ও সাহায্যের নামে তাহারা সরল মুসলিম জনসাধারণের ঈমান নষ্ট করিতেছে। তাহাদের সংখ্যা বাড়াইয়া এই দেশকে খৃষ্টান দেশে পরিণত করিবার অপচেষ্টায় নামিয়াছে।

কলিকাতা, গোবিন্দপুর, সুতানটি তিনটি পরগণা তাহারা শিক্ষার নামে কৌশলে দখল করিয়া অতঃপর কোম্পানীর রাজত্ব কায়েম করিয়া মুসলমানদের হাত হইতে এই দেশ নিয়া মুসলমানদের গোলামে পরিণত করিয়া পথের কাঙ্গাল বানাইয়া ছাড়িয়াছে।

মুসলমানদের হাত হইতে জমিদারী ছিনাইয়া নিয়া হিন্দুদের দিয়া দিল আর মুসলমানদের উপর নির্যাতন চালাইতে লাগিল। মুসলমানগণ পরাধীনতার জিঞ্জিরে আবদ্ধ হইয়া শ্বাসরূদ্ধকর অবস্থায় দিনাতিপাত করিতে লাগিল। বর্তমানে মুসলমানরা পাকিস্তান অর্জন করিয়াছে, কিন্তু এই পাকিস্তানকে খৃষ্টানদের অধীনে নিয়া মুসলমানদের পুনরায় গোলাম বানাইবার চেষ্টা চালাইতেছে।

আমি সমস্ত দুনিয়ার পাদ্রীদের চ্যালেঞ্জ করিতেছি, তাহাদের নিকট আল্লাহর প্রেরিত ইঞ্জিল কিতাব নাই। তাহারা একটি কপিও দেখাইতে পারিবেনা। আমরা আল্লাহর কোরআনের লক্ষ লক্ষ হাফেয দেখাইতে পারিব। ইঞ্জিল কিতাব অপরিবর্তিত নাই। পাদ্রীরা উহা রদবদল করিয়াছে, এমন কি উহার মূল ভাষায় একটি কিতাবও দুনিয়ার কোথাও নাই।

www.pathagar.com

ঢাকা নারায়ণগঞ্জের চাড়ার খোপের গীর্জার এক পাদ্রী এই চ্যালেঞ্জের জবাব প্রদানের জন্য লালবাগ মাদ্রাসায় হুযুরের নিকট আসে এবং বলে যে, এক মাস সময় চাই, ইঞ্জিলের আসল কপি ভ্যাটিকানের পোপের নিকট আছে। উহা আনাইয়া দেখাইব। হুযুর সময় দিলেন। পাদ্রী বলিল: আপনার কর্মীগণের প্রচারণায় বিব্রত বোধ করিতেছি, আমাদের বিরুদ্ধে প্রচার বন্ধ রাখুন। এই বলিয়া এক মাস পরে এক কপি ইঞ্জিল কিতাব আনার জন্য সময় নিয়া চলিয়া গেল।

১৯৬৪ সনের জুন মাস। ভ্যাটিকান হইতে ইঞ্জিল কিতাবের একটি কপি নিয়া পাদ্রী সাহেব আসিলেন। লালবাগ মাদ্রাসায় হযরত সদর সাহেবকে খোজ করিতে লাগিল, ঐ সময় হুযুরের কাছে পাদ্রীকে নিয়া আসার অনুমতি চাহিলে হুযুর বলিলেন প্রথমেই আমার কাছে কেন আনিবে? তোমরা তাহার সাথে কিছুক্ষণ যুক্তিতর্ক কর। বেশ কিছুক্ষণ পরে পাদ্রী হুযুরের সাথে দেখা করিবার জন্য ব্যস্ততা প্রকাশ করিলে হুযুরের কামরায় পাদ্রীকে নিয়ে গেলাম। হুযুর বলিলেন, পড়ুন আপনাদের ইঞ্জিল কিতাব। বিদেশী পাদ্রী পড়িতে আরম্ভ করিলেন। হুযুর গোস্বার সঙ্গে বলিলেন, কে বলে উহা ইঞ্জিল কিতাব। ইঞ্জিল কিতাব কোথায়? ইহা তো সেন্ট পলের লিখিত হিব্রু ভাষার বাইবেল, ইঞ্জিল কিতাব তো সুরইয়ানী ভাষায় নাযিল হইয়াছে। সুরইয়ানী ভাষার ইঞ্জিল কিতাব কোথায়-বলিতেই পাদ্রীগণ সন্ত্রস্ত হইয়া বলিল- আমাদের কাছে ইহা ছাড়া হিব্রু ভাষার কোন ইঞ্জিল নাই। তখন তাহারা ক্ষমা চাহিয়া চলিয়া গেল। ঐ সময় মনে হইতে ছিল সদর সাহেব কোন দস্তে গায়েব হইতে সাহায্য পাইতে ছিলেন। আমরা বলিলাম হুযুর, আপনি সুরইয়ানী ও হিব্রু ভাষা কি করিয়া বুঝিলেন? হুযুর চুপ থাকিলেন।

তাহার পর পাদ্রীদের অপতৎপরতা বন্ধের জন্য রাঙ্গামাটিতে তবলছড়ি মসজিদ প্রাঙ্গনে বিরাট কনফারেন্স করিলেন। আমি ফজলুর রহমান ঐ কনফারেন্সের ব্যবস্থা করিয়া হযরত সদর সাহেব, মাওলানা যাফর আহমাদ উসমানী এবং মুফতী দ্বীন মুহাম্মাদ খান সাহেবদেরকে নিয়া তিন দিনের কর্মসূচী বাস্তবায়িত করিলাম। আমি হিলট্রাক্সের ডি,সি সাহেবের নিকট দরখাস্ত করিয়া কাপ্তাইয়ের নিকট শিলছড়িতে যাট একর পাহাড়ী জমি কুরআন প্রচারের কেন্দ্র করিবার জন্য বন্দোবস্ত নিয়াছিলাম। সেখানে বিভিন্ন ফলের চাষ করিবার কাজে পাহাড়ী লোকদের ব্যবহার করিলাম। তাহাদের মাঝে ইসলামের সৌন্দর্য্য তুলিয়া ধরিলাম এবং তাহাদের ছেলে মেয়েদের পড়াইবার ব্যবস্থা করিলাম।

১৯৬২ সন হইতে সেবামূলক কাজের জন্য কর্মী ট্রেনিং হইতে থাকে। লালবাগ মাদ্রাসায় ফারেগ ছাত্রদের হোমিও ট্রেনিং দিয়া ব্যাগ ও ঔষধ-পুস্তক

www.pathagar.com

দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইল। জনাব ইয়াহইয়া বাওয়ানী উহার জন্য বিরাট অঙ্কের চাঁদা দিলেন এবং তিনিই শিলছড়ির কাজ তদারক করিতেন। সেখানে মসজিদ ও দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করা হইয়াছে। মরহুম জনাব খান সাহেব এই কাজে যথেষ্ট সহযোগিতা করিয়াছিলেন। চট্টগ্রামে বাতিল মতবাদের বিরুদ্ধে তিনি বহু কোরবানী করিয়াছেন, এমন কি তাহার বিখ্যাত হোটেল মেসকায় বিনাখরচে কর্মীদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাহার গাড়ী দ্বারা পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম, কাপ্তাই ও রাঙ্গামাটি যাতায়াত করিতে সুযোগ দিতেন। তাহার বদান্যতার তুলনা হয়না। ১৯৭৩ সনে তিনি ইন্তেকাল করেন। লাভলেইন মসজিদ, লাভলেইন হোমিও দাতব্য চিকিৎসালয় ও কলেজ তাহার অমর কীর্তি। প্রতি বছর সমুদ্রপথে হজ্ব যাত্রীদের সেবার জন্য তিনি মক্কা ও মদীনায় স্বেচ্ছা সেবক পাঠাইতেন।

সূচনালগ্ন হইতেই পাকিস্তানের দুশমনদের দ্বারা ইসলামী জাগরণ বন্ধ করিবার অপচেষ্টায় গোপন তৎপরতা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। আত্মচেতনা ও জাতীয় গৌরববোধ বিরোধী চিন্তাধারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের মাধ্যমে বিস্তার লাভ করিতে থাকে। যার ফলে পরানুকরণপ্রিয়তা ও হীনমন্যতা বোধ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে পাকিস্তান বিরোধী মনোভাব প্রবল হইতে থাকে এবং হায়া-শরম ও শালীনতা লোপ পাইতে থাকে। ছাত্রদের মধ্যে রাজনৈতিক দলের প্রভাব বিস্তারে ছাত্র আন্দোলন তীব্র হইতে থাকে। কলেজ ইউনিভার্সিটি বিদেশী চক্রান্তের শিকারে পরিণত হয়।

পাকিস্তানী শাসকবর্গের মধ্যে ঈমানী চেতনা না থাকায় পাশ্চাত্য অনুকরণ প্রিয়তা বৃদ্ধি পাইয়া এক অসহনীয় পরিবেশের সৃষ্টি হয়। নারী-পুরুষ অবাধ মেলামেশার সুযোগে অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পাইয়া আইন-শৃংখলা ধ্বংসের মুখে পতিত হয়।

এই অবস্থা দেখিয়া ১৯৬৬ সনে মাওলানা শামছুল হক সাহেব সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়া বলেন: পাকিস্তান কোন পথে? যুব সমাজ কোন পথে চলিতেছে? আমাদের ভবিষ্যত বংশধর যুবসমাজ আজ চরিত্রহীন হইতে চলিয়াছে। তাহাদের হাতে ভবিষ্যতে দেশ শাসনের ভার অর্পিত হইলে দেশ ও দেশের স্বাধীনতা ধ্বংস হইতে বাধ্য। জনগণ ও সরকার আলেমদের দোষ দিয়া অপকর্মের রাস্তা সুগম করিতেছিল। অসৎ আলেম ও পীরদের অপকর্মের প্রতিবাদ এবং দেশ হইতে অন্যায় জুলুম ও শরীয়ত পরিপন্থী কার্য বন্ধের জন্য হক্কানী আলেমগণ চাপ সৃষ্টি করেন। ফলে সরকার ঘেষা, স্বার্থপর ও লোভী আলেম এবং নামধারী পীরদের হাতে নিয়া সরকার নানা ছলচাতুরির মাধ্যমে হকের আওয়াজ বন্ধ করিতে চেষ্টা করিতে থাকে। যার ফলে অল্পদিন পরেই পাকিস্তান ভাঙ্গিয়া গেল।

www.pathagar.com

পাক বাহিনী হিন্দুস্তানী বাহিনীর হাতে আত্মসমর্পণ করত: বন্দী হইয়া পড়িল। বাংলাদেশ পাকিস্তানের দুঃশাসন হইতে মুক্তিলাভ করিল। অসংখ্য মূল্যবান জীবন ধ্বংস হইল। ১৯৭১ সনে দেশ স্বাধীন হইল।

ঢাকা হইতে বিদায়ের পূর্বেই ১৯৬৬ সালে হুযুর খুব বেশী অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন। কামরা হইতে মসজিদে যাওয়ার সময় আমার কাঁধে ভর করিয়া জামাতে শামিল হইতেন। আমি বলিলাম, হুযুর আপনার এত চিকিৎসা ও যত্ন হইতেছে, তবুও তো স্বাস্থ্য ভাল হইতেছে না, আপনি নিজে আল্লাহর কাছে দোয়া করুন। ভাল হন না, ডাক্তারগণ রোগ নির্ণয় করিতে পারে না, কি হইল? হুযুর উত্তরে বলিলেন, যদি কোন ব্যক্তির পাঁচ-সাতটা জোয়ান ছেলে থাকে এবং সকলেই উপযুক্ত হয়, তাহার পর যদি ঐ ছেলেগণ বাপের কথা না শোনে, বাপের কথা মত না চলে, তাহা হইলে কি ঐ বাপের সংসারে শান্তি থাকিতে পারে? আমি বলিলাম, না। তখন হুযুর বলিলেন, আমার দিলের মধ্যে আল্লাহপাক মুসলিম কওমের জন্য চিন্তা ও ব্যথা সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন। যাহার দিলের মধ্যে গোটা জাতির চিন্তা থাকে, সে কি করিয়া সুস্থ থাকিতে পারে? উম্মতের চিন্তায় হযরত রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পৃষ্ঠদেশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল- তিনি কখনো নিশ্চিত থাকিতে পারেন নাই, স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিতে পারেন নাই। তাঁর উম্মত হিসেবে জাতির চিন্তা আমাকে কঙ্কালসার করিয়া ফেলিয়াছে।

আমার হাতে হুযুরের লেখা যাবতীয় পান্ডুলিপি ও কুরআন পাকের তাফসীরের কপি প্যাকেট করিয়া দিলেন আর বলিলেন- এইগুলি যত্ন করিয়া রাখিও, তোমাদের কলমে নকল করিয়া রাখিও, খবরদার, কোন লেখা মিটিয়া গেলে বা পোকায় খাইয়া ফেলিলে জীবনেও তাহা আর পাইবে না। আমি উহার একটি কথাও আল্লাহর ইঙ্গিত না পাইয়া লিখি নাই। কোন কপি হারাইয়া গেলে আমার একটি পুত্র সন্তান মারা যাওয়ার শোক হইতে বেশী শোকাতুর হইয়া পড়ি। দেখ নাই! তাফসীরের একটি খাতা হারাইয়া গিয়াছিল, তাহা মাওলানা আজিজুল হক নিয়াছিলেন, তাহার হইতে আবার মাওলানা আবদুল মজিদ সাহেব নকল করিবার জন্য নিয়াছিলেন। শেযে বহু খোঁজাখুঁজির পর কামরাঙ্গীর চরে মাওলানা আবদুল মজিদ সাহেবের ঘরের তাকের উপর ছেড়া অবস্থায় খাতাটি পাওয়া যায়, হুযুরের মেয়ে সুফিয়া স্বপ্নে দেখিয়া ছিল যে, মাওলানা আবদুল মজিদ সাহেবের ঘরে ঐ খাতা আছে। আমি গিয়া উহা তালাশ করিয়া পাই। ছেলেমেয়েরা উহার উপরের কভার ছিড়িয়া ফেলিয়াছিল, কলম দিয়া দাগাইয়াছিল, অযত্নে রাখিয়াছিল। যাহা হউক, হুযুর কত যে খুশী হইলেন! আমাকে বলিলেন, আমি হয়ত আর ঢাকায় আসিতে পারিব না। মাদ্রাসার

www.pathagar.com

কামরায় তাকের উপর তোমার জিম্মায় এই পাণ্ডুলিপিগুলি হেফাজতে রাখিও। খোদা নাখাস্তা আমি যদি মরিয়া যাই, আমার এই লেখাগুলি আমার ছেলে বড় হইলে তাহাদের কাছে দিয়া দিও। আমার কোন উপযুক্ত ছেলে নাই, তোমরাই আমার সন্তান। আমার ছেলেদের উপযুক্ত আলেম বানাইবার জন্য চেষ্টা করিলে আমার রূহ সুখী হইবে। আমার ছেলেরা যেন আলেম হয়, উপযুক্ত হয়।

হুযুরের ইন্তেকালের পর দেশের উপর নানা দুর্যোগ নামিয়া আসিল। পাকিস্তান টিকিল না, অরাজকতার চরম অবস্থা সৃষ্টি হইল, পাক বাহিনী স্বার্থপর অদূরদর্শী আলেমদের হাতে অস্ত্র দিয়া পাকিস্তান রক্ষার চেষ্টা করিল, যার ফলে আল-বদর, রাজাকারগণ মুক্তিবাহিনী মনে করিয়া দেশের বহু লোককে শহীদ করিল। মুক্তিবাহিনীর হাতেও তাহারা বহুসংখ্যক মারা পড়িল।

১৯৭৫ সন পর্যন্ত বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষ বিরাজ করিতেছিল। অসহায় অবস্থায় বহুলোক প্রাণ হারায়। লেখাপড়ার নিরাপদ পরিবেশ ছিল না। হুযুরের বড় ছেলে কিছুকাল বরিশালের মাহমুদীয়া মাদ্রাসায় পড়াশুনা করিলেন। কিন্তু মানসিক দিক দিয়া অস্বস্তি বোধ করিতেছিলেন। এই দিকে খাদেমুল ইসলামের কর্মীগণ তাহাকে সামনে রাখিয়া কাজ করিবার ব্যবস্থা করিল। যার ফলে, উমর ভাইয়ের পড়ালেখা বন্ধ হইবার উপক্রম হইল। আমি তাহাকে পাকিস্তান পাঠাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলাম।

করাচীতে আমার বড় জামাতার পার্টনার আবদুল লতীফ নামে ষ্টক একচেঞ্জের মালিক এক ব্যবসায়ীর নিকট পত্র দিয়া তথাকার খরচের জিম্মাদারী নিলে ১৯৭৫ সনে তাঁহাকে করাচী পাঠাইয়া দিলাম। ছোট ভাই রূহুল আমীন গওহারডাঙ্গায় নিজ বাড়িতে হিফ্য করিতে লাগিল। আল্লাহর অশেষ মেহেরবানী বড় ভাই করাচীতে পড়াশোনা করিয়া পরিপক্ক আলেম হইতে লাগিলেন। এই দিকে ছোট ভাই হিফ্য শেষ করিয়া দরসে নিযামী পড়া আরম্ভ করিলেন। ১৯৮০ সনে ছোট ভাইকে করাচী পাঠাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম।

ঐ সময় পাকিস্তানের বিখ্যাত বোযর্গ হযরত মাওলানা শাহ হাকীম মুহাম্মদ আখতার সাহেবের সোহবতে দীর্ঘদিন থাকিবার সুযোগ লাভ করিয়া পিতার ছিনার মারেফাতের দৌলত হাসিল করিতে ছিলেন। তাহা আমরা জানিতাম না।

১৯৬২ সনে হুযুর যখন তাবলীগুল কুরআন সংস্থা কায়েম করিলেন, তখন কতিপয় যশঃলোভী আলেম ঐ সংস্থায় জুড়িয়া বসিলেন। সেই কারণে নির্বিঘ্নে কাজ করা সহজ হইল না। হুযুরের লেখা বই পুস্তক ছাপাইয়া ব্যাপক প্রচারের কারণে হুযুরের সুনাম সুখ্যাতি বাড়িতে লাগিল। ইহা ঈর্ষার কারণ হওয়ায় পুস্তকাদি ছাপাইতে জটিলতা দেখা দিল।

www.pathagar.com

আমি ঐ সময় হুযুরকে অবস্থা বুঝাইয়া বলিলাম যে, আপনার সম্পূর্ণ নেতৃত্বাধীনে খাদেমুল ইসলাম জামায়াত প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। খাদেমুল ইসলাম পাবলিকেশন্স নাম দিয়া বই পুস্তক এবং হ্যান্ডবিল ছাপাইতে আরম্ভ করিলাম। তখন হুযুর বলিলেন- খাদেমুল ইসলাম একটি ইসলাহী জামাত, ইহার নেতৃত্ব করা সহজ নয়। আলহামদুলিল্লাহ! খুব ভাল চিন্তা করিয়াছ, ইহার নেতৃত্ব করিতে কেহ সাহস করিবে না। ইহার কর্মসূচী বড় কৃচ্ছ্রসাধন ছাড়া বাস্তবায়িত হইবে না। কেননা ইহা ইসলাহী কাজ।

১৯৬৭ সনে তাবলীগুল কুরআন আমরা ছাড়িয়া দেওয়ার কারণে বন্ধ হইয়া যায়। নেতৃত্ব লোভী নেতারা উহা আর চালাইতে পারে নাই। অবশেষে লালবাগ মাদ্রাসা হইতে স্থির সিদ্ধান্ত নেওয়া হইল। মাওলানা শামছুল হক সাহেব আইয়ূব খানকে মন্দ বলিয়াছেন, এই জন্য পশ্চিমা ব্যবসায়ীরা লালবাগ মাদ্রাসায় সাহায্য করিবে না। অতএব লালবাগ মাদ্রাসার প্রিন্সিপ্যালের পদ হইতে তাঁহার এস্তেফা নামা লেখাইয়া আনা হউক। মাওলানা আলী আসগার সাহেবকে ইস্তফানামা লেখাইয়া আনার জন্য গওহারডাঙ্গা পাঠাইল। ১৯৬৭ সনের অক্টোবর মাসে আমি গওহারডাঙ্গায় হুযুরের সোহবতে চিল্লায় ছিলাম।

মাওলানা আলী আসগর সাহেব লালবাগ মাদ্রাসায় প্রথমে লেখাপড়া এবং পরে শিক্ষকতা করেন। নোটিশ নিয়া হুযুরের কাছে পৌঁছাইলে হুযুর নোটিশ পড়েন নাই। শুনিয়া সংগে সংগে বলিলেন, তাড়াতাড়ি আন আমি ইস্তফা দিয়া দেই। আমার কারণে মাদ্রাসার ক্ষতি হইবে কস্মিন কালেও বরদাশত করা যায় না। হুযুর মাদ্রাসা হইতে ইস্তফা দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাবলীগুল কুরআনের সেক্রেটারীর পদ হইতেও ইস্তফা দিলেন।

আমাকে বলিলেন, তাবলীগুল কুরআনের অফিস আমার নামে রাখা ছিল, উহা ছাড়িয়া দিও। আমি যেন তোমাদের ক্ষতির কারণ না হই। খুব বুঝিয়া শুনিয়া চলিবে, চরম ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিবে এবং অবস্থা পরবর্তীতে কি হয় জানাইবে। তোমার চিল্লা শেষ করিয়া ঢাকায় গিয়া কাজ সমাধা করিবে। দ্বীনের খেদমত করা বড় কঠিন। কি চিন্তা করিতেছ জানাইবে।

আমি বলিলাম হুযুর এই সকল হিংসুকদের আপনি মাদ্রাসা ও তাবলীগুল কুরআন সংস্থায় কেন সদস্য করিয়া নিলেন? হুযুর বলিলেন, ইহারা উভয় সংকট। নিয়া চলাও সংকট, বাদ দেওয়াও সংকট। না নিয়া কাজ করিতে পারি না, আবার নিলে বাধার সৃষ্টি হয়। আমার কলিজা চালুনির মত ঝাঁঝরা করিয়া দিয়াছে, তবুও সহ্য করিয়াছি। দ্বীনের কাজ হউক- আমার নাম-কামের প্রয়োজন নাই।

www.pathagar.com

আমি বলিলাম, হুযুর তাহাদের নিকট আমাকে কাজে পাঠান। তাহারা আমার সহিত যে তাচ্ছিল্যের ব্যবহার করিয়া থাকে তাহা অসহনীয়। হুযুর বলিলেন, উহাতে ধৈর্য ক্ষমতা বাড়িবে, যে বাঁকা খুটি ঘরে লাগাইতে পারে না. সে আবার কেমন ছেয়াল (মিস্ত্রী)? ওদের দ্বারা কাজ নিতে হইবে। অতএব অতিষ্ঠ হইবে না। আল্লাহর কাছে জাযা (প্রতিদান) পাইবে।

লালবাগ মাদ্রাসার ম্যানেজিং কমিটির মিটিং ৫নং মগবাজার আয়শা বাওয়ানীর বাড়িতে ইয়াহইয়া বাওয়ানীর তদারকীতে আরম্ভ হইল। ১৯৬৮ সনের জানুয়ারী মাসের ২২ তারিখ সন্ধ্যার পর বিরাট খানার এন্তেজাম হইল। তাবলীগুল কোরআনের আমি মুবাল্লিগ। কাগজ-পত্র আমার হাতে। উহাসহ ইস্তফানামা পেশ করিতে হইবে। মজলিস আরম্ভ হইল। প্রথম নম্বরেই প্রস্তাব আসিল মাওলানা শামছুল হকের ইস্তফানামা গ্রহণ করা হউক।

হাজী ইসহাক, হাজী আবদুল ওয়াহাব সাহেব বলিলেন, মাওলানা শামছুল হক সাহেব অসুস্থ এবং অনুপস্থিত। তিনি কেন ইস্তফা দিতেছেন? তাহার জবানী না শুনিয়া উহা আমরা গ্রহণ করিব না। উহা মূলতবী থাক। ব্যাস, হিংসুকদের মুখ মলিন হইয়া গেল।

দেখা গেল, ঐ বৎসর রমজানে অন্য বৎসরের তুলনায় ২০,০০০ (বিশ হাজার) টাকা বেশী চাঁদা উঠিয়াছে। হুযুর শুনিয়া শুকরিয়া আদায় করিলেন। এইরূপ যত দ্বীনী কাজ করিয়াছেন বাধা-বিপত্তির সীমা ছিল না। তবুও দুর্বার গতিতে হযরত মাওলানা শামছুল হক সাহেব কওম ও মিল্লাতের সর্বমুখী খেদমত আঞ্জাম দিয়া চির স্মরণীয় হইয়া আছেন।

হুযুরের ফকিরী জিন্দেগী

জীবন ভর কৃচ্ছ্রতা সাধনের সহিত সময় অতিবাহিত করিয়াছেন। সকাল বেলায় এক আনার ঘোল ও এক আনার টোস্ট বিস্কুট ছিল তাঁহার নাস্তা। ফজরের পর হইতে সকাল ৯টা পর্যন্ত লেখার কাজে লিপ্ত থাকিতেন। জায়গীর বাড়ির খানা যোহরের পরে আসিত। ঢাকায় কোন জায়গা-সম্পত্তি করেন নাই। ৪৫ বৎসর ঢাকায় কাটাইলেন। কিন্তু বাসাবাড়ি করিলেন না। বলিতেন, "যদি দৌলত লাভ করিবার ইচ্ছা করিতাম তাহা হইলে একখানা সোনার ইট আরেকখানা রূপার ইট দ্বারা বিল্ডিং করিতে পারিতাম। আমি অর্থ উপার্জনের জন্য ইলম শিখি নাই। যাহা করিয়াছি শুধু আল্লাহ তা'আলাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্যই করিয়াছি। জীবনভর মুসাফির থাকিলাম, রোযা রাখিয়া গেলাম- স্থায়ী ঠিকানা আল্লাহর কাছে নিব আর ইফতারও মাওলার কাছে গিয়া করিব।"

www.pathagar.com

ঢাকায় মাদ্রাসা কায়েম

তিনি বলিতেন- আমি যেই সময় ঢাকায় মাদ্রাসা স্থাপন করিয়াছি সেই সময় পদ্মা নদীর উত্তর পাড়ে এবং দক্ষিণ পাড়ে দরসে নিযামীর মাদ্রাসা দেওবন্দের উসূল মতো জারী ছিল না। ঢাকা শহরের কোন মসজিদে সহীহ্ কুরআন শরীফ পড়িবার মতো লোক অর্থাৎ ইমামতির যোগ্য লোক খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না। বিদআতের আমলই বেশী ছিল।

বড় কাটারা আশরাফুল উলূম স্থাপনের পর মাদ্রাসার ছাত্রগণ বিভিন্ন মসজিদে ইমামদের অনুপস্থিতিতে ইমামতি করিতে গেলে তাহাদের আমল-আখলাক ও বিশুদ্ধ কিরাআত পড়ায় সন্তুষ্ট হইয়া মুসল্লীগণ ছাত্রদেরকে ইমাম মোয়াজ্জিন পদে রাখিতেন। আস্তে আস্তে ঢাকার মসজিদসমূহে সুন্নত মতো আমল আরম্ভ হয়। এইরূপে ঢাকা ও তাহার আশপাশের এলাকার মক্তবসমূহে সহীহ কুরআন পাকের তালীম জারী হইতে থাকে।

গওহারডাঙ্গা মাদ্রাসা স্থাপনের পর উত্তর ও দক্ষিণ বাংলায় উহার অনুসরণে মাদ্রাসা স্থাপন হইতে থাকে। তিনি বলেন, আমি তালীম, তাবলীগ ও তাযকীয়ার কাজ দেশে জারী করিতে চেষ্টা করিয়াছি। ভিন্ন মতাবলম্বী আলেমদের সহিত বাহাছ-মোবাহাছা করিয়াছি। কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে ফেরকাবন্দীর ঝগড়া কলহের সুযোগ সৃষ্টি হইতে দেই নাই। কিতাব ও সুন্নাহর আসল হুকুম কিতাবের বহছের দ্বারা নির্ধারণ করিয়াছি।

কাহারও সহিত শত্রুতার সুযোগ হউক এমন কোন কাজ হইতে দেই নাই। মানুষের গুণের কদর করিয়াছি। দোষ সংশোধনের চেষ্টা করিয়াছি। হযরত মাওলানা থানভী (রহঃ)-এর ইসলাহী কিতাবসমূহ বাংলায় তরজমা করিয়া বঙ্গের মুসলমানদের মধ্যে হকের আমল জারী করার চেষ্টা করিয়াছি। 'নেয়ামত' নামক মাসিক পত্রিকার মাধ্যমে জনগণের মধ্যে মাওলানা থানভীর ওয়াজসমূহ বাংলায় তরজমা করিয়াছি। যার ফলে শিরক-বিদআত হইতে মুসলিম কওম সতর্ক হইতে ও সত্যের সন্ধান লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

সাহারানপুর ও দেওবন্দের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া আমি ও জনাব মাওলানা হাফেয মোহাম্মাদুল্লাহ হাফেজ্জী এবং জনাব মাওলানা আবদুল ওয়াহাব পীরজী একত্রে অঙ্গীকার করিয়াছিলাম যে, দেশে গিয়া দেওবন্দের নিয়মে মাদ্রাসা করিবো। ফকিরী জিন্দেগী যাপন করিবো। মাদ্রাসাই হইবে আমাদের থাকার স্থান। নিজস্ব কোন সম্পত্তি করিবো না। আসহাবে সোফ্ফার অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিবো। জিন্দেগীভর মুসাফির থাকিবো। পৈত্রিক ভিটামাটি ঠিকানা থাকিতে সম্পত্তি করিলে মাদ্রাসার জন্যই করিবো। সে অঙ্গীকার পূরণ করিবার উদ্দেশ্যে ঢাকায় কোন সম্পত্তি বা বাসাবাড়ি করি নাই। যাহা করিয়াছি মাদ্রাসার জন্যই করিয়াছি।

www.pathagar.com

মোর্শেদের দরবারে হযরত সদর সাহেব

"হযরত সদর সাহেব বলেন : হাকিমুল উম্মত মুজাহিদুল মিল্লাত হযরত মাওলানা শাহ্ আশরাফ আলী থানভী চিশতির (রহঃ) সোহবতে যাওয়ার সুযোগ হইবার পর হইতে শিক্ষা জীবনে প্রতি বৃহস্পতিবার দেওবন্দ হইতে থানা ভবনের দিকে ১৮মাইল পথ হাঁটিয়া গিয়া হযরতের খেদমতে উপস্থিত হইতাম। শুক্রবার থাকিয়া মজলিসে নসিহত শুনিয়া রাত্রে বিদায় হইয়া আধারাস্তা অতিক্রম করিয়া কোন গাছের নিচে বিশ্রাম নিয়া ফজরের পূর্বে দেওবন্দ হাযির হইয়া সবকে উপস্থিত হইতাম। এইরূপে ইছলাহের জন্য মাদ্রাসা বন্ধের সময় থানাভবন গিয়া থাকিতাম।

শিক্ষা জীবনে একটানা আট বৎসর পর্যন্ত বাড়িতে আসি নাই। কেননা ইংরেজী পড়া ছাড়িয়া পিতার সম্মতি ব্যতীত দ্বীনী এলেম শিক্ষার জন্য বাড়ি হইতে বাহির হইয়াছিলাম। মায়ের নিকট বলিয়া বিদায় হইলাম। মায়ের হাতে মাত্র পাঁচ টাকা ছিল, সেই টাকা দিয়া দিলেন এবং দোয়া করিয়া বিদায় দিলেন।

পায়ে হাঁটিয়া খুলনা পৌঁছিলাম। অতঃপর ট্রেনে কলিকাতা পৌঁছিলাম। পূর্বে কলিকাতায় লেখাপড়া করিয়াছিলাম, এই জন্য চুপে হাওড়া স্টেশনে পৌঁছিলাম। হযরত মাওলানা থানভী (রহঃ)-এর সহিত এর কিছু দিন পূর্বে কলিকাতায় সাক্ষাত করিয়া দোয়া চাহিয়াছিলাম। এলমে দ্বীন শিক্ষার জন্য তিনি দোয়া করিয়াছিলেন এবং নিজের ঠিকানা লিখিয়া দিয়াছিলেন। হযরত মাওলানা থানভী তখন বার্মার মান্ডলা যাইতেছিলেন। ঐ সময় সাক্ষাৎ করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল।"

হাওড়া স্টেশনে পৌঁছিয়া ভাবিতেছিলেন হাতে মাত্র তিন টাকা আছে। তখন সাহারানপুরের ভাড়া নয় টাকা ছিল। কি করিয়া যাইবেন? আল্লাহর নিকট কান্নাকাটি করিতেছিলেন। এমন সময় লাহোরের এক ব্যবসায়ী অতি ব্যস্ততার মধ্যে তাহার তেজারতের লাগেজ বহন করিতে পারিতেছিলেন না। গাড়ি ছাড়িবার মাত্র ১০ মিনিট বাকি ছিল। মালামাল বুক করিতে বিলম্ব হইতেছিল। এমন সময় হযরত মাওলানা শামছুল হক সাহেব তাহাকে উর্দূতে বলিলেন, "কিয়া আপ কো কোঁই মদদ্ কী জরুরত হ্যায়?" তখন তিনি বলিলেন, স্টেশনের কেরানী ইংরেজ। আমার কথায় কর্ণপাত করে না। মাল বুক করাইতে পারিতেছি না। তৎক্ষণাত হুযুর ইংরেজী ভাষায় ঐ ক্লার্ককে বলিয়া উক্ত ব্যবসায়ীর মালামাল বুক করাইয়া দিলেন।

লাহোরের উক্ত ব্যবসায়ী হুযুরের পরিচয় জানিতে চাহিলেন। হুযুর বলিলেন, আমি থানা ভবনে হযরত মাওলানা আশরাফ আলী সাহেবের নিকট এলেম

www.pathagar.com

হাসিলের জন্য যাইতেছি। নিজের কোন হাজতের কথা বলেন নাই, কিন্তু ঐ ব্যবসায়ী ২৫টি রৌপ্য মুদ্রা দিয়া বলিলেন, নিন ইহা আপনাকে হাদিয়া হিসাবে পেশ করিলাম। আপনি কবুল করুন। আপনি তালেবে ইলম। আপনাকে মদদ্ করিবার সৌভাগ্য আমার হইল। ব্যাস গায়েবী মদদ হইল। নির্বিঘ্নে টিকেট ক্রয় করিয়া থানা ভবন পৌঁছিলেন। হযরত থানভী (রহঃ) কিছুদিন নিজের সোহবতে রাখিয়া পরে সাহারান পুর মাজাহেরে উলূম মাদ্রাসায় ভর্তি করাইয়া দিলেন।

দীর্ঘ আট বৎসরে বাড়ি হইতে কোন খরচ দেওয়া হয় নাই। কারণ হুযুরের আব্বা সাহেবের ইচ্ছা ছিল- ইংরেজী পড়া শেষ করিয়া আইন শাস্ত্র পড়িয়া বৃটিশের বিরুদ্ধে এই ছেলে সংগ্রাম করিবে, কিন্তু সেই আশা পূরণ হইল না। মেট্রিক পরীক্ষা তাহাও তাচ্ছিল্লের সহিত উত্তর লিখিয়া পরীক্ষা দিলেন। মনে করিয়াছিলেন যে, ফেল করিলেই মাদ্রাসায় পড়ার রাস্তা সুগম হইবে। ঐরূপ মাত্র এক ঘন্টা প্রশ্নোত্তর লিখিয়া হল পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তাহার ফল বাহির হইল, স্বর্ণ পদকসহ লেটার পাইয়া পাশ করিলেন। এই মেধাবী ছাত্রকে শেষ পর্যন্ত না পড়াইয়া কি মা-বাপের তৃপ্তি হয়? এই জন্য সম্পূর্ণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাহার পরই জীবনের মোড় পরিবর্তন করিবার সুযোগ হইল।

দীর্ঘ আট বৎসরে সকালে নাস্তা খান নাই। মাদ্রাসার রুটি ও মাদ্রাসার পক্ষ হইতে পাওয়া জামা-পায়জামা দ্বারা প্রয়োজন মিটাইয়াছেন। কস্মিনকালেও কোন সাহায্য কাহারো নিকট পাওয়ার আশা করাতো দূরের কথা অভাবের কোনরূপ প্রকাশ করেন নাই। সম্পূর্ণ বেনিয়াজীর সহিত কাটাইয়াছেন।

আধ্যাত্মিক সাধনায় কঠোর মোজাহাদা

একদিন দেওবন্দ হইতে কিছু রুটির টুকরা যাহা তাহার খাবার পরে বাঁচাইয়া রাখিতেন উহা পুটুলীতে বাধিয়া থানা ভবন নিয়া গিয়া (ময়মনসিংহের বড় মসজিদের ইমাম) মাওলানা ফয়জুর রহমান সাহেব যেই মসজিদে ইমামতি করিতেন, থানা ভবনের সেই মসজিদে গিয়া উঠিলেন। বর্ষার মৌসুম ছিল। সকালবেলা রৌদ্র উঠার পর ছাদে উঠিয়া চৌকি বিছাইয়া গামছা ভিজাইয়া উক্ত রুটির টুকরাগুলির ছাতলা মুছিয়া শুকাইতে দিয়াছিলেন। এমন সময় মাওলানা সাহেব ছাদে উঠিয়াছিলেন। তৎক্ষণাৎ হুযুর গামছা দিয়া রুটির টুকরাগুলি ঢাকিয়া ফেলিলেন।

পরে ঐ ইমাম সাহেব বলিলেন, আচ্ছা ভাই আপনি এত কষ্ট করেন কেন? আমার জন্য মহল্লা হইতে দুইটি রুটি আসে উহার একটিতেই আমার যথেষ্ট

www.pathagar.com

হয়। আপনি আমার একটি রুটিতো খাইতে পারেন। হুযুর বলিলেন, না! খাইতে পারিনা। কেননা যদি আমার মোর্শেদ হযরত মাওলানা থানভী জানিতে পারেন যে, আমি গায়রুল্লাহর দরজায় হাজত পূরণ করিতেছি, তাহা হইলে সমস্ত ফয়েজ ও বরকত বন্ধ হইয়া যাইবে। আমার নিজস্ব শুকনা রুটির টুকরা আমার সম্বল। আল্লাহ পাক যখন যে অবস্থায় রাখেন তাহার উপরই সন্তুষ্ট আছি। আমি তো আল্লাহর গায়েবী মদদে থানা ভবন পৌঁছিয়াছি। আমার তো কোন প্রকার যাহেরী আসবাব উপকরণ কিছুই ছিল না। আপনি মানসিক কষ্ট করিবেন না। আমার সম্পর্কে নিশ্চিত থাকুন।

এই কথাগুলি হযরত মাওলানা ফয়জুর রহমান সাহেব আমার নিকট বলিয়াছিলেন ১৯৮৩ খৃষ্টাব্দে আমি যখন করাচীর বিখ্যাত বুযুর্গ আলিম, সিলসিলায়ে থানভীর মুখপাত্র আরেফ বিল্লাহ হযরত মাওলানা হাকীম মোহাম্মাদ আখতার সাহেবকে নিয়া ময়মনসিংহ বড় মসজিদে গিয়াছিলাম। তখন হযরতের বয়ান শুনিয়া বলিয়াছিলেন যে, মনে হয় থানা ভবনে পুনরায় আসিয়াছি এবং মাওলানা থানভী (রহঃ) বয়ান করিতেছেন।

ভাই ফজলুর রহমান, তোমার পীর মাওলানা শামছুল হক সাহেবের মোজাহাদার একটি কাহিনী শোনাইতেছি। আমি যখন থানা ভবনে পড়ি তখন একটি মসজিদে আমার জায়গীর ছিল। তোমার ওস্তাদ ও পীর মাওলানা শামছুল হক সাহেব ছাত্র জীবনে প্রতি বৃহস্পতিবার দেওবন্দ হইতে থানা ভবন পৌঁছিয়া আমার মসজিদে আসিয়া ক্লান্তি দূর করিয়া হযরত থানভীর (রহঃ) মজলিসের সময় গিয়া সাক্ষাত করিতেন এবং সেখানেই থাকিতেন। একদিন আমি তাহাকে রুটির ছাতলা পড়া টুকরাগুলি শুকাঁইতে দেখিয়া ফেলিয়াছিলাম। এই জন্য তিনি বড়ই বিব্রতবোধ করিতেছিলেন। তখন আমার খানা তাহাকে দেওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি কবুল করেন নাই। আজ তুমি সেই থানা ভবনের পরিবেশ পুনরায় আমাদিগকে দেখাইয়াছ, তোমাকে ধন্যবাদ।

সুলূকের খেদমত

হযরত মাওলানা শামছুল হক সাহেবের নিয়ম ছিল লোকদিগকে বই-পুস্তক পড়াইয়া সুলূক ও তরীকতের গুরুত্ব আগে বুঝাইয়া খাঁটি আশেক হইলে পরে মুরীদ হওয়ার সুযোগ দিতেন। তিনি বলিতেন- মুরীদ হওয়া জরুরী নহে- ইসলাহ করা জরুরী ফরজ। কেহ মুরীদ হইতে আসিলে নিজে মুরীদ না করিয়া হযরত হাফেজ্জীর নিকট যাইয়া মুরীদ হইতে বলিতেন। হুযুরের নির্দিষ্ট কঠিন মোজাহাদায় উত্তীর্ণ হওয়া বড়ই কঠিন মনে করিয়া সাধারণত তাঁহার কাছে লোক আসিতে সাহস করিত না।

www.pathagar.com

তিনি প্রায়ই বলিতেন আমি প্রথমেই ইংরেজী শিক্ষা করিয়া পরে দ্বীনী এলেম শিক্ষা করিয়াছিলাম। এই জন্য ইংরেজী শিক্ষার বিযক্রিয়া দূর করিতে বহু সাধনা করিয়াছি। মাওলানা থানভীর (রহঃ) সোহবতে থাকিয়া এক একটি ত্রুটি সংশোধন করিতে চিল্লা দিতে হইয়াছে। জীবনে মানুযের চরিত্রে যেই সকল ত্রুটি প্রকাশ পায় উহার প্রত্যেকটির জন্য ভিন্ন ভিন্ন মোজাহাদা করিয়াছি। প্রতিটি লোমকূপের গোড়ায় অপারেশন করিলে যেই রূপ অবস্থা হয় আমি নিজেকে সেইরূপ অপারেশন করাইয়াছি।

তিনি হযরত থানভীর (রহঃ) খেদমতে সুদীর্ঘ ২২ বৎসর ছিলেন। যত দিন হযরতের হায়াৎ ছিল কোন রমজানে দেশে থাকেন নাই। শাবানের ২০ বা ২২ তারিখে মাদ্রাসার দায়িত্ব পূরণ করিয়া থানা ভবনে হাজির হইয়াছেন। হযরতের খেদমতে পূর্ণ রমজান অতিবাহিত করিয়া ঈদের পরে ৬ই শাওয়াল দেশে ফিরিয়া ১০ই শাওয়াল মাদ্রাসায় হাজির হইয়া মাদ্রাসার নেজাম পরিচালনা করিয়াছেন। এমন কি হযরত থানভীর (রহঃ) ইন্তেকালের সময়ও তাঁর সোহবতে হাজির ছিলেন মওতের সুন্নাত তরীকা দেখার জন্য। যখন হযরতের ইন্তেকাল হইতেছিল- তখন তাঁহার নিকট প্রচন্ড ভীড় হইতে ছিল। হযরত এরশাদ করিলেন, যাহাদের নাম বলিলে আমি চিনি তাহাদিগকে নিকটে আসিতে অনুমতি আছে। অন্য কেহ যেন ভীড় না করে।

পায়ের দিক হইতে কোমর পর্যন্ত অচেতন হইল, তখনও কথা বলিতেছিলেন তবে ইশারায়। জবান বন্ধ হইয়া যাইতেছে, কিন্তু কলবে আল্লাহর যিকির জারী আছে। বলিলেন, তোমরা কলেমার যিকির করিতে থাক। কিছুক্ষণ পরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিবার সময় উচ্চস্বরে বলিলেন, আল্লাহুম্মাগ ফিরলী ওয়ার হামনি ওয়াল হিকনি বির রফিকিল আ'লা। আল্লাহুম্মা--- রফিকুল আ'লা তিন বার উচ্চারণ করিবার পর প্রাণ বায়ূ বাহির হইয়া গেল। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

হযরত সদর সাহেব বলিলেন, তোমরা আমার জন্য দোয়া কর আমার যেন সুন্নত তরীকায় মউত হয়।

আমরা হযরতের লিখিত পুস্তক সমূহ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে প্রচারের ফলে তাহার নিকট দলে দলে লোক ইসলাহের জন্য আসিতে আরম্ভ করিল। তিনি বহু পূর্ব হইতেই গওহারডাঙ্গার মসজিদের দক্ষিণ পাশে খানকাহ্ স্থাপন করিয়াছিলেন। সেখানে কোন সময় এনফেরাদি (পৃথকভাবে) আবার কোন সময় ইজতেমায়ি (সমষ্টিগতভাবে) নসিহত ও হেদায়েত করিতেন। কিন্তু মজলিস করিয়া যিকির-ওজিফার তালীম দিতেন না। তরীকতের তালীম-তরবীয়তে গোপনীয়তা অবলম্বন করিতেন।

www.pathagar.com

সালেকীন যখন তাঁহার খেদমতে জামাত বন্দী হইয়া আসিত তখন তিনি আসরের পরে আম মজলিস করিতেন এবং মাগরিবের পর ভিন্ন ভিন্ন ভাবে হালকা শুনিতেন এবং ইসলাহ করিতেন। শেষরাতে তাহাজ্জুদের পর সালেকদিগকে ইসলাহী বয়ান শুনাইতেন। তখন মনে হইত আমার দোষগুলি সবই হুযুর জানিয়া আমাকে হেদায়েত করিতেছেন। এমনকি যার যে প্রশ্ন থাকিত ঐ বয়ানে সকলের প্রশ্নের জওয়াব হইয়া যাইত। ইহা হযরতের কারামত ছিল। সোহবতে যে আসিয়াছে তালেবে ছাদেক (ধন্য) হইয়া গিয়াছে।

আমি ছাত্র জীবনে পটিয়া মাদ্রাসার বার্ষিক জলসায় যাইতাম। মাদ্রাসার মসজিদে শেষ রাতে তাহাজ্জুদের পর ইজতেমায়ী যিকির হইত। ইজতেমায় সবাই যার যার আমল ভিন্ন ভিন্ন করিত, কিন্তু কাহারো কোন খলল (ক্ষতি) হইত না। সে যে কি অপূর্ব দৃশ্য! রোনাজারীর সহিত যিকির! যাহা দেখিলে পাষাণ হৃদয়ও গলিয়া যাইত। আমার প্রাণে যিকিরের শওক, আমার আব্বাজান মরহুমের আহাজারী হইতে অঙ্কিত হইয়াছিল। চট্টগ্রামে পড়ার জামানায় হযরত মাওলানা মুফতী আজিজুল হক সাহেব (রহঃ)-এর বয়ান ও যিকির আমাকে পাগল করিয়াছিল, কিন্তু সুলুকের রাস্তা অতিক্রম করিতে হয় কিরূপে কিছুই জানা ছিল না। ১৯৪৭ সন হইতে হযরত সদর সাহেব কিছু কিছু তালীম দিতে লাগিলেন। ইসলাহী পত্রাদি লেখা আরম্ভ করিলাম।

১৯৬২ সন হইতে হুযুরকে অনুরোধ করিতেছিলাম, যিকিরের মজলিস করিয়া তালীম-তরবিয়তের ব্যবস্থা করিতে। কিন্তু, হুযুর কোন জওয়াব দেন নাই। এই দিকে অন্যান্য পীর সাহেবগণ মজলিস করিয়া যিকির করিতেছেন। তাহাদের জামাতও শক্তিশালী হইতে লাগিল। আমি বারবার হুযুরের খেদমতে যিকির শিক্ষা দেওয়ার জন্য মজলিস করিতে দরখাস্ত করিতেছিলাম। কিন্তু তিনি কোন উত্তর দেন নাই।

১৯৬৫ সনের নভেম্বর মাসে হুযুর গওহারডাঙ্গায় ছুটিতে গিয়াছিলেন। আমি তখন পার্বত্য চট্টগ্রামে দ্বীনের প্রচারের জন্য শিলছড়ি ছিলাম। হুযুরের খেদমতে পত্র লিখিলাম, "হুযুর আমাকে আপনি জঙ্গলে পাঠাইয়া দিয়াছেন। আপনার সোহবত হইতে বহু দূরে আছি। আমার মন টিকিতেছে না, প্রাণে অস্থিরতা বোধ করিতেছি। কোন পীরভাইও কাছে নাই, সর্বদা আপনাকে দেখিবার জন্য প্রাণ কাঁদে, আপনার কাছে আসিতে অনুমতি প্রার্থণা করিতেছি। '৬২ সন হইতে '৬৫ সন পর্যন্ত রাজশাহীর চর অঞ্চল হইতে ময়মনসিংহের গারো এলাকা এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের উত্তর পূর্বাঞ্চল হইয়া বান্দরবন পর্যন্ত প্রচার কাজে নিয়োজিত ছিলাম।

পার্বত্য চট্টগ্রামে কাজ করা কঠিন ছিল। আমাদিগকে ওহাবী আখ্যা দিয়া শেরে বাংলা মাওলানা আজিজুল হক সাহেবের শিষ্যগণ বাধাবিঘ্ন সৃষ্টি করিত।

www.pathagar.com

কাজ করিতে দিত না। তাহাদের দ্বারা মাইনি মুখ মসজিদে একবার বিপদের সম্মুখীন হইয়াছিলাম। হুযুর গওহারডাঙ্গায় আসিয়া বিস্তারিত রিপোর্ট শোনাইতে অনুমতি দিলেন। আর লিখিলেন পাহাড়ী অঞ্চল গুনাহমুক্ত এলাকা। এই দিকে গোনাহ বেশী, মনে অশান্তি বোধ করিলে তাজা ওযু করিয়া নফল নামায পড়িয়া খুব জোরে আল্লাহর যিকির করিয়া গাছ-পালা ও জীবজন্তুদের আল্লাহর যিকির শোনাইয়া সাক্ষী বানাইয়া লইও। পাহাড়ের পাথর হইতে পানি নির্গত হইয়া প্রবাহিত হইয়া নদীর সৃষ্টি হইতেছে। আল্লাহর ভয় ও এশকে পাহাড় কাঁদে, তুমিও কাঁদিয়া কাঁদিয়া আল্লাহর মহব্বত বাড়াও।

আল্লাহর থেকে যিকিরের মজলিসের মজমুন লাভ

কিছুদিন পরে আমি ঢাকা হইয়া গওহারডাঙ্গায় আসিলাম। হুযুরের সহিত সাক্ষাত করিলাম, তৎক্ষণাৎ হুযুর বলিলেন, তাড়াতাড়ি হাজীগঞ্জের হুযুরের কাছে যাও। আল্লাহ একটি জিনিস দান করিয়াছেন। তাহাকে দেখাইয়া দিয়া সাফ করিয়া লেখাইয়া আন। কি জিনিস তাহা বলিলেন না। আমি দৌড়াইয়া হাজীগঞ্জের হুযুর মাওলানা আব্দুল হাফিয সাহেবের নিকট গিয়া বলিলাম, হযরত সদর সাহেব আপনার নিকট আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। কি একটি নিয়ামত নাকি দেখাইয়াছেন? তাহা দিয়া দিন। তিনি বলিলেন, এখনো পরিষ্কার করিয়া লিখি নাই। হুযুরের নিকট সংবাদ দিলাম এখনো সাফ করিয়া লেখেন নাই। হুযুর বলিলেন বার বার যাও তাগিদ দিতে থাক। লেখাটা নিয়া আসিলাম। অতঃপর বলিলেন, বহুদিন যাবত চিন্তা করিতেছিলাম। যিকিরের মজলিস সম্পর্কে কি পদ্ধতি অবলম্বন করা যায়। আল্লাহ পাকের শোকর আমার দিলের মধ্যে যিকিরের মজলিসের মজমুন আল্লাহপাক ঢালিয়া দিয়াছেন।

আলহামদুলিল্লাহ। তাহার পর তাফসীরের মজলিস নাম দিয়া বিশিষ্ট আলেমদিগকে গওহারডাঙ্গায় ডাকাইলেন। মজলিস আরম্ভ হইল, যশোরের মুহাদ্দেস মাওলানা আবুল হাসান যশোরী উপস্থিত হইলেন। মাগরিবের পরে যশোরের মুহাদ্দেস সাহেবের বয়ানের জন্য সময় নির্ধারণ হইল। হুযুর খানকায় তাশরিফ রাখিলেন, আমাকে বলিলেন, যিকিরের মজলিসের মজমুনটা মুহাদ্দেস সাহেবকে দেখাও। আমি নিয়া দেখাইলাম। তিনি মাগরিবের পর হইতে ঐ নকশা অনুযায়ী যিকিরের মশক করাইতে লাগিলেন। সভামঞ্চ হইতে বার বার তাগিদ হইতেছিল তাফসীরের মজলিসে মোফাস্সেরে কুরআন আলেমগণ অপেক্ষা করিতেছেন। তাহাদের তাফসীর করিতে সময় দেয়া হউক।

আমি হুযুরের কাছে গিয়া বলিলাম, হুযুর হুকুম করিলেন পুরা মজমুন শেষ করিতে বল। মোহাদ্দেস সাহেব উহা অবলম্বনে দীর্ঘ সময় বার তসবীহ্‌র যিকির

www.pathagar.com

মশ্‌ক করাইলেন। সে যে কি অপূর্ব দৃশ্য! রোনাজারী ও আল্লাহর এশকের বহিঃপ্রকাশ তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। সভা খতম হইয়া গেল, মোহাদ্দেস সাহেব নেয়ামত পাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে হুযুরের দুইপা জড়াইয়া ধরিয়া বেহুশ প্রায় হইলেন। হুযুর সান্ত্বনা দিলেন এবং আলেমদের বলিলেন, আপনারা আল্লাহর মোহব্বত শিখুন। মোহাদ্দেস সাহেবকে অবজ্ঞা করিবেন না। তাঁহাকে আল্লাহ পাক মোহাব্বতের দৌলত দিয়াছেন। উক্ত মজমুন প্রশ্নোত্তরে তাসাউফ নামক কিতাবে ছাপাইয়া প্রকাশ করিয়াছি। এইভাবে যিকিরের মজলিস করিতে হুযুর আদেশ দিয়াছিলেন।

হুযুর বলিলেন, তোমরা যাহারা আলেম আছ, তাহারা আল্লাহর মহব্বতের ইলম অর্থাৎ তরীকতের ইলম শিখ না শুধু কতগুলি মাসয়ালা মুখস্ত করিয়া লোকদিগকে শুনাও, তোমাদের কাছে মানুষ কতগুলি মাসআলা শুনিয়া থাকে। আল্লাহ-মহব্বতের রস তোমাদের মধ্যে নাই। এই কারণে লোকেরা বিদআতীদের শিকার হয়। মানুষের মনের মধ্যে আল্লাহর মহব্বত আছে, তাহা না হইলে তাহারা তাহাদের জান-মাল বিদআতীদের কাছে গিয়া কেন খুয়ায়?

যিকিরের মজলিসের নকশা নিয়া সর্বত্র উহার প্রচার করিতে লাগিলাম। হুযুর ঢাকায় তাশরীফ আনিলেন। লোকেরা যিকির শিক্ষার জন্য সময় চাহিলে হুযুর বলিলেন, রবিবার সরকারী ছুটি। অতএব সরকারী কর্মচারীগণের জন্য শনিবার বৈকালে মজলিসের সময় নির্ধারণ করা হউক।

লালবাগ শাহী মসজিদে প্রতি শনিবার যিকিরের মজলিস হইতে আরম্ভ হইল। আছরের পরে মালফুজাত (আধ্যাত্মিক বাণী) শুনান এবং বাদ মাগরিব যিকিরের মশ্‌ক হইতে লাগিল। হুযুর দুর্বলতা বশতঃ উচ্চস্বরে কথা বলিতে অপারগ হওয়ায় আমি, মাওলানা সালাহুদ্দীন সাহেব ও মাষ্টার আবদুল হক হুযুরের ডানে বামে ও পিছনে দাঁড়াইয়া কথাগুলি লোকদিগকে বুঝাইয়া দিতেছিলাম।

যিকিরের মজলিসে বহু লোকের হাল গালেব হইতে লাগিল। মুহাদ্দিসীনে কেরাম ও শিক্ষকবৃন্দ উহাতে শরীক হইয়া বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইলেন। যিকিরের তালীম লওয়ার পর আমি চট্টগ্রামে যাইব। সেইখান হইতে উত্তরাঞ্চল ঘুরিয়া আবার ঢাকায় ফিরিবার প্রোগ্রাম হইল।

হুযুর আমাকে বলিলেন, চট্টগ্রামে যেই বাধার সৃষ্টি হইতেছে, তুমি প্রচার করিতে পার নাই। তুমি শেরে বাংলা আজিজুল হকের নিকট যাও আর আমার কথা বলিয়া পরিচয় দিয়া কাজে লাগ। আমি হতবাক হইয়া বলিলাম, হুযুর সে-ইতো বিদআতিদের মূল ব্যক্তি। হুযুর বলিলেন, যাও তুমি। আমার পরিচয় দিয়া

www.pathagar.com

সাক্ষাত কর। আমার কৌতূহল জাগিল জানার জন্য। তাহার সহিত হুযুরের সম্পর্ক কিরূপে, সে তো ওহাবী বলিয়া আমাদের অকথ্য গালাগালি করে।

হুযুর বলিলেন, চট্টগ্রামের আহ্‌লে হক আলিমদের দূরদর্শিতার অভাব আছে। তাহারা শেরে বাংলা আজিজুল হকের বিরূদ্ধে ফতোয়া দিয়া তাহাকে ক্ষেপাইয়া তুলিয়াছে, তাহা না হইলে তাহার মধ্যে আল্লাহর মহব্বত আছে। আল্লাহর রসুলের এশ্‌ক গালেব। মদীনা শরীফের রওজা শরীফে তাহাকে যেভাবে সালাম পাইতে দেখিয়াছি, তাহা বড়ই করুণ, একত্রে চা-পানি খাইয়াছি। আমার সহিত মহব্বত আছে। আমি গিয়া তাহার চট্টগ্রামে আস্‌কার দীঘির পাড়ে বসিয়া সাক্ষাত করিয়াছি। তিনি বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, মাওলানা শামছুল হক সাহেব সুন্নী ও হক্কানী আলিম। আর সকলে দেওবন্দী।

তিনি খুব মেহমানদারী করিলেন আর আমার অভিযোগ শুনিয়া বলিলেন, "যান আপনি সমস্ত পার্বত্য চট্টগ্রামে মাওলানা শামছুল হক সাহেবের এই তাবলীগ ব্যাপক প্রচার করুন।" আমি আমার লোকজনকে বলিয়া দিব, আপনার সহিত কেহ কোনরূপ অভদ্র ব্যবহার করিবে না।

বাস্তবিকই পার্বত্য এলাকায় কোন আহলে হক আলিমগণ মাহফিল করিতে পারিত না। তলওয়ারে বাঙ্গাল নামক শেরেবাংলা আজিজুল হকের খলীফা পার্বত্য এলাকার সর্বত্র বিচরণ করিত। আমাদের সম্পর্কে বলিয়া দেওয়ার পর আর কোন বাধা বিঘ্ন সৃষ্টি হয় নাই।

অতঃপর হযরত মাওলানা শামছুল হক, মুফতী দ্বীন মোহাম্মাদ, হযরত মাওলানা যাফর আহমাদ উসমানী, মাওলানা আজিজুল হক ও মাওলানা আব্দুর রহমান প্রমুখকে রাঙ্গামাটি নিয়া বিরাট মাহফিল করাইতে সক্ষম হই। তাহারা সকলেই কাপ্তাই হইয়া লঞ্চ যোগে রাঙ্গামাটি সফর করেন।

হযরত সদর সাহেব (রহঃ) কওমী মাদ্রাসা সমূহকে একতাবদ্ধ করিবার জন্য বেফাকুল মাদারিস সংস্থা করার উদ্দেশ্যে হাটহাজারী, পটিয়া ও জিরি সফর করেন। কওমী মাদ্রাসা শিক্ষার মান উন্নয়ন ও সর্ব প্রকার বেদ্বীনী প্রভাব হইতে দরসে নেযামীর হেফাযত কল্পে একতাবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন উপলব্ধি করিলেন এবং চট্টগ্রামের আলিমগণকে এই বিষয়ে অবগত করাইলেন।

১৯৬৬ সনে নভেম্বর মাসে পশ্চিম পাকিস্তানের রাওয়াল পিন্ডির দেওয়াল শরীফের পীরকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মাশায়েখ সম্মেলন কর্তৃপক্ষ দাওয়াত করিয়া আনিয়াছিলেন। ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান ঐ পীরের ভক্ত ছিলেন। এই জন্য ঢাকায় গভর্ণর মোনএম খানের রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসাবে গভর্ণর হাউজে দেওয়াল শরীফের পীর সাহেবকে স্থান দেওয়া হইল। তিনি শর্ষিণার পীর

www.pathagar.com

সাহেবের দাওয়াত গ্রহণ করিলেন। শর্ষিণার মাহফিলে জেনারেল আইয়ূব খানও আসিলেন। মোনএম খানও ঐ সভায় দেওয়াল শরীফের পীরের সহিত যোগদান করিলেন। মাশায়েখ সম্মেলন আহলে-হক ওলামায়েকেরামকে বাদ দিয়া গঠন করা হইয়াছিল। শরীয়ত বিরোধী কুখ্যাত পারিবারিক আইন পাশ করার পর আহলে হকের বিরোধিতার সম্মুখে সরকারের টিকিয়া থাকা দুষ্কর হইয়া পড়িয়াছিল। সরকার মাশায়েখ সম্মেলনের ছত্রছায়ায় পারিবারিক আইন টিকাইয়া রাখিতে সমর্থ হয়। শর্ষিণার সভা হইতে এই আইনের সমর্থন নেওয়াই ছিল প্রধান উদ্দেশ্য।

শর্ষিণায় কি হয় জানিবার জন্য আমাকে হুযুর যাইতে বলিলেন। দেওয়াল শরীফের পীরের খাদেম সাজিয়া যাওয়ার পরামর্শ দিলেন। গভর্ণর হাউজে (বঙ্গভবন) যাইয়া পীর সাহেবের সহিত সাক্ষাত করিলাম। তাঁহার একান্ত ভক্ত হইয়া সঙ্গী হিসাবে শর্ষিণা যাওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করিলাম। পীর সাহেব বলিলেন, "আমি তো শর্ষিণার পীর সাহেব ও গভর্ণর সাহেবের সহিত একত্রে প্লেনে যাইব। আপনি আমার সহিত যাইতে পারিবেন না। তবে হাঁ আমার সঙ্গী-সাথী ও খাদেমগণ জাহাজে যাইবে। তাহাদের সহিত আপনি যাইতে পারিবেন।

আমি বলিলাম, আমাকে তাহাদের সহিত খাদেম হিসাবে যাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিন। তখন মোনায়েম খানকে দেওয়াল শরীফের পীর সাহেব আমাকে তাঁহার খাদেমদের সহিত একত্রে যাওয়ার জন্য ব্যবস্থা করিতে বলিলেন এবং নারায়ণগঞ্জ মেরী এন্ডার সন প্রমোদ তরীতে উঠাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করিলেন। মোনয়েম খানের গাড়িতে উঠিয়া নারায়নগঞ্জের মেরী এন্ডারসনে পৌঁছিলাম। লিখিত কাগজ নিয়া দলের লিডার ওমর উদ্দীন সাহেবের হাতে দিলাম। ওয়াপদার কাউখালী নামক লঞ্চ মেরী এন্ডারসনকে টানিয়া নিতে লাগিল। শেযরাতে শর্ষিণা পৌঁছিলাম। নদীর মধ্য পর্যন্ত জেটি বাধা হইয়াছে। আমাদের মেহ্মান খানায় নেওয়া হইল। সেখানে দেওয়ালের পীর সাহেব কিছুক্ষণ পূর্বে সী-প্লেন যোগে পৌঁছিয়াছেন। বেলা একটায় আইয়ূব খান পৌঁছাইবেন। যোহরের নামায পড়ার পূর্বেই বক্তৃতা শেষ হইল। "সদরে মামলেকাতের হুকুম মান্য করা অপরিহার্য কর্তব্য। ইসলামী হুকুমাতের সদরের হুকুম মান্য করা কর্তব্য, অতএব পারিবারিক আইন গ্রহণ করিতে হইবে, উহার খেলাপ করা যাইবে না।" এই আলোচনা বিশেষ বৈঠকে হয় এবং সাধারণ সভায় সমর্থন নেয়া হয়। প্রেসিডেন্ট আইয়ূব শর্ষিণা মাদ্রাসায় তিন লাখ টাকা দান করিলেন। ঢাকায় আসিয়া সব কথা হুযুরকে জানাইলাম। হুযুর মনে বড় ব্যথা পাইলেন।

হযরত সদর সাহেবের এন্তেকালের এক বৎসর পূর্বে অসুস্থাবস্থায় গওহারডাঙ্গায় ছিলেন। তখন শর্ষিণার পীর মাওলানা আবু যাফর মুহাম্মদ ছালেহ

www.pathagar.com

সাহেব সেখানে হুযুরকে দেখিতে যান। হুযুর খবর পাইয়া তাহাকে চেহারা দেখাইতে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। বলিলেন, আল্লাহর কোরআনের বিরুদ্ধে আইন পাশ করা হইয়াছে, তাহা যে লোকে সমর্থন দেয় তাহার সহিত সাক্ষাত করিব না। অনুরোধ করিলেন জানালার ফাঁক দিয়া এক নযর দেখিতে চাই। হুযুর নিষেধ করিলেন, দেখা দিলেন না। অগত্যা ফিরিয়া গেলেন।

লালবাগ শাহী মসজিদে যিকিরের মজলিস বন্ধ

প্রতি শনিবার বৈকালে শাহী মসজিদে যিকিরের মজলিসে বহু সংখ্যক লোক সমবেত হইতে থাকে। আমরা তারিখ মত মফঃস্বল হইতে ঢাকায় লোকজনসহ হাজির হইলাম। মাগরিবের পর হুযুর আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, যিকিরের মশ্‌ক হইবে না, মজলিস হইবে না। যাহারা আসিয়াছেন তাহাদিগকে কিছু মোজাকারা করিয়া বিদায় দাও। এ কি কথা বলেন হুযুর! কেন মজলিস হইবে না? বলিলেন, মসজিদ কর্তৃপক্ষের নিষেধ। যেহেতু মসজিদে সম্পূর্ণ আমাদের স্বাধীনতা নাই, সেহেতু এখানে সম্ভব নহে। ইন্‌শাআল্লাহ গওহারডাঙ্গা মাদ্রাসার খানকায় মজলিস করিব। এশার পর বিস্তারিত জানতে চাইলে হুযুর বলিলেন, যিকিরের মজলিসের জনপ্রিয়তা হয়তো কাহারো গাত্রদাহের কারণ হইয়াছে।

ঢাকা হইতে এই যিকিরের মজলিসের বিরুদ্ধে করাচীতে হযরত মাওলানা যাফর আহমাদ উসমানী সাহেবের নিকট লেখা হইল- মাওলানা শামছুল হক সাহেব লালবাগ শাহী মসজিদে যিকিরের মজলিস করিয়া লোকজনের ভিড় জমাইতেছেন, যিকিরে জলী করেন। লোকদের মধ্যে অযদের হালত হয়। ইতিপূর্বে কখনও এরূপ করেন নাই।

পত্রের উত্তর আসিল : আমাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ এরূপ করেন নাই। ইহা পূর্ববর্তীগণের তরীকা নহে।

হুযুর পত্র দেখিয়া বিশিষ্ট আলিম, তালেবে-সাদেকগণকে বলিলেন, আমি তাসাউফের ইমাম মারুফ কারখী, সায়্যেদেনা আব্দুল কাদের জিলানী, খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্‌তী, জোনায়েদ বোগদাদী, বাহাউদ্দীন নকশে বন্দীকে পড়িয়াছি, গবেষণা করিয়াছি, আমি নিজেও আলহামদুলিল্লাহ্‌ তাসাওফের ইমামের হাইসিয়ত যোগ্যতা রাখি। এই ফেৎনার জমানায় উম্মতকে হক রাস্তায় কি করিয়া রাখা যায়, সুন্নাত তরীকায় তরীকতের তালীম তরবিয়ত করা যায় তাহা ভাবিয়া চিন্তিয়া এই পদ্ধতি আল্লাহর তরফ হইতে পাইয়াছি, ইহা কোন বেদাআত নহে। অথচ এই মহৎ কাজটা লালবাগে আমাকে করিতে দিল না।

www.pathagar.com

গোটা দেশের ভক্ত অনুরক্তদের প্রাণে আঘাত হানিল। কছদুচ্ছাবিল, তালীমুদ্দীন, জিয়াউল কুলুব, এছলাহে নফস, প্রথম সবক, দোসরা সবক, তওবা নামা ইত্যাদি পুস্তকের তালীমইতো দিতেছি। তাহা সহ্য হইল না। নিরপেক্ষ স্বাধীন খানকাহ্ মসজিদ আপাতত ঢাকায় নেই, যেখানে এই কাজ সঠিকভাবে করিতে পারি। ইহা কোন মাদ্রাসায় সম্ভব নহে। কেননা মাদ্রাসার সব লোক এক মনা হয় না। আল্লাহ সুযোগ দিলে এই কাজ জারী করিতে পারিবে।

অবশেষে ১৯৬৭ সনে গওহারডাঙ্গায় চলিয়া গেলেন। ঢাকা হইতে বিদায় নিলেন, তখন বাড়ি হইতে মাদ্রাসায় আসার মত শক্তি ছিল না। পালকী দ্বারা কোন কোন সময় মাদ্রাসায় তাশরীফ আনিতেন কিন্তু বা-কায়দা নিয়মিত যিকিরের মজলিস করিতে পারিতেন না, হুযুরগণের দ্বারাও করাইবার সুযোগ হয় নাই। একদিন আসরের পরে সমস্ত হুযুরকে হুযুরের বাড়িতে ডাকিয়া নিলেন। আর বলিলেন, আমি সুদীর্ঘ বাইশ বৎসর পর্যন্ত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ)-এর সোহবতে থাকিয়া যেই মারেফাতের এলম ও আমল শিক্ষা করিয়া আসিয়াছিলাম, আপনারা সেই এলেম ও আমলকে মারিয়া ফেলিবেন না। কমপক্ষে প্রতি বৃহস্পতিবার বৈকালে নিজেরা বসিয়া কস্দুচ্ছাবিল কিতাবখানা পড়িয়া শুনাইবেন। আমার মনে চায় আমার হৃদপিণ্ড কাটিয়া টুকরা টুকরা করিয়া আপনাদের দেই। যেইরূপ তরমুজ কাটিয়া ফালী করিয়া ফেরীওয়ালারা বিক্রী করে, সেইরূপ আমার হৃদয় ফালী করিয়া দিতে মন চায়। আছ কেহ খরিদদার? আমার এখন অন্তিম সময়, আহ্ এই যিকিরের আশেক পাইলাম না।

যাহারা মাদ্রাসায় পড়িয়া আলিম হইয়াছে, অন্ততঃ দশ বৎসর লাগে দরসে নিয়ামী এলম হাসিল করিতে। এলম হাসেল করিয়া চলিয়া যায়, অথচ কেহ আমল শিক্ষা করিতে উস্তাদের জুতা-খড়ম আগাইয়া দেওয়ার খেদমত আঞ্জাম দিতে প্রয়োজন বোধ করে না।

জীবনভর রান্না করা শিখিল কেহই খাইয়া গেল না। এলম হাসিল হইলে সাধারণতঃ অহংকার রোগে আক্রান্ত হয়। উস্তাদের দীক্ষা নিয়া রেয়াজত মোজাহাদা দ্বারা তাওয়াযু (বিনয়) পয়দা হয়। এসলাহ হওয়া যায়। ইহার গুরুত্ব ছাত্রদের মধ্যে নাই। চেতনাও নাই। আগের যামানায় মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষক কর্মচারী প্রায় সকলেই সাহেবে নেসবত (যোগ্যতম) বুযুর্গ হইতেন। আজকাল ইহার বড় অভাব। আপনারা এই অভাব মোচন করিতে যত্নবান হউন। আল্লাহর বান্দাদের মাহরুম করিবেন না। কমপক্ষে সপ্তাহে একদিন যিকিরের মজলিস করিয়া কছদুস্সাবিল পড়িয়া শুনাইবার সিলসিলা জারী রাখুন। ইহাতে বিরাট ফায়দা হইবে।

www.pathagar.com

হযরত সদর সাহেবের নিকট মনের আবেগে একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, হুযুর আপনার অবর্তমানে আমরা কার কাছে যাইয়া আমল আখলাক সংশোধন করিব। অনেকক্ষণ চুপ থাকিয়া বলিলেন, কাহাকেওতো দেখি না। আমার কিতাবগুলির উপর আমল করিতে থাকিবে। আল্লাহপাক উপযুক্ত লোক মিলাইয়া দিবেন।

কোন একজন বড় আলিমের নাম দিয়া বলিলাম, হুযুর ওমুক আলিম তো খুব যোগ্যলোক বলিয়া আপনি প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাকে আপনার সীনায় যে মারেফাতের এলম আছে তাহা দিয়া যান। হুযুর বলিলেন, তাহাকে ডাকিয়া আন। তাহার বাসায় গিয়া অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিয়া ডাকিয়া আনিলাম। ইহার মধ্যে দেখা গেল কতিপয় রাজনৈতিক নেতা হুযুরের সহিত সাক্ষাত করিতে আসিয়া দীর্ঘ সময় আলোচনায় লিপ্ত রহিয়াছেন। এমন সময় আসরের আযান হইয়া গেল। তাহারা বিদায় হইলেন, উক্ত মাওলানা সাহেবও চলিয়া গেলেন। আমি হুযুরের উযুর পানি দিয়া বলিলাম: হুযুর কোন কথাতো বলিলেন না? হুযুর উত্তর করিলেন, আরে মিঞা এই দৌলত তো সাধিয়া দেওয়ার বস্তু নহে, এই দৌলত তো খুঁজিয়া নিতে হয়! মোজাহাদা করিয়া নিতে হয়। এই লোকতো তাজেরানা তবিয়তের, আশেকানা তবিয়ত ছাড়া মা'রেফাতের দৌলত পাওয়া যায় না। আবু সাঈদ গাঙ্গুহীর ঘটনা পড়িয়া দেখ। সদর সাহেব (রহঃ) কোন খলীফার নাম বলেন নাই। আসলে তাহার মুরীদ হওয়া কত কষ্টকর, নিম্নের ঘটনা দ্বারা তাহা সম্যক উপলব্ধি করা যায়।

জনৈক ব্যক্তি কুমিল্লা জেলার কচুয়া হইতে হযরত সদর সাহেবের নিকট মুরীদ হইতে আসিয়া দরখাস্ত পেশ করিলেন। লোকটি আলিম ছিলেন। হুযুর বলিলেন, হাফেজ্জী হুযুর (রহঃ)-এর নিকট নিয়া যাও। আমার শক্তি নাই। আমি বলিলাম, হুযুর সে আপনার নিকট বায়আত হইতে আসিয়াছে। একটু তওবা করাইয়া দিতে আর কি কষ্ট। তাতে আর কত শক্তির প্রয়োজন। এই কথা বলায় হুযুর খুব রাগ করিলেন- তুমি কি একটি ভেবলা বলদ? তোমার কি জ্ঞান নাই? একটি লোক মুরীদ করিলে তার দিকে তাওয়াজ্জুহ দিতে হয়, এসলাহ করিতে ফিকির করিতে হয়। মানসিক বহু পরিশ্রম করিতে হয়। আমার ফুরসুত নাই, গোটা মুসলিম কওমের জন্য আমার ফিকির করিতে হয়। উক্ত মুরীদ হইতে ইচ্ছুক ব্যক্তির নিকট এই কথাগুলি বলার পর তিনি কাঁদিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন, আমি হযরত নবী করীম (সাঃ)-কে স্বপ্নে দেখিয়াছি, তিনি মাওলানা শামছুল হকের নাম নিয়া বলিয়াছেন, তাঁহার কাছে যাইয়া মুরীদ হও; এই নির্দেশ পাইয়া আসিয়াছি।

www.pathagar.com

এই কথা হুযুরকে জানাইলাম, পরে হুযুর বলিলেন, "যাও তাঁহাকে গিয়া বল, তাহাজ্জুদের পর রহমতগঞ্জ ছাতিওয়ালা মসজিদে যেন উপস্থিত থাকে, সেখানে তাঁহাকে বায়আত করিব।

হুযুর সময়মত রহমতগঞ্জ মসজিদে গিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন, কিন্তু ঐ মাওলানা সাহেব উপস্থিত হইতে অনেক দেরী করিয়া ফেলিলেন। দেখা হওয়া মাত্র ধমক দিয়া বলিলেন, "যাও তোমার কোন সময়ের মূল্য বোঝার ক্ষমতা নাই, আমি মুরীদ করিব না। লোকটি কান্নাকাটি আহাজারী করিতে লাগিলেন, মাফ চাহিলেন। কিন্তু হুযুর কোন কথা বলিলেন, না। ঐ ব্যক্তি সারাদিন কান্নাকাটি করিতেছিলেন, বারবার আমার মাধ্যমে হুযুরের নিকট আবেদন করিতেছিলেন। অতঃপর হুযুর পরেরদিন তাহাজ্জুদের পর মসজিদে উপস্থিত থাকিতে বলিলেন। ঐ মাওলানা সাহেব সারারাত্রি আর আরাম করেন নাই। ঐ মসজিদের বারান্দায় যিকির ও ওযিফার মধ্যে কাটাইলেন। হুযুর তাশরীফ আনিয়া দেখিলেন ঐ লোক উপস্থিত। সালাম-কালাম করিয়া বায়আত করিলেন আর বলিলেন, "আপনি আমার কাছে মুরীদ হইয়াছেন এই কথা লোকের কাছে বলিয়া বেড়াইবেন না। যাহা বাতাইয়া দিলাম আমল করিবেন। আর এসলাহী পত্র লিখিবেন, মাঝে মাঝে ছোহবতে আসিবেন।

'বায়আতনামা বা জীবনের পণ' নামক একটি ছোট পুস্তিকার মধ্যে বায়আত হওয়ার অঙ্গীকার লিপিবদ্ধ আছে এবং দস্তখত করার ঘর আছে, উহাতে দস্তখত করিয়া মুরীদ হইতে হইত। কোন ব্যতিক্রম হইলে মুরীদ করিতেন না। বলিতেন, ইহা বাজারের কোন সস্তা বস্তু নহে যে চাহিলেই পাওয়া যায়। জান-জীবন ক্ষয় করিয়া ইহা অর্জন করিতে হয়। ইহা পাওয়াও কষ্টসাধ্য, রক্ষা করাটাও অতি কষ্টসাধ্য।

ভাই হাফেয মাওলানা ওমর সাহেব করাচীতে পড়াশুনা করিতেছেন, এখনও দেশে আসেন নাই। ভাই হাফেয রূহুল আমীনও করাচী গিয়াছেন। আমরা হযরত সদর সাহেবের কর্মীগণ মুরব্বীর হায়াৎ থাকা অবস্থায় খাদেমুল ইসলাম জামাতের কাজকে ধরিয়া রাখিয়াছি। বড় ভাইজান দেশে আসিলে তাঁহার হাতে কাজের দায়িত্ব দিব। সেই অপেক্ষায় ছিলাম।

হযরত হাফেজ্জী হুযুর ১৯৭৯ ও '৮০ সনে হজ্জের সময় ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বুযুর্গ হযরত মাওলানা থানভী (রহঃ)-এর খলীফা হযরত মাওলানা শাহ্ আবরারুল হক সাহেবকে হেরেম শরীফে বসিয়া বাংলাদেশে তাশরীফ আনার জন্য দাওয়াত দিলেন। সঙ্গে- তাঁহার খলীফা পাকিস্তানের শ্রেষ্ঠ বুযুর্গ হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার সাহেবকেও দাওয়াত করিলেন। উক্ত মহান বুযুর্গদ্বয় দাওয়াত কবুল করিলেন। হযরত হাফেজ্জী হুযুর আমাদের নিয়া

www.pathagar.com

মজলিস করিয়া জানাইলেন, দুই জন মহান বুযুর্গকে দাওয়াত করিয়া আসিয়াছি। তাঁহারা আসিতেছেন। ১৯৮১ সনের ডিসেম্বর মাসের প্রথমভাগে আসিবেন। সফরসূচীর বিষয় আলোচনা হইল। হাফেজ্জী হুযুর (রহঃ) বলিলেন, হযরত মাওলানা আবরারুল হক সাহেবকে নিয়া বাংলাদেশের সর্বত্র গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সফর করাইতে হইবে। তাঁহার সফর হইবে তাজদীদী, কুসংস্কার দূর করিয়া সুন্নত জারীর কাজ আরম্ভ করিতে হইবে। সঙ্গী-সাথীদের নামের তালিকাও প্রস্তুত হইল।

ইন্ডিয়ার হুযুর এবং পাকিস্তানের হুযুর উভয়ে ঢাকা তাশরীফ আনিলেন। এবং নিউস্কাটনে হাজী বশির সাহেবের বাড়িতে মেহমান হইলেন। আমি খবর পাইয়া খেদমতে হাযির হইলাম। কি অপূর্ব দৃশ্য! সমস্ত বিখ্যাত আলেমগণ মাথা নত করিয়া ইন্ডিয়ার হুযুরের বানী শ্রবণ করিতেছিলেন। প্রত্যেকটি কথাই মনে হইতেছিল হযরত মাওলানা শামছুল হক সাহেব পুনরায় দুনিয়াতে আসিয়াছেন। উম্মতের ফেকের-সুন্নত জিন্দা করিবার জন্য হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার সাহেব মাথা নীচু করিয়া বসিয়া আছেন। হযরতের প্রত্যেকটি কথাই স্বর্ণাক্ষরে লেখার যোগ্য। এইরূপ কথা এইরূপ নসীহত এইরূপ ইসলাহ পাইব তাহা কল্পনাও করিতে পারি নাই। আলহামদুলিল্লাহ। এইরূপ উজ্জ্বল নূরানী চেহারার লোকও দেখি নাই। ঐ যেন বেহেশতি লোক দুনিয়াতে আসিয়াছেন। কি হৃদয় গ্রাহী মর্মস্পর্শী বয়ান! মনে চায় নিজের দেহ মন বিলাইয়া দেই।

দ্বিতীয় দিন সফর শুরু হইল। যশোর, খুলনা, বরিশাল, চাঁদপুর, নোয়াখালী, লুধুয়া, কুমিল্লা হইয়া ঢাকায় ফিরিবেন। গাড়িতে সঙ্গে যাওয়ার গুরুত্বও পাইলাম না, স্থানও পাইলাম না। অবশ্য ব্যবস্থাপকগণ গুরুত্ব দিলে স্থান হইত।

যাহা হউক, বহুকষ্টে ষ্টীমার যোগে বরিশালের মাহমুদীয়া মাদ্রাসায় যাইয়া পাইয়াছিলাম। বয়ানের অপেক্ষায় সকলেই বসা। ইন্ডিয়ার হযরত উর্দূতে বয়ান করিতেছিলেন। অনুবাদ কারীর অনুবাদ মনঃপুত হইতেছিল না। অবশেষে হিম্মত করিয়া আমি কিছু অনুবাদ শুনাইবার অনুমতি পাইলাম। হযরতের মহব্বতের দৃষ্টি আমার উপর পড়িল। ষ্টীমার আসিলে সকলেই- সেকেন্ড ক্লাসের রিজার্ভ সীটে বসিল। আমি ডেকে স্থান নিলাম। তাঁহারা কখন কি আলাপ করেন শুনিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া তাকাইয়া থাকি। কথা গুলি লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিতে ছিলাম। ভোরবেলা ষ্টীমার চলা বন্ধ করিয়া দিল। পদ্মায় পানি কম ছিল। জোয়ার না আসিলে যাইতে সক্ষম হইবে না। চার ঘন্টা বিনষ্ট হইল। রাস্তায় যোহরের পরে ষ্টীমার আটক অবস্থায় ডেকে একটি চেয়ার নিয়া বয়ান আরম্ভ করিলেন আর আমাকে অনুবাদ করিবার হুকুম করিলেন। আমি আরো ঘনিষ্ঠতা অর্জনে অগ্রণী হইলাম।

www.pathagar.com

হযরত হাকীম সাহেব রেলিং ঘেসিয়া চেয়ারে বসিয়া নদীর দৃশ্য দেখিতেছিলেন। আমি তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলে আলাপ পরিচয় হইল। আমাকে সূরা ত্বীন শুনাইতে বলিলেন। আমি শুনাইলাম, তিনিও শুনাইলেন। আমার মারুফ-মাজহুলের তমিজ ছিল না। তিনি ভুল ধরাইয়া দিলেন। অতঃপর দীর্ঘ সময় বাংলাদেশে দ্বীনী খেদমতের বিভিন্ন আলোচনা হইল। হযরত মাওলানা শামছুল হক সাহেবের খেদমত ও ভূমিকা তুলিয়া ধরিলাম।

হাফেয মুহাম্মদ ওমর তাঁহার তরবিয়তে থাকিয়া লেখাপড়া শেষ করিয়াছেন বলিয়া আমাকে জানাইলেন। বেলা চারটার পরিবর্তে রাত আটটায় লঞ্চ চাঁদপুর পৌঁছাইল। পুরাতন বাজার হইয়া হাজী আবদুল কাদেরের বাড়ির মাদ্রাসায় রাত্র যাপন করিলাম। পরের দিন লুধুয়া পৌঁছিলাম। হযরতের সহিত জনাব হাকীম একরামুল্লাহ্ সাহেব এবং দক্ষিণ আফ্রিকার জনাব ইয়াহ্ইয়া ভাসও ছিলেন। কার্তিক মাস, রাস্তায় কাদা বহু কষ্টে রিক্সা যোগে কিছু মাইক্রোবাসে কিছু রাস্তা অতিক্রম করিয়া বৈকালে লুধুয়া পৌঁছিলাম। রাত্রে ভীষণ মুষলধারে বৃষ্টি হইল। আমি ও হুযুরের খাদেম সাথী বলিয়া পরিগণিত হইলাম। দেশী মুরব্বীগণ যাঁহারা সফরের সাথী তাহারা তেমন একটা খুশী হইতে পারিলেন না। আমি যেন উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিয়াছি। ভাবিতেছিলাম, আমি এলান করিয়া দিব নিজ খরচে পথ চলিব এবং নিজ খরচে খাইব। আমি দান শিখিতে আসিয়াছি, তোফায়েলী (গলগ্রহ) হইয়া সঙ্গী হইতে আসি নাই। অবশ্য হাফেজ্জী হুযুরের স্নেহের দৃষ্টি ছিল। মাইলের পর মাইল কর্দমাক্ত রাস্তা। রিক্সা যোগে অতিক্রম করিয়া পাকা রাস্তায় গিয়া গাড়ির ব্যবস্থা হইল। কুমিল্লা হইয়া সাত দিনের সফর শেষ করিয়া ঢাকায় ফিরিলেন।

এইবার ময়মনসিংহ হইয়া কিশোরগঞ্জ যাওয়ার প্রোগ্রাম, হুযুরের পৌঁছার পূর্বেই ময়মনসিংহ পৌঁছিলাম। হুযুর পৌঁছিয়াই বয়ান শুরু করিলেন। আমি হুযুরের কাছাকাছি বসিয়াছিলাম। কর্তৃপক্ষের ইচ্ছা বয়ান খতম করাইয়া খানা খাওয়াইবে। আসরের পরই যাহাতে কিশোরগঞ্জে গিয়া গাড়ি ফেরত আনিতে পারে। সে অনুযায়ী ব্যবস্থা করা হইল, এই দিকে খানা তৈয়ার। যোহরের পরে দেড় ঘণ্টা বয়ান হইয়াছে তবুও খতম হইতেছে না। সকলেই ব্যস্ত। হুযুরকে খানার জন্য তাগিদ করা এবং গাড়ি ওয়ালাদের অসুবিধার কথা জানানো দরকার কিন্তু কে বলিবে হুযুরকে? কেহই সাহস করিতেছিল না। আমাকে মুরুব্বীগণ অনুরোধ করিলেন, ভাই তুমি হুযুরকে বল।

আমি তো হুযুরের মেজায বুঝি নাই, সকলের অনুরোধ এবং মুহতামিম সাহেবের কাকুতি দেখিয়া হযরতকে জানাইলাম, খানা খেয়ে দ্রুত রওয়ানা দিতে হইবে। সন্ধ্যার পূর্বে গাড়ী ফিরিয়া আসিবে। সবাই আপনার অপেক্ষায়।

www.pathagar.com

আহা! কি যে রাগ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে বয়ানও বন্ধ করিলেন। ভীষণ বৃষ্টি হইতেছিল। ভিজিয়া গাড়িতে উঠলেন আর ড্রাইভারকে বলিলেন, যাও, চালাও গাড়ি। আমাকে বলিলেন, তুমি কে? তোমার কাছে খানা আগে না দ্বীন আগে? বুঝিলাম, তোমার নিজের রায় মতো আমাকে চালাতে চাও। সুতরাং চল, দ্রুত চল। আমাকে আবার বলিলেন, আমাকে বলিবার মতো তোমার কি হক আছে? তুমি কে? তোমাকে কে বলিতে বলিয়াছে?

আমি বলিলাম, মোহতামিম সাহেব বলিয়াছেন, এখন তাহার উপর অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিলেন, গাড়ি হইতে নামেন না। বৃষ্টিতে ভিজিয়া সব লোকে হাতে পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহিল। অতঃপর গাড়ি হইতে নামিয়া আবার মজমা একত্র করিয়া বয়ান শেষ করিয়া দোয়া করিয়া প্রোগ্রাম শেষ করিলেন। তখন চারটা বাজে। খানার জন্য সকলেই বসিলেন। আমি দরজার কপাটের আড়ালে নীচু হইয়া লুকাইয়া রহিয়াছি। এমন সময় হযরত বলিলেন, ঐ বড় মিয়া কোথায় থাকে, যাহাকে আমি ধমক দিয়াছিলাম? তাহাকে ডাক। অমনি আমি বলিলাম, হুযুর আমি উপস্থিত। তিনি বলিলেন, খানা খাইয়া লও। তুমিও আমার সাথে মেহমান। আমার সহিত গাড়িতে চলো।

সন্ধার আগেই কিশোরগঞ্জ পৌঁছিলাম। রাত্রে শহীদী মসজিদে বয়ান হইল। হযরত অল্প কিছু বয়ান করিয়া হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার সাহেবকে বয়ান করিতে হুকুম দিলেন। আহ! সে যে কি আল্লাহর মহব্বতের মধুর বয়ান। কি যে এসলাহী কথা, আত্মা ফাটিয়া যায়, কলিজা গলিয়া যায়!! চোখের পানিতে বুক ভাসিতেছিল। এতো যাদুমাখা বয়ান কখনোই শুনি নাই। ইহা যেন মাওলানা থানভীর তরজ মাফিক হইতেছে। কুরআন হাদীস হইতে এতো হাওয়ালা দিয়া কথা বলিলেন! দলিল ছাড়া একটি কথাও বলিলেন, না। এশা পর্যন্ত বয়ান হইল। নামায আদায়ের পর খানার পূর্বেই হযরতের নিকট বায়আত হওয়ার দরখাস্ত পেশ করিলাম। হযরতের নিকট দরখাস্ত পেশ করিলেন জনাব করাচীর হুযুর। খানা খাওয়ার পর তিনি জানাইয়া দিলেন, দরখাস্তকারীগণ দরখাস্ত নিয়া তাহাজ্জুদের নামাযের পর শহীদী মসজিদের মধ্যে যেন উপস্থিত থাকে।

শেষ রাত্রে তাহাজ্জুদের সময় হুযুর মসজিদের মূলস্থানে নামাযে বসা আছেন। আমি উপস্থিত হইলাম। আমাকে একাই বায়আত করিলেন। কিছুক্ষণ পরে আরো তিনজন বায়আত হইলেন। সমস্ত রাত্র আমার ঘুম হয় নাই। কখন সিলসিলার নেয়ামত হাসিল করিব। আলহামদুলিল্লাহ্! আল্লাহর অশেষ রহমতে সিলসিলায় পুনরায় দাখিল হইলাম। এর পূর্বে ১৯৫০ সন হইতে বায়আত হইবার জন্য হযরত সদর সাহেবের খেদমতে হাযির হইতে থাকি। যেহেতু

www.pathagar.com

হুযুরের নিয়ম ছিল, আগে এসলাহ্ করিয়া পরে বায়আত করার। এই জন্য দীর্ঘ দশ বৎসর পর ১৯৬০ সনে হুযুর আমাকে বলিলেন, "আমার মুরুব্বী হযরত মাওলানা যাফর আহমদ উসমানী সাহেব লালবাগে আছেন। বরকতের জন্য হযরতের হাতে তোমাকে বায়আত করাইব এবং ইসলাহ আমি করাইতে থাকিব। আমি বলিলাম, আমি আপনার আশেক হইয়া অপেক্ষায় ছিলাম, আমার মর্জি ফানা করিয়া দিয়াছি।

হযরত সদর সাহেব আমাকে নিয়া হযরত উসমানী সাহেবের হাতে দিলেন আর বলিলেন, হযরত আপ বায়আত কর দিজিয়ে, মাঁয় ইসলাহ করোঙ্গা। হযরত বায়আত করিলেন। তারপর সদর সাহেবের খেদমতে আমার তরবিয়ত হইতে থাকে। হযরত সদর সাহেবের ইন্তেকালের পর আর কোথাও মন বসিতেছিল না। অপেক্ষায় দীর্ঘ বার বৎসর কাটাইয়া বার বৎসর পরে হযরত হাফেজ্জী হুযুরের উসিলায় হারদুয়ীর হুযুরকে পাইয়া মনোবাঞ্ছা পূরণ হইল।

হযরত হারদুয়ী কিশোরগঞ্জ হইতে আসিয়া ঢাকায় মাত্র দুই রাত রহিলেন। তারপর তিনি ইন্ডিয়ায় চলিয়া গেলেন। করাচীর হযরতের বিদায় হইতে আরো তিন দিন বাকি। তাহারা কামরাঙ্গীরচর হইতে মাহফিল করিয়া ধানমন্ডির জনাব হাজী হাবীব সাহেবের বাড়িতে এক দিন থাকিয়া বিদায় হবেন। ঐ সময় ইন্ডিয়ার হযরতের বিদায়ের পর করাচীর হযরত একা রহিলেন, আমি এই সময়কে গনিমত মনে করিয়া হুযুরকে জড়াইয়া ধরিলাম। ১৯৬২ সনের পিপাসা, মসনবীর দরসের সময় চাহিয়াছিলাম, তিনি পরের বৎসরের ওয়াদা দিলেন। কিছু আশেক ধরিয়া আনিয়া হুযুরের সোহবত হইতে ফয়েজ অর্জনের সুযোগ করিলাম।

জনাব হাজী কোব্বাদ সাহেব বর্তমান নাম জামাল সাহেবকে সংবাদ দিলাম, বহু বড় বুযুর্গ পাইয়াছি, হযরত সদর সাহেবের পরিবর্তে আল্লাহ্ মিলাইয়া দিয়াছেন। ধানমণ্ডির ঠিকানায় দিয়া মুন্সী আব্দুল বারী সাহেবকে পাঠাইলাম। যোহরের পর হইতে মাগরিব পর্যন্ত ধানমণ্ডির অবস্থানের স্থান খুঁজিয়া পাইলেন না। বহু খোঁজাখুঁজির পর হাজী হাবীব সাহেবের বাড়ি পাইলেন। হযরত হাকীম সাহেবকে দেখিয়া মোহিত হইলেন আর রিক্সা ওয়ালাকে ৫০ টাকা খুশী হইয়া পুরস্কার দিলেন। বলিলেন, আমার মাশুককে পাইয়াছি, এর চেয়ে বড় দৌলত আর কি হইতে পারে? হাজী কোব্বাদ সাহেব বায়আত হইলেন আর বলিলেন, হুযুরের পাসপোর্ট গায়েব করিয়া তাহাকে আর কিছুদিন রাখিব। টিকিটের কনফার্মেশনের যাবতীয় দায়-দায়িত্ব নিতে চাহিলেন। কিন্তু করাচীর হযরতের সময় ছিল না। পরের বৎসর আনাইবার জন্য দরখাস্ত করিলেন। হযরত হাফেজ্জী হুযুরও দরখাস্ত করিলেন।

www.pathagar.com

তিনি তিনদিন ধানমণ্ডি থাকিবার পর চলিয়া গেলেন। উভয় হ্যরত বিদায় নেওয়ার পূর্বে গেন্ডারিয়ার সতিশ সরকার রোডের হাজী আহমদ আলী সাহেবের বাসায় খানার দাওয়াত কবুল করিয়াছিলেন এবং জামালুল কোরআন মাদ্রাসায় যোহর নামায পড়িয়াছিলেন। কিন্তু তখন আমার খাস দোস্তগণকে ধরিতে সময় পাই নাই।

১৯৮২ সনের সেপ্টেম্বর মাসে করাচীর হুযুর বাংলাদেশে তাশরীফ আনিলেন। ইয়ারপোর্টে গিয়া দেখা করব বলিয়াছিলাম। ঐ সময় ঢালকা নগরের হাজী গোলাম মোস্তফাকে কামরাঙ্গীর চর মাদ্রাসায় সালেকীনদের এজতেমা হইল। হাফেজ্জী হুযুরের দ্বারা সুপারিশ করাইয়া দরসে মসনবীর প্রোগ্রাম করার সিদ্ধান্ত হইল। দৈনিক যোহরের পরে মসনবী শরীফের দরস হইতে লাগিল, কামরাঙ্গীর চর মাদ্রাসা নূরীয়ার মসজিদের দক্ষিণ বারান্দায় দরস শুরু হইল। হ্যরত হাফেজ্জীও নিয়মিত দরসে বসিতেছিলেন এবং দরস চলার সময় হ্যরত মাওলানা হাকীম আখতার সাহেবের বয়ান শুনিয়া অশ্রু প্রবাহিত করিতেছিলেন। সকলেই জার ও কাতার রোনাজারী করিতেছিলেন। হ্যরত হাফেজ্জী হুযুরের সকল খলীফা ও মুতায়াল্লেকীনগণকে দাওয়াত দিয়া আনা হইল। হ্যরত হাফেজ্জী ঘোষণা দিলেন এই খানকায় এসলাহের দায়িত্ব জনাব করাচীর হুযুরকে দিলাম। আমার সমস্ত মুরীদগণকে করাচীর হুযুরের নিকট বায়আত গ্রহণের পরামর্শ দিতেছি। তাঁহার ফয়েজ অর্জনের জন্য বিশেষভাবে নির্দেশ দিতেছি। হ্যরত হাফেজ্জীর কামরা হুযুরকে দিয়া তিনি পশ্চিম দিকের সঙ্কীর্ণ স্থানের উপর মাঁচায় গিয়া থাকিতে লাগিলেন।

১৯৮৬ সনে হ্যরত হাকীম সাহেবকে নিয়া বিভিন্ন স্থানে সফর করিলাম। যশোহর-খুলনা হইয়া গওহারডাঙ্গায় যাইতেছিলাম, উদয়পুর হইতে রিকশায় বড়বাড়িয়া পর্যন্ত আসিয়া নদী পার হইতে জটিলতার সৃষ্টি হইল, বহু চেষ্টার পর একটি ছৈ দেওয়া নৌকা পাইলাম, হুযুর নৌকায় চড়িতে অভ্যস্ত নন। বহু কষ্টে নৌকায় উঠাইলাম। নদীর অপর পাড়ে গওহারডাঙ্গা, বিশাল চর জাগিয়া যাওয়ায় নৌকা কূলে যায় না। চরে ঠেকিয়া গেল, হাঁটু পানি প্রায় দুইশত গজ হুযুরকে পিঠে উঠাইয়া নিয়া শুকনা রাস্তায় উঠাইলাম। মাদ্রাসার শিক্ষকবৃন্দ, মুহতামিম সাহেব ও ছাত্রগণ পাড়ে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাহারা এই প্রথম গওহারডাঙ্গায় হুযুরকে দেখিতে পাইলেন। এক বয়ানেই সবাই মুগ্ধ হইলেন।

খানকাহী নিযামের জন্য নিজস্ব স্থানের প্রয়োজন, ইহা কোন মাদ্রাসায় পরিচালনা সম্ভব নহে। এক মতের এক পথের এক মেজাযের লোক ছাড়া সুলূকের তালীম-তরবিয়াত সম্ভব নয়। এমন কি তাঁহার নিজ গ্রামের মাদ্রাসা গওহারডাঙ্গায়ও হইয়া উঠিল না। মাদ্রাসার সাথে ইসলাহী কাজ সমষ্টিগতভাবে হইতে পারে না।

www.pathagar.com

১৯৮২ সনে সেই জটিলতা দেখা দিল। লালবাগ মাদ্রাসা হইতে হুযুর ধানমন্ডি হাজী হাবীব সাহেবের বাসায় গিয়া অল্প সময় থাকিয়া করাচী ফেরত যাওয়ার ব্যবস্থা করিতে বলিলেন।

আমি তখন হুযুরকে ধানমন্ডি হইতে খাদেমুল ইসলামের দপ্তর পোস্তায় নিয়া কিছু সময় রাখিলাম। তৎপূর্বে কোথায় রাখি? কি করি? ভাবিতেছিলাম। কামরাঙ্গীর চর যখন দরসে-মসনবী চলিতেছিল তখন ঢালকা নগর হইতে জনাব হাজী কামাল সাহেব কামরাঙ্গীর চরে হযরত হাফেজ্জীর কাছে মুরীদ হইতে আসিয়াছিলেন। আমি তাহাকে বলিলাম, ফায়দা করাচীর হুযুরের মাধ্যমে হইবে, অপেক্ষা করুন। করাচীর হযরতকে আমি ধরাইয়া দিব। কামরাঙ্গীর চর হইতে হযরতকে অন্যত্র নিতে হইবে মনে ভাবিতেছিলাম, সুযোগ মত হযরতকে ঢালকা নগর নিয়া যাইবো; দোয়া করিতে থাকুন।

আলহামদুলিল্লাহ্! হযরতকে ঢালকা নগরে হাজী কামালুদ্দীন সাহেবের বাসায় একদিন নিয়া গিয়াছিলাম এবং মরহুম জনাব কোরবান আলী সাহেবের দ্বীনের খেদমতের কথা ব্যক্ত করিলাম এবং কামাল সাহেবকে মুরীদ করিবার দরখাস্ত করিলাম। তিনি এবং তাহার স্ত্রী উভয়ে মুরীদ হইলেন। পরে আবার ঢালকা নগর হইতে ধানমন্ডি নিয়া হুযুরকে পৌঁছাইয়া দিলাম।

জনাব হাজী কোব্বাদ সাহেবকে বলিলাম, ভাই! নিজের মোর্শেদের রাখার স্থান নাই, টাকা-পয়সা দিয়া কি হইবে? অতিসত্তর একটি জায়গা কিনুন, আমাদের খানকাহ্ নাই, স্বাধীনভাবে হযরতের দ্বারা দ্বীনের খেদমত এবং তরীকতের তালীম জারী করা আমাদের কর্তব্য। কামাল সাহেবকেও বলিলাম, ভবিষ্যত পরিকল্পনা প্রকাশ করি নাই, কারণ পরিবেশ সেইরূপ ছিল না। আর আমারও তদ্রুপ সামর্থ ছিল না, নগণ্য খাদেম হিসাবে জোর দিয়া কিছু বলিতেও পারি না।

যাহা হউক, কোব্বাদ সাহেব ও কামাল সাহেব চেষ্টা করিবেন বলিলেন। কোব্বাদ সাহেব তো দেওয়ানা, তিনি বাড়ী কেনার জন্য প্রস্তুত হইলেন। আমি বলিলাম, দেখুন মাদ্রাসার অধীনে খানকাহ্ চলে না। খানকাহ্র অধীনে মাদ্রাসা চলিতে পারে, যেমন থানাভবনে হযরত থানভী (রহঃ) জারী করিয়া গিয়াছেন।

১৯৮৩ সনে বাড়ি কেনার ব্যবস্থা হয়, হাজী কামালুদ্দীন সাহেবের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় আল্লাহ্পাক হাজী কোব্বাদের দ্বারা ৮৩ নং ঢালকা নগরে বাড়ি কেনার তৌফিক দিলেন। ঐ বৎসরেই হাজী কোব্বাদ সাহেব করাচীর হযরতকে ঢাকায় আনিবার ব্যবস্থা করিলেন। আমি তার নূতন কেনা বাড়ির পাহারাদার নিযুক্ত হইলাম। লোকজন ভিড়াইতে লাগিলাম। আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধবগণকে

www.pathagar.com

সিলসিলায় দাখিল করাইতে লাগিলাম। করাচীর হযরত তাশরীফ আনিলেন, সম্পূর্ণ খরচ হাজী সাহেব নিজের জিম্মায় নিলেন।

১৯৮২ সনের সফরে কামরাঙ্গীর চরে অবস্থান করিবার সময় হাফেয ওমর সাহেবের একটি পত্র হযরত মাওলানা হাকীম মুহাম্মদ আখতার সাহেবের নামে আসে। পত্রটি হযরত আমাকে দিলে পড়িয়া দেখিলাম, তিনি আফসুস করিয়া লিখিয়াছেন, আজ আমার আব্বাজান জীবিত নাই। তাহা না হইলে তিনি যদি হযরত শায়েখকে পাইতেন তবে তাঁহার সমাদর করিতেন। আজ হযরতকে কে গওহারডাঙ্গায় নিয়া যাইবে? তাঁহাকে কে পরিচিত করাইবে? আমি তো এখানে (পাকিস্তানে)।

আমি করাচীর হযরতকে জিজ্ঞাসা করলাম, হাফেয ওমর ভাই কি আপনার সোহবত অর্জন করিয়াছেন? তিনি বলিলেন,"হাঁ, আমার তত্ত্বাবধানে লেখাপড়া শিখিতেছে এবং ইসলাহ লইতেছে।"

আমার প্রাণে আবেগ এত বাড়িল যে, করাচীর হযরত কে জিজ্ঞাসা করিলাম, হুযুর তার কি আরো পড়িতে হইবে? তিনি বলিলেন, না যাহা পড়িয়াছে যথেষ্ট। এখন তাহাকে দেশে আনিয়া বিবাহ করাইয়া দাও। হুযুরকে অনুরোধ করিলাম, তিনি যেন তাহাকে পাঠাইয়া দেন।

হাফেয ওমর সাহেব দেশে আসিতেছেন, তাহাকে নিয়া দেশের সর্বত্র পরিচিত করাইতে হইবে। এতদুপলক্ষ্যে ঢালকা নগরে তাহাকে প্রাণঢালা সম্বর্ধনা দিতে হইবে। হাজী কোব্বাদ ও আমি প্রস্তুত হইতেছিলাম।

তিনি ঢাকায় আসিলেন। তাঁহাকে ঢালকা নগর মসজিদে সম্বর্ধনা দিলাম। বয়ান করিয়া তিনি সকলকে মুগ্ধ করিয়া দিলেন। এখন করাচীর হযরতকে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে সফর করিবার ব্যবস্থা করিলাম। এই নিয়ামত একা ভোগ করা উচিত হইবে না, হযরত মাওলানা শামছুল হক সাহেবের ভক্ত-অনুরক্তগণের প্রতিষ্ঠান সমূহে নিতে হইবে।

তাই খুলনা, যশোর, চট্টগ্রাম, সিলেট, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, রংপুর, বগুড়া, দিনাজপুরের সফর সূচী তৈরী করিলাম। বাংলাদেশ হইতে যাহারা করাচী লেখাপড়া করিয়াছেন এবং হযরতের সোহবতে গিয়াছেন, তাহারা সংবাদ পাইয়া সাক্ষাতের জন্য দলে দলে আসিতে লাগিলেন।

ঢালকা নগরে খানকার উপরের তলায় দৈনিক মজলিস হইতে লাগিল। হযরতকে নীচে আরামের ব্যবস্থা করা হইল। হযরতের যাদুমাখা বয়ানে মুগ্ধ হইয়া আলেম-তালেবে এলমগণ বায়আত হইতে লাগিলেন। আল্লাহপাক মাকসুদ পূরণ করিয়াছেন। আল্লাহ পাকের অসীম রহমতে বাংলাদেশে খানকায়ে

www.pathagar.com

এমদাদিয়া আশরাফিয়ার খানকাহী নেজাম চালু হইলো। হযরত মাওলানা শামছুল হক সাহেব সদর সাহেব কেবলার স্বপ্ন বাস্তবায়ন হইল। মাদ্রাসার আওতামুক্ত খানকাহ্ স্থাপন করিয়া মাওলানা থানভী (রহঃ)-এর তালীমাত শিক্ষা-দীক্ষা আরম্ভ করিবার সুযোগ আল্লাহপাক দান করলেন।

হারদুয়ীর হযরত দামাত বারকাতুহুমের খেদমতে পত্র লিখিয়া কারগুজারী জ্ঞাত করাইতে থাকিলাম। হুযুর খুব দুআ করাইয়া প্রেরণা দিলেন। প্রাথমিক অবস্থায় যেই ভাইগণ মুরীদ হইয়া খানকার প্রাণ সঞ্চার করিয়াছেন তাহারা হইলেন, হাজী কোব্বাদ হুসাইন সাহেব, হাজী কামালুদ্দীন সাহেব, হাজী গোলাম মোস্তফা, হাজী আবদুল মতিন সাহেব, হাজী মীর গোলাম মাওলা সাহেব। জান-মাল উৎসর্গকারী এই ভাইদের নিয়া করাচীর হযরত একটি পার্লামেন্টারী বোর্ড গঠন করিলেন। আলেমগণের মধ্যে হযরত মাওলানা আবদুল মজিদ ঢাকুবী, মাওলানা হেমায়েত হুসাইন, মাওলানা মুহাম্মাদ আলী চাঁদপুরী, মাওলানা আলী আহমদ, মাওলানা নূরুল ইসলাম পটিয়াভী উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করিয়াছেন। তাহারা সকলেই হযরত মাওলানা হেদায়েতুল্লাহ সাহেবের সিলসিলায় দাখিল হইয়া খেলাফত পান।

প্রাথমিক অবস্থায় ভাইগণের কাছে কত যে যাইতে হইয়াছে, মিটিং করিতে বারবার চেষ্টা করিয়াও একত্র করিতে পারিতাম না। দু'এক জন আসিয়া যখন দেখিতেন, কেহ আসে নাই তখন তাহারাও চলিয়া যাইতেন। আমি দৌড়াইয়া গিয়া রিক্সার চাকা ধরিয়া বলিতাম, ভাই একটু বসুন। পরামর্শ না হয় না হউক একটু দুআ করিয়া যান। ভাইগণ আসিলে মনে কত আনন্দ পাইতাম। তাহারা আমার প্রাণের ব্যথায় ব্যথিত বলিয়া মনে হইত।

১৯৮২ সনে আমি প্রথমে হারদূয়ী একাকী সফর করি। হারদূয়ীর হযরতের ছোহবতে একমাস থাকিয়া নুরানী কায়দা পড়ি এবং সূরা মশ্‌ক করি। হারদূয়ীতে সুন্নতের আমলী মশক শিক্ষা করিবার, আযান-একামত ঠিক করিবার কাজ শিক্ষা করিয়া আসিলাম।

করাচী হযরতের দেওয়া কিতাব সমূহ নিয়া ঢালকা নগরে দারুল মুতালাআ' স্থাপন করিলাম। আমাদের দেশের আলেমগণকে হুযুর বহুত কিতাব বিনামূল্যে দান করিলেন। আমরা জানিতাম না, কামালাতে আশরাফিয়া, মারেফাতে ইলাহিয়া, মায়িয়াতে ইলাহিয়া, মাজালিসুল আবরার, মায়ারেফে মসনবী, রূহ কি বিমারিয়া আওর উন কি এলাজ এই সমস্ত কিতাবের নাম এবং উহাতে কি লেখা আছে। ফলে এক অফুরন্ত উৎসের সন্ধান পাইলাম।

www.pathagar.com

হারদুয়ীর তালীম ঢাকায় কি করিয়া জারী করা যায়? আমাদের অনেক আলেমের সূরা শুদ্ধ হয় না। উহা সংশোধনের উপায় কি করি। করাচীর হযরতের সহযোগিতা কামনা করিয়া পত্র লিখিলাম। তিনি বলিলেন 'এশায়াতুল হক' নাম দিয়া তালীম আরম্ভ করিয়া দাও। হাতে কলমে সুন্নতের আমল শিক্ষার জন্য মসজিদে ও মাদ্রাসায় ছাত্রদের তালীম করিলে জনসাধারণ শিখিতে পারিবে। করাচীর হযরত পর পর চার বার বাংলাদেশে তাশরীফ আনার পর হাজী কোব্বাদ সাহেবের ঘর অপেক্ষাকৃত কম আয়তনের এবং আরামের উন্নত মানের ব্যবস্থা না থাকায় পঞ্চম বারের সফরে করাচীর হুযুর জনাব কামাল সাহেবের বাসায় থাকিবার জন্য পছন্দ করিলেন।

হাজী কোব্বাদের বাসার পার্শ্বে হট্টগোল বেশী হয়, নোংরা গলী এই জন্য ঐ স্থান বাদ দিয়া ৪/৪ নং ঢালকা নগরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। হাজী কোব্বাদ সাহেবের মানসিক অস্বস্তি দূর না হওয়ার কারণে করাচীর হযরত তাহাকে ইসলাহের জন্য হারদূয়ী যাইতে বলিলেন। আমাকে বলিলেন হাজী সাহেবকে নিয়া হযরতের সোহবতে ইসলাহ্ করাও সেখানে তাহার ফায়দা হইবে।

আমার চতুর্থ সফরে ১৯৮৬ সনে হাজী কোব্বাদ সাহেব হারদূয়ী যান এবং ইছলাহী সম্পর্ক হারদূয়ীর হযরতের সহিত কায়েম হয়। জনাব হাজী কামালুদ্দীন সাহেবকে তাঁহার বাবা মরহুম কোরবান আলী সাহেব ১৯৭২ সনে হজ্জের সফরে আমাকে সাথী করিয়াছিলেন। তাহার সহিত ঘনিষ্ঠতার কারণে মনে বড়ই বাসনা ছিল, এই লোকটার মধ্যে করাচীর হযরতের ছোহবতের ফয়েজ কি করিয়া লাভ হয়। সুতরাং বহু চেষ্টায় ১৯৮৫ সনে করাচীর সফরে তাহার সহিত আমিও সফর করি। হযরতের দুই মাসের ছোহবতের রং তখন তাহার মধ্যে পরিলক্ষিত হইতেছিল। জামাল ও কামাল দুই বুযুর্গ ফয়েজ লাভ করায় ঢালকা নগরকে উজ্জ্বল করিয়াছেন। এর পরে জনাব হাজী আফসার উদ্দীন ঢালী সাহেব এবং তারপর জনাব হাজী কাজী দেলোয়ার ছাহেব দিক্ষিত হন এবং প্রাণ উৎসর্গকারী সেবকে পরিণত হন। তাহাদের সহিত জনাব হাজী আশরাফ সাহেবের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

হযরত মাওলানা হেদায়েত উল্লাহ সাহেব করাচীর হযরতের মজলিসে যাত্রাবাড়ি হইতে পায়ে হাঁটিয়া আসিতেন। খেলাফত পাওয়ার পর হযরতের সোহবত পাওয়ার জন্য বে-কারার হইয়া পড়িতেন। করাচী হইতে বাংলাদেশে আসিতে বেশী বিলম্ব হইলে বলিতেন এতদিন কি করিয়া ছবর করিব। মুহাদ্দিস সাহেবের নিকট এলম কম ছিল না। কিন্তু আল্লাহর এশকের জন্য পাগলপারা হইয়া যান।

www.pathagar.com

মাওলানা আবদুল গণী সাহেব ফুলপুরী (রহঃ), হযরত মাওলানা ওছিউল্লাহ সাহেব (রহঃ) এলাহাবাদী, হযরত মাওলানা শাহ্ মুহাম্মদ আহমদ প্রতাবগড়ী (রহঃ), হযরত মাওলানা শহীদুল্লাহ সাহেব খান জালালাবাদী (রহঃ)-এর নাম আমরা শুনিতে পাই নাই, পরিচয় জানিতাম না। হযরত মাওলানা হাকীম মুহাম্মদ আখতার সাহেব ঐ সকল মহাপুরুষদের পরিচয় করাইয়াছেন। তাহাদের এলমের তিনি মুখপাত্র হিসাবে কাজ করিতেন। আজ সারা মুসলিম জগতে একমাত্র হযরত মাওলানা শাহ্ আবরারুল হক সাহেব (করাচীর হুযুর) হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (রহঃ) এর মুখপাত্র বা তরজমান হিসাবে পরিচিত।

ঢালকা নগরের খানকায়ে এমদাদিয়া আশরাফিয়ার খাদেম হিসাবে আমাকে হারদুয়ীর হযরত খলীফার লিষ্টে নাম প্রকাশ করেন। সেইজন্য আমি ঢালকা নগরের খানকাহ্কে থানা ভবনের নকশায় গঠন করিবার জন্য চেষ্টা করিতে থাকি। কিছু ত্যাগী উদ্যোগী যুবক আলেম খেলাফত প্রাপ্ত হইয়া খানকাহ্র খেদমতে নিয়োজিত হউক, অন্তরে এই বাসনা ছিল। উহা হযরত মাওলানা হাকীম আখতার সাহেবের খেদমতে পেশ করিলাম। মাওলানা আবদুল মতিন সাহেবকে এবং কিছুদিন পরে মাওলানা ইসমাইল সাহেবকে আমার সহিত পরামর্শ করিয়া হযরত খেলাফত দিলেন। আলহামদুলিল্লাহ্! তাহাদের দ্বারা কাজ অনেকটা অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে।

আমাদের দেশে হিংসা খুব বেশী আবার বিনয়ও খুব বেশী। এই বিপরীতমুখী অবস্থার কারণে সুষ্ঠুভাবে কাজ করিতে বিরাট বাধার সৃষ্টি হইয়া থাকে। এই বিনয় আসল বিনয় নহে, লৌকিকতা মাত্র। হিংসার ব্যাধি প্রকট। হিত কামনাকারীকে হিত কামনার মূল্য দেয় না। বরং নিজ ক্রেডিট (কৃতিত্ব) প্রকাশে ব্যস্ত থাকা আমাদের অভ্যাস, উহার ইসলাহের জন্য হুযুর খুব বেশী চেষ্টা করিতেন।

হযরতের খেদমতে আবদার করিলাম হুযুর! ঢালকা নগরে থানা ভবনের নকশায় খানকাহ্ করা যায়। তাহার সহিত একটি ছোট মাদ্রাসা প্রয়োজন। সুন্নতের আমলী মশ্ক শিক্ষা দেওয়ার সুযোগ হইতে পারে, কিন্তু ঢালকা নগরের মসজিদ কর্তৃপক্ষকে বুঝাইতে সক্ষম হইলাম না। মসজিদ, মক্তব, খানকাহ্ একই নিজামের অধীন না হইলে কাজ সুষ্ঠুভাবে জারী করা যায় না।

হযরত আমাকে বলিলেন থানা ভবনের নকশে কদমে প্রতিষ্ঠান করিবার জন্য স্থান দেখ, জমির মূল্য আমি দিব। বহু খোজাখুজি করিলাম রুচিমত স্থান পাইলাম না। অবশেষে হাজী কোব্বাদ সাহেবকে তাঁর বাড়ী হইতে দুই কাঠা স্থান চাহিলাম, হয় বিক্রি করুন না হয় দান করুন। তিনি দান করিতে সম্মত হইলেন। ঐ স্থানে মাদ্রাসা হইলে এবং মসজিদের দক্ষিণ পার্শ্বে খানকাহ্ হইলে

www.pathagar.com

খানা ভবনের মত একটি দৃশ্য হইতে পারে। হুযুরের খেদমতে মঞ্জুরীর জন্য হাজী কোব্বাদ সাহেব লিখিলেন। হুযুর মঞ্জুরী দিয়া মাদ্রাসা চালাইতে বলিলেন। আমরা তাঁহার ঘরে দুই বৎসর মাদ্রাসা চালাইয়া পরে ১৯৯১ সালে মাদ্রাসার নিজস্ব ভূমিতে ইমারত শুরু করিবার জন্য হারদুয়ীর হযরত ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করিয়াছিলেন। মাদ্রাসার নাম মাদ্রাসা রওজাতুল উলূম রাখিলেন। ভিত্তি স্থাপনের সময় ২০ মিনিট পর্যন্ত দুই রাকাত নামায পড়িয়া দো'আ করিলেন। এই দো'আর সময় এক অপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা হয়, হযরতের চোখের পানিতে বুক ভিজিয়া যায়। ঐ দো'আয় বহু গণ্যমান্য আলিম, পীর, বুযুর্গ উপস্থিত ছিলেন।

হযরত সদর সাহেবের জীবদ্দশায় আমাদের দেশের বাড়ির গ্রামে দ্বীনী মক্তব মাদ্রাসা করিবার বিষয়ে বার বার দরখাস্ত করিয়াছিলাম, উত্তরে হযরত বলিতেন, পূর্ব পাকিস্তানের ৬৮ হাজার গ্রামে ৬৮ হাজার আদর্শ মক্তব স্থাপন করিবার বাসনা আমি তীব্রভাবে অনুভব করিতেছি। আলহামদুলিল্লাহ্‌। বহু স্থানে মক্তব কায়েম হইয়া গিয়াছে এবং হইতেছে, লোক তৈয়ার হইলেই এই অভাব পূরণ হইতে পারে। তুমিও ইনশাআল্লাহ মাদ্রাসা স্থাপন করিতে পারিবে। দেশের গোমরাহী মাদ্রাসার শিক্ষা ব্যতীত দূর হইতে পারে না।

উপযুক্ত উস্তাদ তৈরী করিবার জন্য আলেমগণকে ট্রেনিং দিয়া নূরানী ও নাদিয়ার মুরব্বীগণকে উৎসাহিত করিয়াছেন এবং বহু দো'আ করিয়াছেন, বিভিন্ন স্থানে ট্রেনিং সেন্টার কায়েম করাইয়া জনগণকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন। হযরত সদর সাহেব পাঞ্জাবের লুধিয়ানায় নূরানী ট্রেনিং-এর জন্য লোক পাঠাইয়া মূল কাঠামো মত শিক্ষার বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। লালবাগ মাদ্রাসাকে এই কাজের জন্য কেন্দ্র করিয়া মাওলানা জিয়াউর রহমান সাহেবকে নিয়োগ করেন। অতঃপর তাঁহাকে পাঞ্জাব পাঠাইয়া ট্রেনিং দিয়া আনাইলেন।

মাত্র কয়েক বৎসর পর মাওলানা আবদুল ওয়াহাব সাহেব ব্রাহ্মণ বাড়িয়ার ভাদুঘরে নাদিয়াতুল কোরআন নামে স্বল্পসময়ে বিশুদ্ধ কুরআন পাকের শিক্ষা আরম্ভ করেন। তাহার পর মাওলানা বেলায়েত হুসাইন সাহেব নূরানী তালীম প্রথমে কামরাঙ্গীর চর মক্তবে আরম্ভ করেন। অতঃপর বিভিন্ন স্থানে ক্যাম্প করিয়া 'তিন সপ্তাহের কোর্স' শিক্ষা দিতে থাকেন অতি অল্প সময়ের মধ্যে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে নূরানী ট্রেনিং-এর জনপ্রিয়তা ব্যাপক প্রসারলাভ করে।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে উহার জনপ্রিয়তা বহুগুণে বাড়িয়া যায়। উভয় পদ্ধতিই জনগণকে আকৃষ্ট করে। আমি আমার শায়েখের ইন্তেকালের পর হযরত হাফেজ্জী হুযুরের খেদমতে আদর্শ মক্তব স্থাপনের জন্য দো'আ চাহিয়াছিলাম। হুযুর বলিয়াছিলেন, যদি আল্লাহ পাক তৌফিক দান করেন তাহা হইলে দাওয়াতুল হকের মাধ্যমে আমিও চেষ্টা করিতেছি আদর্শ মক্তব স্থাপনের জন্য, তোমরা দো'আ কর। তখনও হুযুর রাজনৈতিক আন্দোলন আরম্ভ করেন নাই।

www.pathagar.com

১৯৮৩ সনে হযরত হাফেজ্জী হুযুর রাজনৈতিক আন্দোলন আরম্ভ করিলেন এবং বলিলেন, আল্লাহ যদি আমাকে কামিয়াব করেন আর ইলেকশনে যদি পাশ করিতে পারি তাহা হইলে ৬৮ হাজার গ্রামে ৬৮ হাজার আদর্শ মক্তব স্থাপন করিব, ইন্‌শাআল্লাহ্। মক্তবের শিক্ষার মাধ্যমেই দেশ হইতে গোমরাহী দূর হইবে।

ঢাকা ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটির আদর্শ মক্তব উক্ত পরিকল্পনার বাস্তব একটি প্রতিষ্ঠান। উহার ভিত্তি হাফেজ্জী হুযুর (রহঃ) স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। উহার বাস্তবায়নে জনাব প্রফেসর হামীদুর রহমান সাহেব ও তাঁহার সহকর্মী বন্ধুগণ জান-মাল কোরবান করিয়া আদর্শ শিশু শিক্ষা জারী রাখিয়াছেন। তাহার ওসিলায় বুয়েটের মধ্যে একটি শক্তিশালী দ্বীনী জামায়াত গড়িয়া উঠিয়াছে। আল্লাহপাক তাহাদিগকে দোজাহানে তরাইয়া নেন। আমীন।

আমি আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে হযরত সদর সাহেবের এন্তেকালের পর ঢালকানগরে জনাব মরহুম আলহাজ কোরবান আলী সাহেবের নিকট বারবার উপস্থিত হইতাম, তিনি মুসলিম কওমের দুঃখ-কষ্ট, অবনতির কথা শুনিয়া কাঁদিতেন এবং দুঃখ দুর্দশা মোচনের জন্য বেহিসাব টাকা খরচ করিতেন, মুসলমানের কষ্ট সহ্য করিতে পারিতেন না। তাঁহার অসুখের সময় যখন হাসপাতালে ছিলেন, আমি তাঁহার খেদমতে নিয়োজিত ছিলাম, স্বপ্নে আমাকে হযরত সদর সাহেব বলিলেন, তুমি জনাব কোরবান আলী সাহেবকে ছাড়িও না। তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া দ্বীনের কাজ করিয়া যাও।

জনাব কোরবান আলী সাহেব হযরত সদর সাহেবের অপ্রকাশিত পুস্তকগুলি প্রকাশের জন্য বড়ই আগ্রহী ছিলেন। আমাকে পাইয়া খুব সন্তুষ্টি প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার চিন্তা হযরত সদর সাহেবের চিন্তার খোরাক ছিল। বহু পুস্তক নিজ অর্থে ছাপাইয়া আমার দ্বারা প্রচার করাইয়াছেন, বহু পরামর্শে আমাকে ডাকিতেন।

মুসলিম কওমের গোমরাহী দূর করার জন্য তাঁহার ব্যতিব্যস্ত মস্তিষ্ক অনবরত জাগ্রত থাকিত। মক্তব মাদ্রাসা স্থাপনের জন্য তিনি সীমিত ক্ষমতা নিয়া সদা প্রস্তুত থাকিতেন।

প্রথমে তিনি তাঁহার জন্মভূমি যশোর জেলার ঝিকরগাছা থানাধীন মাটিকুমড়ায় বিশ্বাস বাড়ির পার্শ্বে এক আদর্শ মক্তব স্থাপন করেন এবং ঐ বাড়ির জামে মসজিদ পাকা করিয়া পুনঃনির্মাণ করেন, যাহার তত্ত্বাবধানে অধিকাংশ সময়ে আমাকে পাঠাইয়া দিতেন।

১৯৭২ সনে আমাকে নিয়া ঝিকরগাছা থানার বাঁকড়ায় ডিসেম্বর মাসে বেড়াইতে গেলেন। হাইস্কুলের উন্নয়নের জন্য উক্ত স্থানের কর্তৃপক্ষ যাত্রাপার্টি

www.pathagar.com

আনাইয়াছে। উহা দেখিয়া তাঁহার হৃদয় চূর্ণবিচূর্ণ হইল। বিশজন পুরুষ আর বারজন মহিলা উক্ত দলে দেখিয়া প্রাণে আগুন জ্বলিয়া উঠিল।

রব্বানী সাহেবদের গুদামের অফিসে স্থানীয় মুরুব্বীগণকে ডাকাইলেন। আমার দ্বারা সংক্ষিপ্ত বয়ান করাইলেন এবং বলিলেন, এই গোমরাহী কি করিয়া দূর হইবে? বাঁকড়া বাজারে কোন মসজিদ নাই, যেখানে মুসলিম কওমকে কিছু শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হইবে। আমি বলিলাম, মাটিকুমড়ায় মক্তব মাদ্রাসা ও মসজিদ করিয়াছি, উহা কোন কেন্দ্রীয় স্থান নয়। বাঁকড়া একটি কেন্দ্রীয় স্থান, তাই এখানে মাদ্রাসা-মসজিদ স্থাপন করা হউক। সকলেই উহার প্রয়োজনীয়তার কথা প্রকাশ করিলেন। স্থান দেখার জন্য প্রস্তাব হইল, সকলেই স্থান দেখিতে বাহির হইলাম। আমার পছন্দ হইল বাজারের উত্তর পার্শ্বের শ্মশান ঘাটের পশ্চিম দিকের স্থানটি। অপর সকল মুরুব্বীগণ ইহাই পছন্দ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে খুঁটি পোঁতা হইল। কার জমি, কে খুঁটি গাড়ে? জমি যারই হউক না কেন, জমির মূল্য দিয়া দিব, এখানেই মাদ্রাসা ও মসজিদ স্থাপন করিতে হইবে।

আল্লাহর অশেষ মেহেরবানী ১৯৭৩ সনে প্রথমে পাকা মসজিদ নির্মাণের কাজ হাতে নিলেন। উত্তর পার্শ্বে গোল পাতার ঘর করিয়া মক্তবের কাজ আরম্ভ হইল। ঢাকা হইতে ঐ জামানায় যশোর যাইতে কত যে কষ্ট হইত, ভাষায় তাহা বর্ণনাতীত। ঝিকরগাছা হইতে নৌকায় ১২ মাইল যাইতে হইত তারপর কাঁচা রাস্তা দিয়া কখনও মটর কার নিয়া উহার সহিত সফর করিয়াছি। কোদাল সঙ্গে নিয়া যাইতে হইয়াছে, কোথাও মাঠের মধ্য দিয়া যাইতে হইয়াছে। আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে বাঁকড়ায় আদর্শ মাদ্রাসা তিনি হায়াৎ থাকতে দেখিয়া গিয়াছেন।

ঢালকা নগরে আসিলেই বলিতেন, মাওলানা সাহেব এখানকার গোমরাহী দূর করার উপায় কি? আমার একই কথা যে, মসজিদ স্থাপন করা ছাড়া অন্য কোন উপায় নাই। আলহামদুলিল্লাহ্। ঢালকা নগর মসজিদ করার জন্য জমি কিনিয়া মসজিদ স্থাপন করিলেন। দক্ষিণ পার্শ্বে মক্তব স্থাপন করিলেন। বহু ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করিয়াও ক্ষান্ত হন নাই।

আমাকে বলিতেন, আচ্ছা ভাই ফজলুর রহমান সাহেব, এখানে কোন কামেল বুযুর্গ পীর আনাইয়া নসীহত করাইয়া মানুষগুলিকে চরিত্রবান করা যায় না? আমি বলিলাম, ইনশা আল্লাহ হবে, হবার রাস্তা হইতেছে। বেদআতীদের উৎপাত দেখিয়া নৈরাশ হবেন না। এই কাজ হঠাৎ হয় না, সময় লাগিবে। বলিতেন, যিকিরের মজলিস যাহা সদর সাহেব শিক্ষা দিয়াছেন, ঢালকা নগরে আরম্ভ করুন। আমি বলিলাম, কিছু লোক তৈয়ার করা ছাড়া আরম্ভ করা ঠিক হবে না।

www.pathagar.com

১৯৭১ হইতে দেশে অশান্তি রাজনৈতিক অস্থিরতা ও বিভিন্ন দলের উৎপীড়ন মানসিক ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। খাদ্য সংকটে লোক অনাহারে মরিতেছিল। ঐ সময়ের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা- কামাল সাহেবের আম্মার সমস্ত অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া রুটি বানাইয়া বেবীটেক্সীর পিছনে ভরিয়া মহল্লায় মহল্লায় গিয়া অনাহারী লোকদের রুটি বিতরণ করিয়াছেন। নিজের পরনের বস্ত্র ছাড়া একখানা কাপড়ও ঘরে ছিল না। সব বিবস্ত্র লোকদিগকে দান করিয়াছিলেন।

এই মহিয়সী মহিলা নিজ হাতে পাক করিয়া এই লেখক অধমকে খাওয়াইতে পারিলে কত যে সন্তুষ্ট হইতেন তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। ১৯৬৮ সনে জনাব কোরবান আলী সাহেব আমাকে হযরত সদর সাহেবের নির্দেশে হজ্বে পাঠাইয়াছিলেন, সেই হইতে আমি যেন তাহার সহোদর ভাই মনে করিয়া আদর যত্ন করিতেন। আমাকে তিনি ঢাকায় বাড়ি করিয়া নিজের কাছে রাখিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি বলিয়াছিলাম, হযরত সদর সাহেব আমাকে ঢাকায় বাসা বাড়ি করিয়া থাকিতে অনুমতি দেন নাই। আমি দ্বীনের প্রচারক আটকা থাকিবার অনুমতি আমার নাই। আমি বলিলাম, ভাই! আমার দেলের আরজু এই, আমার গ্রামের গোমরাহীকে দূর করার ব্যবস্থা করিতে পারি নাই, ফরিদপুরের এ,ডি,সি সাহেবের নিকট দরখাস্ত করিয়া ৮৭ শতাংশ জায়গা মাদ্রাসা স্থাপন করার জন্য পাইয়াছি। অর্থের অভাবে ঘর করিতে পারছি না। তৎক্ষণাৎ তিনি বন্দোবস্তের কাগজ আনাইয়া দেখাইতে বলিলেন। আমি কাগজ আনাইয়া ১ সপ্তাহ পরে দেখাইলাম। তিনি তখনই মাদ্রাসার ঘর করার জন্য দশ হাজার টাকা দিলেন। '৭৯ সনে ঘর নির্মাণ আরম্ভ হইল '৮০ সনে ঘর নির্মাণ করা শেষ হইলে নূরানী ট্রেনিং প্রাপ্ত শিক্ষক না পাইয়া, নিজের লোক কিশোরগঞ্জ ট্রেনিং নেওয়ার জন্য পাঠাইয়া ট্রেনিং দেওয়াইয়া আনিলাম এবং বাঁশগাড়ী রহমানিয়া মাদ্রাসায় লেখাপড়া ঠিকমত চালাইতে আরম্ভ করিলাম।

প্রতি বৎসর আহলে হক ওলামা পীর বুযুর্গগণকে নিয়া বার্ষিক মাহফিল করিয়া জনগণকে দ্বীনী শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট করিতে চেষ্টা করিতে থাকিতাম। এক কথায় বাঁশগাড়ী রহমানিয়া মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতাও মরহুম কোরবান আলী সাহেব ছিলেন। তিনি যখনই কোন দুর্ঘটনার কথা শুনতেন সঙ্গে সাহায্য নিয়া দুর্গত লোকদের কাছে সাহায্য পৌঁছাইতেন।

'৭০ সনে দক্ষিণাঞ্চল ভোলাসহ পটুয়াখালী বিধ্বস্ত হইল, অসংখ্য লোক মারা গেল, তখন লঞ্চ বোঝাই করিয়া কাপড় ও খাদ্য সামগ্রী নিয়া আমাদিগকে পাঠালেন। আমরা দশদিন পর্যন্ত বিভিন্ন এলাকায় উহা বন্টন করি।

www.pathagar.com

'৭৮ সনে কাশ্মিরের মুসলামানরা উচ্ছেদ হইয়া চট্টগ্রামের বাজার এলাকায় আশ্রয় নেয়। সেই সময় বহু নগদ টাকা, খাদ্য সামগ্রী ও কোরআন শরীফ নিয়া একটি কর্মীবাহিনী নিয়া খাদেমুল ইসলাম জামাত দুঃস্থ লোকদের মধ্যে পৌঁছান। তিনি যেন এই জামানার হাতেম তাঈ ছিলেন।

মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের অনিয়ম দেখিলে বড়ই মর্মাহত হইতেন। ধোকা, মিথ্যা, প্রতারণা সহ্য করিতেন না। লোক নির্বাচন করিতে অনেক বাছাই করিতেন। গুণের মর্যাদা দিতেন, নিয়মতান্ত্রিকতা, পরিচ্ছন্নতা, সময়ানুবর্তীতায় কোন ত্রুটি দেখিলে বড়ই রাগান্বিত হইতেন। মুসলমান বিশেষতঃ যাহারা আলিম তাহারা যদি আদর্শের খেলাফ করেন তাহা বড়ই অসহনীয় মনে হইত।

মাদ্রাসার ছাত্র ভর্তির বেলায় সংখ্যা বেশী নেওয়ার পক্ষপাতি ছিলেন না। বলিতেন, বাছিয়া ছাত্র নিবেন, উন্নত মানের খাদ্য দিবেন। স্বাস্থ্যকর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশে লেখাপড়া শিখাইবেন। বিজাতীয় লোকজন মাদ্রাসার বাড়িটা দেখিয়া যেন আকৃষ্ট হয়। অথচ আমাদের দেশের মাদ্রাসাগুলি সেই নিয়ম মত চলছে না। পানের পিক দেয়ালে ফেলছে, ঘর অপরিষ্কার, মাদ্রাসার সামনের স্থান আবর্জনায় পরিপূর্ণ। ইহা কি করিয়া সহ্য করা যায়? ভদ্র লোকের ছেলে কি এইরূপ নোংরা স্থানে পড়াইতে ইচ্ছা করে?

আফসোস!! ভাই কোরবান আলী সাহেব হযরত মাওলানা শাহ্ আবরারুল হক সাহেবকে দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। করাচীর হুযুরকে দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। তাহাদের প্রতিষ্ঠিত আদর্শ মাদ্রাসাও দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। কিন্তু তাহার মনের বাসনা বাস্তবায়িত হইয়াছে। ঢাকা তাঁহার বাসভবনের নিকটেই সেই আদর্শ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাহার বাসনা মতই ছাত্র ভর্তি করানো হইতেছে এবং সেই নীতি অনুযায়ী মাদ্রাসা চলছে। তিনি আজ বহু আউলিয়াগণের দোয়া পাইতেছেন। দোয়ার বৃক্ষ রোপন করিয়া গিয়াছেন। অফুরন্ত ছদকায়ে জারিয়ার রাস্তা করিয়া গিয়াছেন। আলহামদুলিল্লাহ তাহার অবর্তমানে তাহার বড় সাহেবজাদা জনাব হাজী কামাল সাহেব পিতার কাজকে আগে বাড়াইয়া উপযুক্ত উত্তরাধিকারীর মর্যাদা লাভ করিয়াছেন। আল্লাহ্র ওলীগণের ঢালকা নগর এসলাহী মজলিসে আগমণ এবং তাঁহাদের আতিথেয়তায় হাজী কামাল সাহেব যা দেখাইয়াছেন; তাহার উদাহরণ বিরল। তাঁহারা এবং তাঁহাদের সহযোগী ভাইগণ ইতিহাস রচনা করিয়াছেন। আহলে হকের নিখুঁত তরীকায় শিক্ষাকেন্দ্র, সিলসিলায়ে থানভীর (রহঃ) অনুকরণে ঢালকা নগরের তুলনা নাই।

কোরবান আলী সাহেবের শুকরিয়া আদায় করার ভাষা আমার নাই। আমি যেই স্নেহ তাঁহার ভোগ করিয়াছি তাহার ঋণ শোধ হইতে পারে না। তিনি প্রায়ই বলিতেন, আমার মৃত্যুর পর কি তুমি আমায় দোয়া করিবে? আমার নাজাতের উপায় কি হবে?

www.pathagar.com

আমি বলিতাম, যদি আপনার আগে আমার মৃত্যু হয়, তাহলে তো আর কিছু করার নাই। আর যদি আপনার এন্তেকাল আগে হয় আর আমি হায়াতে বাঁচিয়া থাকি, তবে কবরে বসিয়া আমার সওয়াব রেসানী দেখিবেন। তখন আপনার খাঁটি নির্লোভ বন্ধু কে? জানিতে পারিবেন। ইহার চেয়ে বেশী কিছু বলিতে চাই না। আপনি আমার কথায় ও কাজে আপনার তরবিয়তের সহিত মিল হওয়ায় যেই সন্তুষ্টি প্রকাশ করিয়াছেন, স্নেহের বশে আবদ্ধ করিয়াছেন, ইহাই আমার জন্য প্রধান সম্বল। না হয় আমার মত একজন নগণ্য লোকের পরামর্শ নেওয়া আপনার মনোঃপুত হওয়ার কথা নহে। কত আলিম আপনার নিকট আসে, কেহই পাত্তা পায় না, অথচ আমি আপনার প্রাণে স্থান পাইয়াছি, আমার দ্বারা দ্বীনের খেদমত করাইয়া তৃপ্ত হইয়াছেন ইহা অতি বড় সৌভাগ্যের কথা। আলহামদুলিল্লাহ্॥

আহ্! আফসোস, আমার সেই নেয়ামত জনাব কোরবান আলী সাহেব আমাদের ছাড়িয়া ...... দুনিয়া হইতে চিরবিদায় নিলেন, আবার এতিম হইলাম। কোথায় যাই কি করি? তাঁহার দোয়ার বরকতে আল্লাহ্ পাক আমাদিগকে ১৯৮১ সনে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ ওলীকূল শিরোমণি কুতবুল আলম হযরত মাওলানা শাহ্ আবরারুল হক হাক্কী দামাত বারকাতুহুম ও হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার সাহেবকে পাইয়া সোহবতের সঞ্জিবনী শক্তির দ্বারা মৃতপ্রায় প্রাণে জীবন লাভ করিলাম।

পরিবেশ পরিবর্তন হইল, মৃত সুন্নাত জিন্দা হইতে আরম্ভ করিল। আধ্যাত্মিক শিক্ষা সুন্নাতমুখী হইয়া উঠিল। যাহারা ইজতেমায়ী যিকিরের মজলিসের খেলাফ করিতেন, আজ তাহাদের দ্বারা মজলিস পরিচালনা হয়। আফসোস্! হযরত সদর সাহেব হুযুর (রহঃ)-এর সেই কদর সেই সময়ে বুঝিয়া তাঁহার ফয়েজ ও বরকত লাভ হইতে কওম বঞ্চিত রহিল।

আল্লাহ তা'আলার লাখো শোকর যে, আজ ঢালকা নগরের ইসলাহী মারকাজে হযরত সদর সাহেব হুযুরের সাহেবজাদা হযরত মাওলানা মুফতী হাফেয রুহুল আমীন, করাচীর হযরতের খেলাফত পাইয়া আসিয়াছেন। তাঁহাকে খানকার জিম্মাদারীও সোপর্দ করা হইয়াছে। ইহা কোন পরিকল্পিত কাজ নহে, সবই গায়েবী নেজামের অধীনে তাকবিনী তানজিমের দ্বারা সম্পাদন হইতেছে। আমার হায়াতে আমি দেখিয়া গেলাম আমার মোর্শেদ কেবলা হযরত সদর সাহেব (রহঃ) এর এসলাহী শিক্ষা তাঁহারই সন্তানের দ্বারা আল্লাহ্ পাক জারী করার ব্যবস্থা করিয়াছেন। আমার দীর্ঘ দিনের পরিশ্রম ও আশা ফলবতী হইয়াছে। কিয়ামত পর্যন্ত এই শিক্ষা জারী ও জীবন্ত-প্রাণবন্ত রাখুন, কওম ও মিল্লাতের সহীহ দিক নির্দেশনা করার তৌফিক দান করুন এবং এই খেদমতকে

www.pathagar.com

কবুল করিয়া নিন। সকল পীর ভাইগণের এসলাহ্ করিয়া দিন ও সকল সালেকীন গণের নেক মকসুদ পূরণ করুন এবং প্রত্যেককে সাহেবে নেসবত (যোগ্যতম) বুযুর্গ হওয়ার তৌফিক দান করুন। (আমীন)

হযরত সদর সাহেব (রহঃ) শিক্ষা জীবন সমাপ্তির পর থানাভবনে ছিলেন, এই দেশে ফিরার কোন পরিকল্পনা করেন নাই। তখন ১৯২৬ সনের শেষ ভাগে দারুল উলূম দেওবন্দের হযরত মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী (রহঃ) এর নিকট এক প্রস্তাব আসিল।

আফগানিস্তানের বাদশাহ্ জহীর শাহ্ দেওবন্দ মাদ্রাসায় পড়া একজন যোগ্য আলিম চাহিয়াছিলেন। যিনি আরবী, ফারসী ও ইংরেজী ভাষায় পারদর্শী। আফগানিস্তানের পররাষ্ট্র দফতরের সেক্রেটারী পদে লোক নিয়োগ করা প্রয়োজন। হায়দারাবাদের নিজাম দাক্ষিণাত্যের নিজাম রাজ্যের প্রধান বিচারপতি পদের জন্য দেওবন্দের ওস্তাদ শায়খুল আদব ওয়াল ফেকাহ হযরত মাওলানা ই'জায আলী সাহেবের নিকট দরখাস্ত করিলেন।

পূর্ব বাংলার কুমিল্লা জেলার ব্রাহ্মণবাড়িয়া মাদ্রাসা জামেয়া ইউনুসিয়া হইতে জনাব ইউনুস সাহেব এক দরখাস্ত মাওলানা থানভীর (রহঃ) নিকট পাঠাইলেন। হাদীসের দরস খোলার জন্য একজন উপযুক্ত মোহাদ্দেসের জন্য উপরোক্ত তিনজন বিখ্যাত বুযুর্গ মাওলানা শামছুল হক সাহেবের নাম প্রকাশ করেন।

এই প্রস্তাব তিন উস্তাদের তরফ হইতে পাইয়া মাওলানা শামছুল হক সাহেব বড় সমস্যায় পড়িলেন। প্রত্যেক উস্তাদই তাহার হিতাকাঙ্খী, কাহার প্রস্তাব রাখিবেন? তখন তিনি নিজের প্রাণের আবেগের কথা নিজ উস্তাদগণের নিকট পেশ করিলেন। হযরত মাওলানা সাইয়েদ হুসাইন আহমাদ মাদানী সাহেবের নিকট বলিলেন, হযরত আমার মনে চায় পূর্ব বাংলায় দারুল উলুমের নকশে-কদমে (অনুরূপ) মাদ্রাসা করিয়া দেওবন্দের তালীম তারবিয়ত জারী করিতে। এখন আমার রায় ফানা করিতেছি। হুযুর যেই হুকুম করিবেন তাহাই আমল করিব। তখন তিনি বলিলেন, নিজের দেশে ইলম জারী করাই বড় কর্তব্য।

এই রূপে হযরত মাওলানা ই'জাজ আলী সাহেবের খেদমতে মনের ভাব ব্যক্ত করিলেন। তিনিও পূর্ব বাংলায় দেওবন্দের তালীম তারবিয়ত জারী করার প্রতি সমর্থন করিলেন। সর্বশেষে মাওলানা থানভী (রহঃ) ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আবেদন দেখাইয়া বলিলেন, যাও তোমার বাসনা পূরণের জন্য আল্লাহর তরফ হইতে ফায়সালা আসিয়াছে। ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় গিয়া হাদীসের দরস আরম্ভ কর।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সংবাদ দেওয়া হইল। থানা ভবন হইতে মাওলানা শামছুল হক সাহেবকে পাঠাইয়া দিলাম। মাদ্রাসা হইতে প্রাপ্ত জামা কাপড় ও টায়ারের

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

এ ক্ষেত্রে দেরী করাকে তিনি মনে করতেন অমার্জনীয় অপরাধ। এ পর্যায়ে বিদগ্ধ সমাজে কাউকে আমরা এত শীঘ্র কোন ভুল স্বীকার করতে দেখি না। পাছে লোকে হয়ত বলবে যে, যে ভুল করে ফেলে সে আবার জ্ঞানী কিসের? এই খোঁড়া যুক্তিই বহু বিদ্বানকে যখন তখন সত্যকে স্বীকার করে নেয়ার পথে বাধা জন্মায়। কিন্তু এই মনীষীকে এইরূপ দুর্বলতার শিকার হতে দেখা যায়নি। কেননা, এখলাস তথা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করাই যদি মোমেন জীবনের লক্ষ্য হয় তাহলে ভুলকে ভুল বলে স্বীকার করতে দ্বিধা হবে কি কারণে? কারণ কি তাহলে এই যে, গায়রুল্লাহর নিকট নিজের মর্যাদা ও সুনামকে বহাল রাখতে হবে? না, আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে গায়রুল্লাহকে সন্তুষ্ট করার চিন্তা তো মহাপাপ। আর তার পরিণতি তো জাহান্নাম।

এ কারণেই আমরা মাওলানাকে দেখেছি: তিনি নিজের ভুল স্বীকার করে নিতেন একেবারেই নির্দ্বিধায়। আর আল্লাহর নিকট কামনা করতেন সঠিক হেদায়েত। উপমহাদেশের দিকে দিকে বুযুর্গানে দ্বীনের মধ্যে যখন মাওলানা মওদুদী সাহেবের ভুল-ত্রুটি নিয়ে আপত্তি উঠে তখনই মাওলানা তার সম্পর্কিত সুধারণাকে পরিবর্তন করেননি; বরং দীর্ঘকাল ধরে তার রচিত বই-পুস্তক পঙ্খানুপুঙ্খ রূপে অধ্যয়ন করেন এবং পরিশেষে তিনি তাদের সাথে একমত হয়ে 'ভুল সংশোধন' নামক পুস্তিকা লিখেন। এই পুস্তকে তিনি মাওলানা মওদুদী সাহেবকে প্রকাশ্যে তার ভুল স্বীকার করতে অনুরোধ জ্ঞাপন করেছেন।

মাওলানার লেখা কয়েকখানি বাংলা পাণ্ডুলিপির ভাষা পরিমার্জনা করার দায়িত্ব একবার এ অধমের উপর অর্পিত হয়। সহসা আমি দেখলাম ইসলামের সাম্য প্রসংগে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি যা লিখেছেন তা কমিউনিজমের মূল বক্তব্যের সাথে সম্পূর্ণরূপেই মিলে যায়। আমি তখন পাণ্ডুলিপিটি নিয়ে মাওলানার নিকট গেলাম এবং এই বিষয়টি উত্থাপন করতেই তিনি সযত্নে তাঁর লেখাটি সংশোধনের দায়িত্ব আমাকে অর্পণ করলেন এবং তাঁর জীবনে লিখিত যে কোন পাণ্ডুলিপিতে কোন ভুল পাওয়া গেলে তা সংশোধন করার অধিকার দান করলেন। আমি তখন বিস্মিত হলাম; আচ্ছন্ন হয়ে গেলাম মুহূর্তের মধ্যে। পরে হুযুরকে বললাম, হযরত! এত বড় দায়িত্ব পালনে আমার সামর্থ কোথায়? হযরত বললেন : আমি আস্থাবান, আল্লাহ তোমার সাহায্যকারী।

কুরআন পাকের ভাষ্যকার ঃ

কুরআন পাক সকল যুগের সকল স্থানের সকল জাতির— এক কথায় সমগ্র মানব জাহানের চিরন্তন পথ প্রদর্শক। সকল শ্রেণীর মানুষের গোটা জীবনের চালিকা শক্তি এই কুরআন। মানুষের পরিচয় কি? কে তার স্রষ্টা, বিশ্ব সৃষ্টিতে

www.pathagar.com

তার অবস্থান বা আসন কোথায়? কি ধরনের চিন্তা তার জন্য কল্যাণকর? কোন ধরনের আমল তার জন্য মঙ্গলজনক? তার ব্যক্তি জীবন, সমাজ জীবন ও রাষ্ট্রীয় জীবনে কি নীতি ও কি কি কাজ তাকে শান্তি দিতে সক্ষম? এই জীবন অবসান হওয়ার পর তাকে যেতে হবে তার স্রষ্টার কাছে। তার দরবারে তো হিসাব দিতে হবে তার জীবনের কার্যকলাপের। তাকে খুশী করতে পারলে তিনি দিবেন জান্নাত, নইলে তো চিরকালই থাকতে হবে তাকে জাহান্নামের অগ্নিকুন্ডে। তাই তো বলা হয় মানুষের ঈমান ও আমল— চিন্তা ও কর্মের কথাই বলে দেয় আল্লাহর এই কিতাব— কুরআনুল কারীম।

কিন্তু চিন্তা ও গবেষণার আবর্তে কুরআন পাক সম্পর্কে কেউ বলেছেন: ইহা একটি মিশন, কেউ বলেছেন: ইহা একটি আন্দোলন। আবার কেউবা বলেছেন: ইহা একটি আধ্যাত্মিক উন্নতির বাহন। মূলতঃ এগুলো হচ্ছে কুরআন পাকের বিভিন্ন দিক।

হযরত মাওলানা শামছুল হক (রহঃ) তাঁর 'হক্কানী তাফসীর' গ্রন্থে এই সত্যের প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, আলকুরআন হচ্ছে মানুষের ঈমান ও আমল সংক্রান্ত আল্লাহর কালাম। বস্তুতঃ এর চাইতে সহজ ও এর চাইতে নির্ভুল সত্য আর কিছুই হতে পারে না। তাঁর তাফসীর এক অনন্য বৈশিষ্টের অধিকারী। যেমন সহজবোধ্য, অনাবিল ও প্রাঞ্জল তেমনি মর্মস্পর্শী ও প্রেরণাদায়ক।

ইহা কোন প্রচারসর্বস্ব কিতাব নয়, নিছক কোন আন্দোলনের ইশতেহার (Menifesto) ও নয়, বিশেষ কোন আধ্যাত্মিক ধ্যান বা যিকির আযকারের অযিফাও নয়; বরং ইহা আল্লাহর মনঃপূত আদর্শ মানুষ ও মানব সমাজ গঠনের এবং তাদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক শান্তি ও নাজাতের একটি সর্বাত্মক কর্মসূচী। যে আল্লাহ অপরিসীম স্নেহভরে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন সেই আল্লাহর স্নেহের ভেতর থেকে তারই কথা অনুসরণ করে করে ইহলৌকিক জীবন কাটানো এবং পারলৌকিক জীবনে তার সাথে মিলিত হওয়ার পন্থাই হল আল-কুরআন। মাওলানার এই তাফসীর তাই ইসলামের শাশ্বত আদর্শের বাস্তব পয়গাম।

প্রসিদ্ধ আলেম শাইখুল হাদীস মাওলানা আজিজুল হক সাহেব 'তাফসীরে হাক্কানীর' আমপারা সম্পাদনা করেছিলেন। তিনি এ তাফসীর প্রসংগে বলেছেন : এর প্রতিটি কথাই কোন না কোন নির্ভরযোগ্য পামাণ্য তাফসীর থেকে গৃহীত। এ কারণেই তাঁর তাফসীর এমন আকর্ষণীয় ও অনবদ্য যে, এর তুলনা সত্যিই বিরল। প্রসংগত: আমরা দুঃখিত যে, সূরা ইয়াসীন, আমপারা এবং আরো একটি খণ্ড ছাড়া তাঁর এ অমূল্য তাফসীর-সমগ্র থেকে এখনো আমরা বঞ্চিত। তাঁর সুযোগ্য উত্তরাধিকারীদের দৃষ্টি আমরা এদিকে আকর্ষণ করছি।

www.pathagar.com

মাওলানার অবদান:

এই নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধে মাওলানার অবদানের কথা বিস্তৃত আকারে তুলে ধরা কোন প্রকারেই সম্ভব নয়। তাই কয়েকটি শিরোনামে মাওলানার অবদান সমূহকে অতি সংক্ষেপে তুলে ধরছি।

এক: ইসলামকে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে পেশ করা ঃ

মুসলিম জাহানের বিভিন্ন দেশে ফিরিঙ্গীদের সেকিউলার শাসনের নির্মম যাঁতাকলে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় অংগন থেকে ইসলামকে বিতাড়িত করার পর এবং দিকে দিকে মুসলমানদের বিপর্যয় ও পতনের পর শিক্ষা ও সংস্কৃতির পরিমন্ডলে যে পরিবর্তন সূচিত হয়, তারই ফলশ্রুতিতে এক সময় এ দেশের মুসলমানরা মনে করতে শুরু করে যে, নামায-রোজা, হজ্জ-যাকাত ও তাসবীহ-তাহলীল এবং বড় জোর বিবাহ-তালাক, ফারায়েজ ইত্যাদি নিয়েই ইসলাম। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক জীবনে ইসলামের কোন বিধান বা আইন-কানুন থাকতে পারে– এরূপ কোন কল্পনা করাও মহাপাপ। এক কথায় জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর দাসত্ব এবং রসূল (সাঃ) এর আনুগত্যের কোন ধারণাই অবশিষ্ট রইল না। শুধু ব্যক্তি জীবনে মোত্তাকী বা পরহেজগার হওয়াকেই সর্বোচ্চ মানের দ্বীনদারী মনে করা হত।

হযরত মাওলানা শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রহঃ)-ই সর্ব প্রথম এই উপমহাদেশে এ সংকীর্ণ মনোভাব থেকে মুসলিম মিল্লাতকে মুক্তি দেয়ার জন্য প্রবল আন্দোলন শুরু করেন। তিনিই স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেন: ইসলাম মানুষকে বৈরাগ্য গ্রহণের নির্দেশ দেয় না। ইসলাম এসেছে মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রে কুরআন-সুন্নাহর বিধান বাস্তবায়ন করে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনে শান্তি ও নাজাতের পথ প্রদর্শন করতে- সংসার, সমাজ, রাষ্ট্র ও আন্তজার্তিক জীবনে সর্বত্রই তার অমোঘ বিধান কার্যকর করতে।

বলা বাহুল্য বৃটিশ শাসনের আওতায় ইসলামকে বৈরাগ্যবাদ রূপে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যে বহুমূখী যড়যন্ত্র করা হয় তার ফলে ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান কেন্দ্রিক বৈপ্লবিক আন্দোলন শাহ্ ওয়ালী উল্লাহর উত্তর সূরিদের মধ্যে ব্যাপক ও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। হযরত মাওলানা শামছুল হক (রহঃ) তাঁরই অন্যতম শীর্যস্থানীয় উত্তরসূরি হিসেবে এই আন্দোলনকে আরো দূর্বার ও প্রাণবন্ত করে তোলেন।

www.pathagar.com

দুই: কোরআনী আইন কায়েম করার সংগ্রাম ফরয-
তা বাস্তব জীবনে প্রমাণ করা ঃ

এ ক্ষেত্রেও মাওলানা ছিলেন হযরত শাহ্ ওয়ালী উল্লাহর সুযোগ্য অনুসারী। তবে বাংলা ভাষাভাষীর বৃহৎ জনপদে যে কয়জন মুষ্টিমেয় সিংহপুরুষ কোরআন সুন্নাহর আইন মোতাবেক চলার উদ্দেশ্যে একটি খেলাফত প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন তিনি ছিলেন তাদের অন্যতম।

বস্তুতঃ এ কারণেই মাওলানা শামছুল হক (রহঃ) যোগদান করেন নিখিল ভারত জমিয়তে উলামায়ে ইসলামে, শরীক হন 'হুকুমাতে ইলাহী' প্রতিষ্ঠার পতাকাবাহী মুসলিম লীগের পাকিস্তান আন্দোলনে উহার সহযোগী হিসেবে। বাংলার গ্রামে-গঞ্জে এবং সিলেট রেফারেন্ডামে স্বাধীনতার সপক্ষে গণভোট সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। এখানেই শেষ নয়, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তিনি উল্কার মত ছুটে বেড়ান পাকিস্তানের সকল মাযহাব ও ফেরকার গ্রহণ উপযোগী শাসনতন্ত্রের প্রেক্ষিতে ২২ দফা মূলনীতি প্রণয়নের আন্দোলনে, ছুটে বেড়ান জীবনকে বাজি রেখে পাকিস্তানের আদর্শ প্রস্তাব পাশ করানোর জনসভা, বিক্ষোভ, মিছিল সম্বলিত সর্বাত্মক জিহাদের।

তিন : দ্বীন প্রতিষ্ঠার মূল উৎস কোরআনী মক্তব ও মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠা ঃ

এ ক্ষেত্রেও মাওলানা শামছুল হক (রহঃ) অনুসরণ করেছিলেন শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ (রহঃ) এর উত্তরসূরিদের, বিশেষ করে দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা উলামা মাশায়েখদের। ত্রিবিধ উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত করাই ছিল এই মাদ্রাসার লক্ষ্য। (১) কোরআন-হাদীসের কোন নির্বাচিত অংশের নয় বরং সর্বাত্মক এবং পূর্ণাঙ্গ বৈপ্লবিক শিক্ষাই ছিল এর প্রথম উদ্দেশ্য। (২) উক্ত শিক্ষা অনুযায়ী হুকুমাত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইসলামের শত্রুদের হাত থেকে এ দেশকে মুক্ত করে ইসলামী খেলাফতের জ্ঞান এবং উহার বাস্তবায়নের জন্য যথা সম্ভব প্রশিক্ষণ ও প্রস্তুতি গ্রহণ করা এবং (৩) ইসলামের আত্মিক ও আধ্যাত্মিক বিধি অনুযায়ী নিজ নিজ চরিত্র গঠন করে আল্লাহর ওলী হওয়ার জন্য সর্বাত্মক কোশেশ করা। এই লক্ষ্য নিয়েই মাওলানা কায়েম করেছেন শত সহস্র মাদ্রাসা এবং এর পশ্চাদ্ভূমি রচনার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছেন হাজার হাজার কোরআনী মক্তব।

চার : ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিজয় ও প্রাধান্য সৃষ্টির পদক্ষেপ ঃ

মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ) এ সত্য পুরোপরিই অনুধাবন করেছিলেন যে, ভারতের মাদ্রাসাগুলোতে যে ধর্ম শিক্ষা দেয়া হয় তাতে করে শিক্ষার্থীদেরকে এ দেশের মাদ্রাসা শিক্ষিতদের ন্যায় দুর্বল হতে হয় না। কারণ

www.pathagar.com

হলো : তারা মাতৃভাষায় শিক্ষালাভ করে বলে বাইরের বৃহত্তর লেখনি জগতে এবং শিক্ষা সংস্কৃতির ব্যাপক পরিমন্ডলে সাধারণ শিক্ষিতদের ন্যায় অংশগ্রহণ করতে পারে। ফলে তাদের কর্মক্ষেত্র হয় বৃহত্তর এবং অধিক প্রশস্ত। কিন্তু দুর্ভাগা এই বাংলাদেশের ইসলামী শিক্ষার্থীদের। তারা মাদ্রাসায় অধ্যয়ন করে উর্দু মাধ্যমে, ফলে বাইরের শিক্ষা-সংস্কৃতির জগতে হয় তারা অপাংক্তেয়, কর্মপরিধি হয় তাদের সংকীর্ণ ও সমস্যা সঙ্কুল। এ দেশের এই গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গনের জন্য একচেটিয়া ভাবে যোগ্য হয়ে উঠে সাধারণ শিক্ষিতরা। এই পরিস্থিতির প্রতি লক্ষ্য করে মাওলানা বলেছিলেন : "ধর্মহীন সাধারণ শিক্ষা যেমন মারাত্মক, তেমনি কর্মহীন ধর্ম শিক্ষাও জাতির জন্য ক্ষতিকর।"

তাই তিনি ইসলামী শিক্ষাকে ফলপ্রসু করার লক্ষ্যে নিম্নরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন ঃ

১. উর্দু মাধ্যমের পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের শিক্ষাদানে বাংলা পরিভাষাসহ বাংলা মাধ্যমের সহায়তা গ্রহনের উপদেশ দিতেন।

২. অতিরিক্ত বাংলা লেখার ক্লাশ চালু করার পরামর্শ দিতেন।

৩. বাংলা-ইংরেজী শিক্ষিত শিক্ষার্থীদেরকে লেখক হওয়ার জন্য বিশেষ ভাবে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করতেন।

৪. মাদ্রাসা শিক্ষিতদের কিংবা ইংরেজী শিক্ষিতদের লেখক, সাংবাদিক ও ইসলামের প্রচারক সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ঢাকাস্থ ফরিদাবাদে তিনি 'ইদারাতুল মা'আরিফ' নামে একটি প্রতিষ্ঠান কায়েম করেন।

৫. মাদ্রাসা শিক্ষা ও কারিকুলামের অনুপযোগী বিষয় ও পুস্তক বাদ দিয়ে তদস্থলে যুগোপযোগী ভাষা ও বিষয় সংযোজন করে ইসলামী কওম ও মিল্লাতের উপযুক্ত নাগরিক গড়ে তোলার লক্ষ্যে একটি মাদ্রাসা বোর্ড গঠনের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতেন। বস্তুতঃ তাঁর এই মহান স্বপ্নের বাস্তবায়ন ঘটে ১৯৭৮ সালে 'বেফাকুল মাদারিস' (বাংলাদেশ কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড) এর প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।

আর এরই সাথে সাথে তাঁর স্বপ্ন ছিল ইসলামী আদর্শে বাংলা ও ইংরেজীর সাথে সাথে সকল বিষয়ের পাঠ্য পুস্তক রচনা করা। এই মনীষীর এই স্বপ্নেরও এক বৃহৎ অংশ বাস্তবায়িত হয়েছে ১৯৯২ সন ও তার পরবর্তী কয়েক বছরে 'বেফাকুল মাদারিস' কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনায় এবং অধমের ন্যায় কিছু ব্যক্তির ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়। খুশীর বিষয় এ কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনায় মাওলানার স্বপ্ন যে আরো সুন্দর ও স্বার্থক ভাবে বাস্তবায়িত হবে তাতে কোন সংশয় নেই। আল্লাহ তাঁদের সহায় হোন।

www.pathagar.com

এই মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে (প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত) মাতৃভাষা বাংলাকে বাধ্যতা মূলক মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং উপরের স্তর সমূহে বাংলার প্রতি অন্যতম মাধ্যম বলে গুরুত্বারোপ করেছে।

এছাড়া এই সংস্থা শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে স্বকীয় তত্ত্বাবধানে পরীক্ষা পরিচালনা করে ইসলামী শিক্ষাকে সুসংবদ্ধ, উৎকর্যমুখী এবং জাতীয় জীবনের সর্বস্তরের জন্য উপযোগী করে গড়ে তোলার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আর এ শিক্ষাকে অন্যতম জাতীয় শিক্ষার মর্যাদা দেয়ার জন্য সরকারের সাথে নিয়মতান্ত্রিক ভাবে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে।

পাঁচ : আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে চরিত্র গঠনের অপরিহার্যতা বিশ্লেষণঃ

মাওলানা শামছুল হক (রহঃ) ছিলেন হিজরী চতুর্দশ শতকের মুজাদ্দেদ বা সংস্কারক হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ)-এর সুযোগ্য অনুসারী। এ সত্য তাঁর নিকট স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে, আল্লাহ তা'আলার এবং বিশ্বনবী (সাঃ) যেমন নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদিকে ফরয বলে ঘোষণা করেছেন, ঠিক তেমনি একদিকে সবর, অল্পে তুষ্টি, বিনয়, মিতব্যয়িতা, সাহসিকতা, বদান্যতা, এখলাস ইত্যাদিকে অবলম্বন করার এবং অন্যদিকে অহংকার, রিয়া, কার্পণ্য, অপব্যয়, পরশ্রীকাতরতা, গীবত, পরনিন্দা ইত্যাদি বর্জন করার নির্দেশ দান করেছেন। আবার নামায, রোযা, হজ্জ প্রভৃতির জ্ঞান অনুশীলন করা যেমন ফরয, ঠিক তেমনি ভাবে সৎ গুণাবলী অর্জন ও অসৎ স্বভাব তথা ত্রুটিগুলো থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য বিচক্ষণ চরিত্র গঠনকারী তথা পীরের পথ প্রদর্শনও একান্ত অপরিহার্য। আত্মিক সংশোধনের কাজটিকে খুব সহজ বা ইচ্ছা করলেই হয়ে যাবে বলে মনে করা স্পষ্ট বাতুলতা ছাড়া অন্য কিছুই নয়। সচ্চরিত্রবান বুজুর্গানে দ্বীনের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেই এ কথা অনায়াসেই বোঝা যায়। আত্মিক সংশোধনের এই আবশ্যকীয় কাজটিকেই মাশায়েখদের পরিভাষায় বলা হয় ইসলাহে নফস।

মোটকথা, পবিত্র কোরআন-সুন্নাহতে যে ভাবে জোরালো ভাষায় শরীয়তের অন্যান্য বিধি নিষেধের কথা উচ্চারিত হয়েছে, ঠিক সেইরূপ জোর দিয়েই আত্ম-সংশোধনের হুকুম দেওয়া হয়েছে। সুতরাং দৈহিক ও আর্থিক ইবাদতের হুকুম যেমন অলঙ্ঘনীয়, আত্মিক ইবাদতের আদেশও তেমনি অপ্রতিরোধ্য। এ সত্যকে সামনে রেখেই মাওলানা শামছুল হক (রহঃ) রচনা করেছেন, 'ইসলাহে নফছ' নামক অতীব প্রয়োজনীয় পুস্তক। আর এ সত্যের তাগিদে তিনি দায়িত্ব পালন করেছেন বহু খোদাভীরু মানুষের আত্মিক ইসলাহের মাধ্যমে। শত সহস্র খোদা প্রেমিককে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন তিনি মঞ্জিলে মকসুদের স্বর্ণশিখরে।

আল্লাহ পাক এই মহামনীষীকে তাঁর জান্নাতুল ফেরদাউসে স্থান দিন, এবং তাঁর আদর্শে যুগে যুগে এই বনী আদমকে উজ্জীবিত ও অনুপ্রাণিত করুন- এই আমাদের শেষ প্রার্থনা। আমীন॥

www.pathagar.com

হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ)
স্মৃতি পটে যা এঁকেছি
মাওলানা সিদ্দীকুর রহমান

তখনও আমার সাধারণ জ্ঞানটুকুও হয়নি। সবে মাত্র আমি স্কুলে যেতে শুরু করেছি। দাদার আমলের সেই মরিচা ধরা টিনের ঘরটির স্থলে আমাদের আরেকটি বেশ বড় টিনের ঘর নির্মাণ করা হয়েছে। কিন্তু এখনও তার জানালা-দরজার কাজ সম্পন্ন হয়নি। গ্রামে রব উঠেছে আজ আমাদের স্কুলের মাঠে ওয়াজ হবে। চটাইমালীর হুযুর (গওহারডাঙ্গা মাদ্রাসার মোহতামিম সাহেব) ও ছদর সাহেব ওয়াজ করবেন। বাদ মাগরিব হযরত সদর সাহেব (রহঃ)-কে প্রথম দেখার সৌভাগ্য হল। তখন মঞ্চে তিনি এমনভাবে মাথা নিচু করে বসেছিলেন যেন কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন রয়েছেন। মাহফিল শেষে তাঁরা উভয়ই আমাদের বাড়ীতেই রাত্রি যাপন করেন।

হযরত মুহতামিম সাহেব (রহঃ) ছিলেন আমাদের সেই ঘরে এবং সদর সাহেব (রহঃ) আমার এক চাচার ঘরের এক বিশেষ কামরায়। ফজর বাদ যখন আমাদের সেই নবনির্মিত টিনের ঘরে হযরত মুহতামিম সাহেব তার সুললিত কণ্ঠে পবিত্র কুরআন মজীদ তেলাওয়াত করছিলেন তখন আমি ঘরের বাইরে দাঁড়িয়েই তন্ময় হয়ে তাঁর কুরআন পাঠ শুনছিলাম। গ্রামে-গঞ্জে তখন যাতায়াত ব্যবস্থা মোটেই সন্তোষজনক ছিল না। পায়ে হাঁটা কিংবা বড় জোর নৌকা ছাড়া আর কোন উপায় ছিলনা। অতএব, হযরত সদর সাহেব (রহঃ)-কে গওহারডাঙ্গা হতে নৌকা যোগে আনা হয়। কিন্তু আমাদের গ্রাম থেকে তিন মাইল দূরেই তাঁকে নৌকা হতে নামতে হয়। এদিকে কিভাবে কোথা হতে একটি ঘোড়ার ব্যবস্থা করা হয় এবং অবশিষ্ট পথটুকু তিনি ঘোড়ায় আরোহণ করেই আসেন।

সকালে নাস্তা শেষ হলে ঘোড়াটি নিয়ে আসা হয়। ঘোড়াটি নাকি ছিল বড় অবাধ্য ও অশান্ত। কেউই তার পীঠের ওপর সহজে আরোহণ করতে সক্ষম হতো না। কিন্তু ঘোড়াটিকে যখন দরজার সম্মুখে দাড় করানো হল তখন হযরত সদর সাহেব (রহঃ) অতি সহজেই তার ওপর আরোহণ করলেন। ঘোড়াটি যে এত বাধ্য ও শান্ত ইতিপূর্বে কেউ কখনও তা বুঝতে পারেনি। এ অবস্থা দেখে উপস্থিত সকলে বিস্ময় প্রকাশ না করে পারল না। কেউ মনে মনে আর অনেকেই মুখে মুখে বলতে বাধ্য হল, এটা হযরত সদর সাহেব (রহঃ) এর কেরামতি।

ইংরেজী ১৯৫৪ সাল। আমি তখন সবেমাত্র গওহারডাঙ্গা মাদ্রাসায় এসেছি। পাকিস্তানে তখন সর্বত্রই নির্বাচনের হাওয়া প্রবল বেগে প্রবাহিত। মুসলিম লীগ

www.pathagar.com

সরকারের জুলুমের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানে 'যুক্তফ্রন্ট' গঠিত হয়েছে। বৃটিশ শাসন হতে স্বাধীনতা লাভের পর হযরত মাওলানা শামছুল হক সাহেব সরাসরি কোন দলীয় রাজনীতির সাথে জড়িত না থাকলেও দেশের রাজনীতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন ও সজাগ ছিলেন। তিনি তখন উক্ত যুক্তফ্রন্টের ঘোর বিরোধী ছিলেন। কারণ যুক্তফ্রন্টের মূল ও শক্তিশালী যে দলটি ছিল তার সম্পর্ক ছিল সমাজতান্ত্রিক দেশের সাথে। আর পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রের ভিত্তি কুরআন ও সুন্নাহ হবে বলে অঙ্গীকার রয়েছে; সমাজ তন্ত্রের পতাকাবাহী কোন দলের শাসন ক্ষমতা লাভের পর তা যে কেবল স্বপ্নই থেকে যাবে; কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে দেশের যাবতীয় জুলুম অবিচারের অবসান ঘটিয়ে ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা এবং দেশের সকল অপসংস্কৃতির বিলোপ ঘটিয়ে তদস্থলে ইসলামী সংস্কৃতি সুপ্রতিষ্ঠিত করা যে কখনও সম্ভব হবে না, এ কারণে তিনি যুক্তফ্রন্টের সমর্থন করতে পারেননি। যদিও তারা তখন জুলুম অত্যাচারের অবসান ঘটাবার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেই মাঠে নেমেছিলেন।

আল্লামা শামছুল হক (রহঃ) জামেআ কুরআনিয়া লালবাগের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ ছিলেন। বছরের বেশীর ভাগ সময় তিনি ঢাকায় অবস্থান করতেন। কিন্তু মাঝে মধ্যে তাঁর গওহারডাঙ্গা মাদ্রাসায় অবস্থান কালে সুদূর ঢাকা হতে মুসলিম লীগের নেতৃবর্গ এবং কোন কোন মন্ত্রীও তাঁর সাথে পরামর্শের জন্য গওহারডাঙ্গা ছুটে যেতেন। গোপালগঞ্জের তৎকালীন সরকারের বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব ওয়াহিদুজ্জামান (ঠান্ডা মিয়া) ও পিরোজপুরের মন্ত্রী আফজাল মিঞাকেও আমার সেই কচি বয়সে গওহারডাঙ্গায় আল্লামা শামছুল হক সাহেবের দরবারে উপস্থিত হতে দেখেছি। মুসলিম লীগের নেতৃবর্গ মৌলিক ভাবে কুরআন সুন্নাহকে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রের ভিত্তি হিসাবে মেনে নিয়েছিলেন, পাকিস্তান আন্দোলনের সময় তারা বহু সভা-সমিতিতে স্পষ্টভাবে একথা ঘোষণাও করেছিলেন।

অতএব পাকিস্তানে যাতে ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করতে না পারে সেজন্য একটি বিশেষ মহলের গোপন তৎপরতা থাকলেও তখন মুসলিম লীগের বিশিষ্ট কিছু সংখ্যক নেতৃবর্গের সহায়তায় সংসদে ইসলামী শাসনতন্ত্র পাস হতে পারে এই আশায় হযরত মাওলানা মুসলিম লীগের সমর্থন করেন এবং কোন কোন জনসভায়ও তিনি নির্বাচনে তাদের বিজয়ী করার জন্য বক্তব্য রাখেন। আমাদের প্রতিবেশী দেশটি ভারত বিভক্তিকে কোন কালেই মনে-প্রাণে মেনে নেয়নি। পাকিস্তান আমলে এবং বাংলাদেশের (তৎকালীন পূর্বপাকিস্তান) একটি রাজনৈতিক দলের ভারত প্রীতির খ্যাতি ছিল। বর্তমানে বাংলাদেশেও তাদেরকে কোন কোন মহল ভারতের দালাল বলে আখ্যা দিয়ে থাকে। ১৯৫৪ সালে সেই

www.pathagar.com

দলের সাথে দেশের একটি ইসলামী দলের যুক্তফ্রন্টে যোগ দেয়ার পর উক্ত দলের সভাপতি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে হযরত মাওলানা এক বৈঠকে বলেন, "তিনি বড় বুযুর্গ সন্দেহ নেই, কিন্তু রাজনীতি আমার চেয়ে বেশী বুঝেন না।" বস্তুত কোন শক্তিশালী বড় দলের সাথে জোট গঠন করলে সাময়িক ভাবে ছোট দলের কিছুটা সুযোগ-সুবিধা হলেও পরবর্তীতে শক্তিশালী দলের বিজয় লাভের পর তার নিজস্ব নীতিমালাই প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস পায় এবং ভিন্নমতের ক্ষুদ্রক্ষুদ্র দলের সাথে বিজয়ী দলের নতুন করে সংঘাত শুরু হয়। বস্তুতঃ এ কারণেই যুক্তফ্রন্টের বিজয়ের পর যুক্তফ্রন্ট কেবিনেটের শিক্ষামন্ত্রী আশরাফুদ্দীন চৌধুরী একটি ইসলামী দলের একজন শক্তিশালী সদস্য হয়েও নীতির কোন পরিবর্তন ঘটাতে পারেননি। এ কারণে হযরত মাওলানা শামছুল হক সাহেব আফসোস করে বলতেন, তিনি মন্ত্রী হয়ে কি করলেন! সেই ব্রিটিশের শিক্ষানীতিই রয়ে গেল!

দেশের সার্বভৌমত্ব, স্বাধীনতা রক্ষা ও ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে দেশ হতে যাবতীয় জুলুম অত্যাচারের অবসান ঘটিয়ে একটি কল্যাণময় দেশ গড়ার ব্রত নিয়েই হযরত মাওলানা তখন মুসলিম লীগের নেতৃবর্গের ওয়াদার উপর আস্থা রেখে মুসলিম লীগের প্রতি সমর্থন প্রদান করেছিলেন। আর এ উদ্দেশ্যে দেশের উলামায়ে কেরাম ও মুসলিম জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন। উক্ত লক্ষ্যে তিনি ছারছীনার মরহুম হযরত মাওলানা আবুজাফর মুহাম্মদ সালেহ্ সাহেবকেও (রহঃ) গওহারডাঙ্গা মাদ্রাসায় দাওয়াত দিয়েছিলেন। ছারছীনার মরহুম পীর মাওলানা আবু জাফর মুহাম্মদ সালেহ সাহেব ও শামছুল হক সাহেব সম্পর্কে তৎকালীন যুক্তফ্রন্টের একটি বিশেষ দলের লোকেরা অত্যন্ত অশালীন ও অশোভন উক্তি করতে থাকে। কিন্তু তাঁরা তা নীরবে সহ্য করেন।

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানে যুক্তফ্রন্ট বিপুল ভোটে বিজয়ী হয় এবং প্রাদেশিক পরিষদে মুসলিম লীগের ভরাডুবি হয়। জাতীয় পরিষদেও পূর্ব-পাকিস্তান মুসলিম লীগের অতি নগণ্য সংখ্যক সদস্য নির্বাচিত হন। পূর্ব পাকিস্তানে জনাব আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রী সভা গঠন করে এবং ক্ষমতা গ্রহণের পর পরই প্রদেশের শিক্ষানীতি নির্ধারণের জন্য একটি কমিশন গঠন করা হয়। কমিশনের রিপোর্টে মুসলিম "Sentiment" এর প্রতি দারুন ভাবে আঘাত হানা হয়। উক্ত রিপোর্টে বলা হয় "Madrasa education is totally waste" অর্থাৎ মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ সময় ও সম্পদের অপচয়। এছাড়া সাত বছর বয়সে সকল ছেলেমেয়ের জন্য স্কুলে যাওয়া বাধ্যতামূলক করার সুপারিশ করে। এতে মুসলমান ছেলেমেয়েদের ইসলামের মৌলিক শিক্ষা লাভের পথরুদ্ধ করা হয়। হযরত মাওলানা পূর্বে যা আশংকা

www.pathagar.com

করেছিলেন বাস্তবে তাই ঘটতে যাচ্ছে দেখে তাঁর শিরা-উপশিরায় যে জেহাদী লহু প্রবাহিত ছিল তা লাভায় পরিণত হয়। তাই কমিশনের রিপোর্টের বিরুদ্ধে তিনি ক্ষোভে ফেটে পড়েন। পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র সফর ও সভা-সমাবেশ করে জাতিকে শিক্ষা কমিশনের সুপারিশের ভয়াবহতা সম্পর্কে জাগ্রত করেন। গওহারডাঙ্গার পার্শ্ববর্তী গ্রাম গিমাডাঙ্গার ঐতিহাসিক ময়দানে লক্ষাধিক লোকের এক বিশাল সমাবেশে তিনি শিক্ষা কমিশনের সুপারিশমালা পাঠ করে শুনান এবং উপস্থিত জনসমুদ্রে উক্ত সুপারিশের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং ধিক্কার জানাতে থাকেন।

এখানেই শেষ নয় বরং তিনি সুপারিশ বাতিল করার জন্য হাজার হাজার টেলিগ্রাম মুখ্যমন্ত্রীর নিকট প্রেরণ করার ব্যবস্থা করেন। কমিশনের সুপারিশের বিরুদ্ধে সারা দেশে ক্ষোভ ও ঘৃণার কারণে অবশেষে সরকার সুপারিশ বাতিল করতে বাধ্য হয়।

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মিঃ ফিরোজ খান এর নেতৃত্বে পাকিস্তানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা গঠন করা হয়েছিল। অতঃপর পরবর্তীতে পার্লামেন্টের কোন এক অধিবেশনে পাকিস্তানে প্রবর্তিত পৃথক নির্বাচনের স্থলে যুক্ত নির্বাচনের বিল উত্থাপন করা হবে বলে খবর প্রচারিত হওয়ায় এদেশের মুসলমানদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। বস্তুতঃ যুক্তনির্বাচনের ফলে মুসলমানদের সঠিক প্রার্থী নির্বাচন করা সম্ভব হয়ে উঠে না।

কারণ এদেশের অমুসলিম সংখ্যালঘুদের মধ্যে এক অসাধারণ ঐক্য প্রতিষ্ঠিত, অপরদিকে মুসলমানদের ভোট বিভক্ত হওয়ায় স্বাভাবিকভাবে যে প্রার্থীর পক্ষে অমুসলিম সংখ্যালঘুদের ভোট বেশী পড়বে, নির্বাচনে তিনি বিজয়ী হবেন বলে ধরে নেয়া যায়। ফলে সংখ্যালঘুদের ভোটে এমন প্রার্থীই নির্বাচিত হবেন যিনি সংসদে ইসলামী আইনের পক্ষে রায় দিতে ব্যর্থ হবেন। অপরদিকে এ নিয়মে সংখ্যালঘুদেরও কোন সঠিক প্রতিনিধির সংসদে পাঠানো সম্ভব হয় না। সম্ভবতঃ পূর্ব পাকিস্তানের বিশেষ একটি দলের সংসদ সদস্যদের পক্ষ হতেই এই বিল উত্থাপিত হতে যাচ্ছিল।

ফলে জাতীয় পরিষদের কতিপয় সদস্য কিংবা মন্ত্রী পরিষদের কোন সদস্য যখন ষ্টীমার যোগে ঢাকা হতে খুলনা সফর করছিলেন তখন হযরত মাওলানা শামছুল হক (রহঃ) ঢাকা-খুলনা পর্যন্ত প্রতি ষ্টীমার ষ্টেশনে পার্শ্ববর্তী-এলাকার মুসলমানদের বিরাট সমাবেশ করে আগত প্রতিনিধিগণকে একথাই বুঝাবার ব্যবস্থা করেন যে, এদেশের মুসলমানদের দাবী একমাত্র পৃথক নির্বাচন, যুক্ত নির্বাচন নয়। অতএব, প্রতি ষ্টেশনেই তারা এই শ্লোগান দেয়- "হামারা মুতালাবা জুদাগানা ইন্তিখাব" "Our demand separate electorate" অর্থাৎ

www.pathagar.com

আমাদের দাবী পৃথক নির্বাচন। অশিক্ষিত স্বল্প শিক্ষিত সাধারণ মানুষদের মধ্যে কয়েকদিন পূর্ব হতেই উর্দু ও ইংরেজীতে এই সব শ্লোগান মুখস্ত করানো হয়। আল্লাহর কি ইচ্ছা, অল্পকাল পরে সরকারের পতন ঘটে। প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হন আই, আই চন্দ্রীগড়। অতি অল্প কালের মধ্যে তারও পতন ঘটে এবং পাকিস্তান নানাবিধ ষড়যন্ত্রের শিকার হয়। পরে ইস্কান্দার মির্জা ও আইয়ুব খানের আবির্ভাব ঘটে। মার্শাল 'ল' জারী করা হয়। প্রথম দিকে আইয়ুব খান কিছু ভাল কাজ করেন। তার আমলে পূর্ব পাকিস্তানের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে বলে বেশ কিছুটা সুনামও ছিল। কিন্তু তার আমলে কুখ্যাত "Muslim family law ordinance" চালু করা হয়। যা ছিল ইসলামের উপর মারাত্মক আঘাত।

যে সব মহামনীষীর অক্লান্ত পরিশ্রম ও আন্তরিক প্রচেষ্টায় এদেশে ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সাধারণ মুসলমান বেসরকারী ভাবে ইসলামী বিধি-বিধান অনুসারে তাদের পারিবারিক ও সামাজিক কর্মকান্ড আঞ্জাম দিয়ে থাকে, তাদের মধ্যে শতাব্দীর অন্যতম প্রাণ পুরুষ ছিলেন হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ)। তাঁরই প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয় শত-শত মাদ্রাসা-মক্তব। তাবলীগ জামায়াতের এদেশের প্রধান মুরব্বী তাঁরই অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হন এবং ব্যাপক ভাবে তাবলীগের কাজ চালু হয়। এদেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে ইসলামী জ্ঞানের প্রসার ঘটাবার জন্য তিনি বহু বই-পুস্তক অনুবাদ ও রচনা করেন। ইসলামের ওপর যখনই দেশী বিদেশী ইসলাম বিদ্বেষীদের আক্রমণ হয়েছে তখনই তিনি মুকাবিলা ও প্রতিরোধের জন্য সর্বপ্রথম বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন।

আইয়ুব খাঁন যখন "Muslim family law ordinance" জারি করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন তখন হযরত মাওলানা শামছুল হক (রহঃ) ঠিক এমন ভাবে ছটফট করতে থাকেন যেমন কোন ব্যক্তি বহু সাধনার পর তার নির্মিত ঘরে তারই সম্মূখে কেউ আগুন ধরিয়ে দিলে সে আত্মযন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকে। আল্লামা শামছুল হক (রহঃ) আইয়ুব খানের এই মুসলিম পারিবারিক আইনের বিরুদ্ধে 'ছার দেগা নেহি দেগা আমামা ' এর ন্যায় সংকল্প গ্রহণ করে বীর বিক্রমে হুংকার ছাড়েন এবং বিকৃত আইনের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলার জন্য দেশের উলামায়ে কেরামদের নিয়ে বৈঠক করেন। সারা দেশ সফর করে সভা-সমাবেশ করেন। এমনকি এক পর্যায়ে তিনি আইয়ুব খানের সাথে সাক্ষাত করে অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় তাঁর ইসলামবিরোধী আইন প্রণয়নের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করেন।

আলোচনার এক পর্যায়ে তার সাথে তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হয়। আইয়ুব খান মাওলানাকে 'মাঁয় পাঠানকা বাচ্চা পাঠান হুঁ' বলে হুংকার ছেড়ে ভীত করতে

www.pathagar.com

চাইলে তিনিও 'মাঁয় মুসলমানকা বাচ্চা মুসলমান হুঁ' বলে পাল্টা জবাব প্রদান করেন। আইয়ুব খানের আমলে ঈদের চাঁদ দেখা না যাওয়া সত্ত্বেও যখন গভীর রাতে চাঁদের সংবাদ দিয়ে পরদিন ঈদ করার সরকারী সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করা হয় তখন হযরত মাওলানা শামছুল হক সাহেব যোগাযোগ করে ইসলাম বিরোধী সরকারী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সাধারণ মুসলমানদের সতর্ক করেন, ফলে ঢাকার পল্টন ময়দানে কিছু সরকারী লোকসহ একটি সরকারী ঈদের জামাত ছাড়া দেশের অন্য কোথাও কোন ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়নি।

৬০ এর দশকে একবার চট্টগ্রামে একটি শান্তির দ্বীপ নির্মাণের জন্য বেলজিয়ামের খৃষ্টান ধর্ম যাজক "ফাদার পিয়ারে" বাংলাদেশ (তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানে) আগমনের সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশ পায়। এ সংবাদ হযরত মাওলানার অন্তরে চরম আঘাত হানে। সেবার নামে খৃষ্টান মিশনারীরা ষড়যন্ত্রের যে জাল বপন করছে, হযরত মাওলানা তা আঁচ করে শিহরিয়ে উঠেন। সুতরাং তিনি ঢাকার কতিপয় বিশিষ্ট দ্বীনদার ব্যবসায়ী ও চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে "আঞ্জুমানে তাবলীগুল কুরআন" নামে একটি সংগঠন কায়েম করেন এবং ঢাকা শহরের ওয়ার্ড কমিশনার ও চেয়ারম্যানদের দাওয়াত করে তাদেরকে খৃষ্টানদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সতর্ক করেন।

ঢাকা শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে দাওয়াত দেয়ার জন্য হযরত মাওলানা আমাকেও বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করেন। ময়মনসিংহ, জামালপুর, নেত্রকোনা, চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চল ও খুলনার সুন্দরবন এলাকায় খৃষ্টান মিশনারীদের তৎপরতা ছিল আশংকাজনক। তিনি আঞ্জুমানে তাবলীগুল কুরআনের পক্ষে কয়েক খানা পুস্তিকা রচনা করেন। যেমন পাদ্রীদের গোমর ফাঁক, আল্লাহর প্রেরিত ইঞ্জিল কোথায়? ইত্যাদি। এসব পুস্তিকা ছাড়াও তিনি মিশনারী কাজের জন্য ইসলামের মৌলিক বিষয় ভিত্তিক আরো অনেক পুস্তিকা রচনা করেন এবং খৃষ্টানদের ষড়যন্ত্র প্রতিহত করে সরলমনা মুসলমানদের ঈমান আকীদা সংরক্ষণের জন্য এসব এলাকায় মুবাল্লিগ প্রেরণ করেন।

একান্ত এখলাস ও নিষ্ঠার সাথে ব্যক্তি, সমাজ ও জাতির ইহলৌকিক ও পারলৌকিক হিত কামনাই ছিল হযরত সদর সাহেব (রহঃ)-এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। জাতির ওপর যখনই কোন দুর্দিন এসেছে তখনই তাঁকে অতিশয় বিচলিত হতে দেখেছি অতি নিকট থেকে। জাতীয় কল্যাণে নিষ্ঠার সাথে নিয়োজিত হতে পারে এমন লোক তৈরীর জন্য তিনি চিন্তিত থাকতেন। সমাজ ও জাতীয় কল্যাণ লাভ হতে পারে এমন কিঞ্চিত কোন গুণ কোন ব্যক্তির মধ্যে পরিলক্ষিত হলে উৎসাহ প্রদান করে তাকে দক্ষ করে গড়ে তোলার ব্যাপারে তিনি কোন ত্রুটি করতেন না। এমন নজীর কত যে আছে তার কোন ইয়ত্তা

www.pathagar.com

নেই। এ বিষয়ে খোদ আমার সাথেই তিনি যে সব আচরণ করেছেন তা এ স্বল্প পরিসর প্রবন্ধে পেশ করা সম্ভব নয়। আমি জামেয়া কুরআনিয়া লালবাগ থেকে "তাকমীল" যখন শেষ করছি, তখন হযরত সদর সাহেব ডাক্তারের পরামর্শে চিকিৎসার জন্য লাহোর গমণ করেন।

"তাকমীল" এর পরীক্ষা শেষ হয়েছে। ফল বের হয়েছে এবং আল্লাহর মেহেরবানীতে আমি প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করতে সক্ষম হয়েছি। এখন পরবর্তী পরিকল্পনার জন্য বড়ই চিন্তিত। সদর সাহেব আমার থেকে বহু দূরে। তাঁর নিকট পত্র লিখে কিছু সিদ্ধান্ত নেয়ারও হিম্মত হচ্ছিল না। তবুও নিরুপায় হয়ে তাঁর নিকট পত্র লিখলাম। তিনি আমাকে বড়ই স্নেহ করতেন। তার প্রমাণ পূর্বে বহুবার পেয়েছি। কিন্তু তিনি যে, এত বেশী স্নেহ করতেন ও ভালবাসতেন তা বুঝতে পারলাম তখন যখন তিনি অসুস্থাবস্থায়ও দীর্ঘ চার/পাঁচ পৃষ্ঠার একটি চিঠি ও সদ্য প্রকাশিত মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী মাদ্দাযিল্লুহু রচিত তারিখে দাওয়াত ওয়া আযীমাত এর কয়েকটি খন্ড মাওলানা আব্দুর রহীম (রহঃ)-এর মাধ্যমে আমার নিকট পাঠিয়ে দিলেন। প্রেরিত পত্রে তিনি একজন দক্ষ আলিম হবার জন্য যেসব বিষয় ও সংশ্লিষ্ট কিতাবসমূহ প্রয়োজন তার বিস্তারিত বিবরণ দিলেন এবং একজন দক্ষ আলিমের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত হবার জন্য সাথে পাঠালেন মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভীর উক্ত কিতাব।

লাহোর থেকে অনেকটা সুস্থ্য হয়ে যখন তিনি ঢাকা ফিরলেন তখন কেল্লার মোড়ে অবস্থিত একটি ছোট্ট টিনের ঘরের বাসায় তার সাক্ষাতে যাই। তখন প্রথমে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন লালবাগ মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করার জন্য মাদ্রাসার সেক্রেটারী হযরত মাওলানা দ্বীন মোহাম্মদ (রহঃ)-এর নিকট কোন দরখাস্ত পেশ করেছি কি না, না করে থাকলে আর কালক্ষেপন না করে একটি দরখাস্ত যেন পেশ করি। এর পরই তিনি তারিখে দাওয়াত ওয়া আযীমাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে বললেন, কিতাবটি বাংলায় অনুবাদ হওয়া দরকার। লালবাগ জামেয়ায় আমার নিয়োগ হলো কিন্তু রমজানের কয়েকদিন পর গ্রামের বাড়ীতে যাবার একদিন পর আমি মারাত্মক ভাবে বসন্ত রোগে আক্রান্ত হই। দু'মাস পর রোগমুক্ত হলেও লালবাগে আর আমার যাওয়া হল না।

গওহারডাঙ্গা মাদ্রাসার মুহতামিম সাহেব লোক পাঠিয়ে আমাকে খন্ড বছরে উক্ত মাদ্রাসায় থাকার নির্দেশ প্রদান করেন। বছর শেষে রমজানে আমাকে মাদ্রাসার কাজে করাচী পাঠানো হলো। বাদ রমজান এক পত্রে হযরত মাওলানা ইদ্রীস সাহেব কান্ধলভী (রহঃ)-এর নিকট হাদীস অধ্যয়নের জন্য হযরত সদর সাহেব হুযুর আমাকে এই বলে উদ্বুদ্ধ করেন- হযরত মাওলানা বিন্নোরী বহুত বড়

www.pathagar.com

মুহাক্কিক আলেম কিন্তু হযরত মাওলানা ইদ্রীস কান্ধলভী সাহেব যুগের সেরা এবং আমার উস্তাদ। অতএব আমি লাহোর গমণ করি এবং হযরত মাওলানা ইদ্রীস সাহেব (রহঃ)-এর দরসে শরিক হওয়ার সুযোগ লাভ করি। লাহোর থেকে প্রত্যাবর্তন করে পুনরায় গওহারডাঙ্গা মাদ্রাসায় শিক্ষকতা শুরু করি। এক বছর পর তাঁর পরামর্শে আমি তাখাস্‌সুস ফিল হাদীস এর জন্য করাচী নিউটাউন মাদ্রাসায় গমণ করি। তাখাস্‌সুসের জন্য তখন পশ্চিম পাকিস্তান ভিত্তিক বেফাকুল মাদারিস থেকে উত্তীর্ণ প্রথম তিন জনকেই বাছাই করা হতো।

তখন উক্ত তাখাস্‌সুস এর দায়িত্বশীল ছিলেন জনৈক মাওলানা। তিনি শর্ত প্রয়োগে বড়ই কঠোর এবং অনমনীয় ছিলেন। কোন প্রকার সুপারিশ ছিল তার কাছে অগ্রহণযোগ্য। লাহোর জামেআ আশরাফিয়া তখন বেফাকের অন্তর্ভূক্ত ছিল না। অতএব, জামেআ কুরআনিয়া ও জামেয়া আশরাফিয়ায় সর্বোচ্চ সাফল্যের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও আমি 'তাখাস্‌সুস' এ ভর্তি হবার যোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারলাম না। তাই নিউটাউন মাদ্রাসায় পুনরায় দাওরায়ে হাদীসে ভর্তি হলাম।

কিছুদিন ক্লাশ করার পর জামিয়া আশরাফিয়ার মুহতামিম হযরত মাওলানা উবায়দুল্লাহ সাহেব নিউটাউন আগমণ করেন। তাঁর সাথে আমি তাখাস্‌সুস এ ভর্তি হবার ইচ্ছা এবং এর জন্য যে সংকট সৃষ্টি হয়েছে তা আলোচনা করলে তিনি আমাকে নিয়ে হযরত বিন্নোরী (রহঃ)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে আমার প্রতিভা সম্পর্কে কিছু কথা বলেন, ফলে হযরত বিন্নোরী (রহঃ) তাখাস্‌সুসে ভর্তির জন্য ভর্তির শর্ত অনুপস্থিত হওয়া সত্ত্বেও রাজী হয়ে গেলেন এবং দায়িত্বশীলকে এ ব্যাপারে বলে দিবেন বলে জামেয়া আশরাফিয়ার মুহতামিম সাহেবকে জানিয়ে দিলেন। কিন্তু চরম দূর্ভাগ্য যে, দায়িত্বশীল শিক্ষক সাহেব নিয়ম ভংগ করার জন্য কোন মতেই রাজী হলেন না। তাই বাধ্য হয়েই আমি হযরত সদর সাহেবকে বিস্তারিত লিখে জানালাম।

হুযুর তখন অসুস্থতার কারণে গওহারডাঙ্গা অবস্থান করছিলেন কিন্তু আমার পত্র পাওয়ায় তিনি এতই অসন্তষ্ট হলেন যে সাথে সাথেই হযরত মাওলানা বিন্নোরী (রহঃ) এর নিকট তিন/চার পৃষ্ঠার একটি পত্র লিখে পাঠালেন। চিঠিটি আমার খামের মধ্যেই তিনি পাঠিয়েছিলেন। এক স্থানে তিনি লিখেন-মৌলবী সিদ্দীক আমাদের জামিয়া কুরআনিয়ার একজন মেধাবী ও প্রতিভাবান ছাত্র। জামিয়া কুরআনিয়া ঢাকা ও জামিয়া আশরাফিয়া, লাহোর হতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। গওহারডাঙ্গা মাদ্রাসায়ও অসাধরণ কৃতিত্বের সাথে হিদায়া আখিরাইন দরস (পাঠ) দিয়েছে। অথচ এটা বাস্তব যে, আপনাদের প্রতিষ্ঠান থেকে তাখাস্‌সুস করেও আমাদের এখানে মুখতাছারুল মা'য়ানী

www.pathagar.com

পড়াবার যোগ্যতা রাখেনা। হযরত শাহ সাহেব (রহঃ) বলতেন, কানুন (আইন)-তো অন্ধের লাঠি।

পূর্ণ পত্রে একটি আরোপিত শর্তের কারণে আমাকে তাখাস্‌সুস থেকে বঞ্চিত রাখার জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করেন। কিন্তু চিঠিটি এমন সময় আমার হস্তগত হয় যখন হযরত মাওলানা বিন্নোরী হজ্বের সফরে রওয়ানা হয়ে গেছেন এবং হজ্বের পর তিনি মিসর সহ অন্যান্য আরব দেশ সফর করবেন বলে জানা গেছে। অতএব তাড়াতাড়ি তাকে এ পত্র যে পৌছান সম্ভব হবেনা এবং তাখাস্‌সুস এ ভর্তি হওয়া গেলেও যে বিলম্ব হবে তা নিশ্চিত। অতএব হুযুরের নিকট পূণরায় বিস্তারিতভাবে পত্র লিখলাম এবং পরবর্তীতে আমার আরো কিছু আকাঙ্ক্ষার কথা জানালাম।

এখানে যে বিষয়টি বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় তা হলো- হযরত মাওলানা বিন্নোরী (রহঃ) এর নিকট তিনি যে পত্রটি লিখেছিলেন তা ছিল ক্ষোভে পরিপূর্ণ। চিঠিটা তার হস্তগত হলেও আমার ভর্তি হওয়া সম্ভব হতো কি না তা আল্লাহ পাক ভাল জানেন। কিন্তু চিঠিটা পড়লে যে হযরত মাওলানা বিন্নোরী (রহঃ) অসন্তুষ্ট হয়ে পড়বেন এ আশংকাও কেউ কেউ প্রকাশ করেছিলেন। তবে হযরত সদর সাহেব (রহঃ) না বুঝে চিঠি লিখেছিলেন তা নয়। তিনি আমার মত ছাত্রের ইলমী আগ্রহে কোন প্রকার ভাটা না পড়ুক বরং দিন দিন বৃদ্ধি পাক এবং যোগ্য আলিম তৈরী হোক এ বিশ্বাসে হযরত বিন্নোরী (রহঃ)-এর সন্তুষ্টি- অসন্তুষ্টির পরোয়া না করে যা সত্য সঠিক মনে করছিলেন তাই লিখেছিলেন।

কোরবানীর ঈদের পর আমি বিলম্ব না করে দেশে রওনা হলাম। হুযুরের আর কোন উত্তরের অপেক্ষা না করে ঢাকা পৌছলাম। মনে মনে বড় আশঙ্কা ছিল না জানি হুযুর আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হলেন কি না। হুযুর তখনও গওহারডাঙ্গায়। ঢাকা হতে লঞ্চ যোগে গওহারডাঙ্গা ষ্টেশনে নেমে সফরসঙ্গী আমার এক বন্ধুর দারুন পীড়াপিড়িতে বিশেষ প্রয়োজনে নৌকা যোগে তার শ্বশুর বাড়ীতে যেতে বাধ্য হই। অতএব হুযুরের সাথে সেদিন আর আমার সাক্ষাত করার সুযোগ হলোনা।

পরদিন ভোরেই আমি রওনা দিয়ে মাদ্রাসায় যাই। মাদ্রাসায় উপস্থিত হয়েই একজন উস্তাদের মুখে শুনতে পেলাম, আমি যে গওহারডাঙ্গা ষ্টেশন পর্যন্ত এসেছিলাম তা হুযুর জানতে পেরেছেন এবং তাঁর সাথে সাক্ষাত না করে অন্যত্র চলে গেছি বলে তিনি দুঃখ পেয়েছেন। হুযুর কষ্ট পেয়েছেন একথা শুনে আমি অন্তরে বড়ই আঘাত পেলাম। ভয়ে ভয়ে হুযুরের রুমের দিকে অগ্রসর হয়ে দেখি তিনি রুমের বাইরে একটি চেয়ারে বসে আছেন। আমি ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়ে তাঁকে সালাম করতেই তিনি বললেন, "কে ? সিদ্দীক নাকি? একথা বলে তিনি

www.pathagar.com

উঠে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "ভাল করেছ তুমি চলে এসেছ।" "ভাল করেছ তুমি চলে এসেছ।" একথা বলেই তিনি আমার মনের সকল ভয়-ভীতি ও দ্বিধা-দ্বন্দের অবসান ঘটিয়ে অন্তরে প্রশান্তি এনে দিলেন।

পরবর্তীতে জানতে পারলাম করাচী থেকে রওনা হবার পূর্বে আমার প্রেরিত পত্রখানা হুযুরের এতই ভাল লেগেছিল যে, তিনি মাদ্রাসার আসাতিযায়ে কেরামকে পড়ে শুনিয়েছিলেন। হুযুর শুধু আমার পত্রই নয় বরং একবার করাচী হতে আরো একজন আলিম যিনি তার শিক্ষা সমাপ্ত করার পর ভবিষ্যতে জাতির খিদমতের জন্য কিছু পরিকল্পনা এবং পরিকল্পিত কাজের জন্য যে সব প্রতিবন্ধকতা ছিল তা চিহ্নিত করেন। পরে সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে যে সব পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায় সে সম্পর্কে অতি সাবলীল ভাষায় একটি পত্র লিখেছিলেন। সে পত্র খানাও হুযুরের এত ভাল লেগেছিল যে, তিনি আসাতিযায়ে কিরামকে একত্রিত করে সকলের সম্মুখে পাঠ করে শুনান। পরে উক্ত মাওলানা সাহেব যখন দেশে ফিরে আসেন তখন তাঁকে হুযুর নিজের সাথে নিয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে সভা-সামাবেশে পরিচয় করিয়ে দেন।

হযরত সদর সাহেব (রহঃ) ইসলাম ও জাতির সেবার চিন্তায় এত অধিক বিচলিত থাকতেন যে, যখনই কারো মধ্যে এমন কোন প্রতিভা লক্ষ্য করতেন যা দ্বারা ইসলাম ও জাতির সামান্য কল্যাণ সাধিত হতে পারে তখন তিনি তার সে প্রতিভা বিকাশের জন্য সর্বপ্রকার সহযোগিতা করতেন। গওহারডাঙ্গা মাদ্রাসার মুহাদ্দিস হযরত মাওলানা আব্দুল মুক্তাদির সাহেব যাকে জীবন্ত কুতুবখানা বলা যায়, কিতাব মুতালাআ'র ব্যাপারে তার কোন জুড়ি অন্ততঃ আমার দৃষ্টিতে ছিল না। হযরত সদর সাহেব (রহঃ) তার কিতাব মুতালাআ'র নেশা অধিক সমৃদ্ধ করার উদ্দেশ্যে যখনই কোন বিষয়ে তাহকীক এর প্রয়োজন অনুভব করতেন, তখন তাঁকে স্মরণ করতেন এবং বিষয়টি তাহকীকের দায়িত্ব তাঁর উপর ন্যস্ত করতেন। ফলে তিনি কিতাব মুতালাআ'র ব্যাপারে অধিক উৎসাহ বোধ করতেন।

প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান যখন পাকিস্তানে নতুন মুসলিম পারিবারিক আইন চালু করেন, হযরত সদর সাহেব (রহঃ) তখন সর্বত্র তার উক্ত শরীয়ত বিরোধী আইনের বিরুদ্ধে মুসলমানদের জাগ্রত করার উদ্দেশ্যে সারাদেশে সভা-সমাবেশ করেন। সে সময় তিনি গোপালগঞ্জ শহরেও একটি সভা করার সিদ্ধান্ত নেন। সভার তারিখ উপস্থিত, কিন্তু আল্লাহ পাকের কি মর্জি। বন্যার পানিতে সমস্ত এলাকা প্লাবিত হয়ে গোটা শহর পানির ওপর ভাসছে, তবুও সভা করার সিদ্ধান্তে কোন পরিবর্তন নেই; পানির মধ্যে মঞ্চ প্রস্তুত। এর মধ্যে শহরের চতুর্দিক থেকে নৌকা যোগে শ্রোতার ঢল নামে। মাঠ এবং আশ পাশের সকল ফাঁকা স্থানে

www.pathagar.com

কেবল নৌকা আর নৌকা। নৌকার ওপর মানুষের মহাসমাবেশ। আমরা কিছু সংখ্যক ছাত্র স্বেচ্ছা সেবক হয়ে গওহারডাঙ্গা থেকে কয়েকদিন পূর্বেই গোপালগঞ্জ শহরে সভার বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত ছিলাম।

সভা শেষে হযরত সদর সাহেব (রহঃ)-সহ অন্যান্য বক্তাও কোর্ট মসজিদের দোতলায় রাত যাপন করেন। ফজর বাদ উলামায়ে কেরাম ও বুদ্ধিজীবীগণের বিশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। হযরত মাওলানা সিদ্দীক আহমদ সাহেব (রহঃ) এবং অধ্যাপক গোলাম আযমও সেখানে উপস্থিত ; তাঁরা পূর্ব দিনের সভায় আহুত হয়ে এসেছিলেন। বৈঠকে হযরত মাওলানা সিদ্দীক আহমদ সাহেব (রহঃ) ও অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেব সমবেত উলামায়ে কেরাম ও সুধী বৃন্দের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন। বক্তব্য শেষে যখন সকলে একস্থানে বসেছিলেন তখন হযরত সদর সাহেব (রহঃ) হযরত মাওলানা সিদ্দীক আহমদ সাহেবকে বললেন, আপনার বক্তৃতা হয়েছে একজন সুদক্ষ মুহাদ্দিসের মত এবং গোলাম আযম সাহেবকে বললেন, আপনার বক্তৃতা হয়েছে একজন প্রফেসরের মত। একথা শুনে গোলাম আযম সাহেব বললেন, হুযুর যার যা খাছিয়্যাত। কথাটি শুনে উপস্থিত সকলে বড়ই প্রীত হলেন।

হযরত সদর সাহেব (রহঃ)-কে কেউ কোন প্রশ্ন করলে বড়ই খুশী হতেন। তিনি বলতেন, অন্তরে যে প্রশ্নের উদয় ঘটে তা আল্লাহর পক্ষের মেহমান, তার কদর করা দরকার। এ কথায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁর মজলিসে আমি অনেক প্রশ্ন করতাম। সব প্রশ্নই যে মান সম্মত হত তা নয়। কিন্তু হুযুরকে দেখেছি যেনতেন ভাবে কোন একটি প্রশ্ন হলেই তিনি অত্যন্ত খুশী হয়ে এত সব জ্ঞান গর্ভ আলোচনা করতেন যে, প্রশ্ন করে আমাদের সে সব জানা সম্ভব হতনা। অবশ্য যদি কখনো বাঁকা প্রশ্ন করা হত তখন তিনি তা এড়িয়ে যেতেন। আমরা তখন বুঝতাম যে প্রশ্ন করাটা ঠিক হয়নি। যেমন একদিন আমি হুযুরকে জিজ্ঞাসা করলাম, কোন প্রাণীর ছবি তো ঘরে রাখা যায় না কিন্তু পত্রিকায় তো বহু ছবি থাকে। অতএব পত্রিকা ঘরে রাখা যায় কিভাবে?

যতদূর মনে পড়ে তখন আমার তের-চৌদ্দ বছর বয়স হবে এবং আমি কুদুরী-কাফিয়া পড়ি। আমার থাকার ব্যবস্থা ছিল হুযুরের কামরায়। গওহারডাঙ্গায় হুযুরের আগমণ ঘটলেই বহুবার আমার কিছু কিছু খিদমত করার সুযোগ হয়েছে এবং একারণেই হুযুরের নিকট কোন প্রশ্ন করতে আমার কোন প্রকার দ্বিধা হতনা। এমন কিছু প্রশ্ন করে ফেলতাম যা অন্য কেউ জিজ্ঞাসা করতে সাহস করত না। মাদ্রাসায় তখন "দৈনিক আজাদ" পত্রিকা রাখা হত। হুযুর পত্রিকা পড়তেন, সেই পত্রিকা পড়া দেখেই আমার প্রশ্ন হয়। বস্তুতঃ প্রশ্নটি সরাসরি হুযুরের উপর বর্তায়, কিন্তু শরীয়তের জটিল বিষয়সমূহ বুঝবার মত সে

www.pathagar.com

জ্ঞান আমার তখনও হয়নি। অতএব তিনি চুপ থাকাই শ্রেয় মনে করতেন। হয়ত তিনি মনে করতেন, সময় মত এ প্রশ্নের জবাব আমি নিজেই সংগ্রহ করে নিতে পারব।

স্কুল ত্যাগ করে যখন আমি মাদ্রাসায় পড়তে আসি তখন থেকে আমার অন্তরে একটা সংকল্প ছিল আমাকে একজন সচেতন আলেম হতে হবে। যখন কাফিয়া-কুদুরী পড়ি তখন তো একদিন গওহারডাঙ্গার মরহুম মুহতামিম সাহেবের সাথে খানিকটা তর্ক হল। আমি বললাম, আমাদের নিয়মিত ভাবে ক্লাসে কিছু বাংলা পড়ার দরকার। তিনি প্রতিবাদ করে বললেন "বাংলা আবার ক্লাস করে পড়ার দরকার কি? মাওলানা আজিজুল হক সাহেব তো মাত্র দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছেন অথচ তিনি বুখারী শরীফের অনুবাদ করেছেন, হযরত মাওলানা থানভী (রহঃ) তো কোন স্কুলেই পড়েন নাই। অথচ তিনি অসংখ্য কিতাব লিখেছেন। অর্থাৎ বাংলা ভাষা তো আমাদের নিজেদের ভাষা। আমি বললাম, "অন্য সকল আলিম বুখারী শরীফের অনুবাদ করতে পারেন না কেন? আর অন্য আলিমরাই বা কেন হযরত থানভী (রহঃ) এর মত কিতাব লিখতে পারেন না"

বস্তুতঃ কিছু সংখ্যক বিশেষ ব্যক্তি আছেন যারা অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী বলে তারা ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় বহু দক্ষতা অর্জন করতে পারেন। তাই বলে দক্ষতা অর্জনের জন্য যে সাধারণ নিয়ম আছে অন্যদের পক্ষে তা ত্যাগ করা সংগত হবেনা। যাহোক গওহারডাঙ্গা মাদ্রাসায় প্রথম বছর যখন শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ পাই তখন আমি গোপনে গোপনে কিছু ইংরেজী শিখতে থাকি।

পরবর্তীতে লাহোর গিয়েও একজন শিক্ষকের নিকট আছর থেকে মাগরিব পর্যন্ত অংক ও ইংরেজী শিখি। অবশিষ্ট বিষয়গুলি নিজে নিজেই পড়ে মেট্রিক পরীক্ষা দিয়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই এবং পরের বছরই গওহারডাঙ্গা ফিরে আসি। সে সময় অনেক ছাত্র স্কুল কলেজের পরীক্ষা শেষে কিছু দ্বীনি জ্ঞান লাভের আশায় গওহার ডাঙ্গা মাদ্রাসায় উপস্থিত হত। তাদের জন্য কিছু দ্বীনি শিক্ষার ব্যবস্থা কিভাবে করা যায় সে লক্ষ্যে হযরত সদর সাহেব (রহঃ) এর কক্ষে তাঁর উপস্থিতিতে শিক্ষকগণের এক বৈঠকে আলোচনা হয়।

আমার নাম উল্লেখ করে আমার এক পরম শ্রদ্ধাভাজন উস্তাদ বললেন, এসব ছেলেদের শিক্ষাদানের দায়িত্ব সিদ্দীকুর রহমানের উপর অর্পণ করলে ভাল হবে। কারণ সেও ম্যাট্রিক পাস করেছে। পালিয়ে পালিয়ে পড়াশুনা করে ম্যাট্রিক পাস করেছি; আমার আসাতিযায়ে কিরাম হয়ত খারাপ মনে করতে পারেন সেজন্য আমি স্বেচ্ছায় হুযুরকেও কখনো জানাইনি, কিন্তু সেই গোপন কথাটি যখন হুযুর শুনতে পেলেন তখন তিনি খুশি হয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি আমাকে

www.pathagar.com

এতদিন বলোনি কেন? এই শেষ কথাটুকু বলার উদ্দেশ্যেই পূর্বের পটভূমিকাটুকু উল্লেখ করেছি। হুযুরের এই ছোট্ট কথাটির মধ্যে যে কত স্নেহ এবং হিতাকাঙ্খার প্রকাশ ঘটেছিল তা কি করে বুঝাব? ব্যক্তির কল্যাণ কামনা থেকে নিয়ে জাতির কল্যাণ কামনায় যিনি গোটা জীবন তিলে তিলে ক্ষয় করেছেন, সেই মহান দরদী যখন অন্য কারোর মধ্যে এ জাতীয় কল্যাণকর কোন ক্ষীণ ঝলক প্রত্যক্ষ করতেন তখন তাঁর অন্তরেও যে কিছু আশার আলো সৃষ্টি হতো তা বলাই বাহুল্য।

গওহারডাঙ্গা মাদ্রাসায় অধ্যয়নকালে আমার এক সহপাঠিকে নিয়ে আমাদের গ্রামে মাদ্রাসার চাঁদা আদায়ের জন্য যাই। ফলে জনৈক মাষ্টার সাহেব উপহাস ও বিদ্রূপ মূলক কথা বলেন। মাষ্টার সাহেব এক সময় আমারও মাষ্টার ছিলেন এবং আমার কিছুটা আত্মীয়ও বটেন। তাই তাকে আমি কিছু না বলে তাঁর এক মুরব্বীকে জানাই এবং তাঁর ধৃষ্টতার বিচার দাবী করি। তিনি পাড়ার আরো কয়েকজন মুরব্বীকে নিয়ে বিচারে বসেন এবং মাষ্টার সাহেবকে ক্ষমা চাইতে বাধ্য করা হয়। ঘটনাটির সংবাদ গওহারডাঙ্গায় হুযুরের নিকট পৌঁছে যায়। আমি মাদ্রাসায় পৌঁছলে আমাকে ডেকে আমার এতটুকু কাজের জন্য ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ভূমিকা পালনের জন্য উৎসাহিত করেন।

হযরত সদর সাহেব (রহঃ) স্থায়ী ভাবে এজমা রোগে আক্রান্ত ছিলেন। মাঝে মধ্যে তিনি অসুস্থতায় দীর্ঘ দু'তিন মাস যাবৎ গওহারডাঙ্গায় অবস্থান করতেন। পূর্বেই উল্লেখ করেছি হুযুরের কামরায় আমার থাকার ব্যবস্থা ছিল এবং ছোট-খাট খিদমত করারও সৌভাগ্য হয়েছে (আলহামদুলিল্লাহ্) কিন্তু দুরারোগ্য (মারাত্মক) রোগে আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও তাঁর নিয়মিত কোন কাজ ইবাদত-বন্দেগী ও অজীফাতে ত্রুটি ঘটেনি। শেষ রাতের তাহাজ্জুদ, বাদ ফজর তিলাওয়াত ও ইশরাকের পর নিয়মিত দু'ঘন্টা লেখা ও বাদ আছর সাধারণ মজলিসে অবস্থান ইত্যাদি সবকিছুই নিয়মিতভাবে সম্পন্ন হত।

হযরত আনাস (রাঃ) রসুলুল্লাহ্ (সঃ)-কে নিয়মিতভাবে দশ বছর খিদমত করেছেন। কিন্তু উক্ত দশ বছরে একটি বারের জন্যেও তিনি তাকে কোন কাজের জন্য ধমক দেননি। এটা ছিল খাদেমের প্রতি রসুলুল্লাহ (সঃ)-এর সদ্ব্যবহারের চরম নিদর্শন। হযরত সদর সাহেব (রহঃ)-এর খিদমতে একাধারে দশ বছর না হলেও সব মিলিয়ে দশ মাস অবশ্যই হবে; আমাকে আল্লাহ পাক তাঁর খিদমতে থাকার সুযোগ দান করেছেন কিন্তু তিনি উক্ত দশ মাসে এক বারের জন্যও কখনো মুখ মলিন করে কিছু বলেছেন বলে আমার মনে পড়ে না। অবশ্য এক শুক্রবার তিনি আমাকে মাদ্রাসার মসজিদে জুমআর নামায পড়াবার নির্দেশ দেন।

www.pathagar.com

আমি অতি সাধারণ পোশাক পরেই নামায শেষ করি। নামায শেষে তিনি আমাকে ডেকে কিছুটা ধমকের স্বরেই বললেন, "জুমআর নামাযের প্রতি এতটুকু আ'যমত নেই যে তুমি একটা লুঙ্গি পরেই জুমআর নামায পড়ালে?" ঐদিন আছরের পূর্বে বাড়ী হতে আমার আব্বার মৃত্যু সংবাদ আসে। সংবাদ দাতা আমাকে মৃত্যুর কথা কিছুই বলেনি। অবশ্য একজন শিক্ষককে জানালে তিনি হুযুরকে জানান। আমাকে শুধু অসুস্থতার কথা জানিয়ে বাড়ি যাবার জন্য প্রস্তুত হবার কথা বলা হয়েছে। অথচ এদিকে হুযুরের নির্দেশে হিফজ খানায় কুরআন-খানীর ব্যবস্থা হয়েছে। বাড়ি রওনা দেয়ার পূর্বে হুযুরকে যখন আব্বার মৃত্যু সংবাদ দেয়া হয় তখন তিনি আফসোস করে বলেছিলেন, "আহা! আজ আমি তাকে রাগ করেছি।"

হযরত মাওলানা আবদুল মান্নান সাহেব শায়খুল হাদীস ও মুহতামিম, গওহারডাঙ্গা মাদ্রাসা। গওহারডাঙ্গা মাদ্রাসা হতে ফারেগ হয়ে সেখানেই কিছুকাল শিক্ষকতা করেন। তখন নিয়মতান্ত্রিকভাবে লেখাপড়ার উদ্দেশ্যে দারুল উলুম দেওবন্দে শিক্ষার্থীদের যাবার কোন সুযোগ ছিল না। অতএব তিনি সেখানে গিয়ে দীর্ঘ প্রায় তিন বছর লেখাপড়া করেন এবং গওহারডাঙ্গা ফিরে গিয়ে দীর্ঘদিন হাদীসের দরস দেন। একথা জোর দিয়ে বলা যায় যে, গওহারডাঙ্গা মাদ্রাসায় তখন তিনিই সবচেয়ে উন্নতমানের দরস প্রদান করতেন। এতদসত্ত্বেও নিউটাউন মাদ্রাসায় 'তাখাস্‌সুস ফিল হাদীস' খোলা হলে হযরত সদর সাহেব (রহঃ) তাকে আরো দক্ষ করে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে করাচী পাঠান এবং পুনরায় এক বছর হাদীস পড়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন। পরে তাখাস্‌সুস এ ভর্তি হন। অর্থাৎ এলম এমনই এক অমূল্য সম্পদ যা হাসিল করার জন্য একজন আলিমের অত্যন্ত তৎপর হওয়া উচিত এবং যখন যেখানে সুযোগ পাওয়া যায় সে সুযোগ গ্রহণ করা উচিত। হযরত সদর সাহেব (রহঃ) বিভিন্ন সময় ইলম পিপাসুদের অন্তরে এ উপলব্ধি সৃষ্টি করার চেষ্টা করতেন।

মাদ্রাসার শিক্ষকদের তিনি বলতেন, আপনারা মাদ্রাসাকে 'মাকসাবা' (উপার্জনের স্থান) বানাবেন না। অর্থাৎ মাদ্রাসা থেকে কোন টাকা পয়সা না পাওয়া গেলেও 'ইলমি খিদমত' ত্যাগ করার মানসিকতা সৃষ্টি করবেন না। মূলতঃ মাদ্রাসাগুলোই বর্তমান দ্বীনের মূল ঘাটি। তাবলীগ, খানকাহ্ এবং বিভিন্ন দ্বীনি কিতাব রচনা ও ওয়াজ মাহফিলের জন্য মাদ্রাসা শিক্ষাই মৌলিক ভূমিকা পালন করে আসছে। মাদ্রাসায় সঠিক শিক্ষার অভাবে সমাজে মূর্খতা বৃদ্ধি পেলে হেদায়েতের সকল পথ রুদ্ধ হতে বাধ্য। অতএব হযরত সদর সাহেব (রহঃ) সারা জীবন মাদ্রাসা শিক্ষার প্রসার ঘটানোর জন্য এবং সঠিক, মুখলিছ ও বিজ্ঞ আলিম তৈরী করার জন্য সংগ্রাম ও সাধনা করেছেন।

www.pathagar.com

“দৈনিক আজাদের” প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক মাওলানা আকরাম খাঁ সাহেব এদেশের একজন পন্ডিত ও সাহিত্যিক আলিম ছিলেন। কিন্তু ইলমী ভ্রান্তির কারণে অনেক ক্ষেত্রে তাঁর পদস্খলন ঘটেছে। হযরত সদর সাহেব (রহঃ) তাঁর ভ্রান্তি থেকে দেশের মুসলমানদের সতর্ক করার জন্য নিজ হাতে গড়া আলিম এবং দেশের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস হযরত মাওলানা আজিজুল হক সাহেব ও মাওলানা আবদুস সাত্তার (রহঃ) মুহাদ্দিস, গওহারডাঙ্গা মাদ্রাসা এর দ্বারা দু'খানি প্রতিবাদমূলক পুস্তিকা রচনা করেন। কিতাব দু'খানি অত্যন্ত যুক্তি সহকারে রচিত হওয়ায় তা সর্ব মহলে সমাদৃত হয়।

হযরত মাওলানা শামছুল হক সাহেব (রহঃ) মাদ্রাসা শিক্ষার পূর্বে স্কুল ও কলেজে শিক্ষা লাভ করেন। অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে ম্যাট্রিক পাস করার পর তিনি মাদ্রাসা ও দ্বীনি শিক্ষা লাভের জন্য বিচলিত হয়ে পড়েন কিন্তু অভিভাবকের চাপে কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হতে বাধ্য হন। তখন কলেজের বিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসু। তারই একটি ক্লাশে একদিন আলোচনা হয়। সে সম্পর্কে হযরত মাওলানা বলেন, বিজ্ঞানী জগদীশ বসু একদিন ক্লাশে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন এর সমন্বয়ে কিছু পানি তৈরী করে বললেন, দেখ হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের সাহায্যে আমি যে পানি তৈরী করলাম এটা আমাদের কোন কাজে আসেনা। এর জন্য কেবল আমার শ্রম ও অর্থের অপচয় হয়েছে, কিন্তু যে রাশি রাশি পানি আমরা খরচ করছি জেনে রেখ এর পেছনে এক মহাশক্তি কাজ করছে। তিনি বলেন, "Every thing has a maker, the maker of the earth and the sky is God. He is great creater. He created all things in the earth and the heavens."

অধ্যাপক জগদীশ চন্দ্র বসুর মন্তব্য শ্রবণে তিনি তন্ময় হয়ে পড়েন এবং ঘরে ফিরে ঘুমিয়ে পড়েন। স্বপ্নে দেখেন, একজন তাঁকে দেওবন্দ ও সাহারানপুর যাবার জন্য নির্দেশ করছে। তারপর হতেই তিনি ইলম হাসিল করার অদম্য স্পৃহা নিয়ে সাহারানপুর ও দেওবন্দের শিক্ষাকেন্দ্রে গমণ করেন।

জাতির সার্বিক কল্যাণ সাধনের জন্য দ্বীনের ব্যাপক প্রচার ও প্রতিষ্ঠাই ছিল মাওলানা শামছুল হক (রহঃ)-এর জীবনের মহৎ লক্ষ্য। অতএব তিনি যখনই যার দ্বারা যেভাবে যতটুকু দ্বীন প্রচার ও প্রতিষ্ঠার কোন উদ্যোগ প্রত্যক্ষ করতেন তখনই তাঁকে উৎসাহ প্রদান করতেন এবং সম্ভাব্য সহযোগিতা করতেন। আর এজন্যই জামায়াতে ইসলাম নামক যে রাজনৈতিক দলটি দেশে কাজ করছে তার নেতা-কর্মীদের মধ্যে ব্যক্তিগত জীবনে বিভিন্ন প্রকার ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও এক সময় তাদের সাথে সহযোগিতা করতেন। যে কোন দ্বীনি কাজে এদেশীয় নেতাদের পরামর্শ দিতেন। লালবাগ মাদ্রাসায় নেতাদের বহুবার তাঁর খিদমতে

www.pathagar.com

উপস্থিত হয়ে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে পরামর্শ করতে দেখেছি। হযরত মাওলানা (রহঃ) তাদের সাথে সহযোগিতা করতেন। তাদের প্রতি সুধারণা পোষণ করতেন কেবল দ্বীনের খাতিরে। কিন্তু মাওলানা মওদূদী সাহেব যখন 'খিলাফত ও মুলুকিয়াত' নামক কিতাবখানা লিখে প্রকাশ করলেন এবং ইসলামের মূল ধারক-বাহক সাহাবায়ে কেরামের প্রতি চরম আঘাত হানলেন তখন তাঁর কথাবর্তা ও আচরণে 'আলবুগজু ফিল্লাহ' এর চরম প্রকাশ ঘটতে দেখেছি। তখন তিনি ছিলেন অসুস্থ এবং অসুস্থতার কারণেই দীর্ঘদিন গওহারডাঙ্গা অবস্থান করেন। এ সময় তিনি "খেলাফাত ও মুলুকিয়াতের" মধ্যে জনাব মওদূদী সাহেবের লিখিনীর প্রতি লক্ষ্য করে অস্থির হয়ে ছটফট করতেন; বহু দিন পর্যন্ত তিনি জনাব মওদুদী সাহেবের সাথে এ বিষয় নিয়ে সরাসরি আলোচনা করার উদ্দেশ্যে তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের আমীর ও সেক্রেটারীর সহযোগিতা কামনা করেন।

হযরতের অসুস্থতার কারণে তার পক্ষে লাহোর গিয়ে আলোচনা করা সম্ভব নয় বলে, তাঁরা যেন জনাব মওদূদী সাহেবকে পূর্ব-পাকিস্তানে আনার ও তাঁর সাথে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করেন, এ ব্যাপারে পদক্ষেপ নেয়ার জন্য কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, তিনি তাঁর এ আন্তরিক প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হন। পরে তিনি অনেক সময় দুঃখের সাথে বলতেন "আমার উস্তাদগণ (হযরত মাওলানা মাদানী (রহঃ)-এর প্রতি ইঙ্গিত করে) মওদূদী সাহেবকে সত্যিই চিনতে পেরেছিলেন, কিন্তু আমার চিনতে ভুল হয়েছে।"

যেহেতু হযরত মাওলানা (রহঃ)-এর সহযোগিতা ও উৎসাহ প্রদানে এদেশের বহুলোক ইসলামী আন্দোলনকে সতেজ করার উদ্দেশ্যে জামাত সমর্থন করতেন এবং অনেকেই সক্রিয়ভাবে জামাতে কাজ করতেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনিই যখন আর জামাত সমর্থন করতে পারছেন না বরং ইসলামের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর বিষয়ই জনাব মওদূদী সাহেবের লিখনীর মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে বুঝতে পেরেছেন, তখন দেশের মানুষকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে প্রতিবাদ করবেন বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। আর এ উদ্দেশ্যে তিনি মওদূদী সাহেবের বরাত দেয়া কিছু কিতাব সংগ্রহের চেষ্টা করেন যা তখন গওহারডাঙ্গা মাদ্রাসার কুতুব খানায় ছিলনা। পবিত্র মক্কা শরীফ থেকে কয়েকখানা ইতিহাস গ্রন্থ আনা হয়। বস্তুতঃ মওদূদী সাহেব ঐ সব ইতিহাস গ্রন্থের বরাত দিয়ে তার লিখিত পুস্তকে মারাত্মক ভুল তথ্য প্রদান করেছিলেন যা ছিল ইতিহাস বিকৃতির শামিল।

হযরত মাওলানা "ভুল সংশোধন" নামে একটি অতি মূল্যবান ও সঠিক তথ্যবহুল পুস্তক রচনা করেন। তাতে তিনি "খিলাফত ও মুলুকিয়াত" নামক

www.pathagar.com

পুস্তকে অভিযুক্ত সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে সঠিক ও নির্ভুল তথ্য জাতির সামনে তুলে ধরেন এবং জনাব মওদূদী সাহেবের বিভ্রান্তিকর ও ঈমান বিধ্বংসী মন্তব্যের দাঁত ভাঙ্গা জবাব দেন। এভাবে তিনি জামায়তের সহযোগিতা থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ পৃথক করেন এবং জাতির সামনে তার সঠিক চিত্র তুলে ধরেন।

উল্লেখ্য উক্ত "ভুল সংশোধন" পুস্তকখানির পান্ডুলিপি খানা যখন তৈরী করা হয় তখনও তিনি অনেকটা অসুস্থ ছিলেন। এ অবস্থাতেই তিনি বহু কষ্টে পান্ডুলিপি তৈরী করেন, যা আমার স্ব-চক্ষে দেখা। পান্ডুলিপিটি তৈরী হবার পর তিনি দ্রুত তাঁর "রফীকে আ'লা" এর প্রতি অগ্রসর হন। তাঁর জীবদ্দশায় পুস্তকখানি ছাপানো হয়েছে দেখে যেতে পারেননি। তাঁর ইন্তেকালের পর সত্তরের নির্বাচনের জন্য সাজ-সাজ অবস্থা, উত্তরসূরীদের মধ্যে কেউ কেউ তখনই পুস্তকখানি ছাপানোর উদ্যোগও নিয়েছিলেন। কিন্তু বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে তখন অনেকেই ছাপানো সংগত মনে করেননি অতএব সাময়িকভাবে পুস্তকখানির প্রকাশনা স্থগিত থাকে।

দুঃখের বিষয় বাংলাদেশ হবার পর যখন পুস্তকখানি ছাপানো হল, তখন মূলতঃ "ভুল সংশোধন" এর মূল স্প্রীট থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে তাদের ভুল সংশোধন না করে; একজন লক্ষ দিয়ে "ভুল সংশোধন এর ভুল" নামক একখানি চটি বই প্রকাশ করার ধৃষ্টতা দেখাল। আর দলগত ভাবে তারা সারা দেশে প্রচার করতে শুরু করল যে, ভুল সংশোধন নামক পুস্তক হযরত মাওলানা শামছুল হক সাহেবের নিজের লেখা নয়; বরং অন্য কেউ লিখে তাঁর নামে জাল করে ছাপিয়েছে। বস্তুতঃ এটা তাদের সম্পূর্ণ মিথ্যা অপপ্রচার। পুস্তকখানি যে তাঁরই রচিত এবং মূল পান্ডুলিপিটি তাঁরই হাতে প্রস্তুত করা; তাতে তাঁর স্বাক্ষরসহ এখনও তা গওহারডাঙ্গায় সংরক্ষিত রয়েছে। পুস্তকখানি যে-তাঁরই লেখা সে বিষয়ে আমি নিজেই এক প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী।

পারস্পারিক দ্বন্দ্ব কলহ দুনিয়া আখিরাত উভয়ের জন্য ক্ষতিকর, সুতরাং তা যদি সমাজের আলিম সমাজের মধ্যে ঘটে তবে অত্যন্ত দুঃখজনক এবং মারাত্মক ক্ষতিকর। এ কারণে হযরত মাওলানা শামছুল হক সাহেব মুসলমানদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব যাতে কোন প্রকার মারাত্মক রূপ ধারণ করতে না পারে সে জন্য রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নির্দেশ মুতাবেক তা মীমাংসা করার জন্য যথা সাধ্য চেষ্টা করতেন।

একবার তো ছারছীনার পীর সাহেদের দু'ভায়ের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্বের সংবাদ পেয়ে তিনি বিচলিত হয়ে উঠেন। কালবিলম্ব না করে গওহারডাঙ্গা মাদ্রাসার মুহতামিম সাহেবকে নিয়ে সরাসরি ছারছীনায় উপস্থিত হন। হুযুরকে অপ্রত্যাশিত এমনভাবে উপস্থিত হতে দেখে তারা তো হতবাক। আল্লাহর

www.pathagar.com

মেহেরবানী, হুযুরের উপস্থিত হওয়াই ছিল বড় কথা। পীরসাহেবদের মধ্যে পারস্পরিক যে দ্বন্দ্ব ছিল, হুযুরের মধ্যস্থতায় তার অবসান ঘটে এবং তারা স্বাভাবিক হয়ে যান।

দেশের অভ্যন্তরে সব অনৈসলামিক শক্তি ইসলামের ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে যখন ঐক্যবদ্ধ ষড়যন্ত্র করেছে তখন তাদের বিরুদ্ধে মৌলিক ঈমান আকীদায় ঐক্যমত পোষণকারী সকল ইসলামী শক্তির ঐক্যবদ্ধ হয়ে মুকাবিলা করা এবং ইসলামের উত্থানের উদ্দেশ্যে ছোট-খাট অমৌলিক মত পার্থক্যের ভিত্তিতে পারস্পরিক বিরোধ বৃদ্ধি না করার জন্য হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরীদপুরী (রহঃ) আজীবন চেষ্টা করেছেন।

অতএব, যখনই তিনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় নিয়ে অবাঞ্ছিত বিতর্কের সৃষ্টি হতে দেখতেন, এমনকি তা যখন পারস্পরিক দ্বন্দ্ব কলহের রূপ ধারণ করে সাধারণ মুসলমানদের জন্য বিভ্রান্তির কারণ হয়ে দাঁড়াত তখন কতিপয় অপরিণামদর্শী লোকের এরূপ আচরণে তাঁর দুঃখের কোন অন্ত থাকতনা। ক্ষোভে তাঁর মুখমন্ডল বিবর্ণ হয়ে যেত। একদিন তিনি হঠাৎ আমাকে ডাক দিলেন। তাঁর কাছে গিয়ে দেখি তাঁর হাতে একখানি ছোট বাংলা বই। আমাকে দেখেই তিনি বললেন, এই বইটি নিয়ে যাও এবং এখনি এটি আগুনে জ্বালিয়ে ফেল। আমি তখনও জানতাম না বইটিতে কি ছিল এবং কেনই বা তিনি তা জ্বালিয়ে ফেলার নির্দেশ দিলেন; বইটিতে কি আছে জানার আমার কৌতূহল হলো। হুযুরের রুম থেকে বের হয়েই আমি বই খুলে দেখতে পেলাম, মুসলমানদের দু'টি গ্রুপের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র বিষয় নিয়ে বাহাছ হয়েছে। বাহাছকে কেন্দ্র করে দু'দলের মধ্যে সংঘর্ষও হয়েছে। অবশেষে ডিসি কিংবা ডিষ্ট্রিক্ট জজ এর মধ্যস্থতায় একদলকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়েছে। আর বিজয়ী দলই গর্বের সাথে বইটি ছেপে প্রকাশ করেছে। সম্ভবতঃ তারাই হুযুরকেও এক কপি হাদিয়া হিসেবে পাঠিয়েছে।

গোটা জাতির মৌলিক ঈমান-আকীদা সংরক্ষণের চিন্তায় যিনি সদা পেরেশান, আর ইসলাম বিদ্বেষীরা যেখানে ঈমান ধ্বংসের জন্য ওৎপেতে বসে আছে, সে ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র মত পার্থক্য যেমন রাফঈ ইয়াদাইন, আমীন বিলজাহ্‌র এবং অনুরূপ অন্যান্য বিষয়কে কেন্দ্র করে মুসলমানদের মধ্যে বিভ্রান্তি ও অশান্তি সৃষ্টি করা তাঁর পক্ষে আদৌ সমর্থন যোগ্য ছিলনা। আর এ ধরণের কোন বাহাছে বিজয় হওয়ার কোন আনন্দও তাঁর অন্তরকে স্পর্শ করতে পারে না। অতএব তিনি বইটি আমার হাতে দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। আমিও অম্লান বদনে তাঁর নির্দেশ পালন করে তৃপ্তি বোধ করলাম।

অবশেষে অন্তরের একটি গোপন সুপ্ত কথাই প্রকাশ করছি, দীর্ঘ কাল হযরত মাওলানা শামছুল হক সাহেব (রহঃ)-কে দেখার ও তাঁর সুহবাতে থাকার

www.pathagar.com

সৌভাগ্য হয়েছে। অবশ্য তাঁর থেকে তেমন কিছু হাসিল করা ভাগ্যে জোটেনি একথা বাস্তব। কিন্তু তাঁর জীবদ্দশায় এবং তাঁর ইন্তেকালের পরও দেশ বিদেশের বহু বুযুর্গ উলামায়ে কেরামের খিদমতে যাবার সুযোগ হয়েছে, কিন্তু সামগ্রিকভাবে তাঁর মধ্যে যে গুণাবলীর সমাবেশ প্রত্যক্ষ করেছি এবং তাঁর খিদমতে বসে অন্তরে যে তৃপ্তি পেয়েছি তাঁর ইন্তেকালের পর এ যাবতকাল তেমনটা চোখেও পড়েনি এবং অন্তরেও রেখাপাত করেনি।

"হে আল্লাহ! ইয়া আরহামার রাহিমীন! তুমি আমাদের কবুল কর। দেশ ও জাতির ক্রান্তি লগ্নে এই জ্ঞান তাপস মহান সাধক পুরুষ, দেশ ও জাতির চরম হিতাকাঙ্ক্ষী, তোমার পরম প্রিয় বান্দার অনুকরণ ও অনুসরণ করার তাওফীক দান কর। আমীন।

= ০০০ =

হযরত মুয়ায (রাযিঃ) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কোন আমলটি সর্বশ্রেষ্ঠ? ফরয নামায পড়ার পর নফল নামায বেশী করিয়া পড়া? হযরত (সাঃ) বলিলেন, বেশী করিয়া নফল নামায পড়া অতি ভাল কাজ, অতি ভাল নেক আমল, কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠ নয়। আমি বলিলাম, ফরয রোযার পর বেশী বেশী করিয়া নফল রোযা রাখা? হযরত (সাঃ) বলিলেন, নফল রোযা রাখা খুবই ভাল আমল, কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠ আমল নয়। আমি বলিলাম, তবে ফরয যাকাত আদায় করার পর খুব বেশী করিয়া নফল যাকাত, খয়রাত, দান-সাখাওত করা? হযরত বলিলেন, নফল দান-সাখাওত খুবই ভাল কাজ, তবে সর্বশ্রেষ্ঠ নহে। আমি বলিলাম, তবে মেহেরবানী করিয়া বাতাইয়া দিন, কোন আমল সর্বশ্রেষ্ঠ আমল? হযরত নিজের যবান মোবারক বাহির করিয়া তাহার উপর আঙ্গুল রাখিয়া বলিলেন- ইহাকে শাসনে রাখা! আমি তখন ইন্নালিল্লাহি পড়িয়া বলিলাম- ইয়া রাসূল্লাল্লাহ! যবান দ্বারা কত কথা আমরা বলি, এগুলিরও কি হিসাব ও বিচার হইবে? এগুলিও কি সব লিখিয়া রাখা হইবে এবং পুনরায় আমাদের সামনে পেশ করা হইবে? তখন হযরত (সাঃ) আমার কাঁধের উপর হাত মারিয়া বলিলেন, মুয়ায! তুমিতো বড়ই বিপদগ্রস্থ। তোমার মা দেখিলে তিনি তো কাঁদিয়া জারজার হইয়া যাইতেন।

www.pathagar.com

মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ)কে যেমন দেখেছি

মাওলানা তাকী উসমানী (করাচী)

ভাষান্তর : মাজহারুল ইসলাম

১৩৮৮ হিজরীর জিলকদ মাসে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের (বাংলাদেশের) প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ) আল্লাহর একান্ত সান্নিধ্যে চলে গেলেন। রাত দিনের ব্যস্ততার মাঝে না জানি কত জনের ব্যাপারে সংবাদ পাওয়া যায় যে, তিনি আমাদের থেকে বিদায় হয়ে গিয়েছেন। অনেকেরই হারিয়ে যাওয়ায় অন্তর দুঃখ-বেদনাও অনুভব করে। কিন্তু এমন লোক কম হন যার ইন্তেকালের সংবাদ অন্তরসমূহে বজ্রপাতের মত ঘটে, যার জীবনসূর্য পূর্বে অস্তমিত হলে পশ্চিমের অধিবাসীরা অন্ধকার অনুভব করে এবং যার স্মরণে সেইসব লোকের অন্তরেও বেদনার সৃষ্টি হয় যাদের সাথে আত্মীয়তার প্রথাগত বন্ধন নেই।

আল্লাহ তা'আলা মাওলানা শামছুল হকের প্রতি আপন রহমতের বারি বর্ষণ করুন। তিনি ছিলেন এমন লোকদেরই অন্তর্গত। নিজ ইখলাস, নিঃস্বার্থপরতা, মুজাহিদসুলভ দৃঢ়তা ও কর্ম এবং নিষ্ঠাপূর্ণ কর্মকান্ডের কারণে তিনি ইলমী ও দ্বীনি সমাজে সকলের প্রিয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। ইলম ও দ্বীনের প্রতি যারই অন্তরে সামান্যতম মর্যাদা ও মূল্য আছে, তার জন্য তাঁর ইন্তেকাল এক বিরাট দুর্ঘটনা।

অবিভক্ত ভারতে দ্বীনি শিক্ষার দুইটি প্রধান কেন্দ্র ছিল- দারুল উলূম দেওবন্দ ও মাজাহেরুল উলূম সাহারানপুর। মরহুম মাওলানা উভয়টি থেকেই সুধা অর্জন করেছিলেন। এতদুভয় প্রতিষ্ঠানে তিনি আল্লাহ ওয়ালা বুজুর্গগণের সাহচর্য লাভের সুযোগ লাভ করেন। অতঃপর দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে শিক্ষা সমাপ্ত করেন। অতঃপর থানা ভবনে হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (রহঃ) এর নিকট থেকেও তিনি আধ্যাত্মিক সাধনার নিগূঢ়তত্ত্ব হাসিল করেন।

মরহুম মাওলানা তদানীন্তন পূর্বপাকিস্তানের ফরিদপুর জেলার বাসিন্দা ছিলেন। জীবনের শেষ পর্যন্ত সেটিই ছিল তাঁর বাসস্থান। কিন্তু এলম ও দ্বীনের সম্প্রসারণ কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য ঢাকাকে নিজের অবস্থানস্থল করে নিয়েছিলেন। সেখানে লালবাগ দূর্গের পার্শ্বে জামেয়া কোরআনিয়া নামে একটি দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি স্থাপন করেন। এটি ঢাকার প্রসিদ্ধ ও প্রধান দ্বীনি প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। কখনো কখনো ছুটি কাটানোর জন্য অথবা অসুস্থতার কারণে নিজ পরিবার পরিজনের নিকট ফরিদপুরে চলে যেতেন। নতুবা মাদ্রাসার ব্যবস্থাপনা ব্যতীত দেশের ধর্মীয় ও কিছুটা

www.pathagar.com

রাজনৈতিক তৎপরতায় কার্যকর ভূমিকা পালনের জন্য বছরের অধিকাংশ সময় এখানেই অতিবাহিত করতেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর ইখলাছ ও দ্বীনি একাগ্রতার কারণে তাকে সাধারণ- বিশেষ সকলের মধ্যে অসাধারণ গ্রহণযোগ্যতা ও শ্রদ্ধা দান করেছিলেন। তিনি ইচ্ছা করলে নিজের জন্য সুরম্য প্রাসাদ বানিয়ে নিতে পারতেন। কিন্তু তিনি নিজের অবস্থানের জন্য জামেয়া কোরআনিয়ার এমন এক অপ্রশস্ত অন্ধকার কামরা নির্ধারণ করেছিলেন যা দেখে- "তুমি দুনিয়াতে থাকবে এমন ভাবে যেন একজন প্রবাসী"- এর বাস্তব ব্যাখ্যা পরিলক্ষিত হত।

মরহুম মাওলানা ছিলেন বাংলা ভাষার একজন উচ্চ মানের লেখক। বাংলার জনসাধারণকে দ্বীনি শিক্ষার সাথে পরিচিত করানোর ক্ষেত্রে তার কর্মকান্ড অবিস্মরণীয়। "বেহেশতী জেওর" হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (রহঃ) এর সেই সর্বজনপ্রিয় গ্রন্থ যা লাখ লাখ বরং কোটি কোটি মুসলমানের উপকার সাধন করছে। জীবনের এমন কোন দিক নেই, যা সম্পর্কে একজন মুসলমানের প্রয়োজন সমূহ এতে সন্নিবেশিত করে দেওয়া হয়নি। হযরত মাওলানা শামছুল হক সাহেব এই প্রসিদ্ধ গ্রন্থখানার বাংলা অনুবাদ করেন। ঐ এলাকায় এটি খুবই জনপ্রিয়। এছাড়া হযরত মাওলানা থানভীর (রহঃ) আরো অনেক রচনা বাংলা ভাষায় অনুবাদের কৃতিত্ব তাঁরই।

ইখলাস ও হিতকামনার সাথে সত্যবাদিতা ও নির্ভীকতা ছিল তাঁর বিশেষ গুণ। সমকালীন শাসকদের সাথে তাঁর খুবই সম্পর্ক ছিল এবং সাধারণভাবে তিনি তাদের সাথে মিলেমিশেই থাকতেন। কিন্তু যখনই যেথায়ই দ্বীনের বিষয় উপস্থিত হত এবং আল্লাহর বিধানের কোন হানি ঘটছে পরিলক্ষিত হত তখন তিনি সম্পূর্ণ স্পষ্ট, নির্ভয়, সাহস ও দৃঢ়তার সাথে নিজ বক্তব্য পেশ করতে কোনরূপ দ্বিধা করতেন না। এই স্পষ্টবাদিতার বিনিময়ে তাঁকে কোন কোন শাসকের ভর্ৎসনার শিকার হতে হয়েছে। কিন্তু যেহেতু তাঁর ক্ষোভ ও ক্রোধ হতো ইসলামের স্বার্থে, সে জন্য সাধারণভাবে শাসক গোষ্ঠি অনুভব করত যে, তাঁর সমর্থন কিংবা বিরোধের সাথে কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ কিংবা ঘৃণ্য রাজনৈতিক কারণের কোন সম্পর্ক নেই। তিনি যা কিছুই বলতেন, আল্লাহর জন্যই বলতেন। এই অনুভূতির ফলেই শত ব্যাপারে শাসক গোষ্ঠির বিরোধিতা সত্ত্বেও কেউ তাকে উত্যক্ত করেনি এবং কেউ তাকে নিজের বৈরী মনে করেনি।

মাওলানা দীর্ঘ বয়স পাননি। খুব বেশী হলে যাট বাহাত্তর- সম্পাদক পর্যন্ত পৌঁছে থাকবে। কিন্তু বহু বছর ধরে নানা রোগ তাঁকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। এই লাগাতার ও ধারাবাহিক রোগসমূহ তাঁকে খুব দুর্বল করে ফেলেছিল। আমি শৈশবে তাঁকে সুস্থ সবল দেখেছি বলে স্মরণ হয়। কিন্তু বোধ অনুভব জাগ্রত হবার পর তাঁকে পুরোপুরি সুস্থ কখনই দেখিনি। তিনি ছিলেন স্থায়ী হৃদরোগী। এক সময়ে পুরো শরীর ফুলে গিয়েছিল। কিন্তু এ সকল অসুস্থতা সত্ত্বেও দ্বীনের

www.pathagar.com

সেবার জন্য তাঁর দৃঢ়তা ও উচ্চ মনোভাবে কখনই ঘাটতি আসেনি। মনে হত, বয়স অতিক্রম করার সাথে সাথে ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি তাঁর ভালবাসা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং দ্বীনের সেবা করার প্রেরণা নবযৌবন লাভ করছে। এ কারণেই পাকিস্তানের যে কোন অংশে যখনই উলামায়ে কেরামের পক্ষ থেকে কোন সামষ্টিক কাজের কর্মসূচী হত, পূর্ব পাকিস্তানের আলেমগণের মধ্যে মাওলানা শামছুল হক সাহেবের নাম তাতে অন্তর্ভূক্ত না থাকা ছিল অসম্ভব ব্যাপার।

তিন বছর পূর্বে পাক-ভারত যুদ্ধের পরপরই আব্বাজান হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী সাহেব ও হযরত মাওলানা ইউসুফ বিননূরী সাহেব তাঁর দাওয়াতে পূর্ব পাকিস্তান সফর করেন। লেখকও উক্ত বুযুর্গদের সাথে ছিল। ঢাকার সকল সমাবেশ ও ঘরোয়া বৈঠকে তিনি নিজের অসুস্থতা সত্ত্বেও সর্বান্তঃকরণে অংশ নেন। কিন্তু কিশোরগঞ্জ, চট্টগ্রাম, সিলেট ইত্যাদি স্থানে যাবার সময় এলে তিনি সফর করার উপযুক্ত রইলেন না। তাই ঢাকাতেই রয়ে গেলেন। এরপর তার উপর রোগের আক্রমণ আরো তীব্র হলো। আমরা যখন ঢাকায় ফিরে এলাম তখনও মাওলানা প্রচন্ড অসুস্থ ছিলেন এবং বার বার তার হৃদকম্পন বেড়ে যাচ্ছিল। ঘটনাক্রমে আব্বাজানও সফরের মাঝখানে অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং লাগাতার সফর তাকে খুবই দুর্বল করে দিয়েছিল। এ কারণে সফর সংক্ষেপ করে করাচী ফিরে যাওয়া জরুরী হয়ে পড়ে। সেমতে আমরা আসরের সময়ে ঢাকা পৌঁছলাম এবং সে রাতেই দুইটায় বিমানযোগে করাচী রওয়ানা হবার সিদ্ধান্ত ছিল।

আমরা অবস্থান করছিলাম আশরাফুল উলুম মাদ্রাসায়। আমি ভাবছিলাম একটু সুযোগ পেলে মাওলানার সাথে সাক্ষাত করে আসব। এরই মধ্যে এক ব্যক্তি আমার কাছে তাঁর এ বার্তা নিয়ে এল যে, আমিও অসুস্থ, মুফতী সাহেবও। তুমি কিছু সময়ের জন্য এসো। জরুরী কিছু আলাপ আছে। মুহতারাম মাওলানা মুফতী মুহিউদ্দীন সাহেবকে আব্বাজানের নিকট রেখে আমি লালবাগে চলে গেলাম। সময় ছিল স্বল্প। আমি মাওলানার কামরায় প্রবেশ করে কিছুক্ষণের জন্য নির্বাক হয়ে গেলাম। এটি ছিল মসজিদের এক কোণায় খুবই অন্ধকার একটি কামরা। চারদিক দিয়ে বদ্ধ মাঝখানে পার্টিশন দেয়া। এরই ছায়ায় ছোট-খাট একটি তক্তপোশ। এই তক্তপোশই মাওলানার বিশ্রামের বিছানা। তক্তপোশের নীচে একটি চাটাই ফেলানো। মাওলানা এই চাটাইয়ে বসে আহার করছিলেন। খাবার কি ছিল ? একটি বড়সড় বাটিতে ডাল ও ঝোলে মেশানো সালুন আর তন্দুরি রুটি। আর কিছুই নয়।

ইতোপূর্বে মাওলানার খাছ কামরা দেখার সুযোগ ঘটেনি। সব সময় মাদ্রাসার দফতরে দেখা হত। এটি বেশ প্রশস্থ এবং অনেকটা সুসজ্জিত ছিল।

www.pathagar.com

আজ জানতে পারলাম যিনি মাদ্রাসা ও মসজিদের জন্য এত বিরাট ও প্রশস্থ ভবনটি নির্মাণ করিয়েছেন তিনি নিজে থাকেন এভাবে! আমি ভেবে পাচ্ছিলাম না যে, হৃদরোগে আক্রান্ত যে ব্যক্তি সকাল সন্ধ্যা হৃদকম্পন সহ্য করছেন, তিনি এই কামরায় এরূপ আসবাবপত্র ছাড়া কিভাবে থাকতে পারেন ? সাথে সাথে আমার মনে মহানবী (সাঃ)- এর পবিত্র বাণী বেজে উঠলো- "তুমি দুনিয়াতে এমনভাবে থাকবে যেন তুমি একজন প্রবাসী কিংবা পথিক।"

মাওলানা আমাকে দেখে খুব আনন্দিত হলেন। তখনো তার শরীরে হৃদকম্পনের প্রতিক্রিয়া ছিল। তথাপি দীর্ঘ সময় ধরে অত্যন্ত আবেগ অনুভূতি নিয়ে মুসলমানদের পারস্পারিক বিভেদের কথা বলতে লাগলেন এবং তা নিরসনের কিছু বাস্তব উপায় নির্দেশ করলেন। তিনি বললেন : "আমরা তো কিছুদিনের জন্য অতিথি। আল্লাহ জানেন আবার সাক্ষাত হবে কি না। এখন আপনাদের কাজ করার সময়। আল্লাহর ওয়াস্তে এই বিভেদ নিরসনের চেষ্টা করবেন। এটিই আমার সকল ব্যাধির মূল কারণ। হযরত মুফতী সাহেবকে আল্লাহ তা'য়ালা সুস্থ ও নিরাপদ রাখুন। তাঁকে আমার সালাম বলবেন এবং আমার পক্ষ থেকে বলে দেবেন যে, ঐক্যের যে আহবান নিয়ে তিনি অগ্রসর হয়েছেন তা হলো বর্তমান সময়ের সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন। কোন মূল্যেই যেন তিনি তা পরিহার না করেন।"

জানিনা, এসময়ে কেন যেন আমার মনে বার বার ধারণা হচ্ছিল যে, হয়ত এটিই মাওলানার সাথে শেষ সাক্ষাত। শেষ পর্যন্ত এই সাক্ষাতই শেষ বলে প্রমাণিত হলো। এক বছর পর পুনরায় ঢাকায় যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু মাওলানা তখন অসুস্থতার কারণে ফরিদপুরে ছিলেন। সাক্ষাতের আক্ষেপ নিয়েই ফিরে এলাম। এখন কয়েকদিন পূর্বে আব্বাজানের মুখে এই হতাশাজনক সংবাদটি শুনলাম যে, মাওলানা আমাদের থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করেছেন। তাঁর অস্থির চিত্ত প্রকৃত প্রভুর সান্নিধ্যে গমণ করেছেন এবং তাঁর সারা জীবনের অস্থিরতা শান্ত হয়েছে।

জ্ঞান ও মনীযার জগতে কখনই অভাব থাকেনি। কিন্তু ইখলাস ও দ্বীনের সঠিক প্রেরণা এমন অমূল্য রতন যা কদাচিতই মিলে চুল পরিমাণ। এই হিসাবে মাওলানার ইন্তেকাল মুসলিম জাতির জন্য এমন বিরাট ক্ষতি যা পূরণ হবার নয়। আল্লাহ তা'য়ালা মাওলানার উপর নিজ রহমত বর্ষণ করে তাকে পরকালের শান্তি ও আরাম দান করুন। তাঁর সাহেবজাদাগণও আলেম। আশা করা যায় ইন্শাআল্লাহ তারা নিজ পিতার মিশন ধারণ করে তাঁর জন্য আখেরাতের ধন সাব্যস্ত হবেন। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁদেরকে উত্তম ধৈর্য দান করুন এবং দ্বীনের সেবার তাওফীক দান করুন।

"আমীন"

www.pathagar.com

তবীবুল মিল্লাত
হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ)
শাহ আবদুল হক আব্বাসী রাজবাড়ী

হাকীমুল উম্মত মোজাদ্দেদে মিল্লাত হযরত মাওলানা শাহ আশরাফ আলী থানভী (রহঃ)-এর সুযোগ্য উত্তরসূরি ও অনুসারী, তবীবুল মিল্লাত হযরত মাওলানা শামছুল হক সাহেব ফরিদপুরী (রহঃ) কে আমি দেখেছি আজ থেকে আনুমানিক ৪৮ বৎসর পূর্বে আমার পিতার কর্মস্থল বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার বর্তমান রাজবাড়ী জেলাধীন গোয়ালন্দ জামে মসজিদে। আমার পিতা ক্বারী আবদুল লতিফ আব্বাসী গোয়ালন্দঘাট জামে মসজিদের ইমাম ছিলেন। আমার পিতাসহ গোয়ালন্দ ঘাটের বেশ কয়েকজন আলেম ও গণ্যমান্য পরহেজগার ব্যক্তি হযরত সদর সাহেব হুযুর (রহঃ)-এর মুরীদ ছিলেন। তখন ঢাকা হতে আরিচা রোড চালু হয় নাই। ঢাকা হতে স্টীমার যোগে চাঁদপুর হয়ে গোয়ালন্দ ঘাট দিয়েই ফরিদপুরের লোকজন যাতায়াত করতেন।

আমি তখন প্রাইমারী স্কুলের ৫ম শ্রেণীর ছাত্র এবং আমার পিতার নিকট মসজিদের মক্তবে কুরআন শরীফ ও উর্দু কিছু কিতাব পড়ছি। হযরত সদর সাহেব হুযুর (রহঃ) ফজরের নামাযের পর মসজিদে আগমণ করলে আমার আব্বা ও মসজিদের মুসল্লীগণ খুব বিচলিত হয়ে পড়েন। কোথায় বসতে দেবেন, কাকে খবর দেবেন, কি নাস্তা করতে দেবেন, এই নিয়ে সকলেরই দৌড়াদৌড়ি-ব্যস্ততা দেখে আমি আমার আব্বাকে জিজ্ঞাসা করলাম- আব্বা এই শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির নাম কি, তার বাড়ি কোথায় এবং তিনি আমার কি হন। উত্তরে আমার আব্বা বললেন, এই বুযুর্গ ব্যক্তির নাম মাওলানা শামছুল হক সাহেব ফরিদপুরী। লোকে তাকে সদর সাহেব হুযুর বলেন। তিনি ঢাকার প্রসিদ্ধ জামেয়া কুরআনীয়া লালবাগ মাদ্রাসার সুযোগ্য প্রিন্সিপাল এবং আমার পীর সাহেব কেবলা। তিনি তোমার 'দাদাজী হুযুর হন'। তুমি বাংলা লেখাপড়া শেষ করলে তার মাদ্রাসায় তোমাকে আরবী লেখাপড়া করাতে পাঠাব ইন্‌শাআল্লাহ।

নাস্তার পর্ব শেষ হল। চতুর্দিক হতে আস্তে আস্তে লোকজন আসতে লাগল। তখন বেলা প্রায় ৯টা বেজে গেছে। মসজিদ লোকে ভরে গেল। সদর সাহেব হুযুর একটি কম্বলের উপর বসা। সাধারণ কাপড় দ্বারা তৈরী একটা জুব্বা পরিহিত মানুষ। মাথায় পাঁচকল্লী টুপি ও কাঁধে একটা সাদা রুমালমাত্র। উপস্থিত লোকজনকে নসিহত করছেন। আমার পিতাকে লক্ষ্য করে বললেন, ক্বারী সাহেব- আপনি মসজিদ সংলগ্ন একটি মক্তব কায়েম করুন। মক্তবই হলো বড়

www.pathagar.com

মাদ্রাসার বুনিয়াদ। দাওরায়ে হাদীস মাদ্রাসা হতে মক্তবের মূল্য অনেক বেশী। কেননা দাওরায়ে হাদীস মাদ্রাসাতে নবীর হাদীস পড়ানো হয়। আর মক্তবে আল্লাহর কালাম পড়ানো হয়। তিনি (সদর সাহেব হুযুর) উপস্থিত লোকজনকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারা বলুন তো আল্লাহর কালাম বড়, নাকি নবীর হাদীস বড়। সকলে উত্তর দিলেন আল্লাহর কালাম বড়। তখন হুযুর বললেন, যদি আল্লাহর কালামই বড় হয় তবে যে ঘরে আল্লাহর কালাম পড়ানো হবে সেই ঘরটা হবে বড় মাদ্রাসা। একজন মুহাদ্দিস থেকে একজন মক্তবের ক্বারী সাহেবের মূল্য আল্লাহর নিকট অনেক বেশী। মক্তবের শিক্ষক নিজকে ছোট মনে করলে ঈমান হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

উপস্থিত শ্রোতাগণের মধ্যে হুযুরের একজন মুরীদ মৌলভী মছিহুর রহমান সাহেব যিনি ভারতের হুগলীর হাজী মোঃ মহসিন সাহেবের মাদ্রাসা হতে জামা'আতে উলা পাশ করেছেন। গোয়ালন্দ নাজির উদ্দিন হাই স্কুলের প্রধান মৌলভী ধর্মীয় শিক্ষক ও গোয়ালন্দ ঘাট থানার মুসলিম ম্যারিজ রেজিষ্ট্রার ও কাজী সাহেবকে লক্ষ্য করে বললেন, মৌলভী সাহেব আপনি মাওলানা শিব্বির আহমদ উসমানী সাহেবের লিখিত ফাওয়ায়েদে শিব্বিরী ও আমার লিখিত বাংলা তাফসীরে হাক্কানী দেখে মসজিদে মসজিদে মুসল্লিগণের মধ্যে তাফসীর আরম্ভ করুন। আমি আপনার এই তফসীর ক্লাশের নাম রাখলাম 'খায়রুল বাশার কুরআন প্রচার সমিতি'। অতঃপর জোহরের নামায আদায় করতঃ পানাহার শেষ করে তিনি ফরিদপুর শহরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেলেন। রওয়ানার প্রাক্কালে আমাকে আমার আব্বাজান সদর সাহেব হুযুরের সম্মুখে দু'আর জন্য উপস্থিত করলেন। হুযুর জিজ্ঞাসা করলেন, দাদু ভাই তোমার নাম কি ? আমি বললাম আবদুল হক। তুমি কি পড় ? বললাম মক্তবে কুরআন শরীফ ও উর্দু পড়ি এবং স্কুলের ৫ম শ্রেণীতে পড়ছি। হুযুর বললেন, তুমি বড় হলে আমার মাদ্রাসায় পড়তে যেও। আল্লাহ তোমাকে আলেম বানাবেন- আমি দু'আ করলাম।

এক সপ্তাহের মধ্যে গোয়ালন্দ শহরে আমার পিতার মক্তবে কুরআন তা'লীমের গণজাগরণ ও মসজিদে মসজিদে মুসল্লীগণের মধ্যে জনাব মৌলভী মছিহুর রহমান সাহেবের তাফসীরের গণ আলোড়ন সৃষ্টি হল। আমি নাচিজ আব্বাসী উক্ত ফোরকানিয়া মাদ্রাসার একজন ছাত্র ও তাফসীর ক্লাশের সর্বকনিষ্ঠ শ্রোতা। বলতে না বলতেই তিন বৎসর অতিবাহিত হয়ে গেল। আমি তখন স্কুলে ৮ম শ্রেণীতে পড়ি ও মক্তবে কুরআন শরীফ খতম করতঃ তা'লীমুল ইসলাম দ্বিতীয় খন্ড ও উর্দু দুসরী এবং ফার্সী পহেলী পড়ছি। আমার পিতা বললেন, মিয়া আবদুল হক! তোমার জন্মের সংবাদ শুনে আমি তোমার নাম রেখেছি একজন বড় আলেমের নামে। আমার নিয়ত হল তুমি একজন আলেম হও এবং দ্বীনের

www.pathagar.com

খেদমত কর। পিতার নির্দেশ মোতাবেক মাদ্রাসার প্রাথমিক শিক্ষার জন্য বৃহত্তর কুমিল্লা জেলার বর্তমান চাঁদপুর জেলার কচুয়া থানার অন্তর্গত ক্বারী ইব্রাহিম সাহেব (রহঃ)-এর প্রতিষ্ঠিত উজানী ইসলামিয়া ইব্রাহীমিয়া মাদ্রাসাতে ভর্তি হয়ে জামাআতে উলা অর্থাৎ মেশকাত ও জালালাইন শরীফের জামা'আত শেষ করতঃ হযরত সদর সাহেব হুযুরের প্রতিষ্ঠিত জামেয়া কুরআনিয়া আরাবিয়া লালবাগ ঢাকাতে ভর্তি হলাম। উস্তাদে শফিক হিসাবে পেলাম তবীবুল মিল্লাত হযরত মাওলানা শামছুল হক সাহেব ফরিদপুরী (রহঃ); হযরত মাওলানা মুহাম্মাদউল্লাহ হাফেজ্জী হুযুর (রহঃ); হযরত মাওলানা হেদায়েতুল্লাহ সাহেব (রহঃ) যিনি দুই নং হুযুর নামে পরিচিত ছিলেন; শায়খুল হাদীস হযরত আল্লামা আজিজুল হক দামাত বারকাতুহুম সাহেব; হযরত মাওলানা মুফতী আবদুল মুয়িজ সাহেব, খতিব বায়তুল মোকাররম জামে মসজিদ (রহঃ); হযরত মাওলানা হারুন সাহেব চাটগামী মুদ্দাজিল্লুহু; হযরত মাওলানা আবদুল কবীর সাহেব বটতলী মুদ্দাজিল্লুহু; হযরত মাওলানা আবদুল মজিদ সাহেব ঢাকুবী (রহঃ) প্রমুখ বুযুর্গ ও মহান ব্যক্তিগণকে। হযরত সদর সাহেব হুযুর (রহঃ)-এর নিকট শুধুমাত্র বুখারী শরীফের প্রথম ছবক 'ইন্নামাল আ'মালু বিন্নিয়্যাত' এই হাদীস ও এই ছবক পড়ার সৌভাগ্য হয়েছে। শুরু হল জীবনের নতুন এক অধ্যায়। যেদিকে তাকাই শুধু নজরে পড়ে বুযুর্গ উস্তাদগণ।

এদিকে আমার পিতা গোয়ালন্দ হতে প্রতি মাসে একটা করে পত্র লেখতেন। পত্রে আমাকে জানাতেন মিয়া আবদুল হক অবসর সময়ে তুমি ঢাকা শহরে ঘোরাফেরা না করে সদর সাহেব হুযুরের মজলিসে বসিও। ঢাকা শহর জীবনে বাঁচলে দেখতে পারবে। সদর সাহেবের মত ওলী আল্লাহ দুনিয়া থেকে চলে গেলে আর এই ধরণের ওলীআল্লাহর ছোহবত তোমার জীবনে হবে না। তাই আমি আমার পিতার নির্দেশ মোতাবেক আছরের নামাযের পর এদিক ওদিক ঘোরাফেরা না করে হযরতের মজলিসে বসে থাকতাম।

একদিন জনৈক ব্যক্তি এক কুড়ি হাঁসের ডিম নিয়ে আসল এবং বলল- আপনি বাতের রোগী। শীতের দিনে বাতের রোগীর জন্য হাঁসের ডিম খুবই উপকারী। তাই আপনার জন্য এক কুড়ি হাঁসের ডিম এনেছি। সদর সাহেব হুযুর হাঁসের ডিমগুলি দেখে খুবই খুশী হলেন। খাদেম আবদুস সবুরকে বললেন, ডিমগুলি চৌকির নিচে রাখ, প্রতিদিন একটা করে ডিম সিদ্ধ করে আমাকে দিও। আর ঐ লোকটিকে বললেন বাবা আপনি চলে যান। লোকটি হুযুরের নির্দেশ অমান্য করে বসে রইলেন। কিছুক্ষণ পর সদর সাহেব হুযুর জিজ্ঞাসা করলেন, বাবাজি আপনাকে আমি বিদায় দিয়েছি আপনি গেলেন না কেন? লোকটি বলল, আপনি আমার জন্য একটু হাত উঠিয়ে দু'আ করুন। সদর সাহেব হুযুর হাত

www.pathagar.com

উঠিয়ে দু'আ করলেন এবং খাদেম আবদুস সবুরকে নির্দেশ দিলেন এই ব্যক্তির ডিমগুলি ফেরত দাও। তারপর বলতে লাগলেন বাবা দু'আর সম্পর্ক দিলের সন্তুষ্টির উপর নির্ভরশীল, ডিমের বিনিময়ে দু'আ বিক্রি হয় না। আপনি ডিমের বিনিময়ে আমাকে হাত উঠিয়ে দু'আ করালেন। এই সংবাদ জানা জানি হলে ঢাকা শহরের লোকেরা ডিম নিয়ে আসবে। আর আমি হাত উঠিয়ে দু'আ করতে থাকব। অল্প দিনের মধ্যে আমার হুজরাখানা ডিমের আড়তে পরিণত হবে। কিছুদিন পরে লোকেরা ডিমের পরিবর্তে মোরগ-মুরগী আনতে থাকবে। এর কিছুদিন পর লোকেরা ছাগল-গরু আনা আরম্ভ করবে। তখন আমার হুজরাখানা ধর্ম ব্যবসায়ী পীরের আস্তানায় পরিণত হবে। তাই আপনি ডিম নিয়ে বাড়ি চলে যান। আমি আপনার জন্য খাস করে দু'আ করব। (আমি নাচিজ আব্বাসী) হযরত সদর সাহেব হুযুর (রহঃ)-এর সুদূর প্রসারী তাকওয়া ও পরহেজগারীর চিন্তা করলাম এবং ছুটিতে বাড়ী গিয়ে আমার পিতার নিকট বিস্তারিত বর্ণনা করলাম। তখন আমার পিতা বললেন, এজন্যই তোমাকে হুযুরের মজলিসে বসতে পত্র লিখেছি।

১৯৬৭ ইং সনে আমাদের দাওরায়ে হাদীসের বার্ষিক পরীক্ষা ঘনিয়ে এসেছে। আমরা গভীর রাত পর্যন্ত লেখাপড়া করছি। রাত আনুমানিক ১১ টায় হযরত সদর সাহেব হুযুরের খাদেম আবদুস সবুর আমাদের কামরার সম্মুখে দাঁড়িয়ে ঘোষণা দিলেন দাওরায়ে হাদীসের পরীক্ষার্থী ছাত্রগণকে জনাব সদর সাহেব হুযুর তাঁর হুজরাখানায় হাজির হতে নির্দেশ দিয়েছেন। তৎক্ষণাৎ আমরা দলে দলে হযরতের কামরায় উপস্থিত হলাম। আমরা সকলে নীচে পাটির উপর বসে পড়লাম। হযরতের সম্মুখে টেবিলের উপরে একটা বড় ধরনের টিফিন ক্যারিয়ার। যা হতে খুব উন্নতমানের খাবারের সুঘ্রাণ নাকে আসতে লাগল।

আমাদের বসা মাত্রই হযরত সদর সাহেব হুযুর মৃদু হাসিমুখে বলতে লাগলেন, "বাবাজীরা আমি তোমাদেরকে একটা শুভ সংবাদ জানাবার জন্য ডেকেছি। সেই সংবাদটি হল অদ্য ভোর বেলায় আমার একজন মুরীদ হাজী সাহেব তিনি খুবই ভাল লোক, আমার জানামতে তার কামাইও হালাল। ধানমন্ডি হতে আমাকে টেলিফোনে জানালেন, তিনি অদ্য দুপুর বেলা আমার জন্য খাবার পাঠাবেন। আমি তার দাওয়াত কবুল করেছি। বেলা একটার দিকে তার খাবার আমার কামরায় পৌঁছা মাত্র আমার নফস আমাকে তাকিদ দিল খুবই ভাল খাবার এসেছে। আগে আগে খেয়ে নিলেই ভাল হবে। তখন আমি আমার নফসকে বললাম জোহরের নামায পড়ে খানা খাব। তখন আমার নফস আমাকে মাসআলা বলল, পেটে ক্ষুধা রেখে নামায পড়া ঠিক হয় না। এতে নামাযে খুঁশু খুজু'র ক্ষতি হবে। 'নফস তো শামছুল হকের নফস, সে ভাল মাসআ'লাও জানে'।

www.pathagar.com

আমি তখন খাবার না খেয়েই জোহরের নামায আদায়ের জন্য মসজিদে গেলাম। মসজিদে নামাযরত অবস্থায়ও কয়েকবার আমাকে তাকিদ দিল। এই ভাবেই সারাদিন আমার নফসের সাথে আমার জিহাদ চলতে থাকে। এখন রাত ১১ টার সময় জিহাদে আমি বিজয়ী হয়েছি। আমার নফস পরাজিত হয়েছে। এই শুভ সংবাদ জানাবার জন্যই আমি তোমাদেরকে ডেকেছি। এখন তোমরা এই টিফিন ক্যারিয়ার হতে খানাগুলো বের করে খাও। আমি চেয়ে চেয়ে দেখি। খাদেম আবদুস সবুরকে নির্দেশ দিয়েছি আমার জন্য সাদা চাউলের ভাত ও কদু তরকারী টাকি মাছ দিয়ে পাক করার জন্য। আমি এই কদু তরকারী দিয়ে দুপুরের খানা এখন রাত ১১ টায় খাব"। আমরা দাওরায়ে হাদীসের সব ছাত্র ঐ উন্নত মানের খানা তাবারুক হিসাবে ভাগ করে খেলাম। সদর সাহেব হুযুর কদুর তরকারী দিয়ে সাদা চাউলের ভাত খেলেন। আমরা বলতে লাগলাম, 'আকবারুল জিহাদে, জিহাদুল হাওয়া'।

সর্বাপেক্ষা বড় যুদ্ধ নিজ নফসের প্রতি যুদ্ধ ঘোষণা করা- এজন্যেই মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ) কে মুজাহিদে আযম বলা হয়। যিনি তার পুরা জীবনটি বাতিলের বিরুদ্ধে জিহাদ ও নফসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, ভাল বাড়ী, ভাল ঘর, ভাল খাবার-পরার বিরুদ্ধে জিহাদ ও সংগ্রাম করে গেছেন। এদিকে তাঁর শতাধিক ধর্মীয় কিতাবের লেখনীতে মুসলিম মিল্লাতের রুগ্ন কলবের চিকিৎসা হল। রুগ্ন সমাজ ফিরে পেল তাদের ইসলামী চিন্তা ও চেতনা। তাই আজ বাংলার মুসলিম সমাজ বলতে চায় হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ) এর সুযোগ্য উত্তরসূরি ও অনুসারী হলেন তবীবুল মিল্লাত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ)। আল্লাহ তার খাবগাহকে (কবর) ঠান্ডা ও শীতল রাখুন।

ইংরেজী ১৯৬৭ সন। তখন পাকিস্তানের প্রভাবশালী প্রেসিডেন্ট ছিলেন ফিল্ড মার্শাল মুহাম্মদ আইয়ুব খান ও তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রভাবশালী গভর্ণর ছিলেন আবদুল মোনায়েম খান। জানুয়ারী মাসের কোন এক দিন বেলা ৩ ঘটিকার সময় সংবাদ এল পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর আবদুল মোনায়েম খান সদর সাহেবের সাথে সাক্ষাতের জন্য জামেয়া কুরআনিয়া লালবাগ মাদ্রাসায় আসছেন। হঠাৎ মাদ্রাসা গেটে পুলিশের গাড়ি। পিছনে গভর্ণর সাহেবের পতাকাবাহী গাড়ি। গভর্ণর সাহেব গাড়ি হতে নেমেই পকেট থেকে একটা নকশী সূতার কাজ করা কাপড়ের টুপি মাথায় দিলেন। পরনে ছিল পায়জামা ও গায়ে পাঞ্জাবী। দুই পাশে দেহরক্ষী। টুকটুক করে হেটে তিনি সদর সাহেবের কামরার দরজায় গিয়ে দাঁড়ালেন। শ্রদ্ধা সহকারে সালাম দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, হুযুর আমি কি ভিতরে প্রবেশ করব। হযরত সদর সাহেব হুযুর প্রবেশের অনুমতি দিলেন। ভিতরে

www.pathagar.com

প্রবেশ করেই দাঁড়ানো অবস্থায় জিজ্ঞাসা করলেন হুযুর আমি উপরে বসব নাকি নীচে বসব। হযরত সদর সাহেব হুযুর উত্তর দিলেন, আপনার মন যেখানে চায় বসতে পারেন। অতঃপর গভর্ণর সাহেব নীচেই পাটির উপর বসে পড়লেন। গভর্ণর সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, হুযুর আমার আগমনে আপনি কি খুশী? হযরত সদর সাহেব উত্তর দিলেন- মোটেই খুশী না। কেননা পীর ফকিরদের দরবারে রাজা-বাদশাদের আগমণ মোটেই শুভ লক্ষণ নয়। তারা দুনিয়ার ব্যাপারে এসেছে নাকি আখিরাতের ব্যাপারে এসেছে জানা নাই। অধিকাংশ সময় তারা দুনিয়ার ব্যাপারে এসে থাকেন। আলেমের মধ্যে ঐ আলেম খুব খারাপ যিনি ধনীদের দরবারে পড়ে থাকেন এবং ধনীদের মধ্যে ঐ ধনী ভাল যিনি আলেমের দরবারে পড়ে থাকেন।

তারপর গভর্ণর সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি আমাকে সম্মান সহকারে উপরে বসতে বললেন না কেন ? হযরত সদর সাহেব জবাব দিলেন, কোন জালেমকে সম্মান করলে আল্লাহপাকের আরশে আজীম কেঁপে ওঠে। সুতরাং আমি চাই না আমার কোন কার্যকলাপে আল্লাহর আরশে আজীম কেঁপে উঠুক। গভর্ণর সাহেব জানতে চাইলেন, তবে আমি কি জালেম ? হযরত সদর সাহেব জবাব দিলেন, আমি আপনাকে ও আপনার প্রেসিডেন্ট মুহাম্মদ আইয়ুব খান সাহেবকে জালেম মনে করি। আপনারা দুইজন মুসলিম পারিবারিক আইন ও পরিবার পরিকল্পনা আইন পাশ করতঃ কুরআন ও হাদীস তথা আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের আইনের সীমা লঙ্ঘন করে জালেমে পরিণত হয়েছেন। তাই আমি আপনার আগমনের সংবাদ শুনে খুবই বিচলিত। এখনও আমার মধ্যে অশান্তি বিরাজমান।

গভর্ণর সাহেব রওয়ানার প্রাক্কালে দু'আ চেয়ে বললেন, হুযুর আমাকে কিছু নসীহত করুন। হযরত সদর সাহেব হুযুর বললেন, ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন বাতিল করুন, সারা দেশে পর্দার আইন চালু করুন, আপনার গভর্ণর হাউজে ঢাকা শহরের সবচেয়ে নিম্নমানের ও কম মূল্যের চাউল খাবেন। নতুবা পরকালে হিসাবের সময় হাজার হাজার লোকের হক নষ্টের অভিযোগে আপনার বিচার হবে। আপনি পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর। পূর্ব পাকিস্তানের সকলকে খাবার দিয়ে তারপর আপনাকে খাবার খেতে হবে।

অতঃপর গভর্ণর সাহেব হযরত সদর সাহেব হুযুরের সম্মুখে ছয়শত টাকা রেখে আরজ করলেন, হুযুর এই টাকা হালাল আমার বেতন হতে রেখেছি। মাদ্রাসার ছাত্রদেরকে এক বেলা গোশ্‌ত খাওয়ার জন্য লিল্লাহ বোর্ডিং-এ দান করলাম। হযরত সদর সাহেব হুযুর জিজ্ঞাসা করলেন, এই ছয়শত টাকা ব্যতীত চলতি মাসে আপনার সংসার ভাল চলল, কোন অসুবিধা হল না, তবে কি আপনি

www.pathagar.com

পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কোষাগার হতে আপনার মাসিক ভাতা ও বেতন বাবদ ছয়শত টাকা অতিরিক্ত গ্রহণ করছেন না? আপনি কি খলিফাতুল মুসলিমীন ও আমীরুল মুমীনিন হযরত ওমর ফারুক (রাযিঃ)'র হালুয়া রুটি খাবার ঘটনা জানেন না? জনাব গভর্ণর সাহেব, এই টাকা আমি হাত দিয়ে গ্রহণ করব না। আপনি নিজ হাতে লিল্লাহ বোর্ডিং-এর ম্যানেজারের নিকট জমা দিন। (আমি নাচিজ আব্বাসী) সেইদিন দেখতে পেলাম সদর সাহেব হুযুরের ঈমানী শক্তি ও জিহাদী প্রেরণা। কেননা আল্লাহর হাবীব এরশাদ করেন, "সবচেয়ে বড় জিহাদ জালেম শাসকের সম্মূখে হক কথা বলে টিকে থাকা"। তাইতো উপ-মহাদেশের মুসলিম মিল্লাত বলে থাকেন, মুজাহিদে আযম মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ)।

১৯৬৭ ইং সন। সম্ভবত ফেব্রুয়ারী মাসের কোন এক জুম'আর দিনে বাদ আছর হুজরা খানার সম্মূখে কয়েকজন বিশিষ্ট আলেম ও হযরত সদর সাহেব হুযুরের খাস মুরীদগণ নসীহত শুনার জন্য বসে আছেন। আমিও এসে সেই মজলিসে বসলাম। হযরত সদর সাহেব হুযুর বলছেন, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের কিছু নামধারী আলেম আইয়ুব খানের মুসলিম পারিবারিক আইন ও পরিবার পরিকল্পনা আইনের সমর্থন জানিয়েছে এবং কুরআন ও হাদীসের অপব্যাখ্যা দিয়ে উক্ত আইনকে শরীয়তসম্মত বলে প্রচার করছে। প্রকৃতপক্ষে এরা নামধারী আলেম। এই সব আলেমকে আমি সম্রাট আকবরের রাজ দরবারের আবুল ফজল বলে মনে করি। আবুল ফজলও একজন আলেম ছিলেন। আবুল ফজলই তো সম্রাট আকবরকে দ্বীনে ইলাহীর গঠনতন্ত্র তৈরী করে দিয়েছিলেন। এটা ইসলাম ও মুসলিম জাতির সাথে শত্রুতার নামান্তর।

১৯৬৭ ইং সনের কোন এক দিনের ঘটনা। হযরত সদর সাহেব (রহঃ) হুজরা খানার মধ্যে তাঁর কিছু মুরীদগণদের নসীহত করছেন। আমি উক্ত মজলিসে উপস্থিত ছিলাম। হযরত সদর সাহেব হুযুর বললেন, বাবাজীরা! দানে ধন কমে না, বরং আরো বাড়ে, কমপক্ষে দুই গুণ, উপরে দশ গুণ। ক্ষমায় ক্ষমতা কমে না, আরো বাড়ে, যে ক্ষমতার মধ্যে ক্ষমা নাই সে ক্ষমতার কোন মূল্য নাই। তোমাদের নিকট কেউ অন্যায় করে ক্ষমা চাইলে তোমরা ক্ষমা করে দিও। আল্লাহ পাক তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। নম্রতায় ভদ্রতা কমে না, আরো বাড়ে, আল্লাহ পাক নম্র ব্যক্তিকে ভদ্র বলে মনে করেন। নছীহতগুলোর সার সংক্ষেপ হলো (১) দানে ধন কমে না আরো বাড়ে (২) ক্ষমায় ক্ষমতা কমে না আরো বাড়ে (৩) নম্রতায় ভদ্রতা কমে না আরো বাড়ে। (আমি নাচিজ আব্বাসী) হযরতের এই অমিয় বাণীগুলো মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করলাম ও নোট বইতে লিখে রাখলাম।

www.pathagar.com

অতঃপর সদর সাহেব হুযুর (রহঃ) তার আলেম মুরীদদের দিকে লক্ষ্য করে বলছেন, আজকাল আলেমগণ মিঠা সুন্নতের আমলের উপর খুবই গুরুত্ব দিচ্ছে। পেট ভরে খাবার পর একটু মিষ্টি খাওয়া সুন্নত, দুপুরের আহারের পর একটু ঘুমানো সুন্নত। তোমরা কি রাসূলের কষ্টের সুন্নতগুলো চোখে দেখ না। যেমন- না খেয়ে থাকা সুন্নত, দুপুর বেলা দ্বীনের দাওয়াতে ও জিহাদে যাওয়াও সুন্নত। আমি নাচিজ আব্বাসী হযরতের এই নসীহতগুলো নোট বইতে লিখলাম এবং স্মরণ রাখছি ও আমল করার চেষ্টাও করছি।

হযরত সদর সাহেব হুযুর (রহঃ) এর ইন্তেকালের আনুমানিক ১০ বছর পর আমি বৃহত্তর বরিশাল জেলার বর্তমান ভোলা জেলার দক্ষিণে সাগরকূলস্থ চরফ্যাশন নামক উপজেলায় একটি তাফসীর মাহফিলে অংশগ্রহণ করলাম। আমার সফর সাথী ছিল বরিশাল শহরের মৌলভী খলিলুর রহমান। মাহফিল কমিটি আমাকে কিছু হাদিয়া প্রদান করল। আমি হাদিয়ার টাকা মৌলভী খলিলের নিকট জমা রাখলাম। একটা রিজার্ভ গাড়িতে চরফ্যাশন হতে ভোলা রওয়ানা হলাম। ভোলা হতে লঞ্চে বরিশাল যাব। চরফ্যাশন হতে তিন/চার মাইল পথ অতিক্রমের পর মাদ্রাসার এক দল ছাত্র গাড়ির গতি রোধ করতঃ আমার নিকট দুআ ও চাঁদা চাইল। আমি আমার সফর সাথী মৌলভী খলিলকে নির্দেশ দিলাম তিনশত টাকা দিয়ে দাও।

কয়েক মাইল অতিক্রম করার পর লাল মোহন নামক জায়গায় আসলে রাস্তার পার্শ্বে মসজিদ। গাড়ির গতি রোধ করতঃ মসজিদের নির্মাণ কাজের চাঁদা চাইলে আমি মৌলভী খলীলকে দুইশত টাকা দান করতে বললাম। ভোলা ফেরীঘাট পৌঁছবার পূর্বে মৌলভী খলিল বলল, হুযুর আপনি যা হাদিয়া পেলেন তা হতে পাঁচশত টাকা কমে গেল। জবাবে আমি বললাম, খলীল! হযরত সদর সাহেব হুযুর (রহঃ) বর্ণনা করেছেন, দানে ধন কমে না আরো বাড়ে। কমপক্ষে দুই গুণ, উপরে দশ গুণ। খলীল! আল্লাহর ওলীর পাক জবানের কথা কখনও বৃথা যেতে পারে না। ভোলা ফেরীঘাট হতে বরিশাল পর্যন্ত যাও তো। দেখ না কি হয়। গাড়ি ভোলা ফেরীঘাটে পৌঁছল। ফেরীঘাটের কুলীদের সর্দার আমাকে ও আমার সফর সাথীগণকে একটি হোটেলে বসিয়ে ভাল নাস্তা করালেন এবং বলতে লাগলেন- হুযুর আপনি ব্যস্ত হবেন না। আপনার জন্য একটা লঞ্চ রিজার্ভ করা হয়েছে। লঞ্চের ভাড়া আমরা বহন করব এবং আপনি আমাদের ফেরীঘাট দিয়ে যাচ্ছেন এজন্য আপনার নজরানা ও সম্মানী হিসাবে এই এক হাজার টাকা হাদিয়া প্রদান করলাম। (সুবহানাল্লাহ)

আমি তখন আমার খাদেম সফর সাথী মৌলভী খলীলকে বললাম, দানে ধন কমে না আরো বাড়ে কমপক্ষে দ্বিগুণ, উপরে দশ গুণ। হিসাব করে দেখ, নগদে

www.pathagar.com

হল দ্বিগুণ, লণ্ডের ভাড়া হিসাব করলে হবে দশগুণ। মৌলভী খলীল! এই কথাগুলো বর্ণনা করেছেন আমার শ্রদ্ধেয় উস্তাদ হাকীমুল উম্মতের উত্তরসূরি তবীবুল মিল্লাত হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ)।

১৯৬৭ ইং সনের মাঝামাঝি সময়। তখন আমাদের দাওরায়ে হাদীসের ষন্মাসিক পরীক্ষা হয়ে গিয়েছে। সদর সাহেব হুযুর হুজরার সম্মুখে একটা চেয়ারে বসে আছেন। অন্য কোন লোকজন তখন ছিল না। আমি নাচিজ আব্বাসী তার চেয়ারের পাশে বসে জিজ্ঞাসা করলাম, হযরত! পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফের একশত চৌদ্দটি সূরার মধ্যে কোন একটি আয়াতকে বার বার বলেন নাই। কিন্তু সূরায়ে আর-রাহমানের মধ্যে আল্লাহ পাক কেন ৩১ বার 'ফাবিআইয়ি আ'লা ই রাব্বিকুমা তুকাযযিবান' বলেছেন। হযরত সদর সাহেব হুযুর তখন মৃদু হেসে আমার থুতনাতে ধরে বললেন, তুমি জান না সূরায়ে আর-রাহমান কুরআনের জাতীয় সংগীত। আল্লাহ পাক বেহেশতবাসীকে নিজ কুদরতী কণ্ঠে কুরআনের জাতীয় সংগীত সূরা আর-রাহমান তেলাওয়াত করে শুনাবেন। শ্রুতিমধুতে বিভোর হয়ে বেহেশতবাসীগণ লক্ষ লক্ষ বছর বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকবেন। আমাদের পয়গাম্বর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরায়ে ইয়াসীন তেলাওয়াত করবেন। হযরত দাউদ (আঃ) যবুর কিতাব তেলাওয়াত করবেন। হযরত আদম (আঃ) হতে ঈসা রুহুউল্লাহ পর্যন্ত সব নবী রাসূলগণ উপস্থিত থাকবেন। আমরাও ঐ মজলিসে শ্রোতা হিসাবে উপস্থিত থাকব। দাদু ভাই কি ভাল মজলিশ! নবীগণকে একই মজলিসে দেখা যাবে। সব বেহেশতীগণকে একই মজলিসে দেখা যাবে। আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন উক্ত মাহফিলের সভাপতি হিসাবে জাতীয় সংগীত হিসাবে সূরা আর-রাহমান পরিবেশন করবেন। জাতীয় সংগীতের পয়ার বার বার উল্লেখ করতে হয়।

এ প্রসঙ্গে হযরত সদর সাহেব কেবলা বললেন, যেমন আরে ও মুমীন ভাই তুই করিস নারে ভয়, পাকিস্তানের দুর্দিন যাবে, হবে হবে জয়। এই পয়ার বার বার গাইতে হয়। সুতরাং সূরায়ে আর-রাহমানে 'ফাবিআইয়ি আ'লা ই রাব্বিকুমা তুকাযযিবান' জাতীয় সংগীতের পয়ার বা পংক্তি এই জন্য ৩১ বার উল্লেখ করেছেন।

১৯৬৭ ইং শাবান মাসের শেষের দিকে আমাদের দাওরায়ে হাদীসের সমাপনী ছবক ও বুখারী শরীফের শেষ হাদীসের দরস্ দেওয়ার জন্য হযরত মাওলানা জাফর আহমদ উসমানী সাহেব (রহঃ) পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ঢাকা আসলেন। শাহী মসজিদের ভিতর দরসের প্রস্তুতি নেয়া হল। মক্তব, হেফয খানা, জামাত বিভাগ ও দাওরায়ে হাদীসসহ প্রায় দেড় হাজার তালেবুল এলেম এবং ৩০/৪০ জন আসাতিযায়ে কেরামের উপস্থিতিতে হযরত উসমানী সাহেব

www.pathagar.com

(রহঃ) বুখারী শরীফের শেষ হাদীসের দরস্ দিলেন। মুনাজাতের পূর্বে হযরত ছদর সাহেব (রহঃ) কিছু উপদেশ ও নসীহত করলেন। উপদেশগুলো নিম্নরূপ ঃ

দাওরায়ে হাদীসের ছাত্ররা আজ হতে তোমরা ছাত্র নও। পাকিস্তানের আরবী শেখার সর্বোচ্চ ডিগ্রী দাওরায়ে হাদীস তোমরা হাসেল করেছ। এখন থেকে মানুষ তোমাদেরকে মাওলানা সাহেব বলবে। তোমরা যেখানে থাক যে অবস্থায় থাক নিজকে তা'লীমের সঙ্গে জড়িত রেখ। কমপক্ষে মক্তবের শিক্ষক হিসাবে কায়দা পড়ালেও পড়াইও। মক্তবের শিক্ষক ছোট শিক্ষক নয়। দাওরায়ে হাদীসের শিক্ষকের চেয়ে মক্তবের শিক্ষকের দাম অনেক বেশী। তারা আরবী শিক্ষার বুনিয়াদ ও আল্লাহর কালাম পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফের শিক্ষা দিচ্ছেন।

১৯৬৭ ইং সন। আমরা তখন ঢাকায় মৌলভী বাজারে হযরত মাওলানা মুফতী দ্বীন মুহাম্মদ খান সাহেব (রহঃ) এর নিকট তাফসীর পড়ছি। হযরত সদর সাহেব হুযুর (রহঃ) তখন স্বাস্থ্যগত কারণে নিজ বাড়ি গওহারডাঙ্গা চলে গিয়েছেন। হযরত খান সাহেব (রহঃ) তাফসীরের দরসের মধ্যে সাহাবায়ে কেরামের 'মানাকিব' বর্ণনা প্রসঙ্গে বললেন, তোমাদের উস্তাদ হযরত মাওলানা শামছুল হক সাহেব ফরিদপুরী যে একজন কামেল ওলী আমার কোন সন্দেহ নাই। চৌদ্দশত বছর পর সাহাবায়ে কেরামের আদর্শ ও নমুনার উপর কোন লোক যদি দেখতে চাও মাওলানা শামছুল হক সাহেব ফরিদপুরীর দিকে তাকাও। তিনি ইচ্ছা করলে ঢাকা শহরের ধানমন্ডিতে পাঁচ তলা বিল্ডিং তৈরী করতে পারতেন। তা না করে তিনি বাংলাদেশের মধ্যে কতগুলি মাদ্রাসা ও কতগুলো আলেম তৈরী করেছেন।

১৯৬৭ ইং সন। শাওয়াল মাস। হযরত সদর সাহেব হুযুর (রহঃ) খুব অসুস্থ। সংবাদ জানতে পেরে আমি ও হুযুরের একজন খাস মুরীদ মুন্সী আবদুল হামিদ সাহেবসহ গোয়ালন্দ হতে গওহারডাঙ্গা রওয়ানা হলাম। বিকাল ৪ টার সময় আমরা গওহারডাঙ্গা পৌছলাম। আসর নামায জামাতে আদায় করতঃ হযরতের সাথে সাক্ষাতের জন্য বাড়ী গেলাম। আমাদের সাথে বিভিন্ন জেলার ১০/১২ জন লোকও সাক্ষাতের জন্য গেল। প্রবেশের অনুমতি প্রাপ্তির পর বাড়ীর ভেতরে প্রবেশ করতঃ দেখতে পেলাম নিজ বাসগৃহের বারান্দায় একটা কাঠের তক্তার মাচায় তিনি বসে আছেন। সেই ঘরের বেড়া ও বাড়ীর পর্দার হাউলি বেড়া সবই পাটখড়ি দ্বারা বানানো। আমরা হযরতের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে দু'আর দরখাস্ত করলাম। হযরত সদর সাহেব হুযুর (রহঃ) উত্তরে বললেন, বাবাগণ পুরা জীবন আমি আপনাদের জন্য দু'আ করেছি। এখন আপনারা আমার জন্য দু'আ করুন। আমি যেন ঈমানের সাথে দুনিয়া হতে যেতে পারি।

www.pathagar.com

আমার যেন খাতেমা বিল খাইর হয়। এখন আমার দু'আ করার সময় না। এখন আমার দু'আ চাওয়ার সময়।

আমরা হযরতের দরবার হতে বিদায়ের প্রাক্কালে মুসাফাহা করে কিছু হাদিয়া পেশ করলাম। আমার পরিচয় জানতে চাইলেন। পরিচয় দেওয়ার পর আমাকে চিনতে পারলেন। আমার পিতা হযরতের মুরীদ। তিনি কেমন আছেন জানতে চাইলেন। আমার ও আমার সফর সাথী হযরতের মুরীদ মুন্সী আবদুল হামিদ সাহেবের হাদিয়াটুকু গ্রহণ করলেন।

আমাদের পর পরই ময়মনসিংহের এক ব্যক্তি হযরতের হাতে বড় অংকের হাদিয়া পেশ করলেন। হযরত ঐ লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, বাবা আপনার নাম কি? আপনার বাড়ী কোথায়? লোকটি নাম ও বাড়ীর ঠিকানা বলল। হযরত জিজ্ঞসা করলেন, আপনি কি ব্যবসা করেন? লোকটি উত্তর দিল, হুযুর আমি একজন সাধারণ ব্যবসায়ী। হযরত সদর সাহেব (রহঃ) হাদিয়ার টাকাগুলো ঐ ব্যক্তির হাতে ফেরত দিয়ে বললেন, বাবাজী আপনি রাগ হবেন না। আমি আপনাকে ভাল করে চিনতে পারি নাই। আপনার ব্যবসাটা ভাল না মন্দ আমার জানা নাই। সারা জীবন সন্দেহযুক্ত কোন বস্তু আমি খাই নাই। মৃত্যুকালে আমি সন্দেহযুক্ত কোন হাদিয়া গ্রহণ করব না। আপনার পূর্বে আমি যে দুইজনের হাদীয়া গ্রহণ করেছি তারা আমার পরিচিত লোক। তাদের কামাই হালাল আমার জানা আছে। বাবাজী আপনি এই টাকা গুলো দিয়ে কিছু ফল খরিদ করে আপনার ছেলেমেয়ের জন্য নিয়ে যাবেন। তারা যেন আমার জন্য দু'আ করে। মাসুম বাচ্চাদের মধ্যে নবীদের একটি গুণ আছে। নবীগণ নিষ্পাপ, ছোট শিশুরাও নিষ্পাপ। সুতরাং আল্লাহ পাক তাদের দু'আ অবশ্যই কবুল করবেন।

অবশেষে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের আলীশান পাক দরবারে এই মুনাজাত করতঃ আমার ক্ষুদ্র লেখনী শেষ করলাম। তিনি যেন আমাদেরকে হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ) এর সুযোগ্য উত্তরসূরি তবীবুল মিল্লাত হযরত মাওলানা শামছুল হক সাহেব ফরিদপুরীসহ পৃথিবীর সকল আউলিয়া কেরামগণের আদর্শ জীবন অনুসরণ ও অনুকরণের তৌফিক এনায়েত করেন। আমীন।

= 000 =

www.pathagar.com

মুজাহিদে আ'যমকে যেমন দেখেছি

আব্দুল লতীফ মাহমুদী

আমার গ্রামের বাড়ি বরিশাল জেলার উজিরপুরে। আমার দাদা ও পিতা ছিলেন দ্বীনদার ও আলেমভক্ত। আমাদের বাড়িতে মরহুম পীর বাদশাহ মিঞা ও পীর মোহসেন উদ্দীন দুদু মিঞাসহ বহু আলেম-ওলামা বিভিন্ন সময় তাশরিফ এনেছেন। আশরাফুল উলূম মাদ্রাসা হতে প্রকাশিত মাসিক নেয়ামত পত্রিকাসহ হযরত থানভী (রহঃ)-এর বিভিন্ন কিতাবের বাংলা অনুবাদ গ্রন্থ আমাদের ঘরে রক্ষিত ছিল। আমি যখন প্রাথমিক স্কুলে পড়ি, তখন থেকে বিভিন্ন বইতে হযরত মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (রহঃ)-এর নাম দেখে তাঁর প্রতি গভীর ভক্তি এবং তাঁকে স্বচক্ষে দেখার আগ্রহ পোষণ করতাম।

বরিশাল মাহমূদীয়া মাদ্রাসায় প্রাথমিক পর্যায়ে পড়ার সময় তাঁকে স্বচক্ষে বারবার দেখার সুযোগ পেতাম। প্রতি বৎসর মাদ্রাসার বার্ষিক মাহফিলের অন্যতম সভাপতি হিসেবে তাঁকে দাওয়াত দেয়া হত। একবার হযরত মুজাহিদে আ'যম মাহফিলে সভাপতির আসন গ্রহণ করেছিলেন। বাংলাদেশের জনৈক বিশিষ্ট ওয়ায়েজ ওয়াজ করছিলেন। তিনি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রশংসা করতে গিয়ে হযরত মুসা (আঃ)-এর কথা তুলনামূলক এমনভাবে আলোচনা করছিলেন যাতে হযরত মুসা (আঃ)-কে হেয় করা হয়। হযরত মুজাহিদে আ'যম তৎক্ষণাৎ উক্ত বক্তাকে হাত ধরে বসিয়ে দিলেন এবং নিজে তার ভুল সংশোধন করে দীর্ঘ বক্তব্য পেশ করলেন। বর্তমানে এভাবে সভাপতির দায়িত্ব পালন করতে দেখা যায় না। যার ফলে অনেক বক্তা ভুল-ভ্রান্তি পূর্ণ ওয়াজ করে শ্রোতাদেরকে গোমরাহ্ করার সুযোগ পাচ্ছে।

শায়েস্তাবাদ মাদ্রাসাই বরিশালের সবচেয়ে প্রাচীন মাদ্রাসা। উক্ত মাদ্রাসার মুহতামিম হযরত মাওলানা ক্বারী আনোয়ারুল্লাহ সাহেব অত্যন্ত বুযুর্গ আলেম ছিলেন। হযরত মুজাহিদে আযমের সাথে তাঁর গভীর সম্পর্ক ছিল। উক্ত মাদ্রাসার মাহফিলে হযরত মুজাহিদে আযম তাশরীফ আনতেন। বর্তমানে যেখানে মাহমূদীয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বৃটিশ শাসনামলে এর নাম ছিল 'গোপাল নগর' এবং সেখানে হিন্দুদের একটি আবাসিক এলাকা তৈরীর পরিকল্পনা ছিল। হযরত মুজাহিদে আযম শায়েস্তাবাদ মাহফিলে যাওয়ার পথে উক্ত স্থানের দিকে ইশারা করে বলেছিলেন, এখানে একটি দ্বীনী মাদ্রাসা হলে খুব ভাল হত। দেশ বিভাগের পরেই ১৯৪৮ ইংরেজী সনে সেখানে জামিয়া ইসলামিয়া মাহমূদিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। "কলন্দর হরচে গুয়েদ দীদা

www.pathagar.com

গুয়েদ"- আল্লাহর ওলীর আকাংখা অল্প দিনের মধ্যেই বাস্তবায়িত হল। এটাকে তাঁর একটি কারামত হিসাবে গণ্য করা যায়। মাহমূদিয়া মাদ্রাসার প্রতি তাঁর আন্তরিক দরদ ও দোয়া ছিল।

হযরত মুজাহিদে আযমের সান্নিধ্যে থেকে আমার লেখাপড়া করার প্রবল আগ্রহ ছিল। কিন্তু মাহমূদিয়া মাদ্রাসার মুহতামিম হযরত মাওলানা নেসার উদ্দীন সাহেব ও নাযেমে তা'লীমাত মরহুম হযরত মাওলানা আব্দুল মান্নান সাহেব ঢাকা যাওয়ার অনুমতি না দেওয়ায় অবশেষে শরহে বেকায়া পড়ার সময় পালিয়ে ঢাকা চলে যাই। এক সপ্তাহ পর্যন্ত হোটেলে খেয়ে ইসলামিয়া মাদ্রাসায়, আশরাফুল উলুম ও জামেয়া কোরআনিয়ার সবকে বসে বড় কাটারা মাদ্রাসায় ভর্তি হওয়ার সিদ্ধান্ত নেই। এখানে হযরত মাওলানা তাফাজ্জল হোসাইন সাহেব, হযরত মাওলানা মুফতী মুহিউদ্দীন সাহেব, হযরত মাওলানা ওহীদুজ্জামান সাহেব, হযরত মাওলানা শামসুদ্দীন কাসেমী সাহেব, হযরত মাওলানা আব্দুল খালেক সাহেব, হযরত মাওলানা মোহাম্মাদ আলী সাহেব, হযরত মাওলানা সিকান্দর আলী সাহেব আমার উস্তাদ ছিলেন। বড় কাটারা মাদ্রাসায় পড়ার সময় বিকেলে সুযোগ পেলে লালবাগ মাদ্রাসায় গিয়ে মুজাহিদে আযমের মজলিসের এক কোনে বসার চেষ্টা করতাম। ১৯৬৪ ইং সনে জামিয়া কোরআনিয়া লালবাগ মাদ্রাসায় ভর্তি হলাম।

আমি লালবাগ মাদ্রাসায় ভর্তি হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই করাচী ও লাহোর থেকে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে জানতে পারলাম যে, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান কোরআন বিরোধী মুসলিম পারিবারিক আইন পাশ করার জন্য জাতীয় সংসদে পেশ করার উদ্যোগ নিয়েছে। জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের নেতা মাওলানা মুফতী মাহমূদ, মাওলানা ইউছুফ বিন্নূরী, মাওলানা গোলাম গওস হাজারভীর নেতৃত্বে পশ্চিম পাকিস্তানে প্রচণ্ড বিক্ষোভ শুরু হয়েছে। সকল নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে উক্ত কুখ্যাত আইন বিরোধী পোষ্টারে সংসদ এলাকা লালে লাল হয়ে গেছে। সেখানে উক্ত আইন পাশ করার চেষ্টা করা হলে সংসদ সদস্যসহ বহু লোক হতাহত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তৎকালে জাতীয় সংসদের একটি অধিবেশন রাওয়াল পিণ্ডিতে ও একটি অধিবেশন ঢাকায় অনুষ্ঠিত হত। অবস্থা বেগতিক দেখে আইয়ুব খান কোরআন বিরোধী মুসলিম পারিবারিক আইন সংসদে পাস করতে না পেরে পরবর্তী ঢাকার অধিবেশনে পাশ করার সিদ্ধান্ত করল। পাকিস্তানের ওলামায়ে কেরাম ঢাকার আলেম সমাজকে সোচ্চার হওয়ার আহবান জানালেন। কিন্তু সারাদেশে তখন আইয়ুব খানের কনভেনশন মুসলিম লীগের দোর্দণ্ড প্রতাপ। প্রাদেশিক গভর্ণর মোনয়েম খান শক্ত হাতে দেশ শাসন করছিলেন। ঢাকার আলেম সমাজ নিষ্ক্রিয়। লালবাগ মাদ্রাসার সেক্রেটারী

www.pathagar.com

সাহেবের কড়া নির্দেশ ছিল মাদ্রাসার মুদাররেসীন ও ছাত্রবৃন্দ সরকার বিরোধী কোন কাজে লিপ্ত হতে পারবে না। হযরত সদর সাহেব হুযুর তখন বৃদ্ধ ও রোগাক্রান্ত। হযরত মাওলানা হেদায়েত উল্লাহ সাহেব নির্বাহী প্রিন্সিপ্যালের দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন। তিনি ছাত্র রাজনীতি আদৌ পছন্দ করতেন না। এক সময় জাতীয় সংসদের ঢাকা অধিবেশন সমাগত হল। কতিপয় নাস্তিক ও মহিলা সমিতি কোরআন বিরোধী মুসলিম পারিবারিক আইনের পক্ষে বক্তৃতা বিবৃতি শুরু করল। কিন্তু এর বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হল না। কারণ অধিকাংশ সংবাদপত্র উক্ত আইনের সমর্থক ছিল। অথবা সরকারী নিষেধাজ্ঞা ছিল। এমতাবস্থায় আমার অন্তরে দারুন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হল। যত ক্ষীণ কণ্ঠেই হোক, এর প্রতিবাদ করার জন্য আমি অস্থির হয়ে পড়লাম। কিন্তু তখন লালবাগ মাদ্রাসায় আমি একজন নতুন ছাত্র। আমাকে কেউ চেনেনা, আমিও কাউকে চিনি না। অগত্যা আমি আমার জামাতের সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করে একটা কিছু করার জন্য তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করলাম। তারা আমার কথাটি লুফে নিল। সেদিন রাতেই প্রত্যেক জামাতের ২-৩ জন ছাত্র নিয়ে গোপন পরামর্শ হল। সবাই প্রতিবাদ সভা করতে উৎসাহী হল। এজন্য একটি প্রস্তুতি কমিটি গঠন করা হল। আমি নবাগত ও নীচের জামাতের ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও সবাই আমাকে উক্ত কমিটির আহবায়ক মনোনীত করে। হাতে কয়েকদিনের সময় রেখে প্রতিবাদ সভার তারিখ ধার্য করা হল।

স্থান নির্ধারণ করা হল লালবাগ শাহী মসজিদ প্রাঙ্গণ। ব্যাপকভাবে পোষ্টারিং ও মাইকিং করার সিদ্ধান্ত করা হল। অত্যন্ত গোপনে সমস্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হল। ছাত্রদের থেকে গোপনে চাঁদা সংগ্রহ করে কয়েক রিম কাগজ ক্রয় করা হল। গভীর রাত্রে পোস্টার লেখা চলতে লাগল। লিখিত পোষ্টার গুলি পরদিন অন্যত্র সরিয়ে রাখা হল। ঢাকা হোটেলের মালিক জনাব আব্দুল মাজেদ সরদার সাহেব গভর্ণরের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ লোক হওয়া সত্ত্বেও ইসলামের জন্য নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন। আমরা কয়েকজন ছাত্র তাঁর সাথে দেখা করলাম। তিনি আমাদের অনেক টাকা চাঁদা দিয়ে উৎসাহিত করলেন। ঢাকার কয়েকটি কওমী মাদ্রাসা, আলিয়া মাদ্রাসা, আহলে হাদীস মাদ্রাসা, কলেজ, ইউনিভার্সিটি, মেডিকেল কলেজের ছাত্রনেতাদের চিঠি দেওয়া হল। ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চট্টগ্রাম, মোমেনশাহীর বিভিন্ন মাদ্রাসার ছাত্রনেতাদের আমন্ত্রণ জানানো হল। প্রতিবাদ সভার পূর্বরাত্রে সমস্ত ঢাকা শহরে পোষ্টারিং করা হল। সভার দিন ৪-৫টি বেবীতে সকাল হতে দূর-দূরান্তে মাইকিং করা হল। বেলা দুইটার পর সবগুলি মাইক লালবাগ মাদ্রাসার আশেপাশে চক্কর দিতে লাগল। ছাত্রকর্মীরা মাদ্রাসা হতে বহিস্কারের ঝুকি নিল। উস্তাদগণ একত্রিত হয়ে পরামর্শ করতে লাগলেন।

www.pathagar.com

তাঁরা মাদ্রাসায় তালা লাগার আশঙ্কায় শঙ্কিত হলেন। ততক্ষণে ঘটনা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। ছাত্ররা প্রতিবাদ সভাকে সফল করার লক্ষ্যে সম্মিলিত তৎপরতা শুরু করে দিয়েছে। ধর্মপ্রাণ জনসাধারণ আমাদেরকে ধন্যবাদ দিলেন। হুযুরদের মধ্যে কেউ কেউ দরজা বন্ধ করে কামরায় বসে রইলেন। এমন সময় হযরত সদর সাহেব আমাদেরকে তাঁর কামরায় তলব করলেন। আমরা ভয়ে ভয়ে তাঁর খেদমতে হাজির হলাম। তিনি আমাদের কিছু কথা শুনে জিজ্ঞেস করলেন, সভায় সভাপতিত্ব কে করবেন? আমরা বললাম। এখনো সভাপতি ঠিক করা হয় নাই। হুযুর বললেন, "আমিই সভাপতিত্ব করব।"

হুযুর দশটি টাকা দিয়ে বললেন তোমরা তাড়াতাড়ি চকবাজার গিয়ে হযরত মাওলানা নূর মোহাম্মাদ আযমীকে গিয়ে আমার পক্ষ থেকে দাওয়াত দিয়ে এস। হুযুরের কথা শুনে আমরা যে কতখানি আনন্দিত হয়েছিলাম তা ভাষায় ব্যক্তকরা অসম্ভব। আমরা ধারণা করেছিলাম মাগরিব পর্যন্ত সভা শেষ হবে কিন্তু বক্তার সংখ্যা বেশী হওয়ায় এশা পর্যন্ত সভার কাজ চলে। সভাপতির ভাষনে হযরত মুজাহিদে আযম পারিবারিক আইনকে কোরআন বিরোধী আইন বলে ঘোষণা করেন। প্রতিবাদ সভার উদ্যোক্তাদের প্রতি দোয়া ও তাদের উৎসাহ দান করেন। তিনি বললেন, এজন্য জেল-জুলুম বা গুলি করা হলে আমি তোমাদের সামনে থাকব। মুহূর্মুহূ তাকবীর ধ্বনিতে লালবাগ শাহী মসজিদ প্রাঙ্গঁন প্রকম্পিত হল। পরদিন সংবাদ পত্রে অত্র সভার সংবাদ প্রকাশিত হল।

করাচী ও লাহোর থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন উর্দূ পত্র-পত্রিকায় পশ্চিম পাকিস্তানের ওলামায়ে কেরামের অনেক মূল্যবান লেখা প্রকাশিত হত। তন্মধ্যে কোন লেখা বাংলাদেশের আলেম সমাজের জন্য জানা প্রয়োজন মনে হলে হযরত সদর সাহেব অনেক সময় আমাকে ডেকে পত্রিকাটি দিয়ে দিতেন এবং লেখাটি বাংলা অনুবাদ করার নির্দেশ দিতেন। অনুবাদ করে হুযুরের দরবারে পেশ করলে তিনি প্রয়োজনীয় সংশোধনের পর দৈনিক আজাদসহ বিভিন্ন পত্রিকায় পৌঁছে দিতে বলতেন। এভাবে আমার অনুদিত কতিপয় লেখা তৎকালীন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। প্রতিটি লেখা প্রকাশিত হওয়ার পর আমার উৎসাহ বহুগুণে বেড়ে গিয়েছিল।

ফিল্ড মার্শাল আইয়ূব খান যখন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট এবং আব্দুল মোনয়েম খান পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর ছিলেন, তখন বাংলাদেশের উপকুল অঞ্চলে এক প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানে। যার ফলে জান মালের প্রচুর ক্ষতি হয়। দুর্গত লোকদের সাহায্যার্থে গভর্ণর হাউজে এক বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। দেশের খ্যাতনামা নায়িকা, গায়িকা, নর্তকীদের নাচগানের আয়োজন করে ৫০০ টাকা ও ১০০০ টাকা মূল্যে লক্ষ লক্ষ টাকার টিকেট বিক্রি করা হয়।

www.pathagar.com

আদমজী, ইস্ফাহানী, বাওয়ানী গোষ্ঠীসহ বড় বড় ব্যবসায়ী-শিল্পপতিরা টিকেট ক্রয় করার জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়ল। গভর্ণর হাউজ চত্বরে বিরাট প্যান্ডেল তৈরী করা হয়। গোপনে সমস্ত আয়োজন শেষ করে অনুষ্ঠানের দিন সকল দৈনিক পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় ফলাও করে বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয়। হযরত মুজাহিদে আ'যম উক্ত বিজ্ঞাপন পাঠ করে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, আল্লাহর গযব ঘূর্ণিঝড় আকারে প্রকাশ পেয়েছে। এখন আবার তারা গভর্ণর হাউজে নাচ-গানের আয়োজন করে আল্লাহর গযবকে আহবান করছে। হুযুর অস্থির হয়ে উক্ত নাচ-গানের অনুষ্ঠান বন্ধ করার জন্য গভর্ণরকে একটি চরম পত্র লিখলেন। হুযুর চিঠিটি স্পষ্ট করে লিখে আনার জন্য আমাকে দিলেন। হুযুর লেখার মধ্যে অনেক আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহার করতেন। উক্ত চিঠিটিতেও কিছু আরবী-ফারসী শব্দ ছিল। আমার কর্তব্য ছিল উক্ত চিঠিটি হুবহু সুন্দর করে লিখে হুযুরের সম্মুখে পেশ করা। কিন্তু আমি দেখলাম কয়েকটি শব্দ পরিবর্তন করে অন্য শব্দ প্রয়োগ করা হলে চরম পত্রটি দারুন কড়া হবে।

অনেক দ্বিধা-দ্বন্দের পর আমি কয়েকটি শব্দ পরিবর্তন করে নতুন শব্দ বসালাম। হুযুরের মত মহান ব্যক্তির লেখার মধ্যে আমার মত নালায়েকের অনধিকার চর্চা চরম বেয়াদবী। তাই আমি ভয়ে জড়সড় হয়ে দোয়া দরুদ পড়তে পড়তে চিঠি নিয়ে হুযুরের খেদমতে হাযির হলাম। হুযুর চিঠিটি হাতে নিয়ে একবার পড়ে গম্ভীর হয়ে গেলেন। আমি মনে মনে ভয়ে কাঁপতে লাগলাম। হুযুর দ্বিতীয়বার চিঠিটি পড়ে আমার পিঠে থাপ্পড় দিয়ে বললেন, "সাবাস, আমি এমনই লেখা চেয়েছিলাম"। যোহরের পর হুযুর লোক মারফত সরাসরি গভর্ণরের হাতে চিঠি পৌঁছিয়ে দিলেন। বিকেলে রেডিও মারফত ঘোষণা করা হল যে, অনিবার্য কারণ বশতঃ গভর্ণর হাউজের বিচিত্রানুষ্ঠান বাতিল করা হল।

আমার কামরায় কুমিল্লার একটি ছাত্রের সীট ছিল। তার ছিল চুরি-ছেচড়ামীর স্বভাব। অনেক ছাত্রের মালামাল চুরি হতে লাগল। সবাই পেরেশান ছিল। হঠাৎ একদিন তাকে হাতেনাতে ধরা হল। উত্তেজিত ছাত্ররা তাকে মেরে রক্তাক্ত করে ফেলল। এমতাবস্থায় সে দৌড়ে গিয়ে লালবাগ থানায় পৌঁছুল। বারজন ছাত্রকে আসামী করে কেস এন্ট্রি হল। চোর ধরার ব্যাপারে আমি সক্রিয় ছিলাম। আমার নাম ছিল এক নম্বরে আর দুই নম্বরে ছিল ফজলুল হক আমিনী। ছাত্রটির একজন নিকটাত্মীয় ঢাকায় আইনজীবি ছিলেন। ছাত্রটি তার বাসায় গিয়ে সাহায্য চাইল। তিনি থানা থেকে কেসের নকল সংগ্রহ করে মাদ্রাসায় এসে হুযুরদের সাথে দেখা করলেন। তিনি বললেন, এটা এটেম টু মার্ডার কেস। তিনি আসামীদের নামে ওয়ারেন্ট জারী করান। হযরত ছদর সাহেব হুযুর বললেন, "আপনি যদি ছাত্রদের নামে ওয়ারেন্ট জারী করান তাহলে আমরা মাদ্রাসার তরফ হতে

www.pathagar.com

ছাত্রদের পক্ষে মামলা চালিয়ে যাব। তারচেয়ে এটা যেহেতু আমাদের ছাত্রদের ব্যাপার, তাই এর সুষ্ঠু বিচার আমাদের হাতে ছেড়ে দিন।" উকিল সাহেব বললেন, "আপনার কথার প্রেক্ষিতে আমি আপাততঃ মামলা স্থগিত রাখলাম। আগামী একমাসের মধ্যে সন্তোষজনক বিচার না হলে আমি মামলা ষ্টার্ট করব।"

অতঃপর পাঁচজন বিশিষ্ট উস্তাদ সমন্বয়ে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হল। কমিশন এক সপ্তাহ পর্যন্ত সকাল বিকাল অধিবেশনে মিলিত হয়ে আসামী ও সাক্ষীদের জবানবন্দী রেকর্ড করেন। কিন্তু আমি একনম্বর আসামী হওয়া সত্ত্বেও আমাকে সাফাই বয়ান দেওয়ার জন্য ডাকা হল না। কারণ, কমিশন জানতে পেরেছিলেন যে, আমাকে ডাকা হলে বেকসুর খালাশ দিতে হবে। কেননা, আমি যতগুলো কথা বলব, তার প্রত্যেকটি কথার সমর্থনে নতুন নতুন দু'জন ছাত্র সাক্ষ্যদেবে। অথচ বাদী পক্ষকে সন্তুষ্ট করার জন্য ১নং আসামীকে কঠোর শাস্তি দিতেই হবে। আমি এটা টের পেয়ে হযরত সদর সাহেব হুযুরের সমীপে হাযির হয়ে বললাম- হুযুর আমি ১নং আসামী। কিন্তু এখন পর্যন্ত আমাকে ডেকে জবানবন্দী নেওয়া হয় নাই। আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে কোন শাস্তি দেওয়া হলে আমার উপর জুলুম হবে। হুযুর বললেন, তোমাকে সাফাই বয়ান দেয়ার সুযোগ না দিয়ে শাস্তি দেওয়া হবে কেন? তোমার বক্তব্য শোনার জন্য আমি বলে দেব। কিন্তু এরপরও শাস্তি দিতেই হবে। অতঃপর একদিন আসরের পর উকিল সাহেবসহ বাদী পক্ষ হাযির হলেন। উস্তাদবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

আসামীগণকে ডাকা হল, ১৫-১৬ পৃষ্ঠা ব্যাপী রায় পড়া শুরু হল। হযরত সদর সাহেব হুযুর বললেন, "সময় কম বিস্তারিত পড়তে হবে না। শুধু রায় পাঠ করুন।" রায় পাঠ করতে গিয়ে যখন বললেন, "আব্দুল লতীফ মাহমুদীকে মাদ্রাসা হতে বহিষ্কার করা হল।" হযরত সদর সাহেব হুযুর বললেন, "রায়ের কাগজ পত্র আমার কাছে দিন।" কাগজ পত্র হুযুরের হাতে দেওয়া হল। হুযুর জিজ্ঞেস করলেন যে, আব্দুল লতীফের বক্তব্য শুনা হয়েছে কি না। তারা বললেন, "না।" হুযুর বললেন, "এ রায় আমি অনুমোদন করি না। এ রায় পুনঃবিবেচনার জন্য এক সপ্তাহ সময় দেওয়া হল। কোন ছাত্রকে বহিষ্কার করা সমীচীন হবে না। কারণ বহিষ্কার করা হলে শয়তানের ধোকায় পড়ে জেদের বশবর্তী হবে। তাই তাকে মাদ্রাসায় রেখেই সংশোধন করতে হবে"। বস্তুতঃ তখন আমার মানসিক অবস্থা সে রকমই ছিল। বছরের মাঝখানে বহিষ্কার করা হলে আমাদের অনেকের হয়তো কওমী মাদ্রাসায় শেষ পর্যন্ত পড়ার সৌভাগ্য হত না। আল্লাহর ওলীর দূরদর্শিতা এবং মহানুভবতা আমাদেরকে গোমরাহীর অতল গহ্বর হতে রক্ষা করেছে।

www.pathagar.com

যাহোক শেষ পর্যন্ত আমাদের শ্রদ্ধেয় উস্তাদ নায়েমে দারুল একামাহ হযরত মাওলানা হারুন ইসলামাবাদী সাহেব আমাকে ডেকে অত্যন্ত স্নেহের সাথে বুঝালেন যে, বাদী পক্ষকে সন্তুষ্ট করার জন্য তোমাকে আমাদের শাস্তি দিতেই হবে। এমতাবস্থায় তুমি নিজেই বল তোমার কি শাস্তি হওয়া উচিত? তখন আমি বললাম, "আহত ছাত্রটির চিকিৎসার খরচ আমাকে জরিমানা করা হলে আমি তা মানতে রাজী আছি।" এক সপ্তাহ পর বিচার হাতে তুলে নেওয়ার অপরাধে বিভিন্ন মেয়াদে কারো ফ্রি খানা ও সীট কাটা গেল, কারো শুধু ফ্রি খানা বন্ধ হল, কারো শুধু সীট কাটা গেল। আমাকে চিকিৎসা খরচের টাকা জরিমানা করা হল। আমি জরিমানার টাকা মাদ্রাসা দফতরে জমা দিলাম। বাদী পক্ষ সন্তুষ্ট হয়ে গেল। সেই ছাত্রটি আমার সাথে একই কামরায় ছিল এবং আমার যথেষ্ট সেবা-যত্ন করেছে। বার্ষিক পরীক্ষার পর বাড়ি রওয়ানা হওয়ার সময় হযরত মাওলানা হেদায়াতুল্লাহ মোহাদ্দেস সাহেব জরিমানার টাকাগুলি আমাকে ফেরত দিলেন। চিকিৎসার খরচ মাদ্রাসার পক্ষ হতে দেওয়া হয়েছিল। হযরত সদর সাহেব হুযুর, হযরত মোহাদ্দেস সাহেব হুযুর ও অন্য উস্তাদগণের আমার প্রতি এরূপ স্নেহ ও মহানুভবতার কথা চিরজীবন স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

১৯৬৫ ইং সনে আমি জামাতে উলা পড়ি। ষন্মাসিক পরীক্ষার পরে ১৫ দিনের বন্ধ। সবাই গ্রামের বাড়ি চলে যাবে। মাদ্রাসা একেবারে খালি হয়ে যাবে। আমিও বরিশালে যাবার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি। এমন সময় হযরত সদর সাহেব হুযুর আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি হুযুরের খেদমতে হাযির হলাম। হুযুর জিজ্ঞেস করলেন, "কি করছ?" আমি বললাম বাড়ি যাওয়ার জন্য বিছানা-পত্র বাঁধছি। হুযুর বললেন, "আমি বন্ধে মাদ্রাসায় থাকব, তুমিও থাক।" আমি বললাম ছাত্ররা সবাই চলে যাবে, একাকী মন টিকবে না। হুযুর বললেন, "তুমি এখনই জবাব দিও না। আমার কথাটি চিন্তা-বিবেচনা করে তারপর জবাব দিবে।" আসরের পর হুযুরের দরবারে বহু জ্ঞানী-গুনী ব্যক্তি বসা ছিলেন। আমি সেখানে উপস্থিত হলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "কি চিন্তা করেছ?" বললাম, বাড়ি চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত করেছি। হুযুর বললেন, "তুমি এক তরফা চিন্তা করেছ। আজকে যেও না, আমার কথাটি ঠাণ্ডা মস্তিষ্কে নিরপেক্ষ ভাবে চিন্তা করে আগামীকাল জবাব দিও"। পরদিন সকালে ডেকে হুযুর আমাকে কিছু টাকা দিলেন। আমার নিজের কাছে তখন একশ টাকা ছিল। তখন সস্তার বাজার ঢাকা হতে বরিশালের লঞ্চভাড়া ছিল চার টাকা ছয় আনা। চারি আনায় একবাটি খাসীর কলিজা বা মগজ ভূনা পাওয়া যেত। কাজেই বন্ধের দিনগুলিতে নাস্তা ও খানার জন্য একশ টাকাই যথেষ্ট ছিল। সুতরাং টাকা গ্রহণ করতে আমি অস্বীকার করি। হুযুর বললেন তুমি বাড়ি গেলেতো নিজের পয়সা খরচ করে নাস্তা-খানা খাওয়া লাগত না। আমি যেহেতু তোমাকে আটকে রেখেছি, তাই খানা ও নাস্তা খরচ আমিই দেব।

www.pathagar.com

আসরের পর আমি আবার হুযুর সমীপে উপস্থিত হলাম। পূর্বদিন যারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন আজও তাঁদের মধ্যে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি হুযুরের সান্নিধ্যে উপবিষ্ট ছিলেন। আমি বললাম হুযুর, খালি মাদ্রাসায় আদৌ আমার মন টিকে না, মেহেরবানী করে আমাকে বাড়ি যাওয়ার অনুমতি দিন। হুযুর কোন কথা বলার আগেই উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ আমার উপর রাগ করে বললেন, "মাদ্রাসার শত শত ছাত্র বাড়ি চলে যাচ্ছে, হুযুর কাউকে থাকতে বললেন না, তোমাকে হুযুর বার বার বলছেন। নিশ্চয় এরমধ্যে কোন তাৎপর্য আছে। তুমি বুঝছ না। কথাটি যদিও হুযুর সুপারিশ হিসেবে বলেছেন, কিন্তু বস্তুতঃ এটা হুযুরের আদেশ।" একথা শুনার পর আমি বাড়ি যাওয়ার আশা ত্যাগ করে মাদ্রাসায় থাকতে সম্মত হলাম।

মাগরিবের পর হুযুর আমাকে ডেকে- 'তাকসীমে আরাদিয়ে হিন্দ' নামক হযরত মুফতী মোহাম্মাদ শফী সাহেবের একখানি উর্দূ কিতাব দিলেন। উক্ত কিতাবে উপমহাদেশের কোন্ এলাকা যুদ্ধের মাধ্যমে মুসলমানরা জয় করেছে এবং কোন্ এলাকা সন্ধির মাধ্যমে জয় হয়েছে, কোথায় খেরাজ ওয়াজিব হবে, কোথায় ওশর ওয়াজিব হবে, তার ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক বিবরণ লিপিবদ্ধ ছিল। হুযুর উক্ত কিতাবখানি বাংলায় অনুবাদ করার জন্য নির্দেশ দিলেন। নীরবে নির্জনে একাগ্রচিত্তে অনুবাদের কাজ চালিয়ে গেলাম। সময় কাজে লাগল। অনুবাদ কার্য শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। মাদ্রাসা খোলার আর মাত্র তিন-চার দিন বাকী। এমন সময় হুযুর আমাকে ডেকে বললেন, তুমিতো বাড়ি যেতে চেয়েছিলে আমি তোমাকে যেতে দেইনি। এখন বেড়াতে যাও। বললাম, বন্ধতো প্রায় শেষ, এখন আর বাড়ি যাব না। হুযুর বললেন, "যাও,যাও, আগামী বন্ধ অনেক দূরে। ততদিন থাকতে তোমার মন খারাপ হবে।" আমি বললাম, হুযুর আমি যাব না। হুযুর বললেন, "শোন আমি নিজেই আগামীকাল গওহার ডাঙ্গা রওয়ানা করব, তখন তোমার আরো খারাপ লাগবে। তারচেয়ে তুমিও চল"। অগত্যা আমি রাজী হলাম। সন্ধ্যার পরে সদরঘাটে লঞ্চে উঠলাম। হযরত সদর সাহেব হুযুরের মুরীদ-মোতাকেদরা বড় বড় টিফিন ক্যারিয়ারে ভর্তি ভাত, পোলাও, বিরিয়ানী, মাছ, গোশত, ভাজি, রসগোল্লা, রসমালাই, সাগর কলা, শবরী কলা, আপেল, আঙ্গুর, কমলা, ডাব ইত্যাদি নিয়ে এল।

হুযুরের সাথে আমরা ১০-১২ জন ছাত্র ছিলাম। লঞ্চ ছাড়ার পর হুযুর পকেট থেকে কিছু টাকা বের করে আমাকে বললেন, "টাকাগুলি তোমার হেফাজতে রাখ।" আমি বললাম, হুযুর আমার টুপি, রুমাল, চাবি, মেসওয়াক ও টাকা প্রায়ই হারান যায়। অতএব, আমি টাকা হেফাজতের দায়িত্ব গ্রহণ করতে অপারগ। হুযুর বার বার নির্দেশ দেওয়ায় আমি টাকাগুলি পকেটে রাখলাম।

www.pathagar.com

এশার নামাযের পরে হুযুর ইলিশ মাছ দিয়ে আটার রুটি আহার করলেন। অন্যান্য ভাল ভাল খানা গুলি আমাদের খেতে বললেন। ফজলুল হক আমিনীসহ আমরা গোশত-পোলাও ইত্যাদি উপাদেয় খানাগুলি পাল্লা দিয়ে খেয়ে আমিনী (তখন সম্ভবত শরহে জামীর ছাত্র) ও অন্যান্য অধিকাংশ ছাত্র নেমে গেল। হাফেজ্জী হুযুরের ছেলে হাফেয আতাউল্লাহ্সহ (তখন গওহার ডাঙ্গা মাদ্রাসার ছাত্র) আমরা চার-পাঁচজন হুযুরের সাথে ছিলাম।

বরিশাল ঘাটে আসামাত্র আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। আমি তাড়াতাড়ি বিছানা বাঁধতে লাগলাম। হুযুর বললেন, "কি কর? তোমার টিকিট পাটগাতি পর্যন্ত কাটা হয়েছে। তুমি কখনও গওহার ডাঙ্গা মাদ্রাসায় গিয়েছ?" বললাম- জ্বী না। বললেন, "তোমাকে গওহার ডাঙ্গা মাদ্রাসা এবং আমাদের বাড়িতে বেড়াতে যেতে হবে।" একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও ক্ষুব্ধ মনে আবার বিছানা বিছালাম। চাশতের পর হুযুর আমাদের নাস্তা করতে বললেন। নিজে হাল্কা নাস্তা করে নিলেন। আমরা রুটি, কেক, মিষ্টি, কলা সব সাবাড় করলাম। বেলা বাড়ার পর লঞ্চে বসে থাকা অসহ্য লাগছিল। তাই চাকু দিয়ে ছিদ্র করে একটির পর একটি ডাবের পানি পান করে খোসাগুলিকে নদীতে নিক্ষেপ করছিলাম। দুপুর ১২টার পর পাটগাতি স্টেশনে লঞ্চ পৌঁছা মাত্র হুযুর জোর করে আরো কিছু টাকা আমার পকেটে ঢুকিয়ে দিলেন।

হুযুরের বাড়ি আসার সংবাদ গওহার ডাঙ্গা মাদ্রাসায় আগেই পৌঁছেছিল। মাদ্রাসার শত শত মুদাররেস ও ছাত্র হুযুরের অভ্যর্থনার জন্য স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। হুযুর লঞ্চের সিঁড়ি থেকে নেমে কয়েক কদম অগ্রসর হয়ে আমার দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, "আমার মেহমান, আমার মেহমান।" তখন আমার হাতে ছিল একটা চামড়ার হাত ব্যাগ, যার মধ্যে ছিল আমার জামা কাপড় ও কাগজ পত্র। হুযুরেরা এবং দাওরায়ে হাদীসের ছাত্ররা আমার ব্যাগ নিয়ে টানাটানি শুরু করে দিলেন। আমি নীচের জামাতের ছাত্র। দাঁড়ি মোচও গজায়নি, একান্ত হ্যাংলা-পাতলা। আমি লজ্জায় মরে যাচ্ছিলাম। তারা জোরাজুরি করে ব্যাগটা নিয়ে গেল। বিছানা-বালিশ আগেই তারা মাথায় তুলে নিয়েছে। গওহার ডাঙ্গা মাদ্রাসায় পৌঁছে জামে মসজিদের দক্ষিণপাশে খোলা বারান্দায় মালামাল রেখে বসে রইলাম। হযরত সদর সাহেব হুযুর মাদ্রাসার হুযুরদের সাথে কি যেন বললেন। খোলা বারান্দার পশ্চিমপাশের কামরাটি ছিল মাদ্রাসার কুতুবখানা। একটু পরেই বড় বড় ছাত্ররা দলে দলে এসে কিতাবগুলি মাথায় করে নিয়ে গেল। কামরাটি ঝেড়ে মুছে, বিছানা পাটি দিয়ে আমাকে সেখানে সীট দেওয়া হল। ছাত্ররা তাজ্জবের সাথে আমাকে দেখছিল। আমার মত নগণ্য একটি ছাত্রের জন্য কুতুবখানা স্থানান্তরিত হতে দেখে লজ্জায় আমি কোথায় লুকাব ভেবে পাচ্ছিলাম না।

www.pathagar.com

যোহরের পর হুযুর আমাকে খানার জন্য তার বাড়িতে নিয়ে গেলেন। আমি অবাক হলাম। আমার মত বিশিষ্ট মেহমানের জন্য অল্পদামের মোটা চাউলের ভাত ও মাছের যে সালুন তরকারী পরিবেশন করা হল, তা আমার লিল্লাহ বোর্ডিংএ খাওয়া মুখেও রুচি হচ্ছিল না। অতি কষ্টে সামান্য আহার করে ক্ষান্ত হলাম। হুযুরের বাসগৃহ ও খাদ্যের মান দেখে আমার কান্না পেল। হুযুরের অনুমতি পেলে তাঁর অনেক ভক্ত-অনুরক্ত সুরম্য প্রাসাদ নির্মাণ করে দিতে প্রস্তুত। তিনি ইচ্ছা করলে প্রতিদিন কোর্মা-পোলাও, বিরিয়ানী খেতে পারতেন। বহু অপরিচিত লোক মানিঅর্ডার যোগে তাঁকে ব্যক্তিগত ভাবে অনেক টাকা পাঠাতেন, কিন্তু হুযুর সে টাকা ফেরত দিয়ে দিতেন। তাঁর লেখা কিতাব বিক্রি করে অনেকে কোটিপতি হয়েছে। কিন্তু হুযুর কোন কিতাবের সত্ত্ব সংরক্ষণ করেননি। বাংলার যমিনে এতবড় মহান ত্যাগী পুরুষ আর জন্ম গ্রহণ করেছেন কি না সন্দেহ। আরেকজন দেশ-প্রেমিক, নিঃস্বার্থ ত্যাগী ব্যক্তিত্ব দেখেছি মরহুম মেজর এম,এ, জলিল কে।

হযরত সদর সাহেব হুযুর আমার অসুবিধা উপলব্ধি করতে পেরে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি যে কয়দিন গওহার ডাঙ্গা থাকবে, আমার ঘরে খানা খাবে, নাকি মাদ্রাসায় খাবে?" বললাম, হুযুর মাদ্রাসার খানা খেলেই আমার সুবিধা হবে। হুযুর নিজের পক্ষ হতে টাকা জমা দিয়ে মেহমান হিসেবে বোর্ডিংএ আমার খানা জারী করে দিলেন। প্রতিদিন একসের করে দুধ রোজ করলেন; থালা, গ্লাস, টিফিন কেরিয়ার, হারিকেনের ব্যবস্থা করলেন। আমার খেদমতের জন্য সার্বক্ষনিক খাদেম নিযুক্ত করলেন। বিকেলে পাটগাতি বাজার ও পার্শ্ববর্তী এলাকা ঘুরিয়ে দেখাতে বললেন। আমি সেখানে তিনদিন ছিলাম। এ তিনদিনে সেই 'তাকসীমে আরাদিয়ে হিন্দ' কিতাবের অনুবাদ শেষ করে হুযুরের খেদমতে জমা দিলাম। অতঃপর উক্ত পাণ্ডুলিপির আর কোন খোজ-খবর নেই।

প্রতিদিন বিকেলে হুযুরের দরবারে বহু আলেম-উলামা, ভক্ত-অনুরক্ত, পার্শ্ববর্তী গ্রামবাসী এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ জমায়েত হতেন। রাত্রে হুযুর আমাকে বললেন, "আগামীকাল খুব ভোরে তোমার লঞ্চ। তখন আমার সাথে দেখা হবে না। এখনই বিদায় নিয়ে রাখ।" বললাম, জ্বী, হুযুরকে অনেক তাকলিফ দিয়েছি, মেহেরবানী করে মাফ করে দিবেন। হুযুর বললেন, "মোসাফাহা করবে না?" বললাম, জ্বী। হুযুর হাত বাড়ালেন। কিন্তু আমি হাত বাড়ালাম না। উপস্থিত সবাই আমার অমার্জনীয় গোস্তাখী দেখে ক্ষিপ্ত হলেন। আমি বললাম, হুযুরের হাতের মধ্যে কি তা দেখেছেন? হুযুরের হাতের মধ্যে তখন অনেকগুলি টাকা ছিল। সবাই বললেন, "হুযুর যখন তোমাকে টাকা দিতেছেন, তখন তোমাকে তা নিতেই হবে।" বললাম আপনারা তো একবার দিতে দেখেছেন। কিন্তু ইতিপূর্বে

www.pathagar.com

এভাবে কতবার তিনি আমাকে টাকা দিয়েছেন, তা কি আপনারা জানেন? আমি এত টাকা দিয়ে কি করব? সকলের এক কথা তোমাকে মোসাফাহা করতেই হবে। হুযুর এতক্ষণ হাত বাড়িয়েই ছিলেন। অগত্যা মুসাফাহা করলাম। হুযুর টাকা গুলি আমার হাতে দিলেন।

পরদিন সকালে লঞ্চে বরিশাল না এসে খুলনা বেড়াতে গেলাম। ২-৩ দিন খুলনা বেড়িয়ে সেখান থেকে সরাসরি ঢাকা চলে গেলাম। বাড়িতে আর যাওয়া হল না। লালবাগ মাদ্রাসায় পৌঁছে দেখি আমার নাম কাটা গেছে। কারণ তখন মাদ্রাসার কানুন ছিল যেকোন বন্ধের পর খোলার তারিখের তিন দিনের মধ্যে হাজির না হলে নাম কাটা যাবে। আমি ৪র্থ দিন উপস্থিত হয়ে ছিলাম। আমি দফতরে গিয়ে হুযুরদের কাছে বললাম আমি নির্দোষ। আমাকে তো হযরত সদর সাহেব হুযুর একপ্রকার জোর করে তাঁর সাথে বেড়াতে নিয়ে গেছেন। তারা জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাছে হযরত সদর সাহেবের কোন চিঠি আছে? বললাম, জ্বী-না। বললেন, তোমার উপর আইন কার্যকরী হবে। বললাম, এখন কি করব? অন্য মাদ্রাসায় চলে যেতে হবে? তাঁরা বললেন, না, এখানেই নতুন করে ভর্তি হতে পারবে। অতএব পাঁচ টাকা দিয়ে নতুন ফরম কিনে পূরণ করে ভর্তি হয়ে পড়া শুরু করলাম।

ছাত্র জীবনে নাম কাটা বা বহিষ্কার একটি কলঙ্কজনক ব্যাপার। লালবাগ মাদ্রাসায় তিন বছর অধ্যয়ন কালে দুইবার বহিষ্কারাদেশের মধ্যে আমার কোন গ্লানি নেই। বরং উহা আমার জীবনের গৌরবজনক স্মৃতি মনে করি।

হযরত সদর সাহেব হুযুর একখানি বই লিখে তা সাফ করে লেখার জন্য একজন ছাত্রকে দিয়েছিলেন। উক্ত বইখানি প্রকাশিত হওয়ার পর প্রথম বিক্রয়লব্ধ টাকা প্রকাশক কর্তৃক হুযুরকে হাদিয়া পেশ করা হয়েছিল। হুযুর নকল নবীস ছাত্রটিকে ডেকে গোপনে সব টাকা প্রদান করেছিলেন। মাদ্রাসার কোন ছাত্র অসুস্থ হলে হুযুর খোজ খবর নিতেন। ঔষধ পথ্যের জন্য গোপনে টাকা পৌঁছে দিতেন।

আমরা তখন মেশকাত শরীফের ছাত্র। মেশকাত ১ম খণ্ডের দরস মাওলানা হেদায়েতুল্লাহ্ মোহাদ্দেস সাহেব দিতেন। দ্বিতীয় খণ্ড জনৈক উস্তাদকে প্রথমে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ছাত্ররা তাঁর কাছে পড়তে নারাজ। প্রথমে ছাত্ররা একজোট হয়ে অন্য উস্তাদের কাছে কিতাব সরিয়ে দেওয়ার দাবী করল। উক্ত হুযুর ছিলেন মাদ্রাসার সেক্রেটারী সাহেবের বিশেষ স্নেহভাজন। অন্য উস্তাদগণও ছিলেন অনড়। শেষ পর্যন্ত অচলাবস্থা নিরসনের জন্য হযরত সদর সাহেব হুযুর বৃদ্ধ বয়সে অসুস্থ শরীরে আমাদেরকে মেশকাত শরীফের দ্বিতীয় খণ্ড পড়াতে শুরু করলেন। বিভিন্ন হাদীসের উপর হুযুর যে মূল্যবান ব্যাখ্যা বর্ণনা করেছেন, তার কিছু কিছু এখনও স্মরণ আছে।

www.pathagar.com

ফজরের নামাযের পর প্রত্যহ হুযুরের সাথে মোসাফাহা করার জন্যআমাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। আমার দেখাদেখি অন্যান্য ছাত্ররাও মোসাফাহা করা শুরু করল। তাদের দেখাদেখি মহল্লার অন্যান্য মুসল্লীও মোসাফাহার জন্য লাইন দিল। তখন হুযুর এটা বন্ধ করলেন। প্রত্যহ আসরের পরে হুযুর মাদ্রাসার বারান্দায় ইজি চেয়ারে বসতেন। ঢাকার বড় বড় ইসলামী শিক্ষাবিদ, চিন্তাবিদ, বুদ্ধিজীবি, রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ পরামর্শের জন্য উপস্থিত হতেন। সেখানে হুযুর তাঁদের মূল্যবান পরামর্শ দিতেন। উক্ত মজলিসের এক কোনে বসে থাকার জন্য আমাকে প্রায়ই বলতেন। কিন্তু আমি সুযোগ পেলেই সরে যেতাম। ২/৩ দিন অনুপস্থিত থাকলে হুযুর লোক দিয়ে ডেকে এনে বসিয়ে রাখতেন। হুযুর আমাকে বায়আত হওয়ার জন্যও ইঙ্গিত দিতেন। কিন্তু আমি ভাগ্যাহত শয়তানের প্ররোচনায় বিরাট নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হয়েছি।

একবার মাদ্রাসার আর্থিক সংকট চলছিল। সকালে ভাত ও বিকেলে আটার রুটি দেয়া হত। ছাত্রদের অসুবিধা হচ্ছিল। তারা দলবেধে হযরত সদর সাহেবের নিকট আর্জি পেশ করতে গেল। আমাকেও সাথে নিল। হুযুর ধৈর্যের সাথে আমাদের সব কথা শুনলেন। জনৈক ছাত্র বলল, বড় কাটারা মাদ্রাসায় দু'বার ভাত মাছ দেয়া হয়। একথা শুনামাত্র হুযুর খুব রাগান্বিত হয়ে বললেন, তোমরা নিজেদের সমস্যার কথা তুলে ধরতে পার। কিন্তু অন্য মাদ্রাসার সাথে তুলনা দিলে কেন? প্রত্যেকে নিজ নিজ সামর্থ অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। আমরা হুযুরের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করলাম। হুযুর আমাদের মাফ করে দিয়ে বললেন, জীবনে এভাবে কোনদিন তুলনামূলক কোন কথা বলবে না। হুযুরের সেদিনের রাগ ও নসীহতের কথা আজীবন স্মরণ থাকবে। দু'একদিন পরেই আমাদের জন্য বিকালে আটার রুটির পরিবর্তে ভাতের ব্যবস্থা হল।

চরমোনাইর সাবেক চেয়ারম্যান ও কাসেমাবাদ মাদ্রাসার মোহাদ্দেস মাওলানা আব্দুল মান্নান সাহেব বলেন যে, ১৯৫৬ ইং সনে তিনি হজ্বের সফরে মদীনা শরীফ যান। সেখানে জনৈক আলেমের সাথে তাঁর খানায়ে কা'বা ও রওজা শরীফের মধ্যে কার মর্তবা বেশী এ সম্পর্কে তর্ক হয়। মক্কায় আসার পর তাওয়াফের সময় মাওলানা সাহেব খানায়ে কা'বার কাছে আসার সাথে সাথে ভীত-বিহ্বল হয়ে পড়েন। হাজরে আসওয়াদের কাছে যাওয়ার সাহস হচ্ছিল না। সে বছর বাংলাদেশের বহু বিশিষ্ট উলামা ও মাশায়েখ হজ্ব করার জন্য গিয়েছিলেন। মাওলানা সাহেব অনেকের সাথে নিজের মনের ব্যথা পেশ করলেন। কিন্তু কোন ফল হল না। অবশেষে অনেক তালাশ করে হযরত সদর সাহেব হুযুরের সাথে সাক্ষাত করে নিজের হালত বয়ান করলেন। হুযুর তাকে সান্ত্বনা দিলেন ও দোয়া করলেন। তার অন্তর হতে ভয়-ভীতি দূর হয়ে গেল। তিনি খানায়ে কা'বার কাছে গিয়ে হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করে অন্তর শীতল করলেন।

www.pathagar.com

মাহ্‌মুদীয়া মাদ্রাসার শিক্ষক কারী রূহুল আমীন বলেন, খুলনা নিবাসী জনৈক ভক্ত মুরীদ হুযুরের জীর্ণ-শীর্ণ বাসগৃহ দেখে মনে দুঃখ পেল। হুযুর হজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেলে উক্ত মুরীদ হুযুরের বাসগৃহ বড় ও সুন্দর করে নতুন ভাবে নির্মাণ করে দেন। দেশে ফিরে এসে ঘর দেখে হুযুর নাখোশ হলেন। তিনি নতুন ঘরটি ভেঙ্গে মাদ্রাসা কম্পাউন্ডে এনে মাদ্রাসা গৃহ সম্প্রসারণ করলেন। নিজে আবার ছোট করে জীর্ণকরে কুটির তৈরী করে নিলেন। কিছুদিন পর উক্ত মুরীদ দেখা করতে আসলে হুযুর রাগ করে তার সাথে কথা বললেন না। সে মাফ চাইলে হুযুর বললেন, আমার মত শামছুল হকের জন্য খড়ের ঘরই যথেষ্ট। তোমার তৌফিক থাকলে তালেবে এলেমদের জন্য ঘর তৈরী করা উচিত ছিল।

একবার গওহারডাঙ্গা মাদ্রাসার ক্ষেতের কিছু অকেজো লতাপাতা উপড়ে ক্ষেতের বাইরে ফেলে দেওয়া হয়। হযরত সদর সহেব হুযুরের গাভীপালক এসে বলল, হুযুর ওখানে মাদ্রাসার ক্ষেতের কিছু ঘাস ফেলে দেওয়া হয়েছে, সেখানে আপনার গরু বাঁধব? হুযুর বললেন, বাঁধতে পার। তিন দিন সেখানে গরু বাধা হল। হুযুর গাভী পালককে জিজ্ঞেস করলেন, তিন দিনে গরুর কয়টাকার খড়-কুটা লাগত? সে জবাব দিল। তখন হুযুর তার চেয়ে বেশী টাকা দিয়ে বললেন, এই টাকা মাদ্রাসার দফতরে জমা দিয়ে আস। দফতরের হুযুর টাকা নিতে অস্বীকার করে বললেন, ঐ লতা-পাতাতো কোন কাজের জিনিস ছিল না। সেজন্য টাকা দিতে হবে কেন? হযরত সদর সাহেব হুযুর বললেন- মাদ্রাসার জন্য কাজের জিনিস না হতে পারে। কিন্তু আমারতো কাজে লেগেছে। অগত্যা টাকা নিতে হল। এ ছিল তাঁর এখলাসের নমুনা।

বরিশাল দপ্তরখানা রোডের আব্দুল আজিজ কম্পাউণ্ডার বলেন, ঢাকা অবস্থান কালে তার অনেকগুলি টাকা চুরি হয়ে যায়। বিভিন্ন তদবীর করে ব্যর্থ হওয়ার পর তিনি হযরত সদর সাহেবের শরণাপন্ন হন। হুযুর বললেন- আমি দোয়া করব, তবে টাকা ফেরত পাওয়া গেলে চোরকে ক্ষমা করে দিতে হবে। চোরটি হুযুরের হাতে টাকা ফেরত দিয়ে তওবা করল। হুযুর আব্দুল আজিজ মিয়াকে চিঠি দিয়ে ডেকে এনে টাকা দিয়ে দিলেন।

এহেন মর্দে মোমীন, মুজাহিদে আযম, ওলীয়ে কামেলের কবরকে আল্লাহপাক আলোকিত করুন। আ'লায়ে ইল্লীনে তাঁকে স্থান দান করুন। আল্লাহুম্মা আমীন, ছুম্মা আমীন।

= ০০০ =

www.pathagar.com

বাংলার থানভী
মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ)

অধ্যাপক আবদুল গফুর

হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ)-কে কবে, কোথায় প্রথম দেখেছিলাম, মনে নেই। তবে এতটুকু মনে পড়ে প্রথম সাক্ষাতেই তাঁর মুখের সহজ সরল অভিব্যক্তি আমাকে মুগ্ধ করেছিল। এর পর যতবার তাঁর সান্নিধ্যে গিয়েছি, শত ব্যস্ততার মধ্যেও তাঁর সদাহাস্যময় মুখের সাদর অভ্যর্থনা থেকে বঞ্চিত হইনি কখনও। তাঁর সান্নিধ্যে যতটুকু সময়ই যখন কাটিয়েছি, মনে হয়েছে যেন তাঁর ঈমানী আভাদীপ্ত জীবনের এক শুভ্র পবিত্রতার পরশ লেগেছে আমার পাপদগ্ধ জীবনে। তাঁর সাথে যখন প্রথম পরিচয় হয় তখন আমার বয়স পঁচিশের মত হবে। যৌবনের গরম রক্তের কারণেই হোক আর আধুনিক শিক্ষার বিভ্রান্তির কারণেই হোক, তাঁর সব কথা সেদিন বুঝতে পারতাম না, তাঁর দেখানো পথের প্রকৃত মূল্য পুরাপুরি বুঝি নাই।

এ দেশের সমাজ জীবনে তাঁর অবদানের গুরুত্ব– যখন কিছু কিছু বুঝতে শিখলাম তখন তিনি গুরুতর অসুস্থ এবং গ্রামের বাড়ীতে। এর পরই হঠাৎ এক দিন শুনতে পেলাম, তিনি ইহ জীবনের মায়া কাটিয়ে চিরতরে আমাদের ছেড়ে তাঁর চির মাহবুবের কাছে চলে গেছেন। তাঁর নিকট সান্নিধ্যে যাবার সুযোগ আমার খুব বেশী হয় নাই, তবুও আমার সেদিন মনে হ'ল, তাঁর ইন্তেকালে কোথায় যেন এক মহাশূন্যতার গহবরে আপতিত হলাম। মনে হল শুধু আমি নই, মুসলিম বাংলার প্রতিটি সদস্যই যেন তাদের এক মহান মুরব্বী হারিয়ে এতিম হয়ে গেল।

মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরীকে লোকে সংক্ষেপে "সদর সাব" বা সদর সাব হুযুর" বলে জানত। বাংলাদেশে মুসলমানদের মধ্যে বহুজনই কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হয়েছেন, কিন্তু "প্রিন্সিপ্যাল সাব" বলতে সকলে একজনকেই চিনত। তিনি প্রিন্সিপ্যাল ইব্রাহীম খাঁ। বাংলাদেশে শের বা বাঘের মত সাহসী ব্যক্তি হয়ত আরও অনেকে ছিলেন, কিন্তু 'শেরে বাংলা' বলতে এ, কে, ফজলুল হক সাহেবকেই বুঝাত। তেমনি বাংলাদেশে সভা-সমিতি, মাদ্রাসা, আঞ্জুমানের সদর হয়ত ছিলেন অনেকেই, কিন্তু "সদর সাব" বা "সদর সাব হুযুর" বলতে সমগ্র বাংলাদেশের ধর্ম প্রাণ আলেম সমাজে মাত্র একজনকেই বুঝা যেত।

আমার এখন মনে পড়ে, তখন আমি ফরিদপুরে। ফরিদপুর শহরের সর্বজন শ্রদ্ধেয় আলেম মরহুম মাওলানা আব্দুল আলী ও মৌলভী রফিউদ্দিন আহমদ

www.pathagar.com

উভয়কেই পেয়েছিলাম ব্যক্তিগত জীবনে আমার শিক্ষক রূপে। ফরিদপুরের আলেম সমাজে তাঁদেরকে সকলেই মাথার মণি মনে করতেন। অথচ কখনও কোন উপলক্ষে মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরে গেলে চকবাজার মসজিদে সারা জেলার আলেম-ওলামার মহাভীড় লেগে যেত। উল্লিখিত দু'জনসহ সকল আলেম সাহেবান যেভাবে তাঁর সম্বন্ধে ভক্তি কণ্ঠে "সদর সাব" নাম উচ্চারণ করতেন, আমি অবাক হয়ে যেতাম। আশ্চর্যের ব্যাপার এমনটি শুধু ফরিদপুরে নয়, ঢাকায়ও দেখেছি। যতদিন তিনি বেঁচে ছিলেন, তিনি ছিলেন বাংলার আলেম সমাজের সকলের নয়নমণি এবং তাঁদের সর্ব কর্মকান্ডের কেন্দ্রবিন্দু।

"সদর সাহেব" কে ছিলেন? তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত আলেম, যিঁনি সাহরানপুর ও দেওবন্দে পড়াশুনা করেছেন। কিন্তু আমাদের দেশে আরও অনেক আলেমই তো ছিলেন বা আছেন, এমন কি সাহারানপুর, দেওবন্দে শিক্ষাপ্রাপ্ত আলেমদের সংখ্যাও তো আমাদের দেশে কম নয়। তাঁদের আর কারো সম্বন্ধে তো এমন কথা বলা হয় না। তাছাড়া একেবারে প্রেসিডেন্সী কলেজ ত্যাগ করে সরাসরি সাহারানপুর, দেওবন্দে যাবার ঐতিহ্যই বা কয়জনের আছে? তিনি ঢাকাস্থ লালবাগ জামেয়ার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন এবং নিজ গ্রাম ফরিদপুরের গওহারডাঙ্গায় তিনি একটি উচ্চমানের মাদ্রাসা স্থাপন করেন এবং খাদেমুল ইসলাম জামায়াত প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু এ দেশে মাদ্রাসা, জামেয়া বা দ্বীনী সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা তো আরও অনেকে ছিলেন ও আছেন। তাঁরা কেউ তো তাঁর সমকক্ষ রূপে বিবেচিত হন না।

তিনি একজন উচ্চপর্যায়ের লেখক ও গবেষক ছিলেন অথচ এ দেশে বিশেষ করে আলেমদের মধ্যেও লেখক ও গবেষকের সংখ্যা মোটেই কম নয়। কৈ তাদের সম্বন্ধে মানুষদের তো এত শ্রদ্ধাপ্লুত হতে দেখা যায় না। তিনি হেদায়েতের জন্য বহু জলসা-মাহফিলে ভাষণ দিয়েছেন। সত্যি বলতে কি তাঁর তুলনায় অধিকতর তেজস্বী বক্তা আলেম সমাজে বর্তমানে মোটেই কম নাই। অথচ তাঁরা কেউই তো তাঁর মত হেদায়েতকারী বিবেচিত হন না! তিনি একজন আধ্যাত্মিক বুযুর্গ ছিলেন, অথচ এ দেশে অসংখ্য পীর বুযুর্গ রয়েছেন, তবুও তাঁদের খুব কমজনই তো তাঁর মত সুউচ্চ মর্যাদার অধিকারী হতে পেরেছেন। তিনি দলীয় রাজনীতি নিয়ে মেতে না থাকলেও রাজনীতি বিষয়ে তাঁর সক্রিয় দৃষ্টি ছিল আগাগোড়া। এদেশে অনেক আলেমই রাজনীতি করেছেন এবং এখনও করছেন প্রত্যক্ষভাবে, তবুও তাঁদের খুব কম জনই তো রাজনীতি ক্ষেত্রে তাঁর মত মূল্যবান অবদান রেখে যেতে পেরেছেন।

প্রকৃত প্রস্তাবে হযরত মাওলানা শামছুল হক (রহঃ) ছিলেন একই সাথে আলেম, আধ্যাত্মিক বুযুর্গ, ইসলাম প্রচারক, লেখক, গবেষক, চিন্তাবিদ,

www.pathagar.com

সমাজসেবক, শিক্ষাবিদ, রাজনীতিক এবং সমাজ সংস্কারক। সর্বোপরি তিনি ছিলেন দ্বীন ও মিল্লাতের জন্য সর্বোতভাবে আত্মোৎসর্গকারী। এমন এক মহান ব্যক্তিত্ব যাঁর প্রতিটি মুহূর্তের চিন্তা-ভাবনা, স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষা এবং কর্মসাধনা ছিল আল্লাহ ও আল্লাহর রসুলের আদর্শের জন্য উৎসর্গীকৃত। তিনি মুলতঃ আলেম ছিলেন, কিন্তু আলেম হয়েও তিনি আধুনিক সমাজের চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে সম্যক পরিচিত ছিলেন। আধুনিক শিক্ষিতদের মন-মানসিকতা ও সমস্যা-সীমাবদ্ধতার সঙ্গে তাঁর নিবিড় পরিচয় ছিল বলেই তিনি তাদের রোগ বুঝতে পারতেন এবং সুনিপুণ চিকিৎসকের মত তাদের রোগের ওষুধও তাঁর জানা ছিল।

পঞ্চাশ দশকের গোঁড়ার দিকে তাঁর সান্নিধ্যে যাবার প্রথম সুযোগ হয় আমার, ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর ফারুক রাযিআল্লাহু আনহুর ওফাত বার্ষিকী পালন উপলক্ষে। এ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ রচনার জন্য তাঁর সাহায্য নিতে যেয়ে ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্পর্কে তাঁর অগাধ পান্ডিত্য ও গভীর জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে আমি বিস্মিত হই। সে বছর আমরা যে মাহফিলের আয়োজন করি, তাঁর প্রেরণায় সেটা অনুষ্ঠিত হয় লালবাগ শাহী মসজিদে এবং সেখানে তিনি এ বিষয়ে এক নাতিদীর্ঘ ভাষণ দেন।

এখানে তাঁর বক্তৃতার ধরণ সম্পর্কে একটু আলোকপাত করা বোধ করি অপ্রাসঙ্গিক হবে না। তিনি তথাকথিত বক্তাদের মত ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করতেন না। তাঁর ভাষণ ছিল যেন অনেক লোকের সামনে কিছু কথাবার্তা বলছেন, যার মধ্যে আজকালকার অনেক আলেম-বক্তার মত ভাষার ঝংকার থাকত না, থাকত না কেরাআতের সুরেলা মোহ। সহজ সরল ভাষায় তিনি কথা বলতেন অথচ তাঁর কথাগুলো যেন সকল শ্রোতার অন্তর ও হৃদয়কে সঙ্গে সঙ্গে স্পর্শ করে যেত। তাঁর রচনা সম্বন্ধেও একই কথা খাটে।

এ যুগে হেদায়েতের জন্য একটি বড় মাধ্যম বই। যুগের এ প্রয়োজন সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। মৌলিক রচনা ও আরবী উর্দু গ্রন্থ থেকে অনুবাদ মিলে তাঁর রচনার পরিধি বিরাট বিপুল। কিন্তু তাঁর রচনায় কোন কঠিন শব্দ নেই, বাক্যে নেই জটিলতার মারপ্যাঁচ। সহজ কথা, সহজ ভাষায় তিনি লিখেছেন, যা পড়তে সাধারণ অক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন লোকেরও কষ্ট হবার কথা নয়। তাঁর রচনাবলীতে অনেক সময় জটিল বিষয়ও স্থান পেয়েছে। কিন্তু কঠিন বিষয়কেও সহজ করে প্রকাশ করবার ব্যাপারে তাঁর জুড়ি বাংলা সাহিত্যে খুব বেশী ছিল না।

তিনি মুলতঃ ছিলেন একজন মর্দে মুজাহিদ ও একজন সমাজ সংস্কারক। তাই তাঁর রচনার মধ্যে কোরআনুল করীমের তফসীর থেকে শুরু করে মুসলিম মিল্লাতের ধর্মীয়, আধ্যাত্মিক, নৈতিক, পারিবারিক, ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক,

www.pathagar.com

সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সব বিষয়ই স্থান লাভ করেছে। তিনি আজকের দিনের তথাকথিত রাজনীতিক ছিলেন না। দলীয় রাজনীতি নিয়ে মাতামাতি তিনি করেন নাই কখনও। কিন্তু দেশের রাজনৈতিক কর্মকান্ডের ব্যাপারে তিনি নির্লিপ্তও ছিলেন না, বরং ছিলেন সক্রিয় সজাগ। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আলেমদের সংঘবদ্ধ করার তাগিদে জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠায় তিনি ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেন।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পাকিস্তানে আদর্শ প্রস্তাব পাশ করানো এবং ইসলামী শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে বিভিন্ন দল ও মতের আলেমদের ঐক্যবদ্ধ দাবী প্রণয়ন প্রভৃতির মারফৎ ইসলামী শাসনতন্ত্রের আন্দোলন জোরদার করতে তিনি সক্রিয় অবদান রাখেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, প্রকৃত আলেম হবেন ইসলামী আন্দোলনের মুজাহিদ এবং তাঁর পক্ষে দেশের রাজনীতির ব্যাপারে নির্লিপ্ততা সাজে না। তাঁর এ বিশ্বাস তাঁর জন্মসূত্রে পাওয়া কি না কে বলবে? তবে এটা ঐতিহাসিক সত্য যে, তাঁর দাদা (পিতামহ) স্বয়ং সৈয়দ আমহমদ ব্রেলভীর জেহাদী আন্দোলনে শরিক হয়েছিলেন। হয়ত এ বিশ্বাসের বশবর্তী হয়েই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর বেশ কিছু দিন তিনি তদানীন্তন ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগকে সমর্থন করলেও পরবর্তীকালে তিনি যখনই দেখলেন মুসলিম লীগের মধ্যে বিভ্রান্তি চরম ভাবে বাসা বেঁধেছে, তখন তিনি তার সংশ্রব ত্যাগ করেন।

ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে তিনি সব দল ও মতের ইসলামী সংগঠনকে একটি মাত্র প্লাটফর্মে ঐক্যবদ্ধ করবার ব্যাপারে যেমন আমরণ সাধনা করে যান, তেমনি কোন দলের মধ্যে মুসলিম মিল্লাতের ভিত্তি ও ঐক্য বিনাশকারী কোন প্রবণতা লক্ষ্য করলে সে সম্পর্কে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করতেও কখনো তিনি বিস্মিত হননি।

মুসলিম মিল্লাতের একজন সত্যিকার মঙ্গলকামী হিসাবে তিনি সরকারের ক্ষতিকর জাতিবিধ্বংসী নীতিসমূহের প্রতিবাদে দেশে সামরিক আইন বলবৎ থাকা অবস্থায়ও সরকারের প্রতি কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করতে ভয় পেতেন না। আদর্শের প্রশ্নে আইয়ূব খানের মত লৌহ-মানব ডিক্টেটরের মুখের সামনেও তিনি সমালোচনা করতে পিছপা হননি।

এমনি দুঃসাহসী মর্দে মুজাহিদ ব্যক্তি জীবনে ছিলেন শিশুর মত সরল, সম্পূর্ণ মাটির মানুষ এবং অসাধারণ অমায়িক ও বিনয়ী। তাঁর যে কোন রচনা বা পত্রের শেষে নিজের নাম তিনি দস্তখত করতেন "নাচিজ শামছুল হক" রূপে এবং তাঁর এই বিনয়ের মধ্যে কোন কৃত্রিমতা ছিল না। আমার মত একজন গোনাহগার মুসলমানও তাঁর দরবারে গেলে তিনি যেভাবে স্নেহ ও তাজিমের সাথে গ্রহণ করতেন, তা স্মরণ করলে আজও আমার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হয়ে ওঠে।

www.pathagar.com

আমার প্রতি তাঁর অকৃপণ স্নেহের এ ঋণ আমি কি দিয়ে শোধ করব, তা ভাবতে নিজের মনে জাগে শুধু ধিক্কার আর ধিক্কার।

হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। মানুষ দাঁত থাকতে দাঁতের মূল্য বোঝে না। তাঁকে হারিয়ে আজ আমরা বুঝি কি রত্ন হারিয়েছি। আজ তাঁর কথা যখন স্মরণ করি, যখন মিল্লাতের ইতিহাসে তাঁর স্থান নির্ণয়ের চেষ্টা করি তখন মনে হয়, তিনি যেন মুজাদ্দিদের ঐতিহাসিক ভূমিকাই পালন করে গেছেন। মুজাদ্দিদ অর্থ জাতির সার্বিক সংস্কার ও পথ প্রদর্শক। বিগত হিজরী শতকে মুসলিম মিল্লাত যে দু'জন মহান মুজাদ্দিদের হেদায়েত লাভে ধন্য হয়েছিল তাঁদের একজন ছিলেন ফুরফুরার পীর হযরত মাওলানা আবুবকর সিদ্দিকী (রহঃ) এবং অপর জন হাকিমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ)।

শেযোক্ত বুযুর্গ উর্দুভাষী ছিলেন বলে তাঁর হেদায়েত ও বাণী এ দেশের আপামর জনসাধারণের মধ্যে পৌঁছে দেবার এবং তাঁর শিক্ষার আলোকে এ দেশের মানুষের সামাজিক জীবন গড়ে তোলার জন্য এ দেশেরই আরেকজন মহান বুযুর্গ সাধকের প্রয়োজন সেদিন ছিল অপরিহার্য। মিল্লাতের প্রয়োজনে এই ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেন মোর্শেদে কামেল হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রঃ) ।

মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রঃ) ছিলেন একেবারে মিল্লাতগত প্রাণা। এত মশহুর সাধক, লক্ষ লক্ষ যাঁর ভক্ত, তিনি থাকতেন সাধারণত ভাবে, আহার করতেন অতি সাধারণ খানা, সহজ সরল জীবনকেই তিনি সব কিছুর উপরে স্থান দিতেন। তিনি অসুস্থ অবস্থায় রোগ শয্যায় থেকেও জাতির মঙ্গলের জন্য গ্রন্থ রচনা করে গেছেন এবং সব চাইতে বড় কথা কোন বইয়ের গ্রন্থস্বত্ব রেখে যাননি তাঁর ওয়ারেছদের জন্য। আজ জাতির স্বার্থেই এই আত্মত্যাগী মহান সাধকের কর্মবহুল জীবনী রচিত ও প্রকাশিত হওয়া উচিত।

মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী জন্মগ্রহণ করেন বাংলা ১৩০২ সালে, অর্থাৎ ইংরেজী ১৮৯৬ সালে। তিনি ইন্তেকাল করেন ইংরেজী ১৯৬৯ সাল মোতাবেক বাংলা ১৩৭৫ সালের ৭ই মাঘ। তিহাত্তর বছর তিনি বেঁচে ছিলেন। এ দীর্ঘ জীবনের প্রতিটি দিন প্রতিটি মুহূর্তই একজন হিসেবী লোকের মত তিনি ব্যয় ও ব্যবহার করেছেন একটি আদর্শের জন্য। আদর্শের কারণেই তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে শিক্ষা ত্যাগ করে যৌবনে চলে গিয়েছিলেন সাহারানপুর এবং সেখান থেকে দেওবন্দ। এই আদর্শের কারণেই তিনি পরবর্তীকালে পাকিস্তান আন্দোলন ও ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন, বিভিন্ন জামেয়া, মাদ্রাসা ও সংস্থা গঠন করেন এবং সর্বোপরি অসংখ্য দ্বীনী গ্রন্থ রচনা করে যান।

www.pathagar.com

তাঁর মধ্যে অসাধারণ প্রজ্ঞা, মেধা, দূরদৃষ্টি, কোরবাণী ও নেতৃত্বদানের ক্ষমতা লক্ষ্য করেই তাঁর মোর্শেদ মাওলানা জাফর আহমদ উসমানী তাঁকে "সদরে উলামা" লকব দেন। যার পর তিনি "সদর সাব" আখ্যায় সকলের নিকট পরিচিতি লাভ করেন এবং তাঁর জীবন পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় তিনি সত্যই আলেম সমাজের সদর তথা নেতা বলে বিভূষিত হওয়ার সম্পূর্ণ যোগ্য ছিলেন। জাতির এই একনিষ্ঠ সেবক, দূরদৃষ্টি সম্পন্ন মোরশেদ ও নির্ভীক মুজাহিদের জীবন চরিত রচিত হলে তা জাতির জন্য হবে এক অপরিসীম প্রেরণার উৎস।

=== O ===

[*নম্রতা, ভদ্রতা, উদারতা, দয়ার্দ্রতা, বিপদে ধৈর্যধারণ করা, সম্পদে শোক্‌র করা অল্পে তুষ্ট থাকা, আল্লাহ-রাসূলের প্রতি একিন-বিশ্বাস ও ভক্তি রাখা, খলকুল্লাহর খায়েরখাহী করা, আল্লাহ ও রাসূলের সঙ্গে, কুরআন-হাদীসের সঙ্গে বহব্বত পয়দা করা, আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা রাখা, আল্লাহতে রাজী থাকা, দুনিয়ার ধন দৌলতের চেয়ে আখেরাতের ধন দৌলতকে বেশী ভালবাসা ইত্যাদি অনুগ্রহ প্রাপ্তদের রাস্তা-সিরাতে মুস্তাকীম।*

পক্ষান্তরে অহংকার, হিংসা, বিদ্বেষ, অলসতা, অকর্মন্যতা, মোনাফেকী, বিচ্ছিন্নতা, শত্রুতা, মনোমালিন্য, কৃপনতা, পরনিন্দা, কামরিপুর বশ হওয়া, রিয়াকারী, ভন্ডামী করা, নির্দয়তা, নিষ্ঠুরতা ইত্যাদি পথভ্রান্তদের, অভিশপ্তদের রাস্তা।]

www.pathagar.com

উস্তাদে মুহতারাম
হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ)

মাওলানা ফজলুল হক আমিনী

বাংলাদেশের সর্বত্র 'সদর সাহেব' নামে সর্বাধিক খ্যাত ও পরিচিত মুজাহিদে আযম হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ) ছিলেন, উপমহাদেশের একজন শীর্যস্থানীয় আলেম, মুসলিম জাতির পথ প্রদর্শক, আধ্যাত্মিক রাহ্‌বার, অভিজ্ঞ রাজনীতিক, উঁচুস্তরের লেখক, গবেযক ও হাদীস তাফসীর বিশারদ। তাঁর জীবনের শেয আট বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতায় যে বিযয়গুলো আমি তাঁর খুব কাছে থেকে উপলব্ধি করেছি, তা হল- তাঁর ইখলাছ ও নিষ্ঠা, দ্বীনের জন্য দরদ ও আন্তরিকতা, মানুয গড়ার সার্বক্ষণিক চিন্তা ও উম্মতের কল্যাণ কামনায় আজন্ম ব্যাকুলতা।

যুগে যুগে আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীর বুকে বিভিন্ন যোগ্যতা ও বৈশিষ্ট্য দিয়ে মহান ব্যক্তিদের প্রেরণ করে থাকেন। যে যোগ্যতা ও বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে তাঁরা প্রত্যেকেই জগদ্বাসীর কাছে মহীয়ান হয়ে বেঁচে থাকেন। আল্লাহ তা'আলা এই মহান ব্যক্তিদের কাউকে জাগতিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে আবার কাউকে ধর্মীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানে পরিপূর্ণ করে বিশ্ববাসীর সামনে তাঁদের মহান ব্যক্তিত্ব ফুটিয়ে তুলে থাকেন। জাগতিক ও ধর্মীয় উভয় জ্ঞানের সমন্বয় একই ব্যক্তির মাঝে পাওয়া খুবই বিরল।

মুজাহিদে আযম হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ) ছিলেন এমন এক ব্যক্তি, যাঁর মাঝে জাগতিক ও ধর্মীয় উভয় জ্ঞানের সমাবেশ ঘটেছিল পূর্ণমাত্রায়। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ইলমের পাশাপাশি তিনি ছিলেন একজন চূড়ান্ত পর্যায়ের মুত্তাকী ও পরহেজগার ব্যক্তি। অহঙ্কার বা গর্ব কি তা তিনি জানতেন না। খোদাভীতি, তাকওয়া ও পরহেজগারীর মূর্তপ্রতীক এই মহান ব্যক্তিত্ব আল্লাহর প্রতি পূর্ণ অনুগত এবং যাবতীয় পাপ পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত থাকতে আজীবন সাধনায় ব্রতী ছিলেন। প্রকাশ্যে-গোপনে, সরবে-নীরবে, আনন্দে-বেদনায়, সুখে-দুঃখে, সুস্থতায়-অসুস্থতায়, ভ্রমণে-বাসস্থানে মোটকথা জীবনের প্রতিটি স্তর ও ক্ষেত্রে হযরত সদর সাহেবের তাকওয়ার কোন তুলনা হয় না। ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য এই মহান ব্যক্তিত্বের তাক্‌ওয়া অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় হয়ে থাকবে। তাক্‌ওয়ার এই মহান গুণাবলীর প্রভাবেই শত্রু তো বটেই অন্তরঙ্গ বন্ধুরা পর্যন্ত তাঁকে সমীহ করে চলত। দূর থেকে তাঁকে যতই বাঁকা চোখে দেখুক, সামনে দাঁড়ালে শত্রু-মিত্র সকলেরই শ্রদ্ধায়, ভক্তিতে মাথা নুয়ে আসত।

www.pathagar.com

এই মহৎ গুণ ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী মুজাহিদে আযম হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ) ১৮৯৮ ইংরেজী মোতাবেক ১৩০২ বাংলা সনের ফাল্গুন মাসের প্রথম সপ্তাহে বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জের গওহারডাঙ্গা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। অলৌকিক ভাবেই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পিতা-মাতার নামেই হযরত সদর সাহেব হুযুরের পিতা-মাতার নাম ছিল আব্দুল্লাহ ও আমিনা।

এই মহামনীষীর কোন এক পূর্বপুরুষ ইসলাম প্রচারের মহাব্রত নিয়ে আরব দেশ থেকে হিজরী ষোড়শ শতাব্দীতে টুঙ্গীপাড়ার গওহারডাঙ্গায় বসতি স্থাপন করেন। বালাকোটের শহীদ হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলবী (রহঃ)-এর বৃটিশ বিরোধী ও ভারত স্বাধীনতা আন্দোলনে শরীক হয়ে তাঁর পিতামহ 'গাজী' উপাধী লাভ করেছিলেন।

আরব বংশোদ্ভূত এই পুণ্যপুরুষ ছিলেন বিশ্বনবীর অন্যতম প্রেমিক। ইশ্‌কে নবী বা নবীর প্রেম ছিল তাঁর রন্ধ্রে রন্ধ্রে। সৃষ্টিকর্তার পর একজন সাচ্চা মুসলমানকে জীবনের চরম ও পরম ভালবাসা ও মুহাব্বতের আসনে স্থান দিতে হয় পিয়ারা নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)কে। ঈমানের পূর্ণতার জন্য এ এক অপরিহার্য বিষয়। এ সম্পর্কে মহানবী সাঃ) ইরশাদ করেন, "তোমাদের মাঝে কেউ মু'মিন হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি তার কাছে তার ছেলে-মেয়ে, পিতা-মাতা, এমনকি সমস্ত মানুষের থেকে প্রিয় ও ভালবাসার পাত্র হিসেবে গণ্য হই।" নবীর প্রেম ও ভালবাসার বন্ধনে প্রতিটি মুসলমানই আবদ্ধ। প্রত্যেকেই আশেকে রাসুলের দাবীদার কিন্তু হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ)-এর নবী প্রেম, ইশ্‌কে রাসুল একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও আলাদা ঐতিহ্য হিসেবে সব সময়ই ছিল জাজ্বল্যমান, যা সাধারণত কারো মাঝে পরিলক্ষিত হয় না। সুন্নতের পাবন্দীর উত্তম নমুনা ছিলেন হযরত সদর সাহেব। সর্বাবস্থায় ও সর্বস্থানে তিনি নবীর সুন্নতের প্রতি ছিলেন খুবই সতর্ক ও সজাগ।

শতাব্দীর সেরা এই নবী প্রেমিকের শৈশব, বাল্য ও প্রাথমিক শিক্ষার স্তরটা ছিল খুবই অভিনব ও চাঞ্চল্যকর ঘটনায় ভরপুর। তাঁর জীবনের এই সময়টার প্রতি লক্ষ্য করলেই অনুমান করা যাবে যে, সমস্ত প্রতিকুলতা ও প্রতিবন্ধকতার পাহাড় ডিঙ্গিয়ে সত্য ন্যায়ের উৎস সন্ধানে তিনি কত উদগ্রীব ছিলেন। তাঁর এই অস্থিরতাই প্রমাণ করে যে তিনি সামান্য কোন মানুষ ছিলেন না। অসামান্য, অসাধারণ এক ব্যক্তি ছিলেন তিনি। সে সময় শিক্ষা-দীক্ষার প্রচলন ছিল খুবই নগণ্য। কোন শিক্ষাই হাতের নাগালে ছিল না। বলতে গেলে ইসলামী শিক্ষা ছিল আরও দুঃস্প্রাপ্য। সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ)-এর পিতা ছিলেন আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাব

www.pathagar.com

অথচ শিক্ষার তীব্র প্রয়োজন। তাই তিনি আদর্শ সন্তান হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ছেলেকে স্থানীয় পাটগাতির এক হিন্দু পণ্ডিতের কাছে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য সমর্পণ করেন। এরপর সদর সাহেব টুঙ্গিপাড়া ও বরিশাল সুটিয়াকাঠি স্কুলে কৃতিত্বের সাথে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন।

ছোটবেলা থেকেই নম্র, ভদ্র, বিনয়ী, চিন্তাশীল, লাজুক, অত্যন্ত মেধাবী ও তীক্ষ্ম বুদ্ধির অধিকারী মাওলানা শামছুল হক পৈত্রিক অনিচ্ছার অন্তরালে আরবী শিক্ষার প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেন। পিতার অজান্তে তিনি সময়ের ফাঁক গলিয়ে আরবী ও ফার্সী ভাষা আয়ত্বে আনার এক দুর্বিনীত প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন। এ সময় তাঁকে যশোরের নোয়াপাড়া স্কুলে ভর্তি করানো হলে তিনি স্কুলের পড়া বাদ দিয়ে আরবী পড়ার দিকে ঝুঁকে পড়েন। সদর সাহেব বলতেন, এসময় আমার অন্তর কুরআন ও হাদীস বুঝার জন্য ব্যাকুল ও অস্থির হয়ে উঠত। কিন্তু আমার এই ব্যাকুলতা অনুধাবন করার মত কেউ ছিলনা। আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও পুনরায় আমাকে বাঘুডিয়া হাই স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি করে দেয়া হয়।

অল্প কিছুদিনের মাঝেই হাই স্কুলের হিন্দু হেড মাষ্টার সদর সাহেব এর অসাধারণ মেধাশক্তি, পাণ্ডিত্ব, তীক্ষ্মবুদ্ধি, নম্রতা ও সততায় অভিভূত হয়ে পড়েন। এমনকি হেড মাষ্টার সাহেব এক পর্যায়ে ছাত্র শিক্ষকদের এক সভায় হযরত সদর সাহেবের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতে গিয়ে মন্তব্য করেন- "শামছুল হকের প্রতি আমার আস্থা এত প্রবল যে, পরীক্ষার পূর্বে তার হাতে প্রশ্নপত্র তুলে দেয়া হলেও আমার কোন চিন্তা থাকবে না। কারণ, আমি নিশ্চিত যে, সে তা খুলেও দেখবে না বা কাউকে দেখাবেও না। হযরত সদর সাহেব ১৯১৫ ইং সালে ষষ্ঠ শ্রেণীতে নিজের ক্লাশসহ গোটা স্কুলেই প্রথম স্থান অধিকার করেন। এই ভরপুর ফেৎনা-ফাসাদের যুগেও হযরত সদর সাহেব (রহঃ) সীমাহীন ত্যাগ, কঠোর সাধনা ও পরিশ্রমের মাধ্যমে নিজেকে এমন সব উত্তম ও মহান গুণে সজ্জিত করে ছিলেন, যা বর্তমান যুগে কল্পনাতীত ব্যাপার। অদূর ভবিষ্যতে যে ব্যক্তি মহান সংস্কারক ও একটি জাতির উত্থানে অগ্রনায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন, তাঁর জীবন প্রবাহে বাল্যকালেই অস্বাভাবিক কিছু ঘটনার সমাহার ঘটবে, এটাই তো স্বাভাবিক।

হযরত সদর সাহেবকে বহুবার একটি ঘটনা বর্ণনা করতে শুনেছি। তিনি বলতেন, "আমি যখন গ্রামের স্কুলের ছাত্র, তখনকার ঘটনা। একদিন ভাল জামাকাপড় পরে কোন আত্মীয়ের বাড়ি রওনা হয়েছি। পথিমধ্যে এক দরিদ্র অসহায় বৃদ্ধকে কাঁদতে দেখে কারণ জানতে চাইলাম। বৃদ্ধটি বলল, মাছ ধরার জন্য ক্ষেতের আইলে একটি 'চাঁই' পেতে ছিলাম, হঠাৎ প্রবল বৃষ্টিতে তা গভীর পানির নীচে তলিয়ে গেছে। এই বৃদ্ধ বয়সে এত পানির নীচ থেকে তা উঠাব

www.pathagar.com

কেমন করে? তখন আমি বললাম, আরে! এজন্য আপনি কাঁদছেন? কোন চিন্তা নেই, ঐ জিনিযটি কোথায় আছে আমাকে দেখিয়ে দিন, আমি এক্ষুণি তা আপনাকে এনে দিচ্ছি। বৃদ্ধ আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতেই আমি আমার পরিস্কার জামা-কাপড়সহ ঐ ময়লা-কাদার পানিতে নেমে তার সেই বস্তুটি উঠিয়ে এনে তার হাতে তুলে দিলাম। আমার এই ছোট কাজে অসহায় বৃদ্ধটি এতই খুশী হল যে, সে আমার জন্য অন্তর খুলে দুয়া করতে আরম্ভ করল। হযরত সদর সাহেব বলতেন, "আমার এখনও মনে হয়, এই বৃদ্ধের দুয়ার বদৌলতেই আমি আজ দ্বীনী লাইনে আসতে পেরেছি।"

এই মহামনীষী স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনন্য কৃতিত্ব অর্জন করায় তাঁর পিতা উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে তাঁকে কলকাতায় পাঠিয়ে দেন। প্রথমে তিনি কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন। কিন্তু এখানকার শিক্ষা হযরত সদর সাহেবের সযত্নে লালিত স্বপ্ন বাস্তবায়নে যথার্থ ছিল না। তাই তিনি প্রাইভেট ভাবে বেশ কয়েকজন ইসলামী চিন্তাবিদের কাছে আরবী শিক্ষার কার্যক্রম অব্যাহত রাখেন। সীরাতে নববীর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'আসাহ্হুস সিয়ার' এর রচয়িতা মাওলানা আব্দুর রউফ দানাপুরী (রহঃ)-এর নিকট এসময় হযরত সদর সাহেব বিশেষ শিক্ষা অর্জন করেন। এরপর তিনি পিতার নির্দেশ রক্ষায় কলকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হন।

১৯১৯ ইং সনে প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তির জন্য অসংখ্য ছাত্রের ভীড় ছিল। পরবর্তী কালের গভর্ণর মুনয়েম খানসহ অনেক নামজাদা ব্যক্তিত্ব তখন সেখানে ভর্তির জন্য লাইন দিয়েছিল। শুধুমাত্র পিতার আদেশ পালনার্থে নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও হযরত সদর সাহেব সেই প্রবেশিকা পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করেন। নিজে ইচ্ছাকৃতভাবে ফলাফল খারাপ করার লক্ষ্যেই তিনি ৩ ঘন্টার পরিবর্তে ১ ঘন্টা লিখে খাতা জমা দেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, ফলাফল খারাপ হলে, তাকে আর তাঁর পিতা কলেজে পড়তে বাধ্য করবেন না। কিন্তু হায়! মুনয়েম খানসহ অসংখ্য ছাত্র অকৃতকার্য হলেও হযরত সদর সাহেব ৫টি বিষয়ে লেটারসহ প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হলেন। ফলে তাঁকে এই কলেজেই লেখাপড়া চালিয়ে যেতে হল।

এখানে লেখাপড়ার সময় একবার হাকীমুল উম্মত, মুজাদ্দিদে মিল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ) কলিকাতায় আগমণ করেন। হযরত সদর সাহেব এ সময় হযরত থানভী (রহঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়ে দুয়ার দরখাস্ত করে বললেন, "হযরত! আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি অর্জনের পদ্ধতি কি?" তাঁর এই প্রশ্নে হযরত থানভী (রহঃ) অত্যধিক খুশী হয়ে মাথায় হাত রেখে বললেন, "তুমি কি লেখাপড়া কর, বাবা?" সদর সাহেব উত্তরে বললেন,

www.pathagar.com

ইংরেজী। হযরত থানভী পুনরায় প্রশ্ন করলেন, "ইলমে দ্বীন কেন পড়ছ না?" এসময় হযরত সদর সাহেবের দু'নয়ন জুড়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। তিনি বললেন, "ইলমে দ্বীন পড়ার জন্যতো আমি প্রস্তুত কিন্তু পিতা রাজী হচ্ছেন না।" এ উত্তরে হযরত থানভী (রহঃ) আফসোস করে বললেন, "এমন যামানা এসেছে যে, ছেলে ইলমে দ্বীন পড়ার জন্য প্রস্তুত অথচ পিতা রাজী হচ্ছেন না!"

হযরত সদর সাহেব বলেন, হযরত থানভী (রহঃ)-এর সাথে সাক্ষাতের পর দ্বীনী ইলম অর্জনের তীব্রতা আমার মাঝে এত বেশী বৃদ্ধি পায় যে, এসময় মাঝে মাঝে আগ্রহকে অবদমিত করতে না পেরে, হাতে কুরআন নিয়ে গভীর জঙ্গলে চলে যেতাম। সেখানে দীর্ঘক্ষণ ধরে পবিত্র কুরআন মাথায় রেখে, সীনায় চেপে ধরে আল্লাহর দরবারে খুব রোনাজারী করতাম। সে সময় আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করতাম, "প্রভু হে! তুমি এই অধমকে তোমার দ্বীন, তোমার কালামের ইলম থেকে কি বঞ্চিত রাখবে? আমাকে কি তুমি তোমার ছায়াতলে আশ্রয় দিবে না?" কান্নাকাটি করতে করতে এমন একটি পর্যায়ের সৃষ্টি হত যে, আমি উচ্চস্বরে কাঁদতে কাঁদতে মাটিতে গড়াগড়ি খেতাম।

হযরত সদর সাহেব বলেন, "আল্লাহ তা'আলা আমার এই দুয়া কবুল করেছিলেন। ১৯২০ সালে সমগ্র ভারতে ইংরেজ বিরোধী অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। এসময় সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করা হয়। আমি আমার পিতার নিকট- এ শিক্ষার আর প্রয়োজন নেই, এ মর্মে একটি পত্র লিখে দারুল উলূম দেওবন্দের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেই।

হযরত সদর সাহেব বলেন- মাদ্রাসা শিক্ষা সম্পর্কে তখন আমার কোন ধারণাই ছিল না। ইংরেজী শিক্ষার যে বিরাট ব্যয়, মাদ্রাসা শিক্ষার ব্যাপারেও আমার একই ধারণা ছিল। যে কারণে রওয়ানার পূর্বক্ষণে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, রাতের বেলায় কুলিগিরি করে অর্থ উপার্জন করব আর দিনের বেলায় লেখাপড়া করব। উপার্জিত অর্থের অর্ধেক নিজের খাওয়া-দাওয়ায় বাকী অর্ধেক শিক্ষকদের বেতনে ব্যয় করব।

আল্লাহু আকবার! কী ইখলাস, কী নিষ্ঠা! যে ইখলাস আর নিষ্ঠাকে মানব জীবনের সকল ইবাদত, উপাসনা এবং সকল কার্যক্রমের মূল স্তম্ভ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। যে ইখলাস ব্যতীত কোন আমলই আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। সেই ইখলাসের সুদৃঢ় প্রাচীর তাঁর মাঝে এমনভাবে বিরাজমান ছিল। উপরোক্ত ঘটনা থেকেই অনুমান করা যায়। আজীবন হযরত সদর সাহেবের সকল কার্যক্রম ইখলাস ও নিষ্ঠায় পরিপূর্ণ ছিল। রিয়া বা লৌকিকতার লেশমাত্র ছিল না তাঁর কোন কার্যক্রমে। পর্বতসম ইখলাস আর নিষ্ঠার কারণেই তাঁর সামান্য সামান্য কথাও মানুষের অন্তরে রেখাপাত করত। অসংখ্য মানুষের হৃদয়

www.pathagar.com

তাঁর কথায় মোমের মত বিগলিত হয়ে যেত। তাঁর সহজ ও সরল কথার ওজন যে কত অধিক ছিল, তা কল্পনা করাও কঠিন। তাঁর অঙ্গুলীর নির্দেশে আলেম-উলামাসহ সর্বস্তরের মুসলমান ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়তে দ্বিধা করত না।

হযরত সদর সাহেব হুযুর কলকাতা থেকে দেওবন্দের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন রজব মাসে। এ সময়টা হল মাদ্রাসা শিক্ষাবর্ষের শেষ সময়। রমজানের পর নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরু হবে। তাই এই দীর্ঘ সময় নষ্ট না করে তিনি সরাসরি হযরত থানভী (রহঃ)-এর খানকায় অবস্থান করে ইসলাহে নফস বা আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জনে লিপ্ত থাকেন। রমজানের পর হযরত থানভী (রহঃ)-এর পরামর্শ নিয়ে কুরআন হাদীসের উচ্চ জ্ঞানার্জনের লক্ষ্যে মাজাহিরুল উলূম সাহারানপুরে ভর্তি হন। সেখানে তিনি চার বৎসর উর্দূ, ফারসী, বালাগাত ও ফেকাহ্‌শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। এরপর তিনি হযরত থানভী (রহঃ)-এর ইঙ্গিতেই হাদীস, তাফসীর, ফেকাহশাস্ত্রে উচ্চ পর্যায়ের জ্ঞানার্জনের লক্ষ্যে দারুল উলূম দেওবন্দে ভর্তি হন। সেখানেও তিনি ইসলামের বিভিন্ন বিষয়াবলীর উপর চার বৎসরকাল অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে লেখাপড়া শেষে ইসলামী শিক্ষার সর্বোচ্চ ডিগ্রী অর্জন করেন।

সাহারানপুর এবং দেওবন্দে অধ্যয়নকালেও হযরত সদর সাহেব তাযকিয়ায়ে নফ্‌স বা আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে প্রতি বৃহস্পতিবার নিয়মিত হযরত থানভী (রহঃ)-এর দরবারে চলে যেতেন। সাহারানপুর থেকে থানাভবনের দূরত্ব ৩৫ মাইল। আর দেওবন্দ থেকে ১৮ মাইল। এই দীর্ঘপথ পায়ে হেটে নিয়মিত আসা যাওয়ার কল্পনা করলেও গা শিউরে উঠে। কিন্তু তিনি তাই করেছেন। এছাড়া প্রতি বৎসর রমজানের ছুটির সময়টাও খানকাহে ইমদাদিয়াতে তিনি আধ্যাত্মিক সাধনায় কাটাতেন। লেখাপড়া শেষে ইলমে মা'রিফাতের চূড়ান্ত ও শেষ সবক অর্জনের জন্য নিজেকে তরীকতের একজন শ্রেষ্ঠ সাধক হিসেবে গড়ে তুলেন।

মানুষের ইলম ও আমলের পূর্ণ গ্রহণযোগ্যতা তখনই বুঝা যায়, যখন তার প্রভাব পড়ে অন্য লোকের উপর। সূর্যের আলোক রশ্মি যেমন বিশ্ববাসীকে পথ দেখায়, সত্যিকারার্থে একজন বা-আমাল আলেমও বিশ্ববাসীকে সত্যের সন্ধান দিতে সক্ষম। তবে এজন্য প্রধানতম শর্ত হলো-প্রথমে নিজের মধ্যে আধ্যাত্মিকতার উৎকর্ষ অর্জন করা সঠিক ইলম ও আমালের মাধ্যমে। নিজের কালবে যখন আধ্যাত্মিকতার চেরাগ জ্বলতে শুরু করে, তখন সেই চেরাগের আলো অন্যকে উদ্ভাসিত করে তোলে। এই আলো বিচ্ছুরণের মহান কাজ যার দ্বারা সম্পাদন হয়, নিঃসন্দেহে তিনি আল্লাহর একজন মকবুল বান্দা। হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ) কে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইলম ও

www.pathagar.com

আমালের সাথে সাথে আধ্যাত্মিক জগতের শীর্ষ আসন প্রদান করেছিলেন হযরত সদর সাহেব জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ইলমের ক্ষেত্রে যেমন ছিলেন এই শতাব্দী ইমাম গাযালী এবং রাযী তুল্য তেমনি তিনি মা'রিফাত, তরীকত ও আধ্যাত্মিকতার জগতে ছিলেন এই শতাব্দীর হযরত জুনায়েদ বাগদাদী ও শিবলী তুল্য।

মুজাহাদা, রিয়াযাত ও সাধনার মাধ্যমে হযরত সদর সাহেব আধ্যাত্মিকতার এত উঁচু মাকামে অবস্থান করতেন, যে তিনি নিজের হালাত বা অবস্থা মুর্শিদ হযরত থানভী (রহঃ)কে জানাতে লজ্জাবোধ করতেন। কেননা সাধনার মাধ্যমে তিনি তাসাউফের যে উঁচুস্তরে সমাসীন হয়েছিলেন, তা সাধারণ কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। যেহেতু তিনি শায়খের নিকট নিজের উঁচু মাকাম প্রকাশ করেননি, এজন্য তিনি হযরত থানভী (রহঃ)-এর আনুষ্ঠানিক খেলাফত পাননি হযরত সদর সাহেবের অন্যান্য বাংলাদেশী সহকর্মীগণ যাঁরা হযরত থানভী (রহঃ)-এর খেলাফত প্রাপ্ত হয়ে এসেছিলেন, তাঁদের মুখ থেকে বহুবার একথা বলতে শুনেছি, মাওলানা শামছুল হকের রিয়াযাত ও মুজাহাদার আসন আমাদের চেয়ে বহু উর্ধ্বে ছিল। তিনি হযরত থানভী (রহঃ)-এর নিকট যদি নিজের অবস্থা প্রকাশ করতেন, তাহলে আমাদের বহুপূর্বেই খেলাফত পেয়ে যেতেন।

ইলম, আমল ও আধ্যাত্মিকতায় স্বয়ং সম্পূর্ণ হয়ে ১৯২৮ সালে হযরত সদর সাহেব স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। দেশে ফিরে তাঁর উস্তাদ শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী (রহঃ), আধ্যাত্মিক মুর্শিদ হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ)-এর পরামর্শ অনুযায়ী প্রথমে তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরে জামেয়া ইউনুছিয়ার 'সদরুল মুদাররেছীন' হিসেবে যোগদান করেন। এসময় হযরত সদর সাহেবের সাথে ছিলেন হযরত মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্হাব পীরজী হুযুর (রহঃ) ও হযরত মাওলানা মুহাম্মাদুল্লাহ হাফেজ্জী হুযুর (রহঃ) প্রমুখ সুযোগ্য উলামায়ে কেরাম। হযরত সদর সাহেবসহ এই মহামনীষীদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় কয়েক বছরের মধ্যেই মাদরাসাটি দাওরায়ে হাদীস পর্যন্ত উন্নতি লাভ করে।

সদর সাহেবের ইচ্ছা ছিল বাংলার প্রতিটি গ্রামে গ্রামে একটি করে আদর্শ মক্তব এবং বড় বড় শহরগুলোতে কমপক্ষে একটি করে দাওরায়ে হাদীস মাদরাসা খোলা। তিনি তাঁর এই চিন্তাধারা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এক জায়গায় বসে না থেকে বাগেরহাট জেলার গজালিয়া গ্রামে এসে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এই স্থানে কিছুদিন অবস্থানের পর হযরত সদর সাহেব চিন্তা করলেন যে বিপ্লব সৃষ্টির লক্ষ্যে তিনি কাজ করে যাচ্ছেন নিভৃত পল্লীতে বসে তা বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন, মুসলিম জনগোষ্ঠীর প্রাণকেন্দ্রে বসে

www.pathagar.com

কার্যক্রম পরিচালনা করা। তাই তিনি ১৯৩৬ সালে রাজধানী ঢাকার বড় কাটারায় জিঞ্জিরার হাফেয হোসাইন আহমদের সহায়তায় হুসাইনিয়া আশরাফুল উলুম মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এসময় হযরত সদর সাহেব (রহঃ) দেশব্যাপী বিভিন্ন সভা সমাবেশে স্থানীয় জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেন এবং মক্তব ও মাদরাসা প্রতিষ্ঠার আহবান জানিয়ে দেশ ব্যাপী ব্যাপক সাড়া জাগাতে সক্ষম হন। অল্প কিছুদিনের মধ্যে দেশব্যাপী বহু মক্তব-মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। বড় কাটারা মাদরাসা প্রতিষ্ঠার এক বছর পর অর্থাৎ ১৯৩৭ সালে হযরত সদর সাহেব (রহঃ) নিজ গ্রাম গওহারডাঙ্গায় 'দারুল উলূম খাদেমুল ইসলাম' নামে আরও একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন।

সমাজ সংস্কার ও বিপ্লবের যে মহাপরিকল্পনা নিয়ে হযরত সদর সাহেব কার্যক্রম শুরু করেছিলেন তার সফল বাস্তবায়ন ঘটে ১৯৫০ ইং মোতাবেক ১৩৭০ হিজরী সনে। এ সনেই তিনি হযরত মাওলানা যাফর আহমদ উসমানী (রহঃ) এর দুআ এবং হযরত মাওলানা মুহাম্মাদুল্লাহ হাফেজ্জী হুযুর (রহঃ), হযরত মাওলানা মুফতী দ্বীন মোহাম্মদ খান (রহঃ) প্রমুখ সহকর্মীদের নিয়ে লালবাগ শাহী মসজিদকে কেন্দ্র করে প্রতিষ্ঠা করেন উপমহাদেশের অন্যতম ঐতিহাসিক এবং শ্রেষ্ঠ খালেস দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'জামেয়া কোরআনিয়া আরাবিয়া'। হযরত সদর সাহেব (রহঃ) এই প্রতিষ্ঠানটির মাধ্যমে জীবনের লালিত স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের এক ঐতিহাসিক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হন। তাছাড়া তিনি ঢাকার ফরিদাবাদে জামেয়া আরাবিয়া এমদাদুল উলূম, ফরিদপুর শহরে খাবাসপুর শামছুল উলূমসহ আরও অসংখ্য মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। হযরত সদর সাহেব বিভিন্ন মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠার সাথে জড়িত থাকলেও আজীবন লালবাগ জামেয়ার প্রিন্সিপ্যালের দায়িত্ব পালন করেছেন।

কর্মজীবনের অধিকাংশ সময় তিনি লালবাগ জামেয়ায় অতিবাহিত করেছেন। কর্মময় জীবনে হাজারো ব্যস্ততা সত্ত্বেও সময় ও নিয়মানুবর্তিতা হযরতের জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল। গুরুতর অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও তাঁর দৈনন্দিন কাজকর্মে কোন ব্যতিক্রম ঘটত না। জীবন সায়াহ্নে এসে হাঁপানি ও হৃদরোগ তাঁকে মারাত্মকভাবে আক্রমন করে। কিন্তু এই অসুস্থতার মাঝেও কোন সময় তাঁর তাহাজ্জুদের নামায কাযা হয়নি। হযরত সদর সাহেব লালবাগে অবস্থান কালে তাঁর বিধিবদ্ধ নিয়ম ছিল, শেষরাতে তাহাজ্জুদের নামাযের পর পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করা। মসজিদের হাউজের উত্তর পাশের নিচের তলা (বর্তমান যেখানে হাদীসের দরস হয়ে থাকে) হার্ডবোর্ডের পার্টিশন দিয়ে একটি ছোট্ট কুঠুরীতেই সদর সাহেব লালবাগে সারাটি জীবন কাটিয়ে দেন। শেষরাতে তাহাজ্জুদ শেষে নীরব নিস্তব্ধ এই কামরাতে বসে তিনি কোরআন

www.pathagar.com

তেলাওয়াত করতেন। কোরআনকে মাথায় তুলে, বুকে ধরে, চুম্বনকরে আল্লাহর দরবারে কায়মনোবাক্যে দোয়া করতেন, রোনাজারী করতেন। একটি আয়াত বা সূরাকে তিনি বারবার তেলাওয়াত করে তারপর সে আয়াত বা সূরার তাফসীর লিখতেন। সকাল আটটার পর নাশতা শেষে দফতরে গিয়ে তিনি মাদ্‌রাসার যাবতীয় কাজ করতেন। এছাড়া এসময় আগত বিভিন্ন লোকদের সাথে কথা বলতেন। এগারটার পর গোসল সেরে তিনি আরাম করতেন। যোহরের পর খানা শেষে আবার দফতরে যেতেন। এসময় তিনি প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ও জাতীয় সমস্যাদি নিয়ে পরামর্শ ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করতেন। আসরের নামায শেষে তিনি খাস মুরীদ ও বিশেষ বিশেষ ছাত্রদের গুরুত্বপূর্ণ হেদায়াত প্রদান করে মাগরিবের নামায আদায় করতেন। এরপর তিনি নফল নামায ও বিশেষ আমলে লিপ্ত থাকতেন। এশার পর খানা শেষে শুয়ে পড়তেন।

হযরত সদর সাহেব রমযানের প্রথম পনর দিন লালবাগে এবং শেষ ১৫দিন গওহার ডাঙ্গায় অতিবাহিত করতেন। জীবনের শেষ পর্যায়ে তিনি লালবাগে ছাত্রদের দরস না দিলেও আকায়েদ, মানতেক, ফালসাফাসহ কিমিয়ায়ে সাআদাত ও তাসাউফের উচ্চস্তরের কিতাবগুলো খুব সহজবোধ্য ও আছানীর সাথে ছাত্রদের বুঝিয়ে দিতেন। এছাড়া উস্তাদদেরও তিনি সহজ, সরল ও বোধগম্য পদ্ধতিতে পাঠদানের নিয়মনীতি বাতলে দিতেন।

হযরত সদর সাহেব নিজের এবং আলেম সমাজের আত্ম-মর্যাদার ব্যাপারে ছিলেন খুবই সচেতন, সজাগ। কারো সামনে আলেম সমাজের দূর্বলতা প্রকাশ করা বা উলামায়ে কেরামকে মুখাপেক্ষী ও পরমুখী হিসাবে চিহ্নিত করার অপচেষ্টাকে তিনি কঠোরভাবে দমন করতেন। আলেম সমাজ সেরাজাতি, সমাজের নেতৃত্ব প্রদানই হলো তাদের কাজ, তাঁরা মাথা উঁচু করে কাজ করবে এমন চিন্তাধারা তিনি লালন করেছেন এবং নিজের জীবনেও অক্ষরে অক্ষরে তা বাস্তবায়িত করে দেখিয়েছেন। কিন্তু অহংবোধ বা আত্মগর্ব কি জিনিস তা তিনি জানতেন না।

শাসকগোষ্ঠী, রাজনৈতিক নেতা এবং বিত্তশালীদের ভীড় হরহামেশা তাঁর দরবারে লেগে থাকত। কিন্তু তাদের প্রতি অতিরিক্ত মনোযোগ দেয়ার কোন প্রয়োজন তিনি অনুভব করতেন না। বরং অনেককেই দেখা গেছে, তাঁর সাথে দেখা করতে এসে দীর্ঘ সময় অপেক্ষার পর বিফল হয়ে ফিরে যেতে। স্বয়ং মুনয়েম খান যখন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর, তাঁকেও লালবাগ এসে সদর সাহেবের সাথে সাক্ষাতের জন্য দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করে ফিরে যেতে দেখা গেছে।

www.pathagar.com

রাজনীতি ইসলামের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। মুজাহিদে আযম হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ) প্রাজ্ঞ আলেম, আধ্যাত্মিক রাহ্‌বার ও সমাজ সংস্কারক হওয়ার পাশাপাশি একজন সচেতন, বিচক্ষণ ও অভিজ্ঞ রাজনীতিক ছিলেন। দেশের ইসলাম ও স্বাধীনতা রক্ষায় তিনি ছিলেন 'মুজাহিদে আযম'। বিধর্মী খৃষ্টান মিশনারীদের অপতৎপরতা ও সকল অপসংস্কৃতির মুখোশ উন্মোচনে তাঁর ভূমিকা ছিল আপোষহীন সৈনিকের ন্যায়।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা আন্দোলন এবং পাকিস্তানকে ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করার আন্দোলনে তাঁর সংগ্রামী ভূমিকা ইতিহাস হয়ে থাকবে। কেননা পাকিস্তান আন্দোলনের সূচনাকাল কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ এবং মুসলিমলীগের জন্য এক অগ্নি পরীক্ষা ছিল। সকল শীর্ষ স্থানীয় উলামায়ে কেরাম, ন্যাশনালিষ্ট মুসলমান, খোদায়ী খেদমতগারসহ অপরাপর সকল মুসলিম শক্তি তখন কংগ্রেসের নেতৃত্বকে মেনে নিয়েছিল। পরিস্থিতিটা এতই কঠিন ছিল যে, উলামায়ে কেরাম মুসলিম লীগের সাথে কোন ধরণের সম্পর্ক রাখতে পছন্দ করতেন না। এই পরিস্থিতির পরিবর্তনে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সর্ব প্রথম যে ব্যবস্থাটি হয় তা হল, কায়েদে আযমের প্রতি হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ)-এর সমর্থন ঘোষণা।

কায়েদে আযমকে হযরত থানভী (রহঃ)-এর সমর্থন দানের প্রভাব এত শক্তিশালী ও সুদূর প্রসারী ছিল যে, তাঁরপর আর কোন আলেমের সমর্থনের প্রয়োজন ছিল না। তাছাড়া যুগশ্রেষ্ঠ আলেম, দারুল উলূম দেওবন্দের সদরুল মোহতামিম, বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ রাজনীতিক, অনলবর্ষী ও জ্বালাময়ী বক্তা, শায়খুল ইসলাম আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী (রহঃ)-এর ন্যায় একজন পরহেজগার, খোদাভীরু, মহান ব্যক্তিত্ব কায়েদে আযমের দক্ষিণহস্ত হিসাবে মনোনীত হওয়ায় মুসলিমলীগের সৌভাগ্যের দ্বার আরও একধাপ এগিয়ে যায়।

আল্লামা উসমানী (রহঃ) পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে স্বার্থক ও সফল করে তোলার লক্ষ্যে ১৯৪৫ ইং সনের অক্টোবর মাসে সর্ব সাধারণের সমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে তখনকার শীর্ষস্থানীয় উলামায়ে কেরামের সমন্বয়ে গঠন করেন 'জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম'। আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী (রহঃ)-এর নেতৃত্বে গঠিত এই সংগঠনের সদস্যদের মাঝে হযরত মাওলানা যাফর আহমদ উসমানী (রহঃ), হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহঃ), হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ হাসান অমৃতস্মরী (রহঃ), হযরত মাওলানা আতহার আলী (রহঃ), হযরত মাওলানা খায়ের মুহাম্মদ জলন্ধরী (রহঃ), হযরত মাওলানা মুহাম্মদ তাহের কাসেমী (রহঃ)সহ তৎকালীন সকল শীর্ষস্থানীয় উলামায়ে কেরামের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মুজাহিদে আযম হযরত মাওলানা

www.pathagar.com

শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ) প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই এই সংগঠনের অন্যতম নেতা ও সংগঠক ছিলেন। হযরত মাওলানা যাফর আহমদ উসমানী (রহঃ), হযরত মাওলানা আতহার আলী (রহঃ)সহ অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় উলামায়ে কেরামের ন্যায় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে মুজাহিদে আযমের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ও অবদান চির স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তিনি তাঁর উস্তাদ আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী (রহঃ)-এর নির্দেশে এক অনন্য সংগ্রামী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে সারাদেশে সফর করেন। মুসলিমলীগের পক্ষে জোরদার প্রচারণা চালিয়ে মুসলমানদের পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহবান জানান।

কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ সিলেট রেফারেন্ডামে প্রচারণা চালিয়ে পাকিস্তানের পক্ষে জনমত গড়ে তোলার জন্য যখন হযরত মাওলানা যাফর আহমদ উসমানী (রহঃ)-এর কাছে এই বলে দরখাস্ত পেশ করেন যে, আপনি এই মহান দায়িত্ব আঞ্জাম দিন। তখন তিনি কায়েদে আযমের অনুরোধের প্রেক্ষিতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এ দায়িত্ব পালনে সম্মতি জ্ঞাপন করেন। তিনি অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে কংগ্রেসের চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েন। মুজাহিদে আযম হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী(রহঃ), হযরত মাওলানা আতহার আলী (রহঃ), হযরত মাওলানা মুফতী দ্বীন মুহাম্মদ খান (রহঃ) গোটা সিলেট অঞ্চলে এসময়ে এক দীর্ঘ ঝটিকা সফরে নেমে পড়েন। তাঁরা সাধারণ মানুষকে একথা বোঝাতে সক্ষম হন যে, সংখ্যালঘু হিন্দু ইসলামী বিধান জারীর ক্ষেত্রে কোন অন্তরায় নয়। কেননা হিন্দুরা পাকিস্তানকে একটি ইসলামী রাষ্ট্র স্বীকার করেই বসবাস করবে।

যেহেতু ইতিপূর্বেও হাজার বছর অর্ধজাহান মুসলমানদের শাসনাধীন পরিচালিত হয়ে এসেছে। সে সময় সংখ্যালঘুরা ইসলামী শাসন মেনেই শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে বসবাস করেছে। তখন কোন অসুবিধা না হয়ে থাকলে বর্তমান সময়েও কোন অসুবিধা হবে না। উলামায়ে কেরামের এই শক্তিশালী ভূমিকায় রেফারেন্ডামে মুসলিম লীগের অভূতপূর্ব বিজয় সাধিত হয় এবং কংগ্রেসের ভরাডুবি হয়। তাঁদের এ কঠোর পরিশ্রম, ত্যাগ ও সাধনার ফলেই ১৯৪৭ সালে স্বাধীন পাকিস্তান নামক একটি মুসলিম রাষ্ট্রের অস্তিত্ব সম্ভবপর হয়।

উলামায়ে কেরামের এই অগ্রণী ভূমিকার স্বীকৃতি স্বরূপ স্বাধীন পশ্চিম পাকিস্তানে সর্ব প্রথম পতাকা উত্তোলনের দায়িত্ব অর্পিত হয় আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী (রহঃ)-এর উপর এবং পূর্ব পাকিস্তানে সর্ব প্রথম পতাকা উত্তোলনের দায়িত্ব অর্পিত হয় আল্লামা যাফর আহমদ উসমানী (রহঃ)-এর উপর। ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট ঢাকায় আল্লামা যাফর আহমদ উসমানী (রহঃ) পাকিস্তানের পতাকা উত্তোলন করেন এবং তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান বিচারপতির কাছে এসেম্বলী হলে শপথ বাক্য পাঠ করেন। এই শপথ অনুষ্ঠানে উচ্চ পর্যায়ের সরকারী অফিসার ছাড়াও মাওলানা শামছুল হক

www.pathagar.com

ফরিদপুরী (রহঃ), মাওলানা আতহার আলী (রহঃ), মাওলানা মুফতী দ্বীন মুহাম্মদ খান (রহঃ)সহ অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় উলামায়ে কেরাম উপস্থিত ছিলেন।

আল্লামা যাফর আহমদ উসমানী (রহঃ) পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রথম দিনই লালবাগ শাহী মসজিদে জুমুআর খুতবার পূর্বে পাকিস্তান অর্জনের জন্য আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করে এক ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন। পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন আল্লামা উসমানীর এই ভাষনে অভিভূত হয়ে পড়েন। সেদিন আল্লামা উসমানী (রহঃ) তার ভাষণে বলেছিলেন-

"পাকিস্তানের শাসকবর্গের অপরিহার্য দায়িত্ব হবে, সর্বপ্রথম ইসলামী আইন সম্বলিত সংবিধান রচনা করা। সাধারণ মুসলমানদের নামায ও ইসলামী সকল আহকাম যথাযথভাবে পালন করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা। শরাব, পতিতা, সূদ ও ঘুষের মহামারী থেকে পাকিস্তানকে পবিত্র করা। সম্প্রীতি ও সংহতির মাধ্যমে ইসলামী সমাজ গড়ে তোলা। সেনাবাহিনী, পুলিশসহ সকল সামরিক বাহিনীকে নামাযের পাবন্দ হিসেবে গোড়ে তোলা। জাতির সেবা, দেশ ও ইসলামের সুরক্ষায় তাদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। সর্বোপরি, একটি শক্তিশালী সুশৃঙ্খল সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা গড়ে তোলা। কেননা যে সরকারের কাছে শক্তিশালী সামরিক গোয়েন্দা বাহিনী না থাকে, সেই সরকারকে সহজেই কাবু করা সম্ভব হয়।"

মুজাহিদে আযম আল্লামা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ), পাকিস্তান আন্দোলনের সময় আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানীর (রহঃ) এবং সিলেট রেফারেন্ডামের সময় আল্লামা যাফর আহমদ উসমানী (রহঃ)-এর দক্ষিণ হস্ত হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পাকিস্তানে ইসলামী আইন জারী করার জন্য তিনি তাঁদেরই নেতৃত্বে ব্যাপক ও জোরালো তৎপরতা অব্যাহত রাখেন।

১৯৪৮- এর মার্চে যখন গভর্ণর জেনারেল হিসাবে কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ পূর্ব পাকিস্তানে আগমণ করেন, তখন কায়েদে অযমের প্রতিটি সভায় আল্লামা যাফর আহমদ উসমানীর (রহঃ) সাথে মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ) ও মাওলানা আতহার আলী (রহঃ) উপস্থিত থাকতেন। যেহেতু আল্লামা উসমানী কায়েদে আযমের বিশেষ প্রতিনিধি হিসাবে এদেশে আগমণ করেছেন, এ সুবাদেই তাঁর নেতৃত্বে মুজাহিদে আযম আল্লামা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ)সহ এদেশের শীর্ষস্থানীয় উলামায়ে কেরামের প্রতিনিধি দল বেশ কয়েকবার কায়েদে আযমের সাথে একান্ত সাক্ষাৎকারে মিলিত হন। এ সব সাক্ষাৎকারে উলামাদের পক্ষ হতে কায়েদে আযমকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়- "পাকিস্তান অর্জনের পূর্বে আপনি অঙ্গীকার করেছিলেন যে, পাকিস্তানের সংবিধান

www.pathagar.com

রচিত হবে কুরআন সুন্নাহর বিধান অনুযায়ী। আপনি আপনার এই অঙ্গীকা অতি সত্ত্বর বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করুন।" এসময় কায়েদে আযমের উত্ত ছিল-"অনাকাংখিত কিছু অসুবিধার কারণেই কুরআন সুন্নাহর সংবিধান রচনা বিলম্ব হয়ে গেল, এখন যত দ্রুত সম্ভব তা বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেয়া হবে।"

এর কিছু দিনের মধ্যেই কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর ইন্তেকাল হয়ে যায়। তাঁর মৃত্যুর পর পাকিস্তানের শাসকবর্গ বলতে শুরু করলেন- বর্তমান যুগে ইসলামী আইন অচল। শাসকবর্গের এই বিশ্বাস ঘাতকতায় উলামায়ে কেরাম তাদের উপর থেকে আস্থা হারিয়ে ফেলেন এবং এই ঔদ্ধত্য মূলক আচরণের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলার জন্য দেশব্যাপী ঝটিকা সফর শুরু করলেন।

১৯৪৯ ইংরেজী সনের ফেব্রুয়ারী মাসে আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী (রহঃ) পূর্ব পাকিস্তান সফরে আসেন এবং ইসলামী আইন ও সংবিধান রচনার স্বপক্ষে জনমত সৃষ্টি ও প্রবল আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে লাখো জনতার বিশাল সমাবেশে আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী (রহঃ) এর সাথে আল্লামা যাফর আহমদ উসমানী (রহঃ), আল্লামা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ), মাওলানা আতহার আলী (রহঃ), মুফতী দ্বীন মুহাম্মাদ খান (রহঃ) ইসলামী আইন ও সংবিধান রচনার পক্ষে অত্যন্ত জ্বালাময়ী বক্তব্য রাখেন। এসব সমাবেশে দাবী জানানো হয়- "পাকিস্তানের আইন ও সংবিধান হবে ইসলামী। ইসলাম বিরোধী কোন আইন বা সংবিধান এদেশের জনগণ কোন অবস্থাতেই গ্রহণ করবে না।"

এসব মহামনীষীর আবেগঘন ও জ্বালাময়ী ভাষণে পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠার দাবীতে আন্দোলনের দানা বেঁধে উঠে। আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী (রহঃ) পূর্ব পাকিস্তানে আন্দোলনের আগুন ছড়িয়ে দিয়ে যখন করাচী পৌছান তখন কায়েদে মিল্লাত লিয়াকত আলীখান ১৯৪৯ ইংরেজী সনের মার্চে এসেম্বলীতে শাসনতন্ত্রের মূলনীতি হিসাবে কুরআন সুন্নাহর আইনকে স্বীকৃতি দিয়ে প্রস্তাব পাশ করিয়ে নেন। আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী (রহঃ) এই প্রস্তাব পাশ হওয়ার পর পূর্ব পাকিস্তানের উলামায়ে কেরামের সীমাহীন ত্যাগ ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা স্মরণ করে পত্রের মাধ্যমে তাঁদের অশেষ শুকরিয়া আদায় করেন।

এর কয়েক মাস পর ১৩ ডিসেম্বর আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী (রহঃ) ইন্তেকাল করেন। তাঁর ইন্তেকালের পর কিছু সময়ের জন্য আন্দোলন ঝিমিয়ে পড়লেও ১৯৫১ সালে সেই আন্দোলন আবার দুর্বার হয়ে উঠে। কুরআন সুন্নাহর সংবিধান রচনার প্রস্তাব এসেম্বলীতে পাশ হলেও শাসকগোষ্ঠী উলামায়ে

www.pathagar.com

কেরামকে দোষারোপ করে বলতে শুরু করল যে, ইসলামী শাসনতন্ত্রের মূলনীতি সকল উলামায়ে কেরামের ঐকমত্যের ভিত্তিতে আমাদের কাছে পেশ করা না হলে, আমরা ইসলামী সংবিধান রচনা করতে পারব না। ঠিক এসময় উলামায়ে কেরামের এক বৈঠক আহবান করা হয় করাচীতে।হযরত মাওলানা এহতেশামুল হক থানভী (রহঃ) এর বাসভবনে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় উলামায়ে কেরামের এই সম্মেলনে অন্যান্যের মাঝে হযরত মাওলানা যফর আহমদ উসমানী (রহঃ), হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ)সহ উভয় পাকিস্তনের শীর্যস্থানীয় ও শ্রেষ্ঠ উলামায়ে কেরাম উপস্থিত থেকে ইসলামী রাষ্ট্রের ঐতিহাসিক ২২দফা শাসনতান্ত্রিক মূলনীতি প্রণয়ন করেন। এ দিন সকল ফের্কা ও দলের উলামায়ে কেরামের এই সম্মেলনে ঐকমত্যের ভিত্তিতে ইসলামী রাষ্ট্রের এই ঐতিহাসিক ২২দফা মূলীতি প্রণয়নে আল্লামা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ) যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে ছিলেন, আজ পর্যন্ত তা ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ রয়েছে। এই ২২দফা মূলনীতি প্রণয়নের পর শাসকগোষ্ঠী নানা অজুহাত দেখিয়ে আবারও সময় ক্ষেপন করতে থাকে। এক পর্যায়ে উলামায়ে কেরামের চাপের মুখে ১৯৫৬ সনে পার্লামেন্টারী সভায় ইসলামী শাসনতন্ত্রের ২২দফা মূলীতির এই খসড়াটি বিপুল ভোটে পাশ করা হয়। কিন্তু কতিপয় নেতার চক্রান্তের ফলে তা আর বাস্তবায়িত হতে পারেনি।

এরপর আতাউর রহমান খান পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হয়ে একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। এই কমিশনে মাদরাসা শিক্ষাকে অপ্রয়োজনীয় আখ্যা দিয়ে এই শিক্ষা ব্যবস্থাকে বাদ দেয়ার প্রস্তাব করলে হযরত ছদর সাহেব সিংহের ন্যায় এর বিরুদ্ধে গর্জে উঠেন। তিনি দেশ ব্যাপী এর বিরুদ্ধে দুর্বার প্রতিরোধ গড়ে তুললে সরকার এই কমিশন বাতিল ঘোষণা করতে বাধ্য হয়। ১৯৫৮ সনে আইয়ুব খান সামরিক শাসন জারির মাধ্যমে ক্ষমতাসীন হলে তার স্বেচ্ছাশাসনের বিরুদ্ধে কথা বলার সাহস কারো ছিল না। আইয়ুব খান এই সুযোগে কিছু অসৎ লোকের পরামর্শে একের পর এক ইসলাম বিরোধী কার্যক্রম চালিয়ে যেতে থাকে। সদর সাহেব ইসলাম বিরোধী কার্যক্রমের বিরুদ্ধে কড়া প্রতিবাদ অব্যাহত রাখেন। ১৯৬১ সনে মুসলিম পারিবারিক আইন নামে ইসলাম বিরোধী আইন জারি করার অপ-তৎপরতার বিরুদ্ধে ছদর সাহেব তুমুল আন্দোলন গড়ে তোলেন, তাঁর এই আন্দোলনের ফলে আইয়ুবশাহী সাময়িকভাবে এই আইন মুলতবী করতে বাধ্য হয়।

হযরত ছদর সাহেব খৃষ্টান মিশনারীদের অপ-তৎপরতা বন্ধের লক্ষ্যে সারাদেশে সভা সমাবেশ অব্যাহত রাখেন। মিশনারীদের অপতৎপরতার বিরুদ্ধে 'আঞ্জুমানে তাবলীগুল কুরআন' (কুরআন প্রচার সমিতি) নামে একটি সংগঠন

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠা এবং 'পাদ্রীদের গোমর ফাঁক' নামক বইসহ বিভিন্ন প্রচার পত্র প্রকাশ করে এদের ষড়যন্ত্র থেকে মুসলমানদের সতর্ক করে দেন এবং গ্রামে-গঞ্জে কুরআন শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেন। এছাড়া রমজান ও ঈদের চাঁদ সম্পর্কে সরকারী হেলাল কমিটির সিদ্ধান্তকে অনেক ক্ষেত্রেই তিনি ইসলাম বিরোধী আখ্যা দিয়ে জনগণকে এই সিদ্ধান্ত পালন না করার আহবান জানান। জনগণও সরকারী সিদ্ধান্ত না মেনে হযরত ছদর সাহেবের সিদ্ধান্তকে ইসলাম সম্মত বিবেচনা করে সে অনুযায়ী রমজানের রোযা ও ঈদের জামায়াত আদায় করেন।

এ ছাড়াও হযরত ছদর সাহেব (রহঃ) সরাসরি আইয়ুবের সামনে তার ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপের নির্দ্বিধায় সমালোচনা ও কঠোর ভাষায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ করতে কুণ্ঠিত হননি। জালেমের সামনে সত্য প্রকাশের এত দূর্দান্ত সাহসী ভূমিকা ইতিহাসে তালাশ করলে খুব কমই পাওয়া যাবে। এ জন্যই তো তাঁর উপাধি হয়েছিল 'মুজাহিদে আযম'।

হযরত ছদর সাহেব ইসলামী শিক্ষার প্রসার, জাতির আধ্যাত্মিক ও ইসলাহী সংশোধন ও রাজনৈতিক সংগ্রামের সাথে সাথে সমাজ সেবা ও সমাজ সংস্কারমূলক কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে 'খাদেমুল ইসলাম জামাআত' নামে একটি সামাজিক সংগঠনও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। যার কাজ অদ্যাবধি চালু রয়েছে। এই মহান ব্যক্তিত্ব বেশ কয়েকবার হজ্বব্রত পালন করেছেন।

হযরত ছদর সাহেব শিক্ষা, ইসলাহ, সমাজ সেবা ও রাজনৈতিক সংগ্রামের পাশাপাশি প্রতিটি মুসলমানের ঘরে ঘরে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেয়া, তাদের মাঝে ঈমানী জয্‌বা সৃষ্টি এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য ইসলামের সঠিক শিক্ষা, পথ ও পন্থা রেখে যাওয়ার অস্থিরতা নিয়ে তাদের জন্য বেশ কিছু মূল্যবান গ্রন্থ রচনা এবং স্বীয় মুর্শিদ হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ) এর সর্বজন স্বীকৃত ও গ্রহণযোগ্য গ্রন্থ, যার দ্বারা উপমহাদেশের অসংখ্য মুসলমান পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে অসংখ্য সমস্যার সমাধান মিটাতে সক্ষম হয়েছে এবং হচ্ছে, সেই মহা-মূল্যবান গ্রন্থ 'বেহেশতী জেওর'-এর সহজ সরল বাংলা অনুবাদ করে বাঙ্গালী মুসলমানদের জন্য এক অসামান্য খেদমত করেন। তিনি হযরত থানভী (রহঃ) এর আরও অসংখ্য মূল্যবান গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ করেন। স্বরচিত ও অনূদিত তাঁর বইয়ের সংখ্যা প্রায় দুইশতের কাছাকাছি।

তাঁর জীবনের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ও অমূল্য কর্ম হল, পবিত্র কুরআনের তাফসীর। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত কঠিন রোগে আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাঁর এই তাফসীরের রচনার কার্যক্রম একদিনের জন্য স্থগিত রাখেননি। 'হক্কানী

www.pathagar.com

তাফসীর' নামে পবিত্র কুরআনের এই অমূল্য তাফসীরখানা শেষ করতে না পারলেও পনেরো পারার মত তিনি সমাপ্ত করে গেছেন। আমপারা, সুরায়ে ফাতেহাসহ পৃথক পৃথক করে কয়েকটি খন্ড প্রকাশ পেলেও তাঁর লেখা তাফসীরের পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ আজও প্রকাশিত না হওয়ায় বাংলা ভাষাভাষী মুসলমানরা এক অমূল্য সম্পদ থেকে বঞ্চিত রয়ে গেছে। হযরত ছদর সাহেবের স্বরচিত ও অনূদিত প্রসিদ্ধ ও মূল্যবান কয়েকখানা গ্রন্থের নাম তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হল- *বেহেশতী জেওর *ফুরুউল ঈমান *হায়াতুল মুছলেমীন *কাছদুছ ছাবিল *মোনাজাতে মকবূল *তা'লীমুদ্দীন *ভুল সংশোধন *এলেমের ফযীলত *নামাযের ফযিলত *যিকিরের ফযিলত *রোযার ফযিলত *তেজারতের ফযিলত *নামাযের অর্থ *বায়আত নামা *তাওবানামা প্রভৃতি গ্রন্থ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মুসলিম উম্মাহর এই ত্যাগী, সংগ্রামী শিক্ষানুরাগী, সংস্কারক, সাধক, বিপ্লবী মহাপুরুষ মুজাহিদে আযম আল্লামা শামছুল হক ফরিদপুরী ছদর সাহেব হুযূর (রহঃ) ইংরেজী ১৯৬৯ সালের ২১শে জানুয়ারী, বাংলা ১৩৭৫ সালের ৭ই মাঘ, হিজরী ১৩৮৮ সালের ৬ই জিলক্বদ মঙ্গলবার বেলা আড়াইটায় অগণিত আত্মীয়-স্বজন, ছাত্র-শিষ্য, ভক্ত- অনুরাগীকে শোকের সাগরে ভাসিয়ে গোপালগঞ্জের গওহারডাঙ্গায় ইন্তেকাল করেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

হযরত ছদর সাহেব (রহঃ) আমাকে স্নেহ করতেন, আদর করতেন, মায়া-মমতার বন্ধনে জড়িয়ে রাখতেন। নিজের ছেলের চেয়ে অধিক ভালবাসতেন। তাঁর সুদৃষ্টি আমাকে এগিয়ে যেতে সাহস জুগিয়েছে। সব সময় তিনি আমাকে চোখে চোখে রাখতেন। আমি তাঁর দৃষ্টির আড়াল হলেই তিনি আমার খোঁজ নিতেন, খবর নিতেন। আমিও হযরত ছদর সাহেবকে কিছুক্ষণ না দেখলে স্বস্তি পেতাম না, শান্তি পেতাম না। মাদরাসা ছুটি হলেও তিনি আমাকে বাড়ী যেতে দিতেন না। এমনকি একবার আমার দাদার ইন্তেকালের সংবাদ আসলে আমি অস্থির হয়ে বাড়ী যাওয়ার জন্য হযরত ছদর সাহেবের কাছে দরখাস্ত করি। ছদর সাহেব (রহঃ) এ সময় গওহারডাঙ্গা যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। আমারও তাঁর সাথে গওহারডাঙ্গা যেতে হবে এমন সিদ্ধান্ত পূর্ব হতেই ছিল। কিন্তু আমার অস্থিরতা দেখে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন- ফজলু! বাড়ী গিয়ে কি তুমি তোমার দাদার জানাযায় শরীক হতে পারবে?

তখন যাতায়াতের অবস্থা ছিল খুবই খারাপ। কোনক্রমেই দাদার জানাযায় শরীক হওয়া যাবে না, একথা আমি ভাল করেই জানতাম। তাই আমি উত্তরে বললাম, না। তখন ছদর সাহেব হুযূর বললেন, জানাযায় যখন শরীক হওয়া যাবে না, তবে গিয়ে লাভ কি? বরং এখান থেকেই তাঁর জন্য দুআ' করতে থাক।

www.pathagar.com

যা তোমার দাদার কাজে আসবে। এখন তুমিই চিন্তা কর, বাড়ী যাবে, না আমার সাথে গওহারডাঙ্গায় যাবে? আমি বললাম, হুযূর! আপনার সাথেই যাব। যা হোক ছদর সাহেবের সাথে আমার সম্পর্ক এতই গভীর ছিল যে, তিনি যখন গওহারডাঙ্গায় চলে যেতেন তখন আমাকেও তাঁর সাথে নিয়ে যেতেন। সার্বক্ষণিক তাঁর সাথে সাথে রাখার অর্থ এই নয় যে, তিনি আমার দ্বারা তাঁর ব্যক্তিগত কাজ করাতেন। বরং মানুষ গড়ার স্বার্থে প্রয়োজনে কোন কোন সময় আমাকে তাঁর থেকে দূরেও সরিয়ে রেখেছেন। লালবাগের লেখাপড়া শেষ হলে তিনি আমাকে হযরত আল্লামা ইউসুফ বিননূরী (রহঃ) এর কাছে বুখারী শরীফ পড়ার জন্য পাকিস্তানে পাঠিয়ে দেন। যে কারণে হযরতের ইন্তেকালের সময় তাঁর পাশে থাকার সৌভাগ্য এই অধমের হয়নি।

আল্লামা ইউসুফ বিননূরী (রহঃ) হযরত ছদর সাহেবকে যে কত উচুঁস্তরের মানুষ মনে করতেন, তা তাঁর একটি মন্তব্য থেকেই সহজে অনুমান করা যায়। তিনি বলেন– "পূর্ব পাকিস্তানের শীর্যস্থানীয় ও শ্রেষ্ঠ আলেমদের মাঝে জামেয়া কোরআনিয়া আরাবিয়া লালবাগ ঢাকার প্রতিষ্ঠাতা, আলেমে রব্বানী, শায়খুল হাদীস মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ) ছিলেন একজন বড় মুখলিছ, নিষ্ঠাবান মানুষ। সত্য ভাষণে তিনি ছিলেন অকুতোভয়, নির্ভীক! সত্য ঘোষণায় কারো তিরষ্কার বা চোখ রাঙানীর পরোয়া তিনি করতেন না কখনও। সিদ্ধান্তে স্থিরতা, দৃঢ়তা, যুগোপযোগী চিন্তা-চেতনা এবং সত্য প্রকাশে এক ও অদ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন। দারুল উলূম দেওবন্দের ফারেগ এবং তায্‌কিয়ায়ে নফ্‌স ও আধ্যাত্মিকতার মূলকেন্দ্র থানা ভবন থেকে ইলমে মা'রিফাতের উচুঁ মাকাম অর্জন করে ছিলেন। খুবই তীক্ষ্মবুদ্ধিসম্পন্ন, সুচিন্তাশীল ও সুশৃংখল কর্ম ব্যবস্থাপক ছিলেন। অধিকাংশ সময় অসুস্থতার মাঝে থাকলেও ইসলামের খেদমতে সর্বক্ষণ নিজেকে নিয়োজিত রাখতেন। তাঁর সাহস মনোবল ও কর্মপন্থায় কোনদিন কমতি দেখা যায়নি।"

===০০০===

www.pathagar.com

আকাশের মত উদার
সাগরের মত গভীর সেই মহামানব

আবদুল্লাহ্ বিন সাঈদ জালালাবাদী আল-আযহারী

হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ) তাঁর সমসাময়িক হাজার হাজার আলেমের মধ্যে যে অনন্য বৈশিষ্ট্যের জন্যে আমার মত তাঁর হাজার হাজার ভক্তের কাছে স্মরণীয় হয়ে আছেন ও চিরদিন থাকবেন, তা হচ্ছে তাঁর আকাশের মত উদার মন এবং তাঁর ব্যক্তিত্বের সাগরের মত গভীরতা। সুবিশাল আকাশ যেমন ছোট-বড়, উচ্চ-নীচ, পুণ্যবান ও পাপীতাপী সকলকেই তাঁর চাঁদোয়াতলে স্থান দিতে একটুও কার্পণ্য করে না। সাগর যেমন সকলের সকল আবিলতা ধুয়ে দিতে কোনও দ্বিধা করে না, তিনিও তেমনি কাছের দূরের সকলকে তাঁর বিশাল বুকে টেনে নিতেন। গোটা উম্মতকে একান্ত আপন বলে ভাবতেন আর অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে সকলের মঙ্গল কামনা করতেন। তাঁর এখলাসে আন্তরিকতায় কোন খাদ ছিল না। তাই তিনি ছিলেন সকলের বরণীয় 'সদর সাহেব'। তাঁর সুদীর্ঘকালের সহকর্মী (প্রথম জীবনের শাগরেদও বটে) বড় কাটারা আশরাফুল উলুম মাদ্রাসার সাবেক মুহতামিম মাওলানা মুহাম্মদ আলী মরহুমের ভাষায় ঃ "আমাদের তিন বুযুর্গের বুযুর্গী তিন দিক থেকে ছিল প্রশ্নাতীত ও সর্বজন স্বীকৃত ঃ

(১) এখলাসে- সদর সাহেব হুযুর (রহঃ),

(২) যিকিরে- হাফেজ্জী হুযুর (রহঃ) এবং

(৩) মোয়ামালাতে-পীরজী হুযুর।[১]

সৌভাগ্যক্রমে আমার নিজেরও উক্ত তিন বুযুর্গের স্নেহবাৎসল্য লাভের সুযোগ ও সৌভাগ্য হয়েছিল। মাওলানা মুহাম্মদ আলী মরহুমের এ কথাগুলোতে যে একটুও অতিশয়োক্তি ছিল না আমরা নিজেরাও তা প্রত্যক্ষ করেছি। উক্ত তিন বুযুর্গ ছিলেন সমবয়সী ও সহপাঠী। ভারতের দেওবন্দ মাদ্রাসা থেকে পাশ করে আসার পর তিন বন্ধু আজীবন একত্রে দ্বীনের খেদমতে কাজ করে যাবেন বলে

---

১ টিকা- মরহুম তাঁর কর্মস্থল বড়কাটারা মাদ্রাসায় তাঁর কামরায় বসিয়ে আমাকে আপ্যায়নকালে তাঁর ইন্তেকালের ২/৩ বছর পূর্বে কথাগুলো আমার প্রতি লক্ষ্য করে বলেছিলেন। আমি তাঁকে আমাদের বুযুর্গানের কিছু কথা শোনাবার অনুরোধ করেছিলাম। -লেখক

www.pathagar.com

অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছিলেন বলে স্বয়ং হাফেজ্জী হুযুরের মুখেই বহুবার শুনেছিলাম। প্রথমে তাঁরা তিনজনই ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মাওলানা তাজুল ইসলাম (রহঃ)-এর মাদ্রাসা 'জামেয়া ইউনুসিয়ায়' শিক্ষকরূপে তাঁদের কর্মজীবন শুরু করেন। তারপর তিনজনে একত্রে পরামর্শ করে ১৯৩৬ সালে ঢাকায় এসে জিঞ্জিরার দানবীর হাজী মুহাম্মদ হোসেনের আর্থিক সাহায্য নিয়ে মোগল আমলের বিখ্যাত বড় কাটারা দূর্গ- তখন যা একান্তই অনাদরে পরিত্যক্তভাবে পড়ে রয়েছিল সরকারের নিকট থেকে কিনে নিয়ে* 'আশরাফুল উলুম মাদ্রাসা' স্থাপন করেন। তাঁরা নিজেরা দৈহিক পরিশ্রম দিয়ে প্রায় তিনশ বছরের জমে থাকা কবুতরের বিষ্ঠা প্রভৃতি আবর্জনা পরিষ্কার করে মাদ্রাসার কাজ শুরু করেন।

পীরজী মাওলানা আবদুল ওয়াহহাব সাহেব (রহঃ) আজীবন এ মাদ্রাসার মুহতামিম ছিলেন। পরবর্তীতে ইং ১৯৫০/'৫১ সালের দিকে ছদর সাহেব ও হাফেজ্জী হুযুর (রহঃ) মোগল আমলের অপর ঐতিহাসিক দূর্গ লালবাগ কেল্লা সন্নিহিত লালবাগ মসজিদে লালবাগ 'জামেয়া কুরআনিয়া' মাদ্রাসার গোড়াপত্তন করেন। হাফেজ্জী হুযুর ছিলেন এ মসজিদের আজীবন ইমাম ও খতীব এবং সদর সাহেব মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ) এ মাদ্রাসার আজীবন প্রিন্সিপ্যাল। কওমী মাদ্রাসা সমূহে সাধারণতঃ প্রধান পরিচালক মুহতামিম রূপে অভিহিত হন। গোটা বাংলাদেশে বা তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে তথা গোটা পাকিস্তানে সম্ভবতঃ তিনিই সর্বপ্রথম প্রিন্সিপাল বলে আখ্যায়িত হন এবং স্বীকৃতি লাভ করেন। মাওলানা মুহাম্মদ আলী মরহুমও জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত উক্ত তিন বুযুর্গের শাগরেদ এবং বড়কাটারা মাদ্রাসায় তাঁদের উত্তরসূরি মুহতামিম পদে অধিষ্ঠিত হন। তাই তাঁর উক্ত মূল্যায়নের গুরুত্ব রয়েছে।

১৯৫৫ সালে সিলেট সরকারী আলিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হওয়ার পর থেকেই আমি মাদ্রাসার কমনরুমে সর্বপ্রথম দৈনিক পত্রিকা পড়া শুরু করি। তখন মাওলানা আকরম খাঁর দৈনিক আজাদ ছিল দেশের সর্বাধিক প্রচারিত সংবাদপত্র। সাথে সাথে সিলেট আলিয়া মাদ্রাসার লাইব্রেরী, কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদ ও আঞ্জুমানে তরক্কীয়ে উর্দূ (বর্তমান নাম জাতীয় শিক্ষা সংস্থা) লাইব্রেরীতে সদস্য হয়ে যথারীতি পুস্তকাদি পাঠ শুরু করি। মাওলানা আশরাফ আলী (রহঃ) এর শিষ্যরূপে মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ) সাহেবের নামের সাথে ঐ সময়ই আমার পরিচয় ঘটে। বিশেষতঃ মাওলানা আশরাফ আলী

---

* **টিকা-** যতদূর মনে পড়ে, ঐ সস্তার যুগেই- যখন মুদ্রার মান বর্তমানের তুলনায় শতাধিকগুণ বেশী ছিল, হাজী সাহেব ৯০,০০০.০০ টাকা দিয়ে দূর্গটি কিনে মাদ্রাসার জন্য ওয়াক্‌ফ করে দিয়েছিলেন। আল্লাহ তাঁর কবরকে আলোকিত করুন। - লেখক

www.pathagar.com

থানভী (রহঃ) এর বিখ্যাত বেহেশতী জেওর এবং বোখারী শরীফের অনুবাদক হিসেবে তাঁর নাম বেশ গুরুত্ব সহকারে তখনকার দিনে দেশ ব্যাপী উচ্চারিত হতো। এ ছাড়া তখন বড়কাটারা মাদ্রাসা থেকে প্রকাশিত হযরত থানভী (রহঃ) এর ওয়াজ সম্বলিত মাসিক নেয়ামতের তিনি ছিলেন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও মুরব্বী। আমার চাচা সর্ব প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট সিলেট জজকোর্টে পাকিস্তানের পতাকা উত্তোলনকারী উত্তর সিলেট জেলা মুসলিম লীগের সভাপতি মাওলানা মরহুম আব্দুর রশীদ (রহঃ) মাওলানা থানভীর হাতেই বায়আত ছিলেন। তাই মাওলানা থানভীর মুরীদরূপে মাওলানা শামছুল হক সাহেবের প্রতি একটি মমত্ববোধ বা তাঁকে অনেকটা কাছের একজন মনে করা আমাদের পরিবারের পক্ষে অনেকটা স্বাভাবিক ছিল। সুদূর সিলেট থেকে কেন যেন মনে হত মাওলানা শামছুল হক ফরীদপুরী (রহঃ)-এর একটা দুর্ণিবার আকর্ষণ অন্তরে অনুভব করছি। কিন্তু সত্য কথা বলতে কী, আলিয়া মাদ্রাসার একজন ছাত্র হিসেবে কোলকাতা আলিয়া মাদ্রাসার এক কালের কৃতি ছাত্র মুসলিম সাংবাদিকতার জনক দৈনিক আজাদের প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক মাওলানা আকরম খাঁর প্রতি তখন আমার আকর্ষণ ছিল প্রবলতর। বিশেষতঃ দৈনিক আজাদ ও মাসিক মোহাম্মাদীর একজন রীতিমত পাঠক হিসেবে তাঁর ভক্ত না হয়ে উপায়ও ছিল না। ১৯৫৮ সাল থেকে আমি যখন পত্র পত্রিকায় লেখালেখির জগতে প্রবেশ করি তখন এ আকর্ষণ আরো বেশী করে অনুভব করি। শেষ পর্যন্ত ১৯৬২ সালে তিনটি লক্ষ্যকে সামনে রেখে আমি সিলেট থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে পা বাড়াই।

১. মাওলানা ইসলামাবাদী ও মাওলানা আকরম খাঁ প্রমুখ কর্তৃক বহুল উচ্চারিত ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয়কে বাস্তবায়িত করে যুগ যুগ ধরে উপেক্ষিত মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন ও জাতীয় পর্যায়ে এর সামগ্রিক স্বীকৃতি আদায়ের উদ্দেশ্যে নতুন করে ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় আন্দোলনের সূচনা করা।

২. মাওলানা আকরম খাঁ ও মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ)সহ খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব সমূহের সান্নিধ্য লাভ।

৩. সম্ভব হলে সমমনাদের সাহায্য সহানুভূতি নিয়ে একটি ইসলামী পত্রিকা ও প্রকাশনা সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা।

উক্ত তৃতীয় লক্ষ্যটি পুরোপুরি অর্জিত না হলেও আমার প্রথম দু'টি লক্ষ্য আল্লাহর মেহেরবানীতে অর্জিত হয়েছে এবং এ ব্যাপারে উক্ত দু' জন মনীষীর প্রচুর অবদানও রয়েছে যা আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। অবশ্য ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করে আমাদের আন্দোলনের

www.pathagar.com

ফসল চক্রান্ত করে নষ্ট করে দেয়া হয়েছে দেখে খুব দুঃখ পাই। আমার বিশ্বাস, উক্ত দু'জন মনীষী আজ বেঁচে থাকলে এটা দেখে তাঁরাও দুঃখিতই হতেন।

'৬২ সালে ঢাকায় এসে আমি বখশীবাজারস্থ আলিয়া মাদ্রাসার খুব নিকটবর্তী ঢাকেশ্বরী রোডের আজাদ অফিসে গিয়ে মাওলানা আকরম খাঁ সাহেবের সাথে সাক্ষাত করি এবং পরিচিত হই। মাওলানা সাহেব ৫০/৬০ বৎসর আগে এই মাদ্রাসার ছাত্র ছিলেন। আমরা তাঁরই সেই মাদার ইনষ্টিটিউশনের নতুন প্রজন্ম। তাই তাঁর প্রতি আমাদের যে একটা দাবী ছিল তা তাঁরও অস্বীকার করার উপায় ছিল না। আবার আমি তাঁর পত্রিকা দৈনিক আজাদ ও মাসিক মোহাম্মাদীতে লেখালেখি করি। এজন্য আমার প্রতি তাঁর স্নেহ বাৎসল্য একটু বেশীই ছিল।

এ পর্যায়ে আলিয়া মাদ্রাসা সম্পর্কে 'বেহেশতি জেওর'এর অনুবাদে মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ) এর একটা মন্তব্য 'ধর্মের বড় কাঁটা' নিয়ে দৈনিক আজাদে খুব লেখালেখি হচ্ছিল। আমি নিজেও একটি প্রতিবাদমূলক পত্র আজাদে পত্রস্থ করতে দিয়েছিলাম। আমার বক্তব্যে আমি মূল বেহেশতী জেওরে হযরত থানভী (রহঃ) যা বলেননি তাঁরই কিতাবের অনুবাদরূপে একথাটি সংযোজন করা ঠিক হয়নি বলে মন্তব্য দিয়েছিলাম। পত্রটি ছাপা হওয়ার আগে একদিন বিকালে প্রতিদিনের মত আজাদ অফিসে তাঁর সাথে দেখা করতে গেলে এসময় সাদা পাঞ্জাবী পরিহিত মৌলবী গোছের একজন লোক এসে তাঁর কাছে উপস্থিত হলেন। মাওলানা আকরম খাঁ আমাকে লক্ষ্য করে বললেনঃ ঐ লোকটিকে তুমি চিন নাকি হে? আমি আমতা আমতা করে বললামঃ আমি তাঁকে চিনতে পারছি না। বললেন, ও-ই তো তোমার আসামী। এমদাদীয়া লাইব্রেরীর মালিক এবং বেহেশতী জেওরের প্রকাশক। মৌলবী আবদুল করীম মরহুমের কাছে তিনি আমার পরিচয়ও ব্যক্ত করলেন। মৌলবী সাহেব অত্যন্ত কাঁচুমাচু করে বললেনঃ হুযুর, ঐ আপত্তিকর মন্তব্যটা বাদ দিয়েই আমরা পুস্তক প্রকাশ করব। আপাততঃ বিক্রি বন্ধ রেখেছি। দয়া করে আর এ ব্যাপারে কোন লেখা আজাদে ছেপে আমাদের পেটে লাথি মারবেন না। মাওলানা আকরম খাঁ আমাকে লক্ষ্য করে বললেনঃ তুমি কি বল হে? এবার তোমার পত্রখানির কি হবে? আমি বললাম, বেচারা মৌলবী সাহেব যখন ওয়াদা করছেন যে, সংশোধন করা ছাড়া আর এ পুস্তক বাজারে ছাড়বেন না, তখন আমার আর কি বলার থাকতে পারে! আপনি যা ভাল মনে করেন-----। শেষ পর্যন্ত আমার সে পত্রটি আর ছাপা হল না।

এর কিছুদিন পরেই লালবাগ মাদ্রাসার দু'জন ছাত্র মাওলানা শামছুল হক সাহেবের পক্ষ থেকে পয়গাম নিয়ে আমার সাথে সাক্ষাত করতে এল। এর

www.pathagar.com

একজন ছিলেন হাফিজ আহমদ হোসেন বানিয়াচঙ্গী। অপরজনের কথা এখন মনে নেই। মাওলানা ফরিদপুরী সাহেব আমাকে চিনেন, আমাকে তলবও করেছেন দেখার জন্য, কথাটি ভাবতেই আমার গায়ে রোমাঞ্চ অনুভূত হল। সাথে সাথে একটা অজানা দুরু দুরু সংশয়ও। মৌলবী আবদুল করীম সাহেব গিয়ে আমার বিরুদ্ধে কিছু লাগাননি তো? তিনি আমাকে এজন্য ভর্ৎসনা করবেন না তো?

শেষ পর্যন্ত আমি তালেবে-এলেম দু'জনের সাথে মহাপুরুষের দরবারে গিয়ে উপস্থিত হলাম। কী শান্ত সম্মোহনী চেহারা! দেখলেই একজন অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্ব বলে মনে হয়। আমার মনের মণিকোঠায় তাঁর একটি উঁচুস্থান তো ছিলই।

অনেকটা বিস্ময়ের সুরে তিনি আমাকে বললেনঃ আপনিই আবদুল্লাহ্ বিন সাঈদ জালালাবাদী? আপনিই এ নামে লিখেন দৈনিক আজাদ, মাসিক মোহাম্মাদী, মাসিক মদীনা, সাপ্তাহিক জাহানে নও প্রভৃতি কাগজে? তিনি আমার কিছু কিছু রচনার শিরোনামও বললেন। বিশেষতঃ দৈনিক আজাদে সর্বশেষ প্রকাশিত "আরব বিশ্বে পাকিস্তানী প্রচার ব্যবস্থা" শীর্ষক একটি পত্রের কথা তিনি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করে বললেনঃ এ পত্রে তো আপনি অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে উল্লেখ করে একটি খাঁটি কথা বলেছেন যে, ভারত যেখানে নদভী আলেমদেরকে কাজে লাগিয়ে তাদের আরব বিশ্বের দূতাবাস সমূহের কার্যক্রম অত্যন্ত কার্যকরী ও তাৎপর্যবহ করে রেখেছে, সেখানে পাকিস্তান তার দূতাবাসসমূহে পাঠায় আরবী ভাষা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ উটকো চরিত্রের লোকজনকে। তারপর তিনি বললেনঃ এতদিন ভাবতাম, আবদুল্লাহ্ বিন সাঈদ জালালাবাদী আমারই মত সিলেটের এক বুড়ো শামছুল হক। এ যে একেবারেই নওজোয়ান এবং ছাত্র মানুষ তা তো আপনার ঐ পাকা হাতের লেখা দেখে বোঝার জো নেই! আপনি আমাকে তাজ্জব করলেন হে নওজোয়ান মাওলানা! কথাগুলো যে তিনি অন্তর থেকেই বললেন তা বুঝতে আমাকে মোটেই বেগ পেতে হয়নি।

তিনি বললেনঃ আমাদের তো সময় শেষ হয়ে এলো, আল্লাহ আপনার হায়াত দারাজ করুন! আমাদের পতাকা আপনারা নওজোয়ানেরা বয়ে নিয়ে যান! সাথে সাথে বললেনঃ আমকে একটা কথা দিতে পারেন? সকল বাধা বিপত্তি অগ্রাহ্য করে জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত এ কাজটি চালিয়ে যাবেন- কোন ভয়ভীতি বা রক্তচক্ষু দেখে একাজ থেকে পিছপা হবেন না? আমি বললাম, ইনশা আল্লাহ, এ পথে আপনাদের পিছনে আছি এবং আজীবন থাকব। তিনি আমার জবাব শুনে খুব খুশী হলেন। এরপর তিনি তাঁর মনের গভীর ক্ষতের কথা

www.pathagar.com

বললেনঃ আরো দু' জন লোককে আমি বড্ড বিশ্বাস করেছিলাম। তাদের প্রতি আমার বড় আশা ছিল কিন্তু তারা আমাকে নিরাশ করেছে। বলে তিনি দু' জন আলেমের নাম বললেন। এরা দু'জনই দু'টি মাসিক পত্রিকার সম্পাদকরূপে পরিচিত ছিলেন। শেষোক্ত জন পূর্বোক্ত জনের তুলনায় একটু কম বয়সের। তাঁর কথা বলে বললেনঃ তাকে তো নাছারারা টাকা দিয়ে কিনে নিয়েছে। টাকার জন্য ইসলাম বিদ্বেষীদের বই ছাপে। সাথে সাথে তাঁর নিঃশ্বাস অনেকটা ভারী হয়ে এল। আমি তাঁকে আশ্বাস দিলাম, আমি ইনশা আল্লাহ্ আপনাকে হতাশ করব না। আপনারই পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলব। সদর সাহেব আমার কথায় অতিশয় খুশী হয়ে আমার জন্য দোআ করলেন।

তিনি আমাকে বললেনঃ আপনি একটি পত্রিকা বের করুন! আমি বললামঃ আমি পত্রিকা ছাপব কি করে? আর তা পড়বেই বা কে? প্রচার করবেই বা কারা? বললেনঃ তার জন্য আপনার কোন চিন্তা নেই। এজন্য আমি আর আমার খাদেমরাই যথেষ্ট। এ কথা বলেই তিনি তাঁর সম্মুখস্থ খাদেম মাওলানা আবদুল হক ও মাওলানা ফজলুর রহমানের দিকে ইঙ্গিত করলেন। এ দু'জনও এখন পরলোকগত। আল্লাহ তাঁদের উপর রহম করুন!

তিনি বললেন, আপনি কেবল লিখবেন এবং সম্পাদনা করবেন। বাকী সকল দায়িত্ব আমার ও আমার খাদিমদের। ওদের জিজ্ঞেসা করুন, আপনার লেখার কাটিং পত্রিকা থেকে নিয়ে কত ছেপে প্রচার করেছি। সাথে সাথে খাদেমদ্বয়ও এ কথার সাক্ষী দিলেন।

আমি অবাক হয়ে গেলাম। ইনি কি মানুষ! না কি ফেরেশতা! জীবনে কোনদিন আমাকে দেখেননি। একমাত্র পত্রিকার পাতায় নাম দেখা ও আমার কিছু কিছু ছিটেফোঁটা লেখা পাঠ করা ছাড়া আর কোনভাবেই তিনি আমাকে চিনেন না। অথচ আমারই লেখা তিনি হ্যান্ডবিল আকারে ছেপে প্রচার ও বিলি করেছেন। তাঁর সম্মূখে আমার তো কোন অস্তিত্বই নেই। বয়সে আমি তাঁর ছেলের সমান। পড়ি সরকারী মাদ্রাসায়। সরকারী মাদ্রাসার ছাত্রদের দেখলে কওমী মাদ্রাসার হুযুরগণ তো বটেই তালেবে-এলেমরাও নাক সিটকায়। অথচ তিনি নিজের কানে শুনলেন আমি সরকারী মাদ্রাসায় পড়ি, পরনে আমার আলীগড়ী পাজামা ও জিন্নাহ টুপি। তারপরও সমাদরের একটুও কমতি নেই। কী উদার তাঁর মন! কী প্রাণখোলা তাঁর আলাপ আলোচনা! কত আপন করে নিলেন কত দূরের একজনকে। কত বড় অফার দিলেন প্রথম পরিচয়েই। আমি লিখব আর সম্পাদনা করব আর তিনি তা ছাপাবেন আর প্রচার করবেন! আমার লেখা তো পড়েছেন আরো হাজার হাজার জনে। কই, তাঁরা কেউ তো কোনদিন এতটা মূল্যায়ন করে এতটা উৎসাহ দিলেন না! আমার মনোজগতে রীতিমত একটা ঝড় বয়ে গেল। আমার মনে হল আমার জীবনের সকল সাধনা যেন সার্থক হয়ে গেল।

www.pathagar.com

পরম বিনয়ের সাথে আমি জানালাম, আমার বৃদ্ধ আব্বার বড় সখ- আমি দ্বীনের একজন বড় আলিম হব। তিনি আমাকে দুনিয়ার সকল চাওয়া পাওয়া বাদ দিয়ে কেবল দ্বীনের খেদমতের জন্য উৎসর্গ করেছেন। আমি যদি এই মুহূর্তে পত্রিকা সম্পাদনার কাজে লেগে যাই তাহলে আমার আর হাদীস-তাফসীর পড়া হয়তো হয়েই উঠবে না। তাই আমাকে দয়া করে ক'টি বছর সময় দিন। তারপর ইনশা আল্লাহ আমি এ কাজ করব।

সদর সাহেব সেদিন আর আমার কথার উপর দ্বিরুক্তি করেননি। হয়তো বা আমার জবাব শুনে মনে মনে খুশীই হয়েছিলেন। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে, তাঁর সেদিনের সে অফারটুকু গ্রহণ না করে আমি যে ভুল করেছিলাম, কোন দিনই তার ক্ষতিপূরণ হবার নয়। সদর সাহেব যে অন্তর দিয়ে আমার লেখাগুলো পাঠ করেছেন, আমার আন্তরিকতাকে মূল্যায়ন করেছেন, তেমন আর কেউই হয়তো করবে না। আমার লেখার সমঝদার হয়তো আরও অনেকেই আছেন। কিন্তু কে আমার রচনাবলী মুদ্রণ ও প্রচারের দায়িত্ব নেবে? কে দেবে এমন প্রাণখোলা স্বীকৃতি? কার আছে এরূপ আকাশের মত উদার মন আর সাগরের মত গভীরতা? তারপর মাঝে মধ্যেই আমি তাঁর সান্নিধ্যে যেতাম এবং দোআ ও উপদেশ গ্রহণ করতাম। তিনিও তাঁর মাদ্রাসার তালেবে-এলেমদেরকে আমার কাছে সময় সময় পাঠাতেন এবং আমার নিকট থেকে অনুপ্রেরণা ও পরামর্শ নিতে বলতেন। আমার প্রতি তাঁর এ অকৃপণ স্নেহবাৎসল্য তাঁর প্রথাগত অনেক শিষ্য-শাগরেদদের কাছে রীতিমত ঈর্ষার ব্যাপার ছিল। তাঁদের অনেকেই বুঝেই উঠতে পারতেন না, সরকারী মাদ্রাসার একজন ছাত্রকে তাদের 'সদর সাহেব' কেন এতটা ভালবাসেন। কিন্তু এ ব্যাপারে কারুর টু শব্দটি পর্যন্ত করার উপায়ও ছিল না। বাষট্টি সালে একান্তই আমার উদ্যোগে ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসায় হিকমত বিষয়ক ক্লাস বর্জনের মাধ্যমে আমরা সূচনা করেছিলাম ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় আন্দোলনের। আমার নিজ হাতে বিজ্ঞাপনের মুসাবিদা করলাম **'হিকমত নয় অংক চাই'** শিরোনামে। তা ছেপে পাঠিয়ে ছিলাম পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিটি মাদ্রাসায়। তারপর ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, ফাযিলকে ইন্টার মিডিয়েটের মর্যাদা দান প্রভৃতি দাবীতে ডাকলাম হরতাল। এ উদ্দেশ্যে গঠিত প্রথম মাদ্রাসা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আমিই ছিলাম প্রথম উদ্যোক্তা। তখন পড়ি ফাযিল শ্রেণীতে। দেশব্যাপী গ্রহণযোগ্যতার কথা বিবেচনা করে কামিল শ্রেণীর মোমেনশাহীর নাজিম উদ্দীন ভূঁইয়াকে* আহবায়ক করে গঠন

---

* **টিকা ঃ** বর্তমানে ইনি বাংলাদেশ সচিবালয়ের সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের এসাইনমেন্ট অফিসাররূপে চাকুরীরত আছেন।

www.pathagar.com

করলাম 'মাদ্রাসা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ'। আমাদের দাবী-দাওয়ার পক্ষে দৈনিক আজাদের পৃষ্ঠাভর্তি বিরাট শিরোণামে খবরাখবর ছাপা হতে লাগল। আজাদের সাথে যেহেতু আমার পূর্ব সম্পর্ক ছিল তাই সংবাদ কভারেজ আমরা পেলাম ধারণাতীতভাবে।

আন্দোলনের প্রতি আস্থা স্থাপনে অক্ষম দূর্বলমনা বন্ধুরা আলিয়া মাদ্রাসা ছাত্রাবাসে আমি পত্রিকা পড়তে গেলে আমাকে খেতাব দিত 'ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় আন্দোলন'। শেষ পর্যন্ত সত্যি সত্যি আন্দোলন দেশব্যাপী দানা বেঁধে উঠল। এবার যশোরের খন্দকার হাফিজুর রহমান হাল ধরলেন। তিনি হলেন আমাদের সংগ্রাম পরিষদের দ্বিতীয় আহবায়ক। আজকের জামাত নেতা মাওলানা মতিউর রহমান নিযামী ছিলেন আমাদের প্রচার সম্পাদক। তুমুল ছাত্র আন্দোলন এবং হরতাল গড়াল প্রায় দু'মাস পর্যন্ত। সরকার বাধ্য হল ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন গঠন করতে।

'৬৩ সালে আবার আমরা শুরু করলাম সে আন্দোলন। এবার আহবায়ক করলাম ডামুড্যার শেখ আলী আশরাফকে। নেপথ্যে আমি আমার সর্বশক্তি নিয়োগ করলাম। পত্রিকায় খবরাখবর দেয়া, মফঃস্বলে চিঠিপত্র দেয়া থেকে শুরু করে পুরোনো খবরের কাগজ কিনে তার উপর বড় বড় অক্ষরে আমাদের দাবী-দাওয়া সম্বলিত পোষ্টার ও ফেষ্টুন লেখার ৯০% হতো আমারই রুম ৪৩ নং আলিয়া মাদ্রাসা ছাত্রাবাসে এবং লেখা হত আমারই হাতে। কারণ, আমাদের না ছিল কোন ফান্ড, না ছিল কোন নেপথ্য মুরব্বী । অবশ্য মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ) তাঁর নৈতিক সমর্থন দিয়ে উৎসাহিত করতেন। আর দৈনিক আজাদ পত্রিকা তার সংবাদ বিভাগ থেকে উপসম্পাদকীয় কলাম পর্যন্ত আমাদের জন্য অবারিত করে রেখেছিল। মাওলানা আকরম খাঁ ছাড়া তাঁর পত্রিকার মফঃস্বল বার্তা সম্পাদক ও চিঠিপত্র বিভাগের সম্পাদক জনাব দুদু মিঞা (মরহুম) আমাকে সর্বপ্রকার সাহায্য দিয়ে যেতেন। এভাবে '৬৩ সালেও দীর্ঘ চুয়ান্ন দিনের ছাত্র ধর্মঘট হলো। অবশ্য এ পর্যায়ে আমার দু'জন সহপাঠী সরকারের সাথে ষড়যন্ত্রমূলক আঁতাত করে ধর্মঘট ভেঙ্গে দিতে আমাদের বাধ্য করে এবং নিজেরা পূর্ব পরিকল্পনা মোতাবেক পুলিশ প্রহরায় বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের কবল থেকে আত্মরক্ষা করে। কিন্তু পরপর দু'বছরের আন্দোলনে পূর্ব পাকিস্তান সরকারের টনক নড়ে। এভাবে আমি '৬৪ সালে ফাযিল পাশ করি।

'৬৫ সালে কামিল ক্লাসে ভর্তির সময়ই ঘটল দারুন বিপত্তি। মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ আমার মত মারাত্মক ছাত্রকে ভর্তি করে মাদ্রাসাকে পুনরায় বারুদাগার বানাতে একদম নারাজ। মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে রীট করার কথা তখনো আমরা চিন্তা করতে পারতাম না। আর কোন রাজনৈতিক দলের সমর্থন

www.pathagar.com

বা অর্থসাহায্যে যেহেতু আমরা পরিচালিত ছিলাম না তাই ফ্রি কোন ব্যারিষ্টারের আইনগত সাহায্য পাওয়ারও কোন সম্ভাবনা ছিল না। তাই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে সিলেটের বাড়িতে গিয়ে রাগ করে পড়ে রইলাম। আন্দোলন করলাম গোটা পূর্বপাকিস্তানের মাদ্রাসা ছাত্রদের স্বার্থে অথচ কামিল ক্লাসে ভর্তি হতে বাধাগ্রস্থ হচ্ছি মাত্র আমি একজন। আমার উস্তাদ মাওলানা আব্দুর রহমান কাশগড়ী যিনি তখন আলিয়া মাদ্রাসার এডিশনাল হেড মাওলানা এবং মাদ্রাসা হোস্টেলের সুপারও ছিলেন। তিনি স্বচক্ষে আমার কক্ষ ভর্তি ফেষ্টুন আর পোস্টারের গাঁদা দেখে গিয়েছিলেন। আর এটাই আমার কাল হয়েছিল। তিনি ক্লাসে কোন জটিল বা সরকারের বিরুদ্ধে কোন প্রশ্ন করলে বলতেন, এটা তোমার বন্ধু মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরীকে জিজ্ঞেস করবে। সরকারী চাকুরে কারোপক্ষে এর জবাব দেয়া সম্ভব নয়।

এমন সময় একদিন মাইকযোগে হযরত মাওলানা শামছুল হক (রহঃ) এর সিলেট আগমনের কথা জানতে পারলাম। তিনি তখন বন্দর বাজার জামে মসজিদ সংলগ্ন মুসলিম হোটেলে* অবস্থান করছিলেন। আমি দেখা করতে গেলে তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেনঃ এতদিন আপনার সাথে দেখা নাই, কী ব্যাপার? আমি তখন অভিমান করে বললাম, ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যে আন্দোলন করলাম গোটা জাতির স্বার্থে। আপনাদের নৈতিক সমর্থন পুষ্ট হয়ে। অথচ এ জন্য আলিয়া মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ আমাকে ভর্তি করবেন না, কামিল ক্লাসে। এটা কি আমার অপরাধ যে, আমি দেশের ভাবী আলেম সমাজ ও ইসলামী ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে জীবন পাত করে আন্দোলন করেছি। এখন তারা যখন আমাকে ভর্তি করবে না, তখন আমি আর কি করব? বাড়ি এসে বসে রয়েছি। হযরত মাওলানা ফরিদপুরী (রহঃ) আমার প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতি জানিয়ে বললেন, একথা তো কেউ আমাকে জানায়নি। আপনি তাড়াতাড়ি ঢাকায় আসুন। আপনার জন্য যদি শামছুল হকের কারো পায়েও পড়তে হয় আমি পড়তে রাজী আছি। কিন্তু আপনাকে হারাতে আমি কোন ক্রমেই রাজী নই।

হযরত মাওলানার সেই পূর্বের অনুভূতি পূর্বের দরদ আবার প্রত্যক্ষ করলাম। তাঁর যে মর্যাদা শত্রু মিত্র সকলের অন্তরকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। এজন্য তাঁর একটি সুপারিশই যথেষ্ট ছিল। তাঁর মত মনীষীর কারো কাছে অনুরোধ করারও প্রশ্নই উঠে না। তাঁর উক্ত কথায় তাঁর স্বভাবসুলভ বিনয় ও আন্তরিকতাই মূর্ত হয়ে উঠেছিল।

---

* **টিকা** ঃ এ মুসলিম হোটেল তখনকার দিনে সিলেটের একটি উল্লেখযোগ্য ও সম্ভ্রান্ত হোটেল বলে গণ্য হতো।

www.pathagar.com

তাঁর দেয়া সে সাহসে ভর করে সত্যি সত্যি সপ্তাহ খানেক পরে ৬৫ সালের শুরুর দিকে আমি আবার ঢাকায় চলে এলাম। মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ হয়তো আমার পিছনে বিরাট শক্তি রয়েছে বলেই ধারণা করতেন। তারা এবার ভর্তির সময় কোন ফ্যাকড়ার সৃষ্টি করলেন না। আমি আবার আমার সেই পুরোনো আস্তানা বিখ্যাত ৪৩ নং আলিয়া মাদ্রাসার ছাত্রাবাসে উঠলাম। ঢাকায় এসেই যখন লালবাগ মাদ্রাসায় তাঁর সাথে মোলাকাত করতে গেলাম তখন তিনি আনন্দে আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন- আমার হারানিধি ! আমার হারানিধি!! এই তো সুবোধ বালকের মত কাজটি করেছেন যে চলে এসেছেন। হযরতের পাশে তখন আরেকজন ক্ষীণদেহী মামুলী গড়নের একজন কৃষ্ণকায় আলেম আর লালমাটিয়ার কাজী মাওলানা গোলাম কিবরিয়া উপবিষ্ট ছিলেন।

শেষোক্ত কাজী সাহেব যেহেতু পূর্ব পাক-ইমাম সমিতি নামক একটা সংগঠন করতেন তাই তাঁর সাথে আমার পরিচয় ছিল। এছাড়া তিনি ৬৩ সালে গড়া আমার আঞ্জুমানে এজহারে হক নামক সংগঠনটির সাথেও জড়িত ছিলেন। আইয়ুব বিরোধী মুসলিম পারিবারিক আইন ও পরিবার পরিকল্পনা বিরোধী নানা আন্দোলনে আমরা ছিলাম পরস্পরে সাথী এবং একাত্ম। কিন্তু পূর্বোক্ত সেই ক্ষীণদেহী কৃষ্ণকায় ব্যক্তিকে আমি এই প্রথম দেখলাম। সদর সাহেব যখন আমাকে হারানিধি! হারানিধি! বলে দু'দুবার আখ্যায়িত করলেন তখন তাঁর কৌতূহলের সীমা রইল না। সদর সাহেব বললেনঃ ইনি হচ্ছেন আব্দুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী। আমাদের উপর রাগ করে ঢাকা থেকে চলে গিয়েছিলেন। আলিয়া মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ নাকি তাঁকে আলিয়া মাদ্রাসায় কামিল ক্লাসে নতুন করে ভর্তি করতে রাজী নয়। আর ইনি হচ্ছেন মাওলানা নূর মোহাম্মাদ আ'যমী- সদর সাহেব আমাকে লক্ষ্য করে বললেন। দু'বছর পূর্বে সদর সাহেব যেমন আমাকে দেখে বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন ঠিক ততটুকু না হলেও আ'যমী সাহেবও বললেন, এই আব্দুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদীর অনেক লেখা তো পড়েছি কাগজ পত্রে। তিনি আমাকে খোশ্ আমদেদ জানালেন এবং তাঁর সাথে চকবাজার এমদাদীয়া লাইব্রেরী সংলগ্ন তাঁর বাসস্থানে দেখা করতে বললেন। পরবর্তী জীবনে লক্ষ্য করেছি এই মাওলানা আ'যমী আর মাওলানা ফরিদপুরী একান্তই মানিক জোড়ের মত দু'জনের মধ্যে যতটুকু হৃদ্যতা ও একাত্মতা লক্ষ্য করেছি, তেমনি খুব কমই দেখা যায়। মাওলানা ফরিদপুরী (রহঃ) এবং মাওলানা আকরম খাঁ দু'জনকেই দেখেছি, কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে মাসের পর মাস তাঁরা মাওলানা আ'যমী (রহঃ)-এর মতামতের জন্য অপেক্ষা করতেন। মাওলানা আ'যমী অনেক সময় তাঁর দেশের বাড়ি ফেনীতে গিয়ে একদু'মাস বা ততোধিক কাল কাটিয়ে আসতেন। তখনই লক্ষ্য করতাম উক্ত দু'জন মনীষী মাওলানা আ'যমীর অপেক্ষায় কাল ক্ষণ গুনছেন।

www.pathagar.com

মাওলানা আ'যমীর সাথে সদর সাহেবের হৃদ্যতার অনেকগুলো কারণের মধ্যে ছিলঃ-

- ❖ দু'জনেই ছিলেন দ্বীন দরদী, সমাজ দরদী, চিন্তাবিদ ও লেখক।
- ❖ দু'জনেই ছিলেন সরকারী অনাচারসমূহের বিশেষত আইয়ূব খানের মুসলিম পারিবারিক আইন ও পরিবার পরিকল্পনার ঘোর বিরোধী।
- ❖ দু'জনেই ঐ পর্যায়ে আইয়ূব বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় জামাতে ইসলামীর প্রতি অনেক সহানুভূতিশীল ছিলেন।
- ❖ সরকার বিরোধী বক্তৃতা-বিবৃতিতে দু'জনেই অনেক সময় একই প্লাটফরমে থেকে বক্তব্য রাখতেন এবং যুক্তবিবৃতি দিতেন।

এক পর্যায়ে শর্ষিণার মরহুম পীর মাওলানা আবু যাফর সালেহ সাহেবের সাথে তাঁদের দু'জনের একটি সম্মিলিত চুক্তি হয়। তাঁরা তিন জনে চুক্তিবদ্ধ হলেন, কখনো যদি আইয়ূব খান তাঁদেরকে তলব করে, তাহলে হয় তাঁরা তিনজনে একত্রে যাবেন, নতুবা কেউই যাবেন না। তারপর সত্যি সত্যি একবার আইয়ূবী দরবার থেকে তাঁদের জন্যে আমন্ত্রণ আসে। উক্ত দু'জন মনীষী তা প্রত্যাখ্যান করলেও শর্ষিণার পীর সাহেব তাঁর সাথে প্রেসিডেন্ট ভবনে গিয়ে দেখা করলেন। সেই যে পূর্ব প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের জন্য পীর সাহেবের উপর সদর সাহেব ক্ষুণ্ন হলেন আর জীবনে কোনদিন তাঁর মুখ দেখেননি। আমাকেও তিনি একাধিকবার পীর সাহেবের এ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের কথা বলে বলেছেন- তাকে বলে দেবেন, হাশরের ময়দানে এ জন্য আমি আহ্কামুল হাকীমীনের দরবারে তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের মামলা দায়ের করব। মাওলানা আ'যমী সাহেবও একাধিক বার আমার কাছে এ কথাটি ব্যক্ত করেছেন।

সদর সাহেব যখন অন্তিম রোগশয্যায় তখন একবার শর্ষিণার পীর সাহেব সদলবলে নিজস্ব মোটরবোটে করে তাঁর এলাকা অতিক্রমকালে তাঁর সাথে একটিবার সাক্ষাত করার আগ্রহ ব্যক্ত করেন কিন্তু সেই রাগে সদর সাহেব কোনক্রমেই তাঁকে সেই অনুমতি দেননি। অগত্যা পীর সাহেবকে তাঁর সাথে সাক্ষাত না করেই চলে যেতে হয়।

ধর্মীয় ব্যাপারে সদর সাহেবের কড়াকড়ির এটাই একমাত্র ঘটনা নয়, এরূপ অসংখ্য ঘটনা রয়েছে তাঁর জীবনে। মাওলানা আকরম খাঁ মরহুমের ওখানে যখন তিনি যেতেন তখন একটি শিশুরমত অত্যন্ত আদবের সাথে তাঁর সম্মুখে বসতেন। মাওলানা আকরম খাঁ কখনো আমাকে বলতেন, আবদুল্লাহ্! তুমি এটা কর, কখনো কখনো সদর সাহেবকে বলতেন, শামছুল হক! তুমি ওটা কর, অনুরূপভাবে তদানিন্তন পাকিস্তানের ডেপুটী স্পীকার মাইনকারচরের আবুল

www.pathagar.com

কাসেম সাহেবকে (সাবেক মন্ত্রী মঈদুল ইসলামের পিতা)ও তিনি এভাবেই নাম ধরেই 'তুমি' বলে সম্বোধন করতেন। আমি অনেকটা বিব্রতবোধ করতাম এ অবস্থায়। পরে তার কারণটাও জানলাম। সদর সাহেবের দাদা আর মাওলানা আকরম খাঁর পিতা মাওলানা আবদুল বারী কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করেছিলেন ১৮৩১ সালে বালাকোটের ময়দানে সাইয়্যেদ আহমদ শহীদের বাহিনীর মুজাহিদ রূপে। তাই তাঁদের দু'জনের এত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। সে হিসেবে সদর সাহেবের পিতৃতুল্য ছিলেন মাওলানা আকরম খাঁ। আর তিনি ছিলেন মাওলানা আকরম খাঁর ভাতিজার মত। উভয়েরই ধমনীতে বালাকোটের মুজাহিদদের রক্ত প্রবাহিত। উভয়েই এক চরম গৌরবজনক জিহাদের প্রেরণায় উজ্জীবিত। তাই তাঁরা দু'জনে ছিলেন আজীবন মুজাহিদ*। মাওলানা আকরম খাঁ তাঁর ছাত্রজীবনেই আলিয়া মাদ্রাসার ইংরেজ প্রিন্সিপ্যালের মহানবীর (সাঃ) সম্ভ্রম বিরোধী এক বক্তব্যের প্রতিবাদ করে সেই যে কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসার ক্লাসরুম থেকে বেরিয়ে আসেন, আর দ্বিতীয় বার গিয়ে তাতে প্রবেশ করেননি। আর সদর সাহেবের জিহাদী জীবনের আলেখ্য তো প্রবাদসম মশহুর। একবার পাকিস্তানের ক্ষমতাধর প্রেসিডেন্ট আইয়ূব খানের সম্মুখে প্রেসিডেন্ট ভবনে গিয়ে সাক্ষাতে তাকে জালিম-ফাসিক, অনাচারী বলে সম্বোধন করে সংশোধনের জন্য তাম্বিহ করে এসেছিলেন।

মাওলানা আকরম খাঁর প্রতি এত বিনম্র এত বা-আদব হওয়া সত্ত্বেও মাওলানা আকরম খাঁ যখন স্যার সৈয়দের ভঙ্গিতে কুরআন শরীফে উল্লেখিত অনেক মু'জিযাকে সাধারণ ঘটনারূপে তাঁর 'তাফসীরুল কোরআনে' উল্লেখ করলেন তখন সদর সাহেব তাঁর 'চাচাকে' আর খাতির করেননি। তিনি লিখলেনঃ "তাফসীরের নামে সত্যের অপলাপ" নামক পুস্তক। মাওলানা আকরম খাঁ নিজে আমার কাছে দুঃখ করে একবার বললেন, "দেখ, তোমার শামছুল হক পুস্তক লিখে বলল- 'আকরম খাঁ নামক এক ব্যক্তি---' যেন আমাকে চেনেই না।" আমি বললাম- এটা তাঁর দ্বীনী গায়রত। আপনার প্রতি বিনম্র বা-আদব আচরণ হচ্ছে তাঁর শরাফত আর এটা হচ্ছে দ্বীনী গায়রত। ব্যক্তিগত শরাফতের জন্য দ্বীনী গায়রতকে বিসর্জন দেননি বলে তাঁকে দোষী বলা চলে না। মাওলানা আকরম খাঁ বললেন, তুমিও তা বল নাকি হে? আমি বললাম মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী একা নন, গোটা আলেম সমাজ এবং ধর্মপ্রাণ মহল এ জন্য

---

* টিকা- কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাঁর কিছু বিতর্কিত অভিমতের জন্য আমাদের ধর্মীয় মহলে তিনি জনপ্রিয় নন। হিন্দু সংস্কৃতির প্রভুত্ব বিস্তারের বিরুদ্ধে তাঁর খেদমত ছিল উল্লেখ যোগ্য। মুসলিম সাংবাদিকতার এ অগ্রদূতকে ভুলে যাওয়া বা অবমূল্যায়ন করা ঠিক হবে না।

www.pathagar.com

আপনার প্রতি ক্ষিপ্ত। মাওলানা আকরম খাঁ সেদিন এ প্রসঙ্গে আর কথা বাড়াননি।

আরেক বারের কথা। মাওলানা আকরম খাঁর বরাত দিচ্ছিলেন স্বয়ং সদর সাহেব আমার কাছে। ব্যাপারটি হয়েছিল এই যে, আমি লক্ষ্য করলাম, সদর সাহেবের উদারতার সুযোগে জামাতে ইসলামী ওয়ালারা তাঁর ইমেজকে তাদের পক্ষে ব্যবহার করছে। অথচ সদর সাহেব যতই উদারমনা হোন না কেন, তাঁর দ্বীনী গায়রত তো প্রশ্নাতীত। তাহলে ব্যাপারটা তাঁর নিকট তোলা যাক না! তিনি আমাকে অত্যন্ত আদর করেন। তাই কথাটি আমার মুখেই বলা উচিত। অনেক ভেবেচিন্তে এক বিকেলে আমি লালবাগ মাদ্রাসায় তাঁর সান্নিধ্যে গিয়ে উপস্থিত হলাম। খুব ভনিতা করে বললাম, হুযুর! আজ আমি কিন্তু একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে এসেছি। আমি আজ ব্যক্তি সদর সাহেবের কাছে আসিনি আর আমি এক আব্দুল্লাহ বিন সাঈদ আসিনি। আমি এসেছি পূর্ব পাকিস্তানের ছয় লাখ মাদ্রাসা ছাত্রের মুখপাত্র হিসাবে, আর এসেছি এদেশের আলেমদের শিরোমণি ব্যক্তিত্বের কাছে। আজ আপনি আমাকে যাই বলেন, ছয় লাখ মাদ্রাসা ছাত্রদের কাছে হুবহু তা-ই পৌঁছুবে। সুতরাং আপনার পক্ষ থেকে ভুল জবাব পাওয়া গেলে আল্লাহর দরবারে আপনাকে জবাবদিহি করতে হবে, আমাকে নয়। বললেন, কি ব্যাপার বলুন তো ! এখানে বলে রাখা ভাল, সদর সাহেব এতই শরীফ ছিলেন যে, তাঁকে দিয়ে আমি কোন দিন 'তুমি' বলাতেই পারিনি। তিনি সর্বদাই এ দ্বীনহীন ভক্তটিকে আপনি বলেই সম্বোধন করতেন।

আমি বললাম- মাওলানা মওদুদীর কিতাবাদি দেখার সুযোগ কি আপনার হয়েছে? তিনি নেতিবাচক জবাব দিলেন। আমি বললামঃ হুযুর, আপনার মত দিকপাল আলেমের হয়তো দরকার না হতে পারে কিন্তু দেশের হাজার হাজার লোক তো ঐ বইগুলো পড়ে, সকলের ধর্মীয় মুরব্বী হিসাবে আপনার মত আলেমের কি একটু খবর রাখা উচিত না যে, দেশের লোক ধর্মীয় সাহিত্যের নামে কি গিলছে? বললেন- কেন, কি হয়েছে?

আমি আবার পাল্টা প্রশ্ন করলাম, কোন মাসআলায় যদি আপনার উস্তাদগণ এক রকম বলেন আর আপনি অন্য রকম বলেন তখন আমাদের কি করণীয়? তিনি বললেন, আমার উস্তাদগণের সম্মুখে আমার কথার কি মূল্য থাকতে পারে? তাঁদের কথাই ঠিক বলে মানবেন। তখন আমি ধীরে ধীরে আসল কথার দিকে অগ্রসর হলাম এবং সরাসারি বললাম, মাওলানা মওদুদীর বইপত্র যে আমাদের আকীদা-বিশ্বাসের বিরোধী কথাবার্তায় ভরপুর তা'কি আপনার জানা আছে?

তিনি বললেনঃ ওহ্, মাওলানা মওদুদীর কথা বলছেন? শুনেন, উনি যখন প্রথম পূর্ব পাকিস্তানে আসবেন বলে পত্র-পত্রিকায় খবর বেরুল, তখন মাওলানা

www.pathagar.com

আকরম খাঁ সাহেব আমাকে বললেন- শামছুল হক, আমাকে তুমি নিয়ে যেও তো একটু বিমান বন্দরে। ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলার জন্য যে ছেলেটি অকাতরে তৈরী হয়ে গেল ঐ ছেলেটিকে এক নযর আমাকে দেখতে হবে।

আমি বললাম আপনি কিন্তু মূল প্রসঙ্গ থেকে দূরে সরে মাওলানা মওদূদীর প্রশংসা করে চলেছেন। হুযুর! আমার প্রশ্নের জবাব দিন। হুযুর বললেন, কি এমন আপত্তিকর কথা তিনি লিখেন?

আমি ছোট প্রসঙ্গ থেকেই শুরু করলাম। বললাম- ঐ ভদ্রলোক তো তাসাউফ বিশ্বাস করেন না! ওলী আল্লাহগণের বিরূদ্ধে সমালোচনা করে থাকেন। বললেন, তিনি কি লিখেছেন? ভণ্ড পীর-ফকীরদের বিরুদ্ধে তো আমরাও কম বলি না! আমি বললাম, তিনি যাদের বিরূদ্ধে বিরূপ সমালোচনা করছেন তাঁদের দু'চার জনের নামও শুনুন তাহলে। বললেন, বলুন শুনি! আমি বললাম, ইমাম গাজ্জালী, মুজাদ্দেদে আলফে সানী, শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী, সাইয়েদ আহমদ বেরলবী (রহঃ) প্রমুখ। শুনেই তিনি বললেনঃ আস্তাগফিরুল্লাহ! গোস্তাখ!! গোস্তাখ!!! ওঁদের বিরুদ্ধেও সে লিখেছে নাকি? কোন্ কিতাবে? আপনার কাছে তা আছে?

আমি বললাম, জ্বী হুযুর, তাঁর 'তাজদীদ ও এহ্ইয়ায়ে দ্বীন' কিতাবখানায় এসব কথা আছে এবং কিতাবখানা আমার কাছে আছে। এক্ষুণি আমি সাইকেল চেপে আমার আলিয়া হোস্টেলের রুম থেকে নিয়ে আসি। তিনি বললেনঃ আচ্ছা দেখি, আমাদের কুতুবখানায় ঐ কিতাব আছে কি না? তিনি তৎক্ষণাৎ মাদ্রাসার লাইব্রেরীর দায়িত্বে নিযুক্ত শিক্ষক মাওলানা সালাহুদ্দীন মরহুমকে আমার সম্মূখে ডেকে এনে বললেনঃ দেখেন তো ইনি যে কিতাবখানার নাম বলেন তা আমাদের লাইব্রেরীতে আছে কি না। তিনি কিতাবখানা আছে বলে জানালেন। সদর সাহেব কিতাব খানা তিনি দেখবেন বলে আমাকে আশ্বাস দিয়ে সেদিনের মত বিদায় করলেন।

হাজারীবাগের হাজী দ্বীন মোহাম্মাদ নামক এক হাজী সাহেব আমাদের কথোপকথন আগাগোড়া শুনলেন। তিনি বিস্ময়ের সাথে আমাকে বললেন- মাওলানা আপনি হুযুরকে এত কড়া ভাষায় বলতে পারলেন? কেউ হুযুরের সাথে এরূপ কড়া ভাষায় কথা বলতে পারে বলে আমার ধারণা ছিল না। আমি বললাম হাজী সাহেব, ব্যাপারটা গুরুতর তাই ঐভাবে না বললে সদর সাহেবের উদার মনে তা মোটেও রেখাপাত করত না।

এর ক'দিন পরে আমি প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হয়ে জীবনে দ্বিতীয় বারের মত হাসপাতালে ভর্তি হলাম। ঢাকা মেডিকেল হাসপাতালে আমার এক প্রতিবেশী

www.pathagar.com

বন্ধু ডাক্তার সিলেটের লেঃ কর্ণেল বদরুদ্দীন তখন এটর্নী ডাক্তার। তাঁর সৌজন্যে আমি সহজেই ঢাকা মেডিকেল হাসপাতালে একটা সীট পেয়ে গেলাম। ঘটনাচক্রে সদর সাহেবও তখন উক্ত হাসপাতালে গিয়ে ভর্তি হলেন। আমি একটু সুস্থ বোধ করতেই তাঁর সীটে তাঁকে দেখতে যাই। তিনি তাঁর কাছে যারা দেখা করতে আসতেন নানা ফল-মূল নিয়ে, ফলমূলের একটা অংশ তাদের হাতে ফেরত দিয়ে বলতেন এটা অমুক সীটের রোগী মাওলানা আব্দুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদীকে নিয়ে দেন। দেখতে দেখতে আমিও যেন একজন ভি,আই,পি রোগী হয়ে দাঁড়ালাম। আর আমার টেবিলে ফলমূলের স্তুপ হয়ে উঠল।

আমি গিয়ে সালাম জানিয়ে তাঁর প্রতি শুকরিয়া জানালাম। আর এরূপ ফল-মূলসহ লোকজনকে পাঠালে আমার লজ্জা লাগে বলে জানালাম। বললেন, কেন? ফল-মূল তো আপনার মত নওজোয়ান মুজাহিদ রোগীর বেশী প্রয়োজন। তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে দ্বীনের কাজে আত্মনিয়োগ করবেন। আমাদের জরাগ্রস্তদের দিয়ে আর কী কাজ হবে? আবার তাঁর সেই প্রাণখোলা প্রশংসাবাদ ও উৎসাহ-উদ্দীপনা জাগানো মাধুরীমাখা কথাবার্তা আর প্রতিটি কথায়ই তাঁর অন্তরের মহত্ব ও উদারতা বিচ্ছুরিত হয়।

তাঁরপর তিনি বললেন- মাওলানা জালালাবাদী! আপনি সেদিন আমাকে মাওলানা মওদুদীর বই-পত্র ও আকীদা-বিশ্বাস সম্পর্কে যখন কথা বললেন তখন তাঁর প্রতিটি কথা শেলের মত আমার অন্তরে বিদ্ধ হতে থাকে। মাওলানা সালাহুদ্দীনকে দিয়ে যখন কিতাবখানা স্থানে স্থানে পড়িয়ে শুনলাম, তখন আর তা সেরূপ গুরুতর কিছু বলে মনেই হল না। আমি বললাম, হুযুর আমার বেয়াদবী নেবেন না।

আমি তাঁর বইপত্র পড়ে এবং তাঁর ব্যাপারে আমাদের বুযুর্গানের বদনামী শুনে এধারণায় উপনীত হয়েছি যে, তাঁর ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস সম্বলিত পুস্তকাদি আমাদের জন্য বিযাক্ত শরবততূল্য। আমার কথাবার্তায় হয়তো আমার ধারণাটুকুই মূর্ত হয়ে উঠেছে। আবার মাওলানা সালাহুদ্দীন হয়তো এ ব্যাপারে মোটেই অবহিত নন, বা তার বইয়ের ভক্তপাঠক। তাই তাঁর পড়ার আওয়াজে আপনি সঠিক ব্যাপারটি সম্পর্কে তেমন কোন ধারণা করে উঠতে পারেন নাই। আমার অনুরোধ, আপনি নিজে কিতাবখানা মনোযোগ সহকারে পড়ে দেখুন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন! এ ব্যাপারে আপনি আমার বা অন্য কারো কথায় প্রভাবিত হবেন না, এটাই আমি চাই। তিনি বললেনঃ ঠিকই বলেছেন, আচ্ছা এবার আমি নিজেই তা ভালমত পড়ে দেখবো।

পরবর্তীকালে শুনেছি, তারপর সদর সাহেব কেবল পূর্বোক্ত তাজদীদ ও এহ্ইয়ায়ে দ্বীনই নয়, মওদুদী সাহেবের সর্বশেষে লিখিত 'খিলাফত ও

www.pathagar.com

মুলুকিয়াত'* বইটিও সংগ্রহ করেন। এইগুলি আগাগোড়া পাঠ করেন এবং তাঁর উক্ত বইগুলিতে যেসব কিতাবের বরাত রয়েছে সে মূল উৎস-গ্রন্থগুলোও ঐ সময় সাড়ে আঠার হাজার টাকা খরচ করে সংগ্রহ করেন। তাঁর সে বিপুল অধ্যয়নের ফসল হল তাঁর বিখ্যাত 'ভুল সংশোধন' গ্রন্থটি যাতে তিনি তাঁর পূর্বের সু-ধারণাকে তেঁতুলগাছকে লেংড়া আমের গাছ মনে করার মত বিরাট ভুল বলে অভিহিত করে গোটা জাতির প্রতি সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন।

জামাত মহলের অতি ধূর্ততা ও চাতুর্যের দরুন এবং সদর সাহেবের স্বভাবজাত উদারতার জন্য তাঁর জীবদ্দশায় উক্ত পুস্তকটি প্রকাশিত হতে পারেনি। জামাত মহল দীর্ঘকাল তাঁর মুদ্রণ স্থগিত রাখতে মরহুম সদর সাহেব ও তার নাবালক সাহেবযাদাদ্বয়কে বাধ্য করে। তারপর যখন বইটি বাজারে বের হল, তখন সদর সাহেব ইন্তেকাল করেছেন। জামাত মহল বইটি আদৌ তাঁর রচিত নয় বলে প্রোপাগাণ্ডা চালায় এবং এ প্রোপাগাণ্ডার মাধ্যম বানায় সদর সাহেবের প্রথম খলীফা ও গওহারডাঙ্গা মাদ্রাসায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত মুহতামিম মাওলানা আবদুল আযীয সাহেব মরহুমের এক বিভ্রান্ত ছেলেকে। ভুল সংশোধনের ভুল ধরার সে প্রয়াস সম্পর্কে যখন আমি মাওলানা আবদুল আযীয মরহুমকে জিজ্ঞেস করি যে, সত্যিই কি 'ভুল সংশোধন' এর আসল পাণ্ডুলিপি বর্তমান নেই? জবাবে তিনি বললেন, আপনারা বলুন! আরে বে-ওকুফ তোর এ তথ্য জানা না থাকলে তোর বাপকে জিজ্ঞেস কর! মূর্খের মত মিছামিছি প্রচারণা চালাস কেন?

সদর সাহেব 'ভুল সংশোধন' লিখে আল্লাহর কাছে এবং জাতির কাছে দায়িত্ব মুক্ত হয়েছেন। আমার একটা বিরাট সান্ত্বনা, তাঁর এ উল্লেখযোগ্য কর্মটি আমারই চেষ্টায় সাধিত হয়েছিল। আল্লাহ তাঁর এ খেদমতটুকু কবুল করুন এবং আমাকেও এ উসিলায় নাজাত দান করুন।

সদর সাহেব ঐ হাসপাতালে থাকা কালেই তাঁর এবং আমার একটি যুক্তবিবৃতি পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়-যাতে আমরা মুমূর্ষু রোগীদের কালেমা পাঠের স্বার্থে অন্ততঃ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে একজন আলেমকে ইমামরূপে নিয়োগ দানের আবেদন জানাই। যতদূর জানি, সেটি সাথে সাথেই কার্যকরী হয়েছিল।

সদর সাহেব আমার দাওয়াতে 'আঞ্জুমানে এজহারে হকের' অনুষ্ঠানে তাঁর ও আমার পীর হযরত মাওলানা যাফর আহমদ উসমানী এবং ডক্টর মুহাম্মদ

---

* টিকা- 'ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন' ও 'ইসলাম ও রাজতন্ত্র' শিরোনামে পরবর্তীকালে বই দু'টির বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

www.pathagar.com

শহীদুল্লাহ প্রমুখের সাথে একত্রে যোগদান করেন। তাঁর এবং আমার অনেক যুক্তবিবৃতি তখনকার দৈনিক পত্রিকাসমূহের পাতায় ছাপা হয়েছে। এটা ছিল আমার জন্য এক অপ্রত্যাশিত স্বীকৃতি স্বরূপ- যা আমার সমবয়সীদের তো বটেই আমার চাইতে ১০-১৫ বছরের বয়োঃজেষ্ঠ্য কারো ভাগ্যেই জুটেনি।

মাওলানা আকরম খাঁ ও মাওলানা আ'যমী মরহুমদ্বয়কে জড়িয়ে তাঁর আরেকটি ঘটনা পরবর্তী প্রজন্মের অবগতির জন্য না বলে পারছি না। ঘটনাটিতে আমার নিজের ভূমিকাও ছিল বলে অত্যন্ত কুণ্ঠার সাথে সর্বশেষ ঘটনাটি ব্যক্ত করছি।

এ ঘটনাটিতে আমি একজন মনীষীর সাথে যিনি আমাকে অত্যধিক ভালবাসেন ও আদর করেন এই সুবাদে বাহ্যতঃ একটু বে-আদবী করেছিলাম বলা যেতে পারে। কিন্তু আমার উদ্দেশ্যটি মহৎ ছিল বলে বন্ধুরা হয়তো আমাকে মার্জনা করবেন।

দীর্ঘদিন ধরে লক্ষ্য করছিলাম, দৈনিক আজাদের মত ঐতিহ্যবাহী পত্রিকাটি কম্যুনিষ্ট ও নাস্তিক দৃষ্টিভঙ্গির লোকজনে ভর্তি হয়ে রয়েছে। ইসলাম বিরোধী অনেক আপত্তিকর বক্তব্যও তাতে মাঝে মধ্যে প্রকাশিত হত। অথচ এ পত্রিকাটি একদিন হিন্দুদের ও অন্যান্য মুসলিম বিরোধী- ইসলাম বিরোধী শক্তিসমূহের জবাব দিয়ে জাতির আত্মবিশ্বাসকে শুধু রক্ষাই করেনি, বৃদ্ধিও করেছিল। একদিন সন্ধ্যাবেলা আমি মাওলানা আকরম খাঁ সাহেবের নিকট উপস্থিত হয়ে একটু ভনিতা করেই বললাম- আজ আমি আপনার সাথে একটা গুরুতর বিষয়ে কথা বলতে এসেছি। বুঝে শুনে জবাব দেবেন নতুবা আল্লাহর দরবারে আপনাকে জবাবদিহি করতে হবে। মনে রাখবেন, এ 'আজাদ' দিয়ে আপনি সারা জীবন ইসলাম বিরোধী মুসলিম বিরোধী শক্তিসমূহের বিরূদ্ধে জিহাদ করেছেন, গোটা জাতি এজন্যে আপনার কাছে ঋণী। 'আজাদ' পাকিস্তান এনেছে। আজাদ মুসলিম জাতিকে জাগিয়েছে। আর এই আজাদের জন্যই কবরে আপনি অপদস্থ লা-জওয়াব হবেন! বললেন, কেন কি হয়েছে? আমি বললাম, আপনার কাগজে যত সব নাস্তিক্যবাদী কথাবার্তা লেখা হচ্ছে। এখনো আপনার নামই প্রধান সম্পাদকরূপে ছাপা হয়, আপনি দিব্যি বেঁচে আছেন। আপনার পরে পত্রিকাটির অবস্থা কি দাঁড়াবে? এক কালে জাতিকে এ কাগজ দিয়ে মুক্ত করেছিলেন? আর আপনার পরে এ কাগজটিই জাতিকে ডুবাবে মুসলিম সন্তানদেরকে নাস্তিক্যবাদের দিকে ঠেলে দিবে। আপনি কি মনে করেন আপনি কবরে গিয়ে শান্তিতে থাকতে পারবেন?

নবতিপর বৃদ্ধ মাওলানা আকরম খাঁ আমার কথায় অনেকটা বিচলিত বোধ করলেন। তিনি বললেন এবং অনেকটা রাগতঃ স্বরেই বললেনঃ তো তোমরা এত হাজার হাজার মৌলবী থাকতে আরেকটা কাগজ বের করতে পার না? সব করবে কেবল এ আকরম খাঁ? কেন, তোমাদের কারোই আর কিছুই করার নেই? আমি বললামঃ সঙ্গত কথা, কিন্তু তারা কেউ কিছু করতে পারলো না বলে এত

www.pathagar.com

বড় একটা অস্ত্র ঈমান আকীদার শত্রুদের হাতে তুলে দেয়ার শাস্তি থেকে আপনি বাঁচতে পারবেন? অন্যদের অক্ষমতা আপনার অপকর্মের সপক্ষের যুক্তি হল? আজীবন যুক্তিবাদী বলে মাওলানা আকরম খাঁকে আমি চিনে এসেছি, জেনে এসেছি। যাঁকে আমি এজন্য শ্রদ্ধা করি ভক্তি করি এখন তাঁর মুখে এমন অযৌক্তিক কথা বার্তা একেবারেই যে বেমানান! অসহনীয়!

এবার বৃদ্ধশার্দূল একটু দমলেন। কেশর নামিয়ে, কণ্ঠ নরম করে বললেন, তাহলে তুমি কি করতে বল? আমি বললাম, আপনার কাগজে কয়েকশ লোক কাজ করে। অনেকগুলো লোক আছে এ কাগজে। সাপ্তাহিক অন্ততঃ একটি কলাম এমন রাখুন, যাতে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান ঈমান আকীদার সঠিক প্রতিফলন ঘটবে। এজন্য একজন আলেম লেখককে সে পৃষ্ঠাটির সম্পাদনার জন্য রাখতে হবে- যিনি সারা সপ্তাহের সকল জঞ্জাল তাঁর বলিষ্ঠ কলমে একদিনের লেখায় খণ্ডন করবেন- যেমনটি আপনি একা করতেন সকল হিন্দু কাগজের বিরুদ্ধে । বললেন, আচ্ছা যাও আমাকে একটু চিন্তা করতে দাও! আমি এই ভেবে আশ্বস্ত হলাম যে, আমার অব্যর্থ গুলীটি বৃদ্ধ শার্দুলকে আহত করেছে।

এর কিছুদিন পরেই তিনি ডাকলেন তাঁর প্রিয় মাওলানা শামছুল হক ও আ'যমী সাহেবকে। আমার বিরুদ্ধে অনুযোগ করে বললেনঃ শামছুল হক তোমাদের সেই জালালাবাদী ছোকরাটি সেদিন আমাকে খুব শাসিয়ে গিয়েছে। আজাদের জন্য নাকি আমাকে কবরে জবাবদিহি করতে হবে। ওর সেই শাসানির ফলে ঐ রাত্রে আমার ঘুমই হইনি। বল, এবার কী করা যায়? মাওলানা আ'যমী মরহুম পরবর্তী কালে আমাকে বলেছেন, আমরা দু'জনে তখন মুখ চাওয়া চাওয়ি করে গাল টিপে হাসলাম আর বললাম, বৃদ্ধ শার্দুলকে ঠিকই কাবু করে ফেলেছে। তিনি বলেনঃ আমরা বললাম, সত্যিই কি সে এরূপ কথাবার্তা বলতে পারল? আমরা দু'জনে তো বহুবার ব্যাপারটি নিয়ে ভেবেছি কিন্তু আপনার সম্মুখে কথাটি বলি বলি করে কোন দিনই আর বলা হল না। ও যা বলেছে সত্যিই তো!

মাওলানা আকরম খাঁ পুনরায় সদর সাহেব ও আ'যমী সাহেবকে প্রশ্ন করেন। এমন তুখোড় লেখক আলেম আমি পাবো কোত্থেকে- যে কট্টর নাস্তিক সাম্রাজ্যবাদী লেখকদের দাঁতভাঙ্গা জবাব দেবে। মাওলানা আ'যমী সাহেব (রহঃ) বলেন, তখন আমরা দু'জন বললাম, যে এত সুচিন্তিত অভিমত দিতে পেরেছে, সেই পারবে এ কাজটি করতে। তাঁর লেখা তো আর কম প্রখর নয়! মাওলানা আকরম খাঁ তাতে সম্মতি দিলেন।

তারপর যথারীতি 'আজাদ' এর ম্যানেজিং কমিটির মিটিং-এ ডাইরেক্টরদেরকে ডেকে তাদের সম্মতিক্রমে একটি পদ সৃষ্টি করা হয় এবং তিন তিন বার আমার জন্য আলিয়া মাদ্রাসা হোস্টেলে লোক পাঠিয়েও না পেয়ে (কারণ, আমি তখন দেশের বাড়িতে সিলেটে ছিলাম) মাওলানা খালেদ

www.pathagar.com

সাইফুল্লাহ সিদ্দীকীকে সে পদে নিয়োগ দান করা হয়। মাওলানা খালেদ সাইফুল্লাহ সিদ্দীকী আমার বন্ধু এবং আঞ্জুমানে এজহারে হকের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। তিনি তখন ঢাকায় উর্দূ দৈনিক পাসবান এবং করাচীর দৈনিক জং-এর মতো উঁচুমানের কাগজসমূহে উর্দূতে প্রবন্ধ লিখতেন, কিন্তু বাংলা তেমন জানতেন না। কিন্তু দায়িত্ব যখন হাতে আসে তখন তা পালনের শক্তিও আল্লাহ দিয়ে দেন। এখন মাওলানা সাইফুল্লাহ দৈনিক ইনকিলাবের প্রতিদিনের একজন কলাম লেখক। সে দিন 'মুসলিম জাহান' নামক যে কলামটি দিয়ে দৈনিক আজাদে একটি নতুন পৃষ্ঠার সংযোজন হয় সদর সাহেব তাতে এভাবে তাঁর বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছিলেন। সে ধারা আজ অনেক নতুন দৈনিকই অনুসরণ করছে।

হযরত মুয়াবিয়া (রাযিঃ) বর্ণিত একখানা বিখ্যাত হাদীস যার অর্থ: আল্লাহ যার মঙ্গল কামনা করেন, তাঁকে দ্বীনের ব্যুৎপত্তি দান করেন।

তাফাক্কুহ বা দ্বীনের ব্যুৎপত্তি কিন্তু সকলের সমান হয় না। যার এলমের গভীরতা যত বেশী, তাঁর তাফাক্কুহ্ বা দ্বীনের ব্যুৎপত্তিও তত বেশী হয়ে থাকে। এমন প্রজ্ঞাবান আলেমের সংখ্যা সর্বযুগেই খুবই কম ছিল। আমাদের সদর সাহেব মরহুম যে এমনি গভীর প্রজ্ঞা ও ব্যুৎপত্তির অধিকারী ছিলেন, তা তার কথাবার্তায় ফুটে উঠত।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিখ্যাত মুফাস্‌সির ও নাদিয়াতুল কুরআন এর উদ্ভাবক মাওলানা সিরাজুল ইসলাম সাহেবের জামাতা মাওলানা আবদুল ওয়াহ্‌হাব মরহুম "নাদিয়াতুল কুরআন"* এর সাধনায়ই জীবনপাত করে গেছেন। তাঁর সে সাধনা কার্যকর ও ফলবতীও প্রমাণিত হয়েছে। তিনি আবার তাবলীগ জামাতেও সময় লাগাতেন। একবার তিনি সদর সাহেবের সাথে দেখা করার জন্য লালবাগ মাদ্রাসায় গেলে কুশল জিজ্ঞাসার সাথে সাথে সদর সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, মাওলানা এখন কি কাজ করছেন?

জবাবে মাওলানা আবদুল ওয়াহ্‌হাব মরহুম বললেন, দ্বীনের কিছু ফিকির করি। সদর সাহেব বললেনঃ সে ফিকিরটা কি শুনতে পারি? জবাবে মাওলানা বললেন, তাবলীগী মেহনত, জামাতে চিল্লায় যাই। এবার তিনি প্রশ্ন করলেন, এ ফিকিরে আর কত লোক আছে? মাওলানা বললেন, কয়েক লাখ হবে।

সদর সাহেব পুনরায় জিজ্ঞেস করলেনঃ আপনার নাদিয়াতুল কুরআনের কি হলো? কোমলমতি বাচ্চাদেরকে কুরআন শিক্ষা দেয়ার এ মহৎ কাজটি কি ছেড়ে দিয়েছেন? জবাবে মাওলানা বললেন, ছেড়ে দেইনি, তাও করি। ছদর সাহেব আবার প্রশ্ন করলেন, এ কাজটি আর কত লোকে করে?

*** টিকা-** এ নামের প্রতিষ্ঠানটির মাধ্যমে সহীহভাবে কুরআন পঠন পাঠনের খেদমত বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় জোরদারভাবে চালু আছে। বর্তমানে প্রয়োজনীয় ধর্মীয় বই-পুস্তক প্রকাশের একটি প্রকাশনা সংস্থাও এর অধীনে গড়ে উঠেছে।

www.pathagar.com

জবাবে মাওলানা বললেন, এ কাজটি আসলে আমি একাই করি। অন্যরা তা ততটুকু বুঝেও উঠে না, আর লেগেও থাকে না।

এবার ছদর সাহেব গর্জে উঠলেন, যে কাজটি আর কেউই করে না বা করতে পারে না তা ছেড়ে দিয়ে আপনি এমন মেহনতে সময় কাটান যাতে আপনার নিজের কথা মতই কয়েক লাখ লোক লেগে আছে? আপনার ঐ কাজের ছওয়াব সাধারণ দ্বীনী মেহ্নতের তুলনায় কয়েক লাখ গুণ বেশী! একাজটিই আপনি আজীবন করবেন, এতে দ্বীনের বেশী ফায়দা হবে।

রসবোধ

বিচক্ষণতার সাথে সাথে তাঁর মধ্যে প্রচুর রসবোধও ছিল। একবার আমি এক পত্রে তাঁকে লিখেছিলাম, হুযুরের বাড়ীর কাছে ফরিদপুরের টেকের হাট, আ'যমী সাহেবের বাড়ী ফেনীর টেকের হাট আর আপনাদের এ শিষ্যটির বাড়ী টুকের বাজার। আমার জন্য এটা একটা শুভ লক্ষণ মনে হয়। হুযুর আমার একথাটি অত্যন্ত পছন্দ করেছিলেন বলে আ'যমী সাহেবের মুখে শুনেছি।

এ রকম কত পুণ্য কাজের সাথে যে তিনি জড়িত তার সবগুলির বিবরণ প্রকাশিত হলে ভবিষ্যত প্রজন্ম তা থেকে অনেক শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে।

সদর সাহেবের ইন্তেকালের সংবাদ পাওয়া মাত্র তাৎক্ষণিকভাবে আমি একটি কবিতা লিখি। তার শিরোনাম ছিল 'সত্য সূর্য গিয়াছে ডুবিয়া'। তাঁর একান্ত খাদেম মরহুম মাওলানা ফজলুর রহমান ভাই তা ছাপানোর কথা বলে আমার নিকট থেকে নিয়ে যান। তখন ফটোস্ট্যাট মেশিনের প্রচলন ছিল না। তাঁর ছিল আবার লঞ্চ ধরার তাড়া। বললেন, আপনি চিন্তা করবেন না। আমি তো হাজার হাজার কপি ছাপবো। দুর্ভাগ্য, সে কবিতাটি এভাবে চিরদিনের জন্য আমার নিকট থেকে হারিয়ে যায়। তার একটি মাত্র পংক্তি আজ আমার স্মরণ আছে।

"মুসলেহাতের মলিন লেবাসে দ্বীনেরে করনি হীন"

আমরা নানা মুসলেহাতের যুক্তিতে অনেক সময় বাতেলের কাছে পরাভব মেনে নেই। সদর সাহেব মরহুম কোন দিনই তা করেননি। এ তাঁর চরিত্রের এমন একটি বৈশিষ্ট্য, সম্ভবতঃ সমকালীন বিশ্বে এ ব্যাপারে তাঁর আর কোন জুড়ি খুঁজে পাওয়া যাবে না। আল্লাহ আমাদেরকে সদর সাহেবের মত বিশাল হৃদয় মহামানব ও নানা মুখী প্রতিভা সম্পন্ন মহান বুযুর্গের পদাঙ্ক অনুসরণের তৌফিক দান করুন। আমীন!

=০০০=

www.pathagar.com

মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ)-কে যেমন দেখেছি

মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম

আমি যাঁদেরকে দেখেছি এবং যাঁদের সাহচর্য লাভে ধন্য হয়েছি, জ্ঞানের সাধনায় যাঁদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছি তাঁদের মধ্যে হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ) ছিলেন অন্যতম। তিনি দেশ ও জাতিকে অনেক কিছু দিয়ে গেছেন, নিতে চেষ্টা করেননি কিছুই। ইসলামের জন্য মুসলিম মিল্লাতের জন্য তাঁর মধ্যে যে দরদ লক্ষ্য করেছি, তার দৃষ্টান্ত মেলা ভার।

ইসলামী শিক্ষার প্রচার প্রসারে তিনি সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। দ্বীনি এলমকে এদেশের ঘরে ঘরে পৌঁছানোর যে আন্দোলন তিনি করেছিলেন তা বিরল।

বাংলা ভাষায় ইসলামী গ্রন্থ রচনার দিশারী ছিলেন হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ)। আমার তাফসীরে নূরুল কোরআন বা বিশ্ব সভ্যতায় পবিত্র কোরআনের অবদান অথবা মহান রাষ্ট্রনায়ক হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রভৃতি গ্রন্থ সমূহ রচনার সৌভাগ্য আল্লাহ্ পাকের দরবার থেকে পেয়েছি, আর তা পেয়েছি হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ)-এর ন্যায় বুযুর্গানে দ্বীনের অনুসরণের বরকতে। তিনিই বোখারী শরীফের বঙ্গানুবাদ পেশ করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। পরবর্তীতে তাঁর আরব্ধ কাজ সুসম্পন্ন করেছিলেন তাঁরই সুযোগ্য শাগরেদ শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা আজিজুল হক সাহেব। ঐতিহাসিক বড় কাটারা মাদ্রাসা, লালবাগ জামেয়া কোরআনিয়া আরাবিয়া, ঢাকার ফরিদাবাদ মাদ্রাসা, গোপালগঞ্জ গওহারডাঙ্গা মাদ্রাসা প্রভৃতি দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তিনি আজও অমর হয়ে আছেন।

বস্তুতঃ এ পৃথিবীতে যাঁরা আল্লাহর নৈকট্য লাভে ধন্য হয়েছেন, যাঁদেরকে আল্লাহ পাক স্বীয় নৈকট্য দানের জন্য পছন্দ করেছেন, যাঁরা দ্বীন ইসলাম প্রচার প্রসার এবং প্রতিষ্ঠায় ছিলেন নিবেদিত প্রাণ, হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ) ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তিনি তাঁর জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে আল্লাহর দ্বীনের খেদমতে অতিবাহিত করেছেন। তাঁর এখলাস ছিল অসাধারণ, সাধনা ছিল অক্লান্ত, দ্বীন ইসলামের জন্য তাঁর প্রেম ছিল অকৃত্রিম, তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল অনন্য সাধারণ।

www.pathagar.com

ব্যক্তি জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দের জন্য তিনি কোন দিন ব্যস্ত হননি, তাঁর চিন্তা চর্চা, সাধনা একমাত্র আল্লাহ পাকের দ্বীনকে মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছাবার জন্য ছিল। দুনিয়ার মায়া-মোহ তাঁকে ক্ষণিকের জন্যও কোনদিন আকৃষ্ট করতে পারেনি। তাঁকে আল্লাহ পাক বহু গুণের অধিকারী করে সৃষ্টি করেছিলেন এবং দ্বীন ইসলামের খেদমতের জন্য তাঁকে তৈরী করেছিলেন।

তাঁর জন্ম হয় বাংলা ১৩০২ সালে ফাল্গুনের প্রথম সপ্তাহে। দিনটি ছিল শুক্রবার। সাবেক ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত গওহার ডাঙ্গা গ্রামের এক দ্বীনদার পরিবারে তাঁর জন্ম হয়েছিল। যেমন পিতা আবদুল্লাহ তেমনি মাতা আমেনা বেগম ছিলেন অত্যন্ত দ্বীনদার এবং পরহেজগার। হযরত মাওলানা শামছুল হক (রহঃ)-এর জন্মের প্রায় তিনশত বছর পূর্বে মধ্য এশিয়া থেকে ইসলাম প্রচারের মহান উদ্দেশ্যে এ দেশে আগমণ করেছিলেন তাঁর পূর্ব পুরুষগণ। এতদ্ব্যতীত তাঁর পিতামহ মোজাদ্দেদে যামান হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলবী (রহঃ)-এর সঙ্গী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন এবং শিখদের বিরুদ্ধে জিহাদে অংশ গ্রহণ করার তাওফিক অর্জন করেছিলেন। ইসলামের প্রচার এবং ইসলামের দুশমনদের বিরুদ্ধে জিহাদের এ ঐতিহ্য নিয়ে তিনি পৃথিবীতে আগমণ করেন।

শৈশব অতিবাহিত হয় স্বগ্রামে, লেখাপড়ায় হাতেখড়ি সেখানেই। এরপর কলিকাতা আলীয়া মাদ্রাসার এ্যাংলো-পার্শীয়ান বিভাগে সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছিলেন। স্কুলে নিয়মিত ক্লাস করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি কলিকাতার চারজন বিখ্যাত আলেমের নিকট দ্বীন ইসলাম শিক্ষা করার জন্য হাজির হতেন। এরই মধ্যে তিনি উর্দূ ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করলেন। যথা সময়ে তিনি অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন এবং স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হলেন। তাঁর পিতার আদেশ ছিল ইংরেজী পড়তেই হবে, আর তাঁর মনের গোপনতম প্রকোষ্ঠে লালিত আকাঙ্ক্ষা ছিল দ্বীন ইসলাম শিক্ষা করার।

অবশেষে পিতার আদেশে তাঁকে কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হতে হয়। এ দিকে তিনি আল্লাহ পাকের দরবারে দ্বীনি এলম শিক্ষার তাওফিকের জন্য মোনাজাত করতে থাকেন। মানুষ মন থেকে যা চায় আর যদি আল্লাহ পাকের দরবারে তার জন্য ফরিয়াদ জানায়, আল্লাহ পাক তার ফরিয়াদ কবুল করেন। এভাবে মানব মনের আকাঙ্ক্ষা হয় পূর্ণ। হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ)-এর বেলায়ও তাই হয়েছিল।

এটি ১৯২০ সালের ঘটনা। তখন বৃটিশ-ভারতের স্বাধীনতার বহ্নিশিখা জ্বলছে দাউ দাউ করে। বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন চলছে ঘরে ঘরে। ফলে স্কুল-কলেজ বন্ধ হয়ে যায় এবং হযরত ফরিদপুরী (রহঃ)-এর ইসলামী শিক্ষা

www.pathagar.com

লাভের একটা সুযোগ সৃষ্টি হয়। তিনি এ উদ্দেশ্যে কলিকাতা থেকে ফিরে এলেন। কিন্তু এরই মধ্যে আল্লাহর তরফ থেকে তাঁর পরীক্ষা শুরু হয়। তিনি বসন্ত রোগে আক্রান্ত হলেন। তবুও তাঁর অদম্য আকাঙ্ক্ষার একটুও ব্যাঘাত ঘটল না। তিনি স্বপ্ন যোগে আদিষ্ট হয়ে সুদূর দেওবন্দ অভিমুখে যাত্রা করলেন। অতঃপর প্রথমে সাহারানপুরে, পরে দেওবন্দে তিনি দ্বীন ইসলামের সকল বিষয়ে অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করলেন। ১৯২৭ সালে তিনি দেওবন্দ থেকে সনদ প্রাপ্ত হন।

আধ্যাত্মিক দীক্ষা ঃ

হযরত ফরিদপুরী (রহঃ)-এর সৌভাগ্য এই যে, তিনি ১৯১৯ সালে অর্থাৎ প্রবেশিকা পরীক্ষারও পূর্বে হযরত থানভী (রহঃ)-এর সান্নিধ্য লাভে ধন্য হন এবং দ্বীনি শিক্ষার তাওফিকের জন্য তাঁর দোয়া প্রার্থী হন। প্রেসিডেন্সী কলেজে ছাত্র থাকা কালেও তিনি হযরত থানভী (রহঃ)-এর মূল্যবান গ্রন্থাবলী পাঠ করার সুযোগ লাভ করেন। ফলে হযরত থানভী (রহঃ)-এর সাথে তাঁর আত্মিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এ কারণেই ১৯২০ সালে যখন তিনি দেওবন্দ গমণ করলেন তখন শিক্ষাবর্ষ শুরু হতে আরও দু'মাস বাকি। তাই তিনি সে সময়টি হযরত থানভী (রহঃ)-এর দরবারে অতিবাহিত করা পছন্দ করেছিলেন এবং তাঁর নিকটই এলমে মা'রেফাত হাসিল করেছিলেন। হযরত থানভী (রহঃ)-এর আদর্শ তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল। তাই তিনি হযরত থানভী (রহঃ)-এর অনুসরণ করেছিলেন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে।

কর্মজীবন ঃ

দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে সনদ প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে হায়দ্রাবাদের নিযামের প্রধান কাজীর পদ গ্রহণ করার আহবান জানানো হয়। কিন্তু তিনি তাতে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। কেননা তাঁর চোখে স্বদেশের মানুষের দ্বীনি দুরাবস্থার করুণ দৃশ্য। তাই ১৯২৮ সালে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। সারা দেশে ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করার এক মহাপরিকল্পনা তিনি গ্রহণ করেন। তাঁর কর্মময় জীবনের প্রথম কয়েক বছর তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ইউনুসিয়া মাদ্রাসায় অতিবাহিত করেন। ১৯৩৩ সালে তিনি খুলনা জেলার বাগের হাট মহকুমার গজালিয়া গ্রামে একটি মাদ্রাসা কায়েম করেন।

১৯৩৪ সালে তিনি ঢাকার বিখ্যাত ব্যবসায়ী হাফেয মোহাম্মদ হুসাইন সাহেবের সহযোগিতায় বড়কাটারা হোসাইনিয়া আশরাফুল উলূম মাদ্রাসা কায়েম করেন। সুদীর্ঘ পনের বছর কাল তিনি এ মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ছিলেন।

www.pathagar.com

১৯৪৯ সালে একটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কায়েম করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে লালবাগ জামেয়া কোরআনিয়া আরাবিয়া নামক ইসলামী শিক্ষাগার প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি সুদীর্ঘ ১৮ বছর কাল এ প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এর ফলে তাঁর নিকট থেকে যাঁরা ইসলামী শিক্ষা পেয়েছেন তাঁরা সারা দেশে তাঁর অনুসরণে অনেক মাদ্রাসা স্থাপন করেছেন। এভাবে তাঁর স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়।

এতদ্ব্যতীত, তিনি তাঁর নিজ গ্রাম গওহারডাঙ্গায় একটি বিরাট মাদ্রাসা কায়েম করেন। হযরত ফরিদপুরী (রহঃ)-এর ইসলামের জন্য কত আন্তরিকতা ছিল তার একটি জ্বলন্ত প্রমাণ পাওয়া যায় এ মাদ্রাসা স্থাপনের সময়। কেননা, তিনি তাঁর এক মাত্র বৈঠকখানা ঘরটিকেই প্রথম মাদ্রাসায় রূপান্তরিত করেন। পরে দারুল উলূম খাদেমুল ইসলাম নামে মাদ্রাসাটি সুপরিচিত হয়।

১৯৬৬ সালে ঢাকা মহানগরীর পূর্বাঞ্চলে ফরিদাবাদে তিনি একটি মাদ্রাসা কায়েম করেন, যা ফরিদাবাদ মাদ্রাসা নামে খ্যাতি লাভ করে। এমনিভাবে সারা দেশে তিনি আরও বহু ইসলামী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন।

রাজনৈতিক জীবন ঃ

পাকিস্তান আন্দোলনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। পাকিস্তানে ইসলামী শাসন কায়েম করার আন্দোলনেও তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়। আদর্শ প্রস্তাব গ্রহণ ও পূর্ণাঙ্গ ইসলামী জীবন বিধান কায়েমের উদ্দেশ্যে তিনি তৎকালীন পাকিস্তানের দু'অংশে ব্যাপক সফর করেন। তদানিন্তন প্রেসিডেন্ট আইয়ূব খানকে তিনি বলিষ্ঠ কণ্ঠে ইসলামের কথা বলতে এতটুকু দ্বিধাবোধ করেননি। কেননা, তিনি ছিলেন ইসলামের একজন নির্ভীক সৈনিক। ইসলাম বিরোধী কোন কর্মকান্ড দেখলে তার বিরুদ্ধে তিনি জিহাদ ঘোষণা করতেন।

খাদেমুল ইসলাম ঃ

এ উদ্দেশ্যে তিনি একটি সংগঠন গড়ে তোলেন যার নাম হলো খাদেমুল ইসলাম জামাত। দেশের বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ এবং ইসলামী আদর্শে অনুপ্রাণিত কর্মীদের সমন্বয়ে তা গড়ে উঠেছে। আজও ইসলামের প্রচারে এ জামাত কাজ করে যাচেছ।

তাঁর রচনাবলী ঃ

হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ)-এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, তিনি বাংলা ভাষায় শতাধিক ইসলামী বই রচনা ও তরজমা করে গেছেন।

www.pathagar.com

এ দেশের কোন আলেম ইতিপূর্বে এত ব্যাপকভাবে এ মহান কাজ করেননি।

বিশেষত হযরত থানভী (রহঃ) রচিত বহু গ্রন্থের তিনি অনুবাদ করেন। তাঁর সৌজন্যেই হযরত থানভী (রহঃ)-এর চিন্তাধারার সাথে সর্ব প্রথম এ দেশের শিক্ষিত মানুষ পরিচিত হয়। আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে হযরত থানভী (রহঃ)-এর অবদান সম্পর্কে যে গবেষণা চলছে তার মূল উৎস হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ)-এর অক্লান্ত সাধনা, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। বেহেশতী জেওর, তালিমুদ্দীনসহ কয়েকটি অতি মূল্যবান গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করে তিনি জাতিকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করে গেছেন।

সত্যিকথা বলতে গেলে আজ আমরা যা কিছু লিখছি তার পেছনেও তাঁরই অবদান রয়েছে। কেননা, আমরা তাঁরই নিকট থেকে অনুপ্রাণিত হয়েছি। আমি ব্যক্তিগত ভাবে তাঁর নিকট এ জন্য ঋণী যে, তিনিই ছিলেন এ পর্যায়ে আমার অনুপ্রেরণার উৎস। বাংলা ভাষায় আমার রচিত প্রথম গ্রন্থ 'জীবন ও কোরআন' প্রকাশিত হয় ১৯৬০ সালে। এর পান্ডুলিপি দেখিয়েছিলাম তাঁকে। তিনি তাঁর সংশোধন ও অনেক নতুন তথ্য সংযোজন করে আমাকে চিরঋণী করে গেছেন। আমার ভুলগুলোর তিনি সংশোধন করেছেন আর সেই সংশোধনের সময় আমার প্রতি তাঁর যে দরদের পরিচয় পেয়েছি তা ভাষায় প্রকাশ করা আদৌ সম্ভব নয়।

উপসংহার ঃ

তিনি ছিলেন আল্লাহর ওলী। তিনি ছিলেন আল্লাহর রাহের মুজাহিদ। তিনি ইসলামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ খাদেম তিনি ছিলেন আল্লাহর খাঁটি প্রেমিক। তিনি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যই জীবনের যাবতীয় কাজ করে গেছেন। যদিও ১৯৬৯ সালের ২১শে জানুয়ারী রোজ মঙ্গলবার তিনি এ জগৎ ত্যাগ করে গেছেন। কিন্তু মৃত্যু যেন তাঁকে জয় করতে পারেনি; বরং তিনি মৃত্যুকে জয় করে অমর হয়ে আছেন। যাঁর অন্তরে আল্লাহর প্রেম রয়েছে তাঁর মৃত্যু নেই। তিনি অমর চির স্মরণীয়। আল্লাহ পাক তাঁর মরতবাকে আরও বুলন্দ করুন এবং আমাদেরকে তাঁর মহান আদর্শকে সমুন্নত রাখার তাওফিক দান করুন। আমীন।

= ০০০ =

www.pathagar.com

মানুষ গড়ার কারখানা
হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ)

মোহাম্মদ আবদুল মতীন বিন-হুসাইন

মনে হয় তখন ইংরেজী '৭৪ সাল।

আমি তখন বরিশাল মাহমূদিয়া মাদ্রাসায় শরহে-জামী পড়ি এবং হযরত সদর সাহেব (রহঃ)-এর প্রিয় শিষ্য হযরত মাওলানা সালাহুদ্দীন সাহেব (রহঃ)-এর কামরায় থাকি। একবার তিনি ঢাকায় আসতেছিলেন। আসার সময় আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমার খুব বাংলা কিতাবাদি পড়ার শখ, আমি এবার তোমার জন্য ঢাকা থেকে বাংলা কিতাব নিয়ে আসব। ক'দিন পর ঢাকা থেকে ফিরে আসলেন। কামরার মধ্যে বসে একটু পরে বললেন, এই নাও তোমার কিতাব। সদর সাহেব (রহঃ)-এর লেখা "জীবনের পণ", "দোসরা সবক", "জামায়াতি জিন্দেগী" প্রভৃতি কয়েকটি পুস্তিকা পেয়ে খুব খুশি লাগল। পড়লাম। আমার তরুণ মনে আমার অনিচ্ছাতেই, আমার অজ্ঞাতেই আশ্চর্য প্রভাব বিস্তার করল। সেদিন আমি বুঝতেই পারিনি যে, এক বুযুর্গের হাতের এ স্নেহের তোহফা আমাকে কোন এক মহা-মানবের অদৃশ্য তরবিয়তের প্রভাবাধীন করে ফেলেছে। যা ছিল আমার জীবনের ভিত তৈরীর জন্য অমূল্য উপাদান।

আহ্! আমি এই মহা-মানবকে দেখিনি। সেই ব্যথা আমার মনে আজীবন থেকে যাবে। তবু শোকর যে, তার প্রিয়তম আদর্শ শিষ্য হযরত মাওলানা সালাহুদ্দীন সাহেব (রহঃ)-এর সোহবত লাভের সুযোগ হয়েছে। কথায় কথায় তিনি সদর সাহেব (রহঃ)-এর কথা বলতেন আর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকতেন। সদর সাহেব (রহঃ)-এর কোন বিষয় উল্লেখ করার সময় এমনভাবে বলতেন, মনে হতো বিষয়টি খুব অকাট্য, প্রামাণ্য এবং একেবারেই অপ্রত্যাখ্যানযোগ্য।

একবার শায়েখজী হযরত মাওলানা সালাহুদ্দীন সাহেব (রহঃ)-এর খুব জ্বর হলো। এত জ্বর যে, হুযুরের শয্যার অদূরে দাঁড়িয়েই জ্বরের তাপ অনুভূত হচ্ছিল। জ্বরের কষ্টে তিনি খুব কোঁকাচ্ছিলেন। হুযুরের গাম্ভীর্যের কারণে সংকুচিত স্বরে বললাম, হুযুর! কেমন লাগতেছে? বললেন, সর্বশরীরে খুব ব্যথা। জ্বর তো আছেই। বললাম, একটু হাত-পা দাবিয়ে দিই। তাহলে কিছুটা আরাম লাগবে। হুযুর খুব স্তম্ভিত কণ্ঠে দ্রুত বলে উঠলেন, না-না, সদর সাহেব (রহঃ) মানা করেছেন।

www.pathagar.com

বিষয়টি আমি তখন কিছুই বুঝতে পারিনি। অনেকদিন পর জানতে পারলাম য, শরীয়তে দাঁড়ি-মোচবিহীন সুশ্রী তরুণদের দ্বারা শারীরিক খেদমত গ্রহণ যে ভন্ নারীর দ্বারা অনুরূপ খেদমত গ্রহণের মতই হারাম, তিনি হযরত সদর সাহেব রহঃ)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে এ তরুণকে সেই সবকই পড়াচ্ছিলেন।

হযরত শায়েখজী (মাওলানা সালাহুদ্দীন সাহেব) (রহঃ) একবার ঢালকা নগর ানকাহে এমদাদিয়া আশরাফিয়ায় মাদ্রাসার ওস্তাদগণকে উপদেশ দিতে গিয়ে লতেছিলেন, "দেখুন, আপনারা তো আমাকে এখনও দেখতেছেন, এ থেকেই নুমান করতে পারেন- সেই ছোট বেলায় আমি কতটুকুই-বা খূবছুরত (সুশ্রী) ছলাম। তবুও সদর সাহেব (রহঃ) যখনই আমার সাথে কোন কথা বলতেন, সব ময়ই তিনি অন্য দিকে তাকিয়ে থাকতেন, আমার দিকে তাকাতেন না। কারণ, রীয়তের বিধান মোতাবেক শ্মশ্রুবিহীন সুশ্রী তরুণদের প্রতি নযর করা নাজায়েয। বহানাল্লাহ! কি এহতিয়াত (সতর্কতা) ছিল! কি পরিমাণ তাকওয়া ছিল!

আমার শ্রদ্ধাভাজন ওস্তাদ, ঢাকার লালবাগ মাদ্রাসার প্রবীণ মোহাদ্দেস সাহেব ঢাকুবী হুযুর) (রহঃ) আমাকে বলেছেন যে, মাওলানা সালাহুদ্দীনকে তার বড়ভাই াওলানা নযীর আহমদ সাহেব (রহঃ) যখন সদর সাহেব (রহঃ)-এর নিকট ওহারডাঙ্গায় পাঠালেন, সদর সাহেব (রহঃ) আমাকে ডেকে নিয়ে বললেন যে, ামার তো কোন ছেলে নাই, এ-ই আমার ছেলে। আমার ছেলে মনে করে ওঁকে াপনি বিশেষভাবে পড়াবেন। সেমতে আমি তাকে সমস্ত কিতাবাদি সবকের সময় ড়া সত্ত্বেও সবকের বাইরে আবার পড়িয়ে দিতাম। সদর সাহেব (রহঃ) মাঝে াঝে ওকে ডেকে নিয়ে বিভিন্ন কিতাবের বিভিন্ন স্থান থেকে প্রশ্ন করতেন। ওর টকা টাটকা জবাব শুনে তিনি তার প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করতেন ও উৎসাহিত রতেন, সেই সাথে আমার প্রতিও খুব সন্তুষ্টি প্রকাশ করতেন।

হযরত মাওলানা সালাহুদ্দীন সাহেব (রহঃ) ঢালকা নগর খান্‌কায় বয়ানের ময় বার বার শুনিয়েছিলেন যে নামাযে একাগ্রতা পয়দা করার জন্য সদর সাহেব রহঃ) এই মোরাকাবা শিক্ষা দিতেন যে, তাকবীরে তাহরীমার পূর্বক্ষণে বারবার ন্তরে অন্তরে ধ্যান করবে এবং মুখেও বলবে, আল্লাহ আমাকে দেখতেছেন, আমি াল্লাহকে দেখতেছি। আল্লাহ আমাকে দেখতেছেন, আমি আল্লাহকে দেখতেছি। ভাবে একাধিকবার বলবে। হুযুর যখন সদর সাহেব (রহঃ)-এর একথাগুলো দ্ধৃত করতেন তখন তাঁর চোখ-মুখের ভাবভঙ্গির মধ্যে আল্লাহপাকের সাথে কি ক গভীর সম্পর্ক প্রস্ফুটিত হতো!

একবার তিনি তাঁর বাড়ির সংলগ্ন মসজিদের জনৈক আলিমকে জুমআর নামায ড়াতে দিলেন। তিনি হুযুরের একজন শাগরেদ। নামাযের পর তাঁকে ডেকে

www.pathagar.com

পাঠালেন। নামায ইমামতি ইত্যাদি সম্পর্কে কোন জরুরী হেদায়েত দিবেন ব
আমার ধারণা হওয়ায় আমিও মাওলানার সাথে গেলাম। আলোচনা প্রস
বললেন, সদর সাহেব (রহঃ) বলেছেন যে, খোতবা যদিও আরবীতেই হতে হ
কিন্তু খোতবা তো খোতবাই, কেরাত নয়। আর খোতবা শব্দের অর্থ তাকর
করা। তাই খোতবাকে কেরাতের ঢঙ্গে না পড়ে বরং আরবী তকরীরের ঢ
পড়বে। তবে দ্বিতীয় খোতবার মধ্যে যেহেতু হুবহু মানকূলাত্ই বেশী থাকে ত
সেখানে কিছুটা কেরাতের ঢঙে পড়বে।

হযরত শায়েখজী আমাকে বলেছেন, একবার সদর সাহেব হুযুর (রহ
আমাকে ইমামতি করতে হুকুম করলেন। সদর সাহেবের রোব ও হায়ব
(চেহারার গাম্ভীর্য ও প্রতিপত্তি) এত বেশি ছিল যে, সকলে ভয়ে কম্পম
থাকতাম। তাঁর সম্মুখে ইমামতি? আমি তো ঘর্মাক্ত হয়ে গেলাম। প্রাণপণ চে
করেছি মদ-গুন্নার লেহাজের সাথে খুব সহীহ্ শুদ্ধ কেরাত পড়তে। যদিও ভ
কাতর ছিলাম, তবুও মনে মনে ভাবতেছিলাম এত সুন্দর কেরাত শুনে নিশ্চয় হু
খুব মুগ্ধ হবেন। নামাযের পর আমাকে ডাকলেন। কিছুটা রাগের স্বরে বললে
এইভাবে কেরাত পড়তে হয়? যাতে লোক দেখানোর ভাব থাকে? কেরাত ে
এমনভাবে পড়া চাই যে, অন্তরে আল্লাহ্র আযমত থাকে। পড়ার ঢঙ্গের ম
আল্লাহ্র প্রতি আযমত ও ভক্তি প্রকাশ পায়, ভয়ের আয়াতের মধ্যে ভয় প্রক
পায়, জান্নাত ও নেয়ামত সমূহের আয়াতের মধ্যে আল্লাহর প্রতি মহব্বত
অনুরাগ প্রকাশ পায়। অন্তরে এই খেয়াল থাকে যে, আমি আল্লাহপাক
শুনাইতেছি (শুনাচ্ছি)। অর্থের দিকে যেন খেয়াল থাকে।

অসংখ্য গুণে গুণান্বিত ক্ষণজন্মা এ মহাপুরুষের জীবনের এক-একটি মু
ছিল আদর্শ। হযরত মাওলানা সালাহুদ্দীন সাহেব (রহঃ) আমাকে বলেছেন ে
আমি যখন শিক্ষাজীবন সমাপ্তির পর লালবাগ মাদ্রাসায় শিক্ষক নিযুক্ত হই, শ
দিকে নিজের মধ্যে যৌবন ও জাহানত (মেধার) একটা প্রভাব ছিল। একদি
শরহে জামী পড়ানোর সময় সবকের ত্রুটির ফলে ক্রোধান্বিত হয়ে এক ছাে
দিকে নিজের সম্মুখের তেপায়া ছুঁড়ে মেরেছিলাম। পরে ছাত্ররা গিয়ে সদর সা
(রহঃ)-এর নিকট নালিশ করেছে। সদর সাহেব (রহঃ) তাদেরকে খুব র
করেছেন যে, ওস্তাদের শাসন, রাগ-ধমক, মার, গালী সবকিছুকে নেয়ামত ম
করা চাই। তালেবে এলেম হয়ে ওস্তাদের বিরুদ্ধে শেকায়েত করতেছ? মা
মাত্রেই ভুল-ত্রুটি আছে। ওস্তাদের ভুল-ত্রুটি হতে পারে। কিন্তু সে জন্য অন্ত
কোন খারাপ প্রতিক্রিয়া নিতে নেই। তালেবে এলেমের আখলাক তো এ
হওয়া চাই।

www.pathagar.com

হুযুর বলেন যে, একদিকে তিনি তাদেরকে শাসিয়েছেন। আরেক দিকে আমাকে ডেকে নিয়ে ভীষণ রাগান্বিত হয়ে খুব শক্ত ভাষায় বললেন, এত বড় বেওকুফ, জানোয়ার, গাধা। ওস্তাদ হয়ে ছাত্রদের সাথে এই আচরণ? এরা তো রাসূলেপাক (সাঃ)-এর মেহমান। ছাত্রদের ভুল-ত্রুটি তো হবেই। সংশোধনও করতে হবে। কিন্তু তা এভাবে? সংশোধনের পথে সংশোধন করতে হবে, সীমার মধ্যে থাকতে হবে। ইত্যাদি।

আহ্! এরই তো ফল দেখলাম যে, হযরত মাওলানা সালাহুদ্দীন সাহেব (রহঃ)-কে দেখেছি যে, ছাত্রদের প্রতি তাঁর কি কোমল ব্যবহার, সদালাপ, খায়েরখাহী, কি যে দয়া-মায়া। আয় আল্লাহ! আমাদের এই বুযুর্গানের প্রতি আপনি অসীম রহমত বর্ষণ করুন।

নিজের শিষ্য, ছাত্রদের প্রতি হযরত সদর সাহেব (রহঃ)-এর স্নেহ ও দয়া ছিল অবিস্মরণীয় ও অনুকরণীয়। কিরূপ স্নেহ, দরদ ও প্রাণ-উৎসারিত এবং দোআর দ্বারা ছাত্র-শিষ্যদের গড়ে তোলার জন্য উৎসর্গীত থাকতে হয় তারই একটা দৃষ্টান্ত শুনুন। হযরত মাওলানা সালাহুদ্দীন সাহেব (রহঃ) আমাকে শুনিয়েছেন যে, একদা তাহাজ্জুদের নামাযের পর সিজদায় পড়ে সদর সাহেব (রহঃ) কেঁদে কেঁদে দোআ করতেছিলেন আর আমার নাম নিয়ে নিয়ে বলতেছিলেন, আয় আল্লাহ! সালাহুদ্দীনকে কবুল করুন, আয় আল্লাহ, সালাহুদ্দীনকে এই নেয়ামত দান করুন, এই নেয়ামত দান করুন, ইত্যাদি।

সদর সাহেব (রহঃ)-এর সেই তরবিয়ত ও দোআরই আছর নয় কি যে, মাওলানা সালাহুদ্দীন সাহেব (রহঃ) বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় ওলী আওলিয়াদের একজন। মাওলানা (রহঃ)-এর পিছনে বরিশাল মাহমূদিয়া মাদ্রাসায় ২/৩ বৎসর বহু বার ফজরের নামায পড়ার সৌভাগ্য হয়েছে। আমার জীবনে নামাযের মধ্যে এত কাঁদতে আমি আর কাউকে দেখিনি। সূরা-কিয়ামাহ্, মুযযাম্মিল, আম্মা য়াতাসাআলুন প্রভৃতি ফজরের নামাযের মসনুন সূরাগুলি পড়তেন আর এমনভাবে কাঁদতে থাকতেন যে, আওয়ায বুলন্দ হয়ে যেত এবং মাওলার পবিত্র কালামের তখন এক অভাবনীয় মজা লাগতো।

হযরত সদর সাহেব (রহঃ)-এর দেওয়ানা খাদেম হযরত মাওলানা ফযলুর রহমান সাহেব মাদারীপুরী (রহঃ) বলেছেন যে, সদর সাহেব (রহঃ) বলতেন, ছোট থেকেই বাচ্চাদের চরিত্র গঠনের প্রতি যত্নবান হতে হয়, নতুবা পরে তা কঠিন হয়ে পড়ে। তিনি বলতেন, কাঁচায় না নোয়ালে বাঁশ, পাকলে করে ঠাস্ঠাস্। তাই, তিনি ছোট ছাত্রদেরও চরিত্র গঠনের প্রতি উৎসাহিত করতেন। যেমন, হযরত মাওলানা সালাহুদ্দীন সাহেব (রহঃ) একবার যাত্রাবাড়ী মাদ্রাসায় তাঁর

www.pathagar.com

কামরায় এক মজলিসে বলছিলেন যে, হযরত সদর সাহেব (রহঃ) গওহারডাঙ্গা মাদ্রাসায় একদা আমাকে বললেন, সালাহুদ্দীন! তুমি আমার সাথে ইসলাহী তাআল্লুক (সম্পর্ক) কায়েম কর। আমি বললাম, হুযুর! তা কিভাবে করতে হয় আমিতো তা কিছুই জানি না। হুযুর বললেন, যাও, কাগজ নিয়ে আস। আমি কাগজ নিয়ে আসলাম। অতঃপর হুযুর নিজ হাতে আমাকে ইসলাহী তাআল্লুক-এর দরখাস্ত লিখিয়ে দিয়ে বললেন, যাও, হুবহু এভাবে লিখে নিয়ে আস। আমি নিজ হাতে তা-ই লিখে নিয়ে এলাম। সদর সাহেব (রহঃ) ঐ দরখাস্ত মঞ্জুর করে দস্তখত করে দিলেন এবং আমাকে বললেন, নিজের মধ্যে যে সকল ত্রুটি অনুভব হয় তা একটি নোটবুকের মধ্যে সংক্ষেপে নোট করে রাখ। অতঃপর এক দুইটি করে জানাতে থাক এবং সেই প্রেক্ষিতে যা কিছু প্রতিকার বাতলানো হয় তদনুযায়ী আমল করতে থাক।

এরও বহুদিন পর একদা ঢালকা নগর খানকাহ্ এমদাদিয়ায় আমি হুযুরকে উপরোক্ত বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, সদর সাহেব (রহঃ)-এর সঙ্গে এই ইসলাহী তাআল্লুক কায়েমের সময় আপনি কি পড়তেন? বললেন, খুব সম্ভব তখন মীযান পড়তাম।

হযরত মাওলানা সালাহুদ্দীন সাহেব বলেন যে, আমি যখন কাফিয়া পড়ি তখন একদিন সদর সাহেব হুযুর আমাকে ডেকে বললেন, সালাহুদ্দীন, তুমি একমালুশ্-শিয়াম মুতালাআ' (অধ্যয়ন) কর। উল্লেখ্য যে, একমালুশ্-শিয়াম তাসাউফের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ও খুবই উঁচু মানের কিতাব। ঐ তরুণ বয়সে এমন একটি কিতাব পড়তে বলার অর্থ, ইসলাহী সম্পর্কের ফলে মাওলানা(রহঃ)-এর তখনই এত উন্নতি সাধিত হয়েছিল যে, মোর্শেদের বরকতে তিনি তা পাঠ করে হৃদয়ঙ্গম করতে ও উপকৃত হতে পারতেছেন। অথবা মোটামুটি যতটুকুই বুঝতে পারছেন, আরও অধিকতর যোগ্য করে গড়ে তোলাই ছিল সদর সাহেব (রহঃ)-এর লক্ষ্য। সত্যি এ মানুষটি ছিলেন- "মানুষ গড়ার জীবন্ত কারখানা"।

কিন্তু ছাত্র জীবনে তাসাউফের কোন আমলের ফলে সাময়িকভাবে হলেও একজন ছাত্র যাতে লেখাপড়ার মহৎ কর্তব্যের প্রতি উদাসীন হয়ে না পড়ে, সে দিকেও তাঁর দৃষ্টি ছিল সুতীক্ষ্ণ। কারণ, আমাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গানের কেহ কেহ এলেম অন্বেষণে যাতে কোন বিঘ্ন না ঘটে, এদিকে লক্ষ্য করে ছাত্রদেরকে বায়আত হতে নিষেধও করতেন, যদিও তাঁরাও ইসলাহী সম্পর্ককে জরুরী বলতেন। অবশ্য অবস্থার পরিবর্তনে হযরত শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া সাহেব (রহঃ), হযরত ডাঃ আবদুল হাই সাহেব (রহঃ), মুফতী শফী সাহেব (রহঃ), হযরত শাহ্ আবদুল গণী ফুলপুরী (রহঃ), মাওলানা মসিহুল্লাহ খান জালালাবাদী (রহঃ), হযরত হাফেজ্জী হুযুর (রহঃ), হযরত মাওলানা শাহ্

www.pathagar.com

আবরারুল হক সাহেব দামাত বারাকাতুহুম,হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার সাহেব দামাত বারাকাতুহুম প্রমুখ বুযুর্গগণ সেই মতও পরিবর্তন করেছেন।

হযরত মাওলানা সালাহুদ্দীন সাহেব (রহঃ) বলেন, একবার তাসাওউফের কিছু কিতাব পড়ে হঠাৎ মনের অবস্থা এমন হল যে, পাঠ্য কিতাবে কিছুতেই মন বসতেছে না। সদর সাহেব হুযুর কিভাবে তা আঁচ করে ফেলেছেন। ডেকে নিয়ে বললেন, সালাহুদ্দীন তোমাকে যেন আনমনা আনমনা দেখতেছি। কি ব্যাপার, খুলে বল! আমি সব খুলে বললাম। হুযুর বললেন, তাসাওউফের সমস্ত কিতাব সম্পূর্ণ মুলতবী রাখ (যতক্ষণ না দ্বিতীয় বার অনুমতি দেওয়া হয়)। বস্, ঐ সব কিতাব পাঠ বন্ধ করতেই পাঠ্য কিতাবাদির প্রতি আবার খুব মনোযোগ সৃষ্টি হয়ে গেল।

হায়! কত কামেল মোর্শেদ ছিলেন এ মহামানব। কামেল মোর্শেদের গুণাবলী সম্পর্কে যাঁরা ওয়াকেফ, উল্লেখিত এক-একটি ঘটনা পড়ে তাঁরা মূর্ছিত, স্পন্দিত ও হতবাক না হয়ে পারবেন না। আয় আল্লাহ! তোমার এ প্রিয়দের কবরে নূরের বারিশ বর্ষণ কর, রহমতের বারী ধারা প্রবাহিত কর।

তাই তো শায়খজী হযরত মাওলানা সালাহুদ্দীন সাহেব (রহঃ)-এর এই মন্তব্য। একদিন আমি যাত্রাবাড়ী মাদ্রাসায় হযরত শায়েখজী (রহঃ)-কে বললাম, হুযুর যদি সদর সাহেব (রহঃ)-এর কিছু হালাত (জীবন-বৃত্তান্ত) লিখতেন, তবে আমাদের জন্য বড়ই অমূল্য সম্পদ হতো। বললেন, ইহাতো এমন এক সমুদ্র, বুঝেই আসে না কোন্ দিক থেকে শুরু করবো, কি লিখব, কিভাবে লিখব। অতঃপর তিনি গম্ভীর মুখে নীরব হয়ে বসে থাকলেন। অবস্থা দেখে আমিও নীরব হয়ে বসে থাকলাম।

এক দু'জনের কথা নয়। বরং অসংখ্য লোককে তিনি এলমে, আমলে, এক-এক প্রতিভায় সমৃদ্ধশালী করে গড়ে তুলেছেন এবং সেই চিন্তায় ও চেষ্টায় সদা বিভোর থেকেছেন। যেহেতু এ অধম সদর সাহেব (রহঃ)-কে দেখেনি, তাই তাঁর যে ক'জন আদর্শ অনুগামীদের নিকট হতে যতটুকু জেনেছি তা-ই পেশ করতেছি।

জিঞ্জিরার এক বুযুর্গ হাফেয মাওলানা আবদুর রহমান সাহেব একবার খানকাহ্ এমদাদিয়া-আশরাফিয়া, ঢালকা নগর-এ বয়ানের মধ্যে বলেছেন, হযরত সদর সাহেব (রহঃ) একবার অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলেন। আমি তখন বড় কাটারা মাদ্রাসার ছাত্র। অন্যান্য অনেক ভক্তবৃন্দের মত আমিও হযরত সদর সাহেব (রহঃ)-কে দেখতে গেলাম। আমাকে দেখা মাত্রই তিনি খুবই রেগে গেলেন। এত রাগ করলেন যে, আমি পেরেশান হয়ে গেলাম। হায়! না-জানি আমি

www.pathagar.com

কোন্ বেয়াদবী করে ফেলেছি। কোন্ অপরাধ করে ফেলেছি। হুযুর বললেন, তুমি আমাকে দেখতে এসেছো, অথচ তোমার হাতে কোন একটা কিতাব নেই। এর নাম তালেবে এলম? হুযুরের ধমকের চোটে আমি শুধু কাঁপতেছিলাম। আহ্! কি শফকত, কি দরদ ছিল সদর সাহেব হুযুরের মধ্যে ছাত্রদের প্রতি! কি ফিকির ছিল ছাত্র গড়ার!

সমকালীন এশিয়ার শীর্ষস্থানীয় মোহাদ্দেস লালবাগ মাদ্রাসার ভূতপূর্ব প্রিন্সিপ্যাল, হযরত হাকীমুল উম্মত থানভী (রহঃ)-এর দীর্ঘকালের সোহবত প্রাপ্ত ও এলমে হাদীসে হযরত মদনী (রহঃ)-এর প্রখ্যাত শাগরেদ হযরত মাওলানা হেদায়েতুল্লাহ সাহেব (রহঃ) যার সম্পর্কে হযরত সদর সাহেব (রহঃ) বলেছিলেন, কিয়ামতের দিন যদি আল্লাহপাক আমাকে এ প্রশ্ন করেন যে, শামছুল হক, তুমি আমার জন্য কি নিয়ে এসেছ? তবে আমি মাওলানা হেদায়েতুল্লাহকে পেশ করবো এবং বলব, আয় আল্লাহ! আপনার জন্য আমি কিছুই আনতে পারিনি, শুধু হেদায়েতুল্লাহকে নিয়ে এসেছি। এই হযরত মোহাদ্দেস সাহেব হুযুর (রহঃ) আমাদের মেশকাত শরীফের সবকের মধ্যে একটি হাদীসের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে যখন এই কথা বলতেন যে, হযরত ইমাম আযম (রহঃ), ইমাম আওযায়ী (রহঃ)-এর পেশকৃত হাদীসের রাবীদের মোকাবেলায় নিজের পেশকৃত হাদীসের রাবীগণের মর্যাদা ও গুণাবলী রয়ান করতে করতে যখন হযরত ইবনে মাসউদ (রাযিঃ)-এর নাম আসল তখন বললেন, আর ইবনে মাসউদ তো ইবনে মাসউদ (অর্থাৎ তাঁর উচ্চমর্যাদা ও গুণাবলী তো এত স্বীকৃত যে, তা আলোচনারও অপেক্ষা রাখে না)। তখন বলতেন, যেমন আমরা বলে থাকি, সদর সাহেব তো সদর সাহেবই ছিলেন।

হযরত মোহাদ্দেস সাহেব (রহঃ)-এর মুখের এই একটি কথা কত যে ওজস্বী, ব্যাপকার্থ ও কতবেশী মর্যাদাজ্ঞাপক তা তাঁরাই বুঝতে পারবেন, যাঁরা হযরত মোহাদ্দেস সাহেব হুযুরকে জানেন।

হযরত শায়েখজী (রহঃ) আমাকে বলেছেন যে, হযরত মাওলানা যাফর আহমদ উসমানী (রহঃ) যখন ঢাকায় পড়াতেন তখন একদা সদর সাহেব (রহঃ) আমাকে নিয়ে হযরত উসমানীর হাতে সোপর্দ করলেন এবং তার সাথে সম্পর্ক রাখতে বললেন। হায়! কি অপরিসীম ইখলাস ছিল তাঁর মধ্যে যে, নিজের সাথে এত গভীর সম্পর্কওয়ালা একজন শিষ্যকে তিনি নিজের চোখে যাঁকে খুব বড় বুযুর্গ মনে করেছেন, তাঁর হাতে তুলে দিচ্ছেন শুধু ঐ শিষ্যের উন্নততর জীবন গঠনের নেশায়। অথচ, নিজেই কি কম বড় ছিলেন?

মাওলানা ফযলুর রহমান বলতেন যে, সদর সাহেব (রহঃ) বলতেন, গায়রতের অর্থপ্রকাশক কোন শব্দ বাংলাভাষায় নাই। তবুও বাংলায় আমরা এটিকে

www.pathagar.com

আত্মসম্মানবোধ বলে থাকি। সদর সাহেব (রহঃ)-এর মধ্যে গায়রত ছিল অত্যধিক। নিজের সম্মানের মতই কোন আলেম বা তালেবে এলমের সম্মানেও তিলমাত্র আঘাত তাঁকে ভীষণ পীড়া দিত। তাঁর অধীনস্থ ছাত্র শিক্ষকদের সম্মানের প্রতি তিনি ব্যক্তিগতভাবেও খুবই সচেতন ছিলেন।

লালবাগ মাদ্রাসা হতে ফারেগ জনৈক আলেম আমাকে বলেছিলেন যে, লালবাগ মাদ্রাসার জনৈক বিশিষ্ট ওস্তাদ ছিলেন যিনি কখনো রসিকতাচ্ছলে কোন ছাত্রের পেটে-পিঠে একটু খোঁচা দিয়ে দিতেন বা চামড়া ধরে টান দিতেন, যা ছিল ওস্তাদ সুলভ গাম্ভীর্যের সম্পূর্ণ পরিপন্থী হওয়ার পাশাপাশি খোদ সদর সাহেব (রহঃ)-এরও রুচিবিরোধী এক মর্ম পীড়াদায়ক আচরণ। এ বিষয়ে কেউ সদর সাহেব (রহঃ)-এর নিকট অনুযোগ করলে তিনি বললেন, মিয়া, এত বড় আরেকজন আলেম আমি কোত্থেকে আনব? মাওলানা ফযলুর রহমান সাহেব (রহঃ) একই ব্যক্তির আচরণের প্রেক্ষিতে সদর সাহেব (রহঃ)-এর এরূপ মন্তব্য উদ্ধৃত করেছেন যে, দুধ দেওয়া গরুর লাথি খাওয়াও ভাল। হুযুরের এ ধরণের মন্তব্য সমূহের অর্থ সম্ভবতঃ এই ছিল যে, শরীয়তের দৃষ্টিতে কোন চরম ক্ষতির আশঙ্কা না থাকলে একজন যোগ্য শিক্ষক বা যোগ্য ব্যক্তির ক্রটি-বিচ্যুতিকে ক্ষমার চোখে দেখা উচিত বা এড়িয়ে যাওয়া মুনাসিব। সত্যি সদর সাহেব হুযুর সদর সাহেব হুযুরই ছিলেন। যোগ্য ছাত্রদের শাসনের ক্ষেত্রেও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ছিল উদার।

ভবিষ্যতে কর্মজীবনে বহিষ্কার বা শিক্ষা জীবনের অন্য কোন দুর্নামকর ক্ষতির জন্য সমাজে হেয় হতে না হয় বা কমপক্ষে আপন-মনেই হেয় হয়ে থাকতে না হয়, মানুষ-গঠনকারী সদর সাহেব (রহঃ) এর সুদূরপ্রসারী স্নেহের দৃষ্টি সে দিকেও ছিল বরাবর সচেতন। লালবাগের পরবর্তী আসাতিযা ও বুযুর্গানের মধ্যে তাদের প্রাণাধিক প্রিয় পূর্বপুরুষের এ আদর্শকে আমরা অমর দেখতে পেয়েছি। অথচ, এই সদর সাহেব (রহঃ)-ই ছোট ছোট ক্রটিকেও ভবিষ্যত-পরিণতির দৃষ্টিতে একশত ভাগ গুরুত্বের সাথে সংশোধনীয়ই শুধু মনে করতেন না বরং সংশোধনের জোর তাকিদও দিতেন এবং যথাযথ পদক্ষেপও নিতেন। এক কথায়, তাঁর দৃষ্টি যেরূপ থাকত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বর্তমান কর্তব্যের উপর, তদ্রুপ থাকত অচিরেই সমাগত তার কাম্য পরিণামের উপরও। ইয়া আল্লাহ্! কি প্রখর দূরদর্শিতা ও কি নিখাদ কল্যাণকামিতার নমুনা ছিলেন এ মানুষটি। তাই তো হযরত মাওলানা ফযলুর রহমান সাহেব (রহঃ) থেকে শ্রুত বর্ণনামতে হযরত সদর সাহেব (রহঃ) বলতেন যে, ফযলুর রহমান, শোন, উম্মত চরানোর আগে ছাগল চরানো জরুরী।

আহ্, হুযুর এই একটি কথার মধ্যে তাঁর বেদনাভরা মনের কত কথা যে বলে

www.pathagar.com

গেছেন। হযরত মাওলানা ফযলুর রহমান সাহেব (রহঃ)-ই আমাদেরকে শুনিয়েছিলেন যে, একবার হযরত সদর সাহেব (রহঃ) জনৈক মুরীদকে কোন এক ত্রুটির জন্য খান্‌কাহ্ হতে বের করে দিয়েছিলেন। ধমক দিয়ে বলেছিলেন, খবরদার, তুমি আমার সামনে আসবা না। অতঃপর ২/৩ দিন যাবত লোকটিকে দেখতে না পেয়ে বললেন, কি ব্যাপার, ওকে দেখছিনা কেন? আমি বললাম, হুযুর, সে তো আপনার ভয়ে বাইরে বাইরে থাকে এবং কেঁদে কেঁদে মরতেছে। হুযুর বললেন, ফযলুর রহমান, কেন তোমরা এই লোকটাকে সাহায্য করলে না? কেন তোমরা তাকে এই পরামর্শ দিলে না যে, তুমি হুযুরের নিকট পত্র লিখ, মাফ চাও। আপন পীরভাইয়ের প্রতি তোমাদের কোন হক নাই? দরদ নাই? তোমরা কি আমাকে নিষ্ঠুর মনে করেছ? শোন, পিতার মনে সন্তানের প্রতি যেরূপ মায়া থাকে, রূহানী-সন্তানদের প্রতিও রূহানী-পিতার অনুরূপ মায়া মহব্বত থাকে। আমরা এক হাতে বের করে দিই, আর শত হাতে তাকে ডাকতে থাকি, শত হাতে টানতে থাকি।

সুবহানাল্লাহ্, কি নায়েবে-রাসুল সুলভ মহৎ চরিত্রের অধিকারী ছিলেন আমাদের মাশায়েখগণ। হযরত মাওলানা ফযলুর-রহমান (রহঃ) বলেছেন যে, একবার কতিপয় ওলামায়ে-কেরাম সদর সাহেব (রহঃ) এর মজলিসে বসা ছিলেন। এমন সময় প্যান্ট-শার্ট-টাই পরা এক ফর্সা যুবক হুযুরের সাথে দেখা করতে আসল। হুযুর তাকে দেখে দাড়িয়ে গেলেন এবং গলাগলির পর তাকে তাঁর খাছ-গদীর উপর বসালেন। আমরা সবাই হতবাক। লোকটি চলে যাওয়ার পর আমি বললাম, হুযুর, আপনি তাকে এত সম্মান করলেন, অথচ তার দাঁড়িও নাই? হুযুর বললেন, মিয়া, দাঁড়ি আছে,তবে পেটে। ইন্‌শাআল্লাহ্ শীঘ্রই গজাবে। মাওলানা বলেন, এই যুবক হলো পরবর্তীতে ঢাকা-ষ্টেডিয়াম মার্কেটের ব্যবসায়ী আমার বন্ধু হাজী আব্দুল মতীন। সুন্নতী লেবাছ ও সুন্নতী-দাঁড়ি শোভিত কি এক সুদর্শন নেক-লোক।

মাওলানা (রহঃ) বলেন, সদর সাহেব (রহঃ) বলতেন, চরিত্র গঠনের জন্য, দ্বীন হাছিলের জন্য, আল্লাহ্‌কে পাওয়ার জন্য সাহসে বুক বেঁধে সাধনা করতে হবে। হয় মন্ত্রের সাধন, না হয় দেহের পতন। সাধনা ব্যতিরেকে সিদ্ধি লাভ হয় না।

বিভিন্নভাবে দ্বীনের খেদমতের এক বিস্ময়কর শওক-যওক ছিল সদর সাহেব (রহঃ) এর মধ্যে। মাওলানা ফযলুর-রহমান সাহেব (রহঃ) বলেন, বিভিন্ন প্রতিভার লোকদেরকে কাজে লাগানোর এক জযবা ও চেতনা ছিল হুযুরের মধ্যে। মাওলানা

www.pathagar.com

আকরাম খাঁ যখন মোস্তফা-চরিত লিখলেন, যা ছিল বিভিন্ন ভুল-তথ্যপূর্ণ ও বিভ্রান্তিকর, সদর সাহেব (রহঃ) তখন খুব চিন্তিত হলেন যে, এর মোকাবিলায় একটি ভাল সীরাত গ্রন্থ কাকে দিয়ে লেখানো যায়, যা হবে ভাষাশৈলীর দিক থেকেও উন্নতমানের এবং পাঠকদের নিকটও হবে খুব চাহিদা যোগ্য। এজন্য তিনি কবি গোলাম-মোস্তফাকে উদ্বুদ্ধ করলেন ও প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দিলেন। ফলে তিনি 'বিশ্বনবী' রচনা করলেন যা ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছিল। মাওলানা বলেন, একদিন সদর সাহেব (রহঃ) এ বিষয়ে এক পয়গাম দিয়ে আমাকে কবি গোলাম-মোস্তফার নিকট প্রেরণ করেন। আমি গিয়ে দেখি, তিনি নির্জন কামরায় খুব ধ্যান-মগ্ন হয়ে "ফাই'লাতুন, ফাই'লাতুন, ফাই'লুন। ফাই'লাতুন, ফাই'লাতুন, ফাই'লুন।" এই আরবী কবিতারীতিটি পূণরাবৃত্তি করেই চলেছেন। আমি বললাম, ভাই, একি ব্যাপার ? বললেন, আসল মজার জিনিস তো আরবী কাব্যরীতি।

মাওলানা বলেন, আমি চাক্রী-বাক্রী ছেড়ে দিয়ে আত্ম-গঠনের জন্য যখন হুযুরের নিকট আসলাম, একদিন হুযুর আমাকে পার্বত্য-চট্রগ্রামের পাহাড়ী জঙ্গলে যাওয়ার নির্দেশ করলেন। আদেশ মতে চলে গেলাম। হেদায়েত মোতাবেক পাহাড়-জঙ্গলের মধ্যে ঘুরে ঘুরে সেখানে বসবাসকারী মুষ্টিমেয় লোকদেরকে যারা ছিল সম্পূর্ণ মুর্খ, কলেমা, ওযু-গোসল, আযান-একামত, নামায ইত্যাদি শিক্ষা দিতাম। আর পাহাড়-জঙ্গল হতে তরি-তরকারী সংগ্রহ করে নিজ হাতে রান্না করে খেতাম। একবার আমি বেচাইন হয়ে পত্র লিখলাম, হুযুর, আমি আসলাম আপনার কাছে দ্বীন শিখতে, নিজের চরিত্র গঠন করতে, আর আপনি আমাকে সুদূর জঙ্গলে পাঠিয়ে দিয়েছেন। হুযুর লিখলেন, জঙ্গলের মধ্যে যরবের সাথে যিক্‌রে জাহেরী কর, গাছ-গাছড়া ও লতা-পাতাকে আল্লাহ্‌র যিকির শোনাও।

মাওলানা বলেন, একবার আমি হুযুরকে বললাম, রাস্তায় যখন হাঁটি, অনেক সময় মহিলাদের দিকে নজর যায়। এর কি প্রতিকার ? হুযুর বললেন, ফযলুর রহমান, হাটার সময় মাটির দিকে নজর রাখবে এবং এই মোরাকাবা (ধ্যান) করবে যে, আয় আল্লাহ্‌, এই ঘাস-পাতা ও মাটি তো আপনার বানানো, আপনার সৃষ্টি। এই ধ্যানের বরকতে চলার হালতে বস্তুত তুমি আল্লাহ্‌র যিকিরে মশগুল থাকবে। হুযুরের কথা মত সেদিন হতে আমল শুরু করলাম। আলহামদু লিল্লাহ্‌, জীবনে আর কোন দিন কোন মহিলার প্রতি নজর উঠে নাই।

মাওলানা বলেন, হযরত সদর সাহেব (রহঃ) বলতেন, দেখ, যারা বেদআত করে, তাদের মধ্যেও রসুলুল্লাহ্‌ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-ছাল্লাম-এর প্রতি মহব্বত আছে। কিন্তু বেচারারা সেই এশ্‌ক্‌ ও মহব্বতের সদ্ব্যবহার জানে না। তাই,

www.pathagar.com

এদেরকে কঠোরতার সাথে নয়; বরং মহব্বত ও দরদের সাথে সহীহ্ পথে ডাকা উচিত। এতে ফায়দা হয়। কঠোরতার দ্বারা তেমন ফায়দা হয় না।

মাওলানা বলেন, কোন বেদআতী হুযুরের নিকট আসলে হুযুর তাকেও দ্বীনের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য ফিকির করতেন। তিনি বলেন, একবার চট্টগ্রামের বেদআতে লিপ্ত মুসলমান-ভাইদের প্রধান-মুরব্বী শেরে-বাংলা আজিজুল হক সাহেব তার অনুসারীদেরকে নিয়ে হাটহাজারী মুঈনুল-ইসলাম মাদ্রাসার অদূরে একটি সম্মেলনের আয়োজন করলেন। সদর সাহেব (রহঃ) চট্টগ্রামে গেলেন এবং চট্টগ্রামের বিশিষ্ট কয়েকজন বুযুর্গ-আলেমকে ঐ সম্মেলনে অংশ গ্রহণের পরামর্শ দিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, আমরা তার কাছে গেলে আশা করি সে আমাদের সম্মান করবে এবং এতে করে ধীরে ধীরে তার ও আমাদের মধ্যকার দূরত্ব কমে আসার পথ সুগম হতে পারে। উক্ত বুযুর্গগণ এতে সম্মত হলেন না। তারা বললেন, ওখানে গেলে তারা আমাদের লাঞ্ছিত করতে পারে। তাই, আপনারও সেখানে যাওয়া কিছুতেই মুনাসিব হবে না। ওখানে শ্রদ্ধেয় বুযুর্গানের এ উক্তি অমুলক ছিলনা। কিন্তু হুযুর বললেন, আমাকে বাঁধা দিবেন না, আমি তো যাবই। অতঃপর হুযুর উক্ত সম্মেলনের স্টেজের নিকটে পৌঁছতেই শেরে-বাংলা তাকে দেখে দাঁড়িয়ে গেলেন, খুব সম্মান প্রদর্শন করলেন এবং তাকে বয়ানের জন্য অনুরোধ করলেন। সদর সাহেব (রহঃ) বয়ান করলেন। সেই বয়ান শুনে তারা অত্যন্ত মুগ্ধ হয়েছিল।

মাওলানা ফযলুর রহমান (রহঃ) বলেন, হযরত সদর সাহেব কেবলার মধ্যে একটা ব্যথা ছিল যে, হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (রহঃ) এর নিকট হতে যে রূহানী দৌলত তিনি নিয়ে এসেছেন কিভাবে তা যোগ্যপাত্রে পৌঁছাবেন। কিন্তু আশানুরূপ কোন গ্রহণকারী না পেয়ে তিনি ছটফট করতে থাকতেন। মাঝে-মাঝে ঢাকার কয়েক জন বিশিষ্ট আলেমের নাম নিয়ে বলতেন, ফযলুর রহ্মান, এরা কি আমার কাছে আসতে পারে না ? এদেরকে আমার কাছে আনার চেষ্টা কর না। সে মতে আমি তাদেরকে হুযুরের সোহবতে আনার চেষ্টা করলাম। কিন্তু তারা এদিকে তেমন আমল দিতেন না। বড়জোর মোলাকাত করতেন, দোয়া চাইতেন, কিন্তু সোহ্বতের ফয়েজ হাসিলের প্রতি আগ্রহান্বিত দেখা যেত না।

একদিন আমি বিশিষ্ট এক আলেমের নাম নিয়ে বললাম হুযুর, আপনি উনাকে কিছু (খাছ্ রূহানী ফয়েজ) দিয়ে দিন। হুযুর বললেন, যাও, তাকে ডেকে নিয়ে আস। অতঃপর তিনি আসলেন। বসলেন বটে, কিন্তু কোন অনুরাগ বা মনোযোগ ছিল না, বরং চলে যাওয়ার জন্য একটা অস্থিরতারভাব প্রকাশ পাচ্ছিল। তাই, হুযুরেরও কোন তাওয়াজ্জুহ্ হলোনা। চলে যাওয়ার পর বললেন, আমিতো দিতে

www.pathagar.com

চেয়েছিলাম, কিন্তু নিতে না চাইলে আমি কিভাবে দিব ? ইহা তো জোর করে দেওয়ার জিনিস নয়। যে চায় এবং নিজেকে মিটায়, এদৌলত সে-ই পায়। প্রসঙ্গক্রমে অধম প্রবন্ধকারের আরয, হাকীমুল-উম্মত হযরত থানভী (রহঃ) বলেন, মাশায়েখের মধ্যে সিল্‌সিলার খেদমতের অদম্য পিপাসা থাকা চাই, সিলসিলার আমানত পৌঁছানোর জন্য নেহায়েত আসক্তি থাকা চাই। হযরত সদর সাহেব (রহঃ) এর মধ্যে এগুণ কত যে পরিপূর্ণ ছিল, উক্ত ঘটনাবলী তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আমার প্রাণাধিক প্রিয় ওস্তাদ হযরত মাওলানা সালাহুদ্দীন সাহেব (রহঃ) প্রায়ই বলতেন যে, এছ্‌লাহে-নফছের খেদমত বা তরীকতের লাইনে চরিত্রগঠনের কঠিন ও নাযুক দায়িত্ব পালনের জন্য মনস্তাত্ত্বিক জ্ঞানে পারদর্শিতা অতি জরুরী। এবিষয়ে হযরত সদর সাহেব ছিলেন অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব। এ বিষয়ে এতপূর্ণ দ্বিতীয় আরেকজন দেখি নাই। হুযুর এক-এক জনকে এক-এক ভাবে তরবিয়ত করতেন।

অধম প্রবন্ধকারের আরয, আমার এক বিশিষ্ট ওস্তাদ যিনি লালবাগ মাদ্রাসার সুযোগ্য সন্তান এবং পরে উস্তাযুল-হাদীছ, তিনি আমাকে বলেছেন, লালবাগ মাদ্রাসায় পড়ার সময় একদিন আমি একটি ছাত্রকে এমন ভাবে মেরেছিলাম যে, তার মাথায় যখম হয়ে গেল। হুযুরগণ আমাকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নিচ্ছিলেন। সদর সাহেব (রহঃ) বলে উঠলেন, আপনাদের কথা বিলকুল ঠিক ও যুক্তিযুক্ত। কিন্তু আমি ভাবতেছি যে, এর এই অঘটনের মূল কারণ কি ? আমার মনে হয় এর মেধাশক্তি যতটা প্রখর, সেই-পরিমাণ খোরাক সে পায় নাই। ফলে ঐ শক্তিটা অপথে ব্যবহৃত হচ্ছে। তাই, আমি কিছুদিন ওকে পরীক্ষামূলক আমার সাথে রেখে দেখি, ওর মধ্যে কোন পরিবর্তন আসে কি না। হুযুরের কথায় সকলে খুব মুগ্ধ ও প্রস্তাবিত বিষয়ে সম্মত হলেন।

অতঃপর হুযুর একদিন আমাকে ডেকে বললেন, হে অমুক, যাও, এই উর্দু-কিতাবের এতটুকু বঙ্গানুবাদ করে নিয়ে আস। আমি তাই করলাম। হুযুর লেখাটা হাতে নিয়ে আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললেন, আচ্ছা! তুমি এত ভাল বাংলা জান ? আরে, আমি তো তা আদৌ জানতাম না। তোমার এ লেখা আমি সযত্নে আমার কাছে রাখবো।

আমার শ্রদ্ধেয় ওস্তাদজী বলেন, হুযুরের এরূপ প্রশংসা ও উৎসাহে আমার তরুণ-মনে আমি ভীষণ পুলকিত হলাম। কয়েক দিন পর হুযুর আমাকে ডেকে বললেন, অমুক ! দেখ তো তোমার লেখার এই শব্দটির স্থলে তুমি হয়তঃ এই-এই শব্দও লাগাতে পার। দেখ তো কোন্‌টা বেশী সুন্দর লাগে ? আমি বললাম, হুযুর, এইটা (নতুনটা)। হুযুর বললেন, তাহলে তোমার হাতে তুমি আগেরটা কেটে এটা দাও। নির্দেশ মোতাবেক আমি তাই করলাম। এভাবে মাত্র কয়েকটি শব্দের বা

www.pathagar.com

লাইনের পরিবর্তন ঘটাল এবং বললেন, যাও এবার পরিষ্কার করে লিখে নিয়ে আস। আনলাম। হুযুর হাতে নিয়ে খুব খুশীতে বললেন, দেখ তো, এখন কত সুন্দর লাগে। আচ্ছা যাও। এভাবে আরেক দিন। আবার আরেক দিন এবং ঐ দিন একই কাজ, একই ঢঙে করালেন। সর্বশেষ ফ্রেশ-কপি যেদিন তৈরী করালেন, হাতে নিয়ে দারুন আনন্দের সাথে নাম নিয়ে বললেন, অমুক, তোমার এ লেখা কত যে সুন্দর হয়েছে ! এটি আমি আজাদ-পত্রিকায় দেবো। অতঃপর হুযুর কাগজের পাশে ইংরেজীতে কি যেন লিখে দিয়ে বললেন, মাওলানা আকরাম খাঁর কাছে নিয়ে যাও। যাওয়ার পথে মনের দ্বন্দ্ব নিরসনের জন্য আমি এক ইংরেজী-শিক্ষিত লোককে দেখিয়ে বললাম যে, এর অর্থ কি? সে বলল, এর অর্থ, উদীয়মান এই তরুণ-ছেলেটির এ লেখা অবশ্যই আপনি আপনার পত্রিকায় ছাপবেন। নতুবা ওর মন ভেঙ্গে যাবে। যাক, আমি তা মাওলানার হাতে দিলে তিনি ইংরেজীটুকু পড়ে বললেন, লেখা আগামী কালই ছেপে বের হবে। উল্লেখ্য যে, আমার পরম-শ্রদ্ধেয় ওস্তাদ, উপমহাদেশের বিখ্যাত আলেম, শায়খুল হাদীছ হযরত মাওলানা আজিজুল-হক সাহেব দামাত্-বারাকাতুহুম বলেন যে, যদিও কতিপয় বিষয়ে সদর সাহেব হুযুর ও মাওলানা আকরাম খাঁর মধ্যে বিরোধিতা ছিল, এতদসত্ত্বেও তাঁরা পরস্পরের প্রতি খুবই শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং তাদের মধ্যকার সম্পর্ক ছিল খুবই চমৎকার।

যাই হোক, মাওলানা বলেন, আমি গিয়ে সদর-সাহেব (রহঃ)-কে অবহিত করলাম। বললেন, কাল সকালে পত্রিকা এনে আমাকে দেখাবে। খুব সকালে গিয়ে পত্রিকায় লেখা পেয়ে আমি তো খুশীতে আটখান। সেই যুগের দৈনিক আজাদই ছিল সর্বাধিক বাজারপ্রাপ্ত পত্রিকা। হুযুরের হাতে এনে দিতেই হুযুর খুশীতে বাগবাগ হয়ে গেলেন। বললেন, হে অমুক, দেখ, তোমার লেখা পত্রিকায় এসে গেছে। তুমি একজন লেখক, উদীয়মান সাহিত্যিক। হুযুরের কথা শুনে আমার বুকের সাহস বহুগুণে বেড়ে গেল। অতঃপর আমি যখন বড় হলাম তখন একদিন আমার খেয়াল হল, আরে, সেই লেখার মধ্যে পরিবর্তন -পরিবর্ধন করতে-করতে অবশেষে তা তো প্রায় হুযুরেরই লেখায় পরিণত হয়েছিল। কিন্তু হুযুরের সেই গভীর প্রজ্ঞাময় আচরণের ফলে সেদিন আমি তা আদৌ বুঝতে পারিনি। কিন্তু তাঁর সে দিনের সেই দোয়া ও উৎসাহ দানেরই বরকতে আজ আমিও দুই-কলম লিখি। অধম প্রবন্ধকারের আরয, আমার উক্ত ওস্তাদের লেখা ধর্মীয় যে কোন পত্রিকায় পাঠালে তা সাদরে গৃহীত ও প্রকাশিত হয়। তাঁর স্পষ্ট সম্মতি ব্যতীত এই ঘটনায় আমি তাঁর নাম প্রকাশ করতে পারলাম না।

হযরত সদর সাহেব (রহঃ) একটি মানুষকে পূর্ণ-মানুষ রূপে গড়ে তোলা

www.pathagar.com

জন্য খুঁটি-নাটি বিষয়াদিসহ সর্ব-বিষয়েই তরবিয়ত করতে থাকতেন। হুযুরের দ্বিতীয় সাহেবজাদা বন্ধুবর হাফেয মাওলানা রূহুল আমীন সাহেব (যিনি করাচীর আরেফবিল্লাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার সাহেব দামাত বারাকাতুহুম-এর খলীফা) একবার আমাকে বলেছিলেন যে, আমি যখন কিশোর-বয়সে তাইছীরুল-মোবতাদী ইত্যাদি পড়ার জন্য লালবাগ-মাদ্রাসায় আসলাম, আমি হযরত মাওলানা সালাহুদ্দীন সাহেব (রহঃ) এর নেগরানীতে ছিলাম। একদিন আমি ধাক্কা দিয়ে দরজা খুলে কামরায় প্রবেশ করলাম। দরজাকে আমি পূর্ববৎ বন্ধ করে রাখিনি। হুযুর বললেন, দরজার আদব কি? আমি কিছুই বলতে পারলাম না। হুযুর বললেন, দরজার আদব হলো, প্রবেশের সময় যে অবস্থায় ছিল, ঐ অবস্থায় রেখে দেওয়া, খোলা থাকলে খোলা, বন্ধ থাকলে বন্ধ। এ আদব আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন হযরত সদর সাহেব (রহঃ)। তোমার পিতার এই আমানত আজ তোমার কাছে পৌঁছে দিলাম।

অধম প্রবন্ধকারের আরয, আমার ছাত্র জীবনে একবার হুযুরের কামরায় প্রবেশের সময় অনুরূপ ভুল আমিও করেছিলাম। তখন হুযুর এভাবেই আমাকে এ আদব শিক্ষা দিয়েছিলেন। এতে মনে হয় যে, হুযুরের শিক্ষা-দীক্ষায় অনুসৃত পদ্ধতির মধ্যে প্রকৃতপক্ষে অধিকাংশই সদর-সাহেব (রহঃ)-এর শিক্ষা-দীক্ষাই প্রতিফলিত হতো।

ছাত্র-শিক্ষক-সাধারণ মানুষ নির্বিশেষে সকলের জন্যই তিনি ছিলেন আদর্শ দীক্ষা-গুরু। গওহারডাঙ্গা মাদ্রাসার এক ওস্তাদ ছিলেন হযরত মাওলানা আশরাফ আলী সাহেব (কলাখালী হুযুর)। তাঁরই শিষ্য (করাচীর হযরতের খলীফা) বন্ধুবর মাওলানা জাফর আহ্মদ সাহেব আমাকে শুনিয়েছেন যে, ওস্তাদদের কেউ-কেউ সদর-সাহেব (রহঃ)-কে অবহিত করেছিলেন যে, কলাখালী-হুযুর ছাত্র-শিক্ষকদেরকে এত হাসান যে, এক-একজন হাসতে-হাসতে শেষ। একজন ওস্তাদের জন্য ছাত্রদের সম্মুখে যেরূপ গাম্ভীর্য থাকা উচিত, তাঁর এ আচরণ তার বিপরীত মনে হয়। সদর সাহেব (রহঃ) বললেন, আচ্ছা, আমি তাকে তাম্বীহ্ (সতর্ক) করে দিব। খবর দিলে তিনি হুযুরের কামরার দিকে আসছিলেন। তার আগমনের ভঙ্গী এবং এসে যেভাবে ছালাম করেছেন তা দেখে সদর সাহেব হুযুরও হাসি সামলাতে পারেননি। অন্য সবাই তো হেসে কুট্‌কুট্। অতঃপর হুযুর তাকে বললেন, আপনি চলে যান এবং অন্যদেরকে বললেন, এটাতো তার স্বাভাবিক আচরণ এবং তা কোন দূষণীয় বিষয় নয়, এ বিষয়ে উনি মাযুর (অপারগ ও দায়মুক্ত)। এভাবে প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁর জীবন ছিল উচ্চ-আখলাকের দৃষ্টান্ত ও অনুসরণীয়।

www.pathagar.com

মাওলানা ফযলুর রহমান সাহেব (রহঃ) বলেন, একবার আমি গওহারডাঙ্গা হতে হুযুরের সঙ্গে নদীপথে ঢাকা আসছিলাম। সঙ্গে টিফিন-বাটিতে করে দু'জনের (পরিমাণ) ভাত নিলাম এবং সিদ্ধ-বেগুন ও সিদ্ধ-পিয়াজ। পানির-জাহাজের মধ্যে ঐ বেগুন ও পিয়াজ দিয়ে ভর্তা তৈরী করলাম। হুযুর তা দিয়েই খানা খেলেন। আমি (প্রবন্ধকার) মাওলানাকে জিজ্ঞাসা করলাম পিয়াজ সিদ্ধ করে আনার কারণ ? তিনি বললেন, যেহেতু হাদীছ শরীফে কাঁচা-রসুন-পিয়াজ খেতে নিষেধ করা হয়েছে সেজন্যে হুযুর এতটা সতর্কতা অবলম্বন করতেন।

এ প্রসঙ্গে অধমের আরয এই যে, হুযুর কত বেশী আশেকে রাসূল ও আশেকে-সুন্নত ছিলেন, এ ঘটনা থেকেই তা সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয়। বস্তুতঃ আল্লাহ ও আল্লাহ্‌র রাসুলের প্রতি যার প্রেমাসক্তি যত বেশী, তার নজরে ঐ প্রিয়জনের সম্বন্ধযুক্ত ছোট-ছোট বস্তুও তত বড় মনে হয়। কারণ, তার নযর থাকে ঐ সম্বন্ধের উপর। এ প্রসঙ্গে হুযুরের একটি আশ্চর্য ঘটনা।

হযরত মাওলানা ফযলুর রহমান সাহেব (রহঃ) আমাদেরকে শুনিয়েছেন যে, একবার হযরত সদর সাহেব (রহঃ) আমাকে হজ্জে পাঠানোর ব্যবস্থা করলেন। হজ্জ শেষে আমি হারামে কাবার জনৈক ঝাড়ুদারকে বড় অনুনয়-বিনয়ের সাথে বললাম, ভাই , দয়া করে তুমি আমাকে (হারামে ব্যবহৃত, বর্তমানে অব্যবহারযোগ্য যা ফেলে দেওয়া হবে এমন) একখানা ঝাড়ু দাও। সে বলল, এটা মুশকিল ব্যাপার। এখানের কোন পুলিশ দেখতে পেলে তুমি-আমি উভয়ই বিপদগ্রস্ত হবো। আমি নাছোড় হয়ে ধরলাম এবং খুব মিনতির সাথে পীড়াপীড়ি করতে থাকলাম। আমার অবস্থা দেখে তার দয়া হল এবং বলল, ভাই, খুব সতর্ক ভাবে নিও। আমি তা অতি যত্নে ও অতি গোপনে নিজ গাঠ্‌ড়ী-বোচকার একদম ভিতরে রেখে দিলাম।

ঢাকা এসে শুনলাম, হুযুর গওহারডাঙ্গায়। মনকে মানাতে পারলাম না। নিজ বাড়ী মাদারীপুর (বাঁশগাড়ী) না গিয়ে সোজা হুযুরের নিকট চলে গেলাম। সালাম-মোসাফাহা ইত্যাদির কিছুক্ষণ পর বললাম, হুযুর, আমি কা'বা শরীফ হতে আপনার জন্য একটা হাদিয়া এনেছি। হুযুর বললেন, আচ্ছা, কি এনেছ ? বললাম হুযুর, হারাম শরীফের খাদেমের নিকট হতে হারাম শরীফে ব্যবহৃত একখান পুরানা পিছা (ঝাড়ু) চেয়ে নিয়ে এসেছি। এই কাপড়ে মোড়ানো পিছা খানা বে করে হুযুরকে দিলাম।

হুযুর ভীষণ খুশী হয়ে বললেন, আহা, বড় দামী জিনিস এনেছ আমার জন্য এই বলে হাতে নিয়ে ঐ পিছাতে চুমু খেলেন, চোখে,মুখে ও বুকে লাগালেন। এ বলে মাওলানা ফযলুর রহমান সাহেব কেঁদে উঠলেন।

www.pathagar.com

আহ্, কি দেওয়ানা-মানুষ ছিলেন হযরত সদর সাহেব হুযুর। কদমে কদমে সুন্নত-শরীঅতের উপর অটল জীবনের অধিকারী এ মানুষটির অন্তরে কি পরিমাণ এশ্‌ক্‌ ও মহব্বত ছিল মাহবুবে-হাকীকীর জন্য! সুন্নতের আশেক, কোরআন পাকের আশেক সদর সাহেব হুযুরের আরও কয়েকটি ছোট্ট ঘটনা।

হুযুরের ছোট সাহেবজাদা মাওলানা রূহুল আমীন সাহেব আমাকে বলেছেন যে, আমি যখন খুব ছোট, আব্বাজী আমাকে মক্তবে কোরআনে পাক পড়তে দিলেন, তখন গওহারডাঙ্গার জনৈক হাফেয সাহেব হুযুর বললেন, খুব ছোট্ট ছেলে, তাই, প্রথমে ওকে কিছু দিন বাংলা ইংরেজী পড়িয়ে নেওয়া যেত। আব্বাজী বললেন, দেখুন, এ অবস্থায় যদি আমার মৃত্যু হয়,আর আল্লাহ্‌পাক আমাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, শামছুল হক, বৃদ্ধ-বয়সে তোমাকে একটি পুত্র সন্তান দান করেছি। তুমি তাকে কি কাজের মধ্যে রেখে এসেছ ? তখন আমি কি উত্তর দিব ? তাই, আমি ওকে আল্লাহ্‌র কোরআন পড়তে দিলাম, যেন আমি বলতে পারি যে, আয় আল্লাহ্‌, আমার বাচ্চাটাকে আমি আপনার কোরআন পড়তে দিয়ে এসেছি। এর পনের দিন পর আব্বাজী ইন্তেকাল করেন।

মাওলানা বলেন, একদিন আব্বাজী আমাকে কোলের মধ্যে নিয়ে বসে ছিলেন। বড় ভাই (হাফেয মাওলানা ওমর সাহেব, খলীফায়ে হযরত ওয়ালা-করাচী) আব্বাকে মুখস্থ কোরআন শরীফ শুনাচ্ছিলেন। পড়া শেষ হওয়ার পর আব্বাজী আমাকে বললেন, আব্বু, বল তো, আমি বড়, নাকি তোমার মিয়া-ভাইজান বড় ? আমি বললাম, কেন আব্বাজী ? আপনি বড়। আব্বাজী বললেন, না, না, আমি বড় না, তোমার মিয়া ভাইজানই বড়। কারণ, সে হাফেয, আর আমি হাফেয না।

আহ্ ! পবিত্র কোরআনের প্রতি কি আসক্তি, কি যে ভক্তি-শ্রদ্ধা ! ইংরেজী ১৯৮০ সালের ঘটনা। আমার (প্রবন্ধকারের) পীর ও মোর্শেদ আরেফ্‌বিল্লাহ্‌ হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার সাহেব দামাত্-বারাকাতুহুম আমার মহামান্য ওস্তাদ, বিশ্ববিখ্যাত বুযুর্গ হযরত হাফেজ্জী-হুযুর (রহঃ)-এর দাওয়াতে ঢাকায় শুভাগমণ করেন এবং হুযুরের প্রতিষ্ঠিত কামরাঙ্গির চর মাদ্রাসায়ে নূরিয়ায় অবস্থানের এন্তেযাম করা হয়। করাচীর হযরত রোজ বয়ান করতেন, হযরতের পার্শ্বেই তশরীফ রাখতেন হযরত হাফেজ্জী হুযুর (রহঃ)। মজলিসে থাকতেন বড় বড় ওলামা ও মোহাদ্দেছীন যাঁরা ছিলেন হুযুরের ভক্ত ও মুরীদান। যেমন, সিলেটের জনাব কাজী ইব্রাহীম সাহেব, লালবাগের হযরত মাওলানা আবদুল মজীদ ঢাকুবী হুযুর (রহঃ), ফরিদপুরের মুফতী আবদুল বারী সাহেব প্রমুখ। এ অধমও একজন ছালেক হিসাবে তখন সেখানে অবস্থানরত ছিলাম। একদিন ভরা-

www.pathagar.com

মজলিসের মধ্যে হযরত হাফেজ্জী হুযুর (রহঃ) করাচীর হযরতকে সম্বোধন করে এ ঘটনা শুনাচ্ছিলেন।

এক বয়ানের ঘটনা। আমি এবং আমার বড় ভাই (এটি ছিল শ্রদ্ধা-সূচক সম্বোধন) মাওলানা শামছুল হক সাহেব (রহঃ) থানাভবনে হযরত হাকীমুল উম্মত থানভী (রহঃ) এর সোহ্বতে ছিলাম। হযরতের মসজিদে হযরতেরই হুকুমে আমি তারাবীহ পড়াতাম। একদিন মাওলানা শামছুল হক সাহেব (রহঃ) আমাকে বললেন, তারাবীতে তুমি কোরআন শরীফ এত অল্প পড় যে, তাতে প্রাণ ভরে না। আরও বেশী পড়বে। পরের দিন আমি বেশী করে পড়লাম। তারাবীর পর হযরত থানভী আমাকে ডাকলেন এবং খুব রাগ করলেন। কেন তুমি আজ এত বেশী পড়েছ ? এতে দুর্বল মুছল্লীদের কষ্ট হয় নি ? কার হুকুমে তুমি এই কাজ করেছ? আমি বললাম, হযরত, আমার বড় ভাই মাওলানা শামছুল হক সাহেব আমাকে এরূপ বলেছেন। তিনি বললেন, ডাক শামছুল হককে। তাঁকে বললেন, কেন তুমি মোহাম্মদুল্লাহ্‌কে এরূপ বলেছ ? তিনি বললেন, হযরত, কোরআনের অল্প কিরাআতে আমার প্রাণ ভরছিল না, তাই। হযরত তাকেও খুব রাগ করলেন এবং বললেন, যাও, উভয়ে (থানা ভবনের) কবরস্থানে গিয়ে একজন ইমাম হও, আরেক জন মোক্তাদী হও। এভাবে রাতভর মনের সাধ মিটাও। হযরতের হুকুম ছিল অলংঘনীয়। তাই, আমরা দু'জন জঙ্গলময় অনাবাদ কবরস্থানে চলে গেলাম। আমি নামাযে তেলাওয়াত শুরু করলাম আর উনি মোক্তাদী হলেন।

ওদিকে উভয় আম্মাজান (হযরত থানভীর পত্নীদ্বয়) আমাদের উভয়কে জানতেন এবং খুবই স্নেহ করতেন। হযরত গিয়ে তাঁদেরকে জানালে তাঁরা হযরতের উপর রেগে গেলেন এবং বললেন, বাচ্চা দুইটা সারাটা দিন রোযা রেখেছে, তারাবীহ্ পড়ে এখন খানা খাবে আর আপনি ওদেরকে এই শাস্তি দিয়েছেন ? হযরত বললেন, শাস্তি দিয়েছি আমি, তোমরা তো দাও নাই। তোমরা যদি তাদের জন্য খানা পাঠাতে চাও তবে সেটা তোমাদের ব্যাপার।

এদিকে আমরা ঐ অবস্থাতেই এক সময় হঠাৎ শুনতে পেলাম যে, কোন একটা লোক আওয়াজ দিতেছে, হ্যায় কেছী কো রোটি কী যরূরত? (রুটি লাগবে কারুর?) আমরা ভাবলাম, সওয়াল করা তো নিষেধ, কিন্তু, যরূরত থাকা অবস্থায় খোদ-বখোদ এসে গেলে তা গ্রহণে তো কোন দোষ নাই। তদুপরি, মনে হয় হযরতের বরকতে গায়েব হতে এই খানা পাঠানো হয়েছে। তাই, আমরাও আওয়াজ দিয়ে বললাম, হাঁ, হামে হ্যায় রোটি কী যরূরত (আমাদের রুটি দরকার)। লোকটি আমাদের রুটি দিয়ে চলে গেল। অবশ্য পরে আমরা জানতে পেরেছিলাম যে, আসলে আম্মাজানদের পক্ষ হতে স্বয়ং হযরত থানভী (রহঃ

www.pathagar.com

একটি লোকের মাধ্যমে ঐ রুটি পাঠিয়েছিলেন এবং এভাবে আওয়াজ দেওয়ার জন্য বলে দিয়েছিলেন।

এই ঘটনায় সদর সাহেব (রহঃ) ও হাফেজ্জী হুযুর (রহঃ) এর কোরআনের প্রতি কি অপরিসীম অনুরাগ প্রকাশ পায়। সেই সঙ্গে ইছলাহের ফিকির ও শায়খের আনুগত্যের প্রতি কি বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত তারা স্থাপন করে গেছেন।

প্রশ্ন হয় যে, সদর সাহেব (রহঃ) এর মধ্যে এ মহৎ ও আদর্শ জীবন কোত্থেকে পয়দা হয়েছিল? আসলে তিনি তাঁর অনুপম এ আদর্শ জীবন অর্জন করেছিলেন হাকীমুল উম্মত, মুজাদ্দিদুল মিল্লাত হযরত থানভী (রহঃ) এর সোহবত ও তরবিয়তের মাধ্যমে।

মাওলানা ফযলুর রহ্‌মান সাহেব (রহঃ) বলেছেন, প্রত্যেক বৃহস্পতিবার তিনি দারুল উলূম দেওবন্দ হতে পায়ে হেঁটে সুদূর থানাভবনে হযরত থানভীর সোহবতে চলে যেতেন। অতঃপর যথা সময়ে ফিরে এসে সবকে শরীক হতেন। পড়াশুনার প্রতি তিনি অত্যন্ত মনোযোগী ছিলেন। আমার ওস্তাদ হযরত মাওলানা ছালাহুদ্দীন সাহেব (রহঃ) ও হযরত ঢাকুবী হুযুর (রহঃ) বলেন যে, দারুল উলূম দেওবন্দের জীবনে সদর সাহেব (রহঃ) কিতাবাদি এত বেশী পড়তেন যে,তার নাম পড়ে গিয়েছিল কুতুবখানা কা কীড়া (কুতুব খানার পোকা, যা কিতাব ভক্ষণে মশগুল থাকে)। অদম্য এই ইল্‌মী পিপাসা ও অধ্যবসায়ের পাশাপাশি ইছলাহে-নফছের সাধনার প্রতিও তিনি ছিলেন গভীর মনোযোগী ও যারপর নাই অনুরাগী।

হাকীমুল ইসলাম হযরত কারী তৈয়্যেব সাহেব (রহঃ) বাংলাদেশে আসলে মাঝে মাঝে একটি ঘটনা বলতেন যে, "বাংলাদেশের একজন তালেবে এল্‌ম ছিল। সে দেওবন্দে লেখাপড়া করত। বহুদিন পর্যন্ত যোহরের নামাযের সালামের পরপরই দাড়িয়ে এ'লান করত, ভাইসব, আমার মধ্যে অহংকারের বীমারী (রোগ) আছে, আপনারা সকলে দোআ করুন যেন আল্লাহ্‌পাক আমাকে এই বীমারী থেকে নাজাত দান করেন। সেই তালেবে এল্‌মের নাম মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী।

আসলে যে নিজেকে যতটা শায়েখের হাতে ন্যস্ত করে, শায়েখ্‌ তাকে খাঁটি রূপে গড়ে তোলার জন্য তত বেশী সুযোগ পান। উপরোক্ত ঘটনায় সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয় যে, সদর সাহেব (রহঃ) নিজেকে হযরত থানভীর হাতে কতটা ন্যস্ত করেছিলেন। হযরত থানভীও তার প্রতি কিরূপ আস্থাশীল ও স্নেহশীল ছিলেন। শায়খ্‌ যার প্রতি খুব আস্থাশীল না হন তার জন্য এরূপ তিক্ত-চিকিৎসার ব্যবস্থা সাধারণতঃ করেন না। বস্তুতঃ সেদিনের সেই তিক্ত-চিকিৎসা পরবর্তীতে তাকে মর্যাদার সুউচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করেছিল। যদিও তিনি এসেছেন এই যুগে, কিন্তু

www.pathagar.com

তাঁর জীবনটা ছিল ছলফে-ছালেহীনের জীবন্ত নমুনা।

মোমেনশাহীর বিখ্যাত বুযুর্গ হযরত মাওলানা ফয়যুর রহ্‌মান সাহেব (রহঃ) একবার এ অধমকে মোমেনশাহী বড় মসজিদের সম্মুখে বলেছিলেন যে, ছাত্রজীবনে আমি ছিলাম এক মসজিদের ইমাম। সদর সাহেব (রহঃ) থানাভবন যাওয়ার সময় একদিন আমার মসজিদে গিয়ে উঠলেন। বড় খুশী হলাম। নামাযের পর খাওয়ার সময় আর তাঁকে খুঁজে পাইনা। তালাশ করতে করতে সিঁড়ি বেয়ে মসজিদের ছাদে গিয়ে দেখি, তিনি কতগুলো রুটির টুকরা রোদে শুকাচ্ছেন। দেওবন্দ মাদ্রাসার বোর্ডিং হতে যে রুটি খেতে দেওয়া হতো তিনি তা থেকে কিছু পরিমাণ শুকিয়ে রেখে দিতেন। থানাভবন খান্‌কায় অবস্থান কালে পানিতে ভিজিয়ে ভিজিয়ে তাই খেয়ে ক্ষুধা মিটাতেন। যাক, আমাকে দেখে তিনি বিচলিত বোধ করলেন এবং কসম দিয়ে বললেন যে, আমার জীবদ্দশায় কারো কাছে তুমি এই ঘটনা বলবে না। তাই তাঁর জীবদ্দশায় আমি এ ঘটনা প্রকাশ করি নাই। আমি বললাম, আমার খাওয়ার জন্য দুইটি রুটি এসেছে। আসুন, আমরা দুই ভাইয়ে তা ভাগ করে খেয়ে নিই। তিনি তাতে রাজী হলেন না। আমি বললাম, আপনি এত কষ্ট কেন করেন ? হযরত থানভীকে অবহিত করলে তিনি নিজেই তো অভাবগ্রস্তদের খানার ব্যবস্থা করেন। তিনি বললেন, কষ্ট ছাড়া অন্তরে আল্লাহ্‌র মহব্বত-মা'রেফাতের কদর পয়দা হয় না।

সদর সাহেব (রহঃ) এর আরেকটি ঘটনা শুনেছি আমার প্রাণপ্রিয় ওস্তাদ হযরত মাওলানা সালাহুদ্দীন সাহেব (রহঃ) এর যবানে। তিনি বলেন, একবার হযরত সদর সাহেব (রহঃ) বলেছেন যে, দারুল উলুম দেওবন্দে আমার এক ওস্তাদ ছিলেন হযরত মাওলানা মোর্তাজা হাছান (রহঃ)। তিনি ছিলেন জামেউল মাকুলাত ওয়াল মান্‌কুলাত। তার সম্পর্ক ছিল হযরত থানভীর সাথে। একদিন আমি তাঁর গলায় একটি তাবিজ ঝুলানো দেখতে পেলাম। আমি বললাম, হযরত, যদি অনুমতি দান করেন তবে আমি আপনাকে একটি বিষয় জিজ্ঞাসা করতে চাই। বললেন, বল, কি বলতে চাও। বললাম, হযরত, আপনি এত বড় আলিম, তদুপরি হযরত থানভীর সোহবতপ্রাপ্ত, অথচ, আপনার গলায় তাবিজ ? ওখানে তো তাবিজের এত গুরুত্ব নাই। তিনি আমাকে ধমক দিয়ে বললেন, তোমার খামাখা প্রশ্ন করার অভ্যাস। আমি বললাম, হযরত, দয়া করে আমাকে মাফ করে দিবেন। আসলে আমার প্রশ্ন করার কারণ হল, আপনি আমার ওস্তাদ। আপনাকে আমি অন্তর দিয়ে শ্রদ্ধা করি। কিন্তু আমার অন্তরে যখন এরূপ প্রশ্ন দেখা দিল, তখন আমার ভয় হল যে, এরূপ ধারণার ফলে আমার কোন ক্ষতি না হয়ে যায়। তাই নিজেকে ক্ষতি হতে বাঁচানোর জন্য আমি এ প্রশ্ন করতে বাধ্য হয়েছি।

www.pathagar.com

আমার কথা শুনে তিনি খুব খুশী হলেন। অতঃপর তিনি বললেন, মিয়া, এই তাবিজ লট্‌কানোর একটা কারণ আছে। আমি বললাম, হ্যরত, কি কারণ ? তিনি ধমক দিয়ে বললেন, তুমি বড় তাড়াহুড়াকারী। আমি নিজেই তো বলছি। তারপরও তুমি কেন জিজ্ঞাসা করতেছ ? আমি চুপ হয়ে গেলাম। অতঃপর তিনি বললেন, আসল ব্যাপার এই যে, একবার হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (রহঃ) একটি অতি দামী কথা বলেছিলেন, তাআল্লুক মাআল্লাহ্ দৌলতে-আজীম হ্যায়,আওর তরীক্ উছ্‌কা দাওয়ামে-তাআত আওর কাছ্‌রতে যিকির হ্যায় (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সাথে নিবিড় সম্পর্ক লাভ অনেক বড় দৌলত এবং অর্জনের পথ হলো সর্বদা আল্লাহ্‌র আহ্‌কাম পালন ও বেশী-বেশী যিকির করা)।

হযরতের এই বাণীটি এত বেশী গুরুত্বপূর্ণ যে, হামেশা তদনুযায়ী আমলের জন্য সর্বদা তা স্মরণ রাখা দরকার। সেজন্যই আমি তাবিজ রূপে লিখে তা গলায় ঝুলিয়ে রেখেছি, যাতে সর্বক্ষণ স্মরণে থাকে ও আমলের তওফীক হয়।

আমার ওস্তাদ, হযরত মাওলানা আব্দুল মজিদ ঢাকুবী হুযুর (রহঃ) শিক্ষা জীবন শেষে মা'রেফাত ও তরীকতের জ্ঞান আহরণের পর দেশে ফিরে আসেন। দেশে ফিরে এলাকার ইসলাম প্রিয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সহায়তায় দ্বীনি শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে প্রাথমিক পর্যায়ে গ্রামে একটি ফোরকানিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার উদ্বোগ গ্রহণ করেন। স্থানীয় লোকদের পক্ষ থেকে আশাতীত সাড়া পেয়ে দ্বিগুন উৎসাহ নিয়ে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন। অতি অল্প দিনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছাত্র যোগাড় হয়ে যায়। সেই সাথে ঘরের ব্যবস্থা করতেও কোন বেগ পেতে হয়নি। সব শেষে এই মাদ্রাসার নাম কি হবে তার চূড়ান্ত ফয়সালায় পৌঁছতে না পারায় সিদ্ধান্ত হয় যে, ঢাকা যেয়ে সদর সাহেবের পরামর্শ অনুযয়ী নাম ঠিক করে আনাই উত্তম।

এ প্রসঙ্গে ঢাকুবী হুযুর বলেন, কার্যতঃ নতুন মাদ্রাসার নাম নেওয়ার জন্য জিঞ্জিরাস্থ হাফেয হুসাইন সাহেবের মসজিদে সদর সাহেবের খেদমতে উপস্থিত হই। রাতে হুযুরের সাথে দেখা হলেও মূল বিষয়ে তাফসীলী আলোচনার সুযোগ হয়নি। শেষ রাতে তাহাজ্জুদ নামাযের পর তিনি নিজেই আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন— আব্দুল মাজীদ! 'এখন কি করবে স্থীর করেছ?' বললাম— 'দেশে একটা ফোরকানিয়া মাদ্রাসার ব্যবস্থা করে এসেছি। এর জন্য একটি সুন্দর নাম রেখে দিন।' হুযুর কিছু না বলে চুপ করে গেলেন।

পরের দিন এ বিষয়ে কোন কথা নেই। শেষ রাতে তাহাজ্জুদের পরে আবার প্রশ্ন করলেন— কি করবে মনস্থ করেছ? বললাম— 'মাদ্রাসা শুরু করে নাম ঠিক

www.pathagar.com

করার উদ্দেশ্যে আপনার খেদমতে হাজির হয়েছি।' হুযুর চুপ করে গেলেন। আগের মত আজও দিনের বেলায় নীরব রইলেন। তৃতীয় রাতেও তাহাজ্জুদের পরে একই প্রশ্ন।

এতক্ষণে আমার হুঁশ হল। মনে হল, কোথায় যেন ভুল হয়ে যাচ্ছে। নিজের মত প্রকাশ না করে বরং হুযুরের পরামর্শ কামনা করাই বাঞ্ছনীয় ছিল। তাই পূর্ব কথা বাদ দিয়ে বললাম— কি করব হুযুর পরামর্শ দিন। এবার হুযুরের চেহারা মোবারকে হাসি ফুটে উঠল। বললেন— 'পরের জুতা পাহারা দিয়ে নিজের টাকার গাট্টি হারিয়ে ফেলা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। ফোরকানিয়া চালানোর মত লোকের অভাব নেই। এর জন্য বহুলোক রয়েছে। তোমার কাজ হাদীস তফসীর পড়ানো।' (আল্লাহু আকবার, আল্লাহওয়ালা বুযুর্গানে দ্বীনের উক্তি কী অর্থবহ আর কতইনা তত্ত্বপূর্ণ হয়ে থাকে)। আমি বললাম— 'সে সুযোগ কোথায়? হুযুর বললেন— গওহারডাঙ্গা আমার বাড়ীর মাদ্রাসায় গিয়ে হাদীস পড়ানো শুরু কর।' আর কথা কি? বাড়ী যেয়ে বাবাকে বিস্তারিত ঘটনা বলে গওহারডাঙ্গা রওয়ানা দিলাম।

আমার ওস্তাদ, লালবাগ মাদ্রাসার প্রবীণ মোহাদ্দেছ হযরত মাওলানা আবদুল মজীদ সাহেব ঢাকুবী-হুযুর (রহঃ) বলেছেন যে, একবার আমি সদর সাহেব (রহঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, দরছী-কিতাব পড়ানোর দ্বারা কি আল্লাহ্র সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি করা যায় না? তিনি বললেন, অবশ্যই। তবে, আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য পড়াচ্ছি, এই নিয়ত রাখতে হবে। আমার ওস্তাদ, উপমহাদেশের বিখ্যাত আলিম শায়খুল হাদীছ হযরত মাওলানা আজিজুল হক সাহেব দামাত বারাকাতুহুম একবার আমাদেরকে শুনাচ্ছিলেন যে, আমি যখন মাওলানা শাব্বীর আহ্মদ ওসমানী (রহঃ)-এর নিকট ডাভেলে হাদীছ পড়তেছিলাম, তখন আমার আব্বা লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করতেন যে, ভাই, তোমার ছেলে বিলাতে পড়ে, তুমি তার জন্য মাসে কত টাকা পাঠাও ? উত্তর শুনে আব্বা বলতেন, আমার ছেলেকে আমি দ্বীনী এল্ম শিক্ষা করতে পাঠিয়েছি, তাই বেশী না হোক, কমপক্ষে এই-পরিমাণ টাকা প্রতি মাসে ওর জন্য পাঠাবো এবং আব্বা তাই করতেন । আমার আব্বা আলেম ছিলেন না, তবে দ্বীন্দার ছিলেন। আব্বার ইন্তেকালের পর আমি যখন খুবই শোকাহত, তখন সদর সাহেব (রহঃ) আমাকে ডেকে বললেন, আজিজুল হক, আল্লাহ্পাক আপন দয়ায় তোমার আব্বাকে ছিদ্দিকীনের মর্তবা দান করেছেন।

এই ঘটনার দ্বারা বুঝা যায় যে, সদর সাহেব (রহঃ) কাশ্ফ্ বা এলহামের দ্বারাই এই ধারণা ব্যক্ত করেছেন। কারণ, কোন ওলীর নিকট ওহী আসে না,

www.pathagar.com

ওলীদের প্রতি এল্হাম হয়। কাশ্ফ্ও হয়ে থাকে। যদিও কাশ্ফ্-কারামত ওলী হওয়ার জন্য আদৌ জরুরী নয়।

আল্লাহ্র যিকিরের প্রতি তিনি যারপর নাই আসক্ত ছিলেন। মাওলানা ফযলুর রহ্মান সাহেব (রহঃ)-এর মুখে বহুবার শুনেছি যে, সদর সাহেব (রহঃ) লালবাগে ও গওহারডাঙ্গায় যিকিরের মজলিস চালু করার জন্য বারবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, এতে লোকের অন্তরে আল্লাহ্র মহব্বতও বাড়বে, সেই সাথে এ সকল মজলিসের উছিলায় যিকির-আসক্ত লোকেরা বেদআতীদের মজলিসে গমণ হতেও রক্ষা পাবে। কিন্তু কতিপয় আলেম এজ্তেমায়ী-যিকিরের বিরোধিতা করার ফলে তিনি নিজেদের লোকদিগকে পারস্পারিক ফেতনা থেকে মুক্ত রাখার চিন্তায় তা থেকে বিরত হয়ে গিয়েছিলেন।

মাওলানা ফযলুর রহ্মান সাহেব (রহঃ) বলেন যে, সদর সাহেব (রহঃ) সর্বদা অসন্তিবোধ করতেন যে, লোকেরা এগিয়ে আসুক, আল্লাহ্র মহব্বত হাসিল করুক। যাদেরকে তিনি চাইতেন তারা কাছে না আসার কারণে তিনি বেদনা অনুভব করতেন।

একবার এক বিশিষ্ট লোক কিছু সময় হুযুরের সোহ্বতে অতিবাহিত করার পর আরয করল, হুযুর, আল্লাহ্র ওলীদের সোহ্বতে আসলে মানুষ তাদের ফয়েজ-বরকতে ওলীআল্লাহ্ হয়ে যায়। হুযুর, আমি যে আসা-যাওয়া করি, আমি তো এখনও এরূপ কোন ফয়েজ পেলাম না। হুযুর বললেন, দেখুন, আমি একটা দৃষ্টান্ত পেশ করতেছি যা শুনতে যদিও খুবই খারাপ শুনায়, কিন্তু এর দ্বারা বিষয়টা খুব স্পষ্টভাবে বুঝে আসে। তা এই যে, গাই (গাভী) যখন ডাকে, আর সে মুহূর্তে ষাড় এসে তার সাথে মিলিত হয়, ঐ একবারের মিলনেই গর্ভ সঞ্চার হয়ে যায়। তদ্রুপ, কোন ছালেক বা মুরীদ যদি সত্যিকার অর্থে কোন আল্লাহ্-ওয়ালার উপর নিজেকে উৎসর্গ করে, পীরের নিকট হতে কিছু পাওয়ার জন্য বেচাইন হয় ও পুরোপুরি তাবেদারী করে, তবে মোর্শেদের সামান্য দৃষ্টিতেই তার কাজ হয়ে যায়।

মাওলানা ফযলুর রহ্মান সাহেব (রহঃ) বলেন, একবার হুযুর বারবার কোঁকাচ্ছিলেন। কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, হুযুর, খুব বেশী ব্যথা করছে ? হুযুরের হার্নিয়া রোগ ছিল। হুযুর বললেন, না। ফযলুর রহ্মান, শুনলাম যে, ভারতে অমুক জায়গায় মুসলমানদেরকে কতল করা হচ্ছে, অবর্ণনীয় যুলুম করা হচ্ছে। ফযলুর রহ্মান, আমার মুসলমান ভাইদের সেই কষ্টের কথা আমি সহ্য করতে পারছি না।

ঢাকা যাত্রাবাড়ী মাদ্রাসার প্রিন্সিপ্যাল হযরত মাওলানা মাহ্মূদুল হাসান সাহেব বলেন যে, একবার হযরত সদর সাহেব (রহঃ) গওহারডাঙ্গায় এক মজলিসে

www.pathagar.com

উপবিষ্ট ছিলেন। হঠাৎ তিনি একটি ঠান্ডা শ্বাস ফেলে আমাদেরকে বললেন, "বল, তোমাদের সামনে তোমরা কিছু দেখতেছ?" আমরা সবাই নীরব। হুযুর বললেন, ঐ যে ক্ষেতের মধ্যে সরিযার ফুলগুলি দেখতেছ না? আমরা বললাম, জ্বী-হাঁ। বললেন, এতে তোমাদের চোখে ভাল লাগতেছে না ? মনে আনন্দ লাগতেছে না ? আমরা বললাম, জ্বী-হাঁ। তিনি বললেন, দেখ, এই যে তোমাদের চোখের শীতলতা এবং প্রাণের আনন্দ, এর পিছনে সরিযার দানাগুলির এক বিরাট কোরবাণী আছে। এরা গোলার মধ্যে বড় সুখে ও আরামে ছিল। আল্লাহ্র বান্দাদের উপকারের জন্য তারা সেই আরামকে বিসর্জন দিয়েছে। প্রথমে মাটির সাথে মিশে গেছে, মাটির উপর হতে মাটির নীচে চলে গেছে। তারপর সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে নিজের অস্তিত্বকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছে। তারপর সুন্দর গাছ জন্মেছে, ফুল ধরেছে। ঠিক তদ্রুপ, একটি প্রতিষ্ঠান তখন গড়ে উঠে যখন কেউ এর পিছনে জীবন উৎসর্গ করে, ত্যাগ স্বীকার করে, নিজেকে বিলীন করে দেয়।

হযরত মাওলানা ফযলুর রহ্মান সাহেব (রহঃ) বলেন, সদর সাহেব (রহঃ) বলতেন, আমি বেশ কয়েকটা বলদ চাচ্ছিলাম,কিন্তু পাই নাই, মাত্র ১/২ টি বলদ পেয়েছি। অর্থাৎ নিঃশর্তভাবে কায়মনোবাক্যে আনুগত্যশীল লোকই খাঁটি পীরের ফয়েজ-বরকত হাসিল করতে পারে এবং তখনই সে সত্যিকারের কাজের মানুষ হয়। হুযুর জীবনভর এ ধরনের খোদাপিপাসু লোকের জন্য পিপাসিত ছিলেন। বস্তুতঃ খাঁটি নায়েবে-রাসুলদের চরিত্রগুণ এরূপই হয়ে থাকে।

একবার হযরত মাওলানা সালাহুদ্দীন সাহেব (রহঃ) আমাদের বলেছিলেন যে, শুরু শুরুতে সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদীর সাথে সদর সাহেব হুযুরের খুব সম্পর্ক ছিল। মওদুদী সাহেব ঢাকা আসলে লালবাগেও আসতেন হুযুরের সাথে দেখা করার জন্য। সদর সাহেব হুযুর ঐ সময় ইংরেজী শিক্ষিত বহু লোককে মওদুদীর জামাআতে অংশগ্রহণের জণ্য সরল-মনে উদ্বুদ্ধ করতেন। তিনি বলতেন, এই লোকটার দ্বারা ইংরেজী শিক্ষিত লোকদের মধ্যে ভাল দ্বীনী-খেদমতের আশা করা যায়। যদিও কিছু ক্রটি-বিচ্যুতি আছে, আশা করি তা ঠিক হয়ে যাবে।

মাওলানা বলেন যে, একদা আমরা সদর সাহেব হুযুরকে বললাম, হুযুর, আপনি মওদুদী সাহেবের ব্যাপারে দুর্বল ও নরম, অথচ তিনি তাঁর খেলাফত ও মুলূকিয়ত গ্রন্থে প্রিয়নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কয়েকজন বিশিষ্ট ছাহাবীর উপর হামলা করেছেন, তাঁদের দোযচর্চা করেছেন, যা শরীঅতে হারাম। হুযুর বললেন, দেখ, লোকটা দ্বীনের খেদমতে অনুরাগী। যদিও তার লেখার মধ্যে এ সকল গলদ রয়েছে, আশা করি আমরা এদিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে নিশ্চয়ই তিনি তা সংশোধন করে নিবেন। আমরা বললাম, হুযুর, এবার মওদুদী সাহেব ঢাকা আসলে আপনার সম্মুখে আমরা এসব বিষয়ে প্রশ্ন করতে চাই। হুযুর বললেন, ঠিক আছে।

www.pathagar.com

অতঃপর একদিন মওদুদী সাহেব হুযুরের নিকট আসলে অনুমতি নিয়ে আমরা তাঁকে প্রশ্ন করতে লাগলাম। সাহাবায়ে-কেরাম (রাঃ) সম্পর্কিত আমাদের প্রামাণ্য অভিযোগ সমূহ তুলে ধরার পর সদর সাহেব (রহঃ) তাঁকে বললেন, আমার অনুরোধ, এ বিষয়গুলো আপনি সংশোধন করে ফেলুন, অন্যথায় তা দ্বীনের কাজের জন্য অন্তরায় হবে। জবাবে মওদুদী সাহেব বললেন, মাওলানা, আমার যা বুঝে এসেছে আমি তা লিখে দিয়েছি। আপনারও যা বুঝে আসে, আপনিও তা লিখে দিন। সদর সাহেব হুযুর এতে খুবই ক্ষুব্ধ হলেন এবং বললেন, আচ্ছা তাহলে আপনার সাথে আমার যে সম্পর্ক ছিল, আজ হতে সেই সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেল। এরপর থেকে সদর সাহেব (রহঃ) লোকদেরকে ঐ জামাআতে অংশ গ্রহণ হতে বারণ করতে থাকেন। পরে তিনি মওদুদী সাহেবের কতিপয় অতি আপত্তিকর লেখার বিরুদ্ধে কলম ধরেন এবং 'ভুল সংশোধন' নামক বই রচনা করে লোকদেরকে সতর্ক করেন।

এখানে আরেকটি ছোট্ট ঘটনা লিখে কথা শেষ করতে চাচ্ছি। আমার বিশিষ্ট ওস্তাদ, মহামান্য বুযুর্গ হযরত মাওলানা মোহাম্মদুল্লাহ্ হাফেজ্জী হুযুর (রহঃ) বলেন যে, সদর সাহেব (রহঃ) এর এন্তেকালের পর একদিন আমি গওহারডাঙ্গা মাদ্রাসায় গেলাম। হেফজখানার পাশেই হুযুরকে দাফন করা হয়েছে। রাত্রে আমাকে কবরের পার্শ্বস্থ হেফজখানার একটি হুজরায় থাকতে দেওয়া হলো আমি মেশ্ক-আম্বরের চেয়েও অধিক সুগন্ধময় একটা খোশ্বূতে মোহিত হয়ে গেলাম। কবরের দিক হতে এ খোশ্বূ আসছিল। আমি উঠে গিয়ে কবরের মাটি শুঁকে দেখলাম, ঐ মাটি থেকেও অনুরূপ খোশ্বূ আসছে। আল্লাহ্পাক সদর সাহেব (রহঃ)-এর মর্তবা আরও অনেক বুলন্দ করুন এবং আমাদের সবাইকে আমাদের এ সকল বুযুর্গানেদ্বীনের আদর্শ-জীবন অনুসরণের তওফীক দান করুন। আমীন।

=== ০০ ===

www.pathagar.com

অনন্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী
হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ)

মাওলানা শামছুদ্দীন কাসেমী (রহঃ)

মহামনীষীদের জীবন বৃত্তান্তের মূল্য অপরিসীম, কেননা জ্ঞানে-গুণে ও সাধনায় তাঁদের জীবনের পাতা থাকে ভরপুর। সমগ্র জীবনের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং কঠোর সাধনার দ্বারা তাঁরা যে মহাঅবদান রেখে যান, ভবিষ্যত মানব সমাজের জন্য তা হয়ে থাকে পথের দিশারী। যে জাতি তাঁর অতীত দিনের মহাপুরুষদের রেখে যাওয়া পথ নির্দেশকে ভুলেছে বা তাদের জীবন বৃত্তান্ত সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থেকেছে, সে জাতি একাধারে অতীতের প্রেরণা, বর্তমানের সৃজনশীলতা ও ভবিষ্যতের দ্বারকে করেছে রুদ্ধ। কেননা আত্মপরিচয় হারা জাতি ভাসমান শেওলার মতই স্থিতিহীন।

এ দেশে ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রদূত, বাঙ্গালী মুসলমানদের সার্বিক অধঃপতনের সময়ে ত্যাগ-তিতিক্ষা ও সাধনা বলে যিনি রাহুগ্রস্ত জাতির ভাগ্যাকাশে আলোর দীপালী জ্বালাবার জন্য আজীবন কঠোর পরিশ্রম করেছেন, একদিকে যেমন মারাত্মক প্রতিকূল পরিবেশের মধ্য দিয়ে পথহারা মুসলিম মিল্লাতের হৃদয়ে কোরআন হাদীসের আলো দান, অপরদিকে বেদয়াত ও কুসংস্কারের হাত হতে সমাজকে মুক্ত করার জন্য দেশের এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ছুটে বেড়িয়েছেন, প্রবল রাজশক্তির বিরুদ্ধে সঠিক ও সত্যকে তুলে ধরার জন্য একাকী বুক পেতে দাঁড়িয়েছেন যিনি, সেই মহাপুরুষ ইসলামের বীর সেনানী হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রঃ)- এর কথাই আজ বলছি।

মহান স্রষ্টার বিশেষ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য যে সব মহাপুরুষ এ পৃথিবীর বুকে জন্ম গ্রহণ করেছেন স্বভাবতঃই তাঁরা এ সব মহৎ গুণের অধিকারী হন- মহানুভবতা, ন্যায়পরায়ণতা, বিদ্যোৎসাহী, সাম্য, সৌভ্রাতৃত্ব, পরোপকার, আর্তের সেবা, সহনশীলতা, উদারতা ও সত্যের উপর অটল থাকা ইত্যাদি।

এ সব গুণাবলীর প্রেক্ষিতে জীবনে আমি সবচেয়ে বেশী যে সব ব্যক্তিত্বের প্রতি প্রভাবান্বিত হয়েছি তন্মধ্যে কুতুবে আলম শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ হোসাইন আহম্মদ মাদানী (রঃ) সবার শীর্ষে। অতঃপর শায়খুত তফসীর হযরত মাওলানা আহম্মদ আলী লাহোরী, হাফেযুল হাদীস মাওলানা আব্দুল্লাহ দরখাস্তী, ফেদায়ে মিল্লাত হযরত মাওলানা আসআদ মাদানী, হযরত মাওলানা ইউছুফ (আমীরে তাবলীগ জামাত) প্রমুখ ব্যক্তিগণ।

www.pathagar.com

আমাদের দেশী উলামায়ে কেরামের মধ্যে যে ব্যক্তিত্ব আমাকে সবচেয়ে বেশী আকৃষ্ট করেছে তিনি হচ্ছেন হযরত মাওলানা ফরিদপুরী (রঃ)। বাংলাদেশের অনেক উলামা ও বুযুর্গানে দ্বীনের সংস্পর্শে যাওয়ার সুযোগ আমার হয়েছে। অনেক অসাধারণ প্রতিভাশালী আলেমের দরবারে হাজিরা দেওয়ার সৌভাগ্যও আমার হয়েছে। কিন্তু হযরত মাওলানা ফরিদপুরী (রঃ) এর ন্যায় অসাধারণ ব্যক্তিত্ব এবং মহৎ গুণাবলীর অধিকারী আমি অন্য কাউকেও পাইনি। তাঁর মধ্যে পূর্ববর্ণিত গুণাবলীর চমৎকার সমাবেশ ছিল।

ইল্‌মে দ্বীনের প্রতি অনুরাগঃ

দ্বীনী এলেমকে ব্যাপক ভাবে প্রচারিত ও প্রসারিত করার ব্যাপারে তাঁর অদম্য আগ্রহ ও প্রচেষ্টার অন্ত ছিল না। তিনি বহু দ্বীনি মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। ঢাকা বড় কাটরা মাদ্রাসা, লালবাগ মাদ্রাসা, ফরিদাবাদ মাদ্রাসা ও তাঁর নিজ গ্রাম গওহারডাঙ্গায় দারুল উলূম খাদেমুল ইসলাম মাদ্রাসা তাঁরই শ্রম দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। এ ছাড়াও বহু দ্বীনি প্রতিষ্ঠান দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁর তত্ত্বাবধানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ সব প্রতিষ্ঠান আজও সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়ে তাঁরই অক্লান্ত পরিশ্রমের স্মৃতির স্বাক্ষর বহন করে চলেছে।

মাদ্রাসা শিক্ষাকে বিজ্ঞান ভিত্তিক করে গড়ে তোলার জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। পাঠ্যতালিকার সংস্কার, শিক্ষকবৃন্দের প্রশিক্ষণ ছাড়াও অনেক সংস্কারমূলক পদক্ষেপ তিনি নিয়ে ছিলেন। প্রাথমিক ও মৌলিক দ্বীনি শিক্ষাকে ব্যাপকহারে প্রসারিত করার লক্ষ্যে তিনি সহস্রাধিক মক্তব প্রতিষ্ঠা করেছেন। মক্তব-শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও তিনি করেছিলেন। মোট কথা এই জ্ঞান-তাপস বুযুর্গ সারাটি জীবন সততা ও নিষ্ঠার সাথে দ্বীনি এল্‌মের খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন এবং অগণিত আলেম তৈরী করেছেন। শিক্ষা প্রাপ্ত এ সব উলামায়ে কেরাম দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে দ্বীনি ইলমের খেদমত করে চলেছেন।

লেখনীর মাধ্যমে দ্বীনি খেদমত ঃ

লেখনীর মাধ্যমে দ্বীনি এলেমকে প্রচার এবং যুব সমাজকে ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলার জন্য তাঁর চেষ্টার অন্ত ছিল না, হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রঃ)-এর কিতাবাদির বঙ্গানুবাদ ছাড়াও কোরআন হাদীসের দৃষ্টিতে সমকালীন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বহু গ্রন্থও তিনি রচনা করেছেন। সমসাময়িক সকল ফেৎনা সম্পর্কে তিনি লেখনীর মাধ্যমে জাতিকে সর্বদা সতর্ক করেছেন। খৃষ্টান মিশনারীদের চক্রান্তের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে একাধিক গ্রন্থে

www.pathagar.com

তিনি মুসলিম জাতিকে সতর্ক করেছেন। জন্ম নিয়ন্ত্রণ, মুসলিম পারিবারিক আইন, বেদায়াতী ভন্ড-পীরদের ভন্ডামী সম্পর্কে তিনি স্বীয় লেখনীর মাধ্যমে জাতিকে সঠিক পথ দেখিয়েছেন। বিশেষ করে মওদুদী ফেৎনা সম্পর্কে "ভুল সংশোধন" নামক গ্রন্থ রচনা করে জাতিকে সজাগ করেছেন।

বাংলা ভাষায় তাঁর অনুবাদ গ্রন্থ এবং পুস্তিকা মিলিয়ে মোট গ্রন্থের সংখ্যা শতাধিকের কম নহে। লেখনীর মাধ্যমে যাঁরা ইসলামের সেবায় বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী তিনি তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

আঞ্জুমানে তাবলীগুল কোরআন ঃ

আর্ত-পীড়িত অসহায় মানুষের সেবার নামে বাংলাদেশে যখন খৃষ্টান মিশনারীরা সাধারণ মানুষকে ধর্মান্তরিত করার হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। ঠিক তখনই ইসলামের এই বীর সেনানী আঞ্জুমানে তাবলীগুল কোরআন নামক এই সংগঠনটির জন্ম দেন। এ দেশের বিভিন্ন জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং ময়মনসিংহের গারো পাহাড়ী অঞ্চলে মিশনারীরা কুটচক্রান্তের জাল বুনে শিকার করছিল সরল প্রাণ সাধারণ মানুষদেরকে। সে সময়ই এ সংস্থার মাধ্যমে হযরত ফরিদপুরী (রঃ) বিভিন্ন উলামায়ে কেরামকে প্রেরণ করে মিশনারীদের কালো ছোবলকে ধূলিসাৎ করে দেয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালান।

উলামায়ে কেরাম যাতে সেবার মনোভাব নিয়ে প্রতিপক্ষের মোকাবিলা করতে পারেন সে জন্য লালবাগ মাদ্রাসায় আলেমদের জন্য চিকিৎসা বিজ্ঞানের উপর একটি বিশেষ প্রশিক্ষণ কোর্সের ব্যবস্থা করেছিলেন। জাতীয় স্বার্থে এ বীর সেনানীর সময়োপযোগী এই পদক্ষেপের সুফল আজ আর কারো অজানা থাকার কথা নয়।

সহানুভূতি ও সহনশীলতা ঃ

অপরের বক্তব্য শ্রবণ করা এবং তাঁর যৌক্তিকতা যাঁচাই করার মত মনোভাব আজ আমাদের সমাজে বিরল। যে কারণে আজ আমরা সকলেই চরমপন্থী হয়ে পড়েছি। আমাদের দ্বারা আজ আর কোন সমষ্টিগত কাজই সম্পন্ন হচ্ছে না। ফলে আমরা সকলে দেড় ইটের মসজিদ তৈরী করে বসে আছি। এ ক্ষেত্রে আমরা হযরত মাওলানা ফরিদপুরী (রহঃ)-কে অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী পেয়েছি। তিনি সকলের বক্তব্য নেহায়েত সহানুভূতির সাথে শুনতেন। যুক্তিসঙ্গত বক্তব্য মেনে নিতে কখনও সংকোচ বোধ করতেন না। অনেক সময় দেখা গেছে কারো সম্পূর্ণ অযৌক্তিক কথাকেও অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে সহানুভূতির সাথে

www.pathagar.com

শুনেছেন। কখনও কেউ বিরক্তি প্রকাশ করলে হাসিমুখে প্রতিউত্তরে বলতেন "আমি তাঁর আবেগের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে তাঁর বক্তব্য শুনেছি।"

আমরা তো নিজেদের সমালোচনা শুনলে অগ্নিশর্মা হয়ে যাই। অথচ তিনি কারও মুখে নিজের সমালোচনা শুনলে হাসিমুখে মেনে নিতেন এবং সমালোচনার সুযোগ দিতেন। আমার জ্ঞানের স্বল্পতা হেতু অনেক সময় তাঁর সামনে আপত্তিকর ভাষায় তাঁর কোন কাজের সমালোচনা করেছি। কিন্তু কোন দিন মুখে কিংবা ভাবভঙ্গীমায় এ মহাপুরুষকে কখনও বিরক্ত হতে দেখিনি। বরং নেহায়েত ধৈর্যের সাথে শুনেছেন এবং ভদ্রোচিত ও স্নেহ-মমতার ভিতর দিয়ে এমন সুমিষ্ট উত্তর দিয়েছেন যা চিরদিনের জন্য আমাকে তাঁর দাস বানিয়ে ছেড়েছে।

সহনশীলতার এমন পরাকাষ্ঠা ছিলেন যে, অনেক সময় দেখা গেছে, যাদের চিন্তাধারার তিনি ঘোর বিরোধী ছিলেন, তাদের অনেকেই তাঁর নিকট এসেছে। তিনি ধৈর্য সহকারে বিরুদ্ধবাদীর কথা শুনেছেন এবং অতি সরলভাবে তাঁর চিন্তা ধারার বাতুলতা প্রমাণ করে দিয়েছেন। এ কারণেই তাঁর প্রতি চরম বেদআতি ও বিরুদ্ধবাদীরা শ্রদ্ধাশীল ছিল।

দৃঢ় মনোবল ও হক্ কথা বলার অদম্য সাহসঃ

এ মহাপুরুষ কোন দিনও বাতেলের সম্মুখে মাথা নত করেননি। যা কিছু সত্য, ন্যায় ও হক মনে করেছেন তা প্রকাশ করতে কখনও সংকোচ বোধ করেননি। যত বড় বাধাই আসুক না কেন হক কথাকে গোপন করা বা বাতেলের সাথে আপোস করা তিনি জানতেন না। হক কথা বলতে গিয়ে অনেক সময় তাঁকে স্বৈরাচারী শাসক ও স্বার্থান্বেষী মহলের রোষানলে পতিত হতে হয়েছে। কিন্তু সত্য ও ন্যায়ের পথ থেকে কারও ভয়-ভীতি কিংবা লোভ-লালসা এ সংগ্রামী মহামানুষের পদস্খলন ঘটাতে পারেনি।

আমাদের মনে আছে মোনয়েমী শাসনামলে জোরপূর্বক রমজানের ঈদের নামায এক দিন পূর্বে পড়ানোর জন্য যখন চাপ সৃষ্টি করা হলো, তখন দেখা গেল ঢাকার খ্যাতনামা অনেক মুফতী সাহেবও ফতোয়া দিলেন, "রোযাভী রাখ্খো আউর ঈদ কি নামায ভী পড়্হো।" পক্ষান্তরে গভর্ণর হাউজে মোনেম খান সাহেবের কয়েদ করার হুমকির মুখে মুজাহিদে আযম বলেছিলেন, "আপনার যা ইচ্ছা করতে পারেন, আমি আগামী দিন রোযা থাকবো এবং আপনার নির্ধারিত দিনে ঈদের নামায পড়বো না এবং আমার এ সিদ্ধান্তকে সমগ্র দেশবাসীর নিকট জানিয়ে দিব।" তাই-ই তিনি করেছিলেন।

www.pathagar.com

এধরনের সংগ্রামী চেতনায় সমৃদ্ধ আরেকটি ঘটনা আমরা দেখতে পাই আইয়ুব খান ও ফাতেমা জিন্নাহর প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময়। মুজাহিদে আযমের সমর্থনকে স্বীয় অনুকূলে রাখার অভিপ্রায়ে আইয়ুব খান সাহেব তাঁকে বলেছিলেন আমি ওয়াদা করলাম নির্বাচনের পর মুসলিম পারিবারিক আইন বাতিল করে দিব। প্রতি উত্তরে তিনি বলেছিলেন, আপনার ওয়াদার উপর আমার কোন আস্থা নেই। আপনি নির্বাচনের পূর্বেই কুখ্যাত পারিবারিক আইনটি বাতিল করে আমাদের সমর্থনের জন্য আসুন। আইয়ুব সাহেব বললেন, মাওলানা আপনি আমার ওয়াদাকে কেন বিশ্বাস করেন না? আমাকে কি আপনি মুসলমান মনে করেন না। তিনি উত্তরে বলেছিলেন, মায় আপকো মুসলমান সমঝ্তা হুঁ লেকিন এক জাহেল মুসলমান সমঝ্তা হুঁ।

সাহাবায়ে কেরামসহ অতীতের বুযুর্গানে দ্বীনের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা ঃ

সত্যিকার অর্থে দ্বীনদার হওয়া এবং প্রকৃত দ্বীন পাওয়ার প্রথম শর্ত হচ্ছে রেছালাতের প্রথম সাক্ষী, আমাদের নিকট দ্বীন পৌঁছার মাধ্যম, পূত-পবিত্র চরিত্রের অধিকারী সাহাবায়ে কেরামকে শ্রদ্ধা-ভক্তি করা এবং ভালবাসা। হযরত ফরিদপুরী (রহঃ)-এর সাহাবায়ে কেরামের প্রতি অগাধ ভক্তি ও অকৃত্রিম ভালবাসা ছিল। এ সম্পর্কীয় দু'টি ঘটনা আমার মনে পড়ে।

ফরিদপুরী (রহঃ)-এর সাথে এক ব্যক্তির দীর্ঘ দিনের বন্ধুত্ব ছিল। একদিন হযরত মুয়াবিয়া (রাযিঃ)-এর সমালোচনা করায় তাঁর সাথে দীর্ঘ দিনের বন্ধুত্ব ছিন্ন করতে তিনি একটুও দ্বিধা করেননি।

জনাব আবুল আলা মওদুদী সাহেব সম্পর্কীয় আলোচনায় মাওলানা মুহিউদ্দীন খান সাহেব এ মনীষীর সামনে একদিন আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন- স্বয়ং আল্লাহ পাক যাঁদেরকে পবিত্র কুরআনের ঘোষণায় ক্ষমা করে দিয়েছেন, তাঁদেরকে মওদুদী সাহেব কি ক্ষমা করতে পারেন না? মওদুদী সাহেবকে অনুগ্রহ পূর্বক বলেন, তিনি যেন সন্তুষ্টির ঘোষণাপ্রাপ্ত সাহাবায়ে কেরামের জামাতকে ক্ষমা করে দেন। আবেগ মিশ্রিত এ কথা শোনার সাথে সাথেই তিনি ক্ষোভ মিশ্রিত ভাষায় বললেন, এ ব্যক্তির আন্দোলন কখনও কামিয়াব হতে পারে না। এ ব্যক্তি গোমরাহ্। সাহাবায়ে কেরামের শানে লাগামহীন আলোচনা করে মেশকাতে নুবুওয়াত তথা নুবুওয়াতের পাওয়ার হাউজ-এর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলেছে। সুতরাং এহেন ব্যক্তি বা তাঁর আন্দোলনের সাথে সম্পর্ক রাখা চলে না।

সংগ্রামী চেতনায় উজ্জীবিত এমনি আরো অনেক ঘটনা আমরা দেখতে পাই মুজাহিদে আজমের কর্মময় জীবনে। ঘটনা বহুল বর্ণাঢ্য জীবনের অধিকারী এ

www.pathagar.com

মহামনীষীর জীবনালোচনা এত স্বল্পপরিসরে সম্ভব নয়। আমার প্রতি জ্ঞানতাপস এ মনীষীর দু'টি উপদেশের কথা স্মরণ করেই আমি আমার প্রবন্ধটি শেষ করছি।

ইহধাম ত্যাগের কিছুদিন পূর্বে যখন তিনি রোগাক্রান্ত হয়ে স্বগ্রাম গওহারডাঙ্গায় অবস্থান করছিলেন, তখন আমাকে ডেকে নিয়ে বল্লেন, আমি তোমাকে সন্তানের ন্যায় ভালবাসি। আমার দুটো উপদেশ তুমি বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করবে। উলামায়ে কেরামের সংগঠন জমিয়তে উলামায়ে ইসলামকে একটি মজবুত ও শক্তিশালী সংগঠন রূপে গড়ে তোলা এবং কওমী মাদ্রাসা সমূহকে একটি বোর্ডের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ করার প্রক্রিয়া চালিয়ে যাওয়া। অতঃপর অশ্রুসিক্ত নয়নে হযরত মাওলানা থেকে বিদায় নিলাম।

কিছুদিন পর পুনরায় হযরতের পক্ষ থেকে ডাক আসলো। সেবার মোহ্তারাম মাওলানা মুহিউদ্দীন খানকেও সাক্ষাতের জন্য খবর দিয়েছিলেন। আমরা উভয়ে একসাথে গওহারডাঙ্গা মাদ্রাসা পৌঁছলাম। সেবারও তিনি আমাদের পূর্বোল্লিখিত উপদেশটি শুনালেন এবং আরো বললেন, লেখনীর মাধ্যমে বাতেল শক্তির মোকাবেলা ও আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা সর্বদা অব্যাহত রাখবে।

দ্বীনের অক্লান্ত খাদেম এ বীর সেনানীর সাথে এটাই আমাদের শেষ সাক্ষাত। সেদিনের হৃদয়-নিঃসৃত এ উপদেশ আজও আমার মনে সেভাবেই জাগ্রত আছে।

আল্লাহ্ পাক হযরতকে গরীকে রহমত করুন (রহমতের সাগরে ভাসিয়ে দিন) এবং আমাদেরকে তাঁর আদর্শ অনুসারে চলার তৌফিক দিন।

= ০০০ =

www.pathagar.com

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইসলামী রূপকার মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ)

মাওলানা মুহিউদ্দীন খান

আধুনিক বাংলাভাষায় ইসলামী সাহিত্যের অন্যতম স্থপতি পুরুষ মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ)।

বর্তমান শতাব্দীর চল্লিশের দশক থেকে ইসলামী সাহিত্যের যে নতুন একটি রেনেসাঁ যুগের সূত্রপাত হয় তার একটি উল্লেখযোগ্য দিকের প্রধান দিশারী ছিলেন তিনি। কর্মজীবনের দ্বিতীয় পর্যায়ে তিনি ঢাকার ঐতিহ্যবাহী হুসাইনিয়া আশরাফুল উলুম মদ্‌রাসার সদর মুদার্রেছ বা প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর থেকেই যুগের মোজাদ্দেদ হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভীর (রহঃ) রচনাবলী বাংলা ভাষায় অনুবাদ করার লক্ষ্যে একটি সুদূর প্রসারী উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন হযরত সদর ছাব হুযুর। উল্লেখ্য যে, এই লকবেই তিনি তখন সবার নিকট পরিচিত ছিলেন।

প্রথমে তিনি কয়েকজন সাথী-সঙ্গী নিয়ে 'নেয়ামত' নামে একখানা মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকার একজন নিয়মিত পাঠিকা ছিলেন আমার আম্মা মরহুমা। আমি তখন খুব ছোট। পত্র-পত্রিকা সম্পর্কে সুষ্ঠু কোন ধারণা নেওয়ার মত বয়স বা বিদ্যা আমার হয় নি। তখনই আম্মা-আব্বার মুখে শুনতাম, সদর সাহেব হুযুর, পীরজী হুযুর, মৌলবী আব্দুস্ সালাম প্রমুখ মাসিক নেয়ামত এর সাথে সংশ্লিষ্টগণের নাম। আমার নিকট তাঁরা ছিলেন অনেকটাই প্রবাদ পুরুষের মত। আমার শিশুমনে আকাংখা জাগতো, বড় হয়ে অবশ্যই তাঁদের সান্নিধ্যে যাবো এবং তাঁদের পবিত্র চেহারা দেখার সুযোগ গ্রহণ করবো। তখনকার সময়ে সেটা ছিল নিতান্তই শিশুমনের একটা আবেগ, একটা উচ্চাভিলাস। কিন্তু আজ পরিণত বয়সে বুঝতে পারি যে, প্রকৃত অর্থেই এঁরা ছিলেন অনেক বড় মাপের মানুষ। তাঁদের কীর্তি ছিল আরও অনেক বড়। আর আমার পরম সৌভাগ্য বলতে হবে যে, আমি এঁদের সবারই নিকট সান্নিধ্যে যাওয়ার, স্নেহ ও দোয়া লাভ করার সুযোগ পেয়েছি।

হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ) যখন আশরাফুল উলুম মাদ্‌রাসা ছেড়ে লালবাগ জামেয়া কোরআনিয়া প্রতিষ্ঠা করেন তখন আমি সর্ব প্রথম তাঁকে দেখি। আব্বার ইচ্ছা ছিল আমি জামেয়া কোরআনিয়ায় ভর্তি হয়ে লেখাপড়া করি। সুযোগও একটা সৃষ্টি হয়েছিল। আমার ভগ্নিপতি মরহুম মাওলানা আলী

www.pathagar.com

নেওয়াজ ছিলেন সদর সাহেব হুযুরের একজন একান্ত সহকর্মী। আব্বা প্রথমে তাঁর সঙ্গেই আমাকে ঢাকা পাঠিয়েছিলেন লেখাপড়ার ব্যাপারে খোঁজ-খবর নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে। মাওলানা আলী নেওয়াজ সরাসরি সদর সাহেবের সামনে হাজির হয়ে আব্বার অভিপ্রায়ের কথাটা বললেন। সদর সাহেব হুযুর আমার সাথে কিছুক্ষণ কথা বললেন। আমার 'আলেম' এর রেজাল্ট এর কথা শুনে মন্তব্য করলেন, বর্তমানে জামেয়া কোরআনিয়ার যে অবস্থা, তাতে তোমার এখানে ভর্তি হওয়া ঠিক হবে না। এখানকার কষ্টকর পরিবেশ তুমি সহ্য করতে পারবে না। বরং তুমি আলীয়া মাদ্‌রাসায় ভর্তি হও। সেখানে আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় মুরব্বী হযরত মাওলানা যফর আহমদ উস্‌মানী সাহেব আছেন। হোস্টেল সুবিধাও সন্তোষজনক।

আমি হযরত সদর সাহেব হুযুরের সাথে এই প্রথম আলাপেই অবাক হলাম। শুন্‌তাম, কওমী মাদ্‌রাসার সাথে সম্পর্কিত বুযুর্গগণ আলীয়া মাদ্‌রাসা পছন্দ করেন না। অনেককে প্রকাশ্যে বিরূপ মন্তব্য করতেও শুনেছি। কিন্তু সদর সাহেব আমাকে তাঁর মাদ্‌রাসায় ভর্তি না হয়ে আলীয়া মাদ্‌রাসায় ভর্তি হওয়ার পরামর্শ দিলেন। অবাক হওয়ার মত বিষয় বৈকি ! এই ছিলেন মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ)! এখলাছ ছিল তাঁর ভূষণ। অন্যের হিত চিন্তা করাই ছিল তাঁর চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

আমি লালবাগে লেখাপড়া করতে পারি নাই। তাঁর একান্ত সান্নিধ্যে থাকার সৌভাগ্যও আমার হয় নাই। তবে সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে গিয়েছিল তখন থেকেই। আলীয়া মাদ্‌রাসায় ভর্তি হওয়ার পর নিয়মিত যাতায়াত করতাম হযরত সদর সাহেবের খেদমতে। এরপর থেকে ইসলাম ও মুসলিম জাতিসত্তার স্বার্থে যতগুলি আন্দোলন হয়েছে সে সবগুলি আন্দোলনের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ নেতৃত্ব দিতেন সদর সাহেব হুযুর এবং আমরা তাঁর নেতৃত্বের প্রতি দৃঢ় আস্থা নিয়ে কাজ করেছি। হযরত সদর সাহেব হুযুরের কোন হুকুম নিয়ে কখনও মনে কোন প্রশ্নের সৃষ্টি হয় নাই। এমর্মে আমাদের প্রত্যয় ছিল যে, সদর সাহেবের নেতৃত্বে এখলাছ, লিল্লাহিয়াত ও হক্কানিয়াতের কোন কমতি ছিল না।

হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ) আমাদেরকে সর্বাপেক্ষা বেশী উৎসাহিত করতেন দেশ ও দুনিয়া সম্পর্কে বেশী জ্ঞান লাভ করার প্রতি। তিনি মাওলানা শামীর এ মর্মে একটি বক্তব্য উদ্ধৃত করতেন যে, "দেশ কাল সম্পর্কে যে ব্যক্তি অবহিত ও সচেতন নয়, সে জ্ঞানীরূপে পরিচিত হওয়ার যোগ্য নয়।" তবে, রাজনীতি করতে নিষেধ করতেন। বলতেন, ছাত্র জীবন হচ্ছে সবকিছু শিক্ষা করার সময়। অর্জিত এই শিক্ষা কাজে লাগাতে হবে পরবর্তী কর্মজীবনে। কোন ছাত্র বা তরুণ আলেমের মধ্যে একটু সচেতনতা, একটু ব্যতিক্রমী প্রতিভার সন্ধান পেলে

www.pathagar.com

তিনি যেন হারানো মানিক পাওয়ার মতই সে লোকটাকে আপন করে নিতে চেষ্টা করতেন। আমাদের কালের অনেক আলেমেরই প্রতিভা বিকাশে হযরত সদর সাহেবের যে অবদান রয়েছে তা কোন ক্রমেই অস্বীকার করার উপায় নাই।

শুনেছি, হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরীর (রহঃ) পূর্ব-পুরুষগণ হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদের (রহঃ) মুজাহিদ আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন। ধমনীতে যে তিনি জেহাদী রক্ত বহন করতেন তার প্রমাণ পাওয়া যেতো তাঁর নির্ভীক আচরণ থেকে। একমাত্র আল্লাহর নিকট থেকেই পাওয়ার আকাংখা এবং একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালার ইচ্ছা সাপেক্ষেই আশঙ্কাজনক কিছু ঘটতে পারে; দ্বিতীয় কোন শক্তির এখানে কোনই দখল নাই- এই বিশ্বাস তাঁর এতই দৃঢ়মূল ছিল যা কেবল আগের যুগের ওলী-দরবেশগণের জীবনেই দেখা যায়।

হযরত মাওলানা ফরিদপুরী (রহঃ) আজীবন বাতিলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। দ্বীনি দায়িত্ব মনে করেই তিনি অনেক ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতেন। পঞ্চাশের দশকের কিছু অংশ এবং ইন্তেকালের আগ পর্যন্ত পরিপূর্ণ যাটের দশকটিতে তাঁর সংগ্রামী জীবন খুব কাছে থেকে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ আমার হয়েছিল। পাকিস্তানের সর্বাপেক্ষা প্রতাপশালী শাসক ফিল্ড মার্শাল মুহাম্মদ আইয়ুব খান পূর্ণ যাটের দশকটি এদেশ শাসন করেছেন। আইয়ুব খান ছিলেন যোগ্য এবং সরল-সোজা মুসলমান। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁর চারদিকে সমবেত হয়েছিল কাদিয়ানী, শিয়া চক্রান্তকারী ও ইতর শ্রেণীর একদল আমলা ! এই চক্রান্তকারীদেরই এক ব্যক্তি ছিল ডক্টর ফজলুর রহমান। এ ব্যক্তি সোজা মানুষ আইয়ুব খানকে প্রভাবান্বিত করে মুসলিম পারিবারিক আইনে কিছু পরিবর্তন আনয়নের সূচনা করে। এই ধর্মদ্রোহী অনাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন পূর্ব এবং পশ্চিমের সর্বশ্রেণীর ওলামায়ে কেরাম।

তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তানে এই প্রতিরোধ আন্দোলনে নেতৃত্বের মূখ্য ভূমিকায় ছিলেন হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ)। তাঁর একজন প্রধান সহযোগী ছিলেন বিশিষ্ট লেখক প্রাজ্ঞ আলেম হযরত মাওলানা নূর মুহাম্মদ আ'যমী (রহঃ)। উদ্ভূত যে কোন সমস্যার ক্ষেত্রে সদর সাহেব দেশের বিশিষ্ট আলেম ও বুদ্ধিজীবিগণকে ডেকে পরামর্শ করতেন। ঢাকা শহরে তখন মুফতী দ্বীন মুহাম্মদ খান, ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, মাওলানা মুহাম্মদ আকরাম খাঁ, হযরত মাওলানা আত্হার আলী, পীরজী হুযুর, আহলে হাদীছ জামাতের সভাপতি হযরত মাওলানা আবদুল্লাহিল কাফী আল-কোরায়শী (রহঃ), মাওলানা রাগেব আহসান প্রমুখ অনেক বিজ্ঞ আলেম বসবাস করতেন। হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরীর (রহঃ) ডাকে এঁদের অনেককেই সমবেত হতে দেখেছি। আমরা অল্প বয়স্ক এবং জ্ঞান-প্রজ্ঞায় খাটো হলেও সদর সাহেব আমাদেরকেও কাজে লাগাতেন।

www.pathagar.com

পাকিস্তান আন্দোলনের একজন প্রথম সারির নেতৃপুরুষ হওয়ার সুবাদে শাসক শ্রেণীর লোকেরা সদর সাহেব হুযুরকে বেশ সমীহ করতো। কিন্তু মুসলিম পারিবারিক আইন সংশোধন প্রশ্নে ফিল্ড মার্শাল মুহাম্মদ আইয়ুব খানের কেন্দ্রীয় সরকারের প্রচন্ড চাপের মুখে পড়লেন সদর সাহেব হুযুর। অনেক হিতাকাংখীই তাঁকে পরামর্শ দিলেন, আইয়ুব খান সামরিক শাসক। ওর কোপানলে পড়া ঠিক হবে না। এতে তাঁর প্রতিষ্ঠিত দু'টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান লালবাগ জামেয়া কোনআনিয়া এবং গওহারডাঙ্গার খাদেমুল ইসলাম মাদ্‌রাসা ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে।

আমার মনে আছে, জামেয়া কোরআনিয়ার এক রুদ্ধদ্বার কক্ষে অনুষ্ঠিত একটি পরামর্শ সভায় এধরনের পরামর্শ দাতাদের কথা শুনে সদর সাহেব হুযুর গর্জন করে উঠেছিলেন। প্রথম খলীফা হযরত আবু বকরের (রাঃ) সেই ঐতিহাসিক বাণীটি উদ্ধৃত করে বলেছিলেন, "আমি বেঁচে থাকতে আল্লাহর দ্বীনের উপর হস্তক্ষেপ হবে, এটা হতে পারে না। শরীয়ত বিরোধী এ আইন কার্যকর করার আগে আমি শহীদ হয়ে যাব।" শুনেছি, প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের নাক বরাবর অঙ্গুলি উত্তোলন করে তিনি এ কথার হুবহু পুনরাবৃত্তি করেছিলেন। পূর্ব-পাকিস্তানের সর্বশেষ গভর্ণর জনাব আব্দুল মুনয়েম খান সদর সাহেব হুযুরকে খুব সম্মান করতেন। কিন্তু প্রথমতঃ মুসলিম পারিবারিক আইনের প্রশ্নে এবং '৬৬ সনের ঈদুল ফিতর প্রশ্নে সে সম্পর্কেরও চরম অবনতি ঘটে। তখন ঢাকার বিশিষ্ট লোকদের অনেকেই এসে এই বিরোধের অবসান করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু দ্বীনের প্রশ্নে হযরত সদর সাহেবের পক্ষে নরম পন্থা অবলম্বন করা ছিল কল্পনাতীত!

এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের সাথে সদর সাহেবের সাক্ষাত এবং কেন্দ্রীয় ইসলামী এডভাইজারী বোর্ড এর আকর্ষণীয় সদস্যপদ গ্রহণের প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান করার আলোচনা বহুল ঘটনাটি। কেননা, তখনকার ডক্টর ফজলুর রহমান নামক এক ব্যক্তি আমেরিকা দ্বারা প্ররোচিত ছিল এবং কেন্দ্রীয় সরকারের ইসলামী এডভাইজারী কাউন্সিলের উপর সওয়ার হয়ে ইসলামের কতকগুলি সর্বসম্মত মৌলিক বিষয়ে আপত্তিকর হস্তক্ষেপ করতে শুরু করেছিল। পূর্ব ও পশ্চিমের আলেম সমাজ তখন একত্রিত হয়ে এই অবাঞ্ছিত ধৃষ্টতার মোকবেলা করছিলেন। প্রতিবাদী আলেমগণের অন্যতম নেতৃপুরুষ ছিলেন হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী।

হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ) এর অমর স্মৃতি বহন করছে দেশের শীর্ষস্থানীয় অনেকগুলি দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। লালবাগ জামেয়া কোরআনিয়া ইতিহাস প্রসিদ্ধ শায়েস্তা খানের কিল্লার এক অংশে নিতান্ত সুনামের

www.pathagar.com

সাথেই ইলমে দ্বীনের দরস দিয়ে যাচ্ছে। ঢাকা শহরের পূর্ব কোণে শুকতারার মত স্বকীয় অস্তিত্ব ঘোষণা করে যাচ্ছে জামেয়া আরাবিয়া ইমদাদুল উলূম ফরিদাবাদ। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের গওহারডাঙ্গা খাদেমুল ইসলাম মাদ্‌রাসাটিও কালের পাতায় নতুন ইতিহাস রচনা করে যাচ্ছে। এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই হযরত সদর সাহেব (রহঃ) এবং তাঁর আকাংখাগুলি জীবন্ত হয়ে আছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলিই হযরত সদর সাহেবকে কেয়ামতকাল পর্যন্ত স্মরণীয় করে রাখার জন্য যথেষ্ট ছিল।

আমাদের বিবেচনায় তাঁর মহোত্তম কীর্তির কুতুব মিনার হচ্ছে আধুনিক বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্য রচনার এক নতুন রেনেসাঁ যুগের গোড়াপত্তন। এ ক্ষেত্রে তাঁর লেখার ভান্ডার যেমন বিপুল, তেমনি তিনি তৈরী করে গেছেন অনেকগুলি দক্ষ কলম সৈনিক! সর্বাপেক্ষা বেশী জনপ্রিয়তা লাভ করেছে তাঁর অনূদিত গ্রন্থগুলি। অনুবাদের জন্য গ্রন্থ নির্বাচন এবং তা সর্বশ্রেণীর মানুষের পাঠোপযোগী করে পরিবেশন করা উন্নত মেধা এবং সূক্ষ্ম রুচিবোধের পরিচায়ক। বেহেশতী জেওর, তালীমুদ্‌দীন, ছাফাইয়ে-মোয়ামালাত প্রভৃতি গ্রন্থ বাংলা ভাষাভাষী মুসলমানদের ঘরে ঘরে পঠিত হয়। প্রায় অর্ধশতাব্দী অতিক্রান্ত হওয়ার পরও এ বইগুলির জনপ্রিয়তায় মোটেও ভাটা পড়েনি, এসব বইয়ের কোন বিকল্পও সৃষ্টি হয় নি।

= ০০০ =

www.pathagar.com

মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ)
এক বিরল ব্যক্তিত্বের বিকাশ

গোলাম মোস্তফা

ঘোপেরডাঙ্গা ছোট একটি গ্রাম, বৃহত্তর ফরিদপুরের গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া থানায় এটি অবস্থিত। ঐতিহ্যবাহী মধুমতির অববাহিকার এ ক্ষুদ্র পল্লীতে জন্ম গ্রহণ করেন উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ এক মহাপুরুষ মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ)। তাঁর কারণে ধন্য হয় এ নাম নাজানা গ্রামটি। তিনি এটিকে ঘোপেরডাঙ্গা থেকে গওহারডাঙ্গা নাম দেন।

জন্ম ও বংশ পরিচিতি ঃ

১৮৯৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ) এ পৃথিবীতে আগমণ করেন। তাঁর পিতার নাম মুন্সি আব্দুল্লাহ এবং মাতার নাম আমিনা। বিশ্বস্ত সূত্র মতে তাঁর পূর্ব পুরুষ ছিলেন আরবের। ইসলাম প্রচারের জন্য তারা ভারত উপমহাদেশে আসেন। তাঁর দাদার পিতা চাঁদ গাজী যশোরে থেকে সেখানে ইসলাম প্রচারের কাজ করেতেন। তিনি মাঝে মাঝে ফরিদপুর এলাকায় আসতেন। বালাকোটের যুদ্ধের জন্য সৈয়দ আহমদ ব্রেলবী ডাক দিলে তিনি সকলকে যুদ্ধের ট্রেনিং গ্রহণ ও যুদ্ধে যাবার জন্য উৎসাহিত করেন। সৈয়দ সাহেব বালাকোটে শহীদ হলে চাঁদগাজী তার কয়েক জন সঙ্গীসহ এলাকায় ফিরে ইসলাম প্রচারের কাজ পুনরায় শুরু করেন। তিনি গওহারডাঙ্গায় বিবাহ করে সেখানে অবস্থান করেন। চাঁদ গাজীর ইন্তেকালের পর তার পুত্র চেরাগআলী বাপের যোগ্য সন্তান হিসেবে তাবলীগের কাজ চালিয়ে যান। চেরাগআলী সাহেবের পুত্র মুন্সি আব্দুল্লাহ। মুন্সি আব্দুল্লাহর পুত্র হলেন মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী।

তা'লীম তরবিয়াত ঃ

শিশু শামছুল হক চার বছর বয়সে নিজ পরিবারে মায়ের নিকট প্রথমে আমপারা পাঠ শুরু করেন। এরপর ভাবীর কাছে পড়া শোনা করেন। পরবর্তীতে একটু বড় হলে পাটগাতি এক হিন্দু পন্ডিতের কাছে মন্ডপে বাংলা পড়ার জন্য ভর্তি হন। সেখানে তিনি কৃতিত্বের সাথে পাশ করেন। এরপর তিনি পূর্ণচন্দ্র বাবুর টোলে দ্বিতীয় শ্রেণী এবং মুন্সি আজিজুল হকের পাঠশালায় তৃতীয় শ্রেণীতে পড়েন এবং বরিশালের নাজির পুরে চতুর্থ শ্রেণীতে পড়েন।

www.pathagar.com

গিমাডাঙ্গা স্কুলের জনৈক শিক্ষক শরীফ শামছুদ্দিনের কাছে তিনি জ্যামিতি ও ফার্সী ভাষার পাঠ গ্রহণ করেন। তিনি কলিকাতা চলে যাবেন শুনে সদর সাহেবের পিতা তাকে শরীফ সাহেবের সাথে নোয়পাড়া ভাগুটিয়া স্কুলে পড়ার জন্য পাঠান। সেখানে দু'বছর কৃতিত্বের সাথে লেখা পড়া করেন।

ভাগুটিয়ায় পড়াবস্থায় আরবী পড়ার প্রতি তাঁর মন দারুন ভাবে ঝুঁকে যায়। তিনি মাঝে মাঝে কুরআন শরীফ গলে ঝুলিয়ে বনে গিয়ে কাঁদতেন। অবশেষে তিনি মৌলবী কাসেমের কাছে গোপনে আরবী কিতাবপত্র পড়া শুরু করেন। কিন্তু পিতা এ সংবাদ জানতে পেরে মৌলবী সাহেবকে আরবী পড়াতে কঠোর ভাবে নিষেধ করলেন। অতঃপর সদর সাহেব বাধ্য হয়ে কলিকাতা গমণ করলেন। সেখানে তিনি কলিকাতা এ্যাংলো স্কুলে ভর্তি হন। সে স্কুলে তিনি ৮ম শ্রেণীর পরীক্ষায় গোটা বাংলায় প্রথম স্থান অধিকার করে স্বর্ণ পদক লাভ করেন।

একবার পূর্ব বাংলার মূখ্য মন্ত্রী এ, কে, এম ফজলুল হক কলিকাতায় জনসভা করছিলেন। আসরের নামাযের সময় হলে ক্লাস নাইনের ছাত্র শামছুল হক একটা উচুঁ স্থানে দাড়িয়ে আওয়াজ দিলেন- “It is time to prayer, Please let us say our prayer.” একথা বলার সাথে সাথে চারদিক থেকে চিৎকার উঠল, মোল্লা! মোল্লা! ছাত্র শামছুল হক তখন প্রতিজ্ঞা করলেন যে, একথা বললে যদি মোল্লা হয় তাহলে আমি প্রকৃত মোল্লা হতে চাই।

কলিকাতায় এসে আরবী তথা দ্বীনি শিক্ষার প্রতি আগ্রহ আরো বেড়ে যায়। হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানভী একবার কলিকাতার উপর দিয়ে যাবার সময় ছাত্র শামছুল হক তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। তিনি থানভীকে একটি মাত্র প্রশ্ন করেছিলেন “আল্লাহকে কিভাবে পাওয়া যায়” একজন স্কুলের ছাত্রের এ প্রশ্ন শুনে থানভীর বিশেষ দৃষ্টি পড়ে তার উপর। তখন থেকে তিনি আরো উতালা হয়ে উঠেন ধর্মীয় শিক্ষার জন্য। ম্যাট্রিকে তিনি অবহেলা করে পরীক্ষা দিলেন। উদ্দেশ্য রিজাল্ট ভাল না হলে পিতা কলেজে পড়তে বলবেন না। কিন্তু রিজাল্টের পর দেখা গেল তিনি কয়েকটা বিষয়ে লিটারসহ স্টার নম্বর পেয়েছেন। এতে তাকে গোল্ড মেডেল প্রদান করা হলো। স্কুলের পড়ার সাথে সাথে তিনি আরবী, ফার্সী ও উর্দু ভাষা মোটামুটি আয়ত্ব করে ফেলেন। কলেজে ভর্তি হবার পর তিনি কয়েক জন মাওলানা সাহেবের কাছে কুদুরী মানতেক ও শরহে বেকায়া পড়ে শেষ করেন।

অসহযোগ আন্দোলন- অপূর্ব সুযোগ ঃ

এতদিন যে কামনা তিনি হৃদয়ে সযত্নে লালন করছিলেন তার বাস্তবায়ন হলো। কলেজের পড়া কিভাবে বন্ধ করে দেওয়া যায় এবং দেওবন্দ মাদ্রাসায়

www.pathagar.com

কিভাবে যাওয়া যায় এ চিন্তা তার মাথায় সব সময় ঘুরপাক খেত। ১৯২১ সালে গান্ধীজীর ঘড়হ ঈড়-ঙঢ়ধৎধঃরড়হ গড়াবসবহঃ মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। ইংরেজ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনে দেশের জনগণ উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। স্কুল কলেজ ভার্সিটি ইত্যাদি বন্ধ হয়ে যায়। এ সুযোগকে যুবক শামছুল হক গনিমত মনে করলেন। তিনি বাড়ী থেকে ঘুরে কলিকাতায় এসে নিজের বই পত্র সব গরীব ছাত্রদের দিয়ে দিলেন। নিজে একটা ট্রাংক একটা ছাতা ও একটা ঘটি নিয়ে ইলমে দ্বীনের সন্ধানে দেওবন্দ ছুটে চললেন। দেওবন্দ যাবার পথে তিনি পথে একটি চিঠি লিখলেন পিতার উদ্দেশ্যে। চিঠি এই–

দেওবন্দের পথে
১৯২১ সাল ইং ১লা রজব

মাননীয় আব্বাজান,

পত্রে অধমের আন্তরিক সালাম ও অকৃত্রিম শ্রদ্ধা বিজড়িত কদমবুছি গ্রহণ করতে মর্জি হয়। আশা করি করুণাময়ের অশেষ কৃপায় কুশলেই আছেন। আমি দেওবন্দ যাচ্ছি। আমার জন্য আন্তরিক ভাবে দোয়া করবেন, যেন উদ্দেশ্য সাধনে সফলতা লাভ করতে পারি। আপনি আমাকে আরবী পড়ার জন্য কোন টাকা পয়সা না দেন, তাতে আমি দুঃখ পাবনা। শুধু আপনার খেদমতে একান্ত অনুরোধ পাঁচ ওয়াক্ত নামায বাদে আপনি আমার জন্য দোয়া করতে ভুলবেন না। আল্লাহ্ যেন আমাকে কামিয়াব করেন, আমি যেন জীবনে সাফল্য মন্ডিত হয়ে ফিরতে পারি। এই দোয়াই শুধু আপনার খেদমতে চাই। আপনি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন না। আমার যাতে মঙ্গল হয় করুনা ময়ের দরবারে দোয়াটুকু অবশ্যই করতে ভুলবেন না। আপনি দোয়া করলেই আমি সবচেয়ে বেশী খুশি হব। আমি আমার উদ্দেশ্য সফল না করে দেশে ফিরব না। মাকে আমার ভক্তিপূর্ণ সালাম ও দোয়া করতে বলবেন। ভুল ত্রুটি ও বেয়াদবী মার্জনা করবেন। ইতি–

আপনার দোয়া প্রার্থী পুত্র
শামছুল হক

ইলম অন্বেষী শামছুল হক দেওবন্দ পৌঁছে তার মনে হলো বেহেশতে পৌঁছে গেছি। সেখানে ছাত্রদের অভ্যর্থনা ও তার খাতির তওয়াজে তিনি অত্যাধিক মুগ্ধ হলেন। বিগত বছর গুলিতে তিনি কোন দিন এত আদর এত স্নেহ ও ভালবাসা দেখানোর লোক পাননি। শুরু হলো তার মাদ্রাসা জীবন।

www.pathagar.com

থানভীর সোহবতে ঃ

তখন ছিল রজব মাস। বার্ষিক পরীক্ষা হয়ে মাদ্রাসা দু'মাসের জন্য বন্ধ হলো। মাওলানা শামছুল হক মনে করলেন বন্ধের সময় মাদ্রাসায় থাকার চেয়ে হাকীমুল উম্মত হযরত থানভীর সোহবতে থাকা শ্রেয় হবে। তাই তিনি তাঁর নিকট পত্রের মাধ্যমে অনুমতি নিয়ে থানা ভবনে গমণ করলেন।

হযরত থানভীর দরবারে নিয়ম ছিল কোন ছাত্রকে তিনি বায়াত করতেন না। দাওরায়ে হাদীস ফারেগ মাওলানাদেরও তাঁর কাছে বায়াত হবার সময় অনেক ঘুরতে হত। কিন্তু কী আশ্চর্য! ছাত্র শামছুল হক বায়াত হবার কথা বলার সাথে সাথে তিনি সমস্ত নিযামকে বাদ দিয়ে বায়াত করে নিলেন। অথচ শামছুল হক তখন মাদ্রাসার ছাত্রও হননি। তাই লোকে বলে "রতনে রতন চিনে" থানভী (রহঃ) ঠিক চিনতে পেরেছিলেন যে, এই শামছুল হক একদিন বিরাট ওলী হবে। অতএব তিনি নিজেই তাকে গড়ে তোলার দায়িত্ব নিয়ে নিলেন।

থানভীর পরামর্শ ক্রমে তিনি সাহারানপুরে মিশকাত পর্যন্ত পড়া শোনা করেন। প্রতিটি ক্লাসের প্রতিটি কিতাব তিনি স্পষ্টভাবে বুঝে পড়েছেন। ইসলামী আইন শাস্ত্রের কিতাব হিদায়া তিনি উস্তাদের কাছে পড়ার পর ৬৫ বার গভীর ভাবে মুতালাআ' (অধ্যয়ন) করেছেন। সাহারানপুরের পর তিনি দেওবন্দে দাওরায়ে হাদীস পড়েন। সাহারানপুর থেকে থানা ভবন ৩০/৩৫ মাইলের দূরত্ব। প্রতি বৃহস্পতিবার মাওলানা শামছুল হক একমাত্র মুর্শিদের ছোহবতের জন্য এতখানি পথ পায়ে হেঁটে থানা ভবনে গমণ করতেন। শুক্র বার জুমআর পর সেখান থেকে রওনা করে আবার মাদ্রাসায় চলে আসতেন। দেওবন্দ পড়া কালীনও তিনি এরূপ করতেন। তাঁর চার বছর মাদ্রাসা জীবনে তিনি ২০৮ বার থানা ভবনে হযরত থানভী (রহঃ) এর দরবারে গমণ করেন।

দেওবন্দে তিনি সীহাহ্ সিত্তাহ্র কিতাবসহ আরো অনেক কিতাবে পারদর্শিতা লাভ করেন। তিনি হাদীসে যেমন দক্ষ হয়েছিলেন, তেমন তাফসীরে হয়েছিলেন পন্ডিত। উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ আদিব মাওলানা এজাজ আলীর কাছে পড়ে তিনি হয়েছিলেন বিদগ্ধ ও ঝানু আদিব। আর থানভীর সোহবাতে তিনি হয়েছিলেন খাঁটি আল্লাওয়ালা।

কর্মজীবন ঃ

মাদ্রাসা জীবনে তিনি কখনো দেশে আসেননি। এমনকি বাড়ীর কোন চিঠি পত্রও তিনি পড়েননি। সমস্ত চিঠি তিনি জমা করে মাদ্রাসা জীবনের শেষ পরীক্ষা সমাপ্ত করে পড়েছেন। কিন্তু তিনি দেশ, দেশের মানুষকে এক মুহূর্তের জন্য

www.pathagar.com

ভুলেননি। দাওরায়ে হাদীস ফারেগ হবার পর তিনি ব্যাকুল হয়ে উঠেন দেশের খেদমতের জন্য। তারপুরা কর্মজীবন ছিল মানুষের জন্য অনুসরণীয়। আমাদের জন্য আদর্শ। হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভীর (রহঃ) সংস্পর্শে তিনি এমন খাঁটি হয়েছিলেন যে, রাসূল (সাঃ) এর প্রতিটি গুণ তাঁর মধ্যে প্রবেশ করেছিল। নিম্নে তার কিছু নযীর পেশ করা হলো ঃ

নির্লোভ ব্যক্তিত্ব ঃ

জাগতিক প্রাচুর্য ও সম্পদের লোভ তাঁর ছিল না। জীবন ধারণের জন্য, প্রয়োজন পরিমাণ সম্পদকে তিনি যথেষ্ট মনে করতেন। দেওবন্দ থেকে ফারেগ হবার পর স্বাধীন রাজ্য হায়দ্রাবাদের প্রধান বিচারপতির চেয়ে মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানীর কাছে সেখান থেকে পত্র এলো। মাওলানা মাদানী মাওলানা শামছুল হককে পাঠাবার মনস্থ করলেন। মাওলানা শামছুল হককে এ খবর দেওয়া হলে তিনি বললেন- হুযুর! আমার মন চায় দেশে ফিরে জনগণের খেদমত করতে। প্রধান বিচারপতির বেতন ছিল তখন ৬ শত টাকা বর্তমানে ৬ লাখেরও অধিক।

মাওলানা মাদানী শামছুল হকের কথা শুনে অত্যন্ত খুশি হলেন। তিনি বুঝলেন শামছুল হক সাধারণ ছেলেদের মত নয়। সে উঁচু দরজার আলেম। যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও এমন একটা আকর্ষণীয় পদের লোভ তাকে স্পর্শ পর্যন্ত করল না। তাই তিনি বললেন- অপেক্ষা কর! বাংলাদেশ থেকে কোন অফার (প্রস্তাব) আসে কি না। কিছু দিন পর ব্রাহ্মণবাড়ীয়া থেকে দেওবন্দে একজন শাইখুল হাদীস (বুখারী শরীফের শিক্ষক) চেয়ে পত্র এলো। বেতন ৬০ টাকা। মাওলানা শামছুল হক এ প্রস্তাব সাগ্রহে গ্রহণ করলেন। তিনি মাওলানা মাদানীকে বললেন ঃ হুযুর! অত টাকার আমার প্রয়োজন নেই। ১০ টাকা হলে আমার চলে। বললেন, আমাকে দিও। মাওলানা শামছুল হক তাই করতেন। এ মাদ্রাসায়ই তিনি সদর সাহেব নামে পরিচিত হন।

একবার তৎকালীন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল আইয়ুব খান তার পক্ষে সমর্থন দেবার জন্য মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরীকে ১০ লাখ টাকার একটা চেক পকেটে গুঁজে দেন। তিনি সে চেক ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন।

এছাড়া তিনি তাঁর লিখিত বই পুস্তকের কোন স্বত্ত্বাধিকার রাখেননি। প্রকাশকদের দিয়ে দিয়েছেন। ইসলামের প্রচারের জন্য। তিনি কোন মাহফিলে বয়ান করতে গেলে তাদের কাছ থেকে কোন হাদিয়া নিতেন না। শুধু যাতায়াতের খরচই হুযুরকে তারা দিতে পারত। এমন স্বার্থ ত্যাগী লোক পৃথিবীতে ক'জন মিলে।

www.pathagar.com

পীরে কামেল ঃ

স্বর্ণকারগণ স্বর্ণ-রৌপ্য আগুনে জ্বালিয়ে যেমন খাঁটি করে তোলেন। তেমনি হাকীমুল উম্মত তরীকতের মহান গুরু মাওলানা আশরাফ আলী থানভীর শাসনে এবং যত্নে মাওলানা শামছুল হক খাঁটি মানুযে খাঁটি বুযুর্গে পরিণত হয়েছিলেন। তিনি থানভীর বায়আত যেমন ছাত্রাবস্থায় লাভ করেন তেমনি খেলাফতও পান আগে আগেই। তবে প্রথম দিকে তিনি খেলাফত নিতে চাননি। তবে মাওলানা থানভী ইন্তেকালের কিছুদিন পূর্বে যফর আহমদ উসমানীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, শামছুল হক তো খেলাফত নিতে চায় না তবে আমার খেলাফতের নিদর্শন হিসেবে এই পাগড়ীটি তাকে দাও। তখন হযরত শামছুল হক যফর আহমদ উসমানীকে বললেন- কাউকে যেন এ ঘটনা না জানান। যফর আহমদ উসমানীও মাওলানা শামছুল হককে খেলাফত দান করেন।

কিন্তু শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ) পীর-মুরিদীর কাজ করতে চাননি। তার কাছে কেহ বায়আত হতে এলে মুহাম্মাদুল্লাহ হাফেজ্জী হুযুরের কাছে তাকে পাঠিয়ে দিতেন। তিনি হাতে গোনা কয়েকজনকে মুরীদ করেছিলেন। তাঁর মুরীদ সংখ্যা কম হলেও তার কামালাতিতে কমতি ছিলনা। অনেকে বলে থাকে তিনি থানভী (রহঃ) এর খেলাফত পাননি। এটা ঠিক নয়। তাঁর খলিফা ছিল নিতান্তই কম। তাঁর প্রথম খলিফা গওহারডাঙ্গা মাদ্রাসার সাবেক মোহতামিম মাওলানা আব্দুল আজিজ (রহঃ)। এছাড়া মাওলানা খলিলুর রহমান মাদারীপুর, মাওলানা আনোয়ারুল হক মাদারীপুর, মাওলানা নূর মোহাম্মদ (রহঃ) নড়াইল প্রমূখ উল্লেখ্য।

মুজাহিদে আযম বা মহাসংগ্রামী ঃ

মাওলানা শামছুল হক আজীবন ন্যায়ের পক্ষে অন্যায়ের বিরুদ্ধে হকের পক্ষে বাতেলের বিপক্ষে সংগ্রাম করেছেন। তাঁর এ সংগ্রামে কোন রাজনৈতিক দূর্ভিসন্ধি ছিল না। একমাত্র আল্লাহর হুকুম পালনার্থে তিনি সংগ্রাম করেছেন। যদি কোন বন্ধু বা আত্মীয়ও ইসলামের বিপক্ষে কথা বলত তিনি তার সমুচিত জবাব দিতে দ্বিধা করতেন না। এতে যদি তার সাথে সম্পর্ক ছিন্নও হত তাতে তিনি পরোয়া করতেন না। তৎকালীন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট মার্শাল আইয়ূব খান ইসলাম বিরোধী মুসলিম পারিবারিক আইন পাশ করলে তিনি তার সাক্ষাতে এর তীব্র সমালোচনা করেন। আইয়ূব খানকে সে আইন বাতিল করতে বলেন। কিন্তু আইয়ূব খান বিভিন্ন অজুহাতে সে আইন বাতিল করেননি।

www.pathagar.com

১৯৬৬ সালে নির্বাচনের পূর্বে আইয়ূব খান বাংলাদেশে এসে আলেমদের ডেকে তার পক্ষ সমর্থনের কথা বলেন। আইয়ূব খানের বক্তব্যের মধ্যে সদর সাহেব দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করেন। আইয়ূব খানের ইসলাম বিরোধী পদক্ষেপ গুলো তিনি তাকে শুনিয়ে দেন। এতে প্রেসিডেন্ট ক্ষিপ্ত হয়ে বলেন তুমি কার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছ জান "ম্যায় পাঠান কা বাচ্চা পাঠান হোঁ।" তখন মাওলানা শামছুল হক নির্ভীক চিত্তে দরাজ গলায় সিংহের মত গর্জন দিয়ে বলেছিলেন- তুমি জান, তুমি কার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছ "ম্যায় মুসলমান কা বাচ্চা মুসলমান হোঁ।"

আইয়ূব শাহীর প্রতিটি ভুল ও অন্যায় পদক্ষেপের বিরুদ্ধে তিনি এভাবে সোচ্চার হয়েছেন। শুধু সরকার কেন যখন যেভাবে বাতিল ইসলামের উপর মুসলমানদের উপর আক্রমণ চালাতে চেষ্টা করেছেন, তিনি তা রুখে দিয়েছেন।

একবার খৃষ্টান পাদ্রী পায়ার সরকারের অনুমতি নিয়ে চট্রগামে খৃষ্টান ধর্ম প্রচারের মধ্যে আগমণ করেন। মাওলানা শামছুল হক তাদেরকে চ্যালেঞ্জ করলেন ইঞ্জিল কিতাব সঠিক নয়। তিনি সেখানের মানুষকে পাদ্রীদের ধোকার হাত থেকে বাঁচাবার জন্য বই লিখলেন, পাদ্রীদের গোমর ফাঁক আল্লাহর প্রেরীত ইঞ্জিল কোথায়? তিনি পায়ারের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়লেন। যদি তিনি অবিকৃত ইঞ্জিল শরীফ দেখাতে পারেন তাহলে তার বিরোধীতা তিনি করবেন না।

তিনি আরো একটি পুস্তিকা রচনা করলেন 'শত্রু থেকে হুঁশিয়ার'। পাদ্রীদের ধর্মান্তরিত করার ষড়যন্ত্রকে মানুষের মাঝে ফাঁস করে দেবার জন্য তিনি "আঞ্জুমানে তাবলীগুল কুরআন" নামে একটা সংগঠন করেন। এ সংগঠনের কর্মীরা চট্রগ্রামে সাধারণ মানুষদেরকে বুঝাতে লাগলেন। তারা যাতে পাদ্রীদের ফাঁদে পা না দেয়। এভাবে তাদের সজাগ করতে লাগলেন। পাদ্রীরা তার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন। নারায়ণগঞ্জের এক গীর্জা থেকে জনৈক পাদ্রী লালবাগ মাদ্রাসায় একখন্ড ইঞ্জিল শরীফ নিয়ে এলেন। মাওলানা শামছুল হক (রহঃ) ইঞ্জিল শরীফের খন্ডটি হাতে নিয়ে উল্টিয়ে পাল্টিয়ে দেখে বললেন হযরত ঈসা (আঃ) এর উপর আল্লাহর তরফ থেকে যে ইঞ্জিল নাযিল হয়েছিল তা ছিল সুরইয়ানী ভাষায় আর এই ইঞ্জিল দেখছি হিব্রু ভাষায় লিখিত। সুতরাং এটা আল্লাহর প্রেরীত ইঞ্জিল নয়। এটা জন পলের লেখা কিতাব। পাদ্রী তখন লজ্জিত হয়ে ক্ষমা চায়। এরপরে বাংলাদেশ থেকে পাদ্রী পায়ারসহ সকল পাদ্রী তাদের তল্পি তল্পা গুটিয়ে বিদায় হয়। জনগণের মাঝে তাই যেন এ রব শোনা যায় ঃ

কেশর ফুলিয়ে সিংহ উঠেছে জেগে
লেজ গুটিয়ে নেকড়ে গেছে তাই ভেগে।

www.pathagar.com

কলম সৈনিক ঃ

তরবারী দ্বারা শত্রুর দেহ খন্ড বিখন্ড হয়। কিন্তু মাওলানা শামছুল হকের কলমে বাতিলের হৃদয় হয় দীর্ণ। তার প্রতিটি বই বাতিলের জন্য এক একটা মাইন সম কাজ করে। তৎকালীন সবচেয়ে বড় ফেৎনা পাদ্রীদের ধর্মান্তরিত করণ ষড়যন্ত্রকে তিনি লিখনির মাধ্যমে নস্যাৎ করেন। তার লিখিত পাদ্রীদের গোঁমর ফাক, আল্লাহর প্রেরীত ইঞ্জিল কোথায়? শত্রু থেকে হুঁশিয়ার। পাদ্রীদের অন্তরে কাঁপন সৃষ্টি করে।

অপর দিকে তাঁর লিখিত বই পুস্তক হাজার হাজার মানুষকে হিদায়েতের পথ দেখায়। মানব জীবনের প্রায় প্রতিটি দিক নিয়েই তিনি পুস্তক পুস্তিকা রচনা করেছেন। তার বই পড়ে পাশ্চাত্য ধর্মহীন শিক্ষায় শিক্ষিত বহু লোক ওহীর শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হয়। তার লেখা যেন যাদুর মত মানুষের মনকে পরিবর্তন করে দেয়। তাই কবিতার ভাষায় বলতে হয় ঃ

চাইব না আর অনেক বেশী, একটি মানুষ পেলেই খুশি
পথ হারাদের পথ দেখাতে একটি মানুষ অনেক বেশী।

প্রতিভার মূল্যায়নকারী ঃ

তিনি ছিলেন বিরল প্রতিভার অধিকারী। নিজ প্রতিভা বিকাশে তিনি যতটুকু পরিশ্রম করেছেন, যত্ন নিয়েছেন, অন্যের প্রতিভা বিকাশে তার চেয়ে কোন অংশে কম চেষ্টা করেননি। তিনি যাকে যে দিকে ঝোঁকা দেখেছেন তাকে সেদিকে বাড়িয়ে দিয়েছেন। উৎসাহ দিয়েছেন কাজ করবার, সাহস দিয়েছেন পথ চলার, সাহায্য করেছেন প্রাণান্তকর। বাংলা ভাষায় আজ আমরা বুখারী পড়ছি। এটা তাঁরই সুবাদে। তাঁর একনিষ্ঠ ছাত্র মাওলানা আজিজুল হককে দিয়ে তিনি এ মহৎ কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন। তাবলীগ জামাতের বাংলাদেশের মরহুম আমীর মাওলানা আব্দুল আজিজ সাহেবকে তিনিই হযরতজী ইলিয়াস (রহঃ) এর নিকট প্রথম প্রেরণ করেন। এভাবে তার কাছে যে কেউ যে প্রতিভা নিয়ে গমণ করেছেন তাকে সেদিকে তিনি কাজে লাগিয়ে দিয়েছেন।

মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা ঃ

মাওলানা শামছুল হক যেখানেই সফর করেছেন হয় একটা মাদ্রাসা না হয় মসজিদ মক্তব প্রতিষ্ঠা করেছেন। ঐতিহ্যবাহী লালবাগ, গওহারডাঙ্গা, বড় কাটারা মাদ্রাসা তারই প্রতিষ্ঠিত। এছাড়া জামেয়া ইমদাদিয়া ফরিদাবাদ, আজিজিয়া শামছুল উলূম চন্দ্র দিঘলিয়া, গোপালগঞ্জ জামেয়া মোহাম্মাদিয়াসহ কয়েক হাজার মাদ্রাসা স্থাপন করেন।

www.pathagar.com

াকওয়াবান মানব দরদী ঃ

মাওলানা শামছুল হক ছিলেন অত্যাধিক তাকওয়াবান। তার তাকওয়ার ষয়গুলো ছিল খুব সূক্ষ্ম। যা সাধারণ মানুষ কোন দোষই মনে করেনা সেটাও তনি পরহেজ করতেন। ছাত্ররা একবার মাদ্রাসার কদু গাছ মরে গেছে বিধায় কটে গর্তে ফেলে দিয়েছে। গাছের কিছু পাতা তাজা ছিল। মাদ্রাসার ক্যাশিয়ার াষ্টার উমর সাহেব হুযুরের খুব ভক্ত। তিনি তাজা পাতা গুলো কেটে হুযুরের াড়ীতে নিয়ে গেলেন তাঁর গাভীকে খাওয়াতে। হুযুর দেখে জিজ্ঞেস করলেন াষ্টার সাহেব তোমার মাথায় ওগুলো কি? তিনি বললেন ছাত্ররা কদু গাছ কেটে ড্রনে ফেলে দিয়েছে আমি তাই গাভীর জন্য নিয়ে এলাম। হুযুর বললেন দাম কত? মাষ্টার সাহেব বললেন- এগুলোর তো কোন দাম নেই। ফেলে দেওয়া জিনিস। হুযুর বললেন- ফেলে দেওয়া জিনিস তো পচে মাদ্রাসার মাটি বাড়বে। আমি তা আনব কোন অধিকারে? যাও ওগুলোর দাম ঠিক করে আন।

মাষ্টার সাহেব তখনই মাদ্রাসার মুহতামিম সাহেবকে জানালে তিনি কয়েক আনা দাম ধরে দিলেন। সদর সাহেব হুযুর পকেট থেকে পয়সা গুলো বের করে দিলেন। এমন হাজার ঘটনা রয়েছে তার জীবনে। একবার এক গরীব কৃষক আনুমানিক আড়াই সের দুধ এনে হুযুরকে হাদিয়া দিলেন। হুযুর বললেন তোমার গাভীতে কতটুকু দুধ হয়। তিনি বললেন আড়াই সের। হুযুর বললেন তুমি গরীব মানুষ সব দুধ আমাকে হাদিয়া দিলে তোমরা কি খাবে। তিনি এক পোয়ার মত দুধ রেখে সব ফেরত দিলেন।

আরেকটি ঘটনা। ১৯৮০ সাল। আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। এবছর মাওলানা শামছুল হক প্রতিষ্ঠিত খাদেমুল ইসলাম জামাআতের অঙ্গ সংগঠন খাদেমুল ইসলাম ছাত্র পরিষদের আত্ম প্রকাশ ঘটলে আমাকে উক্ত সংগঠনের কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও দফতর সম্পাদক পদের দায়িত্ব দেওয়া হয়। পরে সাধারণ সম্পাদক ও সভাপতিও নিযুক্ত করা হয়।

১৯৮৬ সালে আনুষ্ঠানিক ভাবে এসংগঠন থেকে অব্যাহতির পর মূল সংগঠনের সাথে আমি সম্পর্ক রাখি। এসময় উক্ত সংগঠনের কেন্দ্রীয় আমীর মাওলানা আব্দুল মান্নান সাহেব ভুল সংশোধন বইটি পূণরায় ছাপার জন্য আমার উপর দায়িত্ব দেন। উক্ত বইটির ছাপা কমপ্লিট করে বাধাঁইয়ের কাজ দেখতে আমি একদিন সেখানে হাজির হই। একটা বই হাতে নিয়ে দেখছিলাম। কিন্তু পাশেই পঞ্চাশোর্ধ এক বৃদ্ধ আমার হাতের বইটি অপলক নেত্রে নিরীক্ষণ করছিলেন। একটু কাছে এসেই দু'এক কথা বলতে বলতে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। অত্যন্ত আবেগ ভরা কণ্ঠে আমাকে বললেন এটা কি বই। আমি বললাম বাতেল বিরোধী

www.pathagar.com

অমিয় সুধা। তিনি বিনয়ের সাথে বললেন কে লিখেছেন এটা? আমি বললা মুজাহিদে আযম মাওলানা শামছুল হক। একথা বলতেই তিনি কেঁদে ফেললেন কান্না থামলে আমি তার সাথে কথা বলতে বলতে গন্তব্যের দিকে হেঁটে চললাম তিনি তার নাম ঠিকানাসহ পরিচয় দিয়ে বললেন শামছুল হক ফরিদপুরী যে ক বড় মানব দরদী ছিলেন তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ আমি। তিনি তার ঘটনা বলতে শু করলেন–

আমার পিতা-মাতা রোগে এক সময় অকাল বৃদ্ধ হলেন। আমি আয় করা মত একমাত্র সন্তান কিন্তু ম্যাট্রিক পাশ করে আমি বেকার। এক সময় জানতে পারলাম লালবাগ মাদ্রাসার সদর সাহেব হুযুরের কথা। হাজির হলাম তা দরবারে। আমার সব ঘটনা জানালে তিনি পরের দিন নিজে বাংলা একাডেমীতে আমাকে নিয়ে গেলেন। তখন একাডেমীর চেয়ারম্যান ছিলেন ডঃ মুহাম্ম শহীদুল্লাহ। হুযুরের আগমনে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করলেন তিনি। অবশেষে হুযু তার কাছে আমাকে দিয়ে এলেন। বললেন ছেলেটি যেন মানুষ হয়। সত্য বলতে দ্বিধা নেই। এখন আমি গ্রামের দশ জনের একজন। ঘটনা বলতে বলতে লোকটি আবার আবেগ আপ্লুত হলেন। এটা ছিল সদর সাহেবের দরদী প্রাণের পরিচয়।

শিক্ষার মানোন্নয়নকারী ঃ

মাওলানা শামছুল হক শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য একটা উসূল বাতলে গেছেন- মানকুলাতের সাথে যুগ উপযোগী মা'কুলাত সংযোজন। তাই তিনি কওমী মাদ্রাসার শিক্ষার প্রকৃত উন্নতি সাধনে কওমী মাদ্রাসা বোর্ড গঠন করেন। য এখনও তার দায়িত্ব সুন্দর ভাবে আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছে। দাওরায়ে হাদী ফারেগীনের জন্য তিনি সাহিত্য সাংবাদিকতা ও গবেষণা একাডেমী ইদারাতুল মা'আরিফ প্রতিষ্ঠা করেন ফরিদাবাদে। কিন্তু দুঃখের বিষয় ৭১ সালে যুদ্ধের প তা আর প্রতিষ্ঠিত থাকে নি। তবে বর্তমানে রাজধানীর মিরপুরে মাদ্রাসা দারু রাশাদে তা পুনরায় পূর্বের নামে চালু হয়েছে।

মোট কথা মাওলানা শামছুল হক যে অবদান রেখে গেছেন তা কখনও ম্লা হবার নয়। যুগ যুগ ধরে মানুষ তার থেকে উপকৃত হতে থাকবে। এই সত্যে মহান সাধক ১৯৬৯ সালে ২১ জানুয়ারী আমাদের থেকে বিদায় গ্রহণ করেন তিনি আমাদের মাঝে না থাকলেও তার মহামূল্যবান বাণী, তার লিখিত রচনাবলী আমাদের সত্যের পথে দিক নির্দেশনা দিয়ে যাবে।

= ০০০ =

www.pathagar.com

হযরত সদর সাহেব (রহঃ) সম্পর্কে কিছু অভিব্যক্তি

মাওলানা খলিলুর রহমান

মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ) কে ইলমের ময়দানে সমুদ্রতূল্য পেয়েছি। তিনি আমলের ময়দানে পাহাড়তূল্য প্রতীক ছিলেন। বাতিলের মুকাবিলায় খালিদ সাইফুল্লাহ ছিলেন। আল্লাহ পাকের ধ্যানের সমুদ্রে আলাউদ্দীন আল সাবের (রহঃ) ছিলেন। উম্মতের চিন্তার ক্ষেত্রে রাসূলে পাক (সাঃ)-র রঙ্গে রঞ্জিত ছিলেন। মানব জাতির সেবায় মোমের মত জীবনকে বিলিয়ে দিয়েছেন।

এদেশে ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সমূহের গোড়াপত্তনে তাঁর অগ্রণী ভূমিকা ছিল। যথা ঃ-

* মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা
* দাওয়াত ও তাবলীগ
* ইসলামের ভিত্তি কুরআনী মক্তব মিশন এবং
* তাসাওউফ-মা'রেফাতের সঠিক রূপরেখা।

হযরত সদর সাহেব (রহঃ) চার মাযহাবের উজ্জ্বল প্রদীপ ছিলেন এবং মক্কা শরীফে উক্ত চার মাযহাবের উলামায়ে কেরাম তাঁর থেকে ফয়েজ ও বরকত লাভ করেছেন।

আত্মশুদ্ধির ব্যাপারে হুযুরকে আগের যুগের মনীষীদের ভিতরে গণ্য করা যায়। যেমন- ইমাম গায্‌যালী (রহঃ), মাওলানা জালালুদ্দীন রূমী (রহঃ)সহ আরও অনেক। রূহানী রোগগুলো তাঁর সামনে বসলে এমনি এমনি ঝরে পড়ে যেত এবং রূহ উন্নতির পথে অগ্রসর হতো। হুযুরের সামনে যারা যেত তাদের অবস্থা এই হত যে, মাখলুকাত বিলীন হতে হতে খালিক ও মালিকের তৌহিদের সাগরে নিজকে বিলিয়ে দিত।

এক সময় বাদশাহ ফয়সাল বিশ্বের মুসলিম জাহানকে এক প্লাট ফর্মে দাঁড় করানোর জন্য আহবান জানিয়ে ছিলেন। পাকিস্তান থেকে হযরত ফরিদপুরী (রহঃ) দাওয়াত পেয়েছিলেন। কিন্তু তৎকালীন আইয়ুব সরকার প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। এ জন্য হযরত মনে খুব ব্যথা পেয়ে বলেছিলেন আমি জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে চেয়েছিলাম কিন্তু পাক সরকার তা করতে দেয় নাই।

হযরত সদর সাহেব (রহঃ) বলতেন আল্লাহর কোরআনকে বুঝার জন্য পাক ভারত উপমহাদেশ এবং মধ্যপ্রাচ্যের কিতাবাদি বিভিন্ন ভাষায় অধ্যয়ন

www.pathagar.com

করেছিলাম। আত্মশুদ্ধি প্রসঙ্গে আলোচনা করতে যেয়ে বলেছিলেন- আমার পীর থানভী (রহঃ) আমার শরীরের প্রতিটি লোমকূপ পর্যন্ত পরীক্ষা করে আত্মশুদ্ধি করেছিলেন। এরপর তিনি বলেন- আল্লাহ পাক আমাকে ইলমে লাদুন্নী দান করেছিলেন। আল্লাহ পাক এই নাচিজ শামছুল হককে কোরআন শরীফের প্রতিটি শব্দ বুঝিয়ে দিয়েছেন। শুধু একটি সূরা, (কুল ইয়া আয়্যুহাল কাফিরূন) আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে শরহে সদর হচ্ছিল না। উক্ত ব্যথা নিয়ে মক্কা শরীফে হজ্ব আদায় করে উটের পিঠে জেদ্দা আসছিলাম এবং একটা কিতাব দেখছিলাম। আর আল্লাহর দরবারে আবেদন করছিলাম- হে আল্লাহ ! আমার অন্তরকে আলোকিত করে দাও। তখনি আল্লাহর পক্ষ হতে উক্ত সুরার তাফছির আমার দিলে এসে যায়।

হযরত সদর সাহেব (রহঃ) যে সকল কিতাব রচনা করে গেছেন নিজের মনগড়া একটা কথাও তাতে নাই। তিনি বলে গিয়েছেন- আমার লিখিত বই-পুস্তকের একটা শব্দ ও ভাষা পরিবর্তন করবে না। কারণ আমি একটা কথাও আল্লাহর পক্ষ হতে ইঙ্গিত না পাওয়া পর্যন্ত লিখি নাই।

ইলমে হাদীসের ময়দানে হযরত সদর সাহেব (রহঃ) ছিলেন আগের যামানার মুহাদ্দেসদের কাতারের মানুষ। তিনি তাঁর উস্তাদ মুহাদ্দেসুল আছর হযরত শাহ আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহঃ)-র ইলমের ওয়ারিশ বা উত্তরসূরি ছিলেন। হাদীসের মধ্যে হযরত শাহ সাহেবের কথা কেউ উল্লেখ করলে সদর সাহেব দিশেহারা হয়ে যেতেন। কেমন যেন হুযুর ইলমে নূরের মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছেন।

হযরত মুজাহিদে আযম (রহঃ) ছিলেন খুলুসিয়াতের জ্বলন্ত নমুনা। যে কোন দেশের যে কোন অঞ্চলে যেয়ে হয় সে অঞ্চলে একটা হিফজখানা, না হয় মক্তব খানা প্রতিষ্ঠিত করতেনই। যেমন- কুমিল্লার এক সফরে কোন এক জায়গায় জলসা করতে গিয়েছিলেন। জলসা কর্তৃপক্ষ হুযুরকে কিছু হাদিয়া দিলেন। হুযুর উক্ত হাদিয়ার টাকা কর্তৃপক্ষের হাতে ফেরৎ দিয়ে বললেন- এই টাকা দিয়ে আপনারা একটা মক্তব প্রতিষ্ঠা করবেন। কয়েক বছর পরে হযরত ঐ এলাকাতে সফরে যেয়ে জানতে পারলেন উক্ত মক্তবটি দাওরায়ে হাদীস মাদ্‌রাসায় পরিণত হয়েছে।

ঢাকার বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রাক্কালে অনেক বাধার সম্মূখীন হয়। তৎকালীন সরকার সেখানে মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হতেই দেবে না। এ ব্যাপারে সরল প্রাণ কিছু মুসলমান ব্যবসায়ী হযরতের শরণাপন্ন হলে হুযুর বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করলেন- যাও তোমরা ওখানে মসজিদ প্রতিষ্ঠা কর। আমি তোমাদেরকে সব ধরণের সাহায্য করব। তারপর সরকারী সমস্ত প্রকার বাধা উঠে যায়। আজ সেখানে একটি জাতীয় মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

www.pathagar.com

ইসলাম ধর্মকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়। এ'তেক্বাদাত, ইবাদাত, মু'আমালাত, মু'আশারাত ও আখলাক।

মু'আমালাতের ব্যাপারে হযরত সদর সাহেব (রহঃ) ছিলেন অতুলনীয়। যেমন- তাঁর আম্মার দানকৃত এক বিঘা জমিতে বর্তমান গওহারডাঙ্গা মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠা। ইন্তেকালের পরে অছিয়ত মোতাবেক মাদ্রাসা থেকে তাঁর কবরের জন্য একটু জায়গা দেওয়া হয় এবং উক্ত জায়গায়ই তিনি সমাহিত হন। উল্লেখ্য জীবিতাবস্থায়ই তিনি জমির টাকা পরিশোধ করে যান।

রাজনীতির প্লাটফর্মে অসাধারণ যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন সদর সাহেব হুযুর (রহঃ)। এক সময় নবাবজাদা লিয়াকত আলী খান ইসলামের কতগুলি ব্যাপারে কোরআন সুন্নাহ বিরোধী আইন পার্লামেন্টে পাশ করে। মুজাহিদে আযম সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিবাদ করেন। উক্ত আইনের প্রতিবাদে পূর্ব পাকিস্তানে আন্দোলনের ঝড় উঠে যায়। এর কয়েক দিন পরেই নবাবজাদা লিয়াকত আলী খান আততায়ীর গুলিতে নিহত হন।

হযরত সদর সাহেব (রহঃ) সাহাবায়ে কেরামের পূর্ণ-উত্তরসূরি ছিলেন। দুনিয়াত্যাগি মানুষ ছিলেন। ঢাকার বুকে জীবন কাটিয়েছেন অথচ ঢাকাতে কোন বাসা-বাড়ি বা ব্যবসা বাণিজ্যের চিন্তাও করেন নাই। ফরিদাবাদ মাদ্রাসার জায়গাটিকে হুযুরের বসবাসের জন্য কলিকাতার বিখ্যাত ব্যবসায়ী ওয়াছেল মোল্যার ছেলে কবীর মোল্লা দান করতে চেয়েছিলেন। হুযুর এই শর্তে কবুল করেন যে, আমাকে উক্ত জায়গার মালিকানা দিতে হবে- যেন আমি যে কোন উপায়ে তা ব্যবহার করতে পারি। উক্ত জায়গায়ই হুযুর ফরিদাবাদ মাদ্রাসা স্থাপনের জন্য ওয়াক্ফ করে দিয়েছিলেন। এইরূপ দুনিয়া ত্যাগের অনেক ইতিহাস রয়েছে।

হযরত সদর সাহেবের (রহঃ) গওহারডাঙ্গার দেশের বাড়ীতে একটি পাকা ঘরও করেন নাই। ঘরের বেড়া পাটখড়ি দ্বারা দিয়েছিলেন। গ্রামের লোকেরা বলেছিল- হুযুর আপনার বাড়ীতে একটি পাকা পায়খানা করে দেই। উত্তরে হুযুর বলেছিলেন দেশের মানুষ পাটখড়ি-নাড়া দিয়ে পায়খানা করবে আর আমার বাড়ী পাকা পায়খানা হবে তা হতে পারে না।

পূর্ব পাকিস্তানে প্রথম প্লাবনে যখন সারা দেশ প্লাবিত হয়ে যায় ঐ সময় হুযুর বাড়ীতে ছিলেন। নিজের বাড়ী মাদ্রাসা মসজিদ সব পানিতে ডুবে গিয়েছিল। বাড়ীতে রান্নার কোন উপায় ছিলনা। আম্মা সাহেবা কিছু খৈ কোন ভাবে সংগ্রহ করে নাস্তা খেতে দিয়েছিলেন। হুযুর তাই খেয়ে মাদ্রাসায় বসে বসে কিতাব দেখতে ছিলেন। মাদ্রাসার শিক্ষকরা জানতে পেরে হুযুরকে বলেছিলেন- হুযুর ! মাদ্রাসার বোর্ডিং-এ খানা পাকানো হয়েছে- সেখান থেকে কিছু খেলে ভাল হয়।

www.pathagar.com

হুযুর বলেছিলেন- মাদ্রাসার খানা আমি শামছুল হক কেমন করে খেতে পারি ? তদুত্তরে মুদাররেসীনে কেরাম বলেছিলেন- হুযুর আমরা তার মূল্য দিয়ে দেব। তদুত্তরে হুযুর বলেছিলেন- আমার প্রয়োজন হলে আমি কিনে খাব। তোমাদের দরকার কি ? এইরূপ বহু ত্যাগের জ্বলন্ত নমুনা হুযুরের মধ্যে ছিল- যা আগের যুগের অলীদের মাঝে ছিল।

হুযুর যখন আশরাফুল উলূম মাদ্রাসায় দ্বীনি খেদমত করছিলেন হযরত মাওলানা আজিজুল হক সাহেব বলেন- তখন হযরত সদর সাহেব একাকী কাধে গামছা ও লুঙ্গি নিয়ে গোসল করতে চলে যেতেন এবং সঙ্গে কোন খাদেম থাকত না।

পাকিস্তানের মুফতী মাওলানা তকী উসমানী বলেন- আমি একবার পূর্ব পাকিস্তানে সফরে এসে বড়কাটারা মাদ্রাসায় অবস্থান করি। আছরের পরে হুযুরের সাথে সাক্ষাৎ করতে যেয়ে দেখি কালো একটা দস্তরখান বিছায়ে সাধারণ তন্দুর রুটি ছোলার ডাল দিয়ে খাচ্ছেন। তা দেখে আমি বিস্মিত হয়ে যাই এবং মনে মনে বলতে থাকি যে, পাক ভারত উপমহাদেশের মুজাহেদে আযম এই ধরনের খানা খাচ্ছেন !

এক সময় হযরত সদর সাহেব (রহঃ) চট্টগ্রাম সফরে যান এবং লাভলেইন মাদ্রাসায় অবস্থান করেন। আমি তখন পটিয়া মাদ্রাসায় সাক্ষাতের জন্য চট্টগ্রাম আসি। আমাকে হুযুর উপদেশ দিতে যেয়ে বলেন যে, মিয়া আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্ক জুড়বে এবং তারেকুদ দুনিয়া (দুনিয়া ত্যাগী) হয়ে যাও।

হযরত সদর সাহেব (রহঃ) প্রতি বৃহস্পতিবার দেওবন্দ থেকে থানাভবন পায়ে হেঁটে যেতেন। শুক্রবার সেখানে থেকে শনিবার খুব ভোরে এসে ছবক পড়তেন। হুযুর নিজে আমাদেরকে একদিন বলেছিলেন- হযরত থানভী (রহঃ) প্রসঙ্গক্রমে বলেছিলেন- তোমার দাওরা অবশ্যই পড়তে হবে। তুমি বক্তৃতা করতে পারবা না। তুমি একমাত্র আল্লাহর জিকির ও কোরআন তেলাওয়াত ছাড়া আর কোন কথা বলতে পারবানা। এই সময় আমি মিশকাত শরীফ পড়তাম। আর তখন আমার নিকট কোন টাকা পয়সা ছিল না, কারো নিকট কিছু চাওয়ারও অনুমতি ছিল না। এই সময় এক ব্যক্তি আমাকে ধরে নিয়ে প্রত্যেকদিন খানা খাওয়াতো, খানা খাওয়ার পরে আমাকে চলে যাওয়ার কথাও বলতোনা বা বসেন তাও বলতোনা। এ দ্বারা আমি বুঝতে পারতাম- এ খাদ্য আল্লাহর পক্ষ হতে ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর দ্বারা হযরত সদর সাহেবের মুজাহাদার জিন্দেগীর পরিচয় পাওয়া যায়।

=== ০০০ ===

www.pathagar.com

আত্মত্যাগী মহাপুরুষ

গোলাম সোবহান সিদ্দিকী

বাংলাদেশে আল্লাহর মেহেরবানীতে আলিম উলামার অন্ত নেই। কেবল এটুকু বললেই সম্পূর্ণ সত্যকথা বলা হয় না। তার চেয়েও বড় সত্য কথা এই যে, বিশ্বের অঞ্চলে আলিম তৈরীর যতো কারখানা আছে তা হয়তো বিশ্বের অপর কোন মুসলিম দেশে খুঁজে পাওয়া যাবে না। যারা দুনিয়ায় বিভিন্ন দেশ সফর করেছেন তারা বলেন যে, বাংলাদেশে আলিম তৈরীর যেমন কারখানা আছে, অন্য কোন মুসলিম দেশে তা দেখা যায়না। এক সময় নাকি বাংলাদেশের একটা মাত্র জেলায় মাদ্রাসার সংখ্যা ছিল দশ হাজার। তাহলে সেখানে ছাত্র সংখ্যা কতো ছিল, বছরে সেখান থেকে কতো আলিম বের হতেন, তা অতিসহজে অনুমান করা যেতে পারে।

বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষার দুটি ধারা চালু আছে সরকারী এবং বেসরকারী। অন্যায় ভাবে এবং ছল-চাতুরীর মাধ্যমে বৃটিশরা এদেশের শাসন ক্ষমতা কবজা করার পর তারা এখানে সরকারী মাদ্রাসা গড়ে তোলে নিজেদের মতলব হাসিল করার জন্য। অন্যথায় ইংরেজদের আগমনের পূর্ব থেকে এখানে বেসরকারী মাদ্রাসা-ই চালু ছিল।

বাংলার পলাশী প্রান্তরে ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন মুসলমানদের ভাগ্য বিপর্যয়ের সুযোগে ইংরেজ বেনিয়ার দল শাসন ক্ষমতা কুক্ষিগত করে। কোন কিছু কবজা করতে হলে আগে কবজা করতে হয় তার শিক্ষা ব্যবস্থা আর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ইংরেজরা এখানে নিজেদের শাসন স্থায়ী করার উদ্দেশ্যে সে কাজই করেছে সর্ব প্রথম। তারা কেবল সরকারী মাদ্রাসাই গড়ে তোলেনি, বরং এখানে আধুনিক শিক্ষার নামে সেক্যুলার শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করেছে। কালক্রমে সেক্যুলার শিক্ষা ব্যবস্থাই এ দেশে স্থায়ী ভাবে চালু হয়। পূর্ব থেকে যে সব বেসরকারী মাদ্রাসা চালু ছিল, ইংরেজরা সুকৌশলে সেগুলি বন্ধ করে দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করে। একদিকে বেসরকারী মাদ্রাসা গুলো বন্ধ করে দেওয়া হয় অথবা এমন ব্যবস্থা করা হয়, যাতে সেগুলো নিজে নিজে বন্ধ হতে বাধ্য হয় অপরদিকে তারা নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করে।

সরকারী বেসরকারী উভয় মাদ্রাসা থেকে বহু নাম করা আলিমে দ্বীন সৃষ্টি হয়েছেন, যারা সমাজ জীবনে বহু প্রভাব ফেলেছেন। মশহুর আলিমে দ্বীনদের অন্যতম হচ্ছেন মরহুম মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ)। আল্লাহ তাঁর রূহকে শান্তি দান করুন এবং তাঁর দ্বীনী খেদমত সমূহ কবুল করুন!

www.pathagar.com

আমি ষাটের দশকের প্রথম দিকে ঢাকায় আগমণ করি এবং ঢাকা আলি মাদ্রাসায় কামিল দ্বিতীয় বর্ষ (হাদীস)-এ ভর্তি হই। আমার দুর্ভাগ্য যে, মরহু মাওলানা ফরিদপুরী এবং মাওলানা নূর মুহাম্মাদ আযমী (রহঃ)-র সঙ্গে ঘনি যোগাযোগ করার সুযোগ হয়নি। এ দু'জন বুযুর্গ আলিমে দ্বীনের সঙ্গে আম কেবল একদিন সাক্ষাতের সুযোগ হয়েছিল। কি এক প্রয়োজনে কোন এক মুরব আমাকে মাওলানা ফরিদপুরী (রহঃ)-এর নিকট লালবাগ মাদ্রাসায় প্রের করেছিলেন, যা জামেয়া কোরআনিয়া আরাবিয়া নামে খ্যাত ছিল। সেখানে গি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করি। তিনি ছিলেন বিনয়ের মূর্ত প্রতীক। অল্প সময় তাঁ সোহবতে বসলেও তাঁর স্মৃতি সারাজীবন আমার মনে রেখাপাত করে।

মাওলানা নূর মুহাম্মাদ আযমী (রহঃ) থাকতেন ফরিদাবাদ মাদ্রাসায়। সেখা প্রধানত তাঁরই উদ্যোগে ইদারাতুল মা'আরিফ নামে একটা প্রতিষ্ঠান গ উঠেছিল। কোন এক সেমিনারে তাঁকে নিয়ে আসার জন্য আমি ফরিদাবা মাদ্রাসায় গমণ করি। সেখানে তাঁর কাছে গিয়ে দেখি, তিনি একটা কক্ষে মেঝেতে বসে লেখার কাজে ব্যস্ত। তাঁর চারদিকে অনেক কিতাব পত্র খোল রয়েছে। তিনি এসব বই থেকে উপকরণ নিয়ে নিরলসভাবে লিখে চলেছেন যতদূর মনে পড়ে, তিনি মিশকাত শরীফ বাংলা অনুবাদের কাজে ব্যস্ত ছিলেন আমি অল্প সময় তাঁর সংসর্গে অতিবাহিত করি। ইতিমধ্যে তিনি প্রস্তুত হলে তাঁ নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। জীবনে একবার মাত্র তাঁর সোহবতে যাওয়ার সুযোগ হলে সে স্মৃতি আমি কখনো ভুলতে পারব না। দীর্ঘদিন পর আজও সে স্মৃতি আমা মনের কোনে বার বার উঁকি মারে।

এখানে একটা কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মাওলানা ফরিদপুরী ছিলে বেসরকারী মাদ্রাসায় শিক্ষিত। প্রকারান্তরে মাওলানা নূর মোহাম্মাদ আযমী ছিলে সরকারী মাদ্রাসায় শিক্ষিত। দু'বিপরীত ধর্মী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে বেরিয়ে এলে চাল-চলন, বেশ-ভূষা, চিন্তা ধারায় আর বিনয়-নম্রতায় উভয়ের মধ্যে কো বৈপরীত্য ছিল না। বরং দু'জনেই ছিলেন অতি কাছাকাছি। দু'জনেই এখলাস আ নিষ্ঠার সাথে দ্বীনের খেদমত করে গেছেন।

জনাব মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ) সম্পর্কে জানার জন্য আ অধ্যক্ষ আব্দুর রাজ্জাকের সঙ্গে আলোচনা করি। তাঁর নিকট থেকে জানতে পা যে, তিনি এন্ট্রান্স পাশ করে কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে ইন্টারমিডিয়ে শ্রেণীতে ভর্তি হন। এ সময় তাঁর মনে পরিবর্তন আসে। তিনি কলেজে পড়াশু ত্যাগ করে সোজা গমণ করেন মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ)-এ দরবারে এবং মাওলানা থানভীর পরামর্শ ক্রমে তিনি সাহারানপুর মাদ্রাসায় ভ

www.pathagar.com

হন। এখানেই তিনি মিশকাত পর্যন্ত শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং পরে দারুল উলূম দেওবন্দ মাদ্রাসায় ভর্তি হন। সেখানে শিক্ষা জীবন সমাপ্ত করে তিনি দেশে ফিরে আসেন এবং শিক্ষকতায় আত্মনিয়োগ করেন। প্রথমে তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়া মাদ্রাসায় যোগদান করেন। কিছুকাল সেখানে কাটাবার পর তিনি পুরাতন ঢাকার বড়কাটারার এক বিল্ডিংয়ে আশরাফুল উলূম মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন।

আশরাফুল উলূম মাদ্রাসা বড় কাটারা মাদ্রাসা নামে খ্যাত ছিল। এখানে তখন তাঁর সহযোগী ছিলেন মশহুর বুযুর্গ আলিম মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্হাব (রহঃ), পীরজী হুযুর (রহঃ) এবং মাওলানা মুহাম্মাদুল্লাহ হাফেজ্জী হুযুর (রহঃ) পঞ্চাশের দশকের গোড়ার দিকে পীরজী হুযুরের সঙ্গে মাওলানা ফরিদপুরীর মতপার্থক্য দেখা দিলে তিনি আরো কয়েকজন শিক্ষকসহ আশরাফুল উলুম মাদ্রাসা ত্যাগ করেন এবং লালবাগ শাহী মসজিদকে কেন্দ্র করে জামিয়া কুরআনিয়া আরাবিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। পীরজী হুযুরের সঙ্গে মতপার্থক্যের প্রেক্ষিতে মাওলানা ফরিদপুরী (রহঃ) আশরাফুল উলুম মাদ্রাসা ত্যাগ করলেও তাঁদের উভয়ের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় ছিল। এমনকি উভয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যেও কোন বিরোধ ছিল না। বলা চলে তাঁদের এ বিরোধ ছিল একান্তভাবে নীতিগত।

কেবল মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা নয়, বরং তাঁর সমস্ত কাজেই ইখলাস আর লিল্লাহিয়াতের ছাপ দেখা যায়। লালবাগ জামেয়া কুরআনিয়া আরাবিয়ার প্রধান হিসেবে তিনি অতি সামান্য ভাতা গ্রহণ করতেন এবং কেল্লার মোড়ের পিছনে একটা চিপা গলিতে একখানা টিনের ঘরে দীন-হীনের মত জীবন যাপন করতেন। তিনি যখন ঢাকায় আগমণ করেন, তখন ইচ্ছা করলে ঢাকা শহরে একাধিক বাড়ি করা আর বিলাস বহুল জীবন যাপন করা তাঁর জন্য মোটেই অসম্ভব ছিল না। কিন্তু সেদিকে তিনি আদৌ মনোনিবেশ করেননি। তিনি ছিলেন সত্যিকার অর্থে একজন সমাজ সংস্কারক। ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজের যেখানেই বিকৃতি দেখেছেন সেখানেই তিনি সংশোধনের উদ্দেশ্যে প্রতিবাদ করেছেন।

মাওলানা আকরম খাঁর তাফসীরুল কোরআন প্রকাশিত হলে তিনিই আলেমদের মধ্যে একমাত্র ব্যক্তি, যিনি পবিত্র কোরআনের অপব্যাখ্যা এবং 'তাফসীরের নামে সত্যের অপলাপ' নামে পুস্তিকা রচনা করে তাঁর ভুল ভ্রান্তি নির্দেশ করেন। তাই বলে মাওলানা আকরম খাঁর সঙ্গে তার কোন ব্যক্তিগত বিরোধ বা বিদ্বেষ দেখা দেয়নি। বরং উভয়ে মিলে ইসলাম বিরোধী কাজের প্রতিবাদ করেছেন। এমনি এক সংশোধন প্রয়াসে একদা তিনি মাওলানা মওদূদীর নিকটও পত্র প্রেরণ করেছেন। সে পত্রের নকল আমার সামনে নেই, তবে মাওলানা মওদূদী (রহঃ) সে পত্রের যে জবাব দিয়েছেন, তা থেকে পত্রের

www.pathagar.com

বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। একটা ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে আমরা পত্রখানার অংশ বিশেষ এখানে নকল করছি, যা থেকে তাঁর সংশোধন প্রয়াসী মানসিকতার পরিচয় ফুটে ওঠে।

১৯৬৬ সালের ৪ আগষ্ট মাওলানা ফরিদপুরীর নিকট প্রেরিত এক পত্রে মাওলানা মওদূদী লিখেন ঃ

মুহতারাম মাওলানা,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ। আপনার ২২শে জুলাইয়ের পত্র পেয়েছি। আমার সঙ্গে আপনার যেমন আন্তরিক সম্পর্ক রয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ-আপনার সঙ্গেও আমার তেমনি আন্তরিক সম্পর্ক রয়েছে এবং আমি মনে করি যে, আপনি যা কিছু বলেন, লিল্লাহ এবং ফিল্লাহই বলেন। কিন্তু আমার ধারণা যে, কিছু কিছু লোক আমার সম্পর্কে বছরের পর বছর ধরে যে সব কথা ছড়াচ্ছে, ব্যস্ততার কারণে আপনি সে সবের তাহকীক করতে পারেন না। অবশ্য সেসব কথা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আপনি আমার কল্যাণ কামনায় কতিপয় পরামর্শ দিয়েছেন। আমি চাই যে, আপনি একটু কষ্ট করে তাহকীক করুন এবং আরো স্পষ্ট করে আমাকে বলুন। আপনি লিখেছেন যে, আপনার রচনায় পাঠকদের মনে সলফে সালেহীন এবং বুযুর্গানে দ্বীনের প্রতি বেয়াদবী এবং অসম্মান অনুভূত হয়। কেবল এতটুকু অস্পষ্ট কথা দ্বারা আমি কেমন করে বুঝব যে, কেমন সে বেয়াদবী আর অসম্মান রয়েছে? কোন বক্তব্যে কার বেয়াদবী আমার দ্বারা হয়েছে- নির্দিষ্ট করে সে স্থানগুলো আমি জানতে পারলে তা সংশোধন করতে পারি। নির্দিষ্ট করে না বললে কি সংশোধন করব? আমি জেনে শুনে কারো অসম্মান করে থাকলে আমি জানতে পারব যে কোনদিকে আপনি ইঙ্গিত করেছেন?

মিয়ারে হক তথা সত্যের মানদণ্ড সংক্রান্ত পাঠ সংশোধন করার কথা আপনি বলেছেন। কিন্তু আমার ধারণা সে পাঠ আপনি নিজে কখনও দেখেননি। বরং কেবল তার চর্চাই শুনে থাকবেন। বরং আপনি দয়া করে মাওলানা আব্দুর রহীম সাহেব বা গোলাম আযম সাহেবকে বলুন জামায়াতের গঠনতন্ত্রের সে মূল পাঠ আপনাকে দেখাবার জন্য, যা নিয়ে বছরের পর বছর ধরে অনেক কথা হচ্ছে। তার শব্দমালা এবং যে প্রেক্ষাপটে সে শব্দমালা ব্যবহার করা হয়েছে আগে তা পাঠ করে দেখুন। এরপর আমাকে বলুন, আপনি এতে কি সংশোধনের প্রয়োজন অনুভব করেন?

আপনি একথাও বলেছেন যে, তুমি একটা অছিয়ত বা সাধারণ ঘোষণা করে দাও যে, শরীয়তের ব্যাপারে লোকেরা যেন আমার ব্যক্তিগত মতের তাকলীদ না

www.pathagar.com

করে, বরং সর্ববাদী সম্মত হক্কানী ওলামাদের অভিমত অনুযায়ী চলে। সম্ভবতঃ আপনার জানা নেই যে, যেদিন জামায়াতে ইসলামী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেদিনই আমি ঘোষণা দিয়েছি যে, ইলমী শরয়ীর ব্যাপারে কেউ যেন আমার ব্যক্তিগত মতের তাকলীদ না করে। এ ঘোষণা এখনো জামায়াতে ইসলামী প্রকাশিত রোয়েদাদ বা কার্যবিবরণীতে বর্তমান। এরপরও বহুবার একথা পূনর্ব্যক্ত করেছি যে, শরীয়তের মাসআলার ব্যাপারে আমি যে সমস্ত মতামত ব্যক্ত করি তা ফতোয়া হিসেবে নয়, বরং ওলামাদের চিন্তা-গবেষণার জন্যই প্রকাশ করি। এসব কথা সময়ে সময়ে প্রচারও করা হয়ে আসছে।

এখন আপনি আমাকে কোন নতুন ঘোষণা করতে বলছেন? আমি যদি দশ-বিশ বারও ঘোষণা করি এবং রাতদিন তা পুনর্ব্যক্ত করি, তাহলেও যেসব আলিমরা আমার বিরোধিতায় কসম খেয়ে নেমেছেন, তাঁরা নিজেদের সেই ভাল কর্ম থেকে বিরত হবেন না এবং আমাদের দ্বীনদার শ্রেণীর মধ্যে এমন অনেক সরলমনা ও নেক নিয়তের বুযুর্গ বর্তমান থাকবেন, যারা এদের দ্বারা ধোকা খাবেন। এ কারণে আমি সবর এবং আল্লাহর নিকট সোপর্দ করার ফয়সালা করেছি। আমি তাঁদের সমালোচনার জবাব দেবনা, বরং আমার নিজের কাজ করে যাব। আপনি একমাত্র বলেছেন যে, জামায়াতের কিছু কর্মী এখনও আছে, যারা বুযুর্গানে দ্বীনের সমালোচনা করে থাকে। আমি চাই যে, এমন কোন ব্যক্তি সম্পর্কে আপনার জানা থাকলে বা ভবিষ্যতে জানতে পারলে আমাকে বা ঢাকায় মাওলানা আব্দুর রহীম সাহেবকে অবশ্যই অবহিত করুন, যাতে তাঁকে শাস্তি এবং শিক্ষা দেওয়া যায়। নিছক অস্পষ্ট উক্তি দ্বারা মন অস্থির হয় ঠিকই, কিন্তু সংশোধনের উপায় থাকে না।

হযরত ওসমান, হযরত যুবায়ের, হযরত তালহা, হযরত আলী এবং হযরত মুয়াবিয়া রাযিআল্লাহু আনহুম প্রমুখ সম্পর্কে আমি যা কিছু লিখেছি, এখন গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হচ্ছে, কিতাব প্রেস থেকে আসার পর এককপি আপনার খেদমতে প্রেরণ করা হবে। গোটা কিতাব অধ্যয়ন করার পর সেসব স্থান চিহ্নিত করুন যা আপনার দৃষ্টিতে আপত্তিকর। শোনা কথায় মত স্থির করার চেয়ে মূল জিনিস দেখে নেয়া উত্তম (এখানে খেলাফত ও মুলূকিয়াত গ্রন্থের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।)

আপনার সম্পর্কে জানতে পেরে আমি ভীষণ অস্থিরতা ও অস্বস্তি বোধ করছি। আল্লাহর নিকট দোয়া করছি, তিনি আপনাকে শেফা দান করুন এবং আপনার দ্বারা দ্বীনের খেদমত গ্রহণ করুন। বিগত সফরে এমন কিছু ব্যস্ততা ছিল, যার কারণে আপনার সঙ্গে সাক্ষাত করতে না পারার জন্য দুঃখিত। ওয়াস সালাম-খাকসার আবুল আ'লা।

www.pathagar.com

গোটা সমাজটাকে তিনি ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার-বিশ্লেষণ এবং মূল্যায়ণ করতেন। যেখানেই তিনি ইসলাম থেকে বিচ্যুতি লক্ষ্য করতেন, সেখানে তিনি ইসলাহ বা সংশোধনের জন্য প্রয়াস চালাতেন। বলা বাহুল্য যে, তাঁর ইসলাহ বা সংশোধন প্রয়াসেও ছিল ইখলাস, নিষ্ঠা আর লিল্লাহিয়াত। হাদীসের পরিভাষায় যাকে বলা হয়েছে হুব্বু ফিল্লাহ আর বুগ্যু ফিল্লাহ- কেবল আল্লাহর জন্যই ভালবাসা এবং আল্লাহর জন্যই ঘৃণা করা। হুব্ব ফিল্লাহ আর বুগ্য ফিল্লাহর প্রেরণায় আপ্লুত হয়েই তিনি উক্ত পত্র লিখেছিলেন মাওলানা মওদূদীর নিকট। সংশোধন ছিল তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য। অন্যথায় সংগঠন হিসাবে জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক ছিল না।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছিল যে, গোঁড়ার দিকে তিনি ছিলেন ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত। কলেজে পড়াকালে তাঁর মনে পরিবর্তন আসে এবং কলেজ ত্যাগ করে তিনি মাওলানা থানভী (রহঃ)-এর দরবারে হাযির হন। তখন আমাদের দেশের সরকারী আর বেসরকারী মাদ্রাসা গুলোতে শিক্ষার মাধ্যম ছিল উর্দূ ভাষা। যার ফলে মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত আলিমরা ভাল বাংলা জানতেন না। মাওলানা ফরিদপুরী ছিলেন এর ব্যতিক্রম। শুরুতেই স্কুল কলেজে শিক্ষালাভ করার কারণে তিনি ভাল বাংলা জানতেন। তাই বাংলা ভাষায় গ্রন্থ রচনা আর অনুবাদের কাজেও তিনি হাত দেন এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার কাজও অব্যাহত রাখেন। অনুরূপভাবে উপমহাদেশের অপর একজন খ্যাতনামা আলিমের নামও উল্লেখ করা যায়- যিনি প্রথম জীবনে ছিলেন ইংরেজী শিক্ষিত। পরবর্তীকালে আরবীভাষা আয়ত্ব করেও সরাসরি কুরআন-হাদীসের জ্ঞান অর্জনের প্রতি মনোনিবেশ করেন এবং একজন মশহুর আলিম হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন।

এই শেষোক্ত ব্যক্তিও মাওলানা থানভী (রহঃ)-এর সরাসরি সংস্পর্শে আসেন। ইনি হচ্ছেন মাওলানা আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদী। সারাটা জীবন সাহিত্যসাধনা, গ্রন্থ রচনা এবং সাংবাদিকতার কাজে তিনি নিয়োজিত ছিলেন। প্রচুর ইসলামী গ্রন্থ রচনা, অনেক মূল্যবান দার্শনিক ইংরেজী গ্রন্থের উর্দূ অনুবাদ ছাড়াও উর্দূ এবং ইংরেজীতে প্রণীত তাফসীরে মাজেদী তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি। সুখের বিষয় তাফসীরে মাজেদীর বাংলা অনুবাদও প্রকাশনার কাজ শুরু হয়েছে এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রথম খণ্ড ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে দ্বিতীয় খণ্ডের কাজ চলছে।

জনাব মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ) অসংখ্য গ্রন্থ রচনা ও অনুবাদ করে গেছেন। বাংলাভাষায় মুসলিম লেখক ও গ্রন্থপঞ্জি গ্রন্থে রাজশাহী

www.pathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব লাইব্রেরিয়ান জনাব মুহাম্মাদ আব্দুর রাজ্জাক তাঁর সম্পর্কে যে বিবরণ দিয়েছেন, এখানে তা পেশ করছি।

জনাব আব্দুর রাজ্জাকের বিবরণ অনুযায়ী ঃ

মাওলানা ফরিদপুরী ১৮৯৫ সালে ফরিদপুর জেলায় জন্ম গ্রহণ করেন।

১৯৪৮ সালে এমদাদীয়া লাইব্রেরী থেকে তাঁর অনূদিত হাদীসে আরবাঈন বা চল্লিশ হাদীস প্রকাশিত হয়। মূলতঃ এটি ইবনে দাকীক আল-ঈদ সংকলিত হাদীসের অনুবাদ।

১৯৫০ সালে সূরা ইয়াসীন এর তাফসীর প্রকাশিত হয়। এরপর প্রকাশিত হয় নামাযের ফযিলত।

১৯৬৬ সালে এর নবম সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

২৭২ পৃষ্ঠার হজ্জের মাসায়েল এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৫৫ সালে।

২২৪ পৃষ্ঠার মুনাজাতে মকবুল প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালে।

মাওলানা আজিজুল হকের সহযোগিতায় বুখারী শরীফের বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৯৫১ সালে হামিদিয়া লাইব্রেরী থেকে।

১৫৬ পৃষ্ঠার নূরুল কুরআন প্রকাশিত হয় হামিদীয়া লাইব্রেরী থেকে। ১৯৫৯ সালে গওহার ডাঙ্গা খাদেমুল ইসলাম দারুল মুতালায়া থেকে প্রকাশিত হয় বৃটিশ শাসনের বিষফল নামে ২৯ পৃষ্ঠার একটা পুস্তিকা। কছদুস ছাবীল বা মারেফাত শিক্ষা প্রকাশ পায় এমদাদীয়া লাইব্রেরী থেকে।

১০৮ পৃষ্ঠার এ বইটির ষষ্ঠ সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৫৫ সালে এমদাদীয়া লাইব্রেরী থেকে। এটি মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রচিত উর্দূ গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ।

৪০ পৃষ্ঠার এসলাহে নফস বা আত্মশুদ্ধি গ্রন্থের চতুর্থ মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছে এমদাদীয়া লাইব্রেরী থেকে ১৯৬৯ সালে।

৬৩ পৃষ্ঠার সাফাইয়ে মোয়ামালাত বা হালাল রুজী প্রকাশিত হয়েছে এমদাদীয়া লাইব্রেরী থেকে। ১৯৬৯ সালে এর ষষ্ঠ সংস্করণ হয়। চার খণ্ডে তাবলীগে দ্বীন প্রকাশিত হয়।

১৯৬৬ সালে এমদাদীয়া লাইব্রেরী থেকে সূরা ফাতেহাসহ পাঞ্জসূরার তাফসীর প্রকাশিত হয়।

২৩৪ পৃষ্ঠার এ গ্রন্থটির ১৯৭৪ সালে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। দুইখণ্ডে সমাপ্ত তালীমুদ্দীন বা তাছাওফ তত্ত্ব খণ্ডের পঞ্চম মুদ্রণ প্রকাশিত হয় ১৯৬৩ সালে এমদাদীয়া লাইব্রেরী থেকে (পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৪২)

www.pathagar.com

৪৪ পৃষ্ঠায় তেজারতের ফযিলত এর তৃতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হয় ১৯৬৩ সালে।

২৩৩ পৃষ্ঠার ফুরুউল ঈমান এর নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৬১ সালে এমদাদীয়া লাইব্রেরী থেকে।

বঙ্গানুবাদ বেহেশতী জেওর প্রকাশিত হয় এমদাদীয়া লাইব্রেরী থেকে। তিনখণ্ডে এর মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭০৭ এবং এটি এখনো প্রকাশিত হয়ে আসছে।

১৯৬২ সালে এমদাদীয়া লাইব্রেরী প্রকাশ করে ১১৬ পৃষ্ঠার যিকিরের ফযিলত। আশরাফিয়া লাইব্রেরী প্রকাশ করে ৬২ পৃষ্ঠার বাংলা ফরায়েজ।

৩১২ পৃষ্ঠার হক্কানী তাফসীর প্রকাশ করে ১৯৬১ সালে হামিদিয়া লাইব্রেরী থেকে।

হক্কানী তাফসীর পাঞ্জসূরা প্রকাশ করে হামিদিয়া লাইব্রেরী ১৯৬১ সালে (পৃষ্ঠা১৫৭)।

সোবহানিয়া লাইব্রেরী প্রকাশ করে ১৯৬৪ সালে তাযকেরাতুল আউলিয়া ।
৪২০ পৃষ্ঠার হায়াতুল মোসলেমীন বা মোসলেম সঞ্জীবনী দুইখণ্ডে প্রকাশিত হয় এমদাদীয়া লাইব্রেরী থেকে।

১৯৬১ সালে সোবহানিয়া লাইব্রেরী প্রকাশ করে ১৯৮ পৃষ্ঠার আলকাওলুল জামীল ও শেফাউল আলীল এর বঙ্গানুবাদ।

এছাড়া তাঁর অনূদিত বা লিখিত যেসব বই এবং পুস্তিকার নাম পাওয়া যায় তা এই–

(১) জীবনের পণ	(১৪) ওমর ইবনে আব্দুল আযীয
(২) চারি ইঞ্জিল	(১৫) সংক্ষেপে ইসলাম
(৩) শরীয়তের দৃষ্টিতে পারিবারিক আইন	(১৬) সংক্ষেপে ইসলামী জিন্দেগী
(৪) ঈদের চাঁদঃ সমস্যা ও সমাধান	(১৭) বিদায় হজ্জ
(৫) তিন তালাকঃ সমস্যা ও সমাধান	(১৮) ঘূর্ণি ঝড়ের কারণ কি?
(৬) পবিত্র কুরআনের অপব্যাখ্যা	(১৯) ভোটারের দায়িত্ব
(৭) তাফসীরের নামে সত্যের অপলাপ	(২০) বায়আত নামা
(৮) ইসলামী পরিবার পরিকল্পনা	(২১) দোসরা সবক
(৯) পরিবার পরিকল্পনার ফতোয়া	(২২) তওবা নামা
(১০) জীবন্ত মসজিদ	(২৩) জুমার খুতবা আরবীতে কেন?
(১১) মসজিদ	(২৪) পীরের পরিচয় মুরীদের কর্তব্য
(১২) তোহফা	(২৫) প্রশ্ন উত্তরে তাসাওফ
(১৩) নেতার কর্তব্য	(২৬) মুক্তির পথ

www.pathagar.com

(২৭) তাসাওফ কাহাকে বলে?
(২৮) তাসাওফ তত্ত্ব
(২৯) তাবলীগে দ্বীন
(৩০) এলেমের ফযিলত
(৩১) রোযার ফযিলত
(৩২) নামাযের অর্থ
(৩৩) সহীহ্ নামায শিক্ষা
(৩৪) দ্বীনীয়াত ও নামায শিক্ষা
(৩৫) তাবলীগ
(৩৬) তাবলীগের ফযিলত
(৩৭) পান্জ সূরার তাফসীর
(৩৮) তাফসীরে আশরাফী
(৩৯) আমালে কোরআনী
(৪০) বেদআত ও এজতেহাদ
(৪১) ইংরাজী পড়িব না কেন?
(৪২) জিহাদের আহবান
(৪৩) জিহাদের ফযিলত
(৪৪) মাতৃ জাতির মর্যাদা
(৪৫) সতর্কবানী
(৪৬) পাদ্রীদের গোমর ফাঁক,
(৪৭) আল্লাহর প্রেরিত ইঞ্জিল কোথায়?
(৪৮) শত্রু থেকে হুশিয়ার থাক,
(৪৯) আজল বা জন্ম নিয়ন্ত্রণ,
(৫০) ভুল সংশোধন,
(৫১) ভোট সম্পর্কে শরীয়তের নির্দেশ,
(৫২) মাতাপিতার হক,
(৫৩) পতিত পাবন
(৫৪) আল্লাহর পরিচয়,
(৫৫) মানুষের পরিচয়,
(৫৬) কোরআনের তা'লীম,
(৫৭) হাদীস রত্ন ভাণ্ডার,
(৫৮) আদর্শ প্রস্তাব,
(৫৯) বিশ্বকল্যাণ,
(৬০) হালাল হারাম,
(৬১) জিহাদের ডাক,
(৬২) জামায়াতী জেন্দেগী,
(৬৩) কন্যার বিবাহে পিতার উপহার,
(৬৪) যুদ্ধের সময় দেশবাসীর কর্তব্য,
(৬৫) অসৎ আলেম ও পীর,
(৬৬) এই জামানায় ইসলামী নেজাম সম্ভব নয়,
(৬৭) খেদমতে খালক বা দুস্থ মানবতার সেবা,
(৬৮) আট রাকায়াত না বিশ রাকায়াত,
(৬৯) খাদেমুল ইসলামের কর্মসূচী,
(৭০) খাদেমুল ইসলাম জামায়াতের পরিচয়,
(৭১) জনসেবা,
(৭২) জনগণের কর্তব্য,
(৭৩) শিক্ষা কমিশনের সমালোচনা,
(৭৪) প্রাথমিক আদর্শ শিক্ষা,
(৭৫) মোয়াল্লেম ট্রেনিং,
(৭৬) মাদ্রাসা শিক্ষা পদ্ধতি
(৭৭) ইসলামের অর্থনীতি,
(৭৮) কুটির শিল্প ও ইসলাম,
(৭৯) অসিয়ত নামা,
(৮০) নেয়ামত পত্রিকা,
(৮১) কোরআনের উপর হস্তক্ষেপ বরদাশ্‌ত করা যাইবে না,
(৮২) ইসলামী ও অনৈসলামিক নেজামের পার্থক্য,
(৮৩) বেহেশ্‌তী গওহার,
(৮৪) আদর্শ মুসলিম পরিবার ও উহার সুষ্ঠু পরিকল্পনা

www.pathagar.com

রাজশাহী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব লাইব্রেরিয়ান জনাব আব্দুর রাজ্জাকের দেয়া তথ্য থেকে জানা যায় যে, মরহুম জনাব শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ)-এর অধিকাংশ বইয়ের প্রকাশ এমদাদিয়া এবং হামিদিয়া থেকে। দু'একটা বই আশরাফিয়া এবং সোবহানিয়া লাইব্রেরী থেকেও প্রকাশ করেছে। আরো জানা যাচ্ছে যে, তাঁর প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ১৩৪। এগুলোর মধ্যে মূল বই এবং অনুবাদ দুইই রয়েছে। চটি বই বা পুস্তিকা যেমন আছে তেমনি আছে বেহেশতী জেওরের মত প্রকাণ্ড গ্রন্থও, যার পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭০৭। ভাবতে অবাক লাগে অনেকগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা এবং একটা বিশাল মাদ্রাসার সরাসরি পরিচালক সার্বক্ষণিক ব্যস্ততার ভেতরেও এতগুলো বই লিখতে পেরেছিলেন। এজন্য তাঁকে কতইনা পরিশ্রম করতে হয়েছে! অথচ কোন বৈষয়িক স্বার্থ তাড়িত হয়ে তিনি এসব বই লিখেননি। তিনি মাওলানা থানভীর মাসলাক বা তাঁর অনুসৃত নীতি কঠোরভাবে মেনে চলতেন।

মাওলানা থানভী বয়ানুল কুরআন এবং কালীদে মসনবীর মত প্রকাণ্ড গ্রন্থ ছাড়াও ছোট-বড় প্রায় তিনশতাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। এছাড়া তাঁর ওয়াজগুলোও গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় যার সংখ্যা সাত শতাধিক। সব মিলিয়ে তাঁর গ্রন্থের সংখ্যা দাঁড়ায় এক হাজারেরও বেশী। কিন্তু এসব বই থেকে তিনি কোন অর্থ গ্রহণ করতেন না। কপিরাইটও রেখে যাননি। তাই তা উত্তরাধিকারীদের কোন সম্পদ নয়। শুধু কি এখানেই শেষ? তিনি যেসব ওয়াজ করেছেন, তার জন্য কোন বিনিময় তিনি গ্রহণ করতেন না। কেবল একজন সাধারণ যাত্রীর যাতায়াত ভাড়া গ্রহণ করতেন। আর বর্তমানে তো ওয়াজ রীতিমত একটা শিল্প বা পেশায় পরিণত হয়েছে। কত অজ্ঞাত-অখ্যাত ওয়ায়েজ এ ব্যবসায় নেমে বাড়ি-গাড়ি, ব্যবসা-বাণিজ্য ছাড়াও কাঁড়িকাঁড়ি টাকার মালিক হয়েছে। মজার ব্যাপার এই যে, ওয়াজ, মাযার সেবা বা আইন ব্যবসা এমন পেশা যার জন্য কোন আয়কর দিতে হয় না। একজন ওয়ায়েজ, একটা মাযার বা একজন আইনজীবির উপার্জন কত তা অন্যকারো জানা সম্ভব নয়। অথচ একজন চাকুরীজীবি বা একজন ব্যবসায়ীকে আয়কর দিতে হয়।

হাঁ, আমি মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ)-এর ইখলাস, নিষ্ঠা তথা আত্মত্যাগের কথা বলছিলাম যে, তিনি যা কিছু করতেন, সবই করতেন নিঃস্বার্থভাবে। অথচ প্রচলিত আইন অনুযায়ী গ্রন্থস্বত্ব লেখক বা অনুবাদকের পাওনা। এটা গ্রহণ করা নাজায়েয হওয়ারও কোন কারণ নেই। কিন্তু তাঁর আদর্শিক শিক্ষাগুরু মাওলানা থানভী (রহঃ) এটাকে তাকওয়া পরহেজগারীর খেলাফ মনে করতেন। মাওলানা ফরিদপুরীও হয়তো এরকম মনে করতেন,

www.pathagar.com

একারণে তিনি কোন বইয়ের কপিরাইট গ্রহণ করতেন না। এমদাদিয়া আর হামিদিয়া লাইব্রেরী তাঁর বই বিক্রি করে হাজার হাজার টাকা উপার্জন করেছে। এমদাদিয়া লাইব্রেরীর মালিক হাজী আব্দুল করীম প্রথমে বইয়ের দোকান দেন এবং পিতার নাম অনুসারে দোকানের নাম রাখেন হাসেমিয়া লাইব্রেরী। পরবর্তীতে দোকানের নাম পরিবর্তন করে হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী (রহঃ)-এর নামানুসারে এমদাদিয়া লাইব্রেরীর নামকরণ করেন।

ঢাকার প্রাচীন বাসিন্দারা বলেন, এ নতুন নামকরণের পর থেকে তাঁর ব্যবসা বেশ জমে উঠে। তিনি কোটি কোটি টাকার মালিক হন। এখনো এমদাদিয়া লাইব্রেরী ঢাকার সর্ববৃহৎ প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। কিন্তু লেখক যে নিঃস্বই থেকে গেলেন। মাওলানা ফরিদপুরী (রহঃ)-এর মত নিঃস্বার্থ লেখকদের সরলতার সুযোগে আইনকে ফাঁকি দেয়ার এবং লেখকদের বঞ্চিত করার সুযোগ এরা পুরোপুরিই গ্রহণ করেছে।

আজও এ ট্রাডিশন প্রকাশনা শিল্পে সমানে চালু আছে। এ যেন শিয়ালকে ভাঙ্গা বেড়া দেখানোর মত অবস্থা। এ ধারার অবসান হওয়া উচিত। আইন অমান্য করে লেখকদেরকে বঞ্চিত করা জায়েয হতে পারে না। যাই হোক, তিনি প্রকাশকদের নিকট থেকে কোন রকম আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করেননি। বরং মাদ্রাসা পরিচালনা বাবদ গৃহীত মামুলী ভাতা দিয়ে চিপা গলির একটা টিনের ঘরে দীন-হীনের মত জীবন যাপন করেছেন। এজন্য তাঁর মনে কোন রকম দুঃখবোধ ছিল না, ছিল না কোন হতাশা। বরং এহেন দুস্থের মত জীবন-যাপনেই তিনি পরম পরিতৃপ্ত এবং পুলকিত বোধ করতেন। আসলে তৃপ্তি একটা মানসিক অবস্থার নাম, যা বিত্ত-বৈভব দ্বারা অর্জন করা যায় না। কুরআন বলে- আলা বিযিকরিল্লাহি তাতমাইন্নুল কুলুব। অর্থ ঃ জেনে রাখবে, আল্লাহর স্মরণেই আত্মা পরিতৃপ্তি লাভ করে।

বর্তমানে তাঁর অনেক বই আর বাজারে পাওয়া যায় না। তাঁর প্রতিষ্ঠিত খাদেমুল ইসলাম জামায়াতও এখন আর সক্রিয় নেই। মরহুম মাওলানার সুযোগ্য সন্তান বা প্রকাশকগণ কারো যেন এদিকে খেয়াল নেই। তাঁর উত্তরাধিকারী এবং অনুসারীরা বিষয়টার প্রতি দৃষ্টি দেবেন বলে আমরা আশা করবো। বলাবাহুল্য তাঁর রচিত আর অনূদিত বইগুলো প্রকাশ করা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের উপায়।

মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ) ১৮৯৫ সালে ফরিদপুরে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১৯৬৯ সালের একুশে জানুয়ারী ফরিদপুরের গওহারডাঙ্গায় ইন্তেকাল করেন। ইন্তেকালের সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। এটাকে খুব একটা বেশী বয়স বলা যায় না। তবে তিনি যে সব কাজ করে গেছেন তা বয়সের তুলনায়

www.pathagar.com

অনেক বেশী। ইবনে রজব হাম্বলী 'তবাকাতুল হানাবেলা' নামে প্রকাণ্ড গ্রন্থ রচন করেন, যা তিরিশ খণ্ডে সমাপ্ত। তাতে শায়খ আব্দুল কাদের জিলানীর আলোচন প্রসঙ্গে একটা আরবী কবিতা উদ্ধৃত করেছেন, কবিতাটি এই—

আকুমান-নিসাউ ফামা ইয়ালিদনা শাবীহাহু
ইন্নাননিসায়া বিমিসলিহি আকুমা।

অর্থ ঃ নারীরা বন্ধ্যা হয়ে গেছে, তারা তাঁর মত সন্তান জন্ম দিতে পারে না সত্যিকথা বলতে কি, নারীরা তাঁর মত সন্তান জন্ম দিতে অক্ষম।

উক্ত কবির সাথে সুর মিলিয়ে আমরাও বলব, মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরীর মতো সন্তান জন্ম দিতে নারীরা অক্ষম, তাঁর মত মানুষ এদেশে মাটিতে আর জন্ম নেবে না। মহান আল্লাহ তাঁর রূহকে শান্তি দান করুন এব জান্নাতের উচ্চস্তরে তাঁকে স্থান দান করুন। আমীন॥

= ০০০ =

www.pathagar.com

স্মৃতির আয়নায় মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ)

মাওলানা আবদুল জব্বার জাহানাবাদী

আমি পিরোজপুর জেলার নাজিরপুর থানার অন্তর্গত সাতকাছিমিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হই ১৯৫২ সনে। মাদ্রাসার বাৎসরিক সভার নিয়মিত সভাপতি ছিলেন হযরত সদর সাহেব (রহঃ)। সভার কাজ-কর্ম সাধারণত উস্তাদের তত্ত্বাবধানে ছাত্রদের মধ্যে বণ্টন করে সম্পাদন করা হত। দীর্ঘ কয়েক বছর যাবত উলামায়ে কিরামের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থাপনার মধ্যে আমি অধমকে জড়িত রাখা হয়েছিল। এ সুযোগে হযরত সদর সাহেবের খিদমতে বার বার হাজির হবার ও খানা পরিবেশন করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল।

একবার সদর সাহেব বললেন, দুধ জ্বাল হয় নাই। তিনবার উৎলান দিলে দুধ জ্বাল হয়। সাত কাছিমিয়া মাদ্রাসায় বাৎসরিক সভা হত দু'দিন ব্যাপী। দ্বিতীয় দিন সকাল বেলা হত ছাত্রদের সাহিত্যানুষ্ঠান। বিভিন্ন বিষয়ের উপর ছাত্ররা লিখিত ও মুখস্থ প্রবন্ধ পাঠ করত। আমি ছিলাম ছাত্র জমিয়তের সেক্রেটারী। আর প্রিন্সিপ্যাল মাওলানা আবদুর রাজ্জাক ছিলেন তার সভাপতি। এ সাহিত্যানুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হতেন হযরত সদর সাহেব (রহঃ)। তিনি সাহিত্য চর্চায় আমাদের উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করতেন।

১৯৭৮ সনে আমরা যখন বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ গঠন করার উদ্যোগ গ্রহণ করি, তখন হযরত সদর সাহেব (রহঃ) আর ইহজগতে নেই। তিনি এর প্রায় দশ বছর পূর্বে আল্লাহর সান্নিধ্যে ইহকাল ত্যাগ করে চলে গিয়েছেন। এ বেফাক তথা কওমী মাদ্রাসার জাতীয় সংগঠন গড়ে তোলার জন্য সর্বপ্রথম যাঁরা উদ্যোগ নিয়েছিলেন, হযরত সদর সাহেব ছিলেন তাঁদের পুরোধা। তাঁর সহযোগী ছিলেন হযরত মাওলানা আতহার আলী সাহেব (রহঃ) এবং এ ধরণের অন্যান্য মহান ব্যক্তি। মূলতঃ বেফাক গঠনের ভিত তো এসব মুরব্বিরাই রচনা করে গিয়েছিলেন। আমরা শুধু তাঁদের লাগানো চারা গাছে পানি ঢেলে যাচ্ছি মাত্র। বেফাকের বয়স যখন তিন কি চার বছর, তখন আমি দারুন ভাবে হতাশ হয়ে পড়ি। কারণ, বেফাকের দায়িত্বশীলগণ দাওয়াতী মেহমানের মত সভায় উপস্থিত হতেন। তা-ও আবার সব সভায় উপস্থিত হতেন না।

প্রকৃতপক্ষে বেফাক যখন পরিচালক বিহীন অবস্থায় পরিচালিত হচ্ছিল, আমি তখন হতাশ হয়ে পড়ি এবং বেফাক থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাবার চিন্তা ভাবনা

www.pathagar.com

করতে আরম্ভ করি। এমতাবস্থায় হঠাৎ একদিন রাতে আমি স্বপ্ন দেখি যে, আমি বড় কাটারা মাদ্রাসায় বেড়াতে গিয়েছি। সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে দেখি সামনে নীচের দিকে যাবার আরো একটি সিঁড়ি। আমি আশ্চর্য হলাম যে, এমন সিঁড়ি তো আর কখনও দেখি নাই। তাই সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে গেলাম। গিয়ে দেখি, নীচ তলায় আর গুদাম নাই। সব খালী। পিলার, ওয়াল সব ড্যাম হয়ে লালচে হয়ে গিয়েছে। ফ্লোরের মাটিও স্যাঁৎসেতে। আমি বিস্ময়ে শুধু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছি। হঠাৎ দেখি যে, একটি পিলারে হেলান দিয়ে পশ্চিম দিকে মুখ করে বসে আছেন আমাদের প্রাণপ্রিয় মুরব্বী সদর সাহেব হুযুর। আমি মনে মনে এটাকে একটি সুবর্ণ সুযোগ মনে করলাম। ভাবলাম, এ সুযোগে বেফাকের দৈন্যদশার কথা হুযুরের নিকট তুলে ধরি। কিন্তু আবার চিন্তা করলাম, হুযুর যদি বলেন আমিতো একটা তাকরীর লিখে দিয়েছি, আবার কেন?

এ ভেবে দমে গিয়েছিলাম, পরে মনে সাহস সঞ্চয় করলাম হুযুর যাই বলুন না কেন মুরুব্বীর নিকট বিষয়টি তুলে ধরি। যা হোক সাহস সঞ্চয় করে সামনে অগ্রসর হলাম। সালাম ও মুসাফাহা করে দু'জানু হয়ে সম্মুখে বসে পড়লাম। আরয করলাম, হুযুর! বেফাকের অবস্থা খুবই করুণ। দায়িত্বশীলগণ বেফাকের কোন খোঁজ খবর নিচ্ছেন না। বলার সাথে সাথে দেখলাম চেহারা মুবারক লালবর্ণ ধারণ করল। কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর বললেন, "তুমি কোন চিন্তা করো না। আমি ইনশা আল্লাহ সব মাদ্রাসায় গিয়ে গিয়ে সবাইকে বেফাকে এনে দিব।" এর পরই ঘুম ভেঙ্গে গেল। কি দেখলাম, মনের মধ্যে এক পেরেশানী আরম্ভ হল। তখন অফিস ছিল ফরিদাবাদ মাদ্রাসায়।

ফজরের নামায পড়ে ফরিদাবাদ মাদ্রাসার মরহুম মুহতামিম হযরত মাওলানা ইসমাইল সাহেবের দরবারে হাজির হয়ে আরয করলাম, হুযুর! আমি গত রাতে একটা খা'ব দেখেছি। খাবটির একটি সুন্দর তা'বীর করে দিন। অতঃপর খা'বটি বললাম। আমার খা'ব শুনে মৃদু হাসি দিয়ে মুহতামিম সাহেব বললেন, "আরে ভাই! আপনি আর যেতে পারলেন না। আপনাকে বেফাকে থাকতেই হবে।" ব্যাখ্যা শুনে চুপ হয়ে গেলাম। আমারও বুঝতে বাকী রইল না। যেহেতু আমি সদর সাহেব হুযুরের ভক্ত। তিনি যখন আমাকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন, তখন আর আমি যাই কি করে? অগত্যা থেকেই গেলাম।

আল্লাহ ওয়ালাদের রূহানী ফয়েজ ও বরকতে বেফাক আজ একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠানের রূপ লাভ করেছে। তবে এটা আমার বা আমাদের কোন কৃতিত্ব নয়। কারণ এ গাছের চারা তো মুরুব্বীরা ও আল্লাহ ওয়ালারা রোপণ করে গেছেন। আবার এখনও তাঁদের রূহানী ফয়েজ ও বরকত দ্বারা এ চারায় পানি সিঞ্চন হচ্ছে। আমার বা আমাদের গৌরব এতটুকু যে, আমি বা আমরা এ গাছের পাহারাদারী

www.pathagar.com

করার, পানি সিঞ্চন করার সৌভাগ্য লাভ করেছি। '৭৬ সনে বেফাক গঠনের প্রস্তাব থেকে আরম্ভ করে এ পর্যন্ত আল্লাহপাক আমাকে অন্ততঃ এ খিদমতে লাগিয়ে রেখেছেন। আলহামদু লিল্লাহ! ছুম্মা আলহামদুলিল্লাহ।

আমি যখন ফরিদাবাদ মাদ্রাসায় তা'লীমের খিদমতে নিয়োজিত ছিলাম তখনকার একটি ঘটনা। ফরিদাবাদ মাদ্রাসার মূল প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন হযরত সদর সাহেব হুযুর (রহঃ) এবং তিনিই ছিলেন এর প্রধান উপদেষ্টা। আমি যখন উক্ত মাদ্রাসায় তালীমের খিদমত করে যাচ্ছি, তখন একদিন হযরত সদর সাহেব হুযুর আমাকে একখানা বই হাদিয়া দিলেন। বইখানা ছিল সাইক্লোস্টাইল করা ও উর্দু ভাষায় লেখা। বই খানার মূল প্রতিপাদ্য ছিল- "লাকাদ কানা লাকুম ফি রসূলিল্লাহি উসওয়াতুন হাসানা" অর্থাৎ নিশ্চয়ই একমাত্র আল্লাহর রাসূলের মধ্যেই রয়েছে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ।

কুরআনের এ ঘোষণার আলোকে পাকিস্তানের জনৈক বিজ্ঞ ব্যক্তি আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার একটি চমৎকার কাঠামো তৈরী করেছেন। প্রথম শ্রেণী হতে দশম শ্রেণী পর্যন্ত প্রতিটি বিষয়ে তথা সাহিত্য, অংক, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, আচার-আচরণ সবই একমাত্র হুযুরে পাক (সাঃ)-এর জীবনী থেকে সংগ্রহ করে সুন্দর ভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে একটা পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস তুলে ধরে আয়াতখানির বাস্তবতা দেখিয়ে দিয়েছেন। বইখানা আমি আদ্যোপান্ত ভাল করে পড়লাম। আমার মধ্যে এক নতুন চেতনার সৃষ্টি হল। চিন্তার খোরাক পেলাম। মনে করলাম, মুরব্বীর পক্ষ থেকে জ্ঞানার্জনের তোহফা পেলাম। কিন্তু কি উদ্দেশ্যে হুযুর আমাকে এ বই খানা উপহার দিলেন তা কিন্তু আর কখনও জিজ্ঞেস করতে যাই নাই।

একাত্তরের স্বাধীনতা সংগ্রামের পর মুক্তিবাহিনীর লোকেরা আমাদের জমিয়তের অফিস দখল করে নিল। ক'দিন পর অফিস ছেড়ে দিল ঠিকই কিন্তু অফিসের সব কিছু তারা লুণ্ঠন করে নিয়ে গেল। এ অফিসেই ছিল আমার ব্যক্তিগত কুতুবখানা। আর এ কুতুবখানায় উক্ত মূল্যবান পাণ্ডুলিপিটিও ছিল। হারালাম অনেক গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ।

যা হোক '৮১ সনের আগ পর্যন্ত আমি বুঝতে পারি নাই যে সদর সাহেব হুযুর ঐ বইটি আমাকে কেন উপহার দিয়েছিলেন। '৮১ সালে যখন আমরা ইসলামী আদর্শ ও চিন্তা-চেতনার ভিত্তিতে প্রাইমারীর পাঠ্য পুস্তক প্রণয়নে হাত দিলাম, তখন ঐ বইটির প্রয়োজনীয়তা বুঝে আসল। আর তখনই ঐ বইটি হাদিয়া দেওয়ার কারণ উপলব্ধি করতে সক্ষম হলাম। আমি নগণ্যের হাতে '৮১ সনে যে কাজটি হতে যাচ্ছে, তারই পথ নির্দেশনা মূলক গাইড বই ছিল ঐ বইটি। একজন খাঁটি আল্লাহ প্রেমিকের চোখের সামনে সম্ভবতঃ বই প্রণয়নের ছবি ভেসে

www.pathagar.com

উঠেছিল। তাই তিনি আমাকে ঐ বইটি উপহার দিয়েছিলেন। আমার মত নগণ্যের তা বুঝতে সময় লেগেছিল প্রায় ১৮/২০ বছর।

ফার্সী শ্লোক –

"কলন্দর হারচে গুয়াদ দীদা গুয়াদ"

অর্থ ঃ কলন্দর যা বলেন দেখেই বলেন।

আমি যখন ফরিদাবাদ মাদ্রাসায় অধ্যাপনায় নিয়োজিত তখন লন্ডন টাইমস পত্রিকায় হুযুর (সাঃ) সম্পর্কে কটাক্ষ করে একটি বিবৃতি ছাপা হয়েছিল। তার বিরুদ্ধে ঢাকায় প্রতিবাদ সভা ও মিছিলের আয়োজন করা হয়েছিল। ফরিদাবাদ মাদ্রাসার নেতৃত্ব দিচ্ছিলাম আমি। প্রতিবাদ সভার পূর্ব রাত্রে লালবাগ মাদ্রাসায় গেলাম সদর সাহেব হুযুরের সঙ্গে দেখা করে আয়োজনের রিপোর্ট দেয়ার জন্য। গিয়ে দেখি সদর সাহেব হুযুর অনেকখানি নিরুৎসাহিত। মনে মনে খুব দুঃখ পেলাম। হুযুর বললেন, যদি মিছিলের মধ্যে সন্ত্রাসীরা ঢুকে পড়ে কোন দূর্ঘটনা ঘটায়? কেউ যদি গ্রেপ্তার হয়? তখন এসব ঝামেলা কে পোহাবে?

কথাগুলো শুনে আমার ভারী দুঃখ হল। আমি তখন নির্ভয়ে বললাম, হুযুর! আপনাদের ন্যায় মুরুব্বীরা বিদ্যমান থাকতে যদি আমরা একটু রাস্তায় না নামতে পারলাম, আপনারা যদি আমাদের এতটুকু গড়ে যেতে না পারলেন, তাহলে আমাদের তো আর কোন ভবিষ্যত নাই। যাক ঠিক আছে। আপনারা যান আর নাই যান ফরিদাবাদ মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকরা প্রস্তুত। তারা ইনশাআল্লাহ যাবে। প্রতিবাদ সভা ও মিছিলও হবে ইনশাআল্লাহ। আমার এ কথাগুলো বলার সাথে সাথে দেখলাম- সদর সাহেব হুযুরের মধ্যে সেই যৌবন কালের তেজোদীপ্ততা ফিরে এল। তিনি বজ্র কণ্ঠে বলে ফেললেন—যাও, আমরাও যাব ইনশাআল্লাহ। প্রতিবাদ সভা ও মিছিল হবে ইনশাআল্লাহ। অবশ্য সাথীসঙ্গীদের বুঝিয়ে নিয়ে যেতে একটু দেরী হয়েছিল। বায়তুল মোকাররমের দক্ষিণের সিঁড়ি ছিল আমাদের স্টেজ। এ প্রতিবাদ সভার সভাপতিত্ব করলেন হযরত সদর সাহেব হুযুর।

পূর্ব-পাকিস্তানের গভর্ণর যখন জনাব মোন্‌য়েম খান তখন একবার চাঁদ দেখা নিয়ে গোলমাল হল। আকাশ পরিস্কার। কেউ চাঁদ দেখে নাই। রেডিওতে বলা হল—করাচীতে চাঁদ দেখা গেছে। আগামী কাল ঈদ হবে। খবর শুনে মানুষের মধ্যে প্রতিবাদের ঝড় উঠল। দলে দলে লোক লালবাগ মাদ্রাসায় জমা হতে লাগল। আমরাও গেলাম। অবশেষে মসজিদে বসে আলোচনা হল। সাব্যস্ত হল—ঈদের নামায পড়া যাবে না। সদর সাহেব হুযুর মিম্বরে উঠে বললেন, আমি আগামী কাল ঈদের নামায পড়ব না। উপস্থিত আমরা সকলেই সমস্বরে একবাক্যে

www.pathagar.com

বললাম, আমরাও ঈদের নামায পড়ব না। পরদিন সরকারী দলের ও বে-রোজাদারদের ঈদ হয়েছিল বটে কিন্তু রোযাদাররা তার পরদিন ঈদ করেছিল।

জামায়াতে ইসলামীর ভ্রান্ত আকীদা সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করার জন্য সদর সাহেব হুযুর একখানা বই লিখেছিলেন। তার নাম দিয়েছিলেন 'ভুল সংশোধন'। বইখানা মুদ্রণের জন্য মাওলানা ফজলুর রহমান সাহেব (রহঃ) গেন্ডারিয়ার এক প্রেসে দিয়েছিলেন। এ প্রেসের ম্যানেজার ছিলেন মাওলানা শহীদ সাহেব। প্রুফ দেখার দায়িত্ব অর্পণ করা হল আমার উপর। দুই কি তিন ফর্মা প্রুফ দেখার পর খবর এল- সদর সাহেব হুযুর আর ইহ জগতে নেই। মাথার উপর যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। বইয়ের কম্পোজ বন্ধ হয়ে গেল। আর ছাপা হল না। মনে করেছিলাম আমাদের প্রাণ প্রিয় মুরব্বীর লেখা বই ছাপা হবে আর আমরা সহযোগিতা প্রদান করে মুরুব্বীর আরো স্নেহভাজন হতে সক্ষম হবো। জীবন ধণ্য হবে। আর মওদুদী-জামায়াতের গোমরাহী থেকে সমাজ উদ্ধার পাবে। কিন্তু জানিনা কি অদৃশ্য কারণে বই আর তখন ছাপা হল না। ছাপা বন্ধ হয়ে গেল।

সাত কাছেমিয়া মাদ্রাসায় পড়ার জীবনের আর এক ঘটনা। আমার বড় ভাই সে বছর মেট্রিক পরীক্ষার্থী। আব্বা গেছেন বার্ষিক সভার সময় সদর সাহেব হুযুর থেকে দু'আ আনার জন্য। আমি ও আব্বা সদর সাহেব হুযুরের কামরায় প্রবেশ করে দেখতে পেলাম তিনি কিতাব দেখার মধ্যে গভীর ভাবে নিমগ্ন আছেন। অনেকক্ষণ পর আব্বা বললেন, হুযুর আমি একটু কথা বলতে অনুমতি চাই। হুযুর বললেন, বলুন। আব্বা বললেন, আমার বড় ছেলে এবার মেট্রিক পরীক্ষার্থী। একটু দু'আ চাই যেন পাশ করতে পারে। হুযুর বললেন, আচ্ছা। বড় ভাই পরীক্ষায় পাশ করলেন।

একবার আমি ও মাওলানা শামসুদ্দীন কাসেমী সাহেব (রহঃ) সদর সাহেব হুযুরের সঙ্গে দেখা করার জন্য লালবাগ মাদ্রাসায় গেলাম। অনেক বিষয়ে আলোচনা হল। এক পর্যায়ে আমরা বললাম, মাওলানা মওদুদী সাহেব তাফহীমুল কুরআনের মধ্যে "ইয়াওমুল হাজ্জিল আকবার..." আয়াতের অর্থ করেছেন- "হজ্জ কে বড়ে দিন... ।" বলার সাথে সাথে দেখলাম সদর সাহেব হুযুরের চেহারা রাগে ও ক্ষোভে যেন ফেটে পড়ছে। সামনেই তাফহীমুল কুরআন রাখা ছিল। তিনি তক্ষুণি তাফহীমুল কুরআন বের করে এনে দেখলেন। দেখার পর বললেন, এতো শুধু জাহেলই নয় বরং আজহাল। আরবী ভাষায় এতোটুকু জ্ঞানও তার নেই। মুরাক্কাবে ইজাফী ও তাওসিফি কি তাও বুঝে না। আমি তো ভাই হুসনে নযরে তার লেখাগুলো পড়েছি। তানকীদী নযরে কখনও দেখি নাই। তাই আমার নিকট এ ভুলটি ধরা পড়ে নাই।

www.pathagar.com

সদর সাহেবের ইন্তেকালের এক-দেড় মাস পূর্বে গওহারডাঙ্গা গেলাম তাঁ সাক্ষাত লাভের জন্য। সেখানে মাওলানা ফজলুর রহমান সাহেবকে পেলাম বললাম, একটু সাক্ষাতের জন্য এসেছি। তিনি খবর পৌঁছালেন। একটু পরে দো সদর সাহেব হুযুর দু'জনের কাঁধে ভর দিয়ে বারান্দায় এসে ইজি চেয়ারে শুইে আমার খোঁজ-খবর নেয়া শুরু করলেন। বেশ অনেক্ষণ আলাপ আলোচনা হল বিশেষভাবে জামায়াতে ইসলামীর ব্যাপারেই আলাপ হল। ধর্মপ্রিয় অবুঝ যুবকে জামায়াতের খপ্পরে পড়ে যাচ্ছে। এ থেকে তাদেরকে কিভাবে উদ্ধার করা যায় অনেক আলাপ আলোচনার পর সদর সাহেব হুযুর বললেন, আমি তো খুব অসুস্থ আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। আমি তো আর কথা বলতে পারছি না। আমি ক্ষমা চেয়ে দোয়া নিয়ে বিদায় নিলাম। আমার এ সাক্ষাৎ যে শেষ সাক্ষাৎ হবে তা ভাবে পারি নাই। ভাবতে পারলে চুপচাপ আরো কিছুক্ষণ সোহবতে কাটিয়ে আসার চে করতাম।

=০০০=

www.pathagar.com

খৃষ্টান মিশনারীদের অপ-তৎপরতার বিরুদ্ধে মুজাহিদে আযমের ভূমিকা

মাওলানা আবদুল আউয়াল (খুলনাভী)

পাকিস্তান কায়েম হওয়ার পর ইংরেজী ১৯৪৮ সালে আমি আমাদের এলাকায় একমাত্র মাদ্রাসা সোনাতুনিয়া আজিজিয়া সিনিয়র মাদ্রাসায় দ্বীনি এলম শিক্ষা করার উদ্দেশ্যে ভর্তি হই। সেখানে ৬ বছর অধ্যয়ন করি। ৫ম বছরের সময় মাদ্রাসার বাৎসরিক সভায় হযরত মাওলানা শামছুল হক সাহেবকে দাওয়াত দেওয়া হয়। তখন আমি হযরত মাওলানা শামছুল হক সদর সাহেবের নাম প্রথম শুনি। কিন্তু হযরত সদর সাহেব কোন কারণ বশতঃ উপস্থিত হতে পারেন নাই।

উক্ত সভায় গওহারডাঙ্গা মাদ্রাসার মোহতামিম হযরত মাওলানা আব্দুল আজিজ সাহেব ও সাতকাছিমিয়া মাদ্রাসার মোহতামিম হযরত মাওলানা মোমতাজ উদ্দিন সাহেবকে দাওয়াত দেওয়া হয়েছিল। তাঁরা দুইজন উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁদের ওয়াজ শুনে আমি মনে মনে সিদ্ধান্ত করলাম যে, আগামী বছর আমি গওহারডাঙ্গা মাদ্রাসায় পড়তে যাব। কিন্তু আমার শ্রদ্ধেয় মুরুব্বী আব্বাজান রাজী না হওয়ায় ঐ বছর যেতে পারি নাই। আমি আল্লাহ পাকের নিকট সর্বদা দোয়া করতে থাকি, যেন আল্লাহ তা'য়ালা আব্বাকে রাজী করিয়ে দেন। ওদিকে আমি গওহারডাঙ্গা মাদ্রাসার হযরত মোহতামিম সাহেবের নিকট পত্র দিলাম যে, আমি আপনার মাদ্রাসায় পড়ার জন্য যেতে চাই। হুযুর যাওয়ার জন্য অনুমতি দেন।

ঘটনাক্রমে আব্বাও রাজী হলেন। তার কারণ আব্বাজান একরাত্রে স্বপ্ন দেখেন যে, আব্বা আমাকে সঙ্গে নিয়ে হযরত সদর সাহেব হুযুরের সঙ্গে দেখা করার জন্য গেছেন। হুযুর আব্বাকে বলছেন যে, আপনার তো অনেক ছেলে আছে। আপনি আমাকে একটি ছেলে দান করেন। তখন আব্বা আমার হাত ধরে হুযুরের হাতে সোপর্দ করেন। তারপর একদিন আমাকে বললেন যে, তোমাকে এক বৎসরের জন্য গওহারডাঙ্গা মাদ্রাসায় পাঠাব। চল, আমি খুলনায় তোমাকে নিয়ে পাঠানোর ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। ২/৩ দিন পর আমাকে নিয়া খুলনায় গেলেন এবং আব্বার বন্ধু এক দোকানদারকে দিয়ে আমাকে স্টীমারে উঠিয়ে দিয়ে টিকিট করে দেয়ার ব্যবস্থা করে বাড়ী ফিরে গেলেন।

আমি স্টীমার যোগে ঘোপের ডাঙ্গা ষ্টেশনে নেমে মাদ্রাসায় উপস্থিত হলাম। মসজিদের দক্ষিণ পার্শ্বে খানকায় তখন হযরত সদর সাহেব ছিলেন। কামরার বাহিরে হুযুরের খাদেম মাষ্টার আব্দুল হক ছিলেন। তিনি আমার পরিচয় নিয়ে

www.pathagar.com

হুযুরের সঙ্গে মোলাকাত করিয়ে দেন। আমি হুযুরকে সালাম দিয়ে মোসাফাহা করে দোয়া চাইলাম। হুযুর আমার জন্য দোয়া করলেন ও মাদ্রাসার দফতরে পৌঁছানোর কথা বললেন।

১৯৫৪ সালের ঘটনা। তখন হযরত সদর সাহেব ঢাকা লালবাগ জামেয়ার প্রিন্সিপাল ছিলেন। হুযুর রমজান মাসের প্রথম ১৫ দিন লালবাগ থাকতেন ও শেষ ১৫ দিন বাড়ীতে থাকতেন। কোরবানীর পরও ১৫ দিন বাড়ীতে থাকতেন এবং বাৎসরিক সভার সময়ও বাড়ীতে যেতেন। যখন হুযুর বাড়ীতে যেতেন, তখন হুযুরের সঙ্গে দেখা করতাম। এইভাবে হুযুরের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন হল। আমি গওহারডাঙ্গায় ৫ বছর পড়ার পর জালালাইনের বছর হাট হাজারী মাদ্রাসায় ফুনুনাত পড়ার জন্য যাই। সেখানে হেদায়া, জালালাইন, মেশকাতসহ মানতেক হেকমতের কেতাবাদি পড়ি। ঐ সময় মোহতামিম মাওলানা আবদুল ওহাব ও হযরত মুফতীয়ে আজমের সোহবতে যেতাম।

১৯৬১ সাল মোতাবেক ১৪৮১ হিজরীতে দাওরায়ে হাদীসের বছর ঢাকা লালবাগে ভর্তি হই এবং দাওরায়ে হাদীস ও দাওরায়ে তাফসীর মোট ৩ বছর পড়াশুনা করি। হুযুরের সঙ্গে মোলাকাত করার সঙ্গে হুযুর খুব খুশী হন। ভর্তি হওয়ার পর আমাকে বললেন যে, তুমি একটি নেজামুল আওকাত লিখে আমাকে এককপি দাও ও তোমার কাছে এককপি রাখ, ঐ নেজাম অনুযায়ী লেখাপড়া করতে থাক। নেজামুল আওকাত দেয়ার পর হুযুর বললেন যে, আছর থেকে মাগরিব পর্যন্ত কি করবা। আমি বললাম যে, ঐ সময় কিছু ঘোরাফিরা করব। হুযুর বললেন যে, আছরের পর আধাঘন্টা কোন কেতাবের অনুবাদ করে তারপর কিছু সময় ঘোরাফিরা কর।

দাওরা হাদীস শেষ হওয়ার পর দ্বিতীয় বছর দাওরায়ে তাফসীরে ভর্তি হই। তখন আমাদের থাকার স্থান হুযুরের কামরার পার্শ্বের কামরায় দেয়া হল। আমি খেদমতের কাজ করতাম এবং আঞ্জুমানে তাবলীগুল কোরআনের দফতরের দায়িত্ব আমার উপর দিলেন। যখন খৃষ্টান মিশনারীদের জোর তৎপরতা চলছে। তখন তার মোকাবেলায় খাদেমুল ইসলামের শাখা হিসাবে আঞ্জুমানে তাবলীগুল কোরআন নামে একটি সংস্থা গঠন করা হয়।

আমরা দাওরায়ে তাফসীর দুই বছর হযরত মুফতী দ্বীন মোহাম্মদ খান সাহেবের নিকট পড়ি। ঐ দুই বছর আমি ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসা হতে কামিলে ফিকহ ও হাদীস পরীক্ষা দিয়া সুনামের সঙ্গে পাশ করি। হুযুরের সঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় মাঝে মাঝে সভায় যেতাম। যেমন ভৈরব কলেজ ময়দান, নারায়ণগঞ্জের মদনগঞ্জ ইত্যাদি। ঐ সময় প্রতি বছর রমজানের প্রথম ১৫ দিন হযরত জাফর

www.pathagar.com

আহমদ উসমানী (রহঃ)-র খেদমতে থাকার সৌভাগ্য লাভ করি। ফারেগ হওয়ার পর দেশে গিয়ে ইসলামাবাদ মাদ্রাসায় সুপার ও সোনাতুনিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করতাম। আর রমজান মাসে হযরত সদর সাহেবের সোহ্‌বতে কাটাতাম।

১৯৬৮ সালে হুযুর যখন বেশী অসুস্থ অবস্থায় বাড়ীতে চলে যান; তখন দেখার জন্য গওহারডাঙ্গায় গেলে হুযুর বললেন যে, আবদুল আউয়াল কিছু দিন আমার কাছে থাক। আগে বলি নাই। এখন বলিতেছি। একটি চিল্লা দাও আমি বললাম যে, ইন্‌শা আল্লাহ্‌ আগামী রমজানের সময় আসব। অতঃপর রমজানের শুরুতেই হুযুরের সোহবতে চিল্লা দেয়ার জন্য গেলাম। আমাকেও কছদুচ্ছবিল পড়তে বলতেন এবং হুযুর শোয়া অবস্থায় তার ব্যাখ্যা করতেন। মাদ্রাসায় মোহতামিম সাহেব, কলাখালী হুযুর ও অন্যান্য মোদার্‌রেছীনও উপস্থিত থাকতেন। রমজানের মাঝামাঝি হযরত মোহতামিম সাহেব ও কলাখালী হুযুর আমাকে গওহারডাঙ্গা মাদ্রাসায় খেদমতের জন্য প্রস্তাব দেন এবং হযরত সদর সাহেব এজাজত দেন। আমি রাজী হয়ে থেকে গেলাম।

১৯৬৯ সাল থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত মোট ১২ বছর গওহারডাঙ্গা মাদ্রাসায় খেদমত করার তৌফিক হয়েছিল। দুইমাস পর ১৯৬৯ ইং ২১শে জানুয়ারী হুযুর ইন্তেকাল করেন। হুযুরের ইন্তেকালের পর খাদেমুল ইসলাম জামাতের কাজ করতাম।

১৯৭৮ সালে হুযুরের জীবনী রচনা করি ও ১৯৭৯ সালে তা প্রথম প্রকাশ করি। গওহারডাঙ্গায় মোদার্‌রেছীর সময় হুযুরের জীবদ্দশায় দৈনিক সকালে ও বিকালে হুযুরের সোহবতে কাটাতাম। ইন্তেকালের সময়ও হুযুরের কাছে থাকার সৌভাগ্য হয়েছিল।

খৃষ্টান মিশনারীদের অপ-তৎপরতার বিরুদ্ধে মুজাহিদে আযম যখন উদাত্ত আহবান জানান তখন কতিপয় উলামা-ই-ছু তথা স্বার্থপর-লোভী ও ভন্ডপীর ব্যতীত হাক্কানী উলামায়ে কিরাম ঝাপিয়ে পড়েছিলেন। তন্মধ্যে সবচেয়ে বেশী সাহায্য ও সহযোগিতা করেছিলেন প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ও লেখক মাওলানা নূর মুহাম্মদ আ'যমী (রহঃ)। মুজাহিদে আযমের সঙ্গে তিনি অধিকাংশ জিহাদে শরীক হয়েছিলেন। ইহুদী ও খৃষ্টান জাতি ইসলামের সবচেয়ে বড় শত্রু। সর্বযুগে সর্বক্ষণ তারা ইসলাম ও মুসলমানদের ক্ষতি করার অপচেষ্টায় লিপ্ত ছিল, আছে এবং থাকবে। মদীনার ইহুদীরা নবী করীম (সঃ) এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে পাথর নিক্ষেপ করে তাকে হত্যা করার অপচেষ্টা চালায়েছিল।

ঐতিহাসিক খায়বর যুদ্ধের সময় (হাদীয়া স্বরূপ প্রেরণ করা) খাদ্যের মধ্যে বিষ মিশিয়ে হুজুরে আকরম(সঃ) এর প্রাণ নাশ করার চেষ্টা করেছিল। তবুক যুদ্ধ

www.pathagar.com

থেকে ফেরার পথে রাতে ইস্তেঞ্জায় যাওয়ার সময় মুনাফিক ইহুদীরা নবী করীম (সঃ)-কে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিল।

খোলাফায়ে রাশেদীন ও হুকুমাতে বনু উমাইয়া যুগেও বিশ্বধিকৃত ইহুদী সন্তান আবদুল্লাহ বিন সাবা ও তার দলবল মাওজু (মিথ্যা-বানোয়াট) হাদীস বিশুদ্ধ হাদীসের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। খোলাফায়ে আব্বাসিয়ার যুগে দু'জন খৃষ্টান হায়াতুন্নবী(জীবন্ত নবী) সরদারে দো-আলম (সঃ) এর লাশ মুবারক সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার অপচেষ্টা করেছিল।

খৃষ্টানদের পলিসি ছিল মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে পরস্পর দ্বন্দ্ব-কলহ বাঁধিয়ে দেয়া। যেমন ঃ লিবিয়া ও মিশরকে, ইরাক-ইরান, ইরাক-কুয়েত ও সৌদী আরবকে পরস্পর যুদ্ধে লাগিয়ে দেয় এবং প্রত্যেকের কাছে অস্ত্রবিক্রি করে।

মিশনারীদের পরিকল্পনা এই ছিল যে, প্রথমে খৃষ্টানদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। যখন খৃষ্টান জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাবে তখন তাদেরই ভোটের মাধ্যমে আবার এ দেশের মালিক হতে পারবে। সে লক্ষ্যে তারা মুসলিম বিশ্বের বৃহত্তর রাষ্ট্র পাকিস্তানীদের জন্য কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে। সেবার নামে তারা নতুন নতুন স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, মহিলা সমিতি, গ্রামীণ ব্যাংক ইত্যাদি স্থাপন করে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, দরিদ্রতা দূরীকরণ ইত্যাদির ছদ্মাবরনে অশুভ তৎপরতা চালিয়ে সরল মানুষকে খৃষ্টান বানায়। নতুন কেউ খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষিত হলে তাকে হাজার হাজার টাকা দেয়। এ সমস্ত বহুমুখী কাজ পরিকল্পিতভাবে তাদের সংস্থা ও মিশনের মাধ্যমে চলে।

সর্বদা তারা সুযোগের সন্ধানে থাকে, যেখানে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় সেখানে খাদ্য ও ঔষধ দিয়ে সাহায্য করে। সে সঙ্গে তাদের ধর্মীয় পুস্তকাদি বিনামূল্যে দিয়ে ধর্ম প্রচার করে। এভাবে টাকা পয়সা, ঔষধ-পত্র, জীবনের বিভিন্ন প্রকার উপকরণের লোভের টোপ দেখায়ে রোগী, অশিক্ষিত দুর্বল ও অসহায়কে ক্রমে ক্রমে খৃষ্টান ধর্মে রূপান্তরিত করে।

যেমন কারো মারাত্মক অসুখ হলে প্রথমে নকল ও নষ্ট ঔষধ দিয়ে বলে এটা তোমার খোদার নামে খাও। যখন কোন উপকার হয় না, রোগ ভাল হয় না, তখন ভাল ঔষধ দিয়ে বলে, এটা যীশুর নামে খাও। যখন রোগ ভাল হয় তখন বলে- দেখলে তো? তোমাদের খোদার কোন শক্তি নেই। খোদার চেয়ে যীশুর শক্তি বেশী (নাউযুবিল্লাহ) কাজেই যীশুর ধর্ম সত্য। তাই তার নামে ঔষধ খাওয়ার সাথে সাথে রোগ ভাল হয়ে গেল।

১৯৬১-৬২ সালে তৎকালীন (পূর্ব-পাকিস্তানে) পর পর কয়েকটি জলোচ্ছ্বাস ও ঘূর্ণিঝড় হওয়ায় দেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়।

www.pathagar.com

৬২ সালের ঘুর্ণিঝড়ে চট্টগ্রামের 'গহিরা' নামক একটি গ্রাম একেবারে ধ্বংস হয়ে যায়। এটা জানতে পেরে খৃষ্টান জগৎ সুযোগ গ্রহণ করল। এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করার জন্য বিশ্বের সকল দেশের পাদ্রীরা পরামর্শ করে ঐ 'গহিরা' গ্রামে একটি "শান্তিদ্বীপ" স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিল। প্রধান পাদ্রী ফাদার পাঁয়ার প্রথম বারের মত পঞ্চাশ লক্ষ টাকার সামগ্রী নিয়ে পাকিস্তানে আগমণ করেন। করাচী পৌঁছলে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জেনারেল আইয়ুব খান তাকে বিপুল অভিনন্দন জানান এবং উক্ত ফান্ডে তিনিও পঞ্চাশ লক্ষ টাকা দান করেন। মোট এক কোটি টাকার সামগ্রী নিয়ে ঢাকায় পৌঁছলে, তাকে দীর্ঘ এক মাইল ব্যাপী রিসিপশন (অভিনন্দন) জানানো হয় এবং চট্টগ্রামে দুই মাইল ব্যাপী অভিনন্দন জানানো হয়।

প্রকাশ থাকে যে, ঐ বছর সারা পাকিস্তানে মিশনারীদের বাজেট ছিল চল্লিশ কোটি টাকা। যার মূল্য বর্তমানে চার'শ কোটি টাকা হবে।

মুজাহিদে আযম হযরত মাওলানা শামছুল হক সাহেব (রহঃ) ঐ বছর হাপানী ও হৃদরোগে মারাত্মকভাবে আক্রান্ত হয়ে দীর্ঘ সাত মাস হাসপাতালে ছিলেন। প্রথমে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পরে পশ্চিম পাকিস্তানের করাচী ও রাওয়ালপিন্ডি হাসপাতালে ছিলেন। রমজানের দু'মাস পূর্বে কিছুটা সুস্থ হয়ে ঢাকায় ফিরে আসেন। চিন্তা করতে লাগলেন, কি করে পাদ্রীদের হাত থেকে দেশ ও জাতিকে বাঁচানো যাবে। ইসলামের চিরশত্রু ইয়াহুদী-খৃষ্টানদের হাত থেকে মুসলমানদের ঈমানকে রক্ষা করা যাবে। আমি সে বছর লালবাগ জামিয়া কুরআনিয়া আরাবিয়ায় দাওরায়ে হাদীসের ছাত্র ছিলাম। রমজানের পূর্বে কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করেন যে, আগামী বছর দাওরায়ে তাফসীর খোলা হবে। এ সংবাদ পেয়ে রমজানে আমি মাদ্রাসায় থেকে যাই এবং হযরত মাওলানা যাফর আহমদ উসমানীর খেদমত করার সুযোগ পাই।

প্রতি বছর হযরত শাইখুল ইসলাম মাওলানা জাফর আহমাদ উসমানী রমজানের পূর্বে এসে খতমে বুখারীর জলসা করতেন এবং ১৫ রমজান পর্যন্ত লালবাগ জামেয়ায় অবস্থান করতেন। পরে ১৬ রমজান রেঙ্গুন চলে যেতেন। রমজানের পরে পুনরায় মাদ্রাসায় এসে বুখারী শরীফের ছবক শুরু করে যেতেন। হযরত সদর সাহেবও রমজানের প্রথম পনের দিন লালবাগ মাদ্রাসায় থাকতেন এবং শেষ পনের দিন নিজ গ্রামের মাদ্রাসা দারুল উলুম খাদেমুল ইসলাম গওহারডাঙ্গায় অবস্থান করতেন।

প্রকাশ থাকে যে, হযরত উসমানী সাহেব সদর সাহেবের উস্তাদ ও পীর ছিলেন। তিনি ছাহারানপুর মাজাহিরে উলুম মাদ্রাসায় হযরত উসমানী সাহেবের নিকট অধ্যয়ন করেছিলেন।

www.pathagar.com

রমজান মাস সমাগত। হঠাৎ একদিন খবরের কাগজে প্রধান পাদ্রী ফাদার পাঁয়ারের পাকিস্তানে আগমনের সংবাদ প্রচার করা হল। সংবাদ পত্রে সংবাদ পড়ে হযরত মুজাহিদে আযম সদর সাহেব খুব মর্মাহত হলেন। তিনি তাঁর শায়েখের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করলেন। তিনিসহ ঢাকার বিশিষ্ট উলামায়ে কেরামের সঙ্গে পরামর্শ করে ১৯৬৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে জরুরী পরামর্শ সভা ডাকলেন। স্থানীয় মাদ্রাসা সমূহের উলামায়ে কেরামসহ বিভিন্ন স্থান থেকে আগত আলিমদেরও দাওয়াত দিলেন। সময়মত জরুরী পরামর্শ সভা শুরু হল। সে সভায় হযরত মুজাহিদে আযম সদর সাহেব হুযুর (রহঃ) খৃষ্টানদের দূরভিসন্ধি সম্পর্কে সকলকে অবহিত করেন এবং খৃষ্টান মিশনারীদের অপতৎপরতা প্রতিহত ও স্তব্ধ করার জন্য 'ইসলামী মিশন' কায়েম করার প্রস্তাব পেশ করেন। সানন্দে উপস্থিত সবাই সে প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

হযরত মাওলানা উসমানী সাহেব খেদমতে খল্ক (সৃষ্টির সেবা) সম্পর্কে এক নাতিদীর্ঘ বক্তৃতার মাধ্যমে সকলকে উক্ত কাজে উৎসাহিত করেন। অবশেষে খৃষ্টান মিশনের মোকাবেলায় ইসলামের তাবলীগ ও খেদমতের উদ্দেশ্যে খাদেমুল ইসলাম জামাতের শাখা হিসাবে "আঞ্জুমানে তাবলীগুল কুরআন" (কুরআন প্রচার সমিতি) নামে একটি সমিতি গঠন করা হয়। তার পৃষ্ঠপোষক হযরত মাওলানা জাফর আহমাদ উসমানী সাহেবকে করা হয়। হযরত মুফতী দ্বীন মুহাম্মদ (রহঃ)-কে সভাপতি, মুজাহিদে আযম মাওলানা শামছুল হক সদর সাহেবকে জেনারেল সেক্রেটারী ও মাওলানা আজিজুল হক সাহেবকে সহ-সভাপতি করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট একটি কার্য নির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়।

নব গঠিত কমিটির অস্থায়ী দপ্তর লালবাগ জামিয়ায় রাখা হয় এবং কেন্দ্রীয় দপ্তরের দায়িত্ব আমার উপর অর্পন করা হয়। তখন আমি দাওরায়ে তাফসীরের ছাত্র। অতঃপর উক্ত আঞ্জুমানের পক্ষ থেকে ৪/৫ জন মুবাল্লিগকে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলাম প্রচার ও খৃষ্টানদের ধোকাবাজী সম্পর্কে অবহিত ও হুশিয়ারী করার জন্য পাঠানো হয়। মরহুম মাওলানা ফজলুর রহমানকে চট্টগ্রামে পাঠানো হয়। তিনি উক্ত 'গহিরা' গ্রামে যেয়ে আল্লাহর রহমতে মুকাবিলা করে পাদ্রীদেরকে এ দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য করেন। চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামে ইসলাম প্রচার করে তিনি বহু গারো, নাগা, কুকিকে মুসলমান বানান । তারা ৬০ একর জমি খাদেমুল ইসলাম জামায়াতকে দান করে। উক্ত জমিতে তিনি মসজিদ, ফোরকানিয়া মাদ্রাসা কায়েম করেন এবং হাসপাতাল স্থাপন করার ব্যবস্থা করেন।

মাওলানা আশরাফ আলীকে ময়মনসিংহ, মাওলানা আবদুস সালামকে (সম্পাদক-নেয়ামত পত্রিকা) ঢাকা মহানগর ও পার্শ্ববর্তী এলাকায়, মাষ্টার আবদুল হককে (সদর সাহেবের খাদেম) রাজশাহী এবং মাষ্টার ইয়াছীন শরীফকে খুলনার দায়িত্ব দেয়া হয়। হযরত মুজাহিদে আযম সদর সাহেব কিবলা (রহঃ) নিজেও ভগ্ন

www.pathagar.com

স্বাস্থ্য নিয়ে চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, রাজশাহী, রংপুর, খুলনা, যশোর, বরিশালসহ বহু এলাকায় সফর ও সভা-সমিতি করেন এবং খাদেমুল ইসালাম জামায়াত ও আঞ্জুমানে তাবলীগুল কুরআনের শাখা গঠন করেন।

একবার হযরত সদর সাহেব (রহঃ) ভৈরব কলেজ ময়দানে এক বিরাট জনসভা করেন। শায়খুল হাদীস মাওলানা আজিজুল হক, মাওলানা ফজলুর রহমান, মাষ্টার আবদুল হক প্রমুখও হুযুরের সঙ্গে ছিলেন। আমারও হুযুরের সঙ্গে যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল। পরের দিন সকালে ভৈরবে জামায়াত গঠন হয় এবং কর্মী-সম্মেলন করা হয়। বিদায়ের সময় স্থানীয় মুরুব্বীগণ হুযুরের যাতায়াত খরচ কত তা জেনে নিয়ে কিছু বেশী টাকা দিতে চেয়ে ছিলেন। তখন হুযুর বললেন, আমি অতিরিক্ত পয়সা নিব না। আমাকে মাফ করবেন। আমাদের আলিমদের দায়িত্ব ছিল নিজ খরচে এসে সভা-সমিতি করা। কিন্তু আমরা গরীব এজন্য রাস্তা খরচটা গ্রহণ করি। তখন উপস্থিত সকলে আশ্চর্য বোধ করতে লাগলেন।

হযরত সদর সাহেব (রহঃ) খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে কয়েক খানা কিতাব লিখে জামায়াতের মাধ্যমে প্রচার করেছিলেন। এর দ্বারা এত বড় কাজ হয়েছিল, যা লক্ষ লক্ষ টাকার অস্ত্রের দ্বারাও সম্ভব ছিল না। যে ব্যক্তি উক্ত কিতাবগুলো পড়বে, সে কোন দিন ইসলাম ত্যাগ করতে পারবে না। যতই তাকে বাড়ী, গাড়ী ও নারী দ্বারা বিভ্রান্ত করা হোক না কেন। কিতাবগুলো হল- (১) পাদ্রীদের গোমর ফাঁক, (২) আল্লাহর প্রেরিত ইঞ্জীল কোথায় ? (৩) শত্রু থেকে হুঁসিয়ার থাক, (৪) চারি ইঞ্জীল ইত্যাদি।

এ সব কিতাবের মধ্যে তিনি খৃষ্টানদের মিথ্যা মতবাদ, অপ-প্রচার ও ধোকাবাজী সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে মুসলিম জাতিকে হুঁসিয়ার ও সজাগ করে দিয়েছেন। বিশেষ করে আল্লাহর প্রেরিত ইঞ্জীলের ব্যাপারে খৃষ্টানদের প্রতি চ্যালেঞ্জ করে বলেছেন, যদি তাদের ধর্ম সত্য হয় তবে আমার সম্মুখে তারা প্রমাণ করুক। আল্লাহর প্রেরিত ইঞ্জীল দুনিয়ার কোথাও নাই। ইঞ্জীলের একজন হাফেযও তারা দেখাতে পারবে না।

পক্ষান্তরে আমি কুরআনের লক্ষ লক্ষ হাফেয দেখাতে পারব। যদি আসল ইঞ্জীলের একটি কপিও দেখাতে পারে, তবে আমি তাদের কথা মানব। আমি চ্যালেঞ্জ করছি যে, দুনিয়ার কোথাও আসল ইঞ্জীল নেই। আসল ইঞ্জীল আসমানে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। আর পরবর্তীতে তারা ১০৪ খানা ইঞ্জীল লিখেছিল। সেন্ট পল চার খানা রেখে বাকী একশত খানা পুড়িয়ে ফেলে। এমন চ্যালেঞ্জ সামাল দিতে না পেরে আল্লাহ পাকের রহমতে মাত্র এক বছরের মধ্যে মিশনারীদের প্রচার নিস্তেজ হয়ে গেল। এমনকি পাদ্রীরা বাইরে বের হতো না।

১৯৬৩ হতে '৬৮ সাল পর্যন্ত তারা গীর্জায় থেকে তাদের ধর্ম গোপনে গোপনে প্রচার করত এবং ফাঁদার পায়ার অকৃতকার্য হয়ে তাদের স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল

www.pathagar.com

ইত্যাদি গুটিয়ে রেখে চলে যায়। পাদ্রীরা বাইরে আসলে জনসাধারণ তাদেরকে প্রশ্নের দ্বারা আটকে ফেলতো। তারা নিরুত্তর হয়ে যেত। উক্ত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার জন্য একবার নারায়ণগঞ্জ গীর্জার এক পাদ্রী লালবাগে উপস্থিত হয়। তিনি হযরত মুজাহিদে আযম সদর সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। হুযুর বললেন, ইঞ্জীলের আসল কোন কপি অর্থাৎ আল্লাহর নাযিলকৃত ভাষায় ইঞ্জীলের কোন কপি আছে কি না ! থাকলে তা কোথায় আছে ? উত্তরে পাদ্রী সাহেব বললেন, রোমে একটি কপি আছে। হুযুর বললেন, তা নিয়ে আসেন। পাদ্রী সাহেব তিন মাস সময় চেয়ে আনার ওয়াদা করলেন।

তিন মাস পর পাদ্রী সাহেব উক্ত কপি এনে হুযুরের সঙ্গে দেখা করলেন। হুযুর ইঞ্জীলখানা হাতে নিয়ে কিছু উল্টায়ে দেখে বললেন, এটা তো আসল ইঞ্জীল নয়, নকল ইঞ্জীল! কারণ ইঞ্জীল কিতাব সুরয়ানী ভাষায় নাযিল হয়েছিল। আর এ ইঞ্জীলখানা তো হিব্রু ভাষায়। তখন পাদ্রী সাহেব নিরুত্তর হয়ে গেলেন এবং বললেন, হুযুর এটা ব্যতীত আমাদের নিকট আর কিছু নাই। লালবাগ জামিয়ায় যখন সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল, পাদ্রী বাহাছে (তর্কে) পরাজিত হয়েছে। তখন রব উঠল পাদ্রীকে ধর। ধোকাবাজ পাদ্রী কোথায় গেল? শুনে পাদ্রী সাহেব খুব ব্যস্ত হয়ে গাড়ীতে চড়ে চলে গেলেন।

মোদ্দাকথা, অল্প দিনের মধ্যে খৃষ্টানরা বিভিন্ন বাহাছে (তর্কে) ও মোকাবেলায় পরাজিত হয়ে গোপনে পলায়ন করতে লাগল। বর্তমানে উক্ত জামায়াতের কাজ অব্যাহত আছে। হুযুরের মূল জামায়াত 'খাদেমুল ইসলাম' জামায়াতের মাধ্যমে সর্ব প্রকার বাতিলের মোকাবেলা করা হচ্ছে। ইদানীং বাংলাদেশে এন,জি,ও-দের মাধ্যমে দেশ-বিদেশের গ্রামের পাড়ায় পাড়ায় এবং শহরের অলিতে গলিতে স্কুল, সেবা প্রতিষ্ঠান, মহিলা সমিতি, গ্রামীণ ব্যাংক ইত্যাদি কায়েম করে মুসলমানদের দ্বীন-ঈমান হরণ করার জাল বিস্তার করা হয়েছে। এ সবের ধোকায় ও চক্রে পড়ে মুসলমানদের ঈমান বাঁচান কঠিন হয়ে পড়েছে। মুসলিম জাতির এমন দূরবস্থার সময় আমাদের একান্ত কর্তব্য, হযরত মুজাহিদে আযম মাওলানা শামছুল হকের (সদর সাহেবের) মত বাতিলের মোকাবেলায় নেমে যাওয়া।

আসুন ইহুদী, খৃষ্টান ও কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে দলমত নির্বিশেষে একত্র হয়ে ঝাপিয়ে পড়ি। যদি আমরা এখনও অন্যায়-অপতৎপরতার বিরুদ্ধে সজাগ ও সোচ্চার না হই তবে অদূর ভবিষ্যতে মুসলমানদের ঈমান রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়বে। শিক্ষা বোর্ড সমূহের পক্ষ থেকে বাতিল মতবাদ সম্পর্কে বইপত্র প্রণয়ন করে মাদ্রাসার সিলেবাস ভূক্ত করা দরকার। অন্যথায় পরবর্তীতে এদেশের মানুষ অধিকাংশই খৃষ্টান ও কাদিয়ানী হয়ে যাবে। আল্লাহ পাক মুসলমানদের ঈমান রক্ষা করুন। (আমীন)॥

www.pathagar.com

যে সূর্যের অস্ত নেই

মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাঈল

যুগে যুগে যে সব মনীষী নিজেদের বিশ্ব ইতিহাসের পাতায় তালিকাভুক্ত করে সেখানে সুদৃঢ় অবস্থান ও সমুন্নত আসন নিশ্চিত করেছেন তাঁদের সকলেই সাধারণ মানুষের স্তর হতে উর্ধ্বে উঠে এক বা একাধিক বিষয়ে তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব তথা অসাধারণত্বের প্রমাণ রেখেছেন। জ্ঞান-গরিমা, বিদ্যা-বুদ্ধি, সাধনা, গবেষণা, আবিষ্কার, বীরত্ব ও সাহসিকতা, জাতিগঠন ও রাষ্ট্র পরিচালনায় সুদক্ষতা ইত্যাদির কোন ক্ষেত্রে অন্যদের চেয়ে উর্ধ্বে আরোহণ করে তাঁরা খ্যাতির শীর্ষে অবস্থান গ্রহণ করেছেন এবং বিশ্ব ও বিশ্ব মানবতার কল্যাণে কোন না কোন চিরন্তন অবদান রেখে গিয়েছেন।

খ্যাতি অর্জন ও অবদান-কীর্তি স্থাপনের ক্ষেত্রে সমসাময়িক পরিবেশ-পরিস্থিতি, দেশ-কাল ও উপায়-উপকরণের আনুকূল্য তাঁদের অনেকের জন্য সৌভাগ্য রূপে দেখা দিয়েছে এবং ব্যক্তিগত প্রতিভা ও পরিবেশ আনুকূল্যের সৌভাগ্য-এ দু'য়ের সম্মিলন তাঁদের জন্য সোনায় সোহাগা হয়েছে। মনীষীদের অধিকাংশের ক্ষেত্রে আর একটি লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, তাঁদের কৃতিত্ব, সুখ্যাতি ও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন কোন একটি ক্ষেত্র বা বিষয়ে সীমাবদ্ধ রয়েছে।

পক্ষান্তরে বহু মনীষীকে দারিদ্র ও অনটনের পীড়নসহ বহু ব্যক্তিগত সমস্যা এবং দেশ-কাল সমাজের দুর্গম গিরি ও মরু প্রান্তর পাড়ি দিয়ে সাফল্যে আরোহণ করতে হয়েছে। আবার এঁদের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক মনীষী জ্ঞান-বিজ্ঞান ও কর্ম-অবদানে একাধিক ক্ষেত্রে পদচারণা করে সমুজ্জ্বল সাফল্যের অতুলনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

সহজ ভাষায় বললে, অনুকূল পরিবেশ অনেকের জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে এবং অনেকে পরিবেশের বহুমুখী বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে সফলতার বিজয় তোরণে উপণীত হয়েছেন। বলা বাহুল্য যে, সত্যের সূর্য মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ) এর শিক্ষা জীবন হতে শুরু করে বিশাল কর্মময় জীবনে দ্বিতীয় অবস্থাটি সর্বদা দৃশ্যমান। প্রতিকুলতার পাহাড় ডিংগিয়ে তিনি নিজের জন্য রচনা করেছিলেন বৈশিষ্ট্যময় জীবন ধারা যা তার শৈশব হতে মৃত্যু, শিক্ষা জীবন হতে কর্ম জীবনের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত।

শিক্ষা জীবন ঃ "সুদূরের সমুন্নত লক্ষ্য সদা দৃষ্টির সামনে সমুজ্জ্বল।" যখন কোন পথচারীর পথ চলার চূড়া ও সমুন্নত লক্ষ্যবিন্দু সুদূর দিগন্ত রেখায় সমুজ্জ্বল

www.pathagar.com

রূপে প্রতিভাত হয় এবং গন্তব্যে উপনীত হওয়ার পথচিত্র (রোডম্যা' সংশয়হীনরূপে পরিচ্ছন্ন হয়ে উঠে তখন ভিতরের আলস্য ও জড়তা বাইরের পথি পার্শ্বের চমকপ্রদ মন ভোলানো দৃশ্যরাজি বা চিত্তাকর্ষক প্রলোভন কিং পথের যে কোন প্রকার বন্ধুরতা যেমন তাকে স্খলিত কিংবা বিপথগামী করে পারে না বরং কোন কিছুর তোয়াক্কা না করে অবিরাম ও অবিচল পদক্ষেপে লক্ষ্য পানে এগিয়ে চলতে থাকে, মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরীর জীবনালে পূর্বাপর এ অবিরাম ও অবিচল পদচারণার অতুলনীয় বৈশিষ্ট্যে দেদীপ্যমান।

শিক্ষা জীবনের সূচনায় এবং বোধোদয়ের প্রথম শুভক্ষণেই তিনি যেন তাঁ জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য বিন্দুটি নির্মেঘ পরিচ্ছন্ন দিগন্তের অত্যুজ্জ্বল তারকার ন্যা জ্বল জ্বল করতে দেখতে পেয়েছিলেন এবং জীবনের কোন অসতর্ক মুহূর্ত তাঁর লক্ষ্যকে তাঁর দৃষ্টি-পরিধি হতে সরিয়ে দিতে পারে নি। তাই তো দেখি, সে বালক বয়স হতে শিক্ষা জীবনের সমাপ্তি পর্যন্ত যখন যেখানে যে কোন ধরনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবং যে কোন পরিবেশ পরিস্থিতিতে তিনি থাকুন না কেন এব বাহ্যত তিনি সাবলীল কিংবা সংকটময় পরিবেশ পরিস্থিতির সম্মুখীন হোন কেন, তাঁর দৃষ্টি কিন্তু সে সুদূরে অবস্থিত লক্ষ্য বিন্দুতে স্থির নিবদ্ধ এবং তাঁ পদচারণা ঐ লক্ষ্যপানে অবিশ্রান্ত গতিতে আগুয়ান। নবুয়াতী স্বভাব ও চিন্তাধারা আলোকে উদ্ভাসিত হৃদয়ের অধিকারী বালক শামছুল হক তার বাল্য বয়সেই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, ব্যক্তি জীবন গঠন ও উন্নত সমাজ-রা বিনির্মাণের লক্ষ্যে ইসলামী শিক্ষার বিকল্প নেই। তাঁর শিক্ষা জীবনের প্রারম্ভ ছিল দেশে বেনিয়া শাসন-শোষণের ক্লান্তিকাল।

যখন পূর্ণাঙ্গ ইসলামী জ্ঞান ও ধর্মীয় শিক্ষার সহজলভ্যতা তো দূরের কথা সাধারণ ও প্রচলিত জাগতিক শিক্ষা লাভ করাও একজন পল্লীবাসী মুসলি বালকের জন্য ছিল দুরূহ ব্যাপার। কিন্তু সমুজ্জ্বল সত্য উদ্ভাসিত হৃদয়ের কা জীবন পরিক্রমার মহাসড়ক কন্টকাকীর্ণ ও বন্ধুর হলেও তাতে সূচনা বিন্দু হতে সমাপ্তি পর্যন্ত গন্তব্যে উপনীতকারী একটি সূক্ষ্ম সরল রেখা ছিল প্রদীপ্ত ও স্বচ্ছ তা তো দেখা যায়, হিন্দু পন্ডিতের পাঠশালা হতে শুরু করে মহাবিদ্যালয়ের বিশ্বখ্যা হিন্দু বিজ্ঞানীর প্রাক্‌টিক্যাল বিজ্ঞান চর্চা এবং পিতার প্রচন্ড অসম্মতিও তাকে লক্ষ হতে বিচ্যুত করতে পারেনি ইঞ্চি পরিমাণেও। বরং আল্লাহর খলীল ইব্রাহী আলাইহিস্ সালামের সত্য সন্ধানী মেধা ও হৃদয় যেমন কৈশোরেই তারকারাজি চন্দ্র-সূর্যের আকর্ষণ প্রত্যাখ্যান করে সন্ধান লাভ করেছিল প্রকৃত বিশ্ব-স্রষ্টার তদ্রূপ হাজার হাজার বছরের ব্যবধানে আগত মুসলিম মিল্লাতের "জাতির পিতা" র অন্যতম উত্তরসূরি "সত্যের সূর্য" বালক শামছুল হক, কিশোর শামছুল হক

www.pathagar.com

তরুণ শামছুল হকও মন্ডপ সংলগ্ন পাঠশালা এবং হিন্দু-খৃষ্টান শিক্ষক ও অধ্যাপক মন্ডলীর বিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয়ের বৈরী পরিবেশ ও হিন্দুয়ানী সংস্কৃতির পরিমন্ডলে অবস্থান করেও এ জন্মগত 'মুল্লা' ছিলেন আত্মপ্রত্যয়ে দৃপ্ত স্থির-অবিচল। কিন্তু তাঁর এ দৃপ্ততা ও অনমনীয়তা ছিল অহংবোধ ও প্রতিপক্ষকে অবজ্ঞা বা হেয় প্রতিপন্ন করার ক্লেদ-কলুষতা হতে পবিত্র । সুতরাং মেধা সততা ও আচার-আচরণে 'একজন আদর্শ ছাত্রের' সদ্‌গুনাবলীতে বিভূষিত শামছুল হক 'কাবু' করে ফেলেছিল তার সর্ব বিদ্যাপীঠের পন্ডিত ও শিক্ষকবর্গকে এবং স্বভাবগতরূপে ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষী পন্ডিত প্রবরদের বাধ্য করেছিল এরূপ সাক্ষ্য ও সনদ প্রদানে যে, "পরীক্ষার আগেই পরীক্ষার সমুদয় প্রশ্নপত্র নির্দ্বিধায় ও পূর্ণাঙ্গ বিশ্বাসে তুলে দেয়া যায় শামছুল হকের হাতে"।

বিজ্ঞানী অধ্যাপকের পানি তৈরীর কারিসমা-কৌশল তাকে স্থূল বিজ্ঞানমুখী না করে ধাবিত করে 'পানির স্রষ্টার' প্রতি; প্রেরণা যোগায় 'আল্লাহমুখী' হওয়ার। পিতার অসম্মতি জনিত সুদীর্ঘ সময়ের মানবিক যন্ত্রণা তাকে ঠেলে দেয়নি জন্মদাতার প্রত্যক্ষ অবাধ্যতায়। বরং সুদীর্ঘ দিনের দহনে বিদগ্ধ হৃদয় সর্বশ্রেষ্ট সহায় ও সাহায্যদাতার দরবারে আকুলি বিকুলি করতে করতে এক সময় হাতের নাগালে পেয়ে গেল পিতার অনিচ্ছা-অসম্মতি ও নিজের প্রবল কামনা-বাসনার মাঝে সুসমন্বয়ের নির্মল সুযোগ।

সাহারানপুর ও দেওবন্দের পাঠ্যজীবনের ইতিহাসের পাতাগুলোও প্রমাণ বহন করে এ বিদ্যার্থীর সাধনা ও স্থির লক্ষ্যবিন্দু অভিমুখে এগিয়ে চলার অবিরাম অধ্যাবসায়ের। সেই সাধনা জাহিরী 'ইল্‌মের মধু ভান্ডারকে পরিশোধিত করে খাঁটি মধুতে রূপান্তর এবং খনিজ আবর্জনা ও কর্দমযুক্ত হীরক ও স্বর্ণকে 'ধোলাই' করে নিখাদ-নিষ্কলুষ স্বর্ণ-হীরকে রূপান্তরিত করার প্রক্রিয়া চলতে থাকে- "আল্লাহ যাকে চান তাকে আকর্যণ করেন নিজের কাছে" (আল্ কুরআন)-এর প্রবাহ ধারায়। বছরের পর বছর প্রতি সপ্তাহে ৫০/৬০ মাইল পথ পায়ে হেঁটে থানা ভবন যাতায়াত ও সেখানকার 'রিফাইনারীতে' অবস্থান ছিল এ ধারারই বহিঃপ্রকাশ।

অবশেষে পুঁথিপাঠ অধ্যায়ের যবনিকাপাতের পরে থানাভবন শোধনাগারে নিরবচ্ছিন্ন অবস্থান ছিল পরিশোধিত হওয়ার চূড়ান্ত পর্যায়ের সফল পরিসমাপ্তি। এতক্ষণে কারখানার এ 'উৎপাদন'টি 'নূরুন আলা নূর' ও 'সোনায় সোহাগা' হয়ে সম্পন্ন করেছে বাজারজাত হওয়ার প্রস্তুতি পর্ব। অবশেষে এ উৎপাদন আকর্ষণীয় ও সুদৃশ্য আবরণে (লেবেল) পরিবেশিত হল বৃটিশ বেনিয়া শাসন শোষণে সর্বাধিক নিষ্পেষিত ও ক্ষত-বিক্ষত জনপদ বাংলার আপামর মুসলিম জনতার পরিত্রাণের লক্ষ্যে।

www.pathagar.com

সফলতায় ভরপুর জিহাদী কর্মজীবন ঃ একটি জাতির রাহুমুক্তি, উন্নতি বিধান ও কল্যাণ সাধনের জন্য করণীয় কাজগুলোকে যদি আমরা একটি সংক্ষিপ্ত তালিকায় সন্নিবেশিত করি (কিংবা আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোকে একটি কল্যাণ রাষ্ট্রের রাষ্ট্রযন্ত্রের কর্ম বিভাগ মন্ত্রনালয় ও সচিবালয় সমূহে বিন্যাস ধারায় সংক্ষিপ্তরূপে বিন্যস্ত করি) তবে সে তালিকাটি দাঁড়াবে মোটামুটি নিম্নরূপ-

(ক) সুনাগরিক তৈরীর লক্ষ্যে ও কুসংস্কারমুক্ত সমাজ বিনির্মাণে আদর্শ শিক্ষা বিস্তার;

(খ) আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন চারিত্রিক গুণাবলীতে বিভূষিত বিদ্বান সমাজ ও নেতৃশ্রেণী তৈরীর লক্ষ্যে উচ্চমাত্রার জ্ঞান বিজ্ঞানের পরিচর্যা ও নৈতিক প্রশিক্ষণ;

(গ) 'সৃষ্টিকুল আল্লাহর পরিবার' নীতির আলোকে মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সব মানুষের (এমন কি অন্যান্য প্রাণীকুল ও সৃষ্টি জগতের) অধিকার রক্ষায় দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন এবং সবল হতে দুর্বলের অধিকার আদায় তথা মানবতার সেবা ও আল্লাহর বিধানে আল্লাহর যমীন শাসিত হওয়ার লক্ষ্যে 'আদর্শ রাষ্ট্র ব্যবস্থা;

(ঘ) উপরি উক্ত লক্ষ্য সাধনের অন্তরায় রূপে বিবেচিত পার্থিব ও জাগতিক জীবনের সমস্যাবলী বিশেষতঃ অর্থনৈতিক সংকট নিরসনে জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় সম্পদের সুষ্ঠু বন্টন ব্যবস্থা, খেদমাতে খাল্‌ক-দুস্থ ও আর্তমানবতার সেবা (পূর্ত, ত্রাণ ও জনকল্যাণ বিভাগ) এবং

(ঙ) বৃহত্তম অন্তরায় ও কঠিন প্রতিবন্ধক বাতিল মতবাদ ও যাবতীয় শয়তানী তাগুতী চক্রের প্রতিরোধে জীবনবাজী সংগ্রাম-জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ।

মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরীর কর্মজীবনের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ প্রমাণ করবে যে, তিনি তাঁর কর্মজীবনকে উপরিউক্ত ধারায় বিন্যস্ত করেছিলেন অত্যন্ত সুচারুরূপে। প্রবন্ধ পরিসরের সীমিত পরিধিতে বিষয়টির সংক্ষিপ্তাকার উপস্থাপনের প্রয়াস পাওয়া যেতে পারে।

(১) আদর্শ শিক্ষা বিস্তার ও দীনি পরিবেশ সৃষ্টির সুদূর প্রসারী ও সুবিস্তীর্ণ কর্মসূচী ঃ

বাংলার মুসলিম প্রধান পূর্বাঞ্চলের কেন্দ্রভূমি ও রাজধানীর বাইরে মফস্বল (বি. বাড়িয়া) ও পল্লী অঞ্চলে (খুলনার গজালিয়া) প্রাথমিক ও পরীক্ষামূলক কর্মসূচীর সূচনা করা হল। অতঃপর সমগ্র দেশকে কর্মসূচীর আওতায় নিয়ে আসার সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে রাজধানী কেন্দ্রিক কর্মসূচীর উদ্বোধন করা হল মুসলিম শাসনামলের ঐতিহ্যবাহী বড় কাটারার হোসাইনিয়া আশরাফুল উলুম মাদ্রাসা

www.pathagar.com

হতে। ক্রমান্বয়ে তা সম্প্রসারিত হল জামিয়া কুরআনিয়া আরাবিয়া, লালবাগ, ইমদাদুল উলুম ফরিদাবাদ, মাদ্রাসা-ই নূরিয়া আশরাফাবাদ, খাদিমুল ইসলাম গওহারডাঙ্গাসহ সারা বাংলায় ও পরবর্তীতে পূর্ব-পাকিস্তানের প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত বিপুল সংখ্যক মকতব ও মাদ্রাসা রূপে।

সম-সাময়িকদের চিন্তা-চেতনার বহু উর্ধ্বে 'জামিয়া কুরআনিয়া' (তথা কুরআনিক বিশ্ববিদ্যালয়) নামকরণ প্রমান বহন করে তাঁর চিন্তাধারার সমুন্নত উৎকর্ষতার। আর রাজধানীর মসজিদগুলোর নামায শুদ্ধ হওয়ার ন্যূনতম পরিমানে বিশুদ্ধ কুরআন তিলাওয়াতের দুর্লভ্যতার অন্ধকার যুগ হতে বর্তমানে রাজধানী ও মফস্বল শহরগুলোর যে কোন মসজিদে নামায শুদ্ধ হওয়ার নিশ্চয়তা বরং ইমামগণের 'তাজবীদ' সুষমার সুমধুর-সুললিত তিলাওয়াত এবং সমগ্র দেশের দ্বীনি প্রতিষ্ঠান সমূহের পাশাপাশি খোদ রাজধানীতে আজ প্রায় দু'ডজন তাকমীল (দাওরা) স্তরের মাদ্রাসার উপস্থিতি, দ্বীনের প্রতি বিপথগামী ও ভাড়াটিয়া 'বুদ্ধিজীবী' শ্রেণীর অনীহা ও বিরুদ্ধাচরণ, অপসংস্কৃতির বাঁধভাংগা সয়লাব ও বিশ্বব্যাপী আধুনিক অসভ্যতার জোয়ারের মুখে দ্বীনি পরিবেশ ও সংস্কৃতির প্রতিরোধ ও প্রতিরক্ষা এ সবই যে মনীষী শামছুল হক ও তাঁর সহযোগীদের শিক্ষা বিস্তার কর্মসূচীতে নিরলস সাধনার প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ ফল তা নিরপেক্ষ বিচারক-মন্ডলীর স্বতঃস্ফূর্ত ও সর্বসম্মত স্বীকৃতির বিষয়।

প্রাথমিক স্তর হতে উচ্চতর স্তরের জন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণের ধারা প্রবর্তন, শিশু ও বয়স্কদের জন্য কুরআন শিক্ষার আধুনিকীকরন ও সহজীকরণ লক্ষ্যে নূরানী নাদিয়া প্রভৃতি পদ্ধতি উদ্ভাবন ও তার প্রচার-প্রসারের কর্মসূচী গ্রহণ, প্রতিটি গ্রামে দ্বীনি শিক্ষালয় ও মসজিদ ভিত্তিক কুরআনী প্রাথমিক মক্তব প্রতিষ্ঠা এ সবই তাঁর আল্লাহ-প্রদত্ত মেধা, প্রতিভা ও চিন্তাধারার ফসল।

প্রসঙ্গত ঃ দ্বীনি শিক্ষার প্রচার-প্রসার উন্নয়ন ও সুসংহত করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত ও অবিরাম কর্মরত 'বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বা কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড-ও এ মনীষীর আজীবন লালিত স্বপ্ন ও চিন্তাধারারই বাস্তব রূপায়ণ। অল্প কথায় বললে, সারা দেশে দ্বীনি ও সুশিক্ষা বিস্তারে নিয়োজিত আলিম সমাজ ও শিক্ষা-সেবা বাহিনীর বৃহদাংশ কিংবা বহুলাংশ মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ)-এর আত্মিক উত্তরসূরি এবং তাঁর শিক্ষা বিস্তার কর্মসূচীরই উৎপাদিত ফসল।

(২) সুনাগরিক সমৃদ্ধ সমাজ বিনির্মাণ ও সুষ্ঠু নেতৃত্বের বিকাশ সাধন ঃ

'সমাজ চলে রাজার চালে' অর্থাৎ যেমন 'নেতা তেমন দেশ' প্রবচনের ধারায় নেতৃশ্রেণী দ্বারাই জাতি পরিচালিত হয়। কোন দেশ ও জাতির নেতৃশ্রেণী আদর্শ ও

www.pathagar.com

উন্নতমানের হলে সে জাতি হবে আত্মমর্যাদায় বলিষ্ঠ। সাংসদ ও মন্ত্রী, প্রধান মন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতি 'সৎ নেতা' হলে, উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা 'ভাল লোক' হলে জাতি অবশ্যই বিশ্ব সমাজে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে। নেতৃত্বের জন্য আবশ্যিক শর্ত ও অপরিহার্য গুনাবলীকে কুরআন হাদীসের আলোকে মাত্র দু'টি মৌলিক বিষয়ে সীমিত করা যায়–

(ক) আমানতদারী- অর্থাৎ সততা ও বিশ্বস্ততা তথা আল্লাহর ভয় (তাক্ওয়া)

(খ) বিদ্যা ও জ্ঞান অর্থাৎ শিক্ষাগত যোগ্যতা, প্রতিভা ও কর্মক্ষমতা বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা। পক্ষান্তরে, নেতৃত্ব ও পরিচালনার ক্ষেত্রে সর্বাধিক ক্ষতিকর ও মরাত্মক হচ্ছে 'যশ লিপ্সা' ও 'অর্থ লিপ্সা' (হুব্বে মাল ও হুব্বে জাহ্)। অযোগ্য নেতৃত্ব অর্থাৎ যোগ্যতা-অভিজ্ঞতাকে নেতৃত্বের মানদন্ড স্থির না করে চাতুর্য্যের মাধ্যমে ক্ষমতার মসনদে আরোহন এবং ক্ষমতা কুক্ষিগত করার মানসে দলীয়করণ ও অবৈধ পন্থায় (কিংবা নগদ প্রাপ্তির বিনিময়ে) অপাত্রে নেতৃত্ব অর্পণ।

অপরিহার্য শর্ত-গুণাবলীতে ভূষিত ও মারাত্মক ব্যাধিমুক্ত নেতা ও রাষ্ট্রীয় পরিচালক শ্রেণী তৈরীর সুমহান লক্ষ্যে একদিন তিনি শ্রেণীকক্ষের শিক্ষা-সমাপনকারীদের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন নৈতিক চরিত্র গঠনের। 'মানব স্বভাবে' বিদ্যমান প্রবৃত্তিজাত অসৎ গুনাবলী ও অন্যায় কামনা বাসনা তথা অহং, লোভ, মাৎসর্য, আত্মগর্ব, পরশ্রীকাতরতা, কামুকতা ইত্যাদি হতে অবমুক্ত করে সদগুনাবলী বিনয়, নির্লোভ, অল্পেতুষ্টি, পরমত সহিষ্ণুতা ও সেবার মনোবৃত্তি তৈরীর লক্ষ্যে পরিচালিত করলেন 'তাযকিয়া' বা আধ্যাত্মিক সংশোধনী কার্যক্রম। এভাবে তিনি প্রয়াস পেয়েছিলেন নেতৃত্বের প্রধান পূর্বশর্ত আমানতদারীর গুনে ভূষিত একটি মানব কাফেলা তৈরীর। আর এ কাফেলাটিকে জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুদক্ষ পরিচালক শ্রেণীতে রূপান্তরের লক্ষ্যে বুনিয়াদ রেখেছিলেন 'দারুল মা'আরিফ' কর্মসূচীর।

জাতির দুর্ভাগ্য যে, সমসাময়িকদের অনেকে এ কর্মসূচীর গুরুত্ব অনুধাবনে অপারগ হয়ে পূর্ণোদ্যমে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করতে পারেননি এবং উত্তরসূরিরাও জাতীয় দুর্যোগকালীন প্রতিকূলতায় বন্ধ হয়ে যাওয়া এ কারখানাটিকে বিলুপ্তির করাল গ্রাস হতে উদ্ধার করতে পারেননি। (অবশ্য ইদানীং কোন কোন শ্রদ্ধাভাজন মুরুব্বী এটিকে পুনরুজ্জীবিত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে এ বিষয়ে তৎপর হয়েছেন। তবুও ঐতিহাসিক সত্য এই যে, প্রতিকুল পরিবেশ-পরিস্থিতি ও উপায়-উপকরণের অপ্রতুলতা মুকাবিলা করে এ প্রশিক্ষণাগার অতি অল্প সময়ে যে ক'জনকে তৈরী করেছিল তারা আজীবন সমাজের বিভিন্ন স্তরে অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতৃত্ব আঞ্জাম দিয়েছেন এবং যে ক'জনকে আল্লাহ পাক এখনও হায়াতে রেখেছেন তাঁরা তাঁদের পূর্বসূরিদের পূর্ণাঙ্গ পদাংক অনুসরন করে চলেছেন।

www.pathagar.com

(৩) ও (৪) মানব ও সর্বসৃষ্টির অধিকার সংরক্ষণ এবং খিদমতে খাল্‌ক ঃ

মাওলানা ফরিদপুরী (রহঃ) প্রথমে আধুনিক ইংরেজী শিক্ষা পরে গভীরতম নি শিক্ষা আহরনের মাধ্যমে এ দু'য়ের তুলনামুলক অবস্থান ও পরিণতি সম্বন্ধে য়েছিলেন সুবিজ্ঞ। তিনি এ স্থির বিশ্বাস ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন া, বিদেশী শাসক-শোষক গোষ্ঠীর প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থার বিপরীতে কুরআন াদীস ভিত্তিক শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে অধিকার ও কর্তব্য শিক্ষিত ও জ্ঞানবান নাগরিক তৈরী তথা সমগ্র জাতিকে আখিরাতমুখী ও তাক্‌ওয়াধারী করার মাধ্যমে াত্মমর্যাদা অধিকার আদায় ও তার পাশাপাশি বরং অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অপরের ধিকার প্রদান এবং অন্যায়, অসত্য ও জুলুম-নিপীড়নের মূলোৎপাটন করে দুর্বল াযিতদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সর্বজনের খিদমত ও সেবার প্রবল মনোবৃত্তি সৃষ্টির ধ্যমে সম্ভব হয়ে উঠবে সুষ্ঠ ও আদর্শ সমাজের বিনির্মান। এ উদ্দেশ্য সাধনে চনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আঞ্জুমানে তাবলীগুল কুরআন ও খাদেমুল ইসলাম ামা'আত। তাঁর বক্তব্য-উদ্বৃতিতে তাঁর এ চিন্তাধারা ও সংগঠন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য রিস্ফুটিত হয়েছে।

তিনি বলেছেন, আমি যেহেতু প্রথমে ইংরেজী শিক্ষিত হইয়া স্বর্ণপদক লাভ রিয়া পরে কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা লাভ করিয়াছি, এই জন্য সাধারণ শিক্ষার টি আমি রন্ধ্রে রন্ধ্রে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি, তদুপরি দু'শ বছরের পরাধীনতা বং স্বাধীনতা লাভের পরেও (রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে) ইসলামী শিক্ষা অবর্তমান। সর্বশেষ সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম াল্লাহর দরবার হইতে আনিয়া যে কুরআন ও সুন্নাহ এক কথায় যে ইসলাম ম্মতের নিকট আমানত ও গচ্ছিত রাখিয়া গিয়াছেন উহাই নাজাতের ও মানব ক্তির একমাত্র পথ। আমার দেলের আরজু এবং আল্লাহর দরবারে সকাতরে াকুতি মিনতি সহকারে আরাধনা ও দোয়া এই যে, প্রত্যেক মুসলমানই বিশেষতঃ ই আঞ্জুমানের (খাদেমুল ইসলাম জামাআতের) যাহারা মেম্বার হইবেন তাহারা ই খেদমতের জন্য জানের ও জীবনের একাংশ এবং মালের ও সম্পত্তির একাংশ নষ্ঠাসহকারে খালেছ নিয়তে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অবশ্য অবশ্য খরচ চরিবেন।

বস্তুত ছদর ছাহেব (রহঃ) এত সুদূর প্রসারী সমুন্নত ও ব্যাপক চিন্তাধারার মধিকারী ছিলেন যে, দু'শ বছরের গোলামীর অভিশাপ লাঞ্ছিত ও অধোঃপতিত একটি জাতিকে আত্মপরিচয় ফিরিয়ে দিয়ে তাকে আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন সমুন্নত জাতিতে উন্নীত করার 'ব্যবস্থাপত্র' ছিল তাঁর নখদর্পনে। তাঁর প্রতিষ্ঠিত খাদেমুল সেলাম জামাআতের আদর্শ উদ্দেশ্য ও কর্মসূচী বিশ্লেষন করলে প্রবন্ধকারের এ

www.pathagar.com

দাবী সপ্রমাণ হবে। প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত কলেবরে বিষয়টির বিশদ আলোচনার সু
নেই বিধায় প্রসংগটির প্রতি অতি সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করা হয়েছে।

কুরআন-হাদীসের কোনরূপ আধুনিক ব্যাখ্যার আশ্রয় পরিহার করে সর্বস ব্যাখ্যা অনুসরনের মাধ্যমে পরাধীনতার কুফল বিজাতীয় সভ্যতা-সংস্কৃ হীনমন্যতা ও হেয়তা বোধ, প্রগতি ও সভ্যতার নামধারী খৃষ্টানী অসভ্য বেড়াজাল থেকে মুক্তিলাভ এবং জাতীয় ও ইসলামী সভ্যতার সংস্কৃতির বিকা মাধ্যমে প্রকৃত স্বাধীন ও আত্মমর্যাদাবোধে উজ্জীবিত জাতিতে পরিনত হওয়া এ বিশ্বমুসলিম ভ্রাতৃত্ব সুনিবিড় করা, ইসলামের পাঁচ বুনিয়াদের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবা অর্থের লোভ ও পদের আকর্ষণ পদদলিত করে হারাম ফাসিক, মিথ্যাচ মুনাফিকী, বিশ্বাসঘাতকতার কু-অভ্যাস বর্জন করে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা এ অন্যায় ও আসত্য বিনাশের লক্ষ্যে জিহাদ-ফি সাবীলিল্লাহ-কে জীবনের লক্ষ্য নি করা এবং তদনুসারে জীবন যাপনের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে প্রত্যেক ব্যক্তির জান মাল আল্লাহর অনুমোদিত পন্থায় তাঁর রেযামন্দীতে উৎসর্গ করা অকুতো মুজাহিদ সৈনিকের জীবন যাপন করার লক্ষ্যে জান ও মালকে আল্লাহর মালিক বিশ্বাস করে মুসলিম ঐক্য বিনাশী কুসংস্কার বাতিল মতবাদ ও চিন্তাধারা প্রতির করে জামাআতবদ্ধ জীবন যাপন করা।

সেবার নামে দ্বীন ও ঈমান হরনকারী, জাতীয় চেতনা ধ্বংসকারী মিশনারী এন, জি, ও-দের অপতৎপরতার গোপন অভিসন্ধি ও চূড়ান্ত লক্ষ্য পূর্ণ পরাধীন গ্রাস করার বিরুদ্ধে বাস্তব প্রতিরোধ গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে জাতিকে সতর্ক ব এবং স্বার্থান্ধতার উর্ধ্বে আরোহন করে খিদমতে খাল্‌ক মানবতার সেবা জীবনের ব্রতে পরিনত করা। নিকট অতীতের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, সচেতন আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন এবং সেবার মনোবৃত্তিতে উদ্বুদ্ধ পারস্পরিক সহযোগি ভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণের যে ধারা তিনি রচনা করেছিলেন এবং খাদেমুল ইস জামাআত যে ব্যাপক কর্মসূচী নিয়ে ময়দানে অগ্রসর হয়ে চলছিল তার ক্রমধ অব্যাহত থাকলে আজ এদেশের ইতিহাস ও ভূগোল হত ভিন্নতর। জাতির দুর্ভ যে, উত্তরসূরিদের দ্বারা পূর্বসূরির যথার্থ পদাংক অনুসরন না হওয়ায় পূ পরাধীনতা বরং জাতীয় বিলুপ্তির দুর্যোগের ঘনঘটা আজ জাতির ভাগ্যাকাশ আচ্ছাদিত করে ফেলেছে প্রায়। তবে আজও তাঁর কর্মধারার পূর্ণ অনুসরন এ চ সংকট হতে উত্তরণ ঘটাতে পারে নিঃসন্দেহে।

(৫) সর্ববিধ বাতিল ও তাগুতী চক্রের মুকাবিলায় সার্বিক জিহাদ ঃ

মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ)-এর প্রধান পরিচিতি হচ্ছে এই। তিনি ছিলেন জন্মগতভাবে আপাদমস্তক এক নির্ভিক মুজাহিদ। নবুয়াতী জী

www.pathagar.com

ধারার "আল্লাহর কালিমা সমুন্নত করা" (ই'লাউ কালিমাতিল্লাহ), 'সৎ ও ন্যায়ের আদেশ এবং অন্যায় ও অসত্যের সার্বিক প্রতিরোধ (আমর বিল মা'রুফ ও নাহী আনিল মুন্‌কার) তথা হাদীসে বর্ণিত শক্তি, বুদ্ধি, মেধা, রসনা-বক্তব্য, বিবৃতি ও লিখনীর মাধ্যমে অন্যায় প্রতিরোধের ধারা অনুসরণ এবং হিক্‌মত ও প্রজ্ঞা-কুশলতার সঙ্গে আল্লাহর পথে আহ্বান ছিল তাঁর আজীবনের প্রধান ব্রত। তিনি ছিলেন মনে প্রাণে এ জ্ঞান ও বিশ্বাসের ধারক যে, মানবতা সমৃদ্ধ সমাজ ও আদর্শ কল্যাণ রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব বিধানের জন্য রাষ্ট্রীয় ভাবে ইসলামী বিধান অনুসরণের বিকল্প নেই এবং কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক কুরআনী শাসনতন্ত্র ও ইসলামী সংবিধানই উপরিউক্ত লক্ষ্যের একমাত্র রক্ষা কবচ। তাই ইসলামী সংবিধান ও শাসনতন্ত্র প্রণয়ন এবং তদনুসারে রাষ্ট্র পরিচালনার জিহাদে তিনি ছিলেন নিবেদিত ও আজীবন আত্মনিয়োজিত।

তিনি আরও জানতেন যে, শুধু প্রচলিত দলীয় রাজনীতি এ ক্ষেত্রে সুফল ও পূর্ণ সাফল্য বয়ে আনবে না। কাজেই তাঁর প্রাণপণ তৎপরতা ও অবিরাম সাধনা ছিল সমগ্র দেশবাসীর জাতীয় মানসের ইসলামী করণ ও আপামর জনতার অন্তরের দাবী রূপে জাতীয় আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে নিবেদিত। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জিহাদে সক্রিয় অংশগ্রহণ হতে শুরু করে পূঁজিবাদ সমাজবাদসহ সব মানব রচিত অথর্ব মতবাদের বিরুদ্ধে তাঁর বলিষ্ঠ রচনাবলী ও সোচ্চার কণ্ঠস্বর এবং ক্ষমতাশীনদের যাবতীয় অপকর্ম ও ধর্মদ্রোহী আইন প্রনয়ন ও বাস্তবায়নের অপচেষ্টার বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রামের ধারা ছিল অক্লান্ত ও অবিরাম। শাসন ক্ষমতা মসনদারোহীদের দোর্দান্ত প্রতাপশালী হওয়ার অনুপাতে তাঁর প্রতিবাদ-প্রতিরোধের ধারা ছিল সর্বদা অধিক উচ্চমানের।

ফলে তাঁর জীবনকালে কখনও কোন শাসন প্রশাসন ইসলাম বিরোধী কোন আইন প্রনয়ন ও প্রবর্তন করে উৎরে যেতে পারে নি। বরং সব সময়ই তাঁর প্রচন্ড প্রতিরোধের মুখে সরকারী মহাশক্তিও ফিরআউনী প্রতিপত্তিকে মুখ থুবড়ে পড়ে আত্মসমর্পন করতে হয়েছে। অবশ্য এর মুখ্য কারণ ছিল তাঁর ইখলাছ ও ঐকান্তিক নিঃস্বার্থতা তাঁর আন্দোলন ধারার ব্যাপকতা ও সার্বিকতার বৈশিষ্ট্য। একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধান তাঁর লক্ষ্য হওয়ার কারণে সর্বদাই তাঁর প্রতিরোধ আন্দোলন সর্ববিধ মতদ্বৈধতার ঊর্ধ্বে এক সর্বব্যাপী জাতীয় আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ তাকে সফলতার বিজয় তোরনে উপনীত করেছে।

মুসলিম পারিবারিক আইনের কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী ধারার বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিরোধ আন্দোলন এ প্রসঙ্গের একটি উল্লেখযোগ্য প্রমাণ। শাসক শ্রেণী ও বিরুদ্ধ মতবাদী বর্ণচোরা বুদ্ধিজীবীদের চ্যালেঞ্জের জবাবে ইসলামী শাসনতন্ত্রের

www.pathagar.com

২২ দফা মূলনীতি প্রণয়নে দেশের সর্বমতের আলিম সমাজকে অভিন্ন প্লাটফরমে সম্মিলিত করার কাজে তাঁর নিরব সংগঠক ও সমন্বয়কারীর ভূমিকা পালন জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্‌র পরিসরে তাঁর অবদান তালিকার সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য সংযোজন। যা বাস্তবায়িত হলে ভূ-গোলকের মানচিত্রে আজ মুসলিম জাতি বরিত হত বিশ্বনেতৃত্বের সম্ভ্রমপূর্ণ আসনে। 'একমাত্র স্রষ্টার সন্তুষ্টি বিধান এবং আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় ও তোয়াক্কা না করা ছিল তাঁর জিহাদের মূলনীতি ও বৈশিষ্ট্য'। এ কারণে মিত্র তো বটেই, প্রতিপক্ষ শত্রুও সর্বদা তাঁকে দেখেছে সম্মান প্রদান ও সমীহ করার দৃষ্টিতে।

গুণাবলী ও ব্যক্তিগত প্রসংগ ঃ বক্ষমান প্রবন্ধ কোন ধারাবাহিক জীবনী প্রতিবেদন নয়। তবুও এতে গুণাবলী ও ব্যক্তি প্রসংগ আলোচনার বাঞ্ছনীয়তা রয়েছে এ কারণে যে, কোন ব্যক্তির কর্ম-অবদান মূলতঃ ও প্রধানত তাঁর গুনাবলীরই বহিঃপ্রকাশ। অবশ্য পরিবেশ-প্রতিবেশ ও পার্শ্ব অনুসংগের আনুকূল্য ও প্রতিকূলতার প্রভাব তাতে মাত্রা ও পরিমাণের ক্ষতি বৃদ্ধি ঘটাতে পারে। মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী -ছদর ছাহেব (রহঃ)-এর জীবনেও পরিবেশের প্রতিকূল অবস্থান এবং সমসাময়িক সহযাত্রী ও সহকর্মীদের তাঁকে 'বুঝাতে না পারা' জনিত অসহযোগ তাঁর অবদানের পরিধি ও ধারাবাহিকতাকে ক্ষতিগ্রস্ত কিংবা বাধাগ্রস্ত করেছে। তবুও এ অসহযোগ ও প্রতিকূলতার প্রাচীর ডিংগিয়ে তিনি যে বিশাল অবদান রেখে গিয়েছেন তা তাঁর ব্যক্তিগত স্বভাব চরিত্র ও গুনাবলীরই সমুজ্জল প্রতিফলন।

জন্মগত ভাবেই এমনীষী সমুদয় মানবিক গুণাবলীর উচ্চমাত্রার অধিকারী ছিলেন। তাঁর স্বভাব আচরণ এবং তাঁর চিন্তাধারা ও কর্ম অবদানে নুবুওয়াতী চরিত্র ও গুনাবলীর প্রভাব সুস্পষ্ট রূপে পরিলক্ষিত হয়। এ সবের মধ্যে সমধিক উল্লেখযোগ্য তালিকায় রয়েছে- নির্মোহ- নির্লোভতা, নির্ভীক সাহসিকতা, বিনয়, নম্র-আত্মমর্যাদাবোধ, সর্ব সৃষ্টির প্রতি মমতাবোধ ও সদা জাতির মুক্তি ও কল্যাণ চিন্তা এবং এতদপ্রসূত গুনাবলী। পার্থিব জীবনের আরাম আয়েশ ও সম্পদ-বিলাস, জড়জগতের অলীক চাকচিক্যের হাতছানি শৈশব হতে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের কোন বিন্দুতে তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি।

ব্যক্তিগত লোভ তো দূরের কথা, তাঁর মিশন ও কর্মসূচী বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবের ক্ষেত্রেও সরকারী অনুদান গ্রহণের 'নীচুতা'কে তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন বারংবার। শেরে বাংলা হতে শুরু করে আইয়্যুব-মুনইম পর্যন্ত কারো অনুদান গ্রহণের সকাতর আবেদন এমন কি দ্বীনের সার্থে গ্রহণের অজুহাতও যে তাকে 'কাতর' করতে পারে নি - তা সর্বজন বিদিত। এর পিছনে মূল কার্যকর

www.pathagar.com

বিষয় ছিল তাঁর আজন্ম নির্লোভতা ও পরম আত্মমর্যাদাবোধ। এ প্রসংগে তাঁর জীবনের একটি ক্ষুদ্র ঘটনা এ কারণে উল্লেখযোগ্য যে, ঘটনাটি বাহ্যত অতি ক্ষুদ্র হলেও তা তাঁর নির্লোভ চরিত্রের প্রমানবাহী হওয়ার সাথে সাথে আমাদের মত 'দুর্বলদের' জন্য অনুপম শিক্ষণীয় বিষয়। ঘটনাটি নিম্নরূপ-

কোন একদিন তিনি নাশ্‌তা না করেই সবকের ঘন্টায় পাঠদান আরম্ভ করেছিলেন এবং কোন কথার ফাঁকে তাঁর অভুক্ত থাকার বিষয়টি প্রকাশ হয়ে গিয়েছিল। এরূপ অবস্থায় উসতাদগত প্রাণ কোন ছাত্র উঠে গেলে চট্ করে তাঁর মনে উদয় হল- ছাত্রটি আমার জন্য নাশ্‌তা আনতে যাচ্ছে। বাস্তবেও হল তা-ই। ছাত্রটি একটু পরে ঘন্টাশেষে একটি বাসনে নাশ্‌তা সাজিয়ে তাঁর কামরায় হাজির হলে তিনি স্বভাবজাত দৃঢ়তায় তা গ্রহণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেলেন। নিরুপায় ছাত্রটি নাশ্‌তা ফিরিয়ে নিয়ে গেল। এটি ছিল লোভ হতে উত্তরনের সর্বোচ্চ সোপান তথা 'মনের গহিনে লুকায়িত বাসনা ও চাহিদা' হতে মুক্ত হওয়ার অকাট্য প্রমাণ। (অবশ্য সুযোগ্য উস্‌তাদের যোগ্য শাগরিদও বিষয়টি অনুধাবনে সক্ষম হয়েছিল এবং একটু বিলম্বে পূনরায় সে নাশ্‌তা পরিবেশন করেছিল এবং উস্‌তাদও মনের গহিনের গোপন লোভ এখন আর অবশিষ্ট না থাকার কারণে তা গ্রহণ করেছিলেন)।

তাঁর আত্মমর্যাদাবোধ তো প্রবাদতুল্য 'জালিম শাসকের সম্মূখে স্থির দাঁড়িয়ে সত্য ভাষণের শ্রেষ্ঠ জিহাদ প্রতিপালনে তিনি ছিলেন সিংহ শার্দুল। তাই তো লৌহ মানব ও ফিল্ড মার্শালের মুখের উপর 'ইংরেজ দু'শ বছরে (ইসলামের) যা ক্ষতি করে নি, অতি অল্প দিনে আপনি তার চেয়ে অধিক করেছেন' এ সত্য বাণী উচ্চারনে তাঁর জিহ্বায় ছিলনা কোন জড়তা কিংবা দেখা দেয় নি তাঁর সামান্য হৃদকম্প। সরকারী যে কোন ধর্মদ্রোহী সিদ্ধান্তের মুকাবেলায় তিনি লড়েছেন সেয়ানে সেয়ানে। ঘুষ ও ঘুষী, প্রলোভন ও হুমকীর কোন মাত্রাই তাকে চুল পরিমান বিচ্যুত করতে পারে নি 'সিরাতে মুস্‌তাকীমের' সরল রেখা হতে। তিনি বিশ্বাস করতেন অহংকার পরিত্যাজ্য, কিন্তু আত্মমর্যাদাবোধ সমৃদ্ধ না হলে জাতির মুক্তি অসম্ভব।

তিনি জানতেন, দীর্ঘ কালের গোলামীর অভিশাপে সৃষ্ট 'হীনমন্যতাবোধ-ই জাতির মুক্তি ও উত্থানের পথে প্রধান অন্তরায়। এ কারণে তাঁর রচনাবলীর সর্বত্র 'হীনমন্যতাবোধ' হতে উত্তরন ও 'আত্মমর্যাদাবোধে' জাগ্রত হওয়ার পুনঃপৌনিক আবেদন বিবৃত হয়েছে। বিশেষতঃ আলিম সমাজের আত্মমর্যাদাবোধে বলীয়ান হওয়া তাঁর দৃষ্টিতে ছিল জাতীয় মুক্তির অপরিহার্য শর্ত। কারণ, তিনি অন্তরের অন্তস্থলে পোষন করতেন আল্লাহ তা'আলার এ অমোঘ বানীর সত্যতা-"

www.pathagar.com

ইয়ারফাউল্ লাজীনা আমানু মিনকুম ওয়াল্ লাজীনা উতুল ইলমা দারাজাত।" "আল্লাহ ঈমানদারদের ও ইলমের অধিকারীদের সমুন্নত করেন অনেক অনেক মর্যাদায়।" কিন্তু তাঁর আত্মমর্যাদাবোধের আধিক্য কখনও অহংকারের অবৈধ সীমার সুক্ষ্ম প্রান্তরেখা অতিক্রম করে নি। এ কারণে তাঁর সমালোচক প্রকৃত অর্থে ছিল না বললেই চলে। তবে তাঁর রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ-সরকার ও প্রশাসনও কখনও তাঁর বিরুদ্ধে অহং-এর অভিযোগ তুলতে পারে নি। বস্তুত তিনি ছিলেন বিনয় ও অহংমুক্ত আত্মমর্যাদাবোধের মধ্যে সুসমন্বয়ের মূর্ত প্রতীক।

তাঁর এ চারিত্রিক দৃঢ়তার রহস্য কোথায় ? আসলে তিনি জানতেন ও প্রাণে বিশ্বাস করতেন আল্লাহ তাআ'লার মহান রাসূলের এ বাণী অর্থ ঃ "সমগ্র বিশ্বও যদি আল্লাহ্র কাছে একটি মশার পাখা তুল্য হত তবে তিনি কোন কাফিরকে এক ফোঁটা পানি পান করার সুযোগ দিতেন না।" সুতরাং দুনিয়া তার বাহ্যিক আকৃতি ও অবয়বে যতই বৃহৎ, বিপুল ও চাকচিক্যময় রূপে তাঁর সামনে প্রতিভাত হোক না কেন তার স্বরূপ ও প্রকৃতি তো ছিল তার হৃদয় উপলব্ধিতে উন্মোচিত। তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল উর্ধ্ব পানে। তিনি ছিলেন 'শাহীন' ও ঈগলের ন্যায় উর্ধ্বগামী, শকুনের নিম্নগামীতা তাঁকে কলুষিত করে নি। তিনি বিশ্বাস করতেন, অর্থ "তার পলোকের উর্ধ্বেও রয়েছে জগতের পরিমন্ডল" এবং অর্থ "বন্ধু ! উর্ধ্বগমনের সোপানত রয়েছে অসংখ্য-অগনন। কাজেই তোমার উর্ধ্বগামীতার গতি হবে অবিরাম-অনিরুদ্ধ।" সুতরাং পৃথিবীর 'কারাবাস' থেকে মুক্তি লাভ করে 'পিতৃ নিবাস'-এর উর্ধ্বজাগতিক অক্ষয় কাননে আরোহনই ছিল তাঁর পদচারণার গন্তব্য।

তিনি ছিলেন 'মুওয়াহ্হিদ'- নিরেট তাওহীদবাদী 'মৌলবাদী'। দার্শনিক কবি মাওলানা ইকবালের ভাষায় অর্থ "স্বর্ণ-হীরক ও মনি মাণিক্যের নিবেদন ঢেলে দাও তার চরনযুগলে। কিংবা (উন্মুক্ত অসি তুলে ধর তার মস্তক 'পরে কিংবা লোডেড রিভল্বার উঁচিয়ে ধর তার হৃদয়পিন্ড বরাবরে- ভরসা ভীতির দোলায় দুলে না তাঁর হৃদয় - তাওহীদের মহাভবন নির্মিত হয় ভূমিধ্বস ও ভূমিকম্পের শংকামুক্ত এহেন নিটোল বুনিয়াদের উপরেই।" জাগতিক সুযোগ কিংবা দুর্যোগ, ভীতি-হুমকী কিংবা প্রলোভন তাঁর দৃষ্টিতে ছিল ময়লা ও আবর্জনাতুল্য ভদ্র পথচারীকে যা হতে সযতনে শরীর ও পোশাক বাঁচিয়ে নাকে সুগন্ধি মাখা রুমাল চেপে এগিয়ে যেতে হয়। তাঁর সার্বিক চরিত্রগুণের মূল নিয়ন্ত্রক ও কেন্দ্রীয় বিষয় ছিল তাঁর নবী সুলভ চরিত্রগুণে ভূষিত হওয়া। অর্থাৎ প্রতি মুহূর্তে নিরবচ্ছিন্ন ধারায় উম্মাতের ফিকির, জাতির মুক্তি চিন্তায় বিভোর থাকা। "কানা রাসূলুল্লাহি ছাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দায়িমান লিফিক্‌রাতিম্ মুতাওয়াচ্ছিলিল আহ্যান" অর্থ ঃ হাদীছের ভাষায় - অর্থ ঃ রসূল (সঃ) সর্বদা চিন্তাশীল ও ব্যথিত থাকতেন উম্মতের জন্য)।

www.pathagar.com

ত্রিরত্ন প্রসংগ ঃ প্রবন্ধকারের দৃষ্টিতে মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী ছদর ছাহেব হুযুর, মাওলানা মুহাম্মাদুল্লাহ - হাফেজ্জী হুযুর ও মাওলানা আবদুল ওয়াহ্হাব- পীরজী হুযুর (রহঃ) ছিলেন ত্রিরত্ন, এক বৃন্তে তিন ফুল। কারণ, দেওবন্দ সাহারানপুরের কুসুম কাননে প্রস্ফুটিত ও থানাভবন রিফাইনারীতে পরিশোধন পর্ব সমাপ্তির পর বাংলার মাটিতে তার আকাশ-বাতাস সুরভিত করার লক্ষ্যে পরিবেশিত এ ত্রিরত্নের জীবনধারা পরস্পর অংগাংগি রূপে বিকশিত হয়েছিল। এঁদের প্রত্যেকের স্বকীয় মর্যাদায় ভাস্বর হওয়ার পাশাপাশি এঁদের সম্মিলিত ও সমন্বিত 'তাজদীদ' বাংলার আকাশ-বাতাসকে আজও সৌরভ মুখর করে রেখেছে । অল্প কথায় উপমহাদেশের পূর্বাঞ্চলে বর্তমানে বিদ্যমান দ্বীনি ও ইলমী পরিবেশের বহুলাংশ এ ত্রিরত্নের কাছেই দায়বদ্ধ এবং জাতীয় জীবনে পরিলক্ষিত অবক্ষয় ও অন্ধকারাচ্ছন্নতার আভাস বিশেষতঃ নেতৃত্ব শূণ্যতা এঁদেরই অনুপস্থিতি জনিত অভাবের প্রতিফলন।

শেষ কথা ঃ দেশ,জাতি ও বিশেষতঃ আলিম সমাজ মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরীর কর্মধারা বাস্তবায়নে তাঁর প্রদর্শিত পথরেখা অনুসরন করলে আজ এ অঞ্চলের ইতিহাস ও ভূগোল হত ভিন্নতর। ইয়া আল্লাহ্ ! অমাবশ্যার গাঢ় তমাশায় ধ্বংসের গহিন গহ্বর প্রান্তে পতনোম্মুখ নেতৃত্বের দুর্ভিক্ষ ও দুর্যোগ দুর্দশা দুর্ভাগ্য লাঞ্ছিত এ জাতিকে উদ্ধার করে পূর্ণিমার আলো ঝলমল এ 'গ্রীন হাউজ' দুষনমুক্ত বিশুদ্ধ আবহাওয়ার নির্মল এ অনাবিল মুক্তির পরিবেশে উত্তরনের জন্য আবির্ভাব ঘটাও আর একজন শামছুল হকের আর একটি অনির্বাণ সত্যের সূর্যের। আমীন ॥

=০০০=

www.pathagar.com

মুজাহিদে আ'যম সম্পর্কে জৌনপুরী পীর সাহেবের উক্তি

মাওলানা আবু ছাইদ কাশিয়ানী

মুজাহিদে আযম হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ) ছিলেন নিজ নামের যথার্থ প্রতিফলন ও বাস্তব চিত্র। শামছুল হক অর্থ হকের সূর্য, সত্য ও ন্যায়ের সূর্য। সূর্য যেমন অন্ধকারের সমস্ত বাধা-বিপত্তি উপেক্ষা করে আপন গতিতে এগিয়ে আসে, অন্ধকারের বাধার প্রাচীর সমূহ লন্ড ভন্ড করে পালানোর সুযোগটুকুও না দিয়ে আপন স্থানেই তাকে দাফন করে দেয়। নিজ হাস্যোজ্জ্বল ও ঝলমলে আলো ছড়িয়ে কোলাহলময় করে তোলে গোটা পৃথিবীকে। ঠিক তেমনই হয়েছিল শামছুল হক নামের হকের সূর্যটির উদয়কালীন অবস্থা।

মুজাহিদে আযম হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ) এ ধরাধামে যখন আগমণ করেন, তখন এদেশ বিশেযতঃ তাঁর জন্মভূমি গওহারডাঙ্গা এলাকা ছিল শিরক, বিদআত, গোমরাহী তথা সর্ব রকমের কু-সংস্কারে নিমজ্জিত। লক্ষ্মীপূজা, গাস্মী পূজা, কালীপূজা, আশ্বিনা পূজা, কার্তিক পূজা ইত্যাদি হিন্দুয়ানী প্রথা ছিল তৎকালীন মুসলমানদের অবশ্য পালনীয় আচার অনুষ্ঠান। গাজী কালুর পুঁথি, বেহুলার গান, জঙ্গনামা ইত্যাদি নানা রকমের জারিজুরি দল বেধে পড়া ও তা শোনাকে তারা ধর্ম-কর্মের ন্যায় জ্ঞান করত। সমাজের স্বল্প সংখ্যক মানুষ নামায আদায় করলেও তারা নামাযের দোয়া-কালাম, সূরা ইত্যাদি সম্বন্ধে তেমন কিছুই জানতো না। নানা ধরণের শ্লোক দিয়ে তারা নামাযের নিয়ত করতো। সূরা-কালাম, দোয়া-দরুদ খেয়াল খুশী মত যে যা পারত পড়তো।

এমন আরো কত কিছু যে সে সমাজে বিদ্যমান ছিল তা এ স্বল্প পরিসরে উল্লেখ করা সম্ভব নয়। মোট কথা হাজারো রকমের বাতিল, গোমরাহী, শিরক বিদআতের ঘোর অন্ধকারে সমাজ তখন আকণ্ঠ নিমজ্জিত। এমন এক ভয়াবহ সামাজিক অবক্ষয়ের প্রেক্ষাপটে হযরত সদর সাহেব কেবলা (রহঃ) উপমহাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দারুল উলূম দেওবন্দ হতে লেখাপড়া শেষে ফিরে আসেন নিজ মাতৃভুমির মাটিতে। তিনি শিরক, বেদআত, কুফরী, গোমরাহী তথা সর্ব রকমের কু-সংস্কারের মোকাবেলায় এমন কুশলী, হেকমতপূর্ণ কার্যধারা সমূহের গোড়া পত্তন করলেন যে, সে সব কার্যক্রমের সুদূর প্রসারী প্রভাবে বদদ্বীনীর স্থলে প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠতে লাগল হেদায়েতের আলো। যার ধারাবাহিকতা এখনও প্রবাহমান এবং তা দিনে দিনে আরো সম্প্রসারিত হয়ে আজও বাতিলের পিছু ধাওয়া করে ফিরছে।

www.pathagar.com

এই হকের সূর্যটি, সত্য ও ন্যায়ের সূর্যটি নিজ মাতৃভূমি এলাকায় কি পরিস্থিতিতে উদিত হয়েছিল, তার বিকাশ লাভের সুচনা পর্বটি কেমন ছিল, তার একটি চমৎকার ঘটনা রয়েছে। যা সংকলকের নিকট বর্ণনা করেছেন হযরত মুজাহিদে আযমের (রহঃ) জামাতা, গওহারডাঙ্গা মাদ্রাসার বর্তমান সুযোগ্য মুহতামিম ও শাইখুল হাদীস, হাকীমুল উলামা, হযরত মাওলানা আবদুল মান্নান সাহেব দামাত বারাকাতুহুম। তিনি বলেন, হযরত মুজাহিদে আযম (রহঃ) দারুল উলূম দেওবন্দের সর্বোচ্চ ডিগ্রী লাভ করে দেশে এসে যখন ব্রাহ্মণবাড়িয়া মাদ্রাসায় হাদীসের সর্বোচ্চ কিতাব বুখারী শরীফের ওস্তাদ হিসেবে কর্মরত ছিলেন, তখন তিনি বছরের মধ্যকালীন সময়ের এক ছুটিতে গওহারডাঙ্গার বাড়ীতে আসেন। এ সময় একদিন গোছল করার জন্য একখানা লুঙ্গি কাঁধে ঝুলিয়ে যখন মাত্র মধুমতি নদীর তীরে পৌঁছেন, তখন সেখানে দাঁড়িয়ে নদীর দিকে লক্ষ করে দেখেন, নদীর মাঝখান হতে একখানা বজরা তীরের দিকে এগিয়ে আসছে ধীর গতিতে। এ দিকে ঘাটেও বেশ কিছু লোকজন চোখ উচিয়ে বজরা পানে তাকিয়ে অপেক্ষা করছে। তাদের সাথে একখানা আট বেহারার পালকীও রয়েছে। পরস্পরের মুখে বলাবলি করতে শুনা গেল, ঐতো হুযুর কেবলা আসছেন।

এ খবর গ্রামে ছড়িয়ে পড়ায় আরো লোকজন ঘাটপানে ছুটে আসতে লাগল। দেখতে দেখতে অনেক মানুষের ভীড়ে ঘাট এলাকা লোকে ভরে গেল। ইতিমধ্যে বজরাখানাও কুলে ভিড়ে গেছে। হযরত সদর সাহেব কেবলা লোকদের নিকট হতে জানতে পারলেন যে, বজরার মধ্যে যিনি তাশরীফ এনেছেন, তিনি হলেন বাংলা আসামের আপামর জনসাধারণের মধ্যমণি হযরত জৌনপুরী পীর সাহেব হুযুর কেবলা। লোকেরা নৌকার মধ্যে যেয়ে হযরত পীর সাহেব কেবলাকে সযত্নে নৌকা হতে নামিয়ে আনলেন। অসংখ্য ভক্তবৃন্দ পরিবেষ্টিত হয়ে তিনি নৌকা হতে নেমে পালকির কাছে এসে দাঁড়ালেন।

হযরত সদর সাহেব কেবলা এই প্রথম দেখতে পেলেন হযরত জৌনপুরী পীর সাহেব কেবলাকে। তিনি অত্যন্ত আদব ও এহতেরামের সাথে পীর সাহেব কেবলার সম্মুখে গিয়ে দাঁড়ালেন। অতঃপর হযরত পীর সাহেব কেবলাকে লক্ষ্য করে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে সালাম করলেন। জনতার ভীড়ের মধ্য হতে এমন একটি বিশুদ্ধ ও পরিমার্জিত সালাম শুনতে পেয়ে তিনি হযরত সদর সাহেব কেবলার দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। হযরত সদর সাহেব কেবলার প্রতি প্রথম নযর দিয়েই তিনি বুঝতে পারলেন যে, এ ব্যক্তি নিশ্চয়ই একজন আলেম হবেন। সুতরাং তিনি হযরত সদর সাহেব সম্বন্ধে কিছু ধারণা নেয়ার জন্য সেখানে দাঁড়ানো অবস্থায়ই তাঁর সাথে কিছু কথা বার্তা বললেন। আলোচনার মাঝে তিনি হযরত

www.pathagar.com

সদর সাহেবের নামসহ বিস্তারিত পরিচয় জানতে চাইলেন। হযরত সদর সাহেব কেবলা জৌনপুরী হযরতকে নিজের পরিচয় জানালেন। পীর সাহেব কেবলা বিভিন্ন রকমের প্রশ্ন করে যখন জানতে পারলেন যে, তিনি অবিভক্ত বৃটিশ বাংলার গোল্ডমেডালিষ্ট, দারুল উলুম দেওবন্দের সর্বোচ্চ ডিগ্রী প্রাপ্ত, বাংলার বিখ্যাত ব্রাহ্মণবাড়িয়া মাদ্রাসার শাইখুল হাদীস এবং হযরত হাকীমুল উম্মত মুজাহিদুল মিল্লাত মাওলানা থানভী (রহঃ) এর দরবারের একজন বিশেষ ব্যক্তিত্ব, তখন তিনি এসব দেখে শুনে ও হযরত সদর সাহেব কেবলার সুমধুর ব্যবহার ও উৎকৃষ্ট বাচনভঙ্গি লক্ষ্য করে উপলব্ধি করলেন যে, এযে কেবল নামের শামছুল হক নয়, বরং প্রকৃত অর্থেই হকের সূর্য, সত্য ও ন্যায়ের সূর্য। এ মুহূর্তে আমার সামনেই দাঁড়িয়ে।

মোট কথা হযরত সদর সাহেব কেবলাকে দেখে শুনে তিনি যারপর নাই অভিভুত হলেন। অতঃপর বললেন, আজ বিকালে গিমাডাঙ্গা গ্রামে আমার একটা সভা (প্রোগ্রাম) রয়েছে। এখন সেখানে যাচ্ছি। আমি সেখানে পৌঁছে আপনার জন্য আমার এই পালকীখানা পাঠিয়ে দেব। আপনার নিকট আমার আবেদন থাকল, মেহেরবানী করে সে সভায় আপনি অবশ্যই তাশরীফ আনবেন। একথার জবাবে হযরত সদর সাহেব কেবলা বললেন, হুযুর ! আপনার দরখাস্ত নয় বরং আমি এটাকে আপনার হুকুম মনে করছি। আপনি আমাদের শ্রদ্ধেয়। সুতরাং আমি অবশ্যই সেখানে যাব (ইন্‌শাআল্লাহ)। আপনার এ বিনীত খাদেম আপনার পালকীতে চড়ে সেখানে যাবে, এটাতো কল্পনাতীত ব্যাপার। সুতরাং হুযুরের খেদমতে বিনীত আরোজ, পালকী পাঠিয়ে লজ্জা দিবেন না। আমি পায়ে হেটেই যথা সময়ে হুযুরের খেদমতে উপস্থিত হবো (ইন্‌শাআল্লাহ)।

অতঃপর হযরত জৌনপুরী হুযুর কেবলা পাল্‌কীতে চড়ে বসলেন । ভক্ত-মুরিদগণ পালকীখানাা কাঁধে তুলে নিয়ে চল্‌ল গিমাডাঙ্গা গ্রামের দিকে। হুযুর কেবলা গিমাডাঙ্গা গ্রামে পৌঁছা মাত্র এ খবর চারিদিকে বাতাসের ন্যায় ছড়িয়ে পড়ল। গিমাডাঙ্গা, গওহারডাঙ্গা, দাউদকান্দি, শিংগীপাড়া, পাটগাতিসহ প্রত্যন্ত গ্রাম সমূহ হতেও দলে দলে মানুষ ছুটে আসছে হুযুরকে এক নযর দেখার জন্য। গিমাডাঙ্গা গ্রাম আজ লোকে লোকারণ্য। বিকাল তিনটার দিকে পীর সাহেব কেবলা কতিপয় মুরীদকে ডেকে বললেন, ও মিয়ারা আমার পালকীখানা নিয়ে জল্‌দি গওহারডাঙ্গা গ্রামে চলে যাও। সে গ্রামের হযরত মাওলানা শামছুল হক সাহেব হুযুরকে পালকীতে উঠিয়ে নিয়ে আসবে। তোমরা বিলম্ব করোনা। পালকীখানা নিয়ে এখনই রওয়ানা কর। হযরত মুজাহিদে আযম শামছুল হক সাহেব (রহঃ) এর বাল্যকালের ডাক নাম ছিল "কালু"। গ্রাম এলাকার মানুযেরা

www.pathagar.com

তাকে এ কালু নামেই জানতো। শামছুল হক নামে তিনি গ্রাম এলাকায় তেমন পরিচিত ছিলেন না। তাছাড়া তিনি যে একজন বড় আলেম, সে সম্বন্ধেও লোকেরা জানতো না।

কেউ কেউ লোকমুখে এতটুকু শুনেছে যে, ঘোপেরডাঙ্গা গ্রামের মুন্সি আব্দুল্লাহ সাহেবের ছেলে "কালু" নাকি কোথা থেকে কি পড়ে এসেছে। সুতরাং তারা হুযুর কেবলার মুখে এ রকম একটা আদেশ শুনে হুজরাখানা থেকে বেরিয়ে পরস্পরে কানাঘুযা করতে লাগল যে, ঘোপের ডাঙ্গা গ্রামে আবার মাওলানা শামছুল হক সাহেব কে? এরূপ কানাঘুযা লোক মুখে ছড়িয়ে পড়ল। সবার মুখে একই প্রশ্ন। তন্মধ্যে কেউ কেউ বলল, "শুনেছি, ঘোপেরডাঙ্গার মুনশি আব্দুল্লাহ্ সাহেবের ছেলে কালু" নাকি কোথা থেকে কি পড়ে এসেছে। নদীর ঘাটে তো হুযুরের সাথে সে কিছু কথাবার্তা বলেছিল। হুযুর কেবলা মনে হয় তার কথাই বলছেন।" তবে তাকে আবার পালকীতে আনতে হবে! তাও স্বয়ং হুযুর কেবলার আটবেয়ারার পালকীতে করে! আমরাই বহন করে আনবো!" এটা যেন তারা মেনে নিতে পারছিলনা।

এদিকে হুযুর কেবলার হুকুম তো মানতেই হবে। অন্যথায় হুযুরের বিরাগ ভাজন হয়ে গেলে হুযুরের খাছ খাদেম বলে এলাকার সর্ব মহলে যে একটা সম্মান প্রতিপত্তি রয়েছে এক মুহূর্তেই সে সব ধুলায় মিশে যাবে। সুতরাং হুযুরের হুকুম অমান্য করার কোন উপায় নাই। হুযুরের কথামত সেখানে যেতেই হবে। এরূপ আগে-পিছে কিছু চিন্তা-ভাবনা করার পর মুরীদগণ যথা সময়ে পালকীসহ উপস্থিত হলেন মাওলানা শামছুল হক সাহেবের বাড়ীতে। হুযুরকেও তারা বাড়ীতে পেলেন এবং বললেন, আপনাকে তো পালকীতে করে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদেরকে পাঠানো হয়েছে। অতএব আপনি চলুন।

হযরত সদর সাহেব কেবলা তাদেরকে বললেন, আমার মত একজন মানুষ হুযুরের পালকীতে চড়ে যাব, তাও আবার আপনাদের মত সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিবর্গের কাঁধে ছওয়ার হয়ে, তাতো হতে পারেনা। কখনই হতে পারে না। মেহেরবানী করে আপনারা যেতে থাকুন। আমি এখনই পায়ে হেটে হুযুরের খেদমতে আসছি। তারা পালকীখানা নিয়ে চলে গেলেন। হযরত সদর সাহেব কেবলাও কিছুক্ষণের মধ্যে সভাস্থলে উপস্থিত হলেন। এলাকার সর্বস্তরের হাজার হাজার মানুযের সামনে স্বয়ং পীর সাহেব কেবলা কিছুটা অগ্রসর হয়ে হযরত সদর সাহেব কেবলাকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে মঞ্চের উপরের একেবারে সম্মূখে নিয়ে বসালেন। লোকেরা এ দৃশ্য দেখে চিন্তা করতে লাগল, কালু মিয়া হয়তঃ অনেক বড় আলিম হয়েছেন। তা না হলে হুযুর কেবলা তাকে এভাবে সম্মান জানাবেন

www.pathagar.com

কেন ? অতঃপর হযরত জৌনপুরী হুযুর কেবলা হযরত সদর সাহেব কেবলার প্র
ইশারা করে আবেগ জড়িত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন–

"হে বাংলার ভক্ত জনেরা আমার! তোমরা শুনে রাখ ! তোমাদের এ বাংলা
শামছুল হক নামক হকের সূর্য উদিত হয়েছে। আজ হতে এদেশের জন্য তিনি
যথেষ্ট। এখন হতে আমার কাজ তিনিই করবেন। এখানে আমার আর আ
প্রয়োজন নাই। এখন হতে তোমরা হযরত মাওলানা শামছুল হক সাহেব
খেদমতে যাতায়াত করবে।"

এরপর হতে তিনি এলাকাবাসীর নিকট হযরত মাওলানা শামছুল হক সা
নামে পরিচিত হলেন। তখন হতে এলাকার সর্ব স্তরের লোকজন হযরত স
সাহেব কেবলার নিকট যাতায়াত আরম্ভ করল এবং তিনি তাদেরকে এক বাক্যে
বলতেন তারা তাই শুনত।

তিনি এলাকাবাসীর সহযোগিতায় কায়েম করেন দেশের অন্যতম খালেছ দ্বী
প্রতিষ্ঠান দারুল উলূম খাদেমুল ইসলাম গওহারডাঙ্গা মাদ্রাসা। উৎখাত করে
তৎকালীন সমাজের শিরক, বিদআতসহ সমস্ত কু-সংস্কারের অন্ধকার। হেদায়েতে
আলো দ্বারা আলোকোজ্জ্বল করেছেন সমাজ জীবনের সর্বস্তরের মানু
অন্তঃকরণ। এ মহৎ ব্যক্তিই পরবর্তিতে সর্ব মহলে খ্যাত হয়েছেন হযরত স
সাহেব কেবলা নামে এবং প্রসিদ্ধ হয়েছেন মুজাহিদে আযম তথা সর্ব প্র
বাতিলের মোকাবেলায় দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ মুজাহিদ আলেম রূপে।

= ০০০ =

www.pathagar.com

মাওলানা ফরিদপুরীকে (রহঃ) যেমন দেখেছি

অধ্যাপক গোলাম আযম

আমি যখন ১৯৩৯ সালে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র ছিলাম তখন হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ) এর নামের সাথে পরিচয় ঘটে। 'মাসিক নেয়ামত' নামক একটি ধর্ম বিষয়ক পত্রিকায় হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ) এর ওয়াযের বাংলা অনুবাদ নিয়মিত প্রকাশিত হত। আমার এক বন্ধু এ পত্রিকাটি কোথাও থেকে যোগাড় করতেন এবং ছুটির দিন আমার মত আরো ২/১ জন বন্ধুকে এ পত্রিকা পাঠ করে শোনাতেন। মাওলানা থানভীর উর্দুতে দেয়া বক্তৃতাগুলোর অনুবাদক হিসেবেই মাওলানা ফরিদপুরীর (রহঃ) নাম জানলাম। তাছাড়া ঐ পত্রিকায় থানভী সাহেবের কোন কোন বই এর বাংলা অনুবাদের বিজ্ঞাপনও প্রকাশিত হত এবং সে সব বই এর অনুবাদক হিসাবেও মাওলানা ফরিদপুরীর নাম আমার নিকট আকর্ষণীয় হয়ে উঠে।

নেয়ামত পত্রিকায় প্রকাশিত মাওলানা থানভীর (রহঃ) ওয়াযের অনুবাদে একদিকে কোরআন ও হাদীসের উদ্ধৃতি এবং অপরদিকে ঐ উদ্ধৃতির পক্ষে বলিষ্ঠ যুক্তি আমার মনে বেশী দাগ কেটেছিল। যার ফলে 'নেয়ামত' অধ্যয়নের বৈঠক থেকে আমি অনুপস্থিত থাকতাম না। মাওলানা থানভীর (রহঃ) আকলী ও নকলী দলীল পেশ করার কৌশল পরবর্তীকালে আমার লেখার মধ্যেও প্রভাব ফেলেছে। ইসলামে যে কোন বিষয়কে বুঝাবার জন্য বলিষ্ঠ যুক্তি পেশ করার অদ্ভুত শক্তি আল্লাহ তাঁকে দিয়েছিলেন। এভাবে নেয়ামত পত্রিকার মাধ্যমে মাওলানা থানভী (রহঃ) ও মাওলানা ফরিদপুরী (রহঃ) এর প্রতি আমার অন্তরে খুবই মহব্বত সৃষ্টি হয়।

মাওলানা ফরিদপুরীর (রহঃ) সাথে পয়লা সাক্ষাৎ:

১৯৪০ সালের জানুয়ারীতে ঢাকায় এসে ক্লাশ নাইন-এ ভর্তি হলাম। কিছু দিনের মধ্যেই 'মাসিক নেয়ামত' পত্রিকার ঠিকানায় পৌছে সম্পাদক সাহেবের সংগে পরিচয় করলাম এবং নেয়ামতের নিয়মিত গ্রাহক হয়ে গেলাম। নেয়ামত এর সম্পাদক মরহুম জনাব আবদুস সালাম এর কাছ থেকে মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ) সাহেবের ঠিকানা যোগাড় করলাম। সে সময় মাওলানা ফরিদপুরী (রহঃ) লোকজনের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য চকবাজার মসজিদের দোতলায় সময় দিতেন। সে কথা জেনে একদিন আসরের নামায ঐ মসজিদে

www.pathagar.com

পড়ার পর মাওলানার সঙ্গে আমার পয়লা সাক্ষাৎ হয়। আমি লক্ষ্য করলাম যে, সাক্ষাৎপ্রার্থী কিছু লোক তাঁর নিকট বিভিন্ন মাসাআলা জিজ্ঞেস করলেন। তিনি তাদেরকে অল্প কথায় হাসি মুখে জওয়াব দিতে থাকলেন। কেউ কেউ তাদের সমস্যা তাঁর কাছে জানিয়ে সমাধানের জন্য পরামর্শ চাইলেন। কথাবার্তা থেকে আমি অনুভব করলাম তারা সবাই মাওলানা সাহেবকে পীরের মত মহব্বত করেন। আমি এ অবস্থায় পয়লা চুপচাপ থাকলাম। আর সবাই যারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন বয়সের লোক, দাঁড়ি-টুপি ও জামা দেখে আলেমদের মতই মনে হয়। একমাত্র বালক বয়সী আমিই ছিলাম এবং আমার পরনে পাজামা ও শার্ট ছিল।

আমি এক দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকাচ্ছিলাম এবং কিভাবে তাঁর সাথে পরিচিত হওয়া যায় ভাবছিলাম। এমন কোন পরিচিত লোক ছিলনা যার মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে পরিচয় করা সহজ হয়। আমি লক্ষ্য করলাম বিভিন্ন লোকের প্রশ্নের জওয়াব দেয়ার ফাঁকে ফাঁকে বার বার আমার দিকে তাকাচ্ছিলেন। সবার প্রশ্নের জওয়াব শেষ হয়ে গেলে তিনি হাতের ইশারায় কাছে ডাকলেন। আমি কাছে গিয়ে হাত মিলালাম। তিনি স্নেহের সুরে জানতে চাইলেন আমি কে এবং কী চাই। কথা বলার সুযোগ পেয়ে আমি একটানা বেশ কিছুক্ষণ কথা বললাম।

সবাই আমার দিকে আশ্চর্য হয়ে তাকাচ্ছিলেন এবং পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছিলেন। তাঁরা আশ্চর্য হয়ে দেখছিলেন হুযুর কিভাবে আমার মত বালকের কথা শুনছেন। আমার বক্তব্যের সারকথা ছিল "আমি কুমিল্লায় এক বছর আগে থেকে 'নেয়ামত' পত্রিকা পড়ছিলাম এবং ঢাকায় এসে এর গ্রাহক হয়েছি। এ পত্রিকা আমার কাছে খুব ভালো লাগে এবং এ পত্রিকার লেখা প্রধানতঃ হযরত মাওলানা থানভীর (রহঃ) অনুবাদ।

বিজ্ঞাপন থেকে জানতে পারলাম হযরত মাওলানা থানভীর (রহঃ) বেশ কয়েকটি বই আপনি বাংলায় অনুবাদ করেছেন। হযরত থানভীর (রহঃ) লেখা ও আপনার অনুবাদে আকৃষ্ট হয়ে 'নেয়ামত' পত্রিকার সম্পাদক থেকে আপনার ঠিকানা যোগাড় করে আপনার খেদমতে হাযির হলাম। আপনার অনুবাদ করা বই কোথায় পাওয়া যায় সেখান থেকে কিনে নিয়ে পড়তে চাই এবং মাঝে মাঝে আপনার খেদমতে হাযির হওয়ার অনুমতি চাই।

আমার কথা শুনে তিনি অত্যন্ত খুশী হলেন এবং হাসিমুখে আমার পিঠে হাত বুলিয়ে যে কোন দিন চকবাজার মসজিদেই আসরের সময় হাযির হবার অনুমতি দিলেন। মসজিদের নীচে এমদাদিয়া লাইব্রেরীতে বই পাওয়া যায় বলে জানালেন।

www.pathagar.com

মাওলানার সাথে আমার সম্পর্ক নিয়মিত জারী থাকল:

মাওলানা সাহেব বড় কাটারা মাদ্রাসার শিক্ষক ছিলেন- এটাই জানতাম এবং মাঝে মাঝে চকবাজার মসজিদে এসে বসতাম। কোন সময় তাঁকে একা পাইনি। ১০-১৫-২০ জন তাঁর সামনে বসা পেতাম। তাঁরা মাওলানা সাহেবকে যেসব কথা জিজ্ঞাসা করতেন তা থেকে মাসআলা-মাসায়েল ছাড়াও নসীহতমূলক কথাবার্তা শুনে দ্বীন সম্পর্কে বেশ কিছু শিখে নিতাম। আমি তেমন কিছু জিজ্ঞাসা করতাম না। প্রশ্নোত্তর শেষ হলে অল্প কথায় তিনি আমার খোঁজ খবর নিতেন। আমি কী বই পড়ছি, আরো কোন্ বই পড়া জরুরী সে বিষয়ে পরামর্শ দিতেন।

আমার সঠিক মনে নেই সেটা কোন্ বছর ছিল। আমি চকবাজারে তাঁকে না পেয়ে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম- তিনি এখন এখানে বসেন না। বেগম বাজার মসজিদে গেলে পাওয়া যায়। আরো জানলাম- তিনি এখন বড় কাটারা মাদ্রাসায় নেই, তিনি লালবাগ শাহী মসজিদে নতুন মাদ্রাসা শুরু করেছেন।

বড় কাটারা মাদ্রাসারই একটি কামরায় 'নেয়ামত' অফিস থাকার কারণে 'নেয়ামত' অফিসে আমার যাতায়াত থাকায় পীরজী হুযুর নামে পরিচিত মাদ্রাসার মুহ্তামিম সাহেবের সাথে দেখা করার সুযোগ হয়। তাঁর সঙ্গে পরিচিত হতে গিয়ে জানতে পারলাম যে তাঁর বড় ভাই আমার আব্বার খালু। সে সুবাদে মাঝে মাঝে তাঁর কাছে যেতাম। মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ) বড় কাটারা মাদ্রাসা থেকে চলে গেছেন- এ বিষয়ে সঠিক খবর জানার জন্য পীরজী হুযুরের নিকট হাযির হলাম। আমি বেগম বাজার মসজিদে মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরীর (রহঃ) সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য গেলাম। বড় কাটারা মাদ্রাসা কেন ছেড়ে দিলেন জানতে চাইলাম। তিনি পীরজী হুযুর এর বিষয়ে কিছুই বললেন না। শুধু এটুকুই জানালেন- তিনি লালবাগে আলাদা মাদ্রাসা শুরু করেছেন। বড় কাটারা মাদ্রাসা সম্পর্কে কোন মন্তব্য করলেন না।

ছাত্র জীবনের পর:

বিভিন্ন কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে মাওলানা সাহেবের সংগে যোগাযোগ অনেক কমে যায়। ১৯৫০ সালের মার্চ মাসে এম, এ, পরীক্ষার পর পরই তাবলীগ জামাআতের সাথে তিন চিল্লায় (চার মাস) বেরিয়ে যাই। ঐ সময় তাবলীগ জামাআতের মাসিক ইজতিমা লালবাগ শাহী মসজিদে হত। ১৯৫০ সালে আমি রংপুর কারমাইকেল কলেজে অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করার ফলে যোগযোগ আবার কম হয়ে যায়। বছরে অন্ততঃ কয়েকবার তাবলীগের মাসিক ইজতেমায় শরীক হওয়ার সুযোগে তাঁর সাথে দেখা হত।

www.pathagar.com

সম্ভবতঃ '৫২ সাল থেকে শাহী মসজিদে অনুষ্ঠিত মাসিক ইজতিমায় আমাকে বক্তৃতা করতে হত। মাওলানা সাহেব আমার বক্তৃতা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন বলে পরবর্তীকালে আমি জানতে পেরেছি। ১৯৫৪ সালে আমি জামায়াতে ইসলামীতে যোগদানের পর মাওলানা সাহেবের সাথে দেখা করতে গেলে তিনি উল্লাসিত হয়ে আমার সাথে কোলাকুলি করলেন। উপস্থিত সকলের মধ্যেই একটু বিস্ময়ের ভাব লক্ষ্য করা গেল। তিনি মন্তব্য করলেন যে "তাবলীগের ইজতিমায় তাঁর বক্তৃতার ভাষা থেকে আমি স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলাম যে তাবলীগী জামায়াতের কর্মসূচী একে আটকিয়ে রাখতে পারবে না।" তিনি উপস্থিত লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলেন "কি মিয়ারা আমি এ মন্তব্য করেছিলাম না?" বেশ কয়েকজন এর জওয়াবে বলে উঠলেন যে, "হাঁ আপনি কয়েকবারই একথা বলেছিলেন।"

জামায়াতে ইসলামী ও মাওলানা ফরিদপুরী:

১৯৫৫ সালে অধ্যাপক মাওলানা হেলাল উদ্দীন জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করার পর আমাকে নিয়ে তিনি মাওলানা সাহেবের নিকট গেলেন। অধ্যাপক হেলাল উদ্দীন সাহেব মাওলানা সাহেবকে বললেন, "মাওলানা সাহেব আপনার সঙ্গে আমার পাকিস্তান আন্দোলনের সময় থেকে দীর্ঘ আন্তরিক সম্পর্ক। রাজনৈতিক চিন্তার দিক দিয়ে আপনার সাথে আমার সম্পূর্ণ মিল পেয়েছি। আর অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেবকে তাঁর স্কুল জীবন থেকেই চিনেন। তিনি জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করায় আপনি খুশী হয়েছেন বলে জানতে পেরেছি। তাই জামায়াতে ইসলামীতে যোগদানের খবর আপনার নিকট দেয়ার উদ্দেশ্যে হাযির হয়েছি।"

মাওলানা সাহেব অধ্যাপক হেলাল উদ্দীন সাহেবকে মুবারকবাদ জানিয়ে বললেন, আমি জামায়াতে ইসলামীকে অনেক আগে থেকেই জানি। ব্রিটিশ আমলেই জামায়াতে ইসলামী যখন প্রতিষ্ঠিত হয় তখন আমি মাওলানা মওদূদীর সাথে সাক্ষাতের প্রয়োজনবোধ করি। তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত 'মাসিক তরজমানুল কোরআন' গোটা হিন্দুস্তানের বড় বড় আলিমদের কাছে যেত।

'৪১ সালে জামায়াত কায়েম হবার পূর্বে ঐ পত্রিকার বেশ কিছু সংখ্যা দেখার সুযোগ আমারও হয়েছিল। পত্রিকার মাধ্যমেই তাঁকে আমি জানতাম এবং তদ্বারা ইসলামের বিরাট খেদমত হবে বলে ধারণা পোষণ করতাম। তাই তিনি জামায়াতে ইসলামী নামে পৃথক সংগঠন শুরু করায় আমি একটু বিব্রতবোধ করলাম। কারণ মুসলমানদের মধ্যে আগে বেশ ক'টি বিভিন্ন নামে জামায়াত কায়েম ছিল। তিনি আবার আর একটি জামায়াত গঠন করে বিচ্ছিন্ন মুসলিম জাতির কি খেদমত

www.pathagar.com

করতে পারবেন, এ প্রশ্ন আমার মনে জাগে। তখন মাওলানা মওদূদী পূর্ব পাঞ্জাবের পাঠানকোটে দারুল ইসলাম নামে একটি কেন্দ্র কায়েম করে কাজ করছিলেন। আমি দীর্ঘ সফর করে তাঁর কাছে পৌঁছলাম। তিনি অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে আমার সাথে দীর্ঘ সময় মত বিনিময় করলেন। সর্বশেষে তাঁর এ কথাটি আমার নিকট অত্যন্ত মূল্যবান বলে মনে হয় ঃ

"যে সমস্ত জামায়াত দেশে আছে তাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এবং ইসলাম সম্বন্ধে ঐসব সংঠনের নেতৃবৃন্দ যে সব ধারণা রাখেন তাঁরা সে অনুযায়ী কাজ করছেন। ইসলাম সম্বন্ধে যে ধারণা আপনার নিকট প্রকাশ করলাম এবং এই ইসলামকে বিজয়ী করার উদ্দেশ্যে আমি যে চিন্তাভাবনা রাখি এই কর্মসূচী অন্য কোন দলের উপর চাপিয়ে দেয়া সম্ভব নয়। তাই আল্লাহ আমাকে যতটুকু সমঝ (বুঝ) দিয়েছেন সে অনুযায়ী পৃথক জামায়াত কায়েম করা ছাড়া আমার উপায় কি ? মুসলমানদের মধ্যে বেশী দল থাকা কোন দূষণীয় ব্যাপার নয়। ইসলাম ও মুসলিম জাতির স্বার্থে যদি যার যার দৃষ্টিভংগী অনুযায়ী কাজ করতে থাকে তাহলে উম্মতের কল্যাণই হতে পারে। যদি একদল অপরদলের বিরুদ্ধে অপপ্রচার না চালায় এবং মুসলিম জাতির মধ্যে একদল আরেক দলের বিরুদ্ধে বিভ্রান্তি না ছড়ায় তাহলে বিভিন্ন দল থাকা সত্ত্বেও উম্মতের কোন ক্ষতি হওয়ার আশংকা নেই।" মাওলানা সাহেব বললেন, আমি তাঁর এ কথায় মুৎমাঈন হয়ে ফিরে আসি।

অধ্যাপক মাওলানা হেলাল উদ্দীন সাহেব তখন বললেন, "আমরা তো মাওলানার সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ পাইনি। আপনি তাঁর সম্পর্কে ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত জামায়াত সম্পর্কে অন্য কারো কাছ থেকে না জেনে পাঠানকোট পৌঁছে মাওলানা মওদূদীর কাছ থেকে জানার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। এদিক দিয়ে আপনি আমাদের চেয়ে অনেক অগ্রগামী। আপনি কি জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করার চিন্তা করেন না ? মাওলানা সাহেব বললেন "আমি মাওলানা মওদূদীকে মহব্বত করি এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত এই আন্দোলনের কামিয়াবীর জন্যে দোয়া করি।[১]

এ সত্ত্বেও আমি সরাসরি জামায়াতে ইসলামীতে না যোগদান করাকেই মুসলেহাত মনে করি। কারণ, যে ওলামায়ে দেওবন্দের সঙ্গে আমার সম্পর্ক সে মহলে মাওলানার ব্যাপারে যে ইখতিলাফ রয়েছে তা যাতে দূর করা যায়, অন্ততঃ

---

* পরবর্তীকালে হযরত ফরিদপুরী (রহঃ) মওদূদী সাহেব ও জামায়াতে ইসলামীর কর্মধারা ও কার্যক্রম দেখে নিজের অভিমত পরিবর্তন করেন এবং তার এই ভিন্নমতের কথা জনসাধারণকে অবহিত করার জন্য 'ভূল সংশোধন' গ্রন্থ রচনা করেন- সম্পাদক।

www.pathagar.com

কমানো যায় সে জন্য আমার কিছু করণীয় আছে। আমি মাওলানা মওদূদীর ব
পড়ি এবং তাঁর বিরুদ্ধে যেসব কথা আছে সেগুলোও পড়ি এবং এসব বিষয়ে ওলামায়ে কেরামের সাথে মত বিনিময়ও করি। আমি যদি জামায়াতে ইসলামীতে সরাসরি যোগদান করি তাহলে ওলামায়ে কেরামের সাথে মত বিনিময়ের এ সুযোগ থাকবে না। তখন তাদের সাথে আমার ঝগড়ায় লিপ্ত হওয়ার পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে এবং তা দ্বারা দ্বীনের কোন কল্যাণ হবে না বলে আমি মনে করি। তাই আমাকে এভাবেই থাকতে দিন। আমরা দু'জনেই তাঁর এ কথায় মুৎমাঈন হলাম এবং তাঁর কাছে দোয়া চেয়ে বিদায় নিলাম।

আমার জীবনে মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরীর (রহঃ) প্রভাব:

মাওলানা ফরিদপুরীর (রহঃ) সাথে আমার দীর্ঘ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আমার দ্বীনী জিন্দেগী গড়ায় বিরাট অবদান রেখেছে। তাই তাঁকে আমি আমার দ্বীনী মুরুব্বী হিসাবে এখনও শ্রদ্ধা করি। তাঁর যেগুণটি আমাকে সবচেয়ে বেশী আকৃষ্ট করেছে তা হলো তাঁর বিশাল উদার মন। সাধারণতঃ দেখা যায় যে যারা দ্বীনের যে খেদমতে নিয়োজিত আছেন সেটাকেই দ্বীনের প্রধান খেদমত মনে করেন এবং দ্বীনের অন্যান্য খেদমতকে মোটেই গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন না। এমনকি কিছু লোক ভিন্ন ধরনের দ্বীনের খেদমতকে তুচ্ছ মনে করেন। কিন্তু মাওলানা ফরিদপুরীকে (রহঃ) এর সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম পেয়েছি। যারা যেখানে যতটুকু দ্বীনের কাজ করছে তার প্রতি তাঁর শুভেচ্ছা আমি সবসময় অনুভব করেছি। তাবলীগ জামায়াতে থাকাকালেও তিনি আমাকে উৎসাহ পরামর্শ দিতেন। জামায়াতে ইসলামীতে আসার পর আমি আরও বেশী উৎসাহ পরামর্শ পেয়েছি।

১৯৬৯ সালে আইয়ুব খানের সামরিক শাসনামলে জামায়াতে ইসলামী ও নেযামে ইসলাম পার্টিসহ সব দল বে-আইনী থাকায় জামায়াতের পক্ষ থেকে সারা দেশে ৫ থেকে ১০ দিন সেমিনার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সকল ইসলামী মহলকে এক প্লাটফর্মে বক্তব্য পেশ করার সুযোগ দেয়া হয়। এর প্রথম সেমিনার ঢাকার সিদ্ধেশ্বরী হাই স্কুলে ১০ দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হয়।

মাওলানা ফরিদপুরী (রহঃ) প্রধান অতিথি হিসেবে যে বক্তব্য রাখেন তা ব্যাপক প্রেরণার সৃষ্টি করে। জামায়াতে ইসলামীর লোকদের উদ্যোগ ও প্রচেষ্টায় সারাদেশে সেমিনার অনুষ্ঠানের এ অভিযান পরিচালনায় আমি তাঁর কাছ থেকে সব সময় উৎসাহ পেয়েছি। তিনি বলতে গেলে চির রুগ্নই ছিলেন। এ সত্ত্বেও ঢাকার বাইরেও কয়েকটি সেমিনারে স্বয়ং যোগদান করে আমাদের হিম্মৎ বাড়িয়ে দিয়েছেন।

www.pathagar.com

সকল ধরনের ইসলামী খেদমতের আন্তরিক স্বীকৃতি দেবার যে উদারতা তাঁর কাছ থেকে আমি শেখার সৌভাগ্য লাভ করেছি এরই ফলে আমার সাত বছর নির্বাসন জীবনের পর ১৯৭৮ সালে দেশে এসেই 'ইসলামী ঐক্য ইসলামী আন্দোলন' বইটি লিখি। এ বই-এ প্রকাশিত চিন্তাধারা তাঁরই সরাসরি অবদান। তাঁর নিকট থেকে আর একটি বড় শিক্ষা আমি এই পেয়েছি যে, সকল আলেমকেই শ্রদ্ধা করতে হবে। মতপার্থক্য সবার মধ্যে থাকে কিন্তু ইলমের অধিকারী হওয়ার যে গুণ তার ফলে সকল আলেমের কাছ থেকেই ফায়দা সংগ্রহ করা সম্ভব। এ কারণেই আমি সকল আলেমকেই শ্রদ্ধা করি, তাদের সাথে ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করি এমন কি যারা মাওলানা মওদূদীকে (রহঃ) মন্দ বলেন বা জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে মন্তব্য করেন তাদের সাথেও আমি ইহতিরামের সঙ্গে মিলিত হই।

নেতৃস্থানীয় সকল উলামায়ে কিরামের মধ্যে মাওলানা ফরিদপুরীর (রহঃ) মত মনের উদারতা যদি সৃষ্টি হয় তাহলে এদেশের সকল ইসলামী শক্তির ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পথে আর কোন বাধা থাকবে না। দুর্ভাগ্যবশতঃ আজ দেশে ইসলামের বিরাট শক্তি থাকা সত্ত্বেও ইসলাম বিরোধী শক্তি জনগণের উপরে তাদের মনগড়া শাসন চালিয়ে যাচ্ছে। তাই মাওলানা ফরিদপুরীর (রহঃ) অভাব আমি তীব্রভাবে অনুভব করছি।

= ০০০ =

www.pathagar.com

এক বিস্ময়কর প্রতিভার অধিকারী
হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ)

অধ্যাপক সৈয়দ সিরাজুল ইসলাম

মহান আল্লাহ্ পাকের সর্বোৎকৃষ্ট এবং সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মাখলুক মানুষকে চির ধ্বংস ও অকল্যাণের পথ থেকে রক্ষা করে, চির কল্যাণ ও মুক্তির পথে, অনন্ত জীবনের পথে অনন্ত সীমাহীন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভের উপায় অবলম্বন হিসাবে যুগে যুগে, কালে কালে তিনি এই নশ্বর ধরাধামে প্রেরণ করেছেন নিষ্পাপ, নিষ্কলুষ পবিত্রাত্মা লক্ষাধিক আম্বিয়া (আঃ) কে। তাদের জীবনের প্রাণপণ চেষ্টা, লক্ষ্য ও তপস্যা, চিন্তা-চেতনা ও গবেষণা এটাই ছিল যে, কিভাবে আল্লাহর পথ ভোলা বান্দাকে শয়তানের মহা-ষড়যন্ত্র থেকে এবং চির ধ্বংস ও বরবাদির হাত থেকে রক্ষা করে সিরাতাল মুস্তাকিমের পথে প্রতিষ্ঠিত করা যায়। আল্লাহ্ পাকের ওই সব নির্বাচিত, মনোনিত ও মহিমান্বিত নবী-রসুলগণের পথ ধরে যাঁরা নিজেদের জীবন-যৌবন ও সর্বস্ব বিসর্জন দিয়েছেন, নিপীড়ন ও অত্যাচারকে হাসিমুখে বরণ করে নিয়েছেন তারা মহিমান্বিত ও গৌরবান্বিত। কারণ মানুষকে ওই ধ্বংস ও সর্বনাশের হাত থেকে রক্ষা করা, তাদের অন্তরাত্মাকে ঐশ্বরিক জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করা, জীবনের পথ সহজ-সুন্দর ও সুগম করে দেওয়া, বিবেক-বুদ্ধি ও মনুষ্যত্বকে জাগ্রত ও সচেতন করে তোলা, আত্মাকে সংকীর্ণতার বেড়াজাল থেকে মুক্ত করে আকাশের মত প্রশস্ত ও উদার করে গড়ে তোলা।

মোট কথা নশ্বর ও অবিনশ্বর জগতের একজন উপযুক্ত মানুষ ও বান্দা রূপে গড়ে তোলা অতিশয় শ্রেষ্ঠ ও মহৎ কর্ম-চক্ষুষ্মান লোকের কর্ম, শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানী, প্রেমিক, মহিমান্বিত ও আদর্শ মানুষের কর্ম। এঁরাই দেশ ও জাতির প্রাণ, আত্মার চিকিৎসক এবং মানুষের প্রকৃত বন্ধু। তাদের প্রেম, বন্ধুত্ব ও জ্ঞানের স্পর্শে জাতি ধন্য হয়, মানুষ তার চলার পথের সন্ধান পায়। এসব মানুষই চিরস্মরণীয়, বরণীয়, চির অমর হয়ে থাকবেন সকল যুগের, সকল কালের মানুষের মাঝে।

সুতরাং সমাজ ও জাতির দৃষ্টিতে যাঁরা চক্ষুষ্মান, জ্ঞানী, যাঁরা আল্লাহ্ প্রদত্ত জ্ঞানে বিভূষিত, যাঁরা আদর্শিক কবি-সাহিত্যিক, যারা আত্মার চিকিৎসক তাঁদের মান ও মর্যাদা সর্বোচ্চে। দেশ ও জাতির প্রতিটি মানুষের অপরিহার্য কর্তব্য তাঁদের ব্যক্তিত্বের যথাযথ কদর করা, সম্মান ও শ্রদ্ধা করা। মহামূল্যবান বস্তুর সমাদর ও সংরক্ষণের ন্যায় তাঁদের কৃতকর্মের সংরক্ষণ করা। কারণ তাঁরা শিক্ষা ও সংস্কৃতির ধারক, অবলম্বন। জগৎ ও জীবনের আবেদন তখনই উপেক্ষিত ও নিঃশেষিত হয়,

www.pathagar.com

যখন জগতে জ্ঞান ও জ্ঞানী লোকের অবমূল্যায়ন হয়, মর্যাদা বিনষ্ট হয় এবং দেশ ও জাতির কাছে উপেক্ষিত ও লাঞ্ছিত হয়।

পার্থিব জগতের মানুষ ওইসব মহৎপ্রাণ ব্যক্তি-বর্গের যথোপযুক্ত মর্যাদা দিক বা না দিক, মানব জাতির রচিত, লিখিত ইতিহাসে তাঁদের নাম থাকুক বা না থাকুক, মহান আল্লাহ পাকের দরবারে তাঁদের নাম সোনার হরফেই লেখা থাকবে। আলোচ্য প্রবন্ধটি যাঁর উদ্যেশ্যে নিবেদিত তিনিও আম্বিয়া (আঃ) ও মহামানব রসূলে খোদা (সঃ) এর পদাঙ্ক অনুসরণকারী মহৎ প্রাণ ব্যক্তি-বর্গের দলভূক্ত হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ)। আমার ন্যায় ক্ষুদ্র মানুষের পক্ষে তাঁর মত বিশাল ব্যক্তিত্বের পরিচয় তুলে ধরা সিন্ধুকে বিন্দু জ্ঞান করার মত এবং অন্ধের হস্তী দর্শনের মতই হাস্যকর ও অবাস্তব। কিন্তু তবু তাঁর পবিত্র রূহানী ফয়েজ এবং আল্লাহ পাকের অনুগ্রহ প্রাপ্তির উদ্দেশ্যেই এ প্রয়াস।

আল্লাহ ও রাসূলের (সঃ) আশেক, মুজাহিদে আযম মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ) ছিলেন পাক ভারত উপমহাদেশের একজন শীর্যস্থানীয় অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলেম, মুসলিম জাতির পথ প্রদর্শক, বলিষ্ঠ রাজনীতিবিদ, উচুস্তরের সাহিত্যিক, গবেষক, অকুতোভয় নির্ভিক মুজাহিদ, আধ্যাত্মিক জগতের একজন সার্থক পুরুষ, প্রেম ও ভালবাসার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও বিস্ময়কর প্রতিভার অধিকারী এক মহান ব্যক্তি। এই অনন্য-অসাধারণ ক্ষণজন্মা পুরুষটি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে (১৮৯৮ইং) ২রা ফাল্গুন, জুমআবার সুবহে-সাদিকের অব্যবহিত পরেই ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত গোপালগঞ্জ থানার পাটগাতি ইউনিয়নের ঘোপেরডাঙ্গা নামক এক নিভৃত পল্লী-গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। প্রজ্জ্বলিত, উদ্ভাসিত দিবাকরের ন্যায় শামছুল হক, সত্যের সূর্যের আলোকচ্ছটায় বাতিল ও মিথ্যার বিরদ্ধে শাশ্বত সুন্দরের এক মহাচ্যালেঞ্জ নিয়ে ধরাধমে আগমণ করেন।

তার জন্মের পূর্বে পুরো অষ্টাদশ শতাব্দীটাই ছিল, মুসলমানদের পতন ও ধ্বংসের যুগ, হিন্দুদের উত্থান, শান্তি-সুখ ও অষ্ট প্রহরের যুগ। এ যুগটি ছিল এক কালের বিশ্বকাঁপানো দোর্দন্ড প্রতাপশালী মুসলমানদের চিরশক্র উপনিবেশিক ইংরেজ শাসনের যুগ। উড়ে এসে জুড়ে বসা জালেম, শোষক, মিথ্যুক, বাটপার, ধোকাবাজ, ডাকাত এবং ইসলামের চির দুশমন ইংরেজ বেনিয়ারা তখন উপমহাদেশের স্বর্ণ সিংহাসনে উপবিষ্ট। বাংলা ও দিল্লীতে নব্বই হাজার মাদ্রাসা, অসংখ্য মসজিদ দু'শ এর মত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় তারা ধ্বংস করে দিয়েছিল। তারা রাজত্ব, জমিদারী, ব্যবসা, শিল্প, শিক্ষা সবই হস্তগত করে নিয়েছিল। রাজকোষের লক্ষ লক্ষ মন স্বর্ণ, রূপা ও মূল্যবান সম্পদ পাচার হচ্ছিল ইংল্যান্ডে।

www.pathagar.com

মুসলমানদের চরিত্র ধ্বংস করে দিয়ে তাদেরকে আত্মকলহে লিপ্ত করেছিল এবং সূদ প্রথা চালু করে হিন্দু উচ্চ বর্ণের বেনিয়াদের দ্বারা মুসলমানদের সর্বস্ব আত্মসাৎ করছিল। রাজ্যহারা, ধর্মহারা মুসলমানগণ শিরক্-বিদআত ও হিন্দুয়ানী রছম-রেওয়াজের অনুসরণ করে নিজেদের পরিচয় পর্যন্ত হারিয়ে বসেছিল। রবিকরোজ্জ্বল প্রতিভার অধিকারী শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ) পরিণত বয়সে সকল প্রকার অত্যাচার ও নির্যাতন, বৈষম্য ও দুর্নীতি, শোষণ, বঞ্চনা, শিরক্, বিদআত ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে চির সংগ্রামী ভূমিকা গ্রহণ করেন এবং দেশ ও জাতির জন্যে উৎসর্গ করেন জীবনের সর্বস্ব।

মাওলানা শামছুল হক এর প্রকৃত পরিচয় ঃ

তাঁর প্রকৃত পরিচয় তিনি একজন সীমাহীন আল্লাহ ভক্ত এবং রসূল (সঃ) এর আশেক ছিলেন। পিতার দেওয়া নামকরণ এর অর্থ ও তাৎপর্য তাঁর জীবনে-চরিত্র ও আচরণে পরিপূর্ণ ভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল। সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) এর হুবহু অনুকরণ ও অনুসরণে তিনি এমন জীবন যাপন করতেন, যা দেখে প্রতীয়মান হত যে, তিনি আল্লাহ ও রসূল (সঃ) এর একজন খাঁটি মুখলেছ বান্দা ও উম্মত। ভূবন বিখ্যাত আলেম থানভী (রহঃ) এর সান্নিধ্যে এসে তিনি জাগতিক, ধর্মীয়, আত্মিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ইলম অর্জনের পাশাপাশি খোদাভীতি-তাকওয়া পরহেজগারী এবং রসূল (সঃ) এর আদর্শের (সুন্নাতের) ছিলেন মূর্ত প্রতীক।

রসূল (সঃ) এর আমলা যিন্দেগীর এক জলন্ত দৃষ্টান্ত তাঁর মধ্যে বিদ্যমান ছিল বলেই তিনি দীনের জন্যে, মানুষের জন্যে, দেশ ও জাতির জন্যে জীবনের সর্বস্ব বিলিয়ে দিতে পেরেছিলেন। তাঁর খোদাভীতি, সীমাহীন ব্যক্তিত্ব, অগাধ পান্ডিত্য, বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার জন্যে তৎকালীন শাসকবর্গ উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ রাজনীতিক এমনকি প্রতিপক্ষ প্রভাবশালী দুশমনও তার সামনে মাথা উঁচু করে কথা বলার দুঃসাহস প্রদর্শন করতে পারেনি। জীবনের সকল বিভাগেই ছিল তাঁর সরব পদচারণা। তাই ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই অতি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করতেন মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরীর নাম।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও জাতীয়তাবোধ ঃ

অনুপম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন ফরিদপুরী (রহঃ)। তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট-সুমধুর ব্যবহার ও আচরণে সর্ব স্তরের মানুষই ছিল তাঁর প্রতি বিমুগ্ধ-বিমোহিত ও অনুগত। তাঁর অসাধারণ প্রজ্ঞা, প্রতিভা, দেশবাসীর প্রতি অপরিসীম মমত্ববোধ ও জাতীয়তাবোধের কারণে তিনি আত্মসুখ, আরাম-আয়েশ বর্জন করে বিনিদ্র রজনী

www.pathagar.com

অতিবাহিত করেছেন; সীমাহীন ত্যাগ-তিতিক্ষা ও কুরবানীর বিনিময়ে পার্থিব ও জৈবিক, ইহলৌকিক ও পারলৌকিক এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞানের সর্ব শাখায় মানুষের কল্যাণে বহুবিধ কল্যাণ-কর্মকান্ড আঞ্জাম দিয়েছেন। আমলী জিন্দেগীর পরিবর্তন সাধনের জন্যে স্থাপন করেছেন হাজার হাজার মাদ্রাসা, মসজিদ, আঞ্জুমান, খানকাহ ইত্যাদি দ্বীনি প্রতিষ্ঠান সমূহ। এছাড়া রাজনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষানীতির সংস্কার এবং সংস্কারমূলক কর্মকান্ডে তিনি রেখে গেছেন বিশেষ অবদান। বাংলাদেশের জাতীয় মসজিদ বায়তুল মুকাররম এর প্রতিষ্ঠা এক ঐতিহাসিক ঘটনা। তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের একোয়ারকৃত এ স্থানটি তিনি সরকারের হাতে হস্তান্তর হতে দেননি। দ্বীনদার ব্যবসায়ী মুসলমানদের সহযোগিতায় এক রাতের মধ্যেই তিনি ওই মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন এখানে।

লালবাগ মাদ্রাসার পাশে নির্মিত সিনেমা হলটি মহাড়ম্বর পূর্ণ পরিবেশে উদ্বোধন হওয়ার আগেই তিনি পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর মুনয়েম সাহেবকে বাধ্য করেছিলেন সিনেমা হলটিকে শায়েস্তা খাঁন কল্যাণ-কেন্দ্রে রূপান্তরিত করতে। এসব সামাজিক কর্মকান্ড ছিল সরকারের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ হিসেবে। মানুষের কল্যাণে এবং দ্বীনের খাতিরে তিনি এরূপ অসংখ্য সামাজিক কর্মকান্ড সম্পাদন করে বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন।

অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ ঃ

মাওলানা শামছুল হক সাহেব ছিলেন একজন বিরল ব্যতিক্রমধর্মী রাজনীতিবিদ আর এ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়েছিলেন উত্তরাধিকার সূত্রে। সত্য-ন্যায়, আদল ও ইনসাফের ঝান্ডাবাহী তাঁর পূর্বপুরুষগণ ছিলেন রাজনীতির সিংহ পুরুষ। তাঁরা ছিলেন ইসলামের জন্যে উৎসর্গকৃত প্রাণ। এক মাত্র ইসলামের জন্যে এবং ইসলামকে বিজয়ীর মসনদে আরোহন করার জন্যে সুদূর আরব থেকে ভারতবর্ষে হিজরত করেছিলেন তারা। মাওলানা শামছুল হক (রহঃ) এর রক্তের প্রতিটি কণায় কণায় ছিল জিহাদী প্রেরণা।

অন্যায় ও অসত্যের, জুলুম ও নিপীড়নের শয়তানী প্রভাব থেকে দেশ ও জাতিকে মুক্ত করে সত্য, স্বাধীনতা, ন্যায় ও শান্তির পরিবেশ প্রতিষ্ঠা করাই ছিল তাঁর মূল উদ্দেশ্য। পবিত্র কুরআনের শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মানুষের সেবা, মজলুমের সাহায্য এবং অত্যাচারী-জালেমের মূলোৎপাটন করার উন্মাদনা তিনি ছোটবেলা থেকেই অন্তরে অনুভব করে আসছিলেন।

১৯২০ সনে ব্রিটিশ বিরোধী অসহযোগ আন্দোলন এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে তিনি সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। রাজনৈতিক মঞ্চে বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ

www.pathagar.com

হিসেবে অসাধারণ প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার কারণেই শেরে বাংলা ফজলুল হক, কায়েদে আযম ও অন্যান্য রাজনীতিবিদদের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠে।

শামছুল হক (রহঃ) ছিলেন একজন বিদগ্ধ সাহিত্যিক ঃ

আবাল্যই তিনি ছিলেন একজন সাহিত্য প্রেমিক। আযাদী ও স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে বাঙ্গালী মুসলিম জাতীয় জীবনে বাংলা সাহিত্যের অপরিসীম গুরুত্ব, প্রভাব ও সীমাহীন কার্যকারিতার কথা তিনি সুগভীর প্রত্যয়ে উপলব্ধি করেছিলেন। শুধু বাংলা নয়, অন্যান্য আরও চার-পাঁচটি ভাষায় তিনি ছিলেন বিদগ্ধ পন্ডিত। তিনি বলতেন বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ থেকে আমি ভাল বাংলা জানি। কারণ আমার উস্তাদ তাদের উস্তাদ থেকে অনেক বিজ্ঞ।

আঠার ভাষায় পান্ডিত্যের অধিকারী ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেব (রহঃ) হুযুরকে উস্তাদের ন্যায় শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর সামনে কোন দিন চেয়ারে বসতে চাননি। কারণ একটাই ছিল যে, তিনি মাতৃভাষার প্রতি যথেষ্ট অনুরাগী ছিলেন। বাতিলের মোকাবিলায় ভাষাকে তিনি শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছেন। মাতৃভাষার মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহর প্রভূত কল্যাণ এবং সকল প্রকার বাতিল ও অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে কলমী জিহাদ পরিচালনার এক তীব্র বাসনা পোষণ করছিলেন । তিনি মাতৃভাষায় দু'শ এর মত কিতাব এবং হাজার হাজার প্রবন্ধ লিখেছেন। এছাড়া সাড়ে ষোল হাজার পৃষ্ঠার তাফসীর কিতাব বাংলায় রচনা করে সাহিত্যের ক্ষেত্রে ইসলামী ভাব ধারাকে আরও ঐশ্বর্যশালী করেছেন এবং রেছে গেছেন অসাধারণ পান্ডিত্যের পরিচয়।

খৃষ্টান মিশনারীদের বিরুদ্ধে গড়ে তোলেন প্রচন্ড প্রতিরোধ ঃ

ইসলামের চির শত্রু ইয়াহুদ, খৃষ্টান আফ্রিকা, মধ্য প্রাচ্য এবং ভারত বর্ষ ছাড়াও সমগ্র পৃথিবীতে তাদের প্রচারাভিযান অব্যাহত রেখেছিল এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে চালাচ্ছিল গভীর ষড়যন্ত্র। পাকিস্তান আমলে আইয়ুব শাহীর সহায়তায় খৃষ্টান পাদ্রীদের শক্তি বৃদ্ধি হলে শামছুল হক সাহেব (রহঃ) তাদের বিরুদ্ধে প্রচন্ড প্রতিরোধ গড়ে তোলেন এবং তাদেরকে দেশ ত্যাগে বাধ্য করেন। সাথে সাথে মুসলিম জাতিকে সজাগ ও হুঁশিয়ার করার জন্যে এবং শত্রুদের সব রকমের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবহিত করার জন্যে ব্যাপকভাবে ইসলামের মৌলিক শিক্ষা প্রচার ও প্রসারের ব্যবস্থা করেন।

www.pathagar.com

তাঁর বলিষ্ঠ ভূমিকা ছিল মিলন সাধনা ঃ

শামছুল হক ফরিদপুরী এর জীবনের সবচেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষা ছিল সকল খুঁটি-নাটি মতভেদ ভুলে গিয়ে এক দেহ, এক আত্মায় মিল্লাতে-মুসলিমকে ঐক্যবদ্ধ করা এবং পরস্পরের মধ্যে ভালবাসার সেতু সৃষ্টি করা। যারা পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত, হিংসা-বিদ্বেষ ও ইখতিলাফির সৃষ্টি করতেন, তাদেরকে তিনি অত্যন্ত ঘৃণা করতেন। তিনি বলতেন অন্যান্য ফরজের চেয়ে উম্মতের ইত্তেহাদকে আমি সব চেয়ে বড় ফরজ মনে করি এবং উম্মতের ইখতিলাফিকে অন্য গোনাহের চেয়ে বড় ও মারাত্মক মনে করি। এ দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি কিয়াম, লা-কিয়াম, দেওবন্দী, বেরেলবী, রায়পুরী, শর্ষিণা, ফুরফুরা, তাবলীগি, হাটহাজারী, জৈনপুরী, সুন্নী, ওহাবী, আহলে হাদীস ইত্যাদির মধ্যে পরিচালিত কোন মতভেদের বিষয়কে কোনই গুরুত্ব দিতেন না বরং সবাইকে আল্লাহর বান্দা এবং রসূল (সঃ) এর উম্মত হিসাবে একই মাতার গর্ভজাত সন্তানের মত মনে করতেন। বিভিন্ন দলের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব, মতভেদ, ইখতিলাফ বাহাছকে প্রেম, ভালবাসা ও জ্ঞান গর্ভ কথা দিয়ে স্তব্ধ ও মীমাংসা করে দিয়েছেন, হাজার হাজার ও লক্ষ লক্ষ মানুষের দ্বন্দ্ব, আক্রোশ ও বিদ্বেষকে ভালবাসায় রূপান্তরিত করে দিয়েছেন। একমাত্র প্রেম, ভালবাসা ও মায়ার বন্ধন রচনা করেই তিনি সকলের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

এ পৃথিবী এমনই এক নিষ্ঠুর পান্থশালা, এখানকার নয়নাভিরাম সুশীতল বৃক্ষছায়ায় ক্ষণকাল বিশ্রাম নেওয়ার সুযোগও পায় না কোন পথিক, কালস্রোতে দুর্বার গতিতে ছুটে চলে চিরস্থায়ী বাসস্থানের দিকে। কোন পথিক তার গমণ পথে অবিরাম, অবিশ্রান্ত চলার সময় দিক ভ্রান্ত পথিকের জন্যে এমন কিছু নির্দেশনা, সংকেত ও অমর কীর্তি রেখে যান, যা অত্যন্ত জীবনের পথে ওই দিক ভ্রান্ত পথিকের জন্যে হবে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি, মুক্তি ও পরিত্রাণের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়। এমন কিছু মহান কীর্তি রেখে গেলেন পথিক। আল্লাহ মাওলানা শামছুল হক (রহঃ)-কে জান্নাতুল ফেরদাউসের সর্বোচ্চ স্থান দান করুন। আমীন !

= ০০০ =

www.pathagar.com

উম্মতের কল্যাণ কামনায় আজন্ম ব্যাকুলতা
হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ)

এইচ. এম. হাসান মাহমুদ

যুগে যুগে আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীর বুকে বিভিন্ন যোগ্যতা ও বৈশিষ্ট্য দিয়ে মহান ব্যক্তিদের প্রেরণ করে থাকেন। যে যোগ্যতা ও বৈশিষ্টের মাধ্যমে তাঁরা প্রত্যেকেই জগৎবাসীর কাছে মহিয়ান হয়ে বেঁচে থাকেন। আল্লাহ তা'আলা এই মহান ব্যক্তিদের কাউকে জাগতিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে পরিপূর্ণ করে বিশ্ববাসীর সামনে তাঁদের মহান ব্যক্তিত্ব ফুটিয়ে তুলে থাকেন। জাগতিক ও ধর্মীয় উভয় জ্ঞানের সমন্বয় একই ব্যক্তির মাঝে পাওয়া খুবই বিরল। মুজাহিদে আযম হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ) ছিলেন এমন এক ব্যক্তি, যার মাঝে জাগতিক ও ধর্মীয় উভয় জ্ঞানের সমাবেশ ঘটেছিল পূর্ণমাত্রায়।

জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ইল্‌মের পাশাপাশি তিনি ছিলেন একজন চূড়ান্ত পর্যায়ের মুত্তাকী ও পরহেজগার ব্যক্তি। অহংকার বা গর্ব কি তা তিনি জানতেন না। খোদাভীতি, তাক্‌ওয়া ও পরহেজগারীর মূর্তপ্রতীক এই মহান ব্যক্তিত্ব আল্লাহ্‌র প্রতি পূর্ণ অনুগত এবং যাবতীয় পাপ পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত থাকতে আজীবন সাধনায় ব্রতী ছিলেন। প্রকাশ্য-গোপনে, সরবে-নিরবে, আনন্দে-বেদনায়, সুখে-দুঃখে, সুস্থতায়-সবলতায়, ভ্রমণে-বাসস্থানে মোটকথা জীবনের প্রতিটি স্তর ও ক্ষেত্রে হযরত সদর সাহেবের তাক্‌ওয়ার কোন তুলনা হয়না। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এই মহান ব্যক্তিত্বের তাক্‌ওয়া অনুকরণীয় ও অনসরণীয় হয়ে থাকবে। তাক্‌ওয়ার এই মহান গুণাবলীর প্রভাবেই শত্রুত বটেই অন্তরঙ্গ বন্ধুরা পর্যন্ত তাঁকে সমীহ করে চলত। দূর থেকে তাঁকে বাঁকা চোখে দেখুক, তাঁর সামনে দাঁড়ালে শত্রু-মিত্র সকলেরই শ্রদ্ধায়, ভক্তিতে মাথা নূয়ে আসত।

পূর্ব পাকিস্তানের শীর্ষস্থানীয় ও শ্রেষ্ঠ আলেমদের মাঝে জামেয়া কোরআনিয়া আরাবিয়া লালবাগ ঢাকার প্রতিষ্ঠাতা, আলেমে রব্বানী, শায়খুল হাদীস মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ) ছিলেন একজন বড় মুখলিছ, নিষ্ঠাবান মানুষ। সত্য ভাষণে তিনি ছিলেন অকুতোভয়ী, নির্ভীক। সত্য ঘোষণায় কারো তিরস্কার বা চোখরাঙ্গানীর পরোয়া তিনি করতেন না কখনও।

ইখলাছ ও হীতাকাঙ্খার সাথে হক কথা বলা এবং স্পষ্ট কথা বলার বিশেষ গুণটি তাঁর ছিল। সমকালীন শাসকদের সঙ্গে তাঁর ভাল সম্পর্ক ছিল। সাধারণভাবে তাঁর সঙ্গে শাসকরা সম্পর্ক বজায় রাখত। কিন্তু যখন দ্বীনের কোন মুআমালা এসে

www.pathagar.com

যত এবং শাসকদের পক্ষ থেকে আল্লাহর বিধানের কোথাও কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটতে দেখতেন, তখন সম্পূর্ণ পরিষ্কার ভাষায়, স্পষ্টবাদিতা, সাহস ও দৃঢ়তার সাথে নিজের বক্তব্য তুলে ধরতে বিন্দুমাত্রও শংকাবোধ করতেন না। এই স্পষ্টবাদিতার সূত্রে তাঁকে বিভিন্ন শাসকের পক্ষ থেকে তিরস্কার হতে হয়েছে, গালমন্দ শুনতে হয়েছে। কিন্তু যেহেতু তাঁর বেদনা ও ক্রোধ, ইখলাছ ও নিষ্ঠার সাথে প্রকাশ পেত। সেহেতু সাধারণভাবে শাসকরা এটা উপলব্ধি করতে পারত যে, তাঁর সহযোগিতা ও বিরোধিতার মধ্যে কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ অথবা নোংরা রাজনৈতিক লক্ষ্য সংযুক্ত নেই। তিনি যা কিছু বলেন, আল্লাহর ওয়াস্তেই।

মুজাহিদে আযম হযরত সদর সাহেব হুযুরের এই বিষয়টি ছিল একটি গুপ্ত ভান্ডার। এর সন্ধান ছিলনা কারো কাছে। এটা শুধু তিনিই জানতেন এবং যিনি তাঁর মুরীদ (খলীফা) বা শাগরেদ ছিলেন এই দুই পক্ষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। একবার দুইজন বিখ্যাত মুহাদ্দিস লালবাগ এসে হুযুরের কাছে তাদেরকে মুরীদ করার জন্য অনুরোধ করলেন। হুযুর তাদেরকে হযরত হাফেজ্জী হুযুরের কাছে যেতে বললেন এবং বললেন "তিনি বড় বুযুর্গ, হযরত থানভী (রহঃ)-এর বড় খলীফা।" তারা কিছুতেই অন্য কোথাও যেতে রাজি হলেন না। তারা বললেন, হুযুর! আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখেছি এবং তিনি আপনার হাতে বায়য়াতের নির্দেশ দিয়েছেন। অবশেষে হুযুর তাদেরকে শেষ রাতে বেগম বাজার মসজিদে হুযুরের হুজরায় হাজির হতে বললেন। শেষ রাতে তারা হাজির হলে প্রথমে শপথ নিলেন তার কাছে মুরীদ হয়েছে একথা জীবনে কারও নিকট বলবেন না এবং বায়য়াত করে বিদায় করলেন। কাজেই এ ব্যাপারে বেশী কিছু বলা একেবারেই অসম্ভব।

৬৫ সালের যুদ্ধের সময় তার একটি ইশতেহারে তিনি লিখেছিলেন, 'আমার সাত লক্ষ মুরীদান ও মুহিব্বীন ও দেশবাসী সমস্ত মুসলমান যেন জেহাদের প্রস্তুতি গ্রহণ করে।' একথা থেকে এবং বিভিন্ন সূত্র থেকে বুঝা যায়, তার অসংখ্য মুরীদ ও খোলাফা পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে আছেন। এজন্য আরব আ'যম যেখানেই আমরা যাই, তাঁর মুরীদান ও মুহিব্বীনদের সাক্ষাৎ মেলে। সবাই যার যার দেশে দ্বীনের জেহাদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন। বর্তমানে বাংলাদেশে সর্বত্র লক্ষ্য করলে দিনের আলোর মতো পরিদৃষ্ট হয়-কি মাদ্রাসার খেদমত, মক্তবের খেদমত, খানকার পীর-মুরীদীর খেদমত, দাওয়াত ও তাবলীগের খেদমত, জেহাদ ও রাজনীতির খেদমত, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থনীতির খেদমত, সমাজ সংস্কার ও জাতি গঠনের খেদমত, মিশনারী ও বাতিলের মোকাবিলার খেদমত, সাহিত্য ও ভাষা চর্চার খেদমত, গবেষণা ও খেদমতে খালকের খেদমত অধিকাংশ স্থানেই

www.pathagar.com

মুজাহিদে আযমের হাতে গড়া শাগরেদদের দ্বারা নেতৃত্বের খেদমত চলছে বাংলাদেশের অধিকাংশ বড় বড় মাদ্রাসার মুহতামিম ও শায়খুল হাদীস ও উস্তাদগণ তারই ছাত্র। যেমন- ঢাকার জামেয়া রহমানিয়া মাদ্রাসা, লালবাগ জামেয়া কোরআনিয়া, গওহারডাঙ্গা, কামরাঙ্গীচর মাদ্রাসা-ই নূরিয়া, ফরিদাবাদ জামেয়া এমদাদুল উলুম, পীর জঙ্গী শামছুল উলূম মাদ্রাসা, আরজাবাদ মাদ্রাসা সর্বত্রই শায়খুল হাদীস ও মোহতামিমের কাজ হুযুরের শাগরেদদের দ্বারাই পরিচালিত হচ্ছে। ঢাকার বাহিরে খুলনা, যশোর, রাজশাহী, ফরিদপুর, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, বরিশাল সর্বত্রই বড় বড় মাদ্রাসাগুলো প্রায় সবই হুযুরের শাগরেদ কর্তৃক পরিচালিত। হিন্দুস্থান, পাকিস্তান, আরব আ'যম সব জায়গায়ই হুযুরের শাগরেদদের দ্বীনের খেদমত চালাতে দেখা যায়। দাওয়াত ও তাবলীগের মুরব্বী হযরত মাওলানা আব্দুল আজিজ সাহেব, মরহুম হযরত মাওলানা আলী আকবার সাহেব, মরহুম হযরত মাওলানা আশরাফ আলী, হযরত হাফেয মাওলানা জোবায়ের দামাত বরকাতুহুম, মরহুম হযরত মাওলানা লুৎফর রহমান সাহেব, মাওলানা জমির উদ্দিন ও অন্যান্য মুরব্বীগণের খেদমতে তাবলীগের কাজে সহযোগিতা হচ্ছে। পীরের খানকাসমূহ ছহীহভাবে যেখানে যেখানে কাজ হচ্ছে প্রায় সবই হুযুরের শাগরেদগণ চালাচ্ছেন।

হযরত ক্বারী আঃ ওহাব সাহেবের নূরাণী, আলহাজ্ব আব্দুল মালেক সাহেবের নূরাণী, হযরত মাওলানা ক্বারী বেলায়েত সাহেবের নাদিয়া, নুরিয়া, মোমেনবাড়ী ক্বারী ইব্রাহিম সাহেব (রহঃ) প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতির সমস্ত কুরআনী খেদমতই হুযুরের শিষ্যগণের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। রাজনীতি ও খেদমতে খালক ও সমাজ সংস্কারের খেদমত হুযুরের সাক্ষাৎ শাগরেদদের দ্বারা চলছে। তা নেজামে ইসলাম হোক; খেলাফত আন্দোলন হোক, খেলাফত মজলিস হোক, ইসলামী ঐক্যজোট হোক, ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনই হোক, খাদেমুল ইসলামই হোক, মারকাজুল ইসলামই হোক, জামায়াতে ইসলামই হোক সব দলের নেতা প্রায় সকলেই হুযুরের নিজ হাতে গড়া নেতা কর্মীবৃন্দ।

সাহিত্যের ময়দানে জনাব মুহিউদ্দীন খানই হোক, জনাব মাওলানা আমিনুল ইসলামই হোক, মরহুম কবি গোলাম মোস্তফাই হোক, চাই ডক্টর শহিদুল্লাহ মরহুম সাহেবই হোক সকলেই হুযুরকে গর্বের সাথে মুরব্বী হিসাবে পরিচয় দিতে গৌরব বোধ করেন। মোট কথা পৃথিবীর যেখানে যতটুকু ইসলামের কাজ হচ্ছে বাংলাদেশের যত প্রকার দ্বীনি ইসলামী কাজ হচ্ছে চাই বাতিলের মোকাবেলায় হোক মুজাহিদে আযমের রূহানী শেরকত তার হাতে গড়া মানুষগুলোর মাধ্যমে সর্বত্রই সূর্যের মত উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে।

www.pathagar.com

ইদারাতুল মা'আরিফ ও মাওলানা ফরিদপুরী (রহঃ)

অধ্যক্ষ আবদুর রাজ্জাক

সাধনা জগতের অগ্নিপুরুষ এবং ইসলামী জ্ঞান ও গবেষণা রাজ্যের অনন্য দিশারী হযরত মাওলানা শামছুল হক (রহঃ) প্রয়োজন উপলব্ধি করেছিলেন ইসলামী ইলম ও প্রজ্ঞার ব্যাপক গবেষণা, কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক বিষয়াদির সর্বাত্মক প্রসার এবং বাতিল ধর্ম ও মতবাদসমূহের অসারতা তুলে ধরার উদ্দেশ্যে একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের। কিন্তু উপযুক্ত পরিবেশ তথা ক্ষুরধার লেখনীর অধিকারী মনীষীদের অভাবে যুগের পর যুগ ধরে তিনি এ স্বপ্ন শুধু লালন করেই যাচ্ছিলেন। অবশেষে ১৯৬৭ ঈসায়ী সনে উপমহাদেশের অন্যতম মনীষী, মেশকাত শরীফের বাংলা ভাষ্যকার ও বহু ইসলামী গ্রন্থের রচয়িতা এবং ইল্ম ও শিক্ষা-সংস্কার আন্দোলনের উজ্জ্বল নক্ষত্র হযরত মাওলানা নূর মুহাম্মাদ আ'যমী (রহঃ)-এর সার্বিক পরামর্শে ও তত্ত্বাবধানে তিনি 'ইদারাতুল মা'আরিফ' নামে একটি গবেষণা কেন্দ্রের পরিকল্পনা চূড়ান্ত করেন। ঐ বছর তাঁরই প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসা ফরিদাবাদ ইমদাদুল উলূমের পাশে নবনির্মিত দু'খানি গৃহে এ প্রতিষ্ঠানের কাজ সূচিত হয়। এ সময়ে এর সাধারণ সম্পাদক ছিলেন বর্তমান পটিয়া মাদ্রাসার প্রধান পরিচালক জনাব মাওলানা হারুন ইসলামাবাদী।

প্রাথমিক পর্যায়ে এই ইদারা তথা গবেষণা একাডেমীর উদ্দেশ্য ছিল ইসলামের শাশ্বত শিক্ষা— কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক গবেষণা এবং মানব জাতির নিকট ইসলামকে একমাত্র মুক্তি সনদ হিসেবে উপস্থাপিত করার উদ্দেশ্যে লেখক ও সাংবাদিক সৃষ্টি করা। এ উদ্দেশ্যের প্রেক্ষাপটে একটি দু'বছর মেয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সও বাধ্যতামূলকভাবে চালু করা হয়। এর পয়লা বছর যেহেতু এ দেশের মাদ্রাসা শিক্ষিত লোকেরা জাগতিক বহু বিষয়ে অজ্ঞ থেকে যান সেহেতু রাজনীতি, অর্থনীতি, ইংরেজী, ভূগোল, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতির মৌলিক জ্ঞানের সাথে 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্য' এবং সাংবাদিকতার মৌলিক বিষয় শিক্ষা দেয়া হত এবং পরবর্তী বছরে উপযুক্ত গবেষণা-নির্দেশকের অধীনে নির্দিষ্ট বিষয়ে গবেষণা; পুস্তিকা রচনার ব্যবস্থা অবলম্বন করা হত।

এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম সভাপতি ছিলেন হযরত মাওলানা শামছুল হক (রহঃ) স্বয়ং। তাঁর ইন্তেকালের পর দ্বিতীয় সভাপতি ছিলেন বাংলার অন্যতম দেশবরেণ্য আলেম ও ইসলামী চিন্তাবিদ হযরত মাওলানা ইউনুস সাহেব (রহঃ)। পটিয়া জামেয়া ইসলামিয়ার ন্যায় একটি বিরাট ও বহুমুখী ইসলামী প্রতিষ্ঠানের সার্বিক

www.pathagar.com

পরিচালনার মহান দায়িত্ব পালন করার সাথে সাথে 'ইদারাতুল মা'আরিফের' পরিচালনায় অনেক সময়ে সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাল ধরে ঢাকায় অবস্থান করতে তিনি বিন্দুমাত্রও কার্পণ্য করেননি।

ইদারাতুল মা'আরিফের সর্বাত্মক অনুসন্ধান ও গবেষণা কার্যে যিনি আমৃত্যু প্রতিটি মুহূর্ত ব্যয় করতেন, যিনি সার্বক্ষণিক দিক-নির্দেশনা দিয়ে এর উন্নতি ও সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করেছেন তিনি ছিলেন হযরত মাওলানা নূর মুহাম্মদ আ'যমী (রহঃ)। আর তাঁর ঘনিষ্ট সহযোগী হিসেবে গবেষণা; অধ্যাপক পদে নিয়োজিত ছিলাম আমি অধম আবদুর রাজ্জাক। এই প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ব্যয় বহন করতেন ইসলাম দরদী বিখ্যাত দানবীর হাজী জামিল আহমাদ সাহেব।

স্বাধীনতা যুদ্ধের পর এই প্রতিষ্ঠানটি চরম আর্থিক দুর্দশার সম্মুখীন হয়। ইতিমধ্যে হযরত মাওলানা নূর মুহাম্মাদ আ'যমী (রহঃ) এর ইন্তেকাল হয়। এই সময়ে এর সেক্রেটারী নিযুক্ত হন বাংলাদেশের প্রখ্যাত আলেম যশস্বী চিন্তাবিদ মাসিক মদীনার সম্পাদক হযরত মাওলানা মুহীউদ্দীন খান এবং ডাইরেক্টর পদে নিয়োগ করা হয় এই অধমকে।

পরিশেষে চরম অর্থসংকটে উপনীত হয়ে প্রতিষ্ঠানটি ১৯৭৬ সালের শেষের দিকে বন্ধ হয়ে যায়। এই প্রতিষ্ঠানে শত শত গ্রন্থ অধ্যয়ন করে এবং লেখা ও গবেষণা প্রশিক্ষণের পর যাঁরা উত্তীর্ণ হয়েছেন তাঁদের লিখিত পুস্তক-পুস্তিকার মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হল ঃ

(১) ইসলাম ও কমিউনিজম, (২) ইসলাম ও পুঁজিবাদ,
(৩) খ্রীষ্টান ধর্মের ঐতিহাসিক সমীক্ষা, (৪) কাদিয়ানী মাযহাবের পটভূমি,
(৫) ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

অনূদিত পুস্তকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঃ

(১) খুলাফায়ে রাশেদীন, (২) মুহাজিরীন (নাদওয়া)

আর যে সব পুস্তক বা পুস্তিকা এই প্রতিষ্ঠানের অর্থে বা সহযোগিতায় প্রকাশিত হয়েছিল তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঃ

(১) ইসলামের অর্থনৈতিক সংস্কার, (২) ইসলামী অর্থব্যবস্থার মূলনীতি,
(৩) রাশিয়ার করাল গ্রাসে তুর্কিস্তান,
(৪) ইসলামী নিযামে মাঈশাত কে চাঁন্দ উসূল (উর্দূ)

www.pathagar.com

ইদারাতুল মা'আরিফের বৈশিষ্ট্য ঃ

(১) নীতিবান ও নির্ভীক লেখক-সাংবাদিক সৃষ্টি করা,

(২) এমন উপযুক্ত গবেষক তৈরী করা যারা এক দিকে ইসলামের কালজয়ী সৌন্দর্য্যকে তুলে ধরতে সক্ষম এবং অন্য দিকে বাতিলের অসারতাও প্রমাণ করতে সক্ষম হবে।

(৩) শিক্ষার্থী, লেখক ও গবেষকদের আবাসিক ব্যবস্থা করা এবং তাঁদের পর্যাপ্ত ভাতার ব্যবস্থা করা।

(৪) শিক্ষার্থী-প্রশিক্ষণার্থীদের সার্বিক তত্ত্বাবধানে রাখা, সার্বক্ষণিক দিক নির্দেশনা দেয়া এবং উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা।

(৫) শিক্ষার্থী, গবেষক ও গবেষণা নির্দেশকদের জন্য একটি সমৃদ্ধ পাঠাগারের ব্যবস্থা করা।

(৬) শিক্ষার্থী ও প্রশিক্ষণার্থীদের লেখা ও গবেষণা; নিবন্ধ পত্র-পত্রিকায় এবং পুস্তক-পুস্তিকা আকারে প্রকাশের ব্যবস্থা করা।

(৭) শিক্ষার্থীদের ন্যূনতম এস.এস.সি. এবং দাওরায়ে হাদীস উত্তীর্ণ হতে হত এবং শিক্ষক ও প্রশিক্ষণদাতাদের সাধারণতঃ প্রখ্যাত সাহিত্যিক এবং কলেজ পর্যায়ের প্রভাষক হতে হত।

এক দিকে জ্ঞানের অভাব পূরণ এবং আধুনিক আঙ্গিকে জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য প্রথম বছরে শিক্ষার্থীদের পাঠ করতে হত নিম্ন বিষয়ের প্রয়োজনীয় কিতাব ঃ

(১) ইসলামী আইনশাস্ত্র, (২) ইসলামী/মুসলিম ইতিহাস,
(৩) সাধারণ বিজ্ঞান, (৪) ইসলামী সিয়াসিয়াত (রাজনীতি),
(৫) ইসলামী একতেসাদিয়াত (অর্থনীতি),

আর অন্য দিকে নিয়মিত রুটিন মোতাবেক শিক্ষক/প্রভাষকের নিকট নিম্ন লিখিত বিষয়ে ক্লাস করতে হত ঃ

(১) বাংলা সাহিত্য, (২) ইংরেজী,
(৩) রাষ্ট্রনীতি ও ইসলাম, (৪) বিশ্বের বিভিন্ন ধর্ম, মতবাদ এবং ইসলাম,
(৫) রচনা, প্রবন্ধ ও কবিতা লেখার অনুশীলন,
(৬) সাংবাদিকতাঃ তত্ত্ব ও প্রয়োগ,
(৭) বক্তৃতা প্রশিক্ষণ ও ভূগোল এবং বিশ্ব ও বাংলাদেশের সাধারণ জ্ঞান।

=== ০০০ ===

www.pathagar.com

মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ)
ও
খাদেমুল ইসলাম জামায়াত

মাওলানা ফজলুর রহমান (রহঃ)

আল্লাহ তা'আলার লাখ লাখ শোকর, বর্তমান দুর্যোগপূর্ণ সময়ে, ফেতনার যামানায় আল্লাহর দ্বীন, নবীর তরীকাকে বাংলাদেশ তথা বিশ্ব মুসলিমের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করিয়া রাখার জন্য যে সকল মহামনীষী জীবন দিয়া ইসলামের খেদমত করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে মহান চিন্তা নায়ক, মুসলিম রেনেসাঁ আন্দোলনের অগ্রদূত, কুতবুল আলম হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ) এর খেদমত বিংশ শতাব্দীতে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করিয়াছে।

তাঁহার বিভিন্নমুখী সমাজ সেবামূলক কাজের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ খেদমত তাঁহার নিজহাতে প্রতিষ্ঠিত দেশ বিখ্যাত ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র 'দারুল উলূম খাদেমুল ইসলাম মাদ্রাসা গওহার ডাঙ্গা, জামেয়া কোরআনিয়া আরাবিয়া (লালবাগ মাদ্রাসা) লালবাগ, আশরাফুল উলূম মাদ্রাসা বড়কাটরা, মাদ্রাসা এমদাদুল উলূম, ফরিদাবাদ, ইত্যাদি বিখ্যাত মাদ্রাসা ছাড়াও অসংখ্য শাখা মাদ্রাসা, মক্তব, মসজিদ, আঞ্জুমান, সমিতি, জামায়াত, সেবামূলক ইসলামী প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়া গিয়াছেন।

ইসলামের প্রাণঘাতী শত্রুদের মোকাবেলায় দ্বীনী আদর্শকে টিকাইয়া রাখিবার জন্য তিনি দিয়া গিয়াছেন অমূল্য সম্পদ– তাঁহার লিখিত বিভিন্ন সমস্যার সমাধানপূর্ণ শতাধিক পুস্তকের ভাণ্ডার। নৈতিক চরিত্র গঠন হইতে আরম্ভ করিয়া জাতি গঠনের তথা জনসাধারণকে আদর্শ নাগরিক হিসাবে গড়িয়া তুলিবার জন্য **"খাদেমুল ইসলাম জামায়াত"** নাম দিয়া দলীয় রাজনীতির ঊর্ধ্বে সমাজ সংস্কারমূলক সংস্থা গঠন করিয়া এবং উহার কর্মসূচী সামনে দিয়া এক উজ্জ্বল আদর্শ কওমের হাতে রাখিয়া গিয়াছেন। যে জামায়াত বিগত ১৯৪০ সাল হইতে সমাজের তথা মুসলিম কওমের বিভিন্নমুখী সেবার কাজ করিয়া যাইতেছে।

হযরত মাওলানা শামছুল হক সাহেব যদিও আজ সশরীরে আমাদের মধ্যে নাই, কিন্তু তাঁহার কার্যাবলী অবিরাম গতিতে সামনে আগাইয়া চলিতেছে। তৎকালীন পাক-সরকারের কোপানলে পড়িয়াও তিনি নির্ভীকচিত্তে হকের আওয়াজ বুলন্দ করিতে কোনরূপ কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। তাঁহার কলমের বহ্নিশিখা জনসাধারণের প্রাণে আনিয়া দিয়াছে জাতীয় গৌরববোধ ও আত্মচেতনাবোধ।

www.pathagar.com

তিনি সুদীর্ঘ ৪৫ বৎসর ঢাকায় জিন্দেগী কাটাইয়া গিয়াছেন কিন্তু নিজের জন্য কোন বাসস্থানের এবং রোজগারের জন্য কোন উপায়-ব্যবস্থা করিয়া যান নাই। যাহা করিয়াছেন সবই নিঃস্বার্থভাবে দেশ ও জাতির জন্যই করিয়াছেন। তিনি নিজের জীবনকে তিলে তিলে ক্ষয় করিয়াছেন, কওমের ভালাই ও কামিয়াবীর জন্য। শতাধিক পুস্তক লিখিয়াছেন কিন্তু কোনরূপ অর্থ গ্রহণ করেন নাই, মালিকানা স্বত্বও রাখেন নাই। এই খেদমতের কাজ সমাজে জারী রাখিবার জন্য সঙ্গতিপূর্ণ জনসাধারণের নিকট এক আবেগময় বাণী লিখিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন-

"সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর দরবার হইতে আনিয়া যে কুরআন ও যে সুন্নাহ (আদর্শ) এক কথায় যে ইসলাম উম্মতের নিকট আমানত ও গচ্ছিত রাখিয়া গিয়াছেন উহাই নাজাতের ও মানব মুক্তির একমাত্র পথ। তাহা ছাড়া অন্য কোন পথ নাই।

সমস্ত আউলিয়া ও ওলামাগণ, ইমাম ও খলীফাগণ অপরিবর্তিত অবস্থায় তাঁহারই খাদেম। তাঁহাদেরই অনুগমণে রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর একজন অতি আদনা চাকর, রসুলুল্লাহর প্রদত্ত সেই আমানতের মধ্যে বিন্দু-বিসর্গ পরিবর্তন বা পরিবর্ধনকারী আমি নই। রসুলুল্লাহর গোনাহ্‌গার উম্মতকে বিন্দুমাত্র ঘৃণা বা তুচ্ছকারী আমি নই। বরং সবাইকে রসুলুল্লাহর পরম কারুণিক কোলে তুলিয়া দিবার জন্যই আমি একজন নগণ্য খাদেম এবং এই খেদমতকেই আমি নাজাতের সবচেয়ে বড় উছিলা মনে করি।

আমার দিলের আরজু এবং আল্লাহর দরবারে সকাতরে কাকুতি মিনতি, আরাধনা ও দোয়া এই যে, প্রত্যেকটি মুসলমানই যেন বিশেষতঃ এই আঞ্জুমানের (জামায়াতের) যাহারা মেম্বর হইবেন তাহারা যেন এই খেদমতের জন্য জানের ও জীবনের একাংশ এবং মালের ও সম্পত্তির একাংশ নিষ্ঠা সহকারে খালেছ নিয়তে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অবশ্য অবশ্য খরচ করেন"।

তিনি প্রায়ই বলিতেন, "আমি যেহেতু ইংরেজী শিক্ষিত হইয়া স্বর্ণ পদক লাভ করিয়া পরে কোরআন ও হাদীসের উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়াছি এই জন্য সাধারণ শিক্ষার ত্রুটি আমি রন্ধ্রে রন্ধ্রে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি, আমি ইসলামের একজন নগণ্য খাদেম। সেই সূত্রে যে কেউ ইসলামের দাবীদার, চাই সে হেড-অব দি ষ্টেট হউক, চাই সে একজন দিন মজুর হউক, যেহেতু আমি আমার জীবনকে ক্ষয় করিয়াছি ইসলামকে বুঝিবার এবং আয়ত্ব করিবার জন্য তদুপরি চতুর্দিকে ছড়াইয়া আছে ইসলামের শত্রু দল এবং যেহেতু দুইশত বৎসর পরাধীনতার ফলে এবং স্বাধীনতা লাভের পরেও ইসলামী শিক্ষা জারী না করার ফলে ইসলামের সুশিক্ষা; শিক্ষিত ভাইদের মধ্যে নাই, সেই জন্য ইসলামের শত্রু হইতে রক্ষা করিবার এবং

www.pathagar.com

ইসলামের সত্যশিক্ষা সর্ব সমক্ষে পেশ করিবার জন্য আর্থিক খেদমত দ্বিতী নম্বরে, আধ্যাত্মিক খেদমত প্রথম নম্বরে এই সত্য প্রচারের ও প্রতিষ্ঠার জন্য বাং হইয়াছি।

আমার প্রাণের একান্ত বাসনা এই যে, বাংলার মুসলিম সমাজ বিশেষত সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত ও প্রতিভাবান ব্যক্তিবর্গ পরাধীনতার হীনমন্যতা ও হেয়তাবোধ দূর করিয়া ইসলামের শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া আত্মচেতনাবোধ ও জাতীয় গৌরববোধ সম্পন্ন হউক। তাহাদের জন্য আমার বড় মায়া লাগে, প্রাণ পোড়ে, তাহারা কোরআন হাদীসের শিক্ষার বাস্তব আলো পায় নাই. তাহাদিগকে বঞ্চিত করা হইয়াছে, এইজন্য তাহাদের মস্তিষ্কের সৃজনী শক্তি নিষ্ক্রিয় রহিতেছে। আল্লাহর মারেফাতের নূরে হৃদয়পদ্ম বিকশিত হইতেছে না। ধর্মহীন কর্মশিক্ষা ও কর্মহীন ধর্মশিক্ষার দ্বারা জাতিকে পঙ্গু করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই অভাব মোচনের জন্য কোরআন হাদীসের জ্ঞান সমুদ্র মন্থন করিয়া উহার গভীরতম তলদেশ পর্যন্ত পৌঁছিয়া মণিমুক্তা কুড়াইয়া সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া গেলাম। তোমরা ইহা মানুষের গলার হার বানাইয়া পরাইয়া দিও। দিশাহারা মানুষের পরম উপকার হইবে।”

বাস্তবিকই তাঁহার লেখা যে কোন পুস্তক পাঠ করিলেই চিন্তাশীল লোকের চিন্তা জগতে নতুন প্রবাহের সৃষ্টি করে। মনের সুপ্ত কোণে আঘাত দিয়া চেতনা ও দায়িত্ব জ্ঞান সৃষ্টি করে। ইহা তাঁহার কারামতও বটে।

শিক্ষা ব্যবস্থা সংস্কারে বাস্তব পদক্ষেপের জন্য পাকিস্তান অর্জনের সাথে সাথেই তিনি সরকারকে এবং সমাজকে সদা সর্বদা সতর্ক করিয়াছেন, পরামর্শ দিয়াছেন। আদর্শ চরিত্রবান ধর্মপরায়ণ আমলা-অফিসার সৃষ্টি ব্যতিরেকে ইসলামী রাষ্ট্র চলিতে পারে না, টিকিয়াও থাকিতে পারে না। সুতরাং শিক্ষার সর্বস্তরে ধর্ম শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার জন্য তৎকালীন পাক সরকারের উপর তিনি চাপ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। শিক্ষার একটি পরিকল্পনা এবং পাঠ্যসূচীও তৈয়ার করিয়া সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু সরকার হযরত মাওলানা শামছুল হক সাহেবকে বরদাশত করিতে পারেন নাই।

তিনি তৎকালীন সরকারের শরীয়ত বিরোধী পারিবারিক আইন পাশ করার পর ও ইসলামী শাসনের প্রতিশ্রুতিতে প্রাপ্ত পাকিস্তানে আধুনিকতা ও প্রগতির নামে চরিত্র বিধ্বংসী সহশিক্ষা, বেপর্দা, অশ্লীল নাচ-গান, উলঙ্গপনা, ব্যভিচার ইত্যাদির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াইয়াছিলেন। দুর্বার আন্দোলন ও বলিষ্ঠ প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। সতর্কবাণী নামক একটি পুস্তক লিখিয়া সকলকে হুঁশিয়ার করিয়াছিলেন যে, এই সকল গর্হিত কাজ বন্ধ না করিলে ভবিষ্যত বংশধররা অমানুষ হইবে। কুলের

www.pathagar.com

কুলাঙ্গার হইবে। জাতি ধ্বংস হইবে। দেশ ধ্বংস হইবে। কিন্তু সরকারের চৈতন্য উদয় হইল না। বই বাজেয়াপ্ত করা হইল।

সরকার ঘেযা স্বার্থান্বেষী তথাকথিত নেতৃস্থানীয় আলেমদের সমর্থনে স্থায়ীভাবে সরকারের গদী রক্ষার গোপন উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ১৯৬৫ সালে ঢাকায় প্রেসিডেন্ট হাউজে বিশেষ এক অনুষ্ঠানে জেনারেল আইয়ুব খান তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানের বিশিষ্ট আলেমদেরকে নিজের পক্ষে সমর্থন আদায়ের জন্য ডাকাইয়াছিলেন। সেই দিন হযরত মাওলানা শামছুল হক সাহেব সম্পূর্ণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও সাথীদের জবরদস্তিতে উক্ত বৈঠকে কি হয় তা দেখার জন্য প্রেসিডেন্ট হাউজে উপস্থিত হইলেন। জেনারেল আইয়ুবকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, বৃটিশ দু'শ বছরে ইসলামের যে ক্ষতিসাধন করিয়াছে আপনি তারচেয়ে বেশী ক্ষতি করিয়াছেন। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হইয়া শরীয়ত বিরোধী কুখ্যাত পারিবারিক আইন পাশ করাইয়াছেন এবং প্রগতির নামে ধর্মশিক্ষাকে ঐচ্ছিক বিষয় করিয়াছেন আর সহশিক্ষা ও উলঙ্গ নাচ গান, মদ-জুয়া আমদানী করিয়াছেন। অতএব উহা আপনি বাতিল ঘোষণা করুন। অন্যথায় আপনার প্রেসিডেন্ট থাকার কোন যৌক্তিকতা থাকিবে না।"

জেনারেল আইয়ুব রাগে ক্ষোভে অগ্নিশর্মা হইয়া বলিলেন, "আমি উহা বাতিল করিতে পারিব না। যাহা করিবার কেবিনেট করিবে।" মাওলানা সাহেব বলিলেন, "যদি উহা আপনি বাতিল ঘোষণা না করেন, তাহা হইলে আমি আর আপনার সঙ্গে কথা বলিতে চাই না। আপনি আমাকে একা মনে করিবেন না। চাটুকারিতা করিয়া স্বার্থ আদায় করিতে আমি আসি নাই। পাকিস্তানের ১২ কোটি ধর্মপ্রাণ মুসলমানের প্রাণের দাবি জানাইলাম। ইতিহাস সাক্ষী আছে, প্রবঞ্চনা করিয়া কোন জালেম সরকার টিকিয়া থাকিতে পারে না। তার ধ্বংস অনিবার্য।" এই বলিয়া তিনি চলিয়া আসিলেন। এই কারণে মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ)-কে পাক সরকার শত্রু বলিয়া চিহ্নিত করিল।

১৯৬৬ সালের শেষ ভাগে সৌদি আরবের বাদশাহ ফয়সাল দাওয়াত করিয়াছিলেন মাওলানা শামছুল হক সাহেব (রহঃ)-কে মক্কা শরীফে বিশ্ব মুসলিম ঐক্যজোটের কন্‌ফারেন্সে পরামর্শ দিতে যাওয়ার জন্য। যাতায়াতের টিকেটও পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। যাওয়ার প্রস্তুতিও নেওয়া হইল, কি ভাষণ দিবেন তাহাও স্থির হইল কিন্তু তৎকালীন সরকার উক্ত কন্‌ফারেন্সে যাইবার অনুমতি দিলেন না। তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াও পাসপোর্ট পাইলেন না। ইসলামী রাষ্ট্রে অনৈসলামী-কুফরী কাজের গোমর ফাঁক হইয়া যাইবে এই ভয়েই তাঁহাকে যাইতে দেওয়া হয় নাই।

www.pathagar.com

সরকারের দ্বারা দেশে ইসলামী শাসন কায়েম ও ইসলামী শিক্ষা জারী করার চেষ্টায় ব্যর্থ হইয়া অবশেষে জাতির নিকট আবাসিক কিন্ডার গার্টেন, ইসলামিয়া হাই স্কুল স্থাপন করার পরামর্শ দিলেন। কারণ যে সকল মুসলিম যুবক ভবিষ্যতের আশা আকাঙ্ক্ষার ফল, ক্রিম অব দ্য ন্যাশন অর্থাৎ মস্তিষ্ক সম্পন্ন প্রতিভাবান, সাহসী, এরা মাদ্রাসায় খুব কমই আসে। অতএব জাতির এই অভাব মোচনের জন্য এই স্কুলের মাধ্যমে যাহাতে সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত দেশপ্রেমিক রাষ্ট্র পরিচালক সৃষ্টি করা যাইতে পারে এই জন্য সরকারের নিকট জমি বরাদ্দের আবেদন করিয়াছিলেন। পরিকল্পনা দিয়াছিলেন। কিন্তু জীনে ধরা রোগীর ন্যায় বিদেশী পরামর্শে পরিচালিত পাক সরকার এই আবেদন মঞ্জুর করেন নাই।

পাক সরকার পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী দেশে সর্বস্তরে ইসলামী শিক্ষা ও ইসলামী শাসন জারী করিবেন এবং জনগণের ন্যায্য অধিকার প্রদান করিবেন এই আশায় বিশ বৎসর পর্যন্ত অপেক্ষা করায় এবং পরনির্ভরতায় জাতির চরিত্রে যে কলঙ্ক দেখা দিয়েছিল তাহাতে তিনি অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া পড়েন।

মার্শাল-ল'র সময় যখন সরকারের বিরুদ্ধে কাহারও কোন কথা বলার অধিকার ছিলনা, তখন সরকারের আশা বাদ দিয়া বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে জাগ্রত মস্তিষ্কের বেশ কিছু সংখ্যক গ্রাজুয়েট সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এই গ্রাজুয়েটদের ট্রেনিং দিয়া তিন বৎসরের সংক্ষিপ্ত কোর্সের মাধ্যমে আরবী ভাষায় কোরআন হাদীসের শিক্ষা দিয়া তাহাদের দ্বারা ভবিষ্যতে ইসলামী চিন্তাধারায় জাতি গঠন ও পরিচালনার স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন। যেখানে সর্ব স্বার্থ জলাঞ্জলি দেওয়া জীবন, কোন প্রকার ভোগ বিলাস নাই, আছে শুধু চরম কৃচ্ছ্রসাধন ও মোজাহাদা, স্থূল দৃষ্টিতে যেখানে কোন ভবিষ্যত নাই, সেখানে শুধু দূরদর্শী অন্তরদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিগণই রহিলেন।

আফসোস বাংলার হতভাগ্য কপাল, এই মহান কার্য বাস্তবে রূপায়িত হওয়ার সূচনা লগ্নেই একদিকে দেশে চরম জুলুম-বিশৃঙ্খলা আরম্ভ হইল অপরদিকে এই মহামনীষীর হায়াত শেষ হইয়া গেল। তাই তাঁহার বাসনা বাস্তবে রূপায়িত হইতে দেখিয়া যাইতে পারিলেন না।

ঢাকা হইতে অসুস্থ হইয়া শেষ বিদায় নেওয়ার প্রাক্কালে তাঁহার হাতের লেখা তের হাজার পৃষ্ঠাব্যাপী কোরআন পাকের বাংলায় তাফসীর ও ব্যাখ্যাসহ অন্যান্য পাণ্ডুলিপিগুলি আমাদের হাতে দিয়া বলিলেন, "সামনে ভীষণ ফেৎনার যামানা আসিতেছে, দ্বীন ঈমান বাঁচান কঠিন হইবে। আমার লেখা কিতাবগুলির প্রচার জারী রাখিও। সকল সমস্যার সমাধান দিয়া গেলাম।

www.pathagar.com

এই কওমের মঙ্গলের জন্য চেষ্টার ত্রুটি করি নাই। আমার ঈমানী গায়রতের কারণে সরকারের কোপানলে পড়িয়া কাজে বহু বাধা প্রাপ্ত হইয়াছি। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বাংলার মানুষ প্রকৃত মানুষের যোগ্যতার ও প্রতিভার কদর করিতে জানে না। আমি যদি ইউ.পি, বা সি.পিতে (ইন্ডিয়া) জন্মগ্রহণ করিতাম এবং আমার এই খেদমত তাহারা পাইত তাহা হইলে সেখানকার মুসলমানরা আমার জাগ্রত মস্তিষ্কের কদর করিত। আগামীতে আদর্শ ব্যক্তি কেন্দ্রিক কোন শক্তি পাইবে না। ইসলামী হুকুমাত ইহাদের দ্বারা কায়েম হওয়ার আশা নাই। এখন ব্যক্তি গঠন ও সমাজ সংশোধনের কাজই তোমাদের প্রধান দায়িত্ব। আমার অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি যেন মিটিয়া না যায়, তোমাদের কলমে নকল করিয়া রাখিও। আমি যাহা কোরআন হাদীসের ব্যাখ্যা লিখিয়াছি, উহার রদবদল করিও না, উহার একটা কথাও আল্লাহ পাকের ইশারা না পাইয়া লিখি নাই। কোন কথা ছুটিয়া গেলে জীবন ভর চেষ্টা করিয়াও আর পাইবা না। মানুষের মধ্যে চেতনা আসার মানব কল্যাণ কামনায় নিঃস্বার্থ এই একটি পথই এখন প্রশস্ত রহিয়াছে। অন্য সব পথে স্বার্থ জড়িত থাকায় সুষ্ঠুভাবে কাজ হইতেছে না।"

১৯৬৯ সনের ২১শে জানুয়ারী মঙ্গলবার সদর সাহেব হুযুরের কর্মময় জীবন শেষ হয় এবং দুপুরের সময় হুযুর দুনিয়া হইতে বিদায় নেন। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন। অতঃপর চতুর্দিক হইতে এই দেশের উপর দুর্যোগ নামিয়া আসে। বাতেলের মুকাবেলায় সংগ্রামী চেতনা নিয়া তখন কোন ইসলামী সংস্থার পক্ষে কাজ করা সম্ভব ছিল না। আল-হামদু লিল্লাহ, খাদেমুল ইসলাম জামায়াতের কর্মসূচী মোতাবেক ইহার কাজ অবিরাম গতিতে তখনও চলিয়াছে, এখনও চলিতেছে। এখানে খাদেমুল ইসলাম জামায়াতের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ পেশ করা হইল।

১ ঃ জামায়াতের পরিচয়

খাদেমুল ইসলাম জামায়াত একটি সমাজ গঠন ও ব্যক্তি সংশোধনমূলক আত্মচেতনা ও আত্মমর্যাদা বোধ সৃষ্টিকারী দলীয় রাজনীতির ঊর্ধ্বে সেবামূলক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। ইহা হযরত মাওলানা শামছুল হক সাহেব (রহঃ) কর্তৃক ১৯৪০ সালে প্রতিষ্ঠিত।

২ ঃ আদর্শ

এই জামায়াত চলিবে আল্লাহর কোরআনের এবং রসূলের হাদীসের সর্ববাদী সম্মত ব্যাখ্যা অনুসারে। কোন এখতেলাফি মাসয়ালা বা ইসলামের কোন নূতন ব্যাখ্যা, নূতন এডিশন এই জামায়াতে স্থান পাইবে না।

www.pathagar.com

৩ ঃ উদ্দেশ্য

এই জামায়াতের বিশেষ উদ্দেশ্য হইল- (ক) বিজাতীয়, বিধর্মীয়, দীর্ঘকালের পরাধীনতার ফলে সমাজে যে সব ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ, সভ্যতা, কৃষ্টি ও মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে তাহার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া খাঁটি ইসলামী সভ্যতা, খাঁটি ইসলাম ধর্মকে পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।

(খ) খৃষ্টানী গোলামী যুগের হেয়তা বোধকে ইসলামী জাতীয় গৌরব বোধে পরিবর্তিত করিতে হইবে।

(গ) খৃষ্টানী অসভ্যতার পরিবর্তে ইসলামী সভ্যতার স্থান ও মান উচ্চ হইতে উচ্চতম তাহা প্রতিষ্ঠিত ও প্রমাণিত করিতে হইবে।

(ঘ) গোলামী যুগের লা'নত সমূহকে যেমন বিদেশী ভাষা, বিদেশী পরিভাষার পরিবর্তে নিজেদের জাতীয় ও ধর্মীয় ভাষাকে প্রবর্তন করিতে হইবে।

(ঙ) পৃথিবীর যে কোন স্থানে মুসলমান আছে তাহাদের সহিত সহযোগিতা, তাহাদের প্রতি সহানুভূতি, সমবেদনা, তাহাদের সহিত বলিষ্ঠ যোগাযোগ করিতে হইবে।

৪ ঃ শর্ত

১। কলেমা, ২। নামায, ৩। রোযা, ৪। হজ্ব, ৫। যাকাত, ৬। জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ, ৭। আমর বিল মা'রূফ বা সৎ কাজের আদেশ দান, ৮। নেহী আনিল মুনকার বা বদকাজে প্রতিরোধ, ৯। জামায়াত বন্দী জিন্দেগী, ১০। এতায়াতে উলিল আমর, ১১। টাকার ও পদের খাহেশ না থাকা, ১২। জেলের, গুলির ভয় না থাকা, ১৩। আমানতের খেয়ানত না করা, ১৪। মিথ্যা-ধোকা আচরণ না করা, ১৫। যাবতীয় হারাম, ফাসেকী কাজ এবং সুন্নতের বরখেলাফ কাজ হইতে পরহেজ করিতে যথা সাধ্য চেষ্টা করা। যে কোন মুসলমান ইহার মেম্বর হইতে পারিবেন। ইংরেজী শিক্ষিত, আরবী শিক্ষিত, আহলে হাদীস, হানাফী, শাফেয়ী, রাজনৈতিক, অরাজনৈতিক, সরকারী, বেসরকারী সবাই বিনা দ্বিধায়, বিনা বাধায় ইসলামী জীবন গঠনের জন্য দাখেল হইতে পারিবেন।

বৈশিষ্ট্য ঃ

খাদেমুল ইসলাম জামায়াতের নিজস্ব কর্মসূচী অনুযায়ী নিম্ন বৈশিষ্ট্যসমূহ বাস্তবায়নের যথাসাধ্য চেষ্টা করে।

www.pathagar.com

⇒ খাদেমুল ইসলাম জামায়াত মুসলিম একতায় ভাঙ্গন সৃষ্টিকারী সকল প্রকার কুসংস্কার তথা অনৈসলামিক বাতিল মতবাদের ও চিন্তা ধারার প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করিয়া সাধ্যমত মুসলিম জাতিকে এক ও নেক বানাইবার চেষ্টা করে।

⇒ যথাস্থানে জামাত গঠন, ফোরকানিয়া মক্তব ও মসজিদ স্থাপন, অনাবাদ মসজিদ ও মক্তবকে আবাদ করা এবং কোরআন পাকের তাফসীরের ক্লাস পরিচালনা ও যিকিরের মজলিশ কায়েম, ইসলামী পাঠাগার, নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন ইত্যাদির মাধ্যমে মুসলিম সমাজকে খোদামুখী শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তোলার আপ্রাণ চেষ্টা করে।

⇒ যোগ্য মোবাল্লেগে দ্বীনের দ্বারা অমুসলিমদের নিকট ইসলামের সুশিক্ষা ও সৌন্দর্য ব্যাখ্যার মাধ্যমে ইসলামের দাওয়াত পেশ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে ইসলামের আইন শৃঙ্খলা মানিয়া চলার মানসিকতা সমাজে জারী করে।

⇒ বিদেশী মিশনারী পাদ্রীগণ সেবা, শিক্ষা ও সাহায্যের নামে অপপ্রচারের মাধ্যমে ধোকা দিয়া যাহাতে মুসলিম সমাজকে বিভ্রান্ত করিতে না পারে এবং খৃষ্টান সংখ্যা বাড়াইয়া মুসলিম স্বাধীনতার পতন ঘটাইতে না পারে তদ্বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য সংগ্রহ করিয়া জাতিকে হুঁশিয়ার করার দায়িত্ব পালন করে।

⇒ খেদমতে খল্ক বা দুস্থ মানবতার সেবা কাজ করে এবং সমাজকে জনসেবায় উদ্বুদ্ধ করে। সাথে সাথে নিজে সেবক হওয়া ও শোষক না হওয়া, ত্যাগী হওয়া ও ভোগী না হওয়ার শিক্ষা, খোদার ভয়ের শিক্ষা, পাপের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টির শিক্ষা, পাপীকে সাদরে গ্রহণ করিয়া পাপমুক্ত হওয়ার ব্যবস্থা শিক্ষা ইত্যদি এবং বই-পুস্তক, বিজ্ঞাপন, ইশতেহার, প্রকাশনা ও বিরাট বিরাট জনসভার মাধ্যমে সারাদেশে ব্যাপক প্রচার করে।

এই জামায়াতের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হইতেছে যে, ইহা শুধু কতগুলি প্রকাশ্য নিয়ম তান্ত্রিকতার ও শুধু পুস্তকে সন্নিবেশিত বিদ্যার অনুশীলন নহে। ইহা আধ্যাত্মিকতার পূর্ণ শিক্ষা ও অনুশীলনের বাস্তব পরিবেশ সৃষ্টি করে। সুতরাং বান্দা যতদিন পর্যন্ত আল্লাহর মর্জিমত নিজের চরিত্র গঠন না করিতে পারিবে, ততদিন তাহার মানবতার উৎকর্ষ সাধন হইবে না। আর তাহার দ্বারা অপর বান্দার আত্মিক উন্নতি হইতে পারে না। আল্লাহর সহিত গাঢ় মহব্বত হইলেই তার বান্দার জন্য দরদ পয়দা হয় এবং জান মাল খরচ করার মত মনোবৃত্তির সৃষ্টি হয়। ইহার জন্য সর্বজন গণ্যমান্য মোর্শেদে কামেলের ছোহবতের ও জিহাদের বায়আতের প্রয়োজন। আরও প্রয়োজন চরম কৃচ্ছতা সাধনের।

www.pathagar.com

বাতেলের মোকাবেলায় জিহাদ যখন ফরয হয়, তখন উহার সংগঠনও ফরজ। কর্মীদের প্রশিক্ষণও ফরয। যেহেতু আধ্যাত্মিকতা ব্যতিরেকে নৈতিকতার কোনই নিশ্চয়তা নাই এবং যেহেতু হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দীর্ঘ ১৪ বৎসর পর্যন্ত তাঁহার সাহাবাগণকে ট্রেনিং দিয়া আল্লাহর মর্জি মোতাবেক চরিত্র গঠন করিয়া দিয়াছেন। পরে প্রকাশ্য যুদ্ধের হুকুম পাইয়াছেন। সমস্ত বর্বরতার মূলোচ্ছেদ করিয়া খোদার রাজ্যে শান্তির রাজ্য স্থাপন করিয়াছেন। "রাযিয়াল্লাহু আনহুম ওয়া রাযু আনহু"-এর খেতাবে বিভুষিত হইয়াছেন। খাদেমুল ইসলাম উহার অনুগমনে পরিচালিত। এই জন্যই ইহা অতি দ্রুতগতিতে বাড়ে না। ব্যক্তি গঠন হইলে এক ব্যক্তিই এক এলাকার জন্য যথেষ্ট প্রমাণিত হয়। মন্থরগতিতে হইলেও ইহার খেদমতের কাজ আলহামদু লিল্লাহ জারি জীবন্ত প্রাণবন্ত হিসাবে চলিতেছে। উক্ত কার্যসমূহ জনসাধারণের বিভিন্ন খাতের দানের দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে।

এই জামায়াতের একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় কমিটি রহিয়াছে। যাহাতে এই যুগের শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ, আলেম, বুযুর্গ, সমাজসেবী, ব্যবসায়ী ও সাধারণ শিক্ষিত বিজ্ঞ লোক রহিয়াছেন।

ইহার প্রধান কার্যালয় খাদেমুল ইসলাম গওহারডাঙ্গা মাদ্রাসা, গোপালগঞ্জ। প্রধান পরিচালনা কেন্দ্র লালবাগ শাহী মসজিদ, ঢাকা। ইহার আয়-ব্যয়ের হিসাব চার্টার্ড একাউন্টেন্টের দ্বারা অডিট করানো হয় এবং রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়।

খাদেমুল ইসলামের প্রচেষ্টায় বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় ইসলামী শিক্ষায় অনুন্নত ও দূর্গম এলাকার গ্রামাঞ্চলে বহু অনাবাদ মক্তব মসজিদ সংস্কার করা হইয়াছে। শত শত নূতন মক্তব স্থাপন করা হইয়াছে।

বাতেল মতবাদের মুকাবেলায় প্রায় সমস্ত জেলায়ই আঞ্চলিক ভিত্তিতে জামায়াত গঠন ও ধর্মীয় পাঠাগার স্থাপন করা হইয়াছে। বিভিন্ন এলাকার শহরে ও গ্রামে বড় বড় জনসভা করিয়া খাদেমুল ইসলামের কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগগণ জনসাধারণের মধ্যে ইসলামী শিক্ষার সুফল বুঝাইয়া দিয়াছেন।

ইসলামী শিশু শিক্ষার প্রদর্শনী দেখাইয়া জনমনে শিক্ষার আকুল আগ্রহ এবং প্রাণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। সমাজ বিরোধী চরিত্রহীনতা, নগ্নতা, বেহায়াপনা ইত্যাদির প্রতি এবং শিরক ও বিদআতের প্রতি জনমনে ঘৃণা সৃষ্টি করা হইতেছে। নামাযে অনভ্যস্ত হাজার হাজার ব্যক্তিকে নামাযে অভ্যস্ত করা হইতেছে। যাহারা নামায জানে না তাহাদিগকে নৈশ মক্তবে ভিন্নভাবে নামায শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করা হইতেছে।

www.pathagar.com

যেসব এলাকায় বিদেশী পাদ্রীগণ নূতন ঘাঁটি স্থাপনে সচেষ্ট ছিল এ জামায়াতের কর্মীগণ উহার তথ্য সরবরাহ করিয়া স্থানীয় মুসলিম জনতাকে উহার বিষফল বুঝাইয়া দেওয়ায় পাদ্রীগণ কৃতকার্য হইতে পারে নাই। আর যেসব এলাকায় নূতন প্রোগাম মত পাদ্রীগণ স্থান নিয়া ফেলিয়াছে এবং ঘাঁটি স্থাপন করতঃ সেবার নামে ও কৃষি খামারের নামে জন সাধারণকে আকৃষ্ট করিতেছিল, তথায় খাদেমুল ইসলামের কর্মীগণ গিয়া মুসলিম জনমনে ঘৃণার সৃষ্টি করিয়াছেন এবং প্রচারাভিযান জারী করিয়া দিয়াছেন। পাদ্রীদের অশুভ তৎপরতার বিরুদ্ধে মুসলমানদের যথাসময়ে সজাগ করিয়া দেওয়ায় বিশেষভাবে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ এই কাজে অতিশয় আকৃষ্ট হইয়াছেন। সুতরাং বই পুস্তক প্রচারের মাধ্যমে বাতেলের মুকাবেলায় এক দূর্বার আন্দোলন পরিচালনা অপরিহার্য কর্তব্য হইয়া পড়িয়াছে।

দুঃখের বিষয় বাংলাদেশ সরকারের অদূরদর্শী সকল সরকারী কর্মচারীদের সহযোগিতায় সংখ্যাগুরু মুসলমানদের অসন্তুষ্টি সত্ত্বেও অসংখ্য খৃষ্টান মিশনারী ঘাঁটি এই দেশে স্থাপন হইতেছে। প্রায় অর্ধশত বিদেশী খৃষ্টান সংস্থা এইদেশে সেবার নামে বড় বড় অফিস করিয়া ঢাকায় আসিয়া তাহাদের অশুভ তৎপরতায় লিপ্ত রহিয়াছে। এই দেশের স্বাধীনতার পতন ঘটাইয়া ইহাকে দ্বিতীয় লেবাননে পরিনত করার হীন ষড়যন্ত্র মূলচ্ছেদ না ঘটাইলে এই দেশ রক্ষা পাওয়া সুকঠিন। বিগত অল্পদিনের মধ্যে মুসলিম জাহানে যাহা কিছু ঘটিয়া গেল উহা সবই ইহুদী-খৃষ্টানদের ষড়যন্ত্র ছিল। অতএব মুসলিম জনসাধারণ ও সরকারের চৈতন্য উদয় হওয়া আবশ্যক। সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে সকল ইসলামী সংস্থাগুলি একযোগে কাজ করিলে ইন্‌শাআল্লাহ বাতেলশক্তির পতন অবশ্যই ঘটিবে। 'নাসরুম মিনাল্লাহি ওয়া ফাতহুন কারীব।'

= ০০০ =

www.pathagar.com

স্মৃতির মণি কোঠায়
মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ)

মাওলানা আবদুর রাজ্জাক

প্রথম দর্শন

জীবনের একেবারে প্রারম্ভিক অবস্থায় যখন আমি সবেমাত্র সাত কি আট বছরে পড়েছি। তখন একবার শুনতে পেলাম আমার বড় ভগ্নীপতি গোপালগঞ্জ জিলার গোপিনাথপুর গ্রামের জনাব মরহুম কাজী হাবীবুর রহমান সাহেব আমাদের বাড়ীতে বেড়াতে এসে বললেন, "আমাদের দেশের গৌরব, মহান বুযুর্গ হযরত মাওলানা শামছুল হক সাহেব (সদর সাহেব হুযুর) আমাদের গ্রামে আজ তাশরীফ আনবেন। আমরা হুযুরকে অনেক চেষ্টা করে দাওয়াত দিয়েছি। হুযুরের সঙ্গে বাংলাদেশের আরও ৮/১০ জন বড় বড় আলেমকে ওয়াজের জন্য দাওয়াত করেছি।" এই কথা শোনার সাথে সাথে আমি বলে উঠলাম- "আমিও আপনাদের বাড়ীতে ওয়াজ শুনতে যাব। যেই কথা সেই কাজ। জামা কাপড় পরিধান করে আমি রেডী। অথচ আমি সে সময় না ওয়াজ বুঝি না ওয়াজের মাহ্ফিল বুঝি।"

আমার ভগ্নিপতি অর্থাৎ বড় দুলাভাই বড় বিপদে পড়ে গেলেন। কারণ পাঁচ ছয় মাইল পথ পায়ে হাঁটা ব্যতীত অন্য কোন যান বাহনের কোনই ব্যবস্থা তখন ছিল না। আর এদিকে আমি সাত বছরের বাচ্চা, বড় জোর আধা মাইল হেঁটে কান্ধে চড়তে হবে। দুলাভাই অনেক বুঝিয়ে যখন অপারগ হলেন তখন আমাকে সাথে নিয়ে রওয়ানা দিলেন এবং আধা মাইল যাবার আগেই আমাকে কান্ধে তুলতে হলো। তাঁর কান্ধে চড়ে ঘুমাতে ঘুমাতেই আমি যেন আমার স্বপ্নের রাজ পুত্রের দরবারে হাজির হলাম।

তখনতো আমি না আলেম চিনি, না বুযুর্গ বুঝি। শুধু দুলাভাইয়ের মুখে সমস্ত তারিফ শুনে মনের মধ্যে আগ্রহ জাগলো এবং যাওয়ার জন্য জিদ ধরে বসলাম। হযরত সদর সাহেব হুযুর (রহঃ) আমাদের পূর্বেই উক্ত গ্রামে আমার দুলাভাইয়ের চাচাজান জনাব কাজী আলাউদ্দিন সাহেব বি, এ, (হেড মাষ্টার, কলা বাড়িয়া হাই স্কুল) এর বাড়ীতে পৌঁছে আরাম করছিলেন। আমি আমার দুলাভাইয়ের কোলে উঠে সর্ব প্রথম এ পরশ মণিকে বসা অবস্থায় দেখতে পেলাম। কিছুই জানি না, বুঝি না, তবুও কত আগ্রহের সাথে যে আমার মানিককে আমি দেখেছিলাম এ স্মৃতিটুকু আমার আয়নার মত এখনও স্পষ্ট ভাবে মনের কোণায় ভাস্বর হয়ে জেগে আছে। বিকালে জলসা শুরু হলো। অনেক বাচ্চা সভাস্থলে দৌঁড়াদৌড়ি করছে।

www.pathagar.com

মামি দূর থেকে বাড়ীতে দাঁড়িয়ে দেখলাম কিন্তু অপরিচিত জায়গায় সংকোচ, ভয় ও লজ্জায় সভাস্থলে গেলাম না। মাগরিব বাদ আমার দুলাভাই আমাকে কোলে করে সভাস্থলে নিয়ে গেলেন এবং ষ্টেজের একেবারে সন্নিকটে আমাকে সঙ্গে নিয়ে ওয়াজ শুনতে বসে গেলেন।

আসর বাদ মাইকে কেরাত গজল ও ওয়াজের আওয়াজ শুনেছি কি বলেছে জানি না। মাগরিব বাদ দেখলাম মাঠ ভরা হাজার হাজার শ্রোতা। সবাই চুপ চাপ। কারো মুখে কোন কথা নেই, সবাই ষ্টেজের দিকে চেয়ে আছেন। হযরত সদর সাহেব হুযুর সভাপতির আসনে গম্ভীর ভাবে বসে ছিলেন। হেড মাষ্টার জনাব কাজী আলাউদ্দিন সাহেব সভা পরিচালনা করছিলেন। কয়েক জিলার প্রখ্যাত বক্তাগণ হুযুরের নিকটে বসেছিলেন।

সর্ব প্রথমে একজন বিখ্যাত বক্তা বুলবুলে বাংলাদেশের নাম ঘোষণা করা হলো। বক্তা মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে সুললিত কণ্ঠে খোৎবা আরম্ভ করলেন। খোৎবা শেষ হওয়া মাত্রই হযরত সদর সাহেব হুযুর গুরু গম্ভীর স্বরে বললেন, "বসে পড়ুন"। বক্তা সাহেব সাথে সাথে বসে পড়লেন।

পরবর্তী বক্তার নাম ঘোষণা করা হলো, তিনিও খোৎবা শেষ করে একটি আয়াত পড়ে অন্য একটা কিছু পড়তে আরম্ভ করছেন- এমন সময় হুযুর বললেন- "বসে পড়ুন"। সাথে সাথে তিনিও বসে পড়লেন।

তৃতীয় বক্তার নাম ঘোষণা করা হলো। বক্তাগণ সবাই দেশ বিখ্যাত নাম করা বক্তা। নাম উল্লেখ করলে সবাই চিনতেন এজন্য নাম উল্লেখ করলাম না। তৃতীয় বক্তা কম্পিত কণ্ঠে খোৎবার অর্ধেক পর্যন্ত পৌঁছার সাথে সাথেই হুযুর হুকুম দিলেন, "বসে পড়ুন"। সাথে সাথে তিনিও বসে পড়লেন।

সমস্ত সভায় পিন-পতনেরও শব্দ ছিল না। হযরত সদর সাহেব হুযুর চব্বিশ পরগনা থেকে আগত হযরত মাওলানা আবেদ আলী সাহেবকে হুকুম দিয়ে বললেন- "মাওলানা আবেদ আলী সাহেব ওয়াজ করুন"। সাথে সাথে হালকা পাতলা সুদর্শন হযরত মাওলানা আবেদ আলী সাহেব দাঁড়িয়ে গেলেন এবং স্বাভাবিক ভাবে একটু বুলন্দ আওয়াজে ওয়াজ শুরু করলেন। মিষ্টি মধুর ভাষা স্পষ্ট আওয়াজে হযরত মাওলানা আবেদ আলী সাহেব প্রায় সাড়ে তিন ঘন্টা ওয়াজ করলেন। শ্রোতাগণ মন্ত্রমুগ্ধের মত শুধু শুনতেই ছিলেন। তাঁর ওয়াজ শেষ হলে হযরত সদর সাহেব হুযুর সভাপতির ভাষণ শুরু করলেন।

ইতি মধ্যেই আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। এ জন্য আমার দুলাভাইজান আমাকে কোলে করে বাড়ীতে রেখে আসলেন। এই ভাবেই আমি প্রথম বারের মত হুযুরকে

www.pathagar.com

দেখলাম। সভা কখন শেষ হলো, হুযুর কি বললেন এবং পরের দিন কখন হুযু চলে গেলেন আমি কিছুই জানতে পারলাম না। এই সময়টা ছিল সম্ভবতঃ ১৯৪৬ সালের মার্চ মাস। অতঃপর দীর্ঘ দিন হুযুরকে দেখিনি বা দেখার কোন চিন্তাও হৃদয় পটে জাগ্রত হয়নি।

আমার আব্বাজান মরহুম মুহাম্মদ রায়হান উদ্দীন মোল্লা একজন বিচক্ষণ মুরব্বি ছিলেন। হুযুরের সাথে তার গভীর সম্পর্ক ছিল। তিনি চেষ্টা করে একবার হুযুরকে আমাদের নিজড়া শাহপুর গ্রামে দাওয়াত করে নিয়ে বিরাট জলছ করেছিলেন। কিন্তু আমি তখন একেবারেই কোলের শিশু, কিছুই জানি না। আব্বাজানের মুখে শুনেছি মাত্র।

দ্বিতীয় সাক্ষাৎ

আমার দ্বিতীয় বার হুযুরের সাথে সাক্ষাৎ হয় ১৯৫৪ সালে। তখন আমি উলপুর হাই স্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্র। উলপুর গ্রামে জনাব আদম মোল্লা সাহেবের বাড়ীতে থেকে পড়াশুনা করি। হঠাৎ একদিন আমাদের গ্রামের জনাব মাওলানা গোলাম রহমান সাহেব উলপুর এসে আমাকে বললেন- "বেটা হযরত সদর সাহেব হুযুর আগামী কাল উলপুর ইলেকশনের ব্যাপারে আসতেছেন। তুমি মসজিদ মাঠে একটা ষ্টেজ তৈরী করে রাখবে এবং লোকজনকে খবর দিবে, হুযুর আগামী কাল এসে মিটিং করবেন"।

আমি যথা সময় সমস্ত ব্যবস্থা করে হুযুরের অপেক্ষায় রইলাম। লোকজন জমা হলো। হযরত সদর সাহেব হুযুর বাদ জোহর নৌকা যোগে উপস্থিত হলেন এবং লোকজনকে উদ্দেশ্য করে সংক্ষেপে বললেন, "বর্তমান সময়ে যুক্তফ্রন্টকে ভোট দিলে পাকিস্তান থাকবে না, কাজেই তাদেরকে ভোট দিবেন না"। এই কথাটুকু বলেই হুযুর সভা শেষ করলেন। তিনি দোয়া করে অন্য মিটিং এর উদ্দেশ্যে বিদায় গ্রহণ করলেন। এই ভাবেই সেই মহামনীষীর সাথে দ্বিতীয়বার সাক্ষাতের সৌভাগ্য হলো।

তৃতীয় সাক্ষাৎ

১৯৫৪ সালে ইলেকশনের দুই মাস পরে ভাদ্র মাসে হুযুর কাশিয়ানী থানার গোয়াল গ্রাম মাদ্রাসায় জলসা করে রাত্রে নৌকা যোগে আমাদের নিজড়া গ্রামে শামছুল উলুম মাদ্রাসায় এসে উপস্থিত হলেন এবং পরের দিন আমাদের গ্রামে একটি সভা করেন। উক্ত সভায় আমরা হুযুরের বক্তব্য সর্ব প্রথম শুনলাম এবং বুঝতে পারলাম এ মহান বুযুর্গ নিজের জীবনটাকে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির কাজে

www.pathagar.com

াতির জন্য বিলিয়ে দিয়েছিলেন। কোন মান অভিমান নেই, কে সম্মান করলো বা া করলো সে দিকে কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। নিজে দৌড়া দৌড়ি করে ফিরছেন।

তুর্থ সাক্ষাৎ

ঐ বছরই আমি খেদমতে খালকের কাজে হুযুরের বাড়ীতে যাই এবং এর য়েক মাস পরে ১৯৫৫ সালের জানুয়ারী মাসে গওহারডাঙ্গার বার্ষিক সভায় যাগদান করি। এ সাক্ষাৎটি আমার চতুর্থ সাক্ষাৎ ছিল। এই বছরই গওহারডাঙ্গার ভার সময় খাদেমুল ইসলাম জামায়াত সম্পর্কে জ্ঞাত হই। ঐ বছরই হযরত দর সাহেব হুযুর জনগণের মধ্যে সাধারণ ভাবে খাদেমুল ইসলামের সদস্য ংগ্রহের জন্য আহবান জানান এবং প্রত্যেকটি মানুষকে খাদেমুল ইসলামে যাগদান করে আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের তরিকা পূর্ণরূপে গ্রহণ করে মদীনার ন্সায় সমাজ গঠনের কাজ শুরু করতে বলেন। জনাব মাষ্টার আব্দুল হকের সাথে কত্রিত হয়ে ঐ সভায়ই আমি সদস্য সংগ্রহে অংশ গ্রহণ করি এবং হুযুরের ঘনিষ্ট ান্নিধ্য লাভ করি। তখন থেকে প্রতি বছর নিয়মিত ভাবে গওহারডাঙ্গার সভায় াতায়াত শুরু করি।

১৯৫৫ সালে ম্যাট্রিক পাশ করার পর প্রাইমারী শিক্ষকতা গ্রহণ করে পাঁচমাস গাপালগঞ্জের চরগোবরা গ্রামে শিক্ষকতা করি এবং ঐ পাঁচ মাসে ঐ গ্রামে দুইটা ক্তব কায়েম করি। রমযানে হুযুর গওহারডাঙ্গা আসলে হুযুরের নিকটে থাকার ন্য কয়েকজন সাথীসহ গওহারডাঙ্গা চলে যাই এবং পুরা রমজান হুযুরের াহবতে থাকার সৌভাগ্য লাভ করি। রমযানের পর হুযুরের আগ্রহে গওহারডাঙ্গা াদ্রাসা স্কুলের শিক্ষকতা গ্রহণ করে হুযুরের সান্নিধ্যে গওহারডাঙ্গা থেকে যাই। ঐ ময় থেকে শুরু করে হুযুরের এন্তেকাল পর্যন্ত এবং পরবর্তী সময় গওহারডাঙ্গায়ই বস্থান করি।

ামার জীবনের একটা প্রতিজ্ঞা

আমার জীবনটা বহু ঘাত-প্রতিঘাতের জীবন। একেবারে বাল্যকালে হুযুরকে দখার পর থেকেই আমি চিন্তা করতাম, আমার অবশ্যই বেহেশতে যেতে হবে বং আল্লাহর হুকুম ও নবীর তরিকা ব্যতীত অন্য কোন কিছুই আমি জীবনে গ্রহণ রবো না। অবশ্য আল্লাহর হুকুম ও নবীর তরিকায় কোন ভেজাল মিশ্রণ করা াবে না। এ ব্যাপারে আমাদের গ্রামের শামছুল উলূম মাদ্রাসার শিক্ষকবৃন্দ এবং ক্ত মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা হুযুরের প্রথম জামানার সাগরেদ, সাহারানপুর মাদ্রাসার ারেগ মরহুম গোলাম রহমান সাহেবের অবদানই বেশী। তার কাছেই ওলামায়ে

www.pathagar.com

দেওবন্দের কথা এবং হযরত সদর সাহেব হুযুরের সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান লাভ করা সুযোগ হয়েছিল। এজন্যই আমি জীবনে একদিনের জন্যও উলামায়ে দেওবন্দে মোকাবেলায় অন্য কোন দল বা ফেরকাকে পাত্তা দেইনি। খাছ করে ভন্ড ফকির জটাধারী ভন্ডদেরকে আমি যেখানে যতটুকু সুযোগ পেয়েছি সমূলে উৎখা করেছি। অনেক ফকিরের জট কেটেছি, মালা ছিড়েছি। বহু বেদাতী ভন্ড পীরকে তওবা করিয়েছি এবং তাদের মুরগীর খাঁচা ওয়ালা নৌকাকে দলবল নিয়ে ডাঙ্গা তুলে রেখেছি। এজন্য আমি কোন বদ দোয়া বা অভিশাপের পরওয়া করিনি তারা আমার কোন ক্ষতিও করতে সক্ষম হয়নি। আমার মনবলের সামনে যে তারা তৃণবৎ উড়ে গিয়েছে।

বহু বেদাতী পীরের হাজার হাজার মানুষের জলসা আমি বন্দ করে দিয়েছি উলামায়ে ছু কে ইসলামের সব চেয়ে বড় ক্ষতিকারী মনে করে তাদের সায়েস্ত করার চেষ্টা করেছি। হযরত সদর সাহেব হুযুরকে দেখার পর আমি কো অন্যায়াকারী জালেমকে পরোয়া করি নাই, শক্তি ও বুদ্ধি দ্বারা প্রতিবাদে সোচ্চা হয়েছি। চাটুকারিতাকে ঘৃণার চোখে দেখেছি। হযরত সদর সাহেব হুযুরকে দেখা পরে তাঁর সাথে, তাঁর কর্ম পদ্ধতি ও "জীবন ধারার সাথে কারো সামান্যতমও মি না হলে তিনি যত বড়ই প্রভাবশালী হোন না কেন আমি তাকে কোন বুযুর্গরূপে গণ্য করিনি।

হযরত সদর সাহেব হুযুরকে যতটুকু দেখেছি, গভীর ভাবে দেখেছি। যত সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখেছি ততই হুযুরের ব্যক্তিত্ব আমার কাছে আদর্শে মূর্তপ্রতীক হিসাবে ভাস্বর হয়ে প্রতিভাত হয়েছে। তাঁর চেয়ে সর্ব দিক আদর্শবা মানুষ আমার চোখে পড়েনি। এ জন্যই আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম তি যতদিন হায়াতে থাকবেন আমি একটি দিনের জন্যও তার থেকে দূরে থাকবো না কিছু হাছেল করতে পারি বা না পারি শুধু দু'চোখ দিয়ে দেখতে থাকবো। আল্লা আমার এ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেছেন। আল-হামদুলিল্লাহ।

আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম হুযুর জীবিত থাকা অবস্থায় তাঁকে ছেড়ে আ ইংরেজী পড়তে কলেজে যাব না। আরবী পড়তে অন্য কোথাও যাব না, বন্ধে সময় বাড়ী যাব না। আমার এ প্রতিজ্ঞা আমি রক্ষা করেছি আল হামদুলিল্লাহ আমি যা কিছু ইংরেজী পড়েছি হুযুরের কাছে থেকেই পড়েছি। আরবীও পড়ে হুযুরের কাছেই। আমার সামনে হুযুরের এন্তেকাল হয়েছে, রফিকিল আলা সান্নিধ্যে যাওয়ার দোয়া করে আমার সামনেই মালায়ে আলায় গমণ করেছেন আমি গোছল দিয়েছি, কাফন পরিয়েছি, সারা রাত্র মাথাটি কোলে লইয়া মানুষকে হুযুরের চেহারা দেখিয়েছি। লাশ বহন করেছি। হুযুরকে কবরে রেখেছি, শে

www.pathagar.com

ারের মর্ত চেহারা দেখেছি, কপালে চুমু খেয়েছি। এ সব আবেগ জড়িত ভাবেই রেছি, নিঃস্বার্থ ভাবেই করেছি। আমি তাকে কেমন দেখেছি ইহার পূর্বে তার াছে আমি কি পেয়েছি একথা না বললে নিমক হারামী হবে নিশ্চয়ই। তিনি ামাকে যা কিছু দিয়েছেন আমার চাওয়ার ও পাওয়ার চেয়েও ঢের তিনি আমাকে ান করেছেন। তার দান আমার কলমের ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। তবুও কিছু টা ফাটা ভাষায় ব্যক্ত করতে চেষ্টা করবো।

ালবাসা ও স্নেহ

তিনি আমাকে যে স্নেহ ভালবাসা দান করেছেন, সেই স্নেহ মমতার আমি াটেই যোগ্য ছিলাম না। আমি একটা বেয়াড়া ডান পিঠে মানুষ। কিন্তু কেন যে িনি এত আদর করতেন, আমার বুঝে আসে না। শুধু মনে হয় পেয়ারা নবী াল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নূরাণী সুন্নতের অনুসরণেই তিনি আমাকে এত াদর করতেন। তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারী হিসাবে রোজ বাদ ফজর থেকে গারটা পর্যন্ত তিনি ডিকটেট করতেন আমি লিখে যেতাম। পারবনা এ কথাটি ামি কোন দিন বলিনি। ফজর বাদ খাতা কলম নিয়ে দৌড় দিতাম। হুযুর বাদ জর কিছু দিন চিনিসহ ছানা দিয়ে নাস্তা করতেন। আমি হাজির হওয়ার সাথে াথে জিজ্ঞাসা করতেন কিছু খেয়ে এসেছ? আমি না বলার সাথে সাথে নিজের াস্তার প্রায় অর্ধেক টুকু আমার সামনে তুলে দিতেন। আমি লজ্জায় ও ভয়ে মাথা িচু করে খেয়ে নিতাম। এরকম প্রায় দিন করতেন। পরে আমি শেষ রাত্রে কিছু াকিয়ে ফজর বাদ খেয়ে যেতাম এবং বলতাম হুযুর আজ খেয়ে এসেছি। তবুও লতেন এটুকু মুখে দাও। কৃতজ্ঞতায় মন আমার ভরে যেত।

কুয়েত থেকে একবার হুযুরের একজন দোস্তদার মানুষ পার্সেল করে দুম্বার াস্ত পাঠিয়ে ছিলেন। হুযুর সামান্য একটুকরা মুখে দিয়ে আমাদেরকে ধরে িলেন। আমরা বাড়ীতে পাঠানের কথা বললে হুযুর ধমকের স্বরে বললেন, দরকার নেই, তোমরা খেয়ে লও। শীতের দিনে মাফলার, চাদর আছে কি না খোঁজ নিয়ে হুযুর করাচীতে একজনকে চিঠি লিখে নিজের জন্য মাফলার আনিয়ে িজে গলায় দিয়ে বসে আছেন। আমি হাজির হওয়ার সাথে সাথে বললেন, তোমার মাফলার এসে গেছে"। একথা বলে গলা থেকে মাফলারটি খুলে আামাকে িয়ে দিলেন।

একদিন হুযুর আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন- "তোমার ঘড়ি নেই? আমি না বলায় িনি আর কিছু বললেন না। কিছু দিন পরে একদিন ফজর বাদ আমি অভ্যাস মত ুযুরের সামনে হাজির হয়ে দেখি হুযুরের হাতে একটি নূতন ঘড়ি। আমি হুযুরের

www.pathagar.com

সামনে হাজির হওয়ার সাথে সাথে হুযুর বলে উঠলেন- আব্দুর রাজ্জাক এসেছ? এ লও তোমার ঘড়ি এসে গেছে"। এই কথা বলে হুযুর হাত থেকে ঘড়িটি খু আমার হাতে দিয়ে দিলেন।

কোন্ কথাটি বলবো কোন্‌টি বলবো না। কোন কোন কথাতো না বলার নয়। সব চেয়ে হুযুরের বেশী আগ্রহ ছিল যাতে আমি এলমে দ্বীন শিখতে পারি এজন্য তিনি কত ধরনের চেষ্টা তদবীর যে করেছেন একথা মনে আসলে আমা দুঃখে এবং লজ্জায় মরে যেতে ইচ্ছে হয়। আমাকে আলেম বানানোর চেষ্টায় সময় তিনি ব্যয় করেছেন এ ঋণ আমাকে গোলাম বানিয়ে হাজার বার বিক্রি ক তাঁর পায়ে ঢেলে দিলেও সে ঋণ শোধ হবার নয়। আমাকে তিনি ভোতা এ বলতেন। তিনি বলতেন, "তোর ব্রেইন আছে কিন্তু এলেম নেই, তোকে আলে বানিয়ে ছাড়বো। তিনি মুসলিম শরীফ, মসনবী শরীফ, গোলেস্তা, বোস্তা, কারিম পান্দনামা ইত্যাদি প্রত্যহ বাদ ফজর পড়াতেন এবং বলতেন, "শুনে রাখ, জীব আর এ কথা শুনবে না"।

ছবক শুরুর আগে জিজ্ঞাসা করতেন, আব্দুর রাজ্জাক এসেছ? যদি আমা উপস্থিত হতে কোন দিন একটু দেরী হতো, বলতেন- "তাকে ডেকে আন"। আ হাজির না হলে কোন দিনই ছবক শুরু করতেন না। ছবকে বড় বড় আলেমগ এবং হুজুরের খাছ লোকেরাই শরীক হতেন। কিন্তু কেউ কোন প্রশ্ন করতেন না হুযুর মাঝে মাঝে রাগতঃ স্বরে বলতেন "তোমরা কি ভূত পূজা কর? একা ছওয়াল নেই, প্রশ্ন নেই, আমি কি মূর্তি? আমরা প্রশ্ন করার কথা পরে আলোচ করতাম কিন্তু কেউই প্রশ্ন করতে হিম্মত করতো না। সবাই বলতো "আম কিছুতেই প্রশ্ন করতে পারবো না; প্রশ্ন করতে হলে তুমি করবে"।

আসলে প্রশ্ন করার মত কিছু সামনে আসতোই না। তবুও হুযুর বার বা বলায় আমি মাঝে মধ্যে বাধ্য হয়ে সকলের চাপে প্রশ্ন করতাম। হুযুর ধমক দি বলতেন তুই প্রশ্ন করতে পারবি না, তুইতো ভোতা এড়ে, তোর এলেম নেই কোন আলিফ, বা জানা মানুষ থাকলে প্রশ্ন করবে। কিন্তু কেউই প্রশ্ন করতো না আমি বাধ্য হয়ে প্রশ্ন করতাম। হুযুর রাগ করে গালি দিয়ে আবার হাসি মু জওয়াব দিতেন এভাবেই চলতে থাকতো।

আমাকে পড়ানের জন্য শায়খুল হাদীস জনাব হযরত মাওলানা আব্দুল হাফি সাহেবকে ও অন্যান্যদেরকে ঠিক করে দিতেন। কিন্তু তাদের সাথে রাজনীতি অন্যান্য আলোচনার সময় শেষ করে দিতাম। পড়াশুনা মোটেই হতো না, তারা কিছু বলতেন না। শেষে হুযুর যখন জিজ্ঞাসা করতেন তখন তারা বলতেন "হুয় তারও দোষ না আমাদেরও দোষ না। কি ভাবে যেন কি হয়ে যায় টের পাই না"

www.pathagar.com

হুযুর তখন আমাকে বলতেন, হে গাধা হয় না কেন বল! আমি বলতাম হুযুর কি ভাবে যেন সময় চলে যায় টের পাইনা। হুযুর বলতেন ওরে শয়তান! আমার সাথে শয়তানী, রাখ আমি ঠিক করছি। এরপর বললেন, যাও মুহ্তামিম সাহেবকে পাঠিয়ে দাও। আমি জনাব হযরত মুহ্তামিম সাহেবকে খবর দেওয়ায় তিনি হুযুরের কাছে হাজির হলেন। হযরত সদর সাহেব হুযুর জনাব মুহ্তামিম সাহেব হুযুরকে বললেন, আব্দুর রাজ্জাককে কম পক্ষে তিন ঘন্টা ছবক পড়াতে দাও, বেহেশতী জেওর, উর্দু চৌথি, হেকায়েতুছ্ছ সাহাবা ইত্যাদি।

হযরত মুহ্তামিম সাহেব হুযুরকে বললেন হুযুর আব্দুর রাজ্জাককে আমরা খুব স্নেহ করি কিন্তু তাকে লজ্জা দেওয়া কি ঠিক হবে? সেতো কিতাব পড়ে নি। হুযুর বললেন- আপনার ইজ্জতের কথা ভাবতে হবে না বলবেন- হুযুরের হুকুম এই চারটা কেতাব পড়াইবা। বিকালে হযরত মুহ্তামিম সাহেব আমাকে ডেকে কিতাব দিয়ে দিলেন এবং বললেন- ভাই আমার কোন দোষ না, হুযুরের হুকুম।

আমি কেতাব নিয়ে কামরায় এসে চিন্তা করে দেখলাম যে এখন আর ফাকী দেওয়ার কায়দা নেই। সুতরাং এক একজন হুযুরকে ডেকে কামরায় নিয়ে কেতাবের পড়া ঠিক করে নিতাম এবং আট দশবার লিখে ও পড়ে সব মুখস্ত করে ফেলতাম। পরের দিন সুন্দর ভাবে পড়িয়ে দিতাম। এই ভাবে এক বছর পড়ানোর পরে ঐ চারটি কেতাব সব আমার মুখস্ত হয়ে গেল। এই ভাবে বার বছর উর্দু কায়দার দেড় পাতা পড়ে পড়াতে লাগলাম। এক বছর শেষ হওয়ার পরে হুযুর জিজ্ঞাসা করলেন- তুমি উর্দু ভাল ভাবে পড়তে পার কি না?- আমি বললাম, পারি। তখন হুযুর বললেন, এখন থেকে আমার তফসীর লেখার কাজে তুমি আমাকে সাহায্য করবে। এখানকার তিন-চার জন উস্তাদ যারা উর্দু তফসীর আমাকে শুনায়, তাদের পরিবর্তে তুমি মোতালাআ করে আমাকে শুনাবে। আমি তিন-চারটি তফসীরের কেতাব মোতালাআ' করে হুযুরকে শুনাতে লাগলাম।

এই ভাবে আমার দরদী মুরব্বি আমাকে মানুষ বানাবার চেষ্টা করেছেন। অতঃপর হুযুরের এন্তেকালের পর করাচী গিয়ে জামেয়া ফারুকিয়ায় শুরু থেকে হেদায়া পর্যন্ত পড়াশুনা করি এবং দেশ স্বাধীনের পর ঢাকায় এসে মেশকাত দাওরা যাত্রাবাড়ী মাদ্রাসায় শেষ করি। হুযুর জীবিত থাকাকালে আমাকে সব সময় কাজের উপর রাখতেন।

এন্তেকালের কয়েক মাস পূর্বে একদিন জনাব মরহুম মাষ্টার আব্দুল হক সাহেব হুযুরের কাছে বললেন, হুযুর শত শত মানুষ আপনার কাছে আসে আপনি অসুস্থতার জন্য একটা কথাও বলতে পারেন না, তারা মাহরুম হয়ে ফিরে যায় আব্দুর রাজ্জাক ভাই আপনার কাছে সর্বদা থাকে তাকে অনুমতি দান করলে সে সকলকে কমপক্ষে বায়য়াত নামা কেতাবটা "তালিম করতে পারে"।

www.pathagar.com

হুযুর আমাকে ডেকে নিয়ে বললেন, "এখন থেকে তুমি সকলকে বায়য়াত নামার তালিম করাবা। আমি তোমাকে বায়য়াত নামা বা প্রথম ছবক 'জীবনের পণে'র তালিম করানের এজাজত দিলাম।" পরে আমি সকলকে হুযুরের হুকুম মত বায়য়াত নামার তালিম করাতাম। ইতিহাস নয়, দরদীর কথা অনেক অনেক লম্ব এজন্য আর না বাড়িয়ে সে মহামানবকে আমি যেমনটি স্বচোখে দেখেছি, সে সম্পর্কে কিছু আলোচনা করেই ইতি টানছি।

সাহাবায়ে কেরামের নমুনা

সাহাবায়ে কেরামের জীবন আদর্শ কুরআন হাদীছের আলোকে বুঝতে পেরেছি, জানতে পেরেছি কিন্তু বাস্তবে কিভাবে সম্ভব উহা কল্পনায় আনতে কষ্ট হয়েছে। বিশেষ করে আখেরী এ দুর্যোগপূর্ণ ফেৎনার জামানায় কল্পনায় আনতেও যখন দিশেহারা মানব হিমসিম খেয়ে ইমাম মাহদী (আঃ) এর আগমনের প্রতিক্ষায় দিন গুনছিল, ঠিক তখনই মুজাহিদে আযমের তেজদীপ্ত কর্ম পদ্ধতি এ যামানার মানুষের সামনে উজ্জ্বল ভাস্বর হয়ে মাইল ফলক হিসাবে কাজ করেছে। এ যামানায়ও যে সে যামানার সোনালী ফসল ফলতে পারে এ বিশ্বাস পথ হারা মানুষের সামনে উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে।

রসূলের পরশে সাহাবায়ে কেরামের জীবনের ত্যাগ তিতিক্ষা, কোরবানীর আদর্শ যাহা স্বপ্নের অতীত বলে কল্পলোকেও বিলীন হতে চলেছিল মুজাহিদে আযমের পদচারণায় সে আদর্শ যেন সহজ ভাবে এ যামানার পথ হারা মানুষের সামনে ফুটে উঠেছে। কত শায়েখ মাশায়েখ, পথ প্রদর্শক বিপ্লবী কাফেলার গগন বিদারী কণ্ঠ ধ্বনি শুনতে শুনতে কান ঝালা পালা হয়ে গেছে। কিন্তু বাস্তবতার কষ্ঠিপাথরে যাচাই করায় অন্তঃসার শূন্য প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু মর্দে মোমেন মুজাহিদে আযমের জীবনাদর্শ আমাদেরকে সাহাবায়ে কেরামদের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে।

একটি জীবন্ত দ্বীনের ঝান্ডা

মুজাহিদে আযম মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ)কে আমি একটি জীবন্ত চলন্ত ঝান্ডা হিসাবে পেয়েছি, জেনেছি ও বুঝেছি। হাদীসে দ্বীনের পরিচয়ে, দ্বীনের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে "আদ্দীনু আন্ নসীহা" অর্থাৎ খায়ের খাহীর নাম দ্বীন, কল্যাণ কামিতার নাম দ্বীন। সকলের জন্য খায়েরখাহী- আল্লাহর জন্য রাসূলের জন্য, সমস্ত মানুষের জন্য খায়েরখাহী, সমস্ত সৃষ্টির জন্য খায়েরখাহী। হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন সে দ্বীনে হকের জীবন্ত

www.pathagar.com

নমুনা, সাহাবায়ে কেরাম সে দ্বীনের ঝান্ডাবাহী কাফেলা। ওলামায়ে হক্কানী ছলফে ছালেহীন বুযুর্গানে দ্বীন ছিলেন মশালধারী আলোর দিশারী। সাহাবায়ে কেরামের কথা শুনেছি কেতাবের মাধ্যমে, বুযুর্গানে দ্বীনের কথা শুনেছি ইতিহাসের মাধ্যমে এবং স্বচোক্ষে দেখেছি মুজাহিদে আযমের প্রতিটি কাজ কারবার চাল চলন ও উঠাবসার মাধ্যমে চব্বিশ ঘন্টার জেন্দেগীতে।

এমন কোন মানুষ ছিলনা যাকে তিনি ভালবেসে কোলেতুলে নেননি। কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি বৌদ্ধ, কি খৃষ্টানরা সকলের তিনি চরম পরম কল্যাণ কামী ছিলেন। এমনকি ইতর প্রাণী, বৃক্ষ লতার, তিনি কল্যাণ কামনা করতেন। রাস্তার পার্শ্বের একটি চারা গাছকে গরুতে খেতে দেখে তার দরদী মন কেদে উঠেছে, গরুটাকে সরিয়ে দিয়ে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে পকেটের পয়সা দিয়ে গাছটাকে সংরক্ষণ, সংবর্দ্ধনের ব্যবস্থা করেছেন। সকলের জন্য সর্বদা তিনি কল্যাণের হস্তমেলে রেখেছেন। একটি কল্যাণের তথা ইসলামের কথার আওয়াজ যদি একটু দূরে পৌঁছালে ইসলামের উপকার হয় এজন্য তিনি সে কথাটি পৌঁছে দিতে এতটুকু পিছপা হননি।

তাবলিগী জামাতের সহযোগিতা

হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ) নিযামুদ্দীনে যেয়ে হযরতজী মাওলানা ইলিয়াস (রহঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করলে তিনি তাঁকে বুকের সাথে মিশিয়ে আদরের সঙ্গে বললেন: তোমার বাংলাদেশের তাবলীগের দায়িত্ব নিতে হবে। হুযুর লাববাইক বলে দেশে ফিরে আসেন। দেশে ফিরে খুলনার মোল্লাহাট থানার উদয়পুরের পীর সাহেব মাওলানা আব্দুল হালীম সাহেবের মাদ্রাসা দেখতে গিয়েছিলেন। ঐ সময় হুযুরের নযর পড়ে হযরত মাওলানা আব্দুল আজিজ সাহেবের উপর। হুযুর জিজ্ঞেস করলেন, বাবা! তুমি এখানে কি কর। মাওলানা বলেন, হুযুর আমি এখানের শিক্ষক, পীর সাহেবের জামাতা।

হযরত সদর সাহেব (রহঃ) পীর সাহেবের অনুমতি নিয়ে মাওলানা আব্দুল আজিজ কে কলিকাতা মারকাজে পাঠিয়ে দেন। তিন চিল্লা শেষে নিযামুদ্দীন হতে ফিরে এসে উদয়পুর মাদ্রাসা মসজিদকে মারকাজ ঠিক করে কাজ শুরু করেন। শুরু হল বাংলার জমিনে দাওয়াতী কাজ। সদর সাহেব পরামর্শ করে হযরত মাওলানা আবদুল আযীয সাহেব কে আমীর ঠিক করা হল। শুরু হল বাংলার জমিনে দাওয়াতি কাজ। পরামর্শ করে হযরত মাওলানা আব্দুল আজিজ সাহেবকে আমীর বানিয়ে দিলেন। ২/৩ বছর কাজ চলার পর এক সঙ্গে মাদ্রাসা, তাবলীগের কাজে কিছু অসুবিধা হওয়ায় পরামর্শ করে হযরত সদর সাহেব হুযুর মারকাজকে

www.pathagar.com

মাওলানা আব্দুল আজিজ সাহেবের গ্রামের বাজার মসজিদ তেরখাদা থানার বামন ডাঙ্গায় নেওয়া হল। এটা হলো বাংলাদেশে দ্বিতীয় মারকাজ। ৪/৫ বছর পূর্ণদমে কাজ চলল, উন্নতি হল।

একবার ইজতেমার সময় মাওলানা শামছুল হক সাহেব বললেন, বাবা আব্দুল আজিজ গ্রামে মারকাজ হয় না। মারকাজ খুলনায় নেওয়া দরকার। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ হল। হুযুর হেলাতলার মোতাওয়াল্লী সাহেবের কাছে বলে তালাবওয়ালী মসজিদ বর্তমান দারুল উলূম মাদ্রাসার মসজিদে নেওয়া হল। কাজ জোরেশোরে আরম্ভ হল, বরকত হল। হযরত মাওলানা আব্দুল আজিজ সাহেব সর্বদা মারকাজে অবস্থান করে।

একবার ইজতেমার পর পরামর্শ হলো, হযরত মাওলানা শামছুল হক সাহেব বললেন, বাবা আব্দুল আজিজ, দেহ এক জায়গায় আর রূহ এক জায়গায় কাজে বরকত হচ্ছে না। এখানে মারকাজ চলুক এলাকার ভিত্তিতে। তুমি ঢাকার লালবাগ শাহী মসজিদে চলে আস। শাহী মসজিদে জায়গার সংকুলান হলো না। হুযুর বললেন, দেখ মসজিদের সাথে মাঠ কোথায় আছে? পরামর্শ করে কেল্লার উত্তর-পশ্চিম দিকের খান মোহাম্মদ মসজিদকে মারকাজ করে হযরত মাওলানা আব্দুল আজিজ সাহেব সেখানে আসলেন। এটা হলো বাংলাদেশের পঞ্চম মারকাজ, লালবাগ চতুর্থ, খুলনা তৃতীয়, বামন ডাঙ্গা দ্বিতীয় এবং উদয়পুর প্রথম মারকাজ বাংলাদেশের।

কয়েক বছর পরে খান মোহাম্মদ মসজিদ মাঠেও ইজতেমার জায়গা সংকুলান হলো না। পরামর্শ হলো হযরত মাওলানা শামছুল হক সাহেব সবাইকে বললেন, আপনারা দেখুন ঢাকা শহরে বড় মাঠের পাশে কোথাও মসজিদ আছে কি না? অনেক অনুসন্ধানের পরে পাওয়া গেল রমনা পার্ক বড় ময়দানের পাশে ছোট একটি মসজিদ আছে, নাম মাল ওয়ালী মসজিদ। হযরত মাওলানা শামছুল হক সাহেব বললেন, ছোট মসজিদ হোক ক্ষতি নেই, পার্কের জায়গা কিছুটা দখল করে আমরা মসজিদ বড় করে নেব ইনশাআল্লাহ।

মাল ওয়ালী মসজিদ মারকাজ কায়েম হল, বাংলাদেশের ছয় নম্বরী দাওয়াতের কাজের যষ্ঠ মারকাজ হলো। হযরত মাওলানা শামাছুল হক সাহেব খুশী হলেন। সাগরেদ হযরত মাওলানা আলী আকবর সাহেব, আমাদের হাজী সাহেব হুযুরের পরিচালনায় এখন আমাদের নওজোয়ান মাওলানা জোবায়ের সাহেবও আছেন। এখনও সেই হযরত মাওলানা আব্দুল আজিজ সাহেবও হায়াতে আছেন। তার ইমারতে এখনো কাজ চলছে। শেষ বারের মত হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব যখন আইয়ুবের আমলে ইজতেমায় এলেন এবং টিন দিয়ে পার্ক ঘিরে ইজতেমা হলো।

www.pathagar.com

হযরত মাওলানা শামছুল হক সাহেব, ছেলে হাফেয মাওলানা ওমর, জনাব মাওলানা আব্দুল মান্নান সাহেব হুযুরের মেঝে জামাতা বর্তমান গওহারডাঙ্গার মুহতামিম ও আমি হতভাগা ঐ জামাতে হুযুরের সাথে শরীক ছিলাম। জনাব হাফেয ওমর সাহেব তখন খুব ছোট। হযরতজী মাওলানা ইউসুফ সাহেব (রহঃ) এক সঙ্গে খাবার সময় নিজ বরকতের হাতে রুটি হাফেয ওমরের মুখে তুলে দিয়ে আদর করে খাওয়াচ্ছিলেন। হযরত সদর সাহেব হুযুরের চেহারা উজ্জ্বল নূরানী মনে হচ্ছিল। কত কথা যে হযরতজী বললেন, তার সীমা নাই। তিনি হযরত সদর সাহেব হুযুরকে মুরব্বীর মত সম্মান করতেন। সদর সাহেব বললেন, মাওলানা ইউসুফ সাহেবকে আল্লাহ্ এ যামানার মুজাদ্দিদ বানিয়েছেন। ঐ সফরে হযরতজী পাকিস্তান বেলাল পার্কে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করে নিজামুদ্দীনে শান্তির নিদ্রায় শায়িত হন এবং হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ) সদর সাহেব হুযুর ঐ ইজতেমার পরে অসুস্থ হয়ে দেশের বাড়িতে গমণ করেন। বর্তমানে তিনি গওহারডাঙ্গা মাদ্রাসার হেফযখানার দক্ষিণ পাশি চির নিদ্রায় শুয়ে কুরআনে পাক শুনছেন।

খেদমতে খালকের অনন্য প্রতীক

মুজাহিদে আযমকে আমি দেখেছি খাদেমে আ'যম হিসাবে। তিনি বলতেন মানুষের মাত্র দুইটি কাজ (১) স্রষ্টার এবাদত (২) সৃষ্টির খেদমত। খেদমতে খোদা মিলে এটা তিনি নিজের জীবনে বাস্তবায়িত করে দেখিয়েছেন। তিনি বলতেন বিশ্ব মানবের খেদমত করতে, বিশ্ব সংস্কার করতে, আল্লার সন্তুষ্টি লাভ করতে হলে জগতে শান্তি ও আখেরাতের মুক্তি ও চির শান্তি হাছেল করতে হলে, বিশ্ব নেতৃত্বের আসন অলংকৃত করতে হলে, রাসূলের দীক্ষা অনুসারেই সকলকে খাদেম হতে হবে। রসূল বলেছেন- "কওমের নেতা সেই হতে পারে যিনি কওমের বেশী খেদমত করেন"।

কওমের খাদেমই কওমের নেতা। এজন্য তিনি কায়েম করেছিলেন খাদেমুল ইসলাম জামায়াত। এ জামায়াতের কর্ম সূচীকে তিনি প্রনয়ণ করেছিলেন হিলফুল ফুজুলের আদর্শকেই সামনে রেখে। খাদেমুল ইসলামের কর্মসূচীকে মসজিদ কেন্দ্রিক সংক্ষিপ্ত আকারে দশ দফা সমাজগত ও দশ দফা ব্যক্তিগত পর্যায়ে বিভক্ত করে প্রতিটি মসজিদকে মদীনার মসজিদের মত জীবন্ত করার প্রোগ্রাম নিলেন। এ প্রোগ্রাম বাংলাদেশের ৬৮ হাজার গ্রামের আড়াই লক্ষ মসজিদে কায়েম হলে মসজিদকে কেন্দ্র করেই প্রতিটি ব্যক্তি, সমাজ ও দেশ পরিপূর্ণ ইসলামী নক্সায় গড়ে উঠবে।

www.pathagar.com

যুগ সংস্কারক রূপে মুজাহিদে আযম

মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ) এর প্রতিটি কাজ ছিল সংস্কার মূলক। শিক্ষা ক্ষেত্রে শিশুদের জন্য নূরাণী পদ্ধতির শিক্ষা ব্যবস্থা জারী করেন। মাধ্যমিক শিক্ষা (সহ শিক্ষা বর্জিত) জ্ঞান বিজ্ঞান সমৃদ্ধ, ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতা মূলক হিসাবে, সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত কারিকুলাম প্রদান করেন। তিনি সুদবিহীন যাকাত ভিত্তিক অর্থনীতির প্রোগ্রাম দেন। দ্বীনি মাদ্রাসা সমূহকে, ইসলামের বিশেযজ্ঞ তৈরীর কারখানা হিসাবে চিহ্নিত করেন। প্রতিটি ছাত্রকে জেহাদী ছাঁচে গড়ে তোলার প্রোগ্রাম দেন। আধ্যাত্মিক সাফল্যের লক্ষ্যে কুরআন হাদীস ভিত্তিক সুন্নত তরিকার প্রবর্তন করেন। বিজাতীয় গণতন্ত্র, সমাজ তন্ত্র, পুজিবাদ, ধর্ম-নিরপেক্ষবাদ রূপী ইজমের মূলে কুঠারাঘাত করে ইসলামের খেলাফত ব্যবস্থার সুমহান নীতির দিক নির্দেশনা দেন। ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক জীবনে ইসলামের বিশ্ব বিপ্লবী রূপকে তুলে ধরেন।

জীবনের শেষ দিনগুলি

জীবন সায়াহ্নে সীমাহীন ত্যাগ-তিতিক্ষা, কোরবাণী ও মেহনত পরিশ্রমের কারণে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। এ অসুস্থতার মধ্যেও তিনি দৈনন্দিন জীবনের রুটিনের কোন পরিবর্তন করেননি। ডাক্তারদের হাজার অনুরোধ ও পরামর্শ সত্ত্বেও তিনি আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগীতে সামান্যতম কমতি করতে রাজী হননি। তিনি বলতেন, আল্লাহর খুশীর কাজই যদি স্বাস্থ্যের কারণে বন্ধ রাখতে হয় তবে এ স্বাস্থ্য, এ জীবন দিয়ে কি হবে? আল্লাহর রাস্তায় শেষ হয়ে যাক সেটাই উত্তম।

অসুস্থ অবস্থায় সর্বদা তিনি পানাহ চাইতেন, হে আল্লাহ হসপিটালের নোংরা, মানবতাহীন জাহান্নামী পরিবেশে যেন আমার মরণ না হয়। তিনি বলতেন, গ্রামের পরিবেশে বিনা চিকিৎসায়ও মৃত্যু ভালো। হসপিটালের নারকীয়, হৃদয়হীন চিকিৎসার পরিবেশের চাইতে। কারণ হসপিটালে মানুষ ঈমান নিয়ে মরতে চাইলেও পরিবেশ ঈমানকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে চায়।

তিনি অসুস্থ অবস্থায় দেশের বাড়িতে আসার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। ভক্ত, অনুরক্ত, শিষ্য, সাগরেদ ও গুণগ্রাহীরা এ সিদ্ধান্তে দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়লেন। চোখে তাদের পানি দেখা দিল, অন্তর বিদীর্ণ হয়ে গেল। দেশে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে একদিন সকলকে উদ্দেশ্য করে এক মর্মস্পর্শী ভাষায় লালবাগ শাহী মসজিদে বললেন, "মানুষ চিরকাল বেঁচে থাকে না, থাকবেও না। মাওলার দরবারে হাজির হতে হবে। আমিও চিরকাল বেঁচে থাকবো না। এ দুনিয়া থেকে চলে যাব মাওলার দরবারে। হাসিমুখে মাওলার দরবারে হাজির হতে পারি এই দোয়া চাই।"

www.pathagar.com

পীর মানুষের উস্তাদ, ভাল-মন্দ কোরআন হাদীসের দৃষ্টিতে বুঝাতে পারেন। লাভ ক্ষতির মালিক আল্লাহ্। মানুষ মানুষের লাভ-ক্ষতির কিছুরই মালিক নয়। পীর, ওস্তাদ মানুষের মুক্তি দিতে পারে না। মুক্তি দেবেন একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। কবর পূজা শিরক। কবরকে সিজদা করা, ভাল-মন্দ হাজত পেশ করা শিরক। তিনি বলেন, খবরদার! খবরদার!! আপনারা কখনো এই সমস্ত গোমরাহীর মধ্যে লিপ্ত হবেন না। এক আল্লাহকে মান্য করে চলবেন। ভাল-মন্দের মালিক তিনিই। পীর পূজা, কবর পূজায় লিপ্ত হয়ে দুনিয়ার বহু জাতি ধ্বংস হয়েছে। আমার শরীরের যে অবস্থা হয়তো আপনাদের সাথে পূনঃ মোলাকাত নাও হতে পারে। আমাকে আল্লাহর ওয়াস্তে ক্ষমা করে দিবেন এবং দোয়া করবেন আমিও আপনাদের দুনো জাহানের কামিয়াবীর জন্য দোয়া করি। আমীন।"

মুজাহিদে আযম-এর সংক্ষিপ্ত হৃদয়গ্রাহী কথা কয়টিতে সকলের চক্ষু অশ্রু ভারাক্রান্ত হয়ে এল। দুঃখ ব্যথিত হৃদয়ে সকলে একে একে বিদায় নিল। মুজাহিদে আযম ঢাকার স্মৃতিকে কষ্টের সাথে হৃদয়ে চেপে নিজের জন্মভূমি গওহার ডাঙ্গা ফিরে এলেন। গওহার ডাঙ্গা মাদ্রাসার ওস্তাদগণ হযরত মোহতামিম সাহেব ও দেশবাসী তাদের প্রাণের মালিক, হৃদয়ের ধন হকের সূর্যকে আপন ঘরে ফিরে পেয়ে খুশীতে বাগবাগ হয়ে গেলেন। মুজাহিদে আযমের অসুস্থতায় সবার মনে যদিও দুঃখের কালো ছায়া তথাপি যেন সান্ত্বনা। কারণ তিনি আমাদের মাঝে ফিরে এসেছেন। এটাই বড় সৌভাগ্য।

হাজারও অসুস্থতার মধ্যেও হযরতের দৈনন্দিন রুটিন সঠিকভাবে চলতে থাকল। মাদ্রাসার শিক্ষকদের পড়াশোনা, আগ্রহ শতগুণে বেড়ে গেল, ছাত্রদের মোতালা'আয় যেন নতুন প্রাণ সঞ্চার হল, দেশবাসী দলে দলে তাদের সর্বজন মান্য-ভক্তির পাত্রকে দেখতে লাগল, মূল্যবান নসিহত শুনতে লাগল।

মুজাহিদে আযমের রুটিন সাধারণতঃ শেষ রাত্র থেকে আরম্ভ হতো। রাত ৪টায় উঠে তিনি এস্তেঞ্জা ইত্যাদি থেকে ফারেগ হয়ে তাহাজ্জুদে লিপ্ত হতেন। কোন কোন দিন তাহাজ্জুদের শেষে আরাম করতেন বা উপস্থিত মুরীদদের সবক বাতাতেন এবং মূল্যবান প্রশ্নের জওয়াবও দিতেন। অধিকাংশ সময় তিনি ইস্তেঞ্জা থেকে ফারেগ হয়ে অজু করে মাদ্রাসার মসজিদে তাশরীফ নিয়ে আসতেন এবং সেখানে তাহাজ্জুদ শেষ করে ভক্ত বৃন্দের কথা শুনতেন, সবক দিতেন এবং যিকর-মোরাকাবায় লিপ্ত থাকতেন।

ফজরের নামাজের আযানের বাদ জামায়াতে নামায শেষ করে খানকায় আসতেন এবং কোরআন তিলাওয়াত, মোনাজাতে মকবুল এক মঞ্জিল এবং অন্যান্য দোয়া ইত্যাদি করার পর ইশরাক পড়তেন। ইশরাক বাদ কোন কিছু

www.pathagar.com

হালকা নাস্তা করতেন, কোন দিন করতেন না। এমতাবস্থায় লেখনির কাজ শুরু করতেন। আল্লাহর কালামের তাফসীর, জাতি গঠনমূলক পুস্তকাদি প্রণয়ন, যুগের সমস্যার ইসলামী সমাধান ইত্যাদি প্রায় দুই শত কিতাব তিনি এ সময় প্রণয়ন করেন। লেখার সময় সকলে জানতো দুনিয়ার কোন রাষ্ট্র প্রধান এলেও তাঁর লেখার টাইম শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হতো। এই সময় তিনি অন্য কোন কথা বলতেন না। লেখা থেকে অবসর নিয়ে নাস্তা করতেন এবং সামান্য একটু বিশ্রাম নিয়ে মাদ্রায় চলে যেতেন। ছাত্র-শিক্ষকদের পড়াতেন বুঝাতেন এবং বাহিরের আগন্তুকদের সাক্ষাত দিতেন। এর মধ্য থেকে বহিরাগত শত শত পত্রের জওয়াব নিজ হাতে লিখে ডাকে পাঠাতেন।

জোহরের পূর্বে গোসল করতেন এবং নামায পড়ে কিছু খানা খেতেন, সামান্য কায়লূলা করে ওলামা, তুলাবা, জ্ঞানী ও শিক্ষিত সর্বশ্রেণীর মানুষের মজলিসে বসতেন। তাঁদের বিভিন্ন প্রশ্নের জওয়াব দিতেন এবং মূল্যবান নসিহত করতেন। কোন কোন সময় কোন কিতাবকে সামনে রেখে আলোচনা চলতো।

আসরের জামায়াত শেষ হয়ে গেলে আবার মজলিস শুরু হতো এবং মাগরিবের আযান পর্যন্ত চলতো।

মাগরিব বাদ আওয়াবীন পড়ে গভীর ধ্যানে মগ্ন হতেন। বিশেষ কোন দ্বীনি কাজ হলে আওয়াবীন বাদ উক্ত কাজও করতেন।

এশার নামায জামায়াতে পড়ে মাদ্রাসার দৈনিক রিপোর্ট শুনে আগামী দিনের প্রোগ্রাম জেনে নিয়ে তিনি বাড়িতে তাশরীফ নিতেন। খানা খাবার পরে সংসারের খবরাখবর সামান্য জেনে নিয়ে আরাম করতে যেতেন।

শেষ রাতে ঠিক সময় মত আবার আল্লাহ আল্লাহ বলে জেগে উঠতেন। অসুস্থ অবস্থায়ও দেশের বাড়িতে এসে সাধারণতঃ রুটিন এ ভাবে চলতো। কোন সময় সামান্য ব্যতিক্রমও দ্বীনের খাতিরে করতেন।

অসুস্থ অবস্থায় তিনি যখন মাদ্রাসা পর্যন্ত হেঁটে আসতে অক্ষম হতেন সে সময় একটা ঠেলাগাড়িতে মাদ্রাসায় হাজির হতেন। যখন গাড়িতে চলতেও কষ্ট হত সে সময় তিনি বাড়ির মসজিদে নামায পড়তেন এবং ঐ সময় ফযর বাদ বাড়ির মসজিদে সালেকীন, মাদ্রাসার ছাত্রদের ভীড় জমে যেত। ফজর বাদ তিনি ঐ সময় মুসলিম শরীফ, মসনবী শরীফ পড়াতেন। মাঝে মাঝে তিনি বলতেন, মসনবী শরীফ পড়ে লও। এ কথা আর কোন দিন হয়তো শুনাব না। মধ্যে মধ্যে তিনি কারীমা, পান্দেনামা, গোলেস্তাঁ, বোস্তাঁ, কসদুসসাবিল, তরবিয়াতুচ্ছালেকীন কিতাবও বুঝিয়ে দিতেন। মসজিদ থেকে গিয়ে কিছু নাস্তা করতেন এবং নাস্তা বাদ লেখার কাজ শুরু করতেন।

www.pathagar.com

শেষ জীবনে তাফসীরের বাকী কাজ শেষ করেন এবং ভুল সংশোধন কিতাবটি লিখেন। জোহর বাদ কিছু বিশ্রাম করে আবার মজলিস শুরু হতো। আসর বাদ তরবিয়াতুস্ সালেক, মলফুজাতে থানভী (রহঃ) ইত্যাদির আলোচনা হতো। এই ভাবে মুজাহিদে আযম নিজের জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত রুটিন মাফিক চলতেন এবং প্রত্যেকটি মুরীদের নামায, ওযু, দোয়া-দরূদ সামনে দাঁড় করিয়ে শুনতেন এবং ঠিক করে দিতেন।

ইন্তেকালের কিছু দিন পূর্বে তিনি গওহার ডাঙ্গা মাদ্রাসার মুহতামিম সাহেবকে বললেন, "মুহতামিম সাহেব জীবনে আল্লাহর কালামের মহব্বত ছাড়তে পারিনি, মৃত্যুর পরেও এ মহব্বত ছাড়তে পারবো না। এ জন্য মাদ্রাসার হেফয খানার দক্ষিণপাশে একটু জায়গা আমাকে কবরের জন্য ভিক্ষা দিন। আমি ওখানে শুয়ে শুয়ে আল্লাহর কালাম শুনবো, আল্লাহর কালামের মহব্বত আমি মরে গেলেও ছাড়তে পারবো না।" উত্তরে মুহতামিম সাহেব বললেন, "এ জায়গা হুযুর দান করেছেন আর আমাদের আকাঙ্ক্ষা হুযুর মাদ্রাসায় শুয়ে থাকলে আমরা বেশী সুখী হব। কাজেই জায়গা চাওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না।" হুযুর বললেন, "এ সব মাদ্রাসার জায়গা, কাজেই আপনারা অনুমতি দান করিলেই আমি হেফযখানার দক্ষিণ পার্শ্বে একটু জায়গা পেতে পারি।"

মাদ্রাসা থেকে কয়েক মুষ্টি চাউল দ্বারা হুযুর চাউল পানি খেয়ে সাথে সাথে উহার কয়েকগুণ বেশী পরিশোধ করতেন। একবার বার্ষিক সভার সময় মাদ্রাসার সমস্ত পুরোনো কদুগাছ কেঁটে ফেলে দিলে মাদ্রাসার ক্যাশিয়ার জনাব মাষ্টার ওমর আহমদ সাহেব কিছু কদুর তাজা পাতা একত্রে আঁটি বেঁধে হুযুরের গাভীটির জন্য নিয়ে গিয়েছিলেন। হুযুর দেখে বললেন, ঐ কদুর পাতার দাম কত? মাষ্টার সাহেব বললেন, হুযুর আমি মহব্বত করে নিয়ে এসেছি। এ পাতা তো দামে বিক্রি হয় না। হুযুর বললেন, বোকা! দাম না দিয়ে মাদ্রাসার একটা দূর্বা ঘাসও গরুকে খাওয়াতে পারি না। এ পাতাগুলি মাদ্রাসায় পঁচে গেলে মাদ্রাসার একটু মাটি বাড়তো। শামছুল হকের কি অধিকার আছে মাদ্রাসার কদুর পাতা গরুকে খাওয়ানোর? অতঃপর মাষ্টার সাহেব মাদ্রাসায় গিয়ে ঐ কদুর পাতার একটা দাম ধরে ঐ পয়সা হুযুরের কাছ থেকে নিয়ে পরে পাতাগুলি গাভীটিকে খেতে দেয়। যে সমস্ত মাদ্রাসায় তিনি পড়াতেন একান্ত প্রয়োজনে কিছু পয়সা তিনি নিতেন। প্রয়োজন না হলে নিতেন না। বরং মাদ্রাসার নেওয়া পয়সা ফেরত দিতেন।

ইন্তেকালের তিন দিন পূর্বের ঘটনা। মাদ্রাসার একজন শিক্ষককে একটা মাসআলার তাহকীকের জন্য বলেছিলেন। কিন্তু হুযুরের শরীর এত অসুস্থ ছিল যে, ডাক্তার ও লোকের সাক্ষাত বন্ধ করে দিয়েছিলেন। এ জন্য ঐ মাওলানা সাহেব

www.pathagar.com

হুযুরের কাছে যেতে পারেন নাই। হঠাৎ সামান্য সুস্থতা বোধ করায় কোন কাজে আমাকে সংবাদ দিলে ঐ মাওলানা সাহেবও আমার সাথে গমণ করলেন। হুযুর জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার সাথে আর কে আছে? আমি উত্তর দিলাম, অমুক মাওলানা সাহেব। সাথে সাথে হুযুর তাকে প্রশ্ন করলেন, ঐ মাসআলার কিতাবটি এনেছ? তিনি বললেন, হুযুরের স্বাস্থ্য বেশী খারাপ এ জন্য আনিনি। মুজাহিদে আযম বললেন, আমি মরে গেলেও কিতাব দেখার শওক থেকে যাবে।

মুজাহিদে আযমের ইন্তেকালের পূর্বের দিন তাঁর অবস্থা বেশী খারাপ হয়ে পড়ল। সারা দিন সকলে পেরেশানীর মধ্যে অতিবাহিত করল, রাত্রেও অবস্থা একই প্রকারে অপরিবর্তিত রইল। গওহার ডাঙ্গা মাদ্রাসার মুহতামিম সাহেব এবং ওস্তাদগণও আমরা সকলে অত্যন্ত পেরেশানীর মধ্যে রাত কাটালাম। রাতেই পরামর্শ হলো, ফজর বাদ খতম শুরু হল। হযরত মুহতামিম সাহেব সদর সাহেব হুযুরের খবর নেওয়ার জন্য আমাকে পাঠালেন। আমি হুযুরের বাড়ি গিয়ে দেখি হুযুরের বড় ছেলে ভাই হাফেয ওমর সাহেব হুযুরকে ওযু করাচ্ছেন। আমি মাদ্রাসায় এসে দেখি খতমের খবর শুনে হযরত সদর সাহেব হুযুর নিজেই আম্মা সাহেবানকে হুকুম দিয়ে ছেলেদের জন্য কয়েকটি পাত্রে পায়েস পাকিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন। মৃত্যু শয্যায় শায়িত থেকে মানুষের হককে এরূপ অগ্রাধিকার দিতে আমি কোন মানুষকে দেখিনি।

ফজরের নামায বাদ খতমে ইউনুস পড়ার পরে আমরা সকলে হুযুরের বাড়ীতে গেলাম। তিনি তখন নামায পড়ে বারান্দার চৌকিতে শুয়ে আছেন। শ্বাসটা কিছু বেড়ে গিয়েছে এবং পেটে লিভারের কিছু কিছু বেদনা অনুভব হচ্ছে। রবারের থলেতে গরম পানি ভরে সেক দেওয়া হচ্ছে। আমি ঐ রবারের থলেটা নিয়ে কিছুক্ষণ সেক দিলাম।

দুইজন লোককে পাটগাতি বাজারের ডাক্তার আব্দুল কাদেরকে আনতে পাঠালাম। ডাক্তার আব্দুল কাদের সাহেবকে হুযুর খুব ভালবাসতেন। কিছুক্ষণ পরে অবশ্য কবিরাজ আব্দুল ওয়াদুদ সাহেবও এসেছিলেন। হুযুর কবিরাজ আব্দুল ওয়াদুদ সাহেবের ঔষধ খেতেন। ডাক্তার আব্দুল কাদের সাহেব আসবার পূর্বেই হুযুর যে চৌকিতে শয়ন করেছিলেন, শীতের জন্য ঐ চৌকিটাসহ হুযুরকে উঠানের রোদে নেওয়া হল। কিন্তু শ্বাস কষ্ট ও পেটে সামান্য ব্যথা ব্যতীত হুযুর সুস্থ ছিলেন এবং কথাবার্তা বলতে ছিলেন। ডাক্তার আব্দুল কাদের সাহেব হাজির হওয়ার পূর্বেই জনাব আব্দুল আলিম মুরুব্বি-মাতব্বরসহ বেশ কয়েকজনকে নিয়ে হুযুরকে দেখতে এলেন। হুযুর শায়িত অবস্থায়ই আমাদের বললেন, মুরব্বিদের বসতে দাও।

www.pathagar.com

একটু পরেই ডাক্তার সাহেব আসলেন এবং মুজাহিদে আযমকে দেখে পরীক্ষা করে কয়েকটি ট্যাবলেট খেতে দিলেন। হুযুর নিজ হাতে ট্যাবলেট কয়টি মুখে দিলেন এবং পানি পান করলেন। শরীরের সব বেচায়েনী কিছু বেড়ে গেল। শ্বাসকষ্ট ও ব্যথায় যেন কিছুটা অস্বস্তি বোধ করছিলেন। রোদ বেড়ে গেল। হুযুরকে আবার চৌকিসহ বারান্দায় নেওয়া হল। এ সময় বেলা সাড়ে বারটা। সারা উঠানে ছাত্র-শিক্ষক ও গ্রামের লোক ভর্তি। হুযুরের বড় ছেলে হাফেয ওমর তখন কাঁদছিলেন। হুযুর ওমরকে সান্ত্বনা দিয়ে কাঁদতে নিষেধ করলেন এবং অত্যন্ত দরদ ভরা কণ্ঠে বললেন, ওমর কেঁদনা। আমি তোমাকে দু'টি অসিয়ত করছি।

(১) তোমার আম্মা আমার যে খেদমত করেছে তার তুলনা হয় না। তুমি জীবনভর তোমার আম্মার খেদমত করবে।

(২) তুমি হাফেয হয়েছ। এখন খাঁটি আলেম হবে এবং তোমার ছোট ভাই রূহুল আমীনকে হাফেয ও আলেম বানাবে।

অতঃপর আলেম, তালেবে ইলম ও জনতার দিকে লক্ষ্য করে শাহাদত আঙ্গুলী উর্ধ্বে তুলে বললেন, আপনাদেরকে আমি একটা অসিয়ত করছি- "আপনারা এক আল্লাহর উপর ভরসা করবেন এবং পূর্ণ এখলাসের সঙ্গে আল্লাহর দ্বীনের খেদমত করে যাবেন।"

অতঃপর তিনি হাত নামালেন এবং সকলকে বললেন, আপনারা সকলে জোহরের নামায পড়ে আসেন এবং মেয়েদের উদ্দেশ্য করে বললেন, সকলে নামায পড়ে আস। আমার নিকট কারো থাকা লাগবে না। তখন হুযুরের মাথা পূর্ব দিকে। হুযুর বললেন, আমার মাথার বালিশ একটু উঁচু করে দাও। অতঃপর তিনি শুয়ে জোহরের নামায পড়লেন। সকলে নামায পড়ে এসে গেল। হুযুর বললেন, আমার মাথাটা একটু ডান দিকে কাত করে দাও এবং সাথে সাথে নিজেই ডান দিকে মুখটা কাত করে নিলেন এবং স্পষ্ট ভাবে পড়তে আরম্ভ করলেন, "আল্লাহুম্মাগ ফিরলী অরহামনী ওয়ালহিকনী বির-রফিকিল আ'লা।" আ'লা শব্দটি বলার সাথে সাথে তাঁর চক্ষু বন্ধ করে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। মৃত্যুর বহু পূর্ব হতেই হুযুর বিভিন্ন নবী আলাইহিস্ সালামগণ মৃত্যুকালে যে দোয়া পড়েছেন ঐসব দোয়া শুনতেন এবং পড়তেন। সবশেষে এই দোয়াটি পড়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। এই দোয়াটিই রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের পূর্বে পড়েছিলেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন।

www.pathagar.com

এমন মানুষ মিলবে না আর

মাওলানা শেখ আজীমুদ্দীন

আমার গ্রামের বাড়ী গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ার অন্তর্গত বাঁশবাড়িয়ায়। এ ধরাধামে আগমনের পূর্বেই আমার আব্বা আম্মা আল্লাহ পাকের কাছে কায়মনোবাক্যে দোয়া করতেন, হে আল্লাহ আমাদেরকে একটি পুত্র সন্তান দান করলে আমরা তাকে তোমার কামেল ওলী হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরীর খেদমতে সোপর্দ করতাম।

কিছু দিনের মধ্যেই দোয়া কবুল হল। আমি দুনিয়াতে এলাম। খুব ধুমধাম করে আমার আকিকা হলো। কিন্তু আল্লাহ পাকের কুদরত মানুষ বুঝতে পারে না। আমার পাঠশালায় যাওয়ার বয়স হলে হঠাৎ করে আব্বাজান দুনিয়া হতে বিদায় নিলেন। আমি চির ইয়াতীম হলাম। হযরত সদর সাহেবের খেদমতে আমাকে সপে দেয়ার সুযোগ তার ভাগ্যে হলো না। অবশ্য এ দায়িত্ব পালন করলেন আমার আম্মাজান। তিনি আমার ভগ্নিপতি ও ফুফাত ভাইকে দিয়ে আমাকে হযরতের খেদমতে উপস্থিত করার ব্যবস্থা করলেন। আমি এই সর্ব প্রথম হুযুরকে দেখলাম। আমার আত্নীয় স্বজনেরা হযরত সদর সাহেবকে আমার আব্বা আম্মার মনের আবেগের কথা জানালেন। হযরত সদর সাহেব আমাকে প্রথম ছবক পড়ালেন এবং দোয়া করলেন এবং বললেন একে প্রথমে প্রাইমারী পড়িয়ে পরে মাদ্রাসায় ভর্তি করবে।

সদর সাহেব হুযুর তখন ঢাকার জামেয়া কুরআনিয়া আরাবিয়ার প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন। মাঝে মাঝে যখন বাড়ীতে আসতেন, তখন আমাদের বাঁশবাড়ীয়া মাদ্রাসার মুহতামিম সাহেবসহ অন্য উস্তাদগণ সদর সাহেব হুযুরের সাথে সাক্ষাত করার জন্য গওহারডাঙ্গা যেতেন। উস্তাদগণ প্রতিবারই আমাকে সাথে নিয়ে যেতেন। তাদেরও সন্তান ছিল, কিন্তু তাদেরকে সাথে না নিলেও আমাকে প্রতিবারই সাথে নিয়ে যেতেন এবং হযরত সদর সাহেব হুযুরের সামনে উপস্থিত করে বলতেন, হুযুর এই ছেলেটির জন্য দোয়া করবেন, এ যেন হক্কানী আলেম হতে পারে। ছেলেটির আব্বা বেঁচে নেই। ও ইয়াতীম, ওর আম্মা নেক মানুষ। আলেম, তালেবে ইল্‌মদের খুব খেদমত করে।

আমার উস্তাদগণ যে স্নেহ ভালবাসা দিয়ে আমাকে লালন করেছেন, একজন নগণ্য ছাত্র তা আসা করতে পারে না। তারা তাদের অকৃত্রিম ভালবাসা ও স্নেহ মমতার আচলে ঘিরে আমাকে লালন করেছেন।

www.pathagar.com

যরত সদর সাহেব হুযুর অসুস্থ হয়ে ঢাকা ছেড়ে দেশে চলে এসেছেন। তখন মিযান বা নাহ্‌বেমীর জামাতে পড়ি। হুযুর তখন ভালো করে চোখে দেখতে না, কথাও কম বলেন। সবাই সাক্ষাত করে দোয়া নিয়ে চলে যেতেন। াহার সময় হুযুর পরিচয় জিজ্ঞেস করতেন। আমার উস্তাদগণ এক এক করে ত করছেন এবং পরিচয়ের জন্য নাম বলছেন। তখন আমিও মুছাফাহা করার বাঁশবাড়ীয়া মাদ্রাসার ছাত্রের পরিচয় দিয়ে নাম বলে চলে যাই। সদর সাহেব তখনই গওহারডাঙ্গা মাদ্রাসার মাওলানা মুজিবুর রহমান সাহেবকে ডেকে ান, ওকে ডাক। ওর মধ্যে কিব্‌র আছে। হুযুর যেভাবে রাগত স্বরে বললেন, আমার শরীরে কম্পন শুরু হলো। আমি ভয়ে ভয়ে হুযুরের সামনে এসে াম। এখন আর হুযুরের সেই ক্রোধান্বিত ভাব নেই। এবার স্নেহের স্বরে কে বললেন, তুমি নাম বললে কেন? তোমার বলা উচিৎ ছিল যে, আমি ামিম সাহেব হুযুরের খাদেম। এখন বল আমি হুযুরের একজন খাদেম। ও বললাম, আমি মুহতামিম সাহেব হুযুরের একজন খাদেম। সদর সাহেব র সেই ধমকের কথা মুহূর্তের তরে ভুলতে পারি না। ছোট বেলায় আমার যে রাগ ছিল তার কারণই ছিল অহংকার এটা। সেই বদ রাগের উৎসই কিব্‌র। া মতই তা ধরা পড়েছে। ঐ ধমক না হলে আমার যে কি অবস্থা হতো হ মা'লুম।

পরের বছর আরও একটি ধমক খেলাম। কিন্তু তাতে ছিল পুরাপুরি স্নেহের । আসরের নামাযের পর সবাই হুযুরের সামনে বসা। হুযুর কথা বার্তা শেষ ছেন। মাগরিবের আযান শুরু হয়েছে। আমি সুযোগের সন্ধানে আছি- হুযুরের বুছি করব। আমার সাথে আমাদের মুহতামিম সাহেব হুযুরের ছেলে আমার নিযাম উদ্দীন ভাইও ছিল। যখন সবাই উঠে গেছেন তখন আমি দ্রুত উঠে সদর সাহেব হুযুরের কদম মোবারকের কাছে হাত রেখেছি। অমনি লাঠি য়ে বললেন, "দৌড়া দৌড়া" নামাযের জন্য যা। মনে পড়ে একবার একাকি াগ মত কাছে বসে কত কথা জিজ্ঞাসা করেছি। আর হুযুর শান্তভাবে জবাব ছেন। জিজ্ঞেস করেছি, হুযুর আপনার শরীর কেমন ? কি খেতে ভাল বাসেন? খেতে ভাল বাসেন কি না ? হুযুর সব কথার উত্তর দিয়েছেন। রাগ করেননি। আফসোস! তখন যদি নিজের ইসলাহের জন্য কিছু জিজ্ঞেস করতাম। বুঝি কি জিজ্ঞেস করলে আজীবন কাজে লাগবে।

আমার উস্তাদ ও মুর্শিদ আমীরে শরীয়ত রাহ্‌বারে তরীকত হযরত ফেজ্জী হুযুরের মুখে শুনেছি :- ১৩৯৯ হিজরী সনের কথা। তখন আমি াসায়ে নূরীয়াতে খেদমত করি। হযরত হাফেজ্জী হুযুর (রহঃ) আসরের

www.pathagar.com

নামাযের পর হুযুরের কামরায় বসে এক মজলিসে কথা প্রসঙ্গে বলেছি
আমাদের সদর সাহেবের হাদীস তাফসীরে খুব মাহারাত ছিল। বাংলাদেশে
সমতূল্য আমি আর কাউকে দেখি না। তাই আমি সব সময় তাঁর সাথে রয়েছি

এ কথাটি তাঁকে আরও অনেকবার বলতে শুনেছি। এক মলজিসে হা
হুযুর বলেছিলেন, আমাদের সদর সাহেবের আ'দত ছিল সব মুদার্‌রিসীনকে
আসরের নামাযের পর বসতেন এবং যার মধ্যে যে কমি-কোতাহি আছে
সম্পর্কে খোলাখুলি আলোচনা করতেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল অনেক উঁচু। কিন্তু
কিছু লোক বিশেষ করে যার কমি কোতাহি বেশী ধরা পড়ত সে লো
প্রোপাগান্ডা শুরু করল। আমি বললাম- আপনি তো ইসলাহের নিয়তে ক
কিন্তু এটা এফসাদের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সত্যিই সেই লোকটি প্রোপাগান্ডা
সদর সাহেবসহ আমাদেরকে বের করে ছাড়লো।

২৬/১২/১৩৯৯ হিজরী মাদ্রাসায়ে নূরীয়ার হুযুরের কামরায় আসরের নাম
পর এক মজলিসে হাফেজ্জী হুযুর বলেছিলেন যে, আমি এক রমযানে থানা ভ
পাশেই এক মসজিদে খত্‌মে তারাবীহ পড়াতাম। সদর সাহেবও ঐ মস
নামায পড়তেন। তিনি আমাকে আরো বেশী করে পড়তে বললেন,
একাধিকবার খতম হয়। আমিও তাঁর কথা মতো বেশী বেশী পড়তে
করলাম। কিন্তু মুসল্লিরা থানভী (রহঃ) কাছে আমার নামে শেকায়েত করল
আমি বেশী করে পড়ার কারণে তাদের কষ্ট হয়। তখন থানভী (রহঃ) আ
ডেকে কারণ জিজ্ঞেস করলেন। আমি বললাম, শামছুল হক সাহেব আ
বলেছেন বেশী বেশী করে পড়তে। হযরত থানভী (রহঃ) আমাদের ইসল
জন্য হুকুম করলেন। যাও কবরস্তানে যেয়ে পাঁচ/দশ পারা করে কুরআন
হুযুরের নির্দেশে সেই অরণ্য-জঙ্গলে যেয়ে পড়তে শুরু করলাম। পরে পী
আম্মার সুপারিশে আমাদেরকে ডেকে আনলেন। অবশ্য হাকিমুল উম্মত মুজা
মিল্লাত আমাদেরকে এই নির্জনে পাঠিয়ে বেখবর ছিলেন না। আমাদের হেফায
জন্য অন্য লোক পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। পরে সেটা বুঝতে পেরে ছিলাম।

ইখলাস ঃ

হাফেজ্জী হুযুরের সুযোগ্য পুত্র হযরত মাওলানা হামীদুল্লাহ সাহেব (
ভাই) ৮/৪/১৪০৩ হিজরীতে বলেছিলেন, তৎকালীন পাকিস্তানের বিখ্যাত হা
বিশারদ হযরত মাওলানা ইউসুফ বিন্‌নূরী একবার বলেছিলেন- বাংলাদে
আলিমদের এখলাস এক পাল্লায় রাখলে আর মাওলানা শামছুল হক ফরিদ
(রহঃ)-এর এখলাস এক পাল্লায় রাখলে মাওলানা শামছুল হক সাহে
এখলাসের পাল্লা ভারী হবে।

www.pathagar.com

ৰ উম্মত ঃ

দর সাহেব ছিলেন একজন মানব দরদী বুযুর্গ। সুশিক্ষা বর্জিত পথহারা ম জাতির প্রতি তাঁর কত যে দরদ ছিল তা বর্ণনাতীত। তিনি চেয়েছিলেন ায় শিক্ষিত একটি সুন্দর সুশৃঙ্খল আদর্শ সমাজ গড়তে। যে সমাজ হবে র্ঁ কলহ মুক্ত। যেখানে থাকবে না হিংসা, বিদ্বেষ, মারামারি, কাটাকাটি, ানি, ঝগড়া-বিবাদ। এই মহান উদ্দেশ্যে তিনি উলামা সমাজকে সংঘবদ্ধ জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। এর জন্য চেয়েছিলেন আত্মত্যাগী একটি দল প্রস্তুত হোক। এটা ছিল তাঁর একান্ত কামনা ও সাধনা। কিন্তু উলামা জর পক্ষ থেকে তেমন সাড়া পান নি। বরং বাধার সম্মুখীন হয়েছেন অনেক। হাফেজ্জী হুযুর (রহঃ) যখন আন্দোলনে নেমে ছিলেন, তখন মাদ্রাসায়ে র মসজিদে মিম্বরে বসে একবার হযরত হাফেজ্জী হুযুর (রহঃ) স্বীয় ডান বারা ডান গালে চাপড় মেরে বলেছিলেন "কী যে ভুল করেছি ! যখন সদর র কাজের জন্য সবাইকে ডাক দিয়েছিলেন তখন আমি বাধা দিয়েছিলাম। হায় সাস ! যদি তখন তাঁর সহযোগিতা করতাম!"

ঠিক এমনি ভাবে গওহারডাঙ্গা মাদ্রাসার স্বনাম ধন্য মুহতামিম হযরত ানা আব্দুল আজিজ সাহেব (রহঃ) আসরের নামাযের পর হাঁটতে হাঁটতে কে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, সদর সাহেব (রহঃ) যখন আন্দোলনের ডাক ছিলেন তখন আমি কঠোর ভাবে বাধা দিয়েছিলাম।

মানব দরদী সমাজ সেবী মুজাহিদে আযম ফরিদপুরী (রহঃ) যখন শয্যাশায়ী দেশ ও জাতির কল্যাণের চিন্তায় পাগলপারা হয়ে গিয়েছিলেন। হুযুরের আবেগ ও বেদনা মাষ্টার আব্দুল হক সাহেব যেভাবে ব্যক্ত করতেন তাতে হতো যেন তিনিই পাগল হয়ে যাবেন। তিনি পাগলের মত হয়ে বলতেন, আয় হুযুরের কাছে- আত্মসমর্পণ কর। হুযুর দেখে যেতে চান দ্বীন-ধর্ম, দেশ তির কল্যাণের জন্য একটি জামাত তৈরী হয়েছে। হুযুরের মনে বড় ব্যথা, বাঁচবেন না। দেশ ও জাতির দরদ নিয়ে চির বিদায় নিবেন। মাষ্টার সাহেব র মত ছাত্রদের হাত ধরেও টেনেছিলেন। কিন্তু আমরা তখন ছাত্র মানুষ কি পারি ? মাষ্টার আব্দুল হক সাহেবের সেই ব্যথাতুর-পাগল পারা অবস্থার ভুলতে পারি না। সেই দৃশ্যটা যখনই স্মৃতিপটে ভেসে উঠে তখন ভারাক্রান্ত শ্রুসিক্ত হয়ে পড়ি। হায় আজ যদি সেই রাহনুমা মুজাদ্দিদকে পেতাম তার লে জীবন উৎসর্গ করতাম নির্দ্বিধায়, যেটা আমার আব্বা ও আম্মা ছিলেনও বটে। আম্মা একদিন বলেছিলেন- বাবা তোমার কামাই খেতে চাই মি মানুষের মত মানুষ হও এটাই চাই। একমাত্র সদর সাহেব হুযুরের দিকে

www.pathagar.com

তাকিয়ে আম্মা কথাটি বলেছিলেন। আম্মার মুখে শুনেছিলাম [illegible] সাহেব
যখন ভারত থেকে ফিরে আসেন তখন তাঁর কোন এক উস্ত[illegible]লছিলেন ব
জমিনে একটি ইলমের জাহাজ পাঠিয়ে দিলাম।

শুনেছি তাহাজ্জুদ নামাযের পর সদর সাহেব হুযুর [illegible] মুহাম্মদীর কল
জন্য শিশুর মত ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদতেন। সমাজের [illegible] তাঁর যে কত দরদ
তা এ সব ঘটনা থেকে অনুমিত হয়।

গওহারডাঙ্গা মাদ্রাসার স্বনামধন্য মুহাদ্দিস[illegible]রত মাওলানা আব্দুর
সাহেবের মুখে শুনেছি, তৎকালীন পশ্চিম পা[illegible]নের বিখ্যাত আলেম
বিশারদ হযরত মাওলানা ইউসুফ বিন্নূরী স[illegible]ব বলতেন, তোমাদের মা
শামছুল হক সাহেবের মধ্যে দরদে উম্মত[illegible]লেব। হুযুর ঐ মজলিসে
বলেছেন যে, আমি ফারেগ হওয়ার পর মুস্ত[illegible]জ মাদ্রাসায় পড়াতে শুরু কর
কিন্তু বছর শেষ হতে না হতেই দারুণ [illegible] আগ্রহ সৃষ্টি হল পাকিস্তান
তাখাস্সুস্ ফিল হাদীস করার। আব্বাও [illegible]লেন, আমি বেঁচে থাকতে যা
শিখে নাও। পরে হয়ত সুযোগ পাবে না। [illegible]ত সদর সাহেব হুযুরের কাছে
বাসনা ব্যক্ত করলাম। ঘটনাক্রমে ঐ [illegible]নেই পাকিস্তানের প্রখ্যাত মু
হযরত মাওলানা ইউসুফ বিন্নূরী সাহে[illegible]কা আগমণ করলেন। আমাকে
কিছু করতে হল না। সদর সাহেব হুযু[illegible]জেই বিন্নূরী সাহেবের সাথে
করে সব ব্যবস্থা করলেন।

সদর সাহেব থানভী (রহঃ)এর খলী[illegible]লেন

হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরি[illegible] (রহঃ) হযরত থানভী (রহঃ
খেলাফত পেয়েছিলেন কিন্তু জীবনভর [illegible] রাখেন। এবং থানভী (রহ
নিকটও আবেদন করেছিলেন যে, শুধু আ[illegible] মধ্যে আর আমার মধ্যেই থ
আর কেউ জানবে না। হযরত থানভী (রহ[illegible]যখন হযরত সদর সাহেব (রহ
খেলাফত দেন তখন হযরত থানভী (রহঃ)[illegible]লেছিলেন, শামছুল হক! দেশে
আমার যে কাজ তুমিও সেই এরশাদ ও হে[illegible]য়তের কাজ করিও। আমি তো
ইজাজত দিলাম কিন্তু হযরত সদর সাহে[illegible]রহঃ) চেয়েছিলেন নিজেকে
গোপন রাখতে। তাই হযরত থানভীর (র[illegible] খেদমতে অত্যন্ত বিনয়-বিনম্র
আবেদন করলেন, হযরত! এতবড় আমান[illegible]আমাকে দিবেন না। এবং এ
যাতে না হয় সেই জন্য সনির্বন্ধ আবেদ[illegible]করলেন। হযরত থানভী তা
করলেন এবং খোলাফার তালিকার মধ্যে[illegible]যরত সদর সাহেবের নাম
করলেন না। কিন্তু হযরত থানভীর (রহঃ) [illegible] থেকে গেল এক দরদ। তা

www.pathagar.com

শামছুল হকের নাম উল্লেখ করে না যেতে পারায় তাই তিনি মৃত্যুর পূর্বে আর একবার উল্লেখ করে বললেন, শামছুল হক! তুমি বুঝলে না। আমার খোলাফাদের ফেহরস্তে তোমার নাম উল্লেখ করে যেতে পারলাম না। আমার মনে থেকে গেল আফসোস। হযরত সদর সাহেব বললেন, হযরত! আপনার মধ্যে আর আমার মধ্যে বিষয়টি গোপন থাকুক এটাই আমি চাই। হযরত থানভী (রহঃ) বললেন, ঠিক আছে যখন এশায়াতের সুযোগ আর থাকল না তখন তুমি আমার এই রুমাল আর আছকান নিয়ে যাও তোমাকে দিলাম এই বিশেষ উপহার, এটাই রেখে গেলাম প্রমাণ।

সদর সাহেব (রহঃ) হযরত যা'ফর আহমদ উসমানীর খলীফা ছিলেনঃ

হযরত থানভী (রহঃ) প্রথম বার খেলাফত দেওয়ার পর হযরত সদর সাহেব যখন নিজেকে গোপনই রাখতে চাইলেন, তখন হযরত থানভী(রহঃ) তাঁর প্রিয় খলীফা যা'ফর আহমদ উসমানীকে ডেকে বললেন, শামছুল হক তো বুঝল না। সে কেবল নিজেকে গোপনই রাখতে চায়। তুমি তাঁকে খেলাফত দিয়ে দাও। হযরত যা'ফর আহমদ উসমানী বলেন আমি হযরত থানভীর (রহঃ) পক্ষ হতে তোমাকে খেলাফত দিলাম। তুমি কোন মতে অস্বীকার করো না। এবার হযরত সদর সাহেব গ্রহণ করলেন।

হযরত সদর সাহেব (রহঃ) তাঁর গোপন রহস্যটি আরেক ব্যক্তির নিকট প্রকাশ করেছিলেন। তিনি হলেন হযরত উসমানী (রহঃ)। হযরত উসমানী (রহঃ) সদর সাহেবের ইন্তেকালের পর অনেকের কাছে উল্লেখ করেছেন যে, থানভী (রহঃ) সদর সাহেবকে খেলাফত দিয়েছেন। কিন্তু সে তা গোপন রেখেছিল এবং আমার কাছে প্রকাশ করেও গোপন রাখার জন্য অনুরোধ করেছিল। জনৈক ব্যক্তি হযরত উসমানীর কাছে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, থানভী (রহঃ) সদর সাহেবকে খেলাফত দেন নাই কেন? তখন উসমানী সাহেব বলেছিলেন, থানভী (রহঃ) তো মাওলানাকে খেলাফত দিয়েছেন কিন্তু কেউ জানে না। তিনি নিজেকে গোপন রাখতেই ভালবেসেছিলেন তাই তার জীবদ্দশায় আমরাও কারো কাছে প্রকাশ করি নাই।

মাওলানা ফজলুল হক আমিনীকে একবার সদর সাহেব হুযুর বলেছিলেন, ফজলু! সারা জীবন একটি জিনিস গোপন রেখে ভুলই করেছি। একথার একটি ইঙ্গিতও ছিল সেই গোপন রহস্য- হযরত থানভীর (রহঃ) খেলাফতের দিকে।

হযরত মাওলানা আব্দুর রউফ সাহেবের কাছে শুনেছি তিনি স্বয়ং হযরত সদর সাহেব হুযুরের কাছে শুনেছেন যে, হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দেদে মিল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ)-এর ইন্তেকালের পর এক বুযুর্গ (হযরত

www.pathagar.com

আশরাফ আলী থানভী (রহঃ)-এর খলিফা) হযরত সদর সাহেব হুযুরকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি খেলাফত পেয়েছ ? সদর সাহেব হুযুর তখন চুপ করে ছিলেন, তখন ঐ বুযুর্গ বললেন, তুমি নিজকে অনেক গোপন করে রেখেছ। আমি তোমাকে খেলাফত দিলাম। এখন থেকে তুমি খেদমত করবা। যারা তোমার কাছে আসবে তাদের সোহবত দিবে ও মুরীদ করবে। সদর সাহেব হুযুর তখন ঐ বুযুর্গের নাম নেন নাই বটে, তবে ইঙ্গিত-ইশারায় বুঝা গেল যে তিনি হযরত মাওলানা আব্দুল গণী ফুলপুরী (রহঃ) হবেন।

গওহারডাঙ্গা মাদ্রাসার হিফয বিভাগের বড় হুযুর হাফেয আব্দুল হক সাহেব ১৪০৪ হিজরীর শাবান মাসে কামরাঙ্গির চর মাদ্রাসায় আমাদের কামরায় বসে বলেছিলেন যে, হযরত সদর সাহেবের সামনে কেউ হযরত থানভীর (রহঃ) নাম নিলে বা নিজে নিলে বার বার তাঁর নাম মুখে উচ্চারণ করতেন (থানভী, থানভী) আর মাটিতে নুইয়ে পড়তেন। আমি একবার নির্জনে সদর সাহেব হুযুরকে জিজ্ঞেস করলাম, থানভীর নাম আসলে আপনি এইরূপ করেন কেন? হযরত সদর সাহেব বললেন, তাঁকে তোমরা চেন না, তিনি যে কত উর্ধ্বের তা আমি জানি। আমি বললাম, থানভী সাহেব (রহঃ) আপনাকে খেলাফত দেন নাই কেন ? তখন উত্তরে তিনি বললেন থানভী সাহেব (রহঃ) আমাকে খেলাফত দিয়েছিলেন। কিন্তু আমি তখন বারবার কেঁদে কেঁদে বলেছিলাম যে, হুযুর আপনি আমাকে এতবড় আমানত দিবেন না। এই আমানত আমি অধম সংরক্ষণ করতে পারবো না। তখন থানভী (রহঃ) আর কিছু বলেন নাই।

পরবর্তীতে যখন থানভী (রহঃ) অসুস্থ হয়ে পড়েন আমি বাংলাদেশ থেকে ছুটে যাই এবং বেশ কিছু দিন খানকাহে অবস্থান করি। তখন হযরত মাওলানা যাফর আহমাদ উসমানী সাহেবের সামনে থানভী (রহঃ) বলেছিলেন- শামছুল হক ! আমি চেয়েছিলাম আমার খলিফাদের নামের তালিকায় তোমার নাম থাকবে, কিন্তু তুমি সুযোগ দিলে না। এই বলে আবার ইযাযত দিয়ে থানভী (রহঃ) এর ব্যবহৃত একটি পাগড়ী সদর সাহেব হুযুরের হাতে দিয়ে বললেন, এটি আলামত স্বরূপ নিয়ে যাও। সদর সাহেব হুযুর তখন হযরত যাফর আহমদ উসমানীকে অনুরোধ করে বললেন, তিনি যেন কারো কাছে না বলেন।

সদর সাহেব কুতুবুল আকতাব ছিলেন ঃ

আশুতীয়ার মাওলানা নূরুল হক সাহেব এক মজলিসে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, হুযুর! সুলতানুল আওলিয়াতো বহু বড় উপাধী অথচ সুলতান তো সাধারণ মানুষই হইতে দেখা যায়। হুযুর জবাবে বললেন, ওরে আমার কপাল রে কপাল।

www.pathagar.com

আরে বোকা এরা তো দুনিয়ার সুলতান। অতঃপর প্রকৃত সুলতানের পরিচয় দিতে গিয়ে হযরত ইব্রাহীম ইবনে আদহামের নাম উল্লেখ করে তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করলেন। এর পর জিজ্ঞাসা করা হল, হুযুর এই যামানার কুতুব কে? হুযুর বললেন, ঐকথা জিজ্ঞাসা করো না। ঐ কথা জিজ্ঞাসা করো না। উপস্থিত সকলেই বুঝলেন, হুযুর নিজেই এই যামানার কুতুব।

হাফেয সাহেব বলেছেন, একদিন আমি আর মাষ্টার হক সাহেব হুযুরের কাছে বসে আছি। এমন সময় সাধারণ এক ব্যক্তি এসে হুযুরের পাশের (বিশেষ ব্যক্তিদের জন্য রাখা) চেয়ারে বসে পড়ল। হুযুর মাথা নিচু করে বসে থাকলেন। আর সে লোকটিও মাথা নিচু করে বসে থাকল। কারো কোন কথা নাই। কিছুক্ষণ পর লোকটি বলল, হুযুর! আমি যাই। হুযুর সম্মতি জানালেন। এবং মাষ্টার আব্দুল হক সাহেবকে বললেন, লোকটির মেহমান দারী করে যশোরের টিকিট করে দাও। হাফেয সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, হুযুর লোকটির পরিচয় কি? হুযুর বললেন, ইনি যশোরের কুতুব। এভাবে বিভিন্ন জায়গার কুতুব কুতুবুল আকতাব হযরত সদর সাহেবের খেদমতে উপস্থিত হতেন।

হযরত সদর সাহেব (রহঃ)এর ধী-শক্তি ঃ

হযরত সদর সাহেব (রহঃ)-এর আজীবন সাথী যুগ বরেণ্য বুযুর্গ হযরত হাফেজ্জী হুযুর (রহঃ)-এর মুখে শুনেছি, একবার তিনি কথা প্রসংগে সদর সাহেব (রহঃ)-এর স্মরণ শক্তি সম্পর্কে বলেছিলেন, এক রমজান মাসে আমাদের সদর সাহেব পুরা ফাতহুল ক্বাদীর মোতা'আলা করেন এবং তার পর থেকে যে কোন মাসয়ালা পৃষ্ঠা নম্বর উল্লেখ করে বলতেন। প্রকাশ থাকে যে, ফাতহুল ক্বাদীর নয় জিলদ বিশিষ্ট ইলমে ফিকহ্ বা ইসলামী আইন শাস্ত্রের একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থ।

আমার যতদূর মনে পড়ে চকবাজার জামে মসজিদে একবার সদর সাহের (রহঃ)-এর জীবনী আলোচনার মজলিশে হযরত শাইখুল হাদীস সাহেব বলেছিলেন, তফসীরে হক্কানী লেখা কালীন সময়ে কখনও কখনও সদর সাহেব কোন বড় একখানা কিতাবের নাম উল্লেখ করে বলতেন দেখ তো এই কথাটা ওমুক কিতাবের ওমুক জায়গায় আছে কি না? আছে মনে করেই তো আমি আনলাম।

শাইখুল হাদীস সাহেব বলেন, সদর সাহেব হুযুর যে কিতাবের যে পৃষ্ঠা নং উল্লেখ করে দেখার জন্য বলেন আমি সে কিতাবের সেই পৃষ্ঠায় হুবহু ঐ রকমই পেতাম, যেমনটি হুযুর লিখেছেন। অথচ হুযুর না দেখেই লিখতেন। হযরত সদর সাহেব অনেক পূর্বে দেখা বিষয় বস্তু বা শোনা কথা অবিকল মনে রাখতে পারতেন।

www.pathagar.com

আমার এক প্রবীণ উস্তাদের মুখে শুনেছি, তিনি বলেছিলেন সদর সাহেব (রহঃ) প্রতি রমজান মাসে পূর্ণ মেশকাত শরীফ মোতালাআ করতেন।

মোতালাআর দৃষ্টিভঙ্গী ঃ

একবার মোতালাআ করতেন হাদীস সমূহের আলোচ্য বিষয় তাঁর ইয়াদ আছে কি না? আরেকবার মোতালাআ করতেন হাদীস সমূহের অর্থ ও উদ্দেশ্য সঠিক ভাবে বুঝেছেন কি না? আবার মোতালাআ করে দেখতেন, হাদীস সমূহের উপর তাঁর পুরোপুরি আমল আছে কি না?

ফানাফিল্লাহ্র মাকাম ঃ

হযরত সদর সাহেব (রহঃ) শেষ রাতে যখন আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন হতেন, তখন আল্লাহর মাঝে নিজেকে হারিয়ে ফেলতেন। তার অস্তিত্ব পর্যন্ত পাল্টিয়ে যেত। ঐ সময়ে তার হুজরায় কারো প্রবেশ করা কঠোর নিষেধ ছিল। একদিন কি এক জরুরতে পড়ে তার শাগরিদে রশীদ মাওলানা সালাহুদ্দীন সাহেব তার হুজরা শরীফের দরজার একপাট খুলে চাইতেই অমনি বেহুশ হয়ে ধড়াস করে মাটিতে পড়ে গেলেন। তিনি কি দেখে যে নিজেকে স্থির রাখতে পারলেন না তা বুঝানোর মত ভাষা তাঁর নাই। তিনি বলেছেন সদর সাহেবকে কি অবস্থায় যে দেখলাম তা বুঝানোর ভাষা আমার নাই। তাঁর চোখ-কান, নাক-মুখ দিয়ে যেন শুধু নূর ঢুকছে। তাঁর দেহের উপরিভাগ চেনা যাচ্ছে না। সে আজীব অবস্থা দেখে আমি সঙ্গে সঙ্গেই চেতনা হারিয়ে ফেললাম। একটু ভালকরে দেখবার ও কল্পনা করার সুযোগও আমার থাকল না।

বড় হাফেয সাহেবের কাছে শোনা তাঁর তিনটি গুণ ঃ

- কারো প্রতি বদগুমানি করতেন না।
- কারো ৯৯টি দোষ আর ১টি মাত্র গুণ থাকলেও, তিনি সেই একটি গুণেরই চর্চা করতেন। কারো দোষ কোন দিন দেখতেন না, বলতেন না।
- নিজের দেশ গ্রামের ভাষায়ই কথা বলতেন। এ ছিল তার দেশ প্রেমের পরিচয়।

খোদার রহমতের পানিতে দাঁড়ি-মুখ ভিজে গেল ঃ

[বরিশালের জনাব সিরাজুল হক চৌধুরী সাহেবের স্বচক্ষে দেখা ঘটনা]

তিনি বলেন, একবার বরিশাল চকবাজার মসজিদে আসরের নামাজের পর

www.pathagar.com

হযরত সদর সাহেব (রহঃ) ওযিফায় মগ্ন ছিলেন মসজিদের দক্ষিণ কোণে। আর আমি মসজিদের উত্তর কোণে বসে তাঁর দিকে তাকিয়ে ছিলাম। দেখলাম ওযিফা থেকে ফারেগ হয়ে তিনি দু'হাত উঠায়ে মোনাজাত শুরু করলেন। স্বচক্ষে দেখলাম যেন এক খন্ড মেঘ নেমে তাঁর শিরোদেশ ও মুখমন্ডল ভিজিয়ে দিল। এমনকি তাঁর দাঁড়ি বেয়ে পানিও পড়তে দেখলাম।

জ্বিন শাগরেদ ঃ

একবার গোপালগঞ্জ থেকে আসতে পথে বাশুড়িয়া পর্যন্ত আসলে হুযুর মাঝিকে বললেন আমাকে এই খানে নামিয়ে দাও। আমি হেঁটে যাব। তখন রাত হয়ে গিয়েছিল। (সেখান থেকে একাকী গওহারডাঙ্গা পর্যন্ত হেঁটে যাওয়া বাহ্যিক দৃষ্টিতে ভয়ের ব্যাপার ছিল) মাঝি বলল কি করে একা যাবেন? হুযুর বললেন, হ্যাঁ পারব, আমাকে নামিয়ে দাও। মাঝি বাধ্য হয়ে নামিয়ে দিল কিন্তু তার মন মানতেছিল না। তাই সেও নৌকা বেঁধে হুযুরের সঙ্গে রওয়ানা হল। তখন মাঠের মধ্যে হুযুর বেশ কিছু দূর চলে গেছেন। মাঝি মাঠে নেমে দেখে হুযুরের সাথে সাথে আরো অনেক লোক চলছে এবং বিভিন্ন ধরনের মাসলা মাসায়েল জিজ্ঞেস করছে। মাঝি নিকটে পৌঁছিয়া যখন কাশি দিল, সঙ্গে সঙ্গে লোক গুলো অদৃশ্য হয়ে গেল। রহস্য জিজ্ঞেস করায় হুযুর জওয়াব দিলেন, জ্বিনের বাদশা এসেছিল নৌকায় থাকতে। তিনি বললেন, হুযুর আমাদের কিছু মাসলা জানা দরকার আপনি এখান থেকে হেঁটে গেলে আমরা সাথে সাথে বাড়িতে পৌঁছে দিতাম।

তাবলীগ জামাআত ঃ

১৩৯৪ হিজরী সনের কথা, আমরা তখন জামিয়া কুরআনীয়া লালবাগ মাদ্রাসায় দাওরায়ে হাদীস পড়ি। আমার পরম শ্রদ্ধেয় উস্তাদ হযরত মাওলানা আব্দুল মাজীদ ঢাকুবী হুযুর (রহঃ) আমাদের মুসলিম শরীফের ঘন্টায় কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, আমি এবং তাবলীগ জামাআতের আমীর মাওলানা আব্দুল আজীজ সাহেব খুলনার উদয়পুর মাদ্রাসায় পড়াতাম। সেখান থেকে সদর সাহেব হুযুর আমাকে গওহারডাঙ্গা মাদ্রাসায় নিয়ে আসলেন। যেহেতু আমার মধ্যে কিছুটা ইলমী যওক ছিল, আর মাওলানা আব্দুল আজীজ সাহেবের মধ্যে তাবলীগী জযবা ছিল, তাই তাকে দিল্লীর নিজাম উদ্দিন ও মেওয়াতে হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেবের কাছে এই বলে পাঠিয়ে দিলেন যে, যাও মাওলানার সান্নিধ্যে থেকে তাবলীগের কাজটি পুরাপুরি জেনে আসো এবং বাংলাদেশে ব্যাপক ভাবে চালু কর। তার ফলশ্রুতিতে আজ বাংলার জমীনে তাবলীগের এত ব্যাপকতা। ঢাকার কাকরাইল

www.pathagar.com

মারকাজে হুযুর নিয়মিত আসা যাওয়া করতেন। একারণেই মারকাজের রওনক বেড়ে যায় এবং মারকাজ কুতুবখানায় যে সব দুষ্প্রাপ্য কিতাব আছে তা সদর সাহেব হুযুরের প্রচেষ্টার ফল।

"নাদীয়াতুল কুরআন" প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা ঃ

আমীরে শরীয়ত রাহবরে তরীকত আমার উস্তাদ ও মুরশিদ হযরত হাফেজ্জী হুযুরের একান্ত ইচ্ছায় মাদ্রাসায়ে নূরীয়ায় "তারবিয়াতুল মুদার্‌রিসীন" বা শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ১৪০০ হিজরীর ২৭ শে শাবান উদ্বোধনী জলসায় হযরত মাওলানা আব্দুল ওহাব সাহেব বলেছিলেন, অনেক দিন ধরে চিন্তা করছিলাম যে, কি পদ্ধতি অবলম্বন করলে স্বল্প সময়ের মধ্যে সব শ্রেণীর লোকদের সহীহ শুদ্ধভাবে পবিত্র কুরআনুল কারীম শিখানো যায়। অনেক গবেষনার পর মোটামুটি একটি রূপরেখা তৈরী করে সদর সাহেব হুযুরের কাছে গেলাম এবং আমার মনের কথাটি বললাম। সদর সাহেব শুনে অত্যন্ত খুশি হলেন এবং বললেন যে, আমিও অনেক দিন ধরে এই ধরণের চিন্তা করছিলাম। নিয়ম পদ্ধতি সম্বলিত একটি পান্ডুলিপিও তৈরী করে রেখেছি। কিন্তু কাকে দিয়ে শুরু করবো তাই ভাবছিলাম। তোমার ভিতর এই ফিকির দেখে আমি খুব আনন্দিত হলাম। আমার এই পান্ডুলিপিটি নিয়ে যাও, দেখ এর দ্বারা কোন ফায়দা হয় কি না। হযরত মাওলানা বলেন আমি তো খুশিতে আত্মহারা। হুযুরের দেওয়া পান্ডুলিপিকে আমি আমার জন্য একটি "বর" (দৈবপ্রাপ্ত বস্তু) মনে করলাম।

নুরাণী তা'লীমুল কুরআন প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা ঃ

নুরাণী তা'লীমুল কুরআন প্রশিক্ষণের প্রবক্তা হযরত মাওলানা বেলায়েত সাহেব একবার সদর সাহেব হুযুরের কথা বলে কেঁদে ফেলেন এবং বলেন ছোট বেলায় আমার আব্বা মারা যান। হযরত সদর সাহেব হুযুর আমাকে পিতার মত স্নেহ-মমতা দিয়ে আমাকে লালন-পালন করেছেন। প্রয়োজনীয় খরচ বহন করেছেন। দাওরায়ে হাদীস ফারেগ হওয়ার পর হুযুর বললেন, যাও এখন খিদমত কর। আমি বললাম কোথায় যাবো? কি খেদমত করবো? হুযুর বুঝতে পারলেন আমার মনের ইচ্ছা। আমাকে গওহারডাঙ্গা মাদ্রাসায় খেদমত করার সুযোগ দিলেন। হুযুরের পরামর্শ মতে ইবতেদায়ী কিতাব গুলো নতুন পদ্ধতিতে পড়াতে শুরু করলাম এবং তাতে আশাতীত ফায়দা পাওয়া গেল। ইবতেদায়ী কিতাবগুলো নতুন পদ্ধতিতে পড়ানোর কারণে অল্প সময়ের মধ্যে ছাত্ররা কিতাব শেষ করতে এবং পূর্ণ যোগ্যতা হাসেল করতে সক্ষম হল। আমার ঐ সময়ের ছাত্রই

www.pathagar.com

গওহারডাঙ্গা মাদ্রাসার উস্তাদ মাওলানা আব্দুল হাকীম, মাওলানা হেলাল উদ্দিন সাহেব, মাওলানা তাহের উদ্দিন সাহেব প্রমুখ। পরবর্তীতে সদর সাহেব হুযুরের পরামর্শে "নুরাণী তা'লীমুল কুরআন প্রশিক্ষণ" ব্যবস্থা চালু করি। তারই দিক নির্দেশনার ফলে আল্লাহ্ তা'য়ালা এ ব্যাপক খেদমত চালু রেখেছেন। আজ শুধু বাংলাদেশেই নয়, পাকিস্তান, ভারত ও লন্ডনসহ বিভিন্ন দেশে এ প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা চালু হয়েছে।

তারবিয়াতুল মুদার্‌রিসীন ঃ

১৪০০ হিজরীর ২৭শে শাবান মাদ্রাসায়ে নূরীয়ায় তারবিয়াতুল মুদার্‌রিসীনের উদ্বোধনী সভায় হযরত মাওলানা সালাহুদ্দিন সাহেব (রহঃ) বলেছিলেন, হযরত সদর সাহেব হুযুর আজ আমাদের মাঝে নেই। তিনিই সর্ব প্রথম এ প্রশিক্ষণের চিন্তা করেন এবং মক্তব শ্রেণী থেকে নিয়ে সর্বোচ্চ জামাআত দাওরায়ে হাদীস পর্যন্ত সব জামাআতের কিতাব সমূহের তরযে তা'লীম বা শিক্ষাদান পদ্ধতি, মেকদারে আসবাক অর্থাৎ সবকের পরিমাণ, মে'য়ারে ইস্তেদাদ অর্থাৎ যোগ্যতার মাপকাঠি সবকিছু ঠিক করেন। অর্থাৎ কোন্ কিতাব কোন্ পদ্ধতিতে কি পরিমাণ পড়ালে কি যোগ্যতা হাসিল হবে- এ সম্পর্কে আমাকে বিস্তারিত ভাবে অবহিত করেন। আমি সেগুলো সাথে সাথে লিপিবদ্ধ করেছিলাম কিন্তু ১৯৭০ এর আন্দোলনের সময় আমার সেই সব খাতাপত্র নিখোঁজ হয়ে যায়। আজ পর্যন্ত তার সন্ধান পাওয়া গেলনা।

সাহিত্য সেবায় যুগ সংস্কার ঃ

পনের যোল বছর পূর্বের কথা, চকবাজার শাহী মসজিদে হযরত সদর সাহেব হুযুরের জীবনী আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। ঐ মজলিসে শাইখুল হাদীস মাওলানা আজিজুল হক সাহেব এক পর্যায়ে বলেছিলেন, সদর সাহেব হুযুর যামানার মুজাদ্দিদ ছিলেন। সকলে সার্বিক মুজাদ্দিদ মেনে না নিলেও বিশেষ ক্ষেত্রে মুজাদ্দিদ ছিলেন এতে সন্দেহের কারণ নাই। বিশেষ করে বাংলাভাষায় ইসলামী কিতাব পত্র প্রণয়ন তারই তাজদীদী পদক্ষেপ। শাইখুল হাদীস সাহেব ঐ দিন আরো বলেছিলেন যে, আমার যে বাংলা বুখারী তাতে অধিকাংশ লেখাই সদর সাহেব হুযুরের। কারণ, হুযুর আমাকে দিয়ে লিখাতেন। আর সংশোধন করাতেন। কয়েকবার আমাকে দিয়ে কপি করিয়েছেন। প্রতিবার অল্প অল্প করে কাটতেন এবং বলতেন আবার কপি করে নিয়ে আস। কপি করতাম আবার কিছু কাটতেন। এভাবে বারবার কপি করাতেন। এতে করে আমার শব্দ আর বেশী থাকতো না।

www.pathagar.com

শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা আব্দুল মান্নান সাহেব (কাশিয়ানী হুযুর) একবার বলেছিলেন, সদর সাহেব হুযুর আমাকে একটি আরবী রেসালা দিয়ে বললেন, আব্দুল মান্নান এটা অনুবাদ করে আমাকে দেখাও। হুযুরের নির্দেশ পালনার্থে আমি অনুবাদ করলাম বটে, কিন্তু এর পূর্বে অনুবাদ সম্পর্কে আমার না কোন অভিজ্ঞতা ছিল, না কোন উৎসাহ ছিল। যা হোক হুযুরের সামনে অনুবাদ কপি পেশ করলাম। হুযুর বললেন, খুব সুন্দর হয়েছে। এরপর কয়েকটি শব্দ কেটে দিয়ে বললেন আবার নতুন করে কপি করে নিয়ে আসো। আমি আবার কপি করলাম। তিনি এবারও কিছু শব্দ পরিবর্তন করে দিয়ে বললেন আবার কপি করে নিয়ে আসো। কাশিয়ানী হুযুর বলেন, এভাবে শুধু আমাকে না, ইসলামী সাহিত্যাঙ্গনে যারাই খেদমত করেছে তাদের অনেকেরই পথ নির্দেশক ছিলেন হযরত সদর সাহেব হুযুর।

শাসন-সোহাগ ঃ

সিঙ্গিপাড়ার হযরত মাওলানা শহিদুল্লাহ সাহেব একবার তার নিজের ঘটনা বলেছিলেন যে, যশোরের মুহাদ্দিস হযরত মাওলানা আবুল হাসান সাহেব গওহারডাঙ্গা মাদ্রাসার মুহাদ্দিস ছিলেন। যে বছর তিনি গওহারডাঙ্গা থেকে চলে যান ঐ বছর আমি নাহবেমীর পড়ি। আমিও হুযুরের সাথে যশোর চলে যাই। কিন্তু ওখানকার আবহাওয়া আমার স্বাস্থ্যসম্মত না হওয়ায় পরবর্তী বছর আমি যশোর থেকে ফিরে আসি এবং গওহারডাঙ্গা মাদ্রাসায় ভর্তি হওয়ার জন্য দরখাস্ত পেশ করি। কিন্তু গওহারডাঙ্গা মাদ্রাসার মুহতামিম সাহেব হুযুর কোন মতেই আমাকে ভর্তি করতে রাযী হলেন না। আমি বিষন্ন মনে বাড়ী ফিরে গেলাম। রাতে আমার ঘুমই হল না।

পরের দিন ফজরের নামায আদায় করে কিছু না খেয়েই আবার মাদ্রাসায় গেলাম, উদ্দেশ্য সদর সাহেব হুযুরকে দিয়ে সুপারিশ করাব। যথা সময় হুযুরকে পেয়েও গেলাম। সাহস করে হুযুরকে সব ঘটনা খুলে বললাম। বলার সময় আমার দু'গন্ড বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। সদর সাহেব হুযুর আমার মাথায় হাত বুলিয়ে আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন তুমি সকালে কিছু খেয়েছ ? আমি বললাম জি না। হুযুর পকেট থেকে ১ টাকা বের করে আমার হাতে দিয়ে বললেন, যাও আগে পেট ভরে নাস্তা খেয়ে এস। তারপর তোমার ভর্তির ব্যবস্থা করা হবে। পেট ভরে নাস্তা খেতে আমার মাত্র ছয় আনা খরচ হল। আমি ফিরে এসে অবশিষ্ট পয়সা হুযুরের সামনে রাখলাম। হুযুর জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কম খেয়ে পয়সা ফিরিয়ে এনেছ নাকি? আমি বললাম, জী না, আমি পেট ভরেই খেয়েছি। সদর

www.pathagar.com

সাহেব হুযুর বরিশালী হুযুরের মাধ্যমে মুহতামিম সাহেব হুযুরকে সালাম পাঠিয়ে উপস্থিত করলেন এবং আমাকে ভর্তি করে নেয়ার জন্য বললেন। মুহতামিম সাহেব হুযুরের পিছনে পিছনে আমিও চললাম। সদর সাহেব হুযুর আমাকে ডাক দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন- তোমার কাছে ভর্তির টাকা আছে ? আমি বললাম নেই। তিনি আমাকে পকেট থেকে পাঁচ টাকা বের করে দিয়ে বললেন, যাও ভর্তি হও। ভর্তি হতে আমার সব টাকা খরচ হল না। আমি হুযুরের সঙ্গে দেখা করে বাকী টাকাগুলো ফেরত দেয়ার জন্য হুযুরের সামনে পেশ করলাম, হুযুর কোন মতে ফেরত নিতে রাযী হলেন না। বললেন, তোমার প্রয়োজনীয় কাজে খরচ করবে।

মাওলানা শহিদুল্লাহ সাহেব আরো বলেছেন, বার্ষিক পরীক্ষা শেষে মাদ্রাসা বন্ধের ঘোষণা হয়েছে। আমি সদর সাহেব হুযুরের সাথে সাক্ষাত করে দু'আ নেয়ার জন্য গেলাম। হুযুর জিজ্ঞেস করলেন, রমযানে কি করবা? আমি বললাম- রোযা, নামায পড়ব, কুরআন শরীফ তিলাওয়াত ঠিকমত করব আর মাছ মারব। হুযুর বললেন, তার চেয়ে ভাল হয় মাদ্রাসার কুতুবখানায় বসে কিতাব মুতালাআ' করবে আর আমাদের বাড়ীর মসজিদে নামায পড়াবে আর আমার ঘরে খাবে। আমি মনে মনে অত্যন্ত খুশি হলাম। আমি পড়াতাম সূরা তারাবীহ। হুযুর পড়তেন মাদ্রাসার মসজিদে খতম তারাবীহ। আমি নামায শেষ করে হুযুরকে নিতে আসতাম। নামাযের শেষে কথাবার্তায় দেরী হলে আমি বলতাম- খানা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে তাড়াতাড়ি চলেন। আমার কথায় হুযুর রাগ করতেন না বরং গুরুত্বই দিতেন। এই ছিল তাঁর ছোটদের প্রতি স্নেহ-ভালবাসা।

মাওলানা শহিদুল্লাহ সাহেবেরই মুখে শুনেছি- যখন তিনি লালবাগ মাদ্রাসায় লেখা-পড়া করেন এ সময় তিনি আর ছোট নন। বড় হয়েছেন মৌলভীর খাতায় নাম উঠেছে। তিনি বলেন, সদর সাহেব হুযুরের বড় ছেলে মাওলানা ওমর সাহেব তখন লালবাগ মাদ্রাসায় হিফজ বিভাগে পড়ে। আমার একটা কলম তার খুব পছন্দ হয়েছে। আমি কলমটি তাকে দিলাম। সদর সহেব হুযুরের ছেলেকে একটি কলম দিতে পেরে আমি মনে মনে গর্বিত। আমি ভাবছি হুযুর জানলে হয়ত খুশীই হবেন। কিন্তু হুযুর ব্যাপারটি জানতে পেরে আমাকে ডাকিয়ে খুব শাসালেন; বললেন, তুমি আমার শত্রু, তুমি আমার আওলাদের শত্রু, তুমি দ্বীনের শত্রু, তুমি আমার আওলাদদের ধ্বংস করতে চাও ? এই ছিল মুজাহিদে আযমের শাসন সোহাগের নিদর্শন।

মাওলানা হাফেয ওমর সহেবের মুখে শুনেছি, তিনি কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে, মাওলানা মওদূদী সম্পর্কে বই লেখার জন্য সবাই যখন আব্বাজীকে অনুরোধ করছিল তখন আব্বাজী বলেছিলেন, আমার ছেলেরই যখন মওদূদীর লোকদের

www.pathagar.com

সাথে সম্পর্ক, তখন আর আমি তার বিরুদ্ধে কি লিখব ? এ সময় হাফেয জাফরের সাথে আমার উঠা-বসা ছিল এবং জামাতে ইসলামের প্রতি আমার দুর্বলতা ছিল। আব্বাজীর এই নারাযীর আসর পড়ল আমার দেহ-মনের উপর। আমি অসুস্থ হয়ে পড়লাম শারীরিক ও মানসিক ভাবে। আমার গায়ে ভীষণ জ্বর। বাঁচব কি না এই পর্যায়ে পৌঁছে গেছি। কিন্তু সাহস করে কেউ আব্বাজীকে একথা বলছে না। একদিন হঠাৎ করে আব্বাজী আম্মাকে বললেন, ওমরকে আমার কাছে নিয়ে এস, ওতো মারা যাবে। আম্মা অনেক কষ্ট করে আমাকে আব্বাজীর কাছে নিয়ে আসলেন। আব্বাজী আমাকে বললেন, তোমার বুক দিয়ে আমার বুকে চাপ দাও। আমি আস্তে করে চাপ দিলাম। আব্বাজী বললেন, জোরে আরো জোরে চাপ দাও। আমি আমার শরীরের সবটুকু শক্তি ব্যয় করে চাপ দিলাম। জ্বর আমার ভাল হয়ে গেল। আমি সুস্থ হয়ে ওঠলাম।

আমার উস্তাদ হযরত মাওলানা আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব (কচুয়ার হুযুর) এর মুখে শুনেছি- একবার কোন একটা শব্দের তাহকীকের জন্য সদর সাহেব হুযুর জনৈক আলিমকে বললেন, লোগাত থেকে শব্দটা তাহকীক করার জন্য। তিনি শব্দটি বের করতে দেরী করছিলেন। কারণ কোন "মাদ্দা" থেকে শব্দটি বের করবে তা তিনি বুঝতে পারছিলেন না। তিনি একবার এদিক একবার ওদিক করে শুধু উল্টাতে পাল্টাতে লাগলেন। হুযুর এ অবস্থা দেখে এক ধমক দিলেন। আর বললেন- লোগাত থেকে শব্দ বের করতে জান না, ছেলেদের কি হক আদায় কর? অথচ একজন সাধারণ লোকের বড় ধরণের ত্রুটিও হুযুর ক্ষমার চোখে দেখতেন।

এমন মহৎ প্রাণের সার্বিক গুণাবলীর আধার মানুষ আর মিলবে না কখনও।

= ০০০ =

www.pathagar.com

হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ) একটি জীবন একটি ইতিহাস

মাওলানা মোস্তফা আজাদ

বন্ধুবর মাওলানা সালমান সাহেব একটি স্মারক গ্রন্থ বের করছেন- বাংলার গৌরব, (আ)লেমকুল শিরোমণি, মুজাহিদে আ'যম হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ)-এর (ঐশ্ব)র্যাঢ্য জীবনের উপর। বিলম্বে হলেও গুরুত্বপূর্ণ এ পদক্ষেপটি সময় উপযোগী এবং প্রশংসনীয়। (পূ)র্বসূরি আকাবিরে উলামায়ে কেরামের কর্মময় জীবনের ইতিহাস-ঐতিহ্য সংরক্ষণ করা আমাদের (জা)তীয় দায়িত্ব। প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ আজ দেশী-বিদেশী ষড়যন্ত্রের আখড়ায় পরিণত (হ)য়েছে। এদেশের সংখ্যা গরিষ্ঠ জনগণ মুসলমানের ঈমান-আকীদা, ধর্ম বিশ্বাস হুমকির (স)ম্মুখীন। ইসলাম বিদ্বেষী অমুসলিমদের হিংস্র থাবায় এদের সর্বগ্রাসী আগ্রাসনের প্লাবনে মুসলিম (জা)তি দিশে হারা। তমসাচ্ছন্ন বাঙ্গালী মুসলমানের জাতীয় জীবনে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে- তা (প)রিপূরণ করা সম্ভব মুজাহিদে আ'যম হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ)-এর মত (অ)সাধারণ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ক্ষণজন্মা মনীষীগণের কর্মময় জীবনের ইতিহাস-ঐতিহ্যের সংরক্ষণ, (মূ)ল্যায়ন এবং অনুসরণের মাধ্যমে। তাই আমি স্মারক গ্রন্থ রচনার এই বলিষ্ঠ কর্মসূচী গ্রহণের (জ)ন্য মাওলানাকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি এবং মহান আল্লাহর নিকট এর কবুলিয়াত ও (স)ফলতার জন্য দোয়া করছি।

হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ) একটি ইতিহাস, এক জিহাদী ব্যক্তিত্বের নাম। যিনি ভারতীয় উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের বীর সেনানী, সলফে সালেহীন, হক্কানী আলেম সম্প্রদায়ের সফল উত্তরসূরি, একজন দেশ প্রেমিক আলেমে-দ্বীন। উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠতম ইসলামী বিদ্যাপিঠ দারুল উলুম দেওবন্দের একজন কৃতিসন্তান। যাঁর পান্ডিত্বের স্বীকৃতি সর্বমহলে এবং যাঁর দ্বীনি খেদমতের সুফল বাংলার ঘরে ঘরে বিদ্যমান।

ঐতিহ্যবাহী দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান লালবাগ জামেয়া কুরআনিয়ায় অধ্যয়নকালে জ্ঞানতাপস এ মহামনীষীর সাহচর্যে কিছুদিন থাকার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। তাকওয়া-পরহেজগারীর মূর্ত প্রতীক, ত্যাগ-তিতিক্ষার জ্বলন্ত আদর্শ, নিষ্ঠাবান এ মহান ওলীকে অত্যন্ত কাছে থেকে ঘনিষ্ঠ ভাবে দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম। তিনি অত্যন্ত কর্মঠ, আত্ম সচেতন এবং অত্যন্ত আত্মমর্যাদাশীল ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। তিনি দয়াশীল ও স্নেহ পরায়ণ ছিলেন। ছাত্রদেরকে তিনি নিজের সন্তানের চাইতেও বেশী ভাল বাসতেন। সংশোধনের জন্য এক্ষুণি যাকে ধমক দিচ্ছেন, একটু পরেই কাছে ডেকে সুন্দর করে বুঝিয়ে তাকে বিদায় করছেন। নিয়মানুবর্তিতা এবং নীতি-আদর্শের প্রতি অবিচল থাকা ছিল তাঁর জীবনের মহান

www.pathagar.com

বৈশিষ্ট্য। আর এ কারণেই আমরা দেখতে পাই হযরত সদর সাহেব (রহঃ) অসু এবং দুর্বল শরীর নিয়েও সমাজের বহু কাজের সুষ্ঠু আঞ্জাম দিয়ে গেছেন।

হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ) একজন যুগশ্রেষ্ঠ শিক্ষাবি ছিলেন। স্বীয় জীবনকে তিনি উৎসর্গ করে দিয়েছেন শিক্ষা বিস্তারে। ঢাকা আশ্‌রাফুল উলুম বড় কাটারা মাদ্রাসা, লালবাগ জামেয়া কুরআনিয়া, ফরিদাবা মাদ্রাসা এবং গোপালগঞ্জের দারুল উলুম খাদেমুল ইসলাম গওহারডাঙ্গা মাদ্রাসাস দেশের বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তিনি গড়ে গেছেন। সহায়তা করেছেন অনেক শিক্ষ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠায়। ছাত্রদের চিন্তা, মেধা ও মননের উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে হযরত সদর সাহেব (রহঃ) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন "ইদারাতুল মা'আরিফ" নামে একটি ইসলামী গবেষণাগার। এ প্রতিষ্ঠানে দাওরায়ে হাদীস উত্তীর্ণ আলেমদের ও অন্যান্য শিক্ষায় শিক্ষিত ছাত্রদের ভর্তি করে বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ, রচনা, প্রবন্ধ তৈরী, যুগ জিজ্ঞাসার জবাব অনুসন্ধান, ইসলামী আইনের গবেষণাসহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হতো।

বাতিলের প্রতিরোধে হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ) ছিলেন আপোষহীন সিপাহসালার। ডিক্টেটর আইউব খান ক্ষমতায় এসে পবিত্র কুরআনের বিধান লংঘন করে যখন কুখ্যাত মুসলিম পারিবারিক আইন পাশ করেন, তখন ফরিদপুরী (রহঃ) এর তীব্র প্রতিবাদ জানান এবং দেশব্যাপী আন্দোলনের মাধ্যমে এই কালো আইন বাতিলের জন্য জনগণকে সোচ্চার করে তোলেন। মুজাহিদে আ'যম হযরত মাওলানা শামছুল হক (রহঃ) দলীয় রাজনীতি করেননি, কিন্তু ক্ষমাসীনদের পক্ষ হতে যখনই কোন ইসলাম বিরোধী- গণ বিরোধী পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে তখনই এই মর্দে মুজাহিদ তার তীব্র প্রতিবাদ করেছেন।

একবার স্বৈরাচারী শাসক আইউব খান নির্দেশ জারী করলেন- উভয় পাকিস্তানে একই দিনে ঈদ পালিত হবে। অথচ পূর্ব পাকিস্তানের কোথাও আকাশে চাঁদ দেখা যায়নি। শরীয়তের হুকুম হচ্ছে- চাঁদ দেখে রোযা রাখা এবং চাঁদ দেখেই রোযা ভাঙ্গা। তখন হযরত ফরিদপুরী (রহঃ) ঘোষণা দিলেন- যেহেতু পূর্ব পাকিস্তানের কোথাও কোন চাঁদ দেখা যায়নি সেহেতু আগামী কাল সকলেরই রোযা রাখতে হবে। সরকারী ঘোষণা মোতাবেক পরের দিন কেউ-ই নামায পড়েননি। অবশ্য আটটায় সরকারী তত্ত্বাবধানে কতিপয় মন্ত্রী মিনিষ্টার, আমলা-অফিসারদেরকে ষ্টেডিয়ামে নামায পড়তে দেখা গেছে।

সুদূর প্রসারী দৃষ্টির অধিকারী হযরত মাওলানা শামছুল হক (রহঃ) সেই ষাটের দশকে খৃষ্টান মিশনারীদের ধর্মান্তকরণের বিরুদ্ধে মুসলমানদের সতর্ক করেছেন। পার্তব্য চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহের গারো অঞ্চল, দিনাজপুরের বিভিন্ন

www.pathagar.com

ঞ্চল, সুন্দরবন এলাকাসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে খৃষ্টানদের অপ-তৎপরতার খোশ উন্মোচন করে তিনি তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। "আল্লাহর প্রেরিত ইঞ্জিল কোথায়?" "পাদ্রীদের গোমর ফাঁক" নামীয় গুরুত্বপূর্ণ ছোট ছোট পুস্তিকা প্রণয়ন করে তিনি জনগণকে সতর্ক করেছেন। সাংগঠনিক ভাবে খৃষ্টানদের তৎপরতার মোকাবেলার জন্য "আঞ্জুমানে তাবলীগুল কুরআন" প্রতিষ্ঠা করে দেশ ব্যাপী খৃষ্টানদের প্রতিরোধ করার ব্যবস্থা করেন।

খৃষ্টানদের সেবামূলক কাজের মুকাবিলার পাশাপাশি মুসলমানদের মাঝেও সেবার মনোভাব যাতে তৈরী হয় সেজন্য তিনি বক্তব্য-বিবৃতি ও লেখনীর মাধ্যমে মুসলমানদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। বিশেষ করে দুস্থ মানবতার সেবার লক্ষ্যে আলেম-উলামাদের অগ্রণী ভূমিকা পালনের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। স্বাধীনতাত্তোর বর্তমান সময়ে এন, জি, ও সমূহের অপতৎপরতায় আশংকাজনক হারে বাংলাদেশে খৃষ্টানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। কতিপয় এন, জি, ও-র পৃষ্ঠ পোষক খৃষ্টান বিশ্ব আগামী ৫০ বছরে বাংলাদেশকে খৃষ্টান মেজরিটি রাষ্ট্রে পরিণত করার পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। বাংলাদেশের মুসলমানগণ এখন থেকেই সতর্ক না হলে আমাদের জাতীয় অস্তিত্ব ধ্বংস হয়ে যাবে।

মুজাহিদে আ'যম হযরত সদর সাহেব (রহঃ) হাঁপানী ও হৃদরোগে আক্রান্ত ছিলেন। কিন্তু এ কঠিন রোগ তাঁকে পরাভূত করতে পারেনি। যারা আধ্যাত্মিক শক্তির বলে বলিয়ান হয়ে আল্লাহর পরিচয় এবং মহব্বত লাভে ধন্য হন- কোন শক্তিই তাঁদের কর্মসূচী বদলাতে পারে না। তাঁকে যারা খুব কাছে থেকে দেখেছেন তারা জানেন যে, চব্বিশ ঘন্টার জিন্দেগীতে কোনদিন ইচ্ছাকৃত ভাবে তিনি কোন নফল নামায ছাড়েননি। শত অসুস্থতার মাঝেও তিনি তাহাজ্জুদের নামায পরিত্যাগ করেননি। এশরাক, চাশত, আওয়াবীন ইত্যাদি নফল নামায, ইবাদত-বন্দেগী অত্যন্ত পাবন্দীর সাথে তিনি আদায় করেছেন। ইবাদত-বন্দেগী, রিয়াজাত ও মুজাহাদার জ্যোতির্ময় আভা তাঁর চেহারায় পরিস্ফুটিত থাকতো সর্বদা। মুজাহিদে আ'যম (রহঃ) গাম্ভীর্যপূর্ণ রাশভারী ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। সমস্ত জড়তা ঝেড়ে ফেলে যারা যত বেশী এ মহান ওলীর সাহচর্যে আসতে পেরেছেন- তাঁরাই তত বেশী দুর্নিবার আকর্ষণ অনুভব করেছেন। তাইতো আমরা দেখতে পাই সমাজের সর্বস্তরের মানুষ এ মহামনীষীর সাক্ষাত প্রার্থী হতেন এবং নিজ নিজ প্রয়োজনীয় পরামর্শ গ্রহণ করে আত্মতৃপ্তি নিয়ে ফিরে যেতেন।

আলেম-তালেবে ইল্‌ম ছাড়াও সামাজের জেনারেল শিক্ষিতদের এক বৃহৎ অংশের মাঝেও দ্বীনি শিক্ষা ও ধর্মীয় চর্চার ব্যাপকতা সৃষ্টির লক্ষ্যে তিনি মাতৃভাষা বাংলায় অনেক বই পুস্তক রচনা করে গেছেন। আকাবিরে উলামায়ে কেরাম বিশেষ

www.pathagar.com

করে হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ)-এর বহু দ্বী গ্রন্থ তিনি অনুবাদ করেছেন। পবিত্র কুরআনের তাফসীরসহ বিভিন্ন বিষয়ের উপ তিনি বহুগ্রন্থ রচনা করেছেন। হযরতের লেখা সবগুলি গ্রন্থই ব্যাপক ভাবে মুসলি সমাজে গ্রহণ যোগ্যতা লাভ করেছে এবং বাংলা ভাষাভাষি মুসলিম নর-নারী এ সমস্ত বই পুস্তকের দ্বারা ব্যাপকভাবে উপকৃত হচ্ছেন। উল্লেখ্য– দুনিয়া বিমুখ নির্লোভ আল্লাহর এ ওলী এসব দ্বীনি বই-পুস্তকের কোন কপিরাইট নিজের নামে বা সন্তানদের নামে সংরক্ষণ করে রাখেননি। বরং 'আম অনুমতি দিয়ে রেখেছেন মুসলিম উম্মাহর প্রয়োজনে প্রকাশকগণ যত দিন গ্রহণযোগ্য মূল্যে বই-পুস্তব সরবরাহ করবেন, ততদিন তাদের এ বই ছাপার অনুমতি থাকবে, অন্যথায় নয়। কত বড় হৃদয়ের অধিকারী হলে এমনি ধরনের নজীর বিহীন ত্যাগ স্বীকার কর যায়, তা ব্যক্ত করার ভাষা আমার কাছে নেই।

হক ও হক্কানিয়াতের জন্য জীবন উৎসর্গকারী, খোদা প্রেমিক মহান ওলী মুজাহিদে আ'যম হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ) তাঁরই অমর কীর্তি দারুল উলূম খাদেমুল ইসলাম গওহারডাঙ্গার হিফজ খানার দক্ষিণ পার্শ্বে চির নিদ্রায় শুয়ে আছেন। শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুজাহিদ, বহুগুণের অধিকারী এ মহামনীষীর পবিত্র স্মৃতি অম্লান হয়ে থাকবে মানুষের হৃদয় মাঝে।

আমরা এ মুখলিস মুরব্বিকে ভালবাসতাম। এখনো প্রাণ দিয়ে ভালবাসি, তাঁর জীবন-সাধনার পথে চলার চেষ্টা করি। দোয়া করি আল্লাহ তা'আলা তাঁর এ ওলীকে জান্নাতুল ফেরদাউসের মর্যাদাপূর্ণ উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত করুন। আমীন।

= ০০০ =

www.pathagar.com

হযরত সদর সাহেব (রহঃ)
যোগ্য ও সার্থক নায়েবে রাসূল

আবদুল জলীল

"আলিমগণ নবীদের ওয়ারিস। আর নবীগণ দীনার-দিরহাম (স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা)-এর ওয়ারিস বানান না। তাঁরা ইলমের ওয়ারিস বানান। তাই যে তা গ্রহণ করল সে পুরো অংশই গ্রহণ করল"- মহানবী হযরত রাসূলে কারীম (সাঃ)-এর এ অমোঘ বাণী যে কত ধ্রুব সত্য ও বাস্তবমুখী, যুগে যুগে আগত হক্কানী উলামায়ে কেরামের আখলাকও জীবন চরিতের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করা যায়। সেই মীরাসী সম্পদ ইলমে নববীর যথাযথ ব্যবহার তথা তার ব্যাপক প্রচার-প্রসারে এবং তদনুযায়ী নিজের, নিজ পরিবারের, সমাজের ও বিশ্বমানবের চরিত্র গঠনে জান কুরবান করেছেন যেসব মনীষী, তাকে জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বলে বিশ্বাস করেছেন আল্লাহর যেসব মকবুল বান্দা, মুজাহেদে আ'যম হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ) হলেন তাদের অন্যতম।

গোমরাহীর নিকশ আঁধারে ঢাকা নিভৃত এক পল্লীর সম্পূর্ণ বৈরী পরিবেশে জন্ম নিলেও ইলমে নববীর জান্নাতী নূরে দীপ্তিমান হয়েছিল তাঁর সীনা। সে ইলমের ভাবে পরিশীলন ও আলদার হয়েছিল তাঁর সমগ্র অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও হৃদয়-মন যা অবিচ্ছিন্ন সাথীরূপে বিরাজমান ছিল তাঁর সারাটি জীবন। কারণ মহান আল্লাহ তা'আলার বিশেষ ফযল ও করম ছিল তাঁর প্রতি। "আল্লাহ যাকে ভালবাসেন তাকে দীনের গভীর জ্ঞান দান করেন" (আল হাদীস)-এর পূর্ণাঙ্গ রূপায়ণ ছিলেন যে তিনি। তাই অষ্টম শ্রেণীর বৃত্তি পরীক্ষায় 'স্বর্ণ পদক' এবং প্রবেশিক্ষা পরীক্ষায় পাঁচটি বিষয়ে লেটারসহ ষ্টার মার্ক পাওয়ার মত গ্লোরিয়াস রেজাল্ট করা সত্ত্বেও নিশ্চিত 'উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ'-এর মুখে পদাঘাত করে সমগ্র যশ ও খ্যাতির স্ফীত ফানুস চুপসে দিয়ে সোজা গিয়ে হাজির হলেন ইসলামী শিক্ষার পাদপীঠ, মাদারে ইলম দারুল উলূম দেওবন্দ।

সমগ্র মনপ্রাণ ও চিন্তা-চেতনা উজাড় করে দিয়ে আকণ্ঠ পান করলেন ইলমের অমৃত সুধা, আপন সীনায় জমা করলেন মানব জীবনের সর্ব শ্রেষ্ঠ সম্পদ ইলমে নববী। স্বীয় কলবের কানায় কানায় ইলমে নববী ধারণ করেই তিনি ক্ষান্ত হননি। বরং সার্থক নায়েবে রাসূল হবার যোগ্যতা অর্জনের জন্য মা'রেফাতের প্রবাদ পুরুষ হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভীর মুবারক সান্নিধ্যে গিয়ে

www.pathagar.com

কঠোর সাধানায় ধন্য হয়েছেন এবং কষ্টার্জিত ইলমে নববীর পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রতিবেদ ঘটিয়েছেন নিজের বাস্তব জীবনে। তাই শত ঝড়-ঝঞ্ঝা, ঘাত-প্রতিঘাত, বাধা-বি ও প্রতিবন্ধকতায়ও তিনি ইস্পাত কঠিন মনোবল নিয়ে মহানবী হযরত রাসূ কারীম (সাঃ)-এর নক্‌শে কদমের ওপর চলেছেন সারাটি জীবন। স্বৈরাচা শাসকের চোখ রাঙানী, পদ ও পদবী তথা যশ ও খ্যাতির লিপসা, সম্পদের মো কোন কিছুই তাঁকে টলাতে পারেনি বিন্দুমাত্রও।

বিশ্বমানবের আদর্শ, উলামায়ে কিরামের রূহানী উস্তাদ ও উত্তরাধিকারদাত হযরত রাসূলে করীম (সাঃ)-এর স্বভাব-চরিত্র ছিল আল-কুরআনের সার্থক বাস্তব রূপায়ণ। তাই তাঁর ইন্তিকালের পর উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ কে যখন জিজ্ঞেস করা হল, "রাসূল (সাঃ)-এর চরিত্র কেমন ছিল? তখন সংক্ষে অথচ ব্যাপক অর্থবোধক ভাষায় তিনি জওয়াব দিয়েছিলেন, "তাঁর চরিত্র ছি আল-কুরআন।" অর্থাৎ আল-কুরআনে যেসব আচরণ, স্বভাব-প্রকৃতি ও গুণে কথা উল্লিখিত হয়েছে তা বাস্তবরূপে ফুটে উঠেছিল তাঁর ঘটনাবহুল জীবনে। আ প্রায় সাড়ে চৌদ্দশ' বছর পর সুদূর বাংলাদেশের নিভৃত এক পল্লীতে জন্ম নেয় তাঁরই এক নায়েব ও ওয়ারিসের মধ্যেও আমরা দেখতে পাই সে সব আচার আচরণ, স্বভাব-প্রকৃতি ও গুণাবলীর এক অকল্পনীয় মিল ও সাযুজ্য। এ যেন তাঁর কামালাতের প্রতিবিম্বিতরূপ- যা দীর্ঘ 'কালের ফিতা' বেয়ে এসে বাংলার বুকে প্রদর্শিত হচ্ছে মুজাহেদে আ'যম হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরীর বাস্ত জীবনে। নমুনা স্বরূপ তার কিছু বিবরণ পাঠকের খিদমতে উপস্থাপন করা হল :

ইলমে দ্বীনের প্রচার-প্রসার :

আল-কুরআনুল কারীমে রাসূল (সাঃ) কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, "হে রাসূল তোমার প্রতিপালকের কাছ থেকে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা প্রচা কর।" (সূরা মায়িদা, আয়াত নং- ৬৭)

এ আদেশ রাসূল (সাঃ) যথাযথ ভাবে অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন মক্কী জীবনের প্রথম দিকে কাফিরদের নির্মম নির্যাতন ও প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও তি এ দীনের প্রচার-প্রসারের জন্য নিভৃত স্থানে অবস্থিত আরকাম গৃহকে কেন্দ্র নির্ধারণ করেন। নও মুসলিম সাহাবীদের কেন্দ্রে শিক্ষা-দীক্ষা এবং দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করতে থাকেন। মাদানী জীবনে এ কাজ তিনি সম্পাদন করেছে মদীনার মসজিদে নববীকে কেন্দ্র করে। রাসূল (সাঃ) এর প্রতি প্রেরিত এ আদে প্রতিপালনে হযরত সদর সাহেব (রহঃ) বলতে গেলে তাঁর গোটা জীবন ওয়াক্ফ করে দিয়েছিলেন। কালামুল্লাহর জ্ঞান তথা ইলমে দীন প্রচার-প্রসারে এমন কো ক্ষেত্র নেই যা তার শুভ পদচারণায় প্রাণবন্ত হয়ে উঠেনি। অত্যন্ত সফলতার সাথে

www.pathagar.com

তিনি দারুল উলূম দেওবন্দের পড়াশুনা শেষ করে ১৯২৭ সালে দেশে ফেরার পর থেকে আমৃত সারা বাংলার আনাচে কানাচে গড়ে তোলেন ইলমে দ্বীন হাসিলের প্রাণ কেন্দ্র অসংখ্য মসজিদ, মাদ্রাসা, মক্তব। লালবাগ জামেয়া কুরআনিয়া, হোসাইনিয়া আশরাফুল উলূম বড়কাটারা, জামেয়া এমদাদিয়া ফরিদাবাদ, দারুল উলূম খাদেমুল ইসলাম গওহারডাঙ্গা প্রভৃতি দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আজও তার উজ্জ্বল স্বাক্ষর বহন করছে। নিজেও তিনি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হাদীস, তাফসীর, ফিক্হ, আকাইদ প্রভৃতি শিক্ষা দিয়েছেন হাজার হাজার ছাত্রকে।

সাধারণ জনগণের মধ্যে দ্বীনি জ্ঞান প্রচার-প্রসারের জন্য তিনি ব্যাপক ভাবে সভা-সমিতি, ওয়াজ-নছিহত ও আত্মার সংশোধনের মহান খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন নিরলস ভাবে। আর তা করতে গিয়ে তিনি বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক ও দীনি সংগঠনের সাথে যুক্ত হয়েছেন। যার ফলে সারা বাংলায় গড়ে উঠেছিল বিরাট একদল নিঃস্বার্থ কর্মী যারা দীনের কাজে জান কুরবান দিতেও কুণ্ঠিত হত না।

দ্বীনি জ্ঞান প্রচারের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও শক্তিশালী মাধ্যম হল লেখনী। এর দ্বারা সুশিক্ষিত ও স্বল্পশিক্ষিত নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই ঘরে বসে দীনি শিক্ষা লাভ করতে পারে। কিন্তু তিক্ত হলেও সত্য যে, তখন পর্যন্ত বাংলা ভাষায় খাঁটি ও প্রয়োজনীয় দ্বীনি আলোচনা ছিল না বললেই চলে।

মীর মুশাররফ হোসেন, ইসমাইল হোসেন সিরাজী, এয়াকুব আলী চৌধুরী, কাজী নজরুল ইসলাম, গোলাম মোস্তফা, মোহাম্মদ বরকত উল্লাহ, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, এস. ওয়াজেদ আলী, মাওলানা আকরাম খাঁ প্রমুখ বাংলা ভাষায় ইসলামী ভাবধারা ও চিন্তা চেতনার বিকাশ ঘটালেও তার কোনটাই ইসলামের ব্যবহারিক দিক সম্পর্কিত ছিল না। ছিল না আমল-আখলাক, মাসআলা-মাসাইল ও আত্মশুদ্ধির দিক নির্দেশনা মূলক কিছু। পরোন্তু তাদের লেখা সাহিত্যিক মানোত্তীর্ণ তথা উচ্চাঙ্গের সাহিত্য সম্বলিত হলেও তা স্বল্প শিক্ষিত সাধারণ জনগণের জন্য সহজবোধ্যও ছিল না। বাংলা ভাষাভাষী মুসলমান ও দ্বীনদার জনগণ এ অভাব মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে আসছিল যুগ যুগ ধরে। তৃষ্ণিত চাতকের ন্যায় তারা প্রতীক্ষার পর প্রতীক্ষা করে আসছিল এমন এক মহামনীষীর যিনি তাদের এ অভাব দূর করে দীনের অমিয় সুধা পান করিয়ে ধন্য করবেন।

অবশেষে মহান আল্লাহর খাস মেহেরবানীতে তাদের এ অভাব দূরীকরণে এগিয়ে এলেন যোগ্য ও সার্থক নায়েবে রাসূল মুজাহেদে আ'যম হযরত সদর সাহেব (রহঃ)। অনুবাদ ও মৌলিক লেখনীর মাধ্যমে বাংলা ভাষায় তিনি দ্বীন ও ইসলামকে তুলে ধরলেন পূর্ণাঙ্গরূপে। ঈমান ও ইসলামের পরিচয়, ইসলামের

www.pathagar.com

ব্যবহারিক ও আত্মশুদ্ধি সম্পর্কিত বিষয়াদির বিস্তারিত বিবরণ তিনি স্বীয় রূহা উস্তাদ মুজাদ্দেদে যামান হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভীর উর্দু রচনাব অনুবাদ করে বাংলা ভাষা-ভাষীদের খিদমতে পেশ করলেন। বেহেশতী জেও তালীমুদ্দীন, ফরূউল ঈমান, হায়াতুল মোছলেমীন, কছদুছছাবীল, সাফাই মোয়ামালাত, মুনাজাতে মকবুল প্রভৃতি গ্রন্থ তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য, যা পড়ে দী সম্পর্কে একজন নিরেট গন্ডমূর্খও পর্যাপ্ত ধারণা লাভ করতে পারে এবং তদনুযা আমল করে মনজিলে মকসূদে পৌঁছতে সক্ষম হয়।

মানব জাতির হিদায়েতের পথ নির্দেশক মহাগ্রন্থ আল-কুরআনুল কারী সহজভাবে বুঝার জন্য তিনি রচনা করেছেন সাড়ে ষোল হাজার পৃষ্ঠা সম্বলিত তাঁ অমর তাফসীর গ্রন্থ 'হক্কানী তাফসীর' যা তিনি সম্পূর্ণ ও সমাপ্ত করে যেতে পারে নি। তাঁর সে আরব্ধ কাজটুকু সম্পাদন করেছেন তাঁরই সুযোগ্য জামাতা, অতুলনী মেধা ও প্রজ্ঞার অধিকারী খ্যাতিমান আলিম, গওহারডাঙ্গা মাদ্রাসার বর্তমা শায়খুল হাদীস ও অধ্যক্ষ, আমার পরম শ্রদ্ধেয় ও শফীক উস্তাদ হযরত মাওলান আবদুল মান্নান সাহেব (কাশিয়ানী হুযুর)।

এ ছাড়াও ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের পথ নির্দেশক বহু গ্রন্থ তিনি রচন করেছেন। দুইশত গ্রন্থ রচনা ও অনুবাদ করে এবং অসংখ্য প্রবন্ধ-নিবন্ধ লি তিনি একদিকে যেমন বাংলা ভাষী মুসলমানদেরকে খাঁটি দ্বীনের ওপর চলার প সুগম করেছেন তেমনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে করেছেন সমৃদ্ধ। এত প্রাঞ্জল ও সাবলীল ভাষায় তিনি লিখেছেন যে, সামান্য শিক্ষিত লোকেরও তাঁর লেখা বুঝতে মোটেও বেগ পেতে হয় না।

গণমানুষের মুখের ভাষাকেই তিনি কলমের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন যাতে সহজেই তারা তা হৃদয়াঙ্গম করতে পারে। আর তা করতে গিয়ে ইচ্ছাকৃত ভাবেই তিনি ভাষারীতির কিছু ব্যতিক্রম করেছেন। তাই সাধু-চলিতের মিশ্রণ করতেও তিনি কুণ্ঠিত হননি। ফলে তাঁর লেখা বইগুলো মুসলিম সমাজে এতই জনপ্রিয়তা লাভ করেছে যার তুলনা বিরল। তাই বাংলার নিভৃত পল্লীতেও তাঁর অনূদিত বেহেশ্‌তী জেওর ও অন্যান্য বই শোভা পাচ্ছে। তিনি বাংলা ভাষার পন্ডিত ছিলেন কিন্তু সে পান্ডিত্য তিনি কোথাও জাহির করেননি শুধু গণ-মানুষের দিকে তাকিয়ে। এখানেই তাঁর লেখনীর সার্থকতা।

ইসলামী গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ঃ

দীন ইসলামকে যুগোপযোগী ও যুক্তিগ্রাহ্য করে তুলে ধরার জন্য এবং জ্ঞানপাপী বিধর্মীদের পক্ষ থেকে অতি সুকৌশলে রাসূল (সাঃ), ইসলাম ও

www.pathagar.com

মুসলমানদের বিরুদ্ধে যেসব অপপ্রচার চালানো হয় তার দাঁত ভাঙ্গা জওয়াব দেয়ার জন্য প্রয়োজন একদল দক্ষ আলিম ও লেখকের। সে ধরনের একদল যোগ্য আলেম ও লেখক সৃষ্টির জন্য ঢাকার ফরিদাবাদ মাদ্রাসায় তিনি 'ইদারাতুল মা'আরিফ' নামে একটি গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। মাদ্রাসা শিক্ষার সর্বোচ্চ ডিগ্রীধারী মেধাবী ছাত্রদেরকে সেখানে ভর্তি করা হত এবং হাতে কলমে তাদেরকে বিভিন্ন ভাষা থেকে অনুবাদ, মৌলিক রচনা ও প্রবন্ধ লেখা প্রভৃতির শিক্ষা দেয়া হত। সাম্প্রতিক কালের বিষয়াদি সম্পর্কেও গবেষণা ও অধ্যয়নে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করা হত।

পাঠাগার প্রতিষ্ঠা ঃ

বাংলা ভাষাভাষী জনগণের মধ্যে লেখনীর মাধ্যমে দীনের প্রচার-প্রসার ঘটাতে হলে ইলমে নববী তথা ইলমে দীন অর্জনের সাথে সাথে মাতৃভাষা বাংলায়ও বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করা প্রয়োজন- এ জলন্ত সত্যটি তিনি উপলব্ধি করেছিলেন মর্মে মর্মে। তাই ছাত্রদের বাংলা ভাষায় জ্ঞানার্জনের জন্য গওহারডাঙ্গা মাদ্রাসায় তিনি গড়ে তুলেছিলেন দারুল মুতালাআ' নামে একটি ছাত্র পাঠাগার যেখানে কেবল বাংলা ভাষার বইই সংগ্রহ করা হত। নিজ বাড়ীতে সুযোগ্য জ্যেষ্ঠ পুত্র হাফেয মাওলানা মোহাম্মাদ ওমর এর তত্ত্বাবধানে গড়ে তুলেছিলেন 'বিশ্বকল্যাণ পাঠাগার' নামে একটি আধুনিক পাঠাগার। এ পাঠাগারের বইয়ের সংগ্রহ দেখলে সত্যিই অবাক হতে হয়। 'ইলমে নববী' জন সাধারণের দোর গোড়ায় পৌঁছে দেয়ার জন্য আপন সন্তান ও কলিজার টুকরো ছাত্রদেরকে যোগ্য করে গড়ে তুলবার কী অপূর্ব প্রয়াস! দিলে জমাট বাঁধা কত দরদ!

যতদূর মনে পড়ে '৭৫ এর শেষভাগে গওহারডাঙ্গার ছাত্র থাকাকালে এ অধম শ্রদ্ধেয় বড় ভাই হাফেয মাওলানা মোহাম্মদ ওমর এর সৌজন্যে উক্ত পাঠাগারে প্রবেশের সৌভাগ্য লাভ করেছিলাম। মহাকবি কায়কোবাদের 'অশ্রুমালা'সহ অন্যান্য খ্যাতিমান সাহিত্যিকের সাহিত্যের সাথে পরিচয় আমার অনেকটা এখান থেকেই। নির্দ্বিধায় বলা যায়, অধম ছিটেফোটা যা কিছু শিখেছে তার পুরো কৃতিত্ব সেই গওহারডাঙ্গা মাদ্রাসার, সেই দারুল মুতালাআ', সেই বিশ্বকল্যাণ পাঠাগারের। সর্বোপরি সেই নিঃস্বার্থ, নির্লোভ ও আত্মত্যাগী মহামনীষী হযরত সদর সাহেব (রহঃ)-এর।

দুনিয়া বিরাগ ঃ

রাসূল (সাঃ)-এর জন্য মক্কার মরুভূমি ও পাহাড়গুলো স্বর্ণে পরিণত করে দেয়ার প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে। কিন্তু বিনয়ের সাথে তিনি তা

www.pathagar.com

প্রত্যাখ্যান করে কষ্টের যিন্দেগী বেছে নেন। তাঁর এ আদর্শের অবিকল প্রতিফলন ও অত্যন্ত সফল বাস্তবায়ন দেখা যায় হযরত সদর সাহেব (রহঃ)-এর যিন্দেগীতে। বহু বিত্তশালী ভক্ত-অনুরক্ত ছিল তাঁর। তারা তাদের প্রাণ প্রিয় মুরশিদের একটু আরমের জন্য প্রাসাদোপম অট্টালিকা বানিয়ে দেয়ার প্রস্তাবও দিয়েছে। দিতে চেয়েছে মোটা অংকের মাসিক সম্মানী। জিঞ্জিরার জনৈক ধনাঢ্য ব্যক্তি তো বাইশ হাজার টাকা (বর্তমান সময়ে বাইশ লক্ষাধিক টাকার সমান) তাঁর হাতে তুলেই দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি যে সুন্নাতে নববীর পূর্ণাঙ্গ অনুসারী। তাই বিনয়ের সাথে সেসব পায়ে ঠেলে দিয়েছেন।

সুদীর্ঘ কাল কাটালেন যে ঢাকায়, শুধু ঢাকায়ই নয় বাংলাদেশের কোন শহরে তার কোন বাড়ী নেই। ঘোপের ডাঙ্গার অজপাড়াগাঁর সেই অতি সাধারণ পিতৃ নিবাসটি তাঁর দুনিয়া বিমুখতার সাক্ষী হয়ে আজো দাঁড়িয়ে আছে, যা দেখলে চোখ ফেটে পানি আসে, বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় যে, সারা বাংলার মানুষ যার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে, সবাই যাকে এক ডাকে চিনে, সেই আলেম-সম্রাট হযরত সদর সাহেব কেবলার বাড়ী এটি!

লালবাগ ও গওহারডাঙ্গার ন্যায় বিশালায়তনের মাদ্রাসা করেছেন, মসজিদ করেছেন কিন্তু নিজের একটু বিশ্রাম, নিজের একটু কিতাব মুতালাআ' তথা অধ্যয়ন ও গবেষণার জন্য যে কুঠরিটি বেছে নিয়েছেন তার অবস্থা শুধুই অবাক করার মত নয়, হৃদয় অন্দরে আফসোস ও ব্যথা দানকারীও বটে। মসজিদের এক কোণে আলো বাতাসহীন ছোট্ট একটু কামরা, যাতে ছোট্ট একখানি চৌকি পাতা। খানা-পিনার ও তদ্রূপ বেহাল অবস্থা। ঠিক নবীজীর (সাঃ) প্রতিবিম্ব যেন! যা সামনে আসতো খেয়ে শোকর করতেন।

কখনো সামান্য ডাল-রুটি কখনো বা শুধু লবণ-ভাত, যার বাস্তব প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর সুযোগ্য জামাতা হযরত মাওলানা আব্দুল মান্নান সাহেব বর্ণিত ঘটনায়, যা সৌদী আরবের সফরে স্টিমারে ঘটেছিল। তিনি বলেন, "..................... ফিরে এসে দেখলাম থালাবাটি এলোমেলো হয়ে আছে। অর্থাৎ হযরত ইতিমধ্যে খেয়ে নিয়েছেন। কিন্তু লবন ছাড়া খাওয়ার মত আর কিছুই ছিল না। হযরত তাই দিয়ে খেয়েছেন।" (দ্র: হযরত মাওলানা আবদুল মান্নান, আলোর কাফেলা; স্মৃতি ও অভিব্যক্তি।)

সাহসিকতা ও দৃঢ়চিত্ততা ঃ

বীরত্ব ও সাহসিকতায় হযরত রাসূলে করীম (সাঃ) ছিলেন অতুলনীয়। উহুদ ও হুনায়ন যুদ্ধে মুসলমানদের সাময়িক বিপর্যয়কালেও তিনি বুকটান করে এগিয়ে

www.pathagar.com

গিয়েছেন শত্রু অভিমুখে। যার ফলে পিছিয়ে পড়া মুসলিম বাহিনী আবার দ্বিগুণ শক্তি নিয়ে জমায়েত হয়েছে তাঁর পেছনে। একরাতে বিরাট এক আওয়াজ শুনে মদীনার সকল মানুষ ভয় পেয়ে গেল। কিন্তু রাসূল (সাঃ) গলায় কোষমুক্ত অসি ঝুলিয়ে সে আওয়াযের দিকে ছুটে গেলেন এবং ফিরে এসে মদীনাবাসীকে আশ্বস্ত করলেন। মক্কী জীবনের প্রথম দিকে কাফিরদের হুমকি ধমকির মুখে এক চুলও টলেননি স্বীয় দায়িত্ব ও মিশন থেকে। হযরত সদর সাহেব (রহঃ)ও এ গুণের উত্তরাধিকার পেয়েছিলেন পূর্ণাঙ্গরূপে। এক আল্লাহকে ছাড়া আর কাউকে পরোয়া করতেন না এ সাহসী বীর পুরুষ। সমকালীন শাসক কর্তৃক ইসলাম বিরোধী যে কোন পদক্ষেপ যখনই জাতির ঘাড়ে চাপানোর অপপ্রয়াস চলেছে তখনই গর্জে উঠেছে অকুতো ভয় এ মর্দে মুজাহিদের ভরাট কণ্ঠ। নিজের জীবন বাজি রেখে সর্বশক্তি দিয়ে তা প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেছেন।

১৯৫৫ সালে আতাউর রহমান খান সাহেবের নেতৃত্বে আওয়ামীলীগের মন্ত্রী সভা গঠিত হয়। তারই সভাপতিত্বে গঠিত পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষা কমিশন ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের ভিত্তিতে তাদের রিপোর্ট প্রণয়ন করতঃ পেশ করে। যাতে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ধর্ম শিক্ষা সম্পূর্ণ বাদ দেয়া হয়। শুধু তাই নয়, ধর্ম শিক্ষা সম্পর্কে আপত্তিকর মন্তব্য করা হয়। হযরত সদর সাহেব (রহঃ) সর্ব প্রথম উক্ত রিপোর্টের বিরোধিতা করেন। স্বয়ং আতাউর রহমান খান সাহেবের বাস ভবনের সামনে প্রকাশ্য রাস্তায় বিশাল জনসভা করে তেজোদ্দীপ্ত কণ্ঠে এর বিরুদ্ধে বক্তৃতা করেন এবং লেখনীর মাধ্যমে সারাদেশে তা ছড়িয়ে দিয়ে দেশবাসীকে জাগিয়ে তোলেন। ফলে সারাদেশে প্রতিবাদের ঝড় উঠে। শেষ পর্যন্ত উক্ত রিপোর্ট বাস্তবায়িত হতে পারেনি (তথ্য: মাওলানা আবদুর রাজ্জাক, মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরীর (রহঃ) জীবনী)।

তৎকালীন পাকিস্তানের স্বৈরাচারী সামরিক সরকার ফিল্ড মার্শাল আইয়ূব খান অবৈধভাবে ক্ষমতার মসনদ দখল করে একটার পর একটা ইসলাম বিরোধী কর্ম কান্ড শুরু করেন। হযরত সদর সাহেব (রহঃ) অসীম সাহসের সাথে তার এসব কর্ম কান্ডের তীব্র প্রতিবাদ করেন, ঝাঁপিয়ে পড়েন সরাসরি প্রতিরোধে। তাঁর সে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের বজ্র নিনাদে থর থর করে কেঁপে ওঠে লৌহ মানব আইয়ূব শাহীর তখত-ই তাউস। আইয়ূব শাহী ইসলামিক রিসার্চ ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করে তার পরিচালক বানান ডাঃ ফজলুর রহমানকে এবং তার মাধ্যমে ইসলামের বিকৃত ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেন। হযরত সদর সাহেব (রহঃ) তখন মার্শাল 'ল' ভঙ্গ করে ডাঃ ফজলুর রহমানের বিরুদ্ধে বিশাল বিশাল মিছিল মিটিং করে জনমত সৃষ্টি করেন। সাথে সাথে উলামায়ে কিরামের দস্তখত সম্বলিত মার্শাল 'ল' বিরোধী

www.pathagar.com

পুস্তিকা ছাপিয়ে গোয়েন্দা বিভাগের শ্যেন দৃষ্টি ফাঁকি দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের গ্রামে-গঞ্জে ও প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত সমগ্র জুমআ মসজিদে পৌঁছে দেন, কর্তৃপক্ষের এক হুমকীর জবাবে তিনি বলেছিলেন, "................ আমার যিনি আসল সরকার আল্লাহপাক, আমি শুধু তাঁরই হুকুম পালন করছি। আল্লাহর সরকারের হুকুম মান্য করতে আমি অন্য কোন সরকারের পরোয়া করি না।

একবার পশ্চিম পাকিস্তানে ঈদের চাঁদ দেখা গেল কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে দেখা গেলনা। আইয়ূব শাহীর খেয়াল চাপলো যে, উভয় পাকিস্তানে একই দিনে ঈদ করতে হবে। সাথে সাথে ফরমান জারী করে দিলেন। পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর উলামায়ে কিরামকে ডেকে এব্যাপারে সরকারের সমর্থনে মতামত চাইলে হযরত সদর সাহেব (রহঃ) এর তীব্র প্রতিবাদ করে বললেন, "আগামীকাল ঈদ হবে না। সকলের ওপর রোযা রাখা ফরয। আমি এখানে কোন রাজা বাদশাহর হুকুম মানতে পারিনা।" কিন্তু হুকুমের চাকর গভর্ণর সাহেব শহর ব্যাপী মাইকে ঘোষণা করালেন যে, 'আগামীকাল ঈদ'। সাথে সাথে পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে সরকারকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে হযরত সদর সাহেব (রহঃ)ও মাইকে ঘোষণা দিলেন যে, "চাঁদ না দেখা যাওয়ায় আগামী কাল ঈদ হবে না; সকল মুসলমানের ওপর রোযা রাখা ফরয।" জনগণ হযরতের কথায়ই আমল দিয়ে পরদিন রোযা রাখল।

১৯৬৬ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রাক্কালে আইয়ূব খান উলামায়ে কিরামের সমর্থন আদায় কল্পে প্রেসিডেন্ট হাউসে তাঁদের এক মিটিং ডাকেন এবং সেখানে তার বিগত ৫/৬ বছরের শাসনামলে কৃত ইসলামের খিদমতের এক ফিরিস্তি পেশ করে বলেন- আমি অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ইসলামিয়াত শিক্ষা বাধ্যতামূলক করেছি। কেন্দ্রের জন্য ইসলামিক রিসার্চ ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেছি ইত্যাদি ইত্যাদি। তিনি আশ্বাস দেন যে, তাকে সমর্থন করলে তিনি ইসলামের আরো অনেক খিদমত করবেন। কিন্তু তার বক্তৃতার মাঝখানেই তেজোদ্দীপ্ত কণ্ঠে মুজাহিদে আ'যম (রহঃ) বলে উঠলেন-

"আপনি ইসলামের জন্য কিছুই করেননি। করেছেন শুধু ইসলামের নামে একনম্বরের ধোকাবাজী।"

অবাক করা ব্যাপার! যে লৌহ মানবের সামনে তার মন্ত্রীরা পর্যন্ত কথা বলতে দুরু দুরু কাঁপে তার মুখের ওপর এতবড় কথা! আইয়ূব খান তখনো বুঝতে পারেননি হযরত সদর সাহেবকে। তিনি চোখ বাড়িয়ে বজ্রকণ্ঠে চীৎকার করে বলে উঠলেন, "আপনি কার সামনে কথা বলছেন খবর আছে? আমি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট– পাঠানের বাচ্চা পাঠান।"

www.pathagar.com

হযরত মুজাহিদে আ'যম যে ঐশী শক্তিতে বলিয়ান! তিনি যে সর্বশ্রেষ্ঠ সাহসী মহামানব হযরত রাসূলে করীম (সাঃ)-এর যোগ্য উত্তরাধিকারী। 'পাঠানের বাচ্চা পাঠান'- এর থোড়াই কেয়ার করেন। তাই আরো চড়া স্বরে তিনি সিংহের মত গর্জে উঠলেন, "আপনার খবর আছে? আমি মুসলমানের বাচ্চা মুসলমান! আমাকে একা মনে করলে আপনার ভুল হবে। দেখেন দশ কোটি মুসলমান (তৎকালীন গোটা পাকিস্তানের মুসলিম জন সংখ্যা) আমার পেছনে দন্ডায়মান। সাবধানে কথা বলুন।"

আইয়ূব যেন ফুটো বেলুনের ন্যায় চুপসে গেলেন, বললেন, "কিভাবে আমি ধোকাবাজী করলাম বলুন।"

অতঃপর হযরত সদর সাহেব (রহঃ) এক এক করে তার ধোকাবাজীর স্বরূপ উন্মোচন করে বললেন, "আপনি কেন্দ্রের জন্য ইসলামিক রিসার্চ ইনষ্টিটিউট করেছেন ঠিক, কিন্তু তার ডাইরেক্টর বানিয়েছেন ইসলাম বিকৃতকারী নাস্তিক ডাঃ ফজলুর রহমানকে। আপনি পূর্ব পাকিস্তানে ইসলামিক একাডেমী প্রতিষ্ঠা করেছেন ঠিক কিন্তু তার ডাইরেক্টর বানিয়েছেন ইসলাম সম্পর্কে বিকৃত চিন্তাধারার অধিকারী একজন বিতর্কিত ব্যক্তিকে। আপনি অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ইসলামিয়াত বাধ্যতামূলক করেছেন ঠিক কিন্তু তার জন্য কোন শিক্ষকের পদ রাখেননি। কাজেই এগুলো ধোকাবজী ছাড়া আর কি?"

প্রেসিডেন্ট আইয়ূব খান একথায় হতবাক হয়ে গেলেন। বলতে লাগলেন, শিক্ষামন্ত্রী এ.টি.এম. মোস্তফাকে ডাক, মোনায়েম খাঁকে ডাক। মাওলানা কি বলছেন আমার বুঝে আসছে না। তোমরা তাকে বুঝাও। এই বলে তিনি বসে পড়লেন।

কোন কোন মন্ত্রী রাগতস্বরে বলে উঠল , হুযুর! আপনি মহামান্য প্রেসিডেন্ট মহোদয়ের সাথে কি শুরু করলেন?

সদর সাহেব (রহঃ) তাদেরকে ধমক দিয়ে বললেন- তোমাদের সাথে আমি কথা বলতে আসিনি, চুপ কর। অতঃপর সব চুপ হয়ে গেল। তখন মুনাজাত শুরু হল। হযরত সদর সাহেব (রহঃ) বীরদর্পে সভা থেকে উঠে চলে এলেন (তথ্য ঃ মাওলানা আবদুর রাজ্জাক, মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরীর জীবনী)।

উদারতা ও দানশীলতা ঃ

আল কুরআনে দান করা ও আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার জন্য বিভিন্ন ভাবে উৎসাহিত করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে, "তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় কর এবং

www.pathagar.com

নিজদেরকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করোনা (সূরা আল-বাকারা, আয়াত- ১৯৫)। এ নির্দেশের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন ঘটেছিল রাসূল (সাঃ)-এর মধ্যে। বিয়ের পর হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর অঢেল সম্পদ- সবই তিনি রাসূল (সাঃ)-এর পদতলে সোপর্দ করেন। আর রাসূল (সাঃ) দু'হাতে বিলিয়ে নিঃশেষ করে ফেলেন। তাঁর যোগ্য উত্তরসূরি হযরত সদর সাহেব (রহঃ)ও পুরাপুরি রপ্ত করেছিলেন তাঁর মাহবুবের এগুণটি, যার অসংখ্য উদাহরণ পাওয়া যায় তার জীবনে। ওয়াজ-নসীহাত করার পর কোথাও থেকে টাকা পয়সা হাদিয়া দিলে তা তিনি মাদ্রাসায় দান করে দিতেন। গরীব ছাত্রদের পেছনে অকাতরে ব্যয় করতেন। নিজের পকেটের পয়সা দিয়ে তাদের দুধের ব্যবস্থা করে দিতেন, খাওয়ার সময় ধারে কাছে কেউ থাকলে নিজে সামান্য খেয়ে বাকীটা তাকে খাওয়াতেন। কাউকে দিয়ে কোন কাজ করালে তার যোলআনা পারিশ্রমিক তো দিতেনই বরং আরো বেশী দিয়ে দিতেন।

একবার তিনি কিছু লোককে দিয়ে কৃষি কাজ করালেন। কাজ শেষে তাদের একজন এসে টাকা চাইলে হযরত সবার টাকা হিসেব করে তার হাতে দিয়ে দিলেন। কিছুক্ষণ পর তাদের আর একজন এসে বললেন, "হুযুর! আমার টাকা দিন।" তিনি কিছু না বলে তাকে টাকা দিলেন। উপস্থিত লোকেরা বলল, হুযুর! সবার টাকাতো দিয়ে দিলেন। আবার তিনি বললেন, "তাতে কি হয়েছে? কোন অসুবিধা নেই। সেও গরীব মানুষ। মনে পড়ে যায় রাসূলে করীম (সাঃ)-এর একটি আচরণ- ইব্‌ন সাফওয়ান (রাঃ) বলেন, হিজরতের পূর্বে আমি মক্কায় রাসূল (সাঃ)-এর কাছে এলাম। অতঃপর আমি তাঁর কাছে পাজামার একটি টুকরা বিক্রি করলাম। তিনি আমাকে ওজন করে তার মূল্য দিলেন এবং ওজনে বেশী দিলেন (আবূ শায়খ ইসফাহানী, আখলাকুন্নবী)। রাসূল (সাঃ)-এর এ আচরণের সাথে হযরত সদর সাহেব (রহঃ)-এর আচরণে কি অপূর্ব মিল!

পরহেযগারী ও আমানতদারী ঃ

হযরত রাসূলে করীম (সাঃ) আজন্ম ছিলেন একজন বিশ্বস্ত আমানতদার। নবূওয়াত লাভের বহু পূর্বেই তিনি 'আল-আমীন' খিতাব পান। এগুণটিতেও হযরত সদর সাহেব (রহঃ) ছিলেন রাসূল (সাঃ)-এর সার্থক অনুসারী। বাল্যকাল থেকেই তিনি এত বিশ্বস্ত ছিলেন যে, তার স্কুলের বিধর্মী শিক্ষকও তার সনদ দিয়েছেন। ভাগুটিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে আপন চরিত্র মাধুরী দিয়ে তিনি ছাত্র-শিক্ষকময় এলাকাবাসীর হৃদয় জয় করেছিলেন। স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন হিন্দু। তিনি যথার্থই চিনেছিলেন পূণ্যবান ও বিশ্বস্ত বালক শামছুল হককে। ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ফাইনাল পরীক্ষার কিছুদিন আগে প্রসঙ্গক্রমে ছাত্র-শিক্ষককে উদ্দেশ্য করে

www.pathagar.com

তিনি বলেছিলেন "আমি আমার শামছুল হককে এত অধিক বিশ্বাস করি এবং তার ওপর এত অগাধ আস্থা রাখি যে, পরীক্ষার এক সপ্তাহ আগে আমি সমস্ত প্রশ্নপত্র শামছুল হকের কাছে দিয়ে দিতে পারি। তার ওপর আমার এ বিশ্বাস আছে যে, সে ভুলেও কখনো ওই প্রশ্ন দেখবে না। তার প্রতি আমার এতই বিশ্বাস।"

মাদ্রাসার সম্পদকে তিনি পবিত্র আমানত বলে মনে করতেন এবং প্রাণের চেয়েও প্রিয় বলে হেফাজত করতেন। তাই অতি ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর জিনিসও বিনামূল্যে ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করতেন না। গওহারডাঙ্গা মাদ্রাসার বিশাল ও বিস্তৃত ক্যাম্পাসে ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারীদের স্বেচ্ছা শ্রমে বিভিন্ন রকমের তরিতরকারী উৎপাদিত হত। হযরত সদর সাহেব (রহঃ) খাবারের সাথে কাঁচা মূলা খেতে বেশী পছন্দ করতেন।

একদিন রাতে আহারের সময় বাঁশবাড়িয়ার হুযুর (ক্ষেত-খামার ও ফসলাদি যার তত্ত্বাবধানে ছিল) ক্ষেত থেকে তাঁর জন্য একটি কাঁচা মূলা তুলে আনলেন। হযরত জিজ্ঞেস করলেন, "মূলাটির মূল্য কত হবে?" বাঁশবাড়িয়ার হুযুর আরয করলেন, "হযরত! আমরা ওস্তাদ ছাত্র সকলে মিলে নিজেদের কায়িক পরিশ্রমে এই ক্ষেত করেছি। তাই আমাদের সবার জন্য বিনামূল্যে খাওয়ার সাধারণ অনুমতি রয়েছে। অবশ্য অতিরিক্ত মূলা বিক্রি করে তার মূল্য মাদ্রাসার ফান্ডে জমা করে দেয়া হয়। তাই সকল ওস্তাদ-ছাত্রের যেখানে সাধারণ অনুমতি রয়েছে আর যেখানে আপনার ঘামের বিনিময়ে ইলমের এ বাগান রচিত হয়েছে সেখানে আপনার জন্য একটি মূলার দাম দেয়ার কোন প্রয়োজন নেই।"

সদর সাহেব (রহঃ) এসব যুক্তি মানতে রাজী হলেন না। যতক্ষণ পর্যন্ত বাঁশবাড়িয়ার হুযুর মূলাটির মূল্য নির্ধারণে সম্মত না হলেন ততক্ষণ তিনি মূলাটি গ্রহণ করলেন না। অনুরূপ ভাবে একবার সভার সময় মাঠ পরিষ্কার করতে গিয়ে পুরাতন মৃতপ্রায় লাউগাছ উপড়ায়ে ছাত্ররা ময়লা আবর্জনার সাথে গর্তে ফেলে দেয়। হযরতের এক ভক্ত মাষ্টার ওমর সাহেব তা থেকে কাঁচা পাতাগুলো বেছে বেছে কেটে গামছায় বেঁধে মাথায় নিয়ে এলেন হযরতের গাভীকে খাওয়াতে। হযরত জিজ্ঞেস করলেন তোমার মাথায় কি? তিনি বললেন, লাউগাছ উপড়ায়ে গর্তে ফেলে দিয়েছিল। তার কিছু পাতা তাজা ছিল। আমি বেছে বেছে সেগুলো হুযুরের গাভীর জন্য নিয়ে এসেছি, দেখি খায় কি না।"

হুযুর জিজ্ঞেস করলেন, "দাম কত?"

তিনি বললেন, "হুযুর! এরতো কোন দাম নেই। এগুলোতো ফেলে দেয়া হয়েছে তাই আমি কুড়িয়ে নিয়ে এসেছি।"

www.pathagar.com

হুযুর বললেন, "মিঞা! ফেলে দিয়েছে তো মাদ্রাসার গাছ মাদ্রাসার গর্তে ফেলেছে। তা পঁচলেও একটু মাটি বাড়বে। আমি শামছুল হকের কি অধিকার আছে মাদ্রাসার জিনিস স্পর্শ করার? তুমি তা মুহতামিম (অধ্যক্ষ) সাহেবের কাছে নিয়ে একটা দাম ধার্য করে আন, অন্যথায় আমার গাভীকে দিওনা।

মাষ্টার সাহেব মাদ্রাসায় ফিরে গেলেন এবং মুহতামিম সাহেবকে অবহিত করলেন। মুহতামিম সাহেব বিষয়টি বুঝলেন এবং হযরতের কথার একচুলও যে অন্যথা হবেনা তাও বুঝলেন। তাই তিনি চার বা আট আনা দাম ধরে দিলেন। মাষ্টার সাহেব ফিরে এসে জানালে হযরত সদর সাহেব (রহঃ) সাথে সাথে পকেট থেকে আট আনা পয়সা বের করে দিলেন। (দ্রঃ মাওলানা আবদুর রাজ্জাক, মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরীর জীবনী)। এরকম আরো অসংখ্য ঘটনা রয়েছে, যা নববী চরিত্র আমানতদারীর সুস্পষ্ট স্বাক্ষ্য বহন করে।

ধন সম্পদ ও মাল দৌলতের প্রতি অনিহা ঃ

দুনিয়াবী সম্পদের প্রতি হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-এর আগ্রহ ও আকর্ষণ ছিল না এক বিন্দুও। বরং তার প্রতি ছিল প্রচন্ড রকমের অনীহা। তাই সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তিনি সম্পদের মালিক হতে চাননি। মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্রের কর্ণধার হিসেবে সবই ছিল তার অধীন কিন্তু রাসূল (সাঃ)-এর কিহাল ছিল! হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, "রাসূল (সাঃ) একাধারে তিন দিন কখনো রুটি দিয়ে পেট পুরে আহার করেননি।"

অন্য এক হাদীসে আছে যে, জিব্রাঈল (আঃ) একবার এসে বললেন, "আল্লাহ আপনাকে সালাম পাঠিয়েছেন এবং বলেছেন যে, আপনি চাইলে এই পাহাড়গুলো আমি স্বর্ণে পরিণত করে দেব। আপনি যেখানেই যাবেন এগুলি আপনার সাথে সাথে থাকবে।" রাসূল (সাঃ) কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন, "হে জিব্রাঈল! এ দুনিয়া তার ঘর যার কোন ঘর নেই; তার সম্পদ যার কোন সম্পদ নেই; সেই তা সঞ্চয় করে যার কোন বুদ্ধি নেই।" জিব্রাঈল (আঃ) তাঁকে বললেন, "আপনাকে আল্লাহ এ মজবুত কথার ওপর অটল রাখুন।" হযরত রাসূলে করীম (সাঃ)-এর এ অনুপম আদর্শ ও মহতী বাণীকে শিরোধার্য করে অক্ষরে অক্ষরে নিজের জীবনের প্রতিটি পলে পলে বাস্তবায়ন করেছিলেন তাঁরই যোগ্য নায়েব ও ওয়ারিস হযরত সদর সাহেব (রহঃ)।

কর্ম জীবনের শুরুতেই তিনি 'চীফ জাষ্টিস'-এর ন্যায় মোহনীয় একটি সম্মান জনক পদ প্রত্যাখ্যান করেন। সময়টি ছিল ১৯২৭ সাল। হযরত তখন দেওবন্দের সর্বশেষ ডিগ্রী অত্যন্ত সফলতা ও সম্মানের সাথে সমাপন করে 'মাওলানা' উপাধি

www.pathagar.com

ভ করেছেন। ঐ সময় হায়দ্রাবাদের নিজামের পক্ষ থেকে দেওবন্দের শায়খুল দীস হযরত মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী (রহঃ)-এর কাছে পত্র মারফত কজন যোগ্য আলিমকে চেয়ে পাঠানো হয়, যাকে হায়দ্রাবাদের চীফ জাষ্টিস করা বে। তীক্ষ্ণ মেধা ও প্রজ্ঞার অধিকারী ইলমের খনি হযরত মাদানী (রহঃ) ছিলেন দর সাহেব (রহঃ)-এর বিশিষ্ট উস্তাদ ও কল্যাণকামী। তিনি সকল উস্তাদকে য়ে পরামর্শ করলেন। সিদ্ধান্ত হল মাওলানা শামছুল হককে সেখানে পাঠানো বে। কয়েকজন বিশিষ্ট উস্তাদের সামনেই মাওলানা শামছুল হককে ডাকলেন বং তাকে হায়দ্রাবাদে চীফ জাষ্টিসের পদে নিয়োগের সুসংবাদ দিলেন।

সবাই মনে করেছিলেন এ খবরে মাওলানা খুশীই হবেন। আর খুশী হবার থাও, কারণ কর্ম জীবনের সুপ্রভাতে এমন ভাগ্য ক'জনের হয়। বেতন তৎকালীন ময়ের ছয় শত টাকা বর্তমান মুদ্রামানে ছয় লক্ষের অনেক বেশী। কিন্তু তিনি যে সূল করীম (সাঃ)-এর অনুপম আদর্শের অনুসারী। হিদায়াতের আলো 'একটি াণী'ও পৌঁছে দেয়ার মীরাস পেয়েছেন। তাই এ খবর শুনে তিনি কেঁদে ফললেন। সবিনয়ে বললেন, "হযরত! আপনাদের হুকুম আমার মাথার তাজ। ন্তু দিল চায়, 'বাংগাল পোর জঞ্জাল'- আমি বাংলায় গিয়ে আমার ভাইদের ন্ধকার থেকে আলোর দিকে আনবো। হুযুর! আমার টাকার প্রয়োজন নেই।"

মাওলানা মাদানী (রহঃ) তাঁর প্রাণ প্রিয় ছাত্রের এহেন জবাব শুনে খুশী য়েছিলেন এবং বাংলার ব্রাহ্মণ বাড়িয়া মাদ্রাসার শায়খুল হাদীস পদে মাত্র ষাট াকা বেতনে তাকে নিয়োগ করে পাঠালেন। কিন্তু হযরত সদর সাহেব (রহঃ) াও নিতে চাইলেন না। বললেন, এত টাকা দিয়ে আমি কি করব? আমার দশ াকা হলেই চলে যাবে। অতঃপর নিজের খরচের জন্য শুধুমাত্র সে দশ টাকাই তনি নিতেন। (তথ্যঃ মাওলানা আবদুর রাজ্জাক, মাওলানা শামছুল হক (রহঃ)- র জীবনী)।

হযরত সদর সাহেব (রহঃ) নিজের লিখিত ও অনূদিত বই থেকে একটি য়সাও রয়্যালটি বা লেখক সম্মানী নেননি। আপন সন্তানদেরকেও ভবিষ্যতে না নয়ার জন্য অছিয়ত করে গেছেন। তাঁর অনূদিত ও লিখিত গ্রন্থাবলী যেরূপ নপ্রিয়তা লাভ করেছে এবং যেরূপ মার্কেট পেয়েছে তিনি ইচ্ছা করলে তা থেকে াক্ষ লক্ষ টাকা নিতে পারতেন সম্পূর্ণ বৈধ পন্থায় কিন্তু তিনি তা করেননি। অন্যে স্তাব দিলেও তিনি তা নাকচ করে দিয়েছেন। একবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের াংলার এক অধ্যাপক তাঁর খিদমতে গিয়ে উক্ত পরামর্শ দিয়ে বললেন, আপনি িজে গ্রহণ না করে বরং তা নিয়ে দান করে দিলেও লক্ষ লক্ষ টাকা দান করার ওয়াব হত। হযরত দৃঢ় অথচ গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, "বাবা! টাকার গরমী এত

www.pathagar.com

ভয়ংকর যে, লক্ষ লক্ষ টাকা যদি আমার হাতে আসে তবে তখন যে আমি শামছু হক এখনকার শামছুল হক থাকব এই আত্ম বিশ্বাস আমার নেই। তাই ঐ টা আমার হাতে ধরার সাহস নেই।" (মাওলানা আবদুল হাই, আলোর কাফেলা, স্মৃতি ও অভিব্যক্তি)।

এরূপ অসংখ্য ঘটনা ও দৃষ্টান্ত পেশ করা যাবে যার মাধ্যমে সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয় যে, মুজাহেদে আ'যম হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপু (সদর সাহেব হুযুর) (রহঃ) ছিলেন একজন সার্থক ও খাঁটি নায়েবে রাসূ রাসূলের সফল ও যথোপযুক্ত ওয়ারিস। জীবনের সর্ব ক্ষেত্রেই পূর্ণাঙ্গভাবে হযর রাসূলে করীম (সাঃ)-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে কুরআনী চরিত্রে চরিত্র গড়েছিলেন তাই তাঁর অন্তর হয়েছিল জান্নাতী নূরের রৌশনীতে উজালা। দ্যুতিময় (আলোকচ্ছটায় তিনি আলোকিত করেছেন সারা বাংলা। আর অবশেষে রাসূ (সাঃ) প্রদত্ত পবিত্র দায়িত্ব যথাযথ ভাবে পালন করে হাজির হয়েছেন 'মাওলা হাকীকী'র দরবারে।

=== ০০০ ===

www.pathagar.com

মাতৃভাষায় ইসলামী সাহিত্য চর্চার অগ্রপথিক মাওলানা শামছুল হক ফরীদপুরী (রহঃ)

আবদুস সাত্তার কিশোরগঞ্জী

জীবনে চলার পথে আমরা যে সমস্ত ক্ষণজন্মা মনীষীদেরকে শ্রদ্ধাভরে যুগের পর যুগ স্মরণ করি, দ্বীনের সঠিক পথ প্রদর্শক মনেকরি এবং যাদের অক্লান্ত চেষ্টা-সাধনার ফলে মাতৃভাষায় ইসলামী সাহিত্য চর্চায় অনুপ্রাণিত হই, তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন বাংলার উজ্জ্বল নক্ষত্র, মুজাহিদে আ'যম মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ)।

যখন বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্য চর্চার পরিধি সংকীর্ণ ছিল, মাদ্রাসায় ছাত্রদের জন্য বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্য চর্চার উল্লেখযোগ্য কোন ব্যবস্থা ছিল না, এমন কি কোন কোন মাদ্রাসা পাশ আলেম মাতৃভাষায় চিঠি-পত্র লিখতেও হিমশিম খেয়ে যেত, তখন হযরত ফরিদপুরী (রহঃ) তাদেরকে এ দূরাবস্থা থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে মাতৃভাষায় ইসলামী সাহিত্য চর্চার প্রতি উদ্বুদ্ধ করতেন এবং তাদের জন্য মাদ্রাসায় পৃথক পাঠাগার স্থাপন করে সংবাদ-পত্র পাঠ, পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখা, বই-পুস্তক রচনা বা অনুবাদ করার জন্য উৎসাহিত করতেন।

তিনি প্রায়ই বলতেন, "এ যুগে ইসলামের উপর যত হামলা এসেছে তার অধিকাংশই চিন্তামূলক বিষয়কে ভর করেই এসেছে। এ যুগে ইসলাম বিদ্বেষীদের মোকাবেলায় অতীতের তরবারির জেহাদের চেয়ে কলমের জেহাদই মোক্ষম পন্থা। হাজার অস্ত্রধারী যা করতে না পারে একজন দুর্বল লেখক রুদ্ধদ্বার কক্ষে বসে তার চেয়ে অধিক করতে পারে।"

তিনি নিজে একথা যে কত গভীর ভাবে উপলব্ধি করেছিলেন, তার বিপুল সাহিত্য কর্মই এর বড় প্রমাণ। জীবনের বিভিন্ন দায়িত্ব পালনের পরও দেশ ও জাতিকে দ্বীনের সঠিক দিক নির্দেশনা এবং মাদ্রাসা পাশ ছাত্রদের মাতৃভাষায় ইসলামী সাহিত্য চর্চার পথ সুগম করার নিমিত্তে ছোট-বড় প্রায় শতাধিক বই লিখে যাওয়া চাট্টিখানি কথা ছিল না। তার লিখিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে "হক্কানী তাফসীর" উল্লেখযোগ্য যা ষোল হাজার পৃষ্ঠা সম্বলিত। অন্যান্য দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করার পর এ ধরণের মহান কাজ করা যে সম্ভব মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ)-তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। প্রকৃত পক্ষে চিন্তা ও গবেষণা মূলক কাজে এ ধরণের ব্যক্তির সংখ্যা অতি বিরল।

তিনি মাদ্রাসা পাশ ছাত্রদেরকে সাংবাদিকতা এবং মাতৃভাষায় ইসলামী সাহিত্য চর্চার মাধ্যমে নবীদের সঠিক উত্তর সূরি এবং দ্বীনের ধারক-বাহক হিসেবে গড়ে

www.pathagar.com

তোলার লক্ষ্যে "ইদারাতুল মা'আরিফ" নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে ছিলেন। এটি তাঁর ও মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ'যমী (রহঃ) এর দীর্ঘ দিনের চিন্তা ও আকাঙ্ক্ষার ফসল। যার ফলশ্রুতিতে উক্ত প্রতিষ্ঠানের সাবেক পরিচালক অধ্যক্ষ মাওলানা আবদুর রাজ্জাক ও মাওলানা নূর মোহাম্মদ আযমী (রহঃ) এর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এ প্রতিষ্ঠান থেকে অনেক লেখক, সাহিত্যিক ও সাংবাদিক তৈরী হয়েছে, যারা ইসলামের সুমহান আদর্শকে প্রতিটি মানুষের দ্বার-প্রান্তে পৌঁছিয়ে দেয়ার লক্ষ্যে চেষ্টা-সাধনা অব্যাহত রেখেছে।

অবশ্য পরবর্তীতে ১৯৭০ ইং গোলযোগে উক্ত প্রতিষ্ঠানটি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায়। বর্তমানে তাঁরই সুযোগ্য উত্তরসূরি, প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ, ঢাকার প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত, অন্যতম ঐতিহ্য বাহী ব্যতিক্রম ধর্মী প্রতিষ্ঠান "মাদ্রাসা দারুর রাশাদ মিরপুর"-এর সুযোগ্য প্রিন্সিপাল মাওলানা মুহাম্মদ সালমান সাহেব উক্ত প্রতিষ্ঠানটির গুরুত্ব অনুধাবন করে পুনরায় কাজ শুরু করেছেন।

মুজাহিদে আ'যম মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ) নিজেও একজন সাহিত্যিক এবং সুপ্রতিষ্ঠিত লেখক ছিলেন। বহু পত্র-পত্রিকার সাথেও তিনি জড়িত ছিলেন, তন্মধ্যে উল্লেখ যোগ্য হচ্ছে মাওলানা আকরাম খাঁ (রহঃ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত দৈনিক আজাদ এবং শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা আতাহার আলী (রহঃ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'সাপ্তাহিক নেজামে ইসলাম'। হযরত ফরিদপুরী (রহঃ) নিজেও হযরত থানভী (রহঃ)-এর ওয়াজ সমূহ এবং দ্বীনি বিষয়াবলী সম্বলিত মাসিক নিয়ামত নামে একটি অতি মূল্যবান পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। মাওলানা আবদুস সালামকে এ ব্যাপারে নিয়ামত প্রত্রিকার সম্পাদক রূপে কাজে লাগিয়েছিলেন। তৎকালীন যুগে ঐ পত্রিকার কোন বিকল্পই ছিল না। বাংলার ঘরে ঘরে তখন দ্বীনদার মহলে এই পত্রিকাই পঠিত হত।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, যখন ফিলিস্তিনের মুফতীয়ে আ'যম জনাব সৈয়দ আমীন আল-হোসাইনী (রহঃ) মুসলিম জাতিকে ধ্বংস করার জন্য খৃষ্টান জগতের মহাপরিকল্পনার প্রতিবাদে আরবী ভাষায় যে সারগর্ভ বক্তব্য পেশ করেছিলেন, তারই হুবহু বঙ্গানুবাদ করে তিনি সাপ্তাহিক নেজামে ইসলাম ১৯৬৪ সালের ১৪ই জুলাই সংখ্যায় প্রকাশ করেছিলেন। (মাওলানা আবু বকর সিদ্দীক, ইসলাম ও পাশ্চাত্য শিক্ষার ইতিকথা (ফেনী ইদারায়ে কওমিয়া, ১৯৬৯ইং, পৃষ্ঠা-৭২)

তাঁর এ ধরণের চেষ্টা-সাধনার ফলেই আজ ওলামায়ে কেরামের মাতৃভাষায় ইসলামী সাহিত্য চর্চা এবং সাংবাদিকতার পথ প্রশস্ত হয়েছে।

=০০০=

www.pathagar.com

ইসলামী রেনেসাঁর বীর সেনানী
মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ)

শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ

আমাদের এ উপমহাদেশের ইলমে দ্বীন ও আধুনিক জ্ঞানে সমৃদ্ধ যে ক'জন মনীষী জন্ম নিয়েছেন এবং জাতীয় জীবনের বিভিন্ন কর্মকান্ডে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থেকে সুফী-সাধক হিসেবে সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে সমুজ্জল দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছেন মাওলানা ফরিদপুরী (রহঃ) তাদের অন্যতম। "সদর সাহেব হুযুর" নামে খ্যাত এই মনীষী বৃহত্তর ফরিদপুরের গোপালগঞ্জ জেলার সদর থানার গওহারডাঙ্গা গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১৩০২ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ১৮৯৫ ঈসায়ীতে জন্মগ্রহণ করেন। মরহুম মুন্সী আব্দুল্লাহ্ তাঁর পিতা। মরহুমা আমেনা খাতুন তাঁর গর্বিতা মাতা পরিবারের ইসলামী পরিবেশে লালিত পালিত হয়ে কৈশোরে নিজেদের পার্শ্ববর্তী পাটগাতী গ্রামের মক্তবে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপন করে যশোর জেলার ভাগুটিয়া হাইস্কুলে ভর্তি হন। সেখানকার লেখাপড়া সমাপ্তির পূর্বেই তিনি কলকাতা চলেযান এবং ঐতিহ্যবাহী কলকাতা আলিয়ায় এ্যাঙ্গলো ফারসিয়ান বিভাগে ভর্তি হন। সেখান থেকেই তিনি বর্তমান ম্যাট্রিক সমমান এন্ট্রান্স পরীক্ষায় ৫টি বিষয়ে লেটারসহ স্কলারশীপ পেয়ে উত্তীর্ণ হন এবং স্বর্ণপদক লাভ করেন।

অতঃপর ভর্তি হন কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে। বছর কয়েক সেখানে অধ্যয়নের মাঝেই তিনি মুরশিদ মাওলানা থানভী (রহঃ)- এর সাহচর্যে ধন্য ও প্রভাবিত হন। ফলশ্রুতিতে তিনি একটি বিশেষ ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা পরিত্যাগ করে ইলমে দ্বীন হাসিলের জন্যে মুরশিদ মাওলানা থানভী (রহঃ) পরামর্শে প্রথমে সাহারানপুরে ও পরে বিশ্ববিখ্যাত দেওবন্দ মাদ্রাসায় ভর্তি হন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি দারুল উলুম দেওবন্দের একজন বিশিষ্ট অনুরাগী ছাত্র হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। দেওবন্দ মাদ্রাসায় তাঁর যশঃ ও প্রতিভার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। ইসলাম ও অন্যান্য বিষয়ে জগদ্বিখ্যাত অনেক সুপন্ডিত ও খোদাভিরু শিক্ষকের নিকট থেকে তিনি জ্ঞান লাভ করে ধন্য হন।

উল্লেখ্য, হযরত ফরিদপুরী (রহঃ) হাদীস ও তফসীর শাস্ত্রে পূর্ণ জ্ঞান ও দক্ষতা লাভের পূর্বেই আরবী সাহিত্য, দর্শন শাস্ত্র, সৌর বিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, প্রাণী বিজ্ঞান, পদার্থ বিজ্ঞান, গণিত শাস্ত্র, ইলমে নাহু ও ইলমে ছরফ, অলংকার শাস্ত্র, সুক্ষ্মতত্ত্ব জ্ঞান শাস্ত্র, ইসলামী আইন শাস্ত্র, নৈতিক চরিত্র বিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ব বিজ্ঞান, ইসলামের মূলনীতি শাস্ত্র, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ও

www.pathagar.com

পান্ডিত্ব অর্জন করেন। মোট কথা সাহিত্য, ধর্ম, নীতি শাস্ত্র, হাদীস, তাফসীরসহ ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানের সকল পর্যায়ে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ও পান্ডিত্ব অর্জন করে ১৯২৮ ঈসায়ীতে ৩৩ বছর বয়সে তিনি তাঁর শিক্ষা জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটান।

কিছু দিন উচ্চতর গবেষণায় স্বীয় শিক্ষকগণের সংস্পর্শে দারুল উলুম দেওবন্দেই তিনি অবস্থান করেন। ইতোমধ্যে হায়দ্রাবাদের নেযাম দারুল উলুমে মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী (রহঃ) এর নিকট তাঁর দেশের চীপ জাস্টিসের দায়িত্ব পালনের যোগ্য একজন বিজ্ঞ আলেম চেয়ে পাঠিয়েছিলেন। মরহুম মাওলানা মাদানী এ পদের জন্যে সদ্য শিক্ষা সমাপ্ত প্রজ্জ্বল মণীযা মাওলানা ফরিদপুরী (রহঃ) কে আহবান জানান। কিন্তু তিনি বিনয়ের সাথে সে প্রস্তাব গ্রহণ না করে দ্বীনের খেদমতে নিজের দেশেই ফিরে আসার অনুমতি চাইলেন।

দেশে ফিরে ১৯২৮ ঈসায়ীতে তিনি দ্বীনি শিক্ষা বিস্তারের মহৎ পরিকল্পনার অংশ হিসেবে বৃহত্তর কুমিল্লার ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার ইউনুসিয়া মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। অক্লান্ত পরিশ্রমের বিনিময়ে কয়েক বছরের মধ্যেই তিনি মাদ্রাসা থেকে দাওরায়ে হাদীস (টাইটেল) পর্যন্ত উন্নীত করেন। উল্লেখ্য, সেখানে তাঁর সহকর্মী ছিলেন ফখরে বাঙ্গাল মাওলানা তাজুল ইসলাম সাহেব (রহঃ), মাওলানা আব্দুল ওহাব পীরজী হুযুর (রহঃ) এবং হাফেয মুহম্মাদুল্লাহ (হাফেজ্জী হুযুর) (রহঃ) দেওবন্দ এবং মাওলানা থানভী (রহঃ) এর দরবারেও তারা এক সাথেই ছিলেন।

সময়ের বিবর্তনে তিনি তাঁর দুই সাথী পীরজী হুযুর এবং হাফেজ্জী হুযুরকে সাথে নিয়ে ১৯৩৩ ঈসায়ীতে পদ্মা নদীর দক্ষিণ পাড়ে বর্তমান বাগেরহাট জেলার গজালিয়ায় গজালিয়া মাদ্রাসা স্থাপন করেন।

কিছু দিন গজালিয়া মাদ্রাসায় কাজ করার পর ১৯৩৩ ঈসায়ীর শেষদিকে তিনি তাঁর কর্মস্থল ঢাকায় স্থানান্তর করেন এবং মুসলিম বাংলার ঐতিহ্যবাহী বিপনী কেন্দ্র চকবাজারের পাশে বড় কাটারায় একটি মাদ্রাসা স্থাপন করেন। উক্ত মাদ্রাসাই বর্তমান কালে 'আশরাফুল উলুম মাদ্রাসা' নামে দেশে-বিদেশে প্রসিদ্ধ। বুড়ীগঙ্গা নদীর তীরে মোগল শাসনামলের একটি বিরাট পুরাতন তেতলা ভবনে উক্ত মাদ্রাসাটি অবস্থিত।

উল্লেখ্য, বিখ্যাত চামড়া ব্যবসায়ী 'জিনজিরার হাফেয সাহেব' নামে খ্যাত জনৈক মহানুভব ব্যক্তির সহযোগিতায় মাওলানা ফরিদপুরী সাহেব ১৯৩৪ ঈসায়ীতে এ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। সে সময় তার সহযোগী ছিলেন মরহুম মাওলানা আব্দুল ওহাব পীরজী হুযুর (রহঃ) ও হাফেয মুহম্মদুল্লাহ হাফিজ্জী হুযুর

www.pathagar.com

রহঃ) প্রমুখ। মাওলানা ফরিদপুরী বড় কাটারা আশরাফুল উলুম মাদ্রাসায় অনেক ন যাবত অধ্যক্ষ হিসেবে কাজ করেন। বরং বলা চলে তাঁর শিক্ষকতা জীবনের রুত্বপূর্ণ ও বেশীরভাগ সময়ই এখানে অতিবাহিত হয়েছে।

ঢাকার আশরাফুল উলুম মাদ্রাসা পরিচালনার দায়িত্বে থাকাকালীনই মাওলানা ফরিদপুরী সাহেব গোপালগঞ্জস্থ নিজ গ্রাম গওহারডাঙ্গায় ১৯৩৭ ঈসায়ীতে খাদেমুল ইসলাম মাদ্রাসা" স্থাপন করেন। এ মাদ্রাসাটি বর্তমানে বাংলাদেশের ন্যতম একটি উল্লেখযোগ্য উচ্চ দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

রাজনীতি সচেতন প্রাজ্ঞ ব্যক্তিত্ব মাওলানা ফরিদপুরী (রহঃ)কে ১৯৪০ থেকে ৪৭ সালের আজাদী পর্যন্ত বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলন ও তৎপরতায় ব্যস্ত াকতে হতো। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে তিনি পুনরায় বড়কাটারা মাদ্রাসার প্রতি পূর্ণ মনোযোগ দিতে লাগলেন কিন্তু তার স্থলাভিষিক্তদের সাথে তাঁর মতপার্থক্য দেখা দেয় ফলে তিনি ১৯৮৯ ঈসায়ীতে মোগল স্মৃতিবিজড়িত লালবাগের কিল্লার সংলগ্ন জামেয়া কোরআনিয়া আরাবিয়া লালবাগ স্থাপন করেন। এ সময় তাঁর বিরাট সহযোগী ছিলেন মাওলানা জাফর আহমদ ওসমানী (রহঃ) যিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ-এর তৎকালীন বিভাগীয় প্রধান ছিলেন এবং মাওলানা মুহম্মদুল্লাহ হাফেজ্জী হুযুর (রহঃ) যিনি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার পূর্বেই লালবাগ শাহী মসজিদের ইমাম নিযুক্ত হয়েছিলেন। প্রকাশ থাকে যে, বর্তমান আশরাফাবাদে ফরিদাবাদ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠাতেও মাওলানা ফরিদপুরীর অবদান অনস্বীকার্য।

খেলাফত ও আজাদী আন্দোলনের একজন সক্রিয় কর্মী হিসেবে সর্ব প্রথম ১৯২০ ঈসায়ীতে রাজনৈতিক অঙ্গনে মাওলানা ফরিদপুরীর পদচারণা ঘটে। পথিমধ্যে কোরআন সুন্নাহর দ্বীপ্ত আভায় তা আরো সমুজ্জল ও সুপ্রভ হয়ে উঠে। প্রকাশ থাকে যে, ভারত বিভাগ প্রশ্নে উপমহাদেশের ইসলামী শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র দারুল উলুম দেওবন্দ এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী সেখানকার বিজ্ঞ আলেমগণ দু'ভাগ হয়ে গিয়েছিলেন-অখন্ড ভারতের সমর্থক ও খন্ড ভারতের তথা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সমর্থক আর উভয় দলেই মাওলানা ফরিদপুরীর পরম শ্রদ্ধেয় ওস্তাদগণ ছিলেন।

অখন্ড ভারতের সমর্থক জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ-এর নেতা ছিলেন মরহুম মাওলানা হোসাইন আহমদ আল মাদানী আর খন্ড ভারত তথা মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র আবাসভূমি পাকিস্তানের সমর্থক জমিয়তে উলামা-এ-ইসলামের নেতা ছিলেন মরহুম মাওলানা শাব্বীর আহমদ ওসমানী।

www.pathagar.com

উল্লেখ্য যে, মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ) উক্ত নাজুক পরিস্থিতিতে খন্ড ভারত তথা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার স্বপক্ষে সুদৃঢ় নেতৃত্ব প্রদান করেছিলেন এবং তিনিসহ তৎকালীন পাকিস্তানের উভয় খণ্ডের বিশিষ্ট ওলামা পীর মাশায়েখের উদ্যোগেই ১৯৪৫ সালে কলকাতার মোহাম্মদ আলী পার্কে নিখিল ভারত ওলামা কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়েছিল। যাতে মরহুম মাওলানা শাব্বীর আহমদ ওসমানীকে প্রধান করে খন্ড ভারত তথা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম গঠিত হয়েছিল। আর সে লক্ষ্যেই ১৯৪৫ সাল থেকে '৪৭ সালের ১৪ আগষ্ট পাকিস্তান কায়েম হওয়া পর্যন্ত মাওলানা ফরিদপুরী (রহঃ) অবিভক্ত ভারতের বিভিন্ন এলাকা সফর করেন এবং পাকিস্তনের স্বপক্ষে জনমত গড়ে তোলার জন্যে মুসলমানদেরকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করেন।

১৯৪৫ সালের ২৫শে জুন ভারতের হিমাচল প্রদেশের সিমলা কনফারেন্সে তিনি এক জেহাদি ভাষন দান করেছিলেন যাতে কায়েদে আ'যম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ অত্যন্ত মুগ্ধ হয়েছিলেন। অতঃপর জিন্নাহ সাহেব তাঁকে অবিভক্ত বাংলার মুসলিম লীগের সভাপতি করতে আগ্রহী হয়েছিলেন। কিন্তু মাওলানা ফরিদপুরী এ প্রস্তাব গ্রহণ না করে খাজা নাজিমুদ্দীনকে সভাপতি করার প্রস্তাব পেশ করেছিলেন।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর মাওলানা ফরিদপুরী একপর্যায়ে 'জমিয়ত-এ-উলামায়ে ইসলাম' বাংলার সভাপতি ছিলেন এবং মরহুম মুফতী দ্বীন মুহাম্মদ খাঁ ছিলেন সেক্রেটারী। তখন নিখিল পাকিস্তান জমিয়তে উলামা-এ-ইসলাম এর প্রেসিডেন্ট ছিলেন মাওলানা জাফর আহমদ ওসমানী ও সেক্রেটারী জেনারেল ছিলেন মাওলানা এহতেশামুল হক থানভী।

মাওলানা ফরিদপুরী (রাহঃ) '৪৭-এর স্বাধীনতার পর এ পর্যায়ে সম্ভবত ১৯৫৪ সালে সাবেক পাকিস্তান মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী পার্টির সদস্যও নির্বাচিত হয়েছিলেন। কিন্তু পরে ইসলামিক শাসনতন্ত্রের প্রশ্নে মুসলিম লীগের সাথে মতবিরোধ দেখা দেয়ায় তিনি তা থেকে ইস্তেফা দিয়ে সরে আসেন।

মাওলানা ফরিদপুরী (রহঃ) পাকিস্তানকে ইসলামী রাষ্টে পরিণত করার জন্যে নানা ভাবে ঐকান্তিক চেষ্টার কোন কসুর করেননি। এমনকি বার্ধক্যেও ইসলামী আন্দোলনে জড়িত প্রতি সংস্থা সংগঠনের প্রতি তাঁর সহযোগিতা ছিল। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরেই তিনি ইসলামী আন্দোলন শুরু করেন। ১৯৪৮ সালের জুন-জুলাইতে পাকিস্তান আদর্শ প্রস্তাবের চার দফা সমর্থনে সর্ব প্রথম তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তানে তাঁর উদ্যোগেই লালবাগ জামে মসজিদে এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তাতে সভাপতিত্ব করেন মাওলানা জাফর আহমদ উসমানী (রহঃ)।

www.pathagar.com

উল্লেখ্য, কাশ্মির সমস্যার উপরও ঐ সভাতে প্রস্তাব নেয়া হয়েছিল।

১৯৫০ সালে লিয়াকত আলী খানের পেশকৃত শাসনতান্ত্রিক মূলনীতির সমালোচনা থেকে শুরু করে যে আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল তাতেও মাওলানা ফরিদপুরীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

১৯৫১ ঈসায়ীর ২১ থেকে ২৪ শে জানুয়ারী করাচীতে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় উলামা সম্মেলনে যে ঐতিহাসিক ২২ দফা শাসনতান্ত্রিক মূলনীতি রচিত হয় মাওলানা ফরিদপুরী (রহঃ) সে সব মূলনীতি রচয়িতাদের অন্যতম। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ১৯৫১ সালের ১৩ই অক্টোবর মোমেনশাহী জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে তারই উদ্যোগে মুসলিম লীগের সমালোচনা এবং চার দফা আদর্শ প্রস্তাবের সমর্থনে বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

এছাড়াও করাচীর সর্বদলীয় উলামা সম্মেলনে (১৯৫১ সালের ২১-২৪ শে জানুয়ারী) প্রণীত ২২ দফা শাসনতান্ত্রিক মূলনীতির ভিত্তিতে ইসলামী শাসনতন্ত্র রচনার স্বপক্ষে জনমত সৃষ্টির জন্যে তিনি সে সময়ে প্রায় তিন মাসাধিককাল করাচীতে অবস্থান করেছিলেন এবং সভা সমিতিতে বক্তৃতা প্রদানসহ পত্রপত্রিকা ও গণ-মাধ্যমগুলোতে বিবৃতি প্রদান করে যাচ্ছিলেন।

১৯৫৩ সনে ইসলামী শাসনতন্ত্র রচনার জন্যে করাচীতে অনুষ্ঠিত উলামা মাশায়েখ সম্মেলনে মাওলানা ফরিদপুরী যোগদান করেছিলেন। শুধু তাই নয়, ইসলামী শাসনতন্ত্র রচনা এবং ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সহায়ক সময়োগযোগী বহু প্রবন্ধও তিনি ঢাকার পত্রপত্রিকায় প্রকাশ করেছিলেন।

১৯৫৫ সালে পূর্ব পাকিস্তানে আতাউর রহমান খানের মুখ্য মন্ত্রীত্বের আমলে শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন কল্পে তাঁরই নেতৃত্বে একটি শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়েছিল। উক্ত কমিশনের রিপোর্টে ধর্ম নিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থার সুপারিশ ছাড়াও মাদ্রাসা শিক্ষাকে কটাক্ষ করে মন্তব্য করা হয়েছিল যে, মাদ্রাসা শিক্ষা হচ্ছে সময় এবং অর্থের অপচয়। এছাড়া অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত আরবী বিষয় উঠিয়ে ফেলার সুপারিশও তাতে ছিল।

ঐ রিপোর্ট সর্ব সাধারণ্যে প্রকাশ হতে না হতেই তার বিরুদ্ধে দেশের ইসলামী জনতা প্রচন্ড আক্রোশে ফেটে পড়ে। সে সময় এ আন্দোলনের পুরোভাগে থেকে যারা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ) অন্যতম, শুধু তাই নয়, তিনি সে সময় ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রায় সব ক'টি পত্রিকাতে এর বিরুদ্ধে যুক্তিযুক্ত ও প্রামাণ্য কলম ধরেছিলেন।

সামরিক শাসক আইয়ুব খান কর্তৃক ১৯৫৬ সালে গৃহীত পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র বাতিলের ঘোষণার প্রতিবাদেও মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ)

www.pathagar.com

ছিলেন অগ্রসেনানী। এছাড়াও করাচীর দৈনিক পাকিস্তান স্ট্যান্ডার্ড পত্রিকার সম্পাদক ফরিদ জাফরী সুন্নাহর বিরুদ্ধে বিষোদগার করে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করলে সারা দেশ ব্যাপী '৫৫ সালের মত প্রচন্ড বিরোধিতা হয়। মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ) সে সময় "ফেৎনা-এ-এনকারে হাদীস" এর বিরুদ্ধে বিরাট প্রতিবাদী ভূমিকা পালন করেন। লেখা ও বক্তৃতার মাধ্যমে মুসলিম আইনে সুন্নার গুরুত্বকে দেশবাসীর কাছে তুলে ধরেন। এছাড়াও আইয়ূব খানের সামরিক সরকারের আমলেই জন্মনিয়ন্ত্রণ আইন এবং কুরআন সুন্নাহ বিরোধী মুসলিম পারিবারিক আইন নামে দু'টি জঘন্য আইন চালু করার চেষ্টা করা হয়।

মাওলানা ফরিদপুরী (রহঃ) সামরিক শাসনের এই নাজুক পরিস্থিতিতেও প্রবল আন্দোলন ও জনমত গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। এমনকি তিনি নিজে পারিবারিক আইন এবং আইয়ূব প্রবর্তিত জন্মনিয়ন্ত্রণ আইনের বিরুদ্ধে আলাদা দু'খানা বই রচনা করেছিলেন। এমনকি এই দু'টি আইন বাতিলের দাবীতে ১৯৬২ সালে কোন এক শুক্রবারে মার্শাল-ল ও সান্ধ্য আইনকে উপেক্ষা করেই জনতা শোভা যাত্রা বের করেছিল। আর এর নেতৃত্বের পুরো ভাগেই ছিলেন মাওলানা ফরিদপুরী (রহঃ)।

পরবর্তীতে প্রেসিডেন্ট আইয়ূব খান মাওলানা ফরিদপুরী (রহঃ)-কে ভাগে নেয়ার জন্যে দশ লক্ষ টাকার চেক, রাষ্ট্রীয় আমন্ত্রণ ও একাধিক আমলাকে তাঁর কাছে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু আল্লাহর পথের এই অকুতোভয় সৈনিক কিছুতেই দমে যান নি এবং বশও মানেননি।

১৯৬১ সালে ঈদের চাঁদ নিয়ে আইয়ূব সরকার এক হঠকারিতার পরিচয় দিয়েছিলেন। গভীর রাতে করাচীতে চাঁদ দেখা গেছে বলে পূর্ব পাকিস্তানেও ঐ অনুসারে ঈদ করার সরকারী নির্দেশ আসে। অথচ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের কোন জেলাতেই চাঁদ দেখার কোন খবর পাওয়া যায়নি। তৎকালীন প্রাদেশিক গভর্ণর মোনায়েম খানের নির্দেশে স্থানীয় ডি,সি মাওলানাকে পরদিন ঈদ করার কথা বললে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন এবং মাইকযোগে সকলকে ঐ দিন ঈদ না করার জন্যে সর্বত্র ঘোষণা করে দেন। অতঃপর ডি, সি পুনরায় গভর্ণরের নির্দেশের বিরুদ্ধাচারণ হচ্ছে বলে তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলে তিনি স্পষ্ট ভাষায় জবাব দিয়েছিলেন যে, ডেপুটি কমিশনার সাহেব আপনি দয়া করে আবদুল মোনায়েম সাহেবকে বলে দিবেন- এ অবস্থায় আমি মোনায়েম সাহেবের আদেশ অনুরোধ কিছুই মানতে রাজী নই।

উল্লেখ্য যে, প্রত্যেক এলাকার অন্ততঃ পাঁচশত মাইলের ভিতরে চাঁদ দেখা গেলে তখনই ঐ এলাকায় পরদিন ঈদ করা যায়।

www.pathagar.com

মাওলানা ফরিদপুরী (রহঃ) কে ১৯৬৬ সালের নির্বাচনে নিজের পক্ষ অবলম্বনের জন্যে প্রেসিডেন্ট আইয়ূব খান যারপর নাই চেষ্টা করেছিলেন। এমনকি নিজের বাসভবনেও তাঁকে দাওয়াত করে নিয়েছিলেন একাধিক বার। কিন্তু নীতির প্রশ্নে অটল মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ) কিছুতেই গলে যাননি বরং প্রেসিডেন্টের ভবনে বসেই তাকে জনমের মত শাসিয়েছিলেন। যা ছিল সত্যিই দুঃসাহসিকতা। প্রতিশোধে প্রেসিডেন্ট আইয়ূব খান কিছুই করতে সাহস পাননি। তবে তৎকালীন সৌদি আরবের বাদশাহ মরহুম ফয়সালের আমন্ত্রণে মাওলানা ফরিদপুরীর সৌদি আরব গমণে বাঁধা দিয়েছিলেন আইয়ূব খান নিজে। গভর্ণর মোনায়েম খান ও আযম খান অনেক বারই মাওলানা ফরিদপুরী (রহঃ)-কে নিজেদের হাউজে দাওয়াত করেছেন কিন্তু কিছুতেই এই মহান ব্যক্তিত্ব দ্বারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করাতে পারেন নাই।

জাত গবেষক ও লিখিয়ে মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ) প্রায় বলতেন-

"এ যুগে ইসলামের উপর যত হামলা আসছে তার অধিকাংশই চিন্তামূলক বিষয়কে ভর করেই আসছে। ইসলামের দুশমনদের মোকাবেলায় আজ অতীতের তরবারীর চাইতে কলমের জিহাদই মোক্ষম পন্থা। হাজার হাজার অস্ত্রধারী যা করতে না পারে একজন দুর্বল লেখক রুদ্ধদ্বার কক্ষে বসে কলমরূপ হাতিয়ার দ্বারা দুশমনের মোকাবেলায় অধিক সফলতা অর্জন করতে পারে।" মাওলানা ফরিদপুরী (রহঃ) তার ছাত্রদেরকে গবেষণা ও সাহিত্য কর্মে উৎসাহিত করতেন।

কুরআন-হাদীসের গবেষণা, ভাষা, সাহিত্য চর্চা, পুস্তক রচনা ও অনুবাদ শিক্ষা ইত্যাদি জ্ঞান চর্চার জন্যে তাঁর প্রত্যক্ষ উদ্যোগ ও মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ'যমী (রহঃ)-এর একান্ত পৃষ্ঠপোষকতায়ই ফরিদাবাদ মাদ্রাসায় তৎকালে 'ইদারাতুল মাআ'রিফ' নামে একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল। অবশ্য '৭০ এর গোলযোগে প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

সেবার সাইন বোর্ডে ধর্মান্তরিত করার কাজে নিয়োজিত খৃষ্টান মিশনারীদের বিরুদ্ধেও মাওলানা ফরিদপুরী (রহঃ) সময়োপযোগি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৪০ সালে 'খাদেমুল ইসলাম জামায়াত' নামে একটি সেবা সংগঠন তাঁরই হাতে গঠিত হয়েছিল। এছাড়া লেখনির দ্বারা খৃষ্টান মিশনারীদের স্বরূপ উম্মোচনেও তিনি চার চারটি পুস্তিকা প্রণয়ন করেছিলেন। যথা:-

(১) পাদ্রীদের গোমর ফাঁক, (২) আল্লাহর প্রেরীত ইঞ্জিল কোথায়, (৩) শত্রু থেকে হুশিয়ার থাক, (৪) চারি ইঞ্জিল।

www.pathagar.com

প্রকাশ থাকে যে, খৃষ্টান মিশনারীদের অপতৎপরতার বিরুদ্ধে 'আঞ্জুমানে তাবলীগুল কুরআন' নামে একটি জামাতও তিনি গঠন করেছিলেন। যা খাদেমুল ইসলাম জামায়াত-এর শাখা হিসাবে পরিগণিত হত।

গ্রাম-গঞ্জের প্রতিটি ঘরে ঘরে আল কুরআনের আলো পৌঁছে দেয়ার নিমিত্তে গ্রামে গ্রামে পাড়ায় পাড়ায় ফুরকানিয়া মক্তব ব্যাপক ভাবে প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে মাওলানা ফরিদপুরী (রহঃ) ছিলেন প্রাণ পুরুষ। এছাড়াও আল কুরআনের শিক্ষা ও শিক্ষিতদের ব্যাপক প্রসারের জন্য ১৯৬২ সালে তাঁরই পবিত্র হাতে গঠিত হয়েছিল "কুরআন তহবিল।" যে তহবিলের উপযোগ্যতা সত্যিই বর্ণনাতীত।

মসজিদের দেশ বাংলাদেশ। দেশের প্রতিটি নাগরিকের প্রাত্যহিক জীবনে মসজিদের ইমামগণের ভূমিকা সত্যই অনস্বীকার্য। মসজিদের ইমামগণকে সুসংগঠিত করে সুপরিকল্পিত ভাবে গাইড প্রদান করতে পারলে সোনালী সমাজ গঠন খুবই বাস্তব ও অনেকটাই সহজ। মাওলানা ফরিদপুরী (রহঃ) এই সহজ বিষয়টিকে বাস্তবায়িত করার জন্যেই ১৯৬৬ সালে খুলনা টাউন মসজিদে বিরাট উলামা কনফারেন্স ডেকে "আইম্মায়ে মাসাজিদ" নামে একটি সমিতি গঠন করেছিলেন।

খুলনা বিভাগের তৎকালীন পাঁচটি জেলার ইমামগণের সমন্বয়ে এটি গঠিত হয়েছিল। ঢাকা কেন্দ্রীক না হওয়াতে এর তেমন প্রচার ছিলনা। ফলে মাওলানার তিরোধানের পর এর আর ব্যাপক কোন কার্যক্রম চোখে পড়ে না।

মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ) প্রথমে ইংরেজী ও পরে কুরআন হাদীসের উচ্চ শিক্ষা লাভ করায় সাধারণ শিক্ষা ও মাদ্রাসা শিক্ষায় কি কি ত্রুটি বিচ্যুতি রয়েছে সে ব্যাপারে পূর্ণ অবহিত ছিলেন। তাই তিনি উভয় শিক্ষারই সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর মতে, দেশের সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে নিজস্ব কৃষ্টি-সংস্কৃতি ও জীবনাদর্শ সম্পর্কে যে হীনমন্যতা তার প্রধান কারণ হল শুধু বস্তুবাদি শিক্ষা গ্রহণ এবং ইসলামী শিক্ষার ব্যাপারে অজ্ঞতা। এই জন্যে তিনি দেশের আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় কুরআন ও সুন্নাহর শিক্ষাকে বাধ্যতা মূলক করে মুসলিম যুব সমাজকে আত্মসচেতন ও জাতীয় গৌরববোধ সম্পন্ন করে গড়ে তোলার উপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবীদার ছিলেন। মাদ্রাসার ছাত্রদেরকে কারিগরী শিক্ষা দিয়ে স্বনির্ভর করে গড়ে তোলার ব্যাপারেও তাঁর অবদানের শেষ ছিলনা।

এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন- "ওহীর জ্ঞান তথা কুরআন-সুন্নাহর আলো ব্যতিরেকে মানুষ সত্ত্বার পূর্ণ বিকাশ ঘটেনা। ধর্মহীন কর্ম এবং কর্মহীন ধর্ম উভয় দৃষ্টি ভঙ্গির শিক্ষাই জাতিকে পঙ্গু করে।"

www.pathagar.com

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ১৯৯৩ সালে সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের সকল মাদ্রাসা থেকে আগত হাজার হাজার ছাত্র "ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয়" প্রতিষ্ঠার দাবীতে ঢাকার রাজপথে নেমে পড়েছিল। সেটা ছিল স্মরণকালের এক বৃহত্তর ছাত্র শোভাযাত্রা। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল আযম খান মাদ্রাসা ছাত্রদের এ দাবী মেনে নিয়ে এ উদ্দেশ্যে ডক্টর সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেনের নেতৃত্বে এগার সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিশন গঠন করেছিলেন। আর এর অন্যতম সদস্য ছিলেন মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ)। কিন্তু সরকারের টালবাহানার কারণে তা আর পরবর্তীতে কার্যকর হয়নি।

প্রকাশ থাকে যে, ইসলামী শিক্ষা আন্দোলনের নিমিত্তে আলীয়া ও কাওমী মাদ্রাসা ছাত্রদের সমন্বয়ে গঠিত তুলাবা-এ-আরাবিয়া নামক সংস্থার এক পর্যায়ে সভাপতির দায়িত্বেও মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী আসীন ছিলেন। এ ছাড়াও মজলিসে তামীরে মিল্লাত ও ইসলামী জমিয়তে তুলাবার প্রতি মাওলানা ফরিদপুরীর প্রত্যক্ষ পরোক্ষ সাহায্য ও সহযোগিতা এবং পরামর্শ ছিল।

ইলমে দ্বীনের পূতঃ নূরে ভাস্বর মাওলানা ফরিদপুরী (রহঃ) আলেমদের পারস্পারিক এখতেলাফ ও কোন্দলের অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন। কুরআন-সুন্নাহর মৌলিক কোন বিধানের যদি কেউ বিরোধী না হত কিংবা ঐ বিরোধীতায় সহযোগিতা না করে এমন প্রতিটি মত ও পথের অনুসারীদেরই তিনি আপন মনে করতেন এবং সকলকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করতেন।

মাওলানা ফরিদপুরী (রহঃ) উলামা সম্প্রদায় ও সাধারণভাবে মুসলমানদের মাঝে খুঁটিনাটি বিষয় নিষ্পত্তি করে ঐক্য প্রতিষ্ঠায় কিরূপ দৃষ্টিভঙ্গি পোষন করতেন তাঁর জীবনের একাধিক ঘটনা ও তাঁর বহু লেখার মধ্যে তা সুস্পষ্ট।

অপরপক্ষে তিনি জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে অর্থলোভী, স্বার্থপর ও বাতিল সরকারের ক্রিড়নক আলেম ও পীরদের পরিচয় এবং তাদের কাজের ইহ-পরকালীন মারাত্মক পরিণতি তুলে ধরে "উলামা-এ-ছু" (অসৎ আলেম) নামে এক ব্যতিক্রমী পুস্তক রচনা করেছিলেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, মাওলানা ফরিদপুরী তাবলীগ জামাত এবং জামায়াতে ইসলামীর সাথেও সুসম্পর্ক রক্ষা করে চলেছেন আজীবন। দাওয়াতের ক্ষেত্রে তাবলীগ জামাত এবং রাজনৈতিক বিষয়াদিতে জামায়াতে ইসলামীকে তাঁর প্রত্যক্ষ পরোক্ষ সাহায্য সহযোগিতা এবং পরামর্শ প্রদান ছিল নিত্যনৈমিত্তিক বিষয়। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের বর্তমান আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেবের সাথে তাঁর আমৃত্যু সুসম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। এছাড়াও জামায়াতে

www.pathagar.com

ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদুদী (রহঃ)র সাথেও তাঁর সম্পর্ক ও যোগাযোগ ছিল অতি প্রগাঢ়। উভয়ের মাঝে একাধিকবার সাক্ষাৎ হয়েছে আর পত্র যোগাযোগ তো ছিলই।

উল্লেখ্য যে আইয়ূব শাসনামলে জামায়াতে ইসলামীর নেতা অধ্যাপক গোলাম আযম প্রায় সময়ই ইসলামী আন্দোলনের পরামর্শের জন্যে লালবাগ মাদ্রাসায় মাওলানা ফরিদপুরীর কাছে হাজির হতেন।*

মাওলানা ফরিদপুরী (রহঃ) একজন প্রথিতযশা সাহিত্যিক ও উদার দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন মহাপুরুষ ছিলেন। জীবনের বিভিন্নমুখী দায়িত্ব পালনের পরও দেশ, জাতি ও ইসলামের কল্যাণে তিনি ছোট বড় প্রায় ৯০ খানা বই লিখে গিয়েছেন। তন্মধ্যে একখানা তাফসীরও রয়েছে। হাক্কানী তাফসীর নামক এই অনন্য তাফসীর গ্রন্থের অংশবিশেষ ছাপা হয়েছে। এছাড়া কয়েকটি অনন্য গ্রন্থের স্বার্থক অনুবাদকও হচ্ছেন মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ)। "বেহেশতী জেওর" তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

মাওলানা ফরিদপুরী (রহঃ) বাহ্যিক প্রদর্শন ও ভাষার অলংকারিক চাকচিক্য দিয়ে নয় বরং বাস্তব জীবনের বিভিন্ন কঠিন পরীক্ষা ও কাজের মধ্য দিয়ে নিজের তাকওয়া-পরহেজগারী, এখলাছ-খোদভীতি ও নৈতিক দৃঢ়তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন।

মাওলানা ফরিদপুরী (রহঃ) একজন খাটি পীরও ছিলেন। আত্মশুদ্ধির সবক নেয়ার জন্যে অগণিত মানুষ বহু দূর দূরান্ত থেকে তাঁর কাছে ছুটে আসত। এই নির্লোভ ও নির্মোহ অনন্য ব্যক্তিত্বটি জীবনের বিভিন্ন বাঁকে অজস্র প্রলোভন ও ক্ষমতাসীনদের নেক দৃষ্টি প্রাপ্ত হয়েও নিজের আখের গোছানোর কোন চেষ্টাই করেননি বরং সব কিছুকেই স্বীয় পদদলে মাড়িয়ে একমাত্র আল্লাহর জন্যেই কাজ করেছেন আজীবন। তাইতো এই নামটি ইতিহাস একটি প্রতিষ্ঠান।

মাওলানা ফরিদপুরী (রহঃ) তাঁর কর্মময় জীবনের কেন্দ্রস্থল ঢাকা থেকে ১৯৬৮ সালের জানুয়ারী মাসে শেষ বিদায় নিয়ে ফরিদপুরের নিজ বাড়ী গওহারডাঙ্গায় চলে যান। প্রকাশ থাকে যে, বাড়ী ফেরার পর মাত্র ১৩ মাস এই মর্দে মুমীন জীবিত ছিলেন। বিভিন্ন প্রকারের অসুখবিসুখ আর ক্রমাগত স্বাস্থ্যের

---

* কিন্তু পরবর্তীকালে মওদূদী সাহেবের বিভিন্ন চিন্তাধারা সম্বন্ধে তিনি জোর আপত্তি তোলেন এবং সেগুলো সংশোধনের আহবান জানান। সে আহবানে সাড়া দিতে ব্যর্থ হওয়ায় তিনি মওদূদী সাহেব ও জামায়াতে ইসলামীর বিচ্যুতি সমূহ চিহ্নিত করে তা সংশোধনের জন্য "ভুল সংশোধন" বই লেখেন।

www.pathagar.com

অবনতিতে ১৯৬৯ সালের ২১শে জানুয়ারী রোজ মঙ্গলবার বেলা ২-৩০ টায় আল্লাহর অমোঘ বিধানে তারই সাড়া দিয়ে তিনি পরপারের পথে যাত্রা করেন- "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।"

পরদিন ২২শে জানুয়ারী '৬৯ সন। দুপুর ১১ টায় গওহারডাঙ্গা মাদ্রাসার মুহতামিম মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল আজিজ সাহেবের ইমামতিতে জানাজা অনুষ্ঠিত হয় এবং গওহারডাঙ্গা মাদ্রাসার পাশেই পূর্ব ওছিয়ত মাফিক তাঁকে কবর দেয়া হয়।

মাওলানা মরহুমের জানাজায় হাজার হাজার আলেমসহ প্রায় লক্ষাধিক লোক উপস্থিত হয়েছিলেন বলে প্রত্যক্ষদর্শীদের মুখে জানা যায়। মাওলানা ফরিদপুরী (রহঃ) দুই পুত্র ও কন্যা সন্তানের জনক ছিলেন।

=000=

www.pathagar.com

মুজাহিদে মিল্লাত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ)

মাওলানা উবায়দুল হক

দারুল উলূম দেওবন্দে পড়ার সময় (১৯৪২-৫০) বাংলাদেশী ছাত্রদের মুখে মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরীর নাম প্রায়ই শুনতাম যে, তিনি দেশের একজন বিখ্যাত আলেম ও বুযুর্গ, ঢাকা বড় কাটারা আশরাফুল উলূম মাদ্রাসার প্রধান ও প্রতিষ্ঠাতা। তখন-ই আমার মনে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের আগ্রহ জন্মে।

১৯৫০ মোতাবেক ১৩৭০ হিঃ সনে আমাদের মুরব্বী হযরত মাওলানা আতহার আলীর হুকুমনামা পেলাম যে, "তোমাকে মাদ্রাসা আশরাফুল উলূমে শিক্ষকতার জন্য নিয়োগ দান করা হয়েছে। পত্র পাওয়া মাত্র এসে পড়।" তখন আমি দেওবন্দ মাদ্রাসায় দাওরায়ে হাদীস ও তাফসীর বিভাগে পড়া শেষ করে অবশিষ্ট ফনুনাতের কিতাবাদি পড়ছিলাম। উক্ত পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে সম্ভবত ১৩৭০ হিজরীর জুমাদাল উলা মাসে আমি বড় কাটারা মাদ্রাসায় এসে পৌঁছেছি। এখানে এসে লক্ষ্য করলাম যে, মাদ্রাসা পরিচালনার মূল দায়িত্বে রয়েছেন পীরজী হুযুর মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্হাব সাহেব, আর সদর সাহেব হুযুর মুরব্বী হিসাবে আসা-যাওয়া করেন।

কিছু দিনের মধ্যে জানতে পারলাম যে, মাদ্রাসা পরিচালনার ব্যাপারে সদর সাহেব হুযুর এবং জনাব পীরজী হুযুরের মধ্যে বিরাট মতানৈক্য সৃষ্টি হয়েছে। তাঁদের মধ্যে সমঝোতার জন্য মাদ্রাসার শুভাকাঙ্ক্ষী ও অভিভাবকদেরকে নিয়ে কয়েকবার বৈঠক হয়। কিন্তু এ সকল প্রচেষ্টা দ্বারা মতভেদের কোন নিরসন হয়নি। বরং শিক্ষকগণও দুইভাগে বিভক্ত হয়ে যান। একভাগ সদর সাহেব হুযুরের সমর্থক, অন্যভাগ পীরজী হুযুরের। তখন আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব এড়িয়ে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে মাদ্রাসার কিছুসংখ্যক মুরব্বী ও অভিভাবক সদর সাহেব হুযুর ও তাঁর সমর্থকদের মাশওয়ারা দেন যে, আপনারা বড় কাটারা ত্যাগ করে লালবাগ শাহী মসজিদ সংলগ্ন স্বতন্ত্র মাদ্রাসা স্থাপন করে নেন।

পূর্ব থেকেই হযরত হাফেজ্জী হুযুর লালবাগ শাহী মসজিদের ইমাম ছিলেন এবং মসজিদের পরিবেশের সাথে তাঁর গভীর সম্পর্ক ছিল। কাজেই, উক্ত মাশওয়ারার পরিপ্রেক্ষিতে হযরত মাওলানা যা'ফর আহমদ উসমানী, মাওলানা মুফতী দ্বীন মোহাম্মদ সাহেবসহ লালবাগ শাহী মসজিদকে কেন্দ্র করে জামেয়া কোরআনিয়া আরাবিয়া লালবাগ মাদ্রাসা স্থাপনের সিদ্ধান্ত হয় এবং পরবর্তী শাওয়াল ১৩৭০ হিজরী থেকে সদর সাহেব হুযুরের তত্ত্বাবধানে জামেয়া

www.pathagar.com

ারআনিয়ার কার্যক্রম চালু হয়। হযরত উসমানী ও মাওলানা মুফতী দ্বীন হাম্মদ সাহেব এর মত ব্যক্তিত্বের পৃষ্ঠপোষকতা ও উচ্চ যোগ্যতা সম্পন্ন ক্ষকদের সমবেত হওয়ার কারণে অল্পদিনের মধ্যেই জামেয়া কোরআনিয়া লবাগ বিশেষ সুনাম অর্জন করে।

হযরত মাওলানা ফরিদপুরী শুধু একজন শিক্ষক বা মাদ্রাসা পরিচালক ছিলেন বরং দেশের সর্বশ্রেণীর দ্বীনী পরিবেশের সাথে তার সম্পর্ক ছিল। জনীতিবিদ, দার্শনিক, পীর-মাশায়েখ, শিক্ষানুরাগী প্রমুখ সকল শ্রেণীর লোকজন র নিকট যাতায়াত করতেন এবং তাঁর উপদেশাবলী নিজ জীবনের পাথেয় সেবে গ্রহণ করতেন। আমিও বহুবার তাঁর মজলিসে উপস্থিত হয়ে বিভিন্ন াীহত শোনার সৌভাগ্য লাভ করেছি। তিনি তাঁর নিকট যাতায়াতকারী সকলের তি এত স্নেহ ও মনোযোগ প্রকাশ করতেন যে, প্রত্যেকে মনে করত তিনি কেই বেশী ভালবাসেন।

হযরত সদর সাহেবের পূর্বপুরুষগণ বিশ্বস্ত সূত্র মতে আরব থেকে এ দেশে াগমণ করেন। বঙ্গবিজয়ী বখতিয়ার খিলজীর সতের জন সঙ্গীর মধ্যে তাঁরই পূর্ব রুষের একজন সৈনিক ছিলেন। যিনি পরবর্তীতে যশোরে বসতি স্থাপন রেছিলেন। তাঁরই সন্তান পরবর্তীতে ফরিদপুরের গওহারডাঙ্গায় এসে স্থায়ীভাবে নবাস করেন।

হযরত মাওলানার শিক্ষা জীবন ছিল বৈচিত্রময়। প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ারম্ভ করে শিক্ষার প্রতিটি স্তরে তিনি স্বীয় প্রতিভার বিরল দৃষ্টান্তের স্বাক্ষর খেছেন। সদর সাহেব (রহঃ)-এর পিতা মুনশি মুহাম্মদ আবদুল্লাহ সাহেব র্বপ্রথম স্বীয় পুত্রকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করার মনস্থ করেছিলেন। কিন্তু যরত সদর সাহেব ফাঁকে ফাঁকে আরবী ও দ্বীনী বিষয়ে গভীর অধ্যয়ন করতেন। নি আধুনিক শিক্ষার এক পর্যায়ে কলকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের ফাইনাল রীক্ষা না দিয়েই দ্বীনী শিক্ষার গভীর অনুপ্রেরণায় দারুল উলূম দেওবন্দে গমণ রেন।

দেওবন্দ উপস্থিত হওয়ার পর তিনি থানা ভবনে যান এবং সে যুগের প্রসিদ্ধ ীয়ে কামেল, হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা শাহ্ আশরাফ আলী থানভী হঃ)কে নিজের মুরব্বী ও মুরশিদ হিসাবে গ্রহণ করেন। তাঁরই পরামর্শে তিনি থমে সাহারানপুর মাজাহেরে উলূম মাদ্রাসায় মিশকাত জামাত পর্যন্ত কৃতিত্বের থে লেখাপড়া করেন। অতঃপর দারুল উলূম দেওবন্দ এসে দাওরায়ে হাদীসে রিক হন। যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস আল্লামা আনওয়ার শাহ্ কাশমীরীর নিকটও তিনি ছুদিন হাদীসের সবক পড়েন। আল্লামা কাশমীরী ডাবেল চলে গেলে সদর

www.pathagar.com

সাহেব দেওবন্দেই থেকে যান এবং শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা সাইয়ে হুসাইন আহমদ মাদানীর নিকট দাওরায়ে হাদীসের শিক্ষা সমাপ্ত করেন।

হযরত সদর সাহেব দেওবন্দে থাকাকালীন সময়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জামে ইউনুসিয়া মাদ্রাসার মোহতামিম হাদীসের শিক্ষকের জন্য হযরত মাদানীর নিব পত্র লেখেন। এ প্রেক্ষিতে উস্তাদগণ তাকে সেখানে পাঠানোর ব্যবস্থা করে হযরত সদর সাহেব হযরত থানভী (রহঃ)এর অনুমতি নিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া মাদ্রাস প্রধান শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন। কিছুদিন পর তারই যোগাযোগের মাধ্য উক্ত মাদ্রাসায় হযরত হাফেজ্জী হুযুর এবং হযরত পীরজী হুযুরও শিক্ষক হিসা নিয়োজিত হন।

পরবর্তী সময় সেখানে কিছু প্রতিকূল অবস্থা সৃষ্টির কারণে হযরত সদ সাহেব, হাফেজ্জী হুযুর ও পীরজী হুযুর ব্রাহ্মণবাড়িয়া মাদ্রাসা ত্যাগ করে খুল জেলার গজালিয়ায় গিয়ে একটি মাদ্রাসা স্থাপন করে দ্বীনের খেদমতে নিয়োজি হন। সেখানের পরিবেশও অনুকুলে না হওয়ার কারণে বছর খানেক পর তাঁ বাংলার কেন্দ্রীয় শহর ঢাকায় চলে আসেন এবং কিছুদিন লোহার পুলের প পার্শ্বের এক মসজিদে কিছু ছাত্র নিয়ে শিক্ষা প্রদানের সূচনা করেন। অতঃপ বাদামতলী স্টীমার ঘাট মসজিদে তাঁরা চলে আসেন এবং এখানেই দ্বীনী শিক্ষ কার্যক্রম চলতে লাগল।

জায়গার সংকীর্ণতার দরুণ মাদ্রাসার কাজ চালাতে কষ্ট হত। এরই মে জিঞ্জিরার জনাব আলহাজ্জ হাফেজ মুহাম্মদ হুসাইন সাহেব– যিনি তৎকালে ব বিত্তবান এবং দানশীল ব্যক্তি ছিলেন এবং বড় কাটারা ছোট কাটারাস চকবাজারের বিভিন্ন বড় বড় জায়গা তাঁর মালিকানায় ছিল।

তাঁদের নিষ্ঠাপূর্ণ দ্বীনী খেদমতে অনুরাগী হয়ে বড় কাটারায় মাদ্রাসা স্থানান্তরে পরামর্শ দেন। বড় কাটারা মোগল আমলে শাহী সেনানিবাস ছিল এবং তখ পরিত্যক্ত ও ময়লা আবর্জনায় পূর্ণ ছিল। অতঃপর এই ইমারতকে পরিস্ক পরিচ্ছন্ন করে তিন বুযুর্গ এখানে পুরোদমে মাদ্রাসার কাজ পরিচালনা করে পরবর্তীতে এ বড় কাটারা আশরাফুল উলূম মাদ্রাসা বাংলাদেশের প্রসিদ্ধ মাদ্রাস রূপান্তরিত হয়।

হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ) এছাড়া বাংলাদেশে আর বিভিন্ন মাদ্রাসা ও দ্বীনি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছেন। হযরতের দেশের বাড়ীতে তাঁর স্থাপনকৃত গওহারডাঙ্গা মাদ্রাসা আজও দেশের একটি প্রসিদ্ধ মাদ্রাসা হিসে বিবেচিত।

www.pathagar.com

হযরত সদর সাহেব জনকল্যাণমূলক কাজে এবং সাধারণের মাঝে দ্বীনি শিক্ষা ।ারে বড়-ই মনোযোগী ছিলেন। এরই লক্ষ্যে তিনি খাদেমুল ইসলাম নামক বামূলক ও দ্বীনি বিষয়াদি প্রচারের জন্য একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। যার র্যক্রম আল্লাহর ফজলে আজ সারা দেশে বিস্তৃত রয়েছে। এরই সাথে সাথে তিনি লেন ইত্তিহাদ ও ইত্তিফাকের প্রতীক। ইসলামী, দ্বীনি ও রাজনৈতিক দল লাকে একত্র করে বিরোধমুক্ত ভাবে কাজ করার জন্য আজীবন প্রচেষ্টা চালিয়ে ন।

তিনি মাদ্রাসা ও মক্তবের শিক্ষকদের জন্য বিভিন্ন স্থানে ট্রেনিং এরও ব্যবস্থা রেছিলেন। তাদেরকে মসজিদ ভিত্তিক দ্বীনি ও কুরআনী শিক্ষা বিস্তারের প্রতি শেষভাবে উদ্বুদ্ধ করেছেন এবং মসজিদ পরিচালনার নিয়ম-নীতি সম্পর্কে একটি ত্বপুর্ণ গ্রন্থও রচনা করেছেন।

হযরত সদর সাহেব (রহঃ) ছিলেন জন্মগত ওলী এবং নির্ভীক মুজাহিদ, ত্যর বেলায় আপোষহীন, সত্য ও সঠিক ব্যপারে কথা বলতে তিনি কারো রায়া করতেন না। দিধাহীন চিত্তে তিনি প্রতিবাদ করতেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে। নি ছিলেন নিঃস্বার্থ , নির্লোভ, সমাজ ও দ্বীনের খেদমতে নিবেদিত প্রাণ। কিস্তানের তৎকালিন সামরিক শাসক জেনারেল আইয়ুব খানের সাথে বিভিন্ন য় সাক্ষাতে এবং লেখনীর মাধ্যমে সত্য ও হক কথা কঠোর ভাবে বলতে কোন ওয়া করেননি।

তিনি নিজের জন্য বা মাদ্রাসার জন্য সরকারী অনুদান গ্রহণ করতেন না। নো কখনো মাদ্রাসায় অনুদান হিসেবে সরকারের পক্ষ থেকে পেশকৃত বিরাট হায্যকেও গ্রহণ করেননি।

তিনি তাঁর লেখনীর মাধ্যমে দ্বীনের যে অসাধারণ খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন অতুলনীয়। তাঁর লিখিত কিতাবাদির সংখ্যা প্রায় এক'শ। তাঁর লিখিত তাবাদি ও পুস্তক-পুস্তিকা কোনটির রয়ালিটি তিনি সংরক্ষণ করেননি। এটা তাঁর লাসের বিরাট নিদর্শন। আল্লাহ তা'লা তাঁকে জন্নাতের সর্বোচ্চ স্থানে আসীন ন এবং আমাদেরকে তাঁর জীবন ও কর্ম থেকে উপকৃত হওয়ার তাওফিক দান ন।

=== ০০০ ===

www.pathagar.com

হযরত ফরিদপুরী (রহঃ) এর সান্নিধ্যে কিছুক্ষণ

মাওলানা আতাউর রহমান খান

হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ) এর নিকট দীর্ঘ দিন থাক সুযোগ আমার হয়ে উঠেনি। তবে তাঁরই সুযোগ্য সাথীভাই হযরত মাওল আতহার আলী (রহঃ) এর দরবারে সারাক্ষণ কাটাবার খোশ নসীব আম হয়েছে। এরই সুবাদে হযরত মাওলানা ফরিদপুরী (রহঃ) 'সদর সাহেব' হুযু সান্নিধ্যে অল্পক্ষণের জন্য হলেও কিছু সময় কাটাবার সুযোগ আমার হয়েছিল।

হযরত আতহার আলী (রহঃ), হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপু (রহঃ)কে অত্যন্ত ভালবাসতেন, শ্রদ্ধা করতেন। তাঁরা দু'জন দেশের দু'প্রা থাকলেও আন্তরিকতার দিক দিয়ে তাঁরা উভয়ে উভয়ের ছিলেন একান্ত কা এবং ঘনিষ্ঠ। গুরুত্বপূর্ণ কোন কাজ তাঁরা একে অপরের পরামর্শ ছাড়া করতেন ন চিঠির মাধ্যমে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের পরামর্শ আদান প্রদান করতেন। হযরত স সাহেব (রহঃ)এর বহু পত্র আমি হযরত আতহার আলী (রহঃ)এর নিকট দেখে আমাদের সংগ্রহেও ছিল। কিন্তু একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে মুক্তিবাহিনী আতহার আ (রহঃ)এর মূল্যবান বহু গ্রন্থ, হযরত সদর সাহেব, শাব্বির আহমদ উসমা হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ) এবং হুসাইন আহমদ মাদ (রহঃ) ও যাফর আহমদ উসমানী (রহঃ)সহ অনেক বড় বড় ব্যক্তি মহামূল্যবান অনেক পত্র জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভস্ম করে দিয়েছে। সেগুলো থাক আমরা তা থেকে অনেক সমস্যার সমাধান পেতে পারতাম।

এই স্মারক প্রকাশের জন্যও ব্যবস্থাপক মাওলানা সালমান সাহেব আম কাছে এবং হযরত আতহার আলী (রহঃ) এর সুযোগ্য সন্তান মাওলানা আনো শাহ্ সাহেবের কাছে হযরত সদর সাহেব (রহঃ) আতহার আলী (রহঃ)এর নি লিখিত পত্র চেয়ে লোক পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু আমরা তাঁকে কোন সহযোগি করতে পারিনি। এসব যুগশ্রেষ্ঠ সূর্যপুরুষের কোন লিখিত মাওয়াদ আমাদের কা প্রায় অনুপস্থিত। তাঁদের সম্বন্ধে এখন কিছু জানবার একমাত্র উপায় তাঁর সোহ প্রাপ্ত ব্যক্তি-বর্গ। এঁরাও ক্রমেই একের পর এক বিদায় নিয়ে চলে যা আমাদের থেকে। এমন এক সময়ে মাওলানা সালমান সাহেবের এ উদে সময়ের দাবী পূরণে বিরাট ভূমিকা রাখবে নিঃসন্দেহে।

এ স্মারকে লেখার জন্য প্রামাণ্য মাওয়াদ আমার হাতে নেই। তাই নি করতে হচ্ছে স্মৃতির উপর। হযরত সদর সাহেব (রহঃ)কে যখন আমি দেখে

www.pathagar.com

খন আমার বয়স নিতান্তই অল্প। সে অল্প বয়সের দু'একটা স্মৃতি চারণই আমি মার লেখায় তুলে ধরছি।

সম্ভবত ৫৩/৫৪ সালের কথা। যুক্ত ফ্রন্টের যৌথ নির্বাচনের প্রস্তুতি কাল। রত সদর সাহেব হুযুর, আতহার আলী (রহঃ), জা'ফর আহমদ উসমানী হঃ)সহ যুগশ্রেষ্ঠ আলেমগণ যুক্ত ফ্রন্টের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলার জন্য রা দেশে সভা-সমাবেশ করে চলেছেন অবিরাম। সে কর্মসূচীরই আওতায় ঢাকায় ক কনফারেন্স-এর সিদ্ধান্ত নেন। স্থান রমনা ময়দান। আমার বয়স তখন ১৬ কি ৭ হবে। হিদায়াতুন নাহূ পড়ি। তবে আতহার আলী (রহঃ) আমাকে অত্যন্ত স্নেহ রতেন, আদর করতেন। বিভিন্ন সফরে সাথে নিয়ে যেতেন। সে রমনার নফারেন্সকে সামনে রেখেই কিশোরগঞ্জ জামেয়া এমদাদিয়া থেকে একটি াড়িতে করে আতহার আলী (রহঃ) ঢাকা রওনা দিলেন। সাথে এমদাদিয়ার 'জন ওস্তাদ আর আমি। গাড়ি ড্রাইভ করছিল আমাদের আবদুর রহমান াইভার। ঢাকায় পৌঁছে প্রথমেই আমরা লালবাগ জামেয়া কোরআনিয়ায় নামলাম। দর সাহেব (রহঃ) এবং আতহার আলী (রহঃ) কিসব বিষয় নিয়ে অনেক্ষণ কথা ললেন। বয়সের অপরিপক্কতার কারণেই হয়ত সে সব কথা শুনবার কোন য়োজন আমার সেদিন অনুভব হয়নি। তবে আজ উপলব্ধি করছি। এমন সুযোগ লো গ্রহণ করলে দুই শায়েখের কত কথা আজ জাতিকে উপহার দিতে পারতাম।

যাহোক, সেদিন বিকেলে যখন দুই শায়েখ দৈনিক ইত্তেফাক অফিসের দ্দেশ্যে গাড়িতে উঠলেন, তখন তাঁদের আলাপ-আলোচনায় বুঝতে পারলাম, য়ত সম্মেলনের জন্য নির্ধারিত রমনার ময়দান নিয়ে কোন সমস্যা ছিল। অর্থাৎ মনার ময়দানে কনফারেন্সের জন্য সরকারী কিংবা কোন মহলের বাধা ছিল।

গাড়ি ইত্তেফাক অফিসের সামনে দাঁড় করিয়ে ড্রাইভার বাদে আমরা সবাই ায়েখদ্বয়ের পেছনে পেছনে গেলাম। তাঁরা খুঁজছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান াহেবকে। মুজিবুর রহমান সাহেব তখন বড় কোন নেতা ছিলেন না। তবে াত্রনেতা হিসেবে এবং জাতীয় নেতাদের নিকট যাতায়াত করতেন বলে অনেক কছুই করতে পারতেন। আমরা অফিসের অনেক পিছনের এক রুমের দরজায় াঁড়িয়ে দেখতে পেলাম কয়েকজন লোক গল্পগুজবে মত্ত। আমরা গিয়ে দাঁড়াতেই শখ মুজিব সাহেব চেয়ার ছেড়ে হন্তদন্ত অবস্থায় এগিয়ে এলেন। আর বিস্মিত ণ্ঠে বলতে লাগলেন, "আরে, দাদা এখানে! হুযুর আপনি? দাদা এখানে– কোন বর না দিয়েই সরাসরি উপস্থিত। কোন দরকার হলে আমাকে একটু খবর দিলেই তা আমি উপস্থিত হতাম।" আতহার আলী (রহঃ) বললেন, "আরে না না, খবর দয়ার হলে তোমাকে খবরই দিতাম। এখানেই প্রয়োজন।" এর পর শেখ মুজিব

www.pathagar.com

তার অন্যান্য বন্ধু-বান্ধবদের পরিচয় করিয়ে দিয়ে, সদর সাহেব এবং আতহ আলী (রহঃ)কে বসালেন। উল্লেখ্য যে, শেখ মুজিবুর রহমান আতহার আ (রহঃ)কে দাদা আর সদর সাহেব (রহঃ)কে হুযুর বলে সম্বোধন করতেন।

এর পূর্বে আতহার আলী (রহঃ) কে কিছুটা জানতাম। মানুষ তাঁকে অত শ্রদ্ধা করত। তা দেখেই আমি বুঝেছি তিনি অনেক বড়। কিন্তু আমাকে তি অত্যন্ত স্নেহ করতেন এবং স্বাভাবিক ভাবেই মিশতেন। সদর সাহেব হুযুরকে আ জানতাম না। ঐদিন শেখ মুজিবুর রহমান সাহেব এবং অন্যান্য লোকদের ব্যস্ত দেখে বুঝেছি যে, ইনিও একজন বিরাট আলেম। শেখ মুজিবুর রহমান উভয়বে এত পরিমাণ শ্রদ্ধা করতেন যে, ঐদিন আমি উপস্থিত না থাকলে জানতে পারত না।

দুই শায়েখ আগমণের উদ্দেশ্য জানালে শেখ মুজিবুর রহমান সাহেব বললে "আপনারা এ নিয়ে আর কোন চিন্তা করবেন না। আমি দেখব ইনশা আল্লাহ।"

শেখ মুজিবুর রহমান যদিও তখন বড় কোন নেতা ছিলেন না। কিন্তু তার কি দিন পরেই ৬ দফা আন্দোলন এবং এর পর আগর তলা মামলার মাধ্যমে স মহলে পরিচিত হয়ে উঠলেন। সারা দেশে তার আন্দোলনের ইতিবাচক প্রভা পড়তে লাগল। তিনি বিরাট নেতা হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি বিরাট নেত হলেও হযরত সদর সাহেব (রহঃ) এবং হযরত আতহার আলী (রহঃ)এর প্রতি সেই শ্রদ্ধা ও ভক্তির মাঝে কোন পরিবর্তন আনেননি।

সদর সাহেব (রহঃ)এর সাথে এটা ছিল আমার প্রথম সাক্ষাত। এ সাক্ষাতে আমি তাঁর সাথে কোন কথা বলার সুযোগ পাইনি। ব্যস্ততার মধ্যে আমার কো আচরণ দ্বারা হুযুরকে আকৃষ্ট করতেও পারিনি। পেরেছিলাম বেশ কিছুদিন পরে ১৯৫৭ সালে।

'৫৭ সালের মাঝামাঝি সময়। এ সময় কিশোরগঞ্জ স্টেডিয়ামে ৩দিন ব্যাপী এক সম্মেলন হল। সম্মেলনের দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় দিনে হযরত সদর সাহে হুযুর এলেন। আয়োজকদের মধ্যে তো হযরত আতহার আলী (রহঃ) স্বয় আছেন। তদুপরি সদর সাহেব আসবেন শুনে স্টেডিয়াম মাঠ লোকে লোকারণ্য সূঁচ ধারণের জায়গা নেই। আমি হযরত আতহার আলী (রহঃ)এর স্নেহ-ভালবাসা বদৌলতে সেই বিশাল জন সমুদ্রে বক্তব্য রাখারও সুযোগ পেলাম। আমা বক্তৃতার বিষয় বস্তু ছিল– চলমান সময়ে দৈনিক নাযাত পত্রিকায় হযরত সদ সাহেব (রহঃ)এর ধারাবাহিক প্রকাশিত "আধুনিক বিজ্ঞান ইসলামের প্রতিবন্ধক নয়" শিরোনামের প্রবন্ধের সারমর্ম। আমি বক্তব্য শেষ করে মঞ্চে বসার সাথে

www.pathagar.com

খে মঞ্চে উপবিষ্ট হযরত সদর সাহেব (রহঃ) আমার পিঠ চাপড়ে বললেন, তুমি বড় আলেম হতে পারবে।" এরপর হুযুর আমাকে গোলাম মোস্তফা হেবের বিশ্বনবী বইটি কিনে পড়বার জন্য উপদেশ দিলেন।

সেদিন কিছুক্ষণের সান্নিধ্যে হযরত সদর সাহেব হুযুরের মধ্যে যে স্নেহ-মমতা বং ছোটদেরকে উর্ধে টেনে তুলবার জন্য অন্তরের দূর্ণিবার যে ব্যঞ্জনা লক্ষ্য করি সত্যিই বিরল। এরপর হযরত সদর সাহেব সম্পর্কে জানবার আগ্রহ আমার ন দিন বাড়তে থাকে। যতই জানি ততই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায়- ভক্তিতে মস্তক বনত হয়ে আসে।

হযরত মাওলানা ফরিদপুরী (রহঃ) কারোর মধ্যে কোন প্রতিভা লক্ষ্য করলে সযত্নে প্রতিপালন করে ফুলে-ফলে সুশোভিত বিরাট এক মহিরূহে পরিণত রতে মোটেও কসুর করতেন না। অনেকের সাথে কথা বলেছি হযরত সদর হেব সম্পর্কে। সবার বক্তব্য শুনে মনে হয়েছে হযরত সদর সাহেব হুযুর যেন কেই সবচেয়ে বেশি ভালবাসতেন। এমন গুণের আজ বড়ই অভাব আমাদের ধ্যে। অথচ যোগ্য উত্তরসূরি তৈরীর জন্য হযরত সদর সাহেব (রহঃ) এর এই াদর্শের বিকল্প নেই। নিতান্ত অল্পক্ষণের সান্নিধ্যে সদর সাহেব (রহঃ) আমাকে া, উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং উপদেশ দিয়েছিলেন আমার পরবর্তী জীবনে তার রাট প্রতিফলন ঘটেছে।

আমার দুই রাহবার হযরত আতহার আলী (রহঃ) এবং হযরত ফরিদপুরী রহঃ) এর অনুসৃত আদর্শ বাস্তবায়নের দৃপ্ত শপথ নিয়ে এবং তাঁরা যেমন প্রতিটা পকর্মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রতিরোধ গড়ে তুলে- "তা'মুরুনা বিল মা'রূফি ওয়া ান হাওনা আ'নিল মুনকার" এর দাবী পূরণের চেষ্টা করেছেন আমাদেরও সে াপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করা প্রয়োজন।

অনুলিখন– নাকীব আশরাফ

=== ০০০ ===

www.pathagar.com

মরহুম মাষ্টার আব্দুল হক সাহেবের ডায়েরী থেকে

[আব্দুল হক সাহেব দীর্ঘ বাইশ বছর হুযুরের খেদমত করেছেন। তিনি তাঁর ডায়েরীতে সদর সাহেব হুযুর সম্পর্কে যা কিছু লিখে রেখেছিলেন তা নিম্নে প্রবন্ধ আকারে পেশ করা হল]

আমার বাড়ী নড়াইল জেলার কালিয়া থানাধীন বাঐসোনা গ্রামে। ১৯৩ সালে আমি এন্ট্রান্স পাশ করি। এরপর ভিক্টোরিয়া কলেজে ভর্তি হই এ পাকিস্তান আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ি। আমাদের এলাকায় তেমন কোন মাদ্রাসা থাকায় আলেম উলামাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক খুব কম ছিল। কিন্তু সদর সাহে হুযুরের নাম আমি অনেক আগে শুনেছি। তাই ১৯৪৫ সালের কোন এক সম গওহারডাঙ্গায় যাই এবং হুযুরের সঙ্গে সাক্ষাত করি। আমার যতদূর মনে পড়ে হুযুরের সাথে প্রথম সাক্ষাতেই তার খাস দোয়ায় আমার মনের অবস্থা পরিবর্ত হয়ে যায়। হুযুরের সোহবতে এসে আমার মনে হতে থাকে: বড় বড় ডাক্তা ব্যারিস্টার, ব্যবসায়ী, চাকুরীজীবী সবাই হুযুরের কাছে দোয়া নিতে আসে অতএব হুযুর এদের সবার চেয়ে বড়। তাই আমি ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার না হ হুযুরের মত হব। এ সংকল্প মনে রেখেই আমি হুযুরের কাছে নিজেকে সোপ করি। হুযুর অভিভাবক হিসেবে আমাকে এলমে দ্বীনের পথে চালাতে শুরু করেন

প্রথমে দেশে পড়াশোনা করি পরে উচ্চ শিক্ষার জন্য হুযুর আমাকে সাহারানপুর মাদ্রাসায় হযরত যাকারিয়া (রহঃ)এর কাছে পাঠিয়ে দেন সাহারানপুর থেকে ফিরে এসে বিশ্ব কুতুব হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপু (রহঃ)এর সাথে আমার ইসলাহী সম্পর্ক গভীর থেকে গভীরতর হতে থাকে । দী বাইশ বছর আল্লাহ আমাকে হুযুরের খেদমত করার তৌফিক দিয়ে ছিলেন।

হুযুর ছিলেন মানুষ গড়ার কারিগর। তিনি আমাদের প্রতি হুকুম দিয়েছিলে "প্রতিদিন একজন করিয়া শিক্ষিত মানুষ আমার কাছে আনিবার চেষ্টা করিবা। হুযুরের এ আদেশ আমি যথাসাধ্য পালন করতে চেষ্টা করেছি।

হুযুর কোরআন প্রচারে ছিলেন সদা তৎপর। কোরআনের মিশন প্রচার প্রসারের জন্য তিনি খাদেমুল ইসলাম জামাত গঠন করেন। হুযুরের মর্মবাণী ছিল- মুসলিম সভ্যতা, শক্তি ও প্রেরণার উৎস আলকোরআন। তাই কোরআন শিক্ষা করা, তার অর্থ বুঝে আমল করা এবং এর বাণী প্রচার প্রসার করাই প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জীবনের প্রধান কাজ। হুযুরের আজীবন সাধনা ছিল আল কোরআন। তাই তিনি বলেন, আল্লাহর রহমত ছাড়া আল্লাহর দ্বীনের ও কোরআনের আজীবন স্থায়ী ভাবে খেদমত করা যায় না। তাই আল্লাহ যাদে তৌফিক দান করেন তারাই কেবল কোরআন ও তার দ্বীনের খেদমত করার জ যথাসর্বস্ব উৎসর্গ করার সৌভাগ্য লাভ করেন। তাদের জীবন ধারণের উপকর

www.pathagar.com

যোগানোর দায়িত্ব মুসলিম কওমের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপর। বিত্তশালী ব্যক্তিগণ স্ব-স্ব দায়িত্বে দ্বীনের মুবাল্লিগদের ব্যয়ভার গ্রহণ করবেন। বিত্তশালীদের প্রতি হুযুরের প্রস্তাব ছিল– একজন ব্যবসায়ী বা মিল মালিক বা ফ্যাক্টরীর মালিক এক দুই জন মুবাল্লিগের সার্বিক খরচপত্র বহন করবেন। যেন তিনি উক্ত বিত্তশালীর পরিবারভূক্ত একজন সদস্য। যেমন, মিশনারী পাদ্রীদের ধনাঢ্য খৃস্টানরা তাদের পরিবারের সদস্য মনে করে থাকে।

আমি সর্বদা হুযুরের সাথে সাথে থাকতাম। হুযুর যা বলতেন তাই শুনতাম। তিনি বড় কাটারা থাকা কালীন জিন্‌জিরায় অবস্থান করতেন। আমাকে বিভিন্ন যিকিরের মজলিস চালানোর দায়িত্ব দিতেন। ঢাকা এবং খুলনার বিভিন্ন কারখানা ফ্যাক্টরীতে শ্রমিক-কর্মচারী, মালিকদের মাঝে আমি ওয়াজ নসীহত করতাম। মাঝে মাঝে তফসীর করে শুনাতাম। এসবই ছিল খাদেমুল ইসলাম জামাতের মিশনভূক্ত কাজ। হুযুর আমাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, এসব কাজ করার জন্য।

হুযুর ইন্তেকালের কিছুদিন পূর্বেও বলেছিলেন: কতগুলি ফিতরাতী বলদ তালীম ছাড়া, হিমালয় পাহাড় টলে যাবে কিন্তু তারা টলবে না। এ ধরণের কিছু লোক এনে দাও। তারা আমার কাজ করবে। হে আব্দুল হক! সারা দেশ ঘুরে যদি একজনও গ্রাজুয়েট পাও, এনে দাও। তাকে দিয়ে আমি কাজ করাবো এবং ৫০০টাকা বেতন দেব।

বাতিলের বিরুদ্ধে হুযুর ছিলেন সদা সোচ্ছার। চট্টগ্রামে পাদ্রী পায়ার এসেছিল মুসলমানদের ধর্মান্তরিত করতে। তিনি তখন খাদেমুল ইসলামের কর্মসূচী দিয়ে ভাই ফজলুর রহমানকে পাঠান। তিনি হুযুরের লেখা পাদ্রীদের গোমর ফাঁক, আল্লাহর প্রেরীত ইঞ্জিল কোথায়?, বই নিয়ে চট্টগ্রামে মানুষের মাঝে প্রচার করতে থাকেন। হুযুরের বিভিন্ন কর্মসূচীতে অবশেষে বাধ্য হয়ে পাদ্রী পায়ার চট্টগ্রাম ত্যাগ করেন।

জামাতে ইসলামীর সাথে প্রথম পর্যায়ে হুযুর সম্পর্ক রাখতেন এবং তাদের দলের প্রতি মানুষকে উৎসাহ দিতেন। কিন্তু পরবর্তীতে তাদের বিভিন্ন ক্রটি জানতে পেরে তিনি ভুল সংশোধন বই লেখেন। এই বইয়ের পান্ডুলিপি তৈরী হবার পর মাঝে মাঝে আমাদেরকে পড়তে বলতেন। এ বই ছাপার জন্য চাঁদাও উঠিয়ে ছিলেন। কিন্তু তাঁর জীবদ্দশায় বইটি ছাপা সম্ভব হয় নাই। দুঃখের বিষয় হুযুরের ইন্তেকালের পর এখন 'ভুল সংশোধনের ভুল' বই বের হয়েছে। হুযুরের বিরহ ব্যথায় যত বেশী না কেঁদেছি তার চেয়ে বেশী কেঁদেছি 'ভুল সংশোধনের ভুল' বই বের হওয়াতে।

সংকলনে : ইদ্রিস ইবনে জহুর

www.pathagar.com

যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও পীরের ছেলে পীর হইবে বা কুরআন ও সুন্নাহর বিরুদ্ধে জীবন যাপন সত্ত্বেও পীর হইবে ইহা পথভ্রষ্টদের, অভিশপ্তদের পন্থা; ইহা অনুগ্রহ প্রাপ্তদের পন্থা নয়, সিরাতে মুস্তাকিম নয়।

টাকার চেয়ে সম্মান বড়, সম্মানের চেয়ে জ্ঞান বড়, জ্ঞানের চেয়ে ঈমান বড়, দুনিয়ার জীবনের চেয়ে আখেরাতের জীবন অনেক অনেক বড়। এই অভিসংবাদিত সর্বস্বীকৃত বিষয় কয়টি গোড়ায় স্বীকার করিয়া নিয়া এই মূলনীতি ঠিক বলিয়া সামনে বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া ছিরাতে মুস্তাকীমের বিচারকের কর্তব্য। পক্ষান্তরে যাহারা বিচারক হওয়া সত্ত্বেও এই মূলনীতি গুলির পরোয়া করে না, তাহারা পথভ্রষ্ট এবং অভিশপ্ত দলভুক্ত।

আখেরাতের বিচারের ও কর্ম ফলের সংবাদ এক মহাসত্য সংবাদ। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁহার পাক কালামের ভিতর এই মহাসংবাদ যত অধিকবার বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, এত অধিক অন্য কোন বিষয়ই বর্ণনা করেন নাই। আল্লাহর একবার বর্ণনাই যথেষ্ট ছিল, কিন্তু তাঁহার মমতা যেহেতু মানব জাতির প্রতি অত্যন্ত অধিক, বাপের চেয়েও অধিক মার চেয়েও অধিক, সে জন্য বার বার দ্বিরুক্তির পরোয়া না করিয়া একই কথা বহুবার বলিয়াছেন, বহু ভাবে বহু ভাষায় বলিয়াছেন। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় যে, দ্বিরুক্তির কারণে কোথাও ভাষার সৌন্দর্য একটুও নষ্ট হয় নাই, বরং বহু কবি সাহিত্যিক ভাষার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া ঈমান আনিয়াছেন।

মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ)

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

সাক্ষাৎকার

www.pathagar.com

আশরাফ-আতরাফের ভেদনীতি বা আভিজাত্যবাদ ইসলামে নাই; ইসলামে আছে গুণের, নৈতিক চরিত্রের এবং কাজের মর্যাদা এবং অকাজের ও দুর্নীতির অমর্যাদা। যাহারা বস্ত্রশিল্পের ব্যবসা করে বা পূর্ব-পুরুষ কোন কালে করিয়াছে, তাহাদের সঙ্গে কৃষি ব্যবসায়ীদের মেয়ের বিবাহ হইতে পারিবে না অথবা কৃষি ব্যবসা ঘৃণার জিনিস, বা বস্ত্র-বয়ন শিল্প ঘৃণার জিনিস এমন জঘণ্য কথার প্রশ্রয় ইসলাম দেয় না। ইসলামে আছে শ্রমের মর্যাদা এবং তাকওয়ার মর্যাদা। বার বার বলিতেছি, তাকওয়া শুধু নামায, রোযা বা মুস্তাহাব নফল বন্দেগীর নাম নয়; তাকওয়া এমন একটি গুণ বাচক শব্দ যাহার ভিতর সমস্ত মানবীয় গুণাবলী, আদব, তাহ্‌যীব, দায়িত্বজ্ঞান সবগুলিই এই একটি শব্দের মধ্যে আছে।

অতঃপর হযরত বলিলেন, "তুমি কি জান না যে, যবানের দ্বারা মানুষের কত পাপ হয়, সেই সব পাপের কারণেই মানুষকে উল্টা করিয়া তাহার নাকের উপর ভর করিয়া তাহাকে দোজখের আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করা হইবে? অতএব, শুধু পরিমাণ মত সৎকথা এবং আল্লাহর যিকর ছাড়া যবানকে যতদুর সম্ভব বন্ধ রাখিয়া চিন্তা করিয়া করিয়া যাবতীয় পাপের কথা হইতে নিজেকে সংযত ও বিরত রাখাই সকল আমলের সেরা আমল।

মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ)

www.pathagar.com

হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ) সম্পর্কে

শাইখুল হাদীস মাওলানা আজিজুল হক সাহেবের সাক্ষাতকার

প্রশ্ন: হযরত ফরিদপুরীর বাল্য জীবন সম্পর্কে আপনি কি জানেন?

উত্তর: বাল্য জীবন সম্পর্কে আমার তেমন কিছু জানা নেই। এতটুকু শুনেছি যে, হুযুর যখন নড়াইলের স্কুলে পড়তেন তখন তার মনে কুরআন শরীফ সম্পর্কে এমন এক আবেগ হলো যে, আমি কুরআন শরীফ বুঝি না! অথচ আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্য তা নাযিল করেছেন! তাই তিনি জঙ্গলে চলে যেতেন এবং চিত হয়ে শুয়ে কুরআন শরীফ বুকে চেপে ধরে কাঁদতেন এবং বলতেন, আল্লাহ! তুমি কুরআন নাযিল করেছ অথচ আমি তা বুঝিনা।

প্রশ্ন: তিনি হযরত থানভী (রহঃ) ও অন্যান্য বুযুর্গদের সান্নিধ্যে কতকাল কিভাবে অতিবাহিত করেছেন?

উত্তর: হযরত থানভী (রহঃ) ঢাকায় আসার সময় কোলকাতা হয়ে এসেছিলেন। সেখানে হুযুর হযরতকে দেখেছিলেন। প্রথম দেখাতেই তিনি হযরত থানভীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন এবং তখন থেকেই তিনি ইচ্ছা করলেন ইলমে দ্বীন শিখবেন, হযরত থানভীর সোহবতে থাকবেন। তাই কলেজের পড়া ছেড়ে দিয়ে থানভীর দরবারে চলে যান।

প্রশ্ন: হযরত যাফর আহমদ উছমানী (রহঃ) এর সান্নিধ্যকাল সম্বন্ধে কি জানেন?

উত্তর: হযরত উছমানী (রহঃ) এর কাছে বায়আত হবার বিষয়টি হলো এই যে, হযরত থানভী (রহঃ) বলতেন বায়আত হবার জন্য তবিয়তের মুনাসাবাত হওয়া জরুরী। এজন্য বাংলার বহু উলামায়ে কেরামকে হযরত থানভী (রহঃ) নিজে বায়আত না করে উছমানী (রহঃ) এর হাওয়ালা করতেন। সুতরাং হযরতের বলায় কিংবা ইশারা করায় সদর সাহেব হুযুর ও পীরজী হুযুর (হাফেজ্জী হুযুরের কথা বলতে পারি না) এ দু'জনে হযরত উছমানী (রহঃ) এর কাছে বায়আত হন।

প্রশ্ন: ব্রাহ্মণবাড়িয়া, গজালিয়া (বাগেরহাট), গওহারডাঙ্গা, বড় কাটরা ও লালবাগ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদানের বিস্তারিত বিবরণ দিন।

www.pathagar.com

উত্তর: হুযুরের কাছে শুনেছি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া মাদ্রাসার মুহতামিম হযরত মাওলানা ইউনুস সাহেব ফয়জাবাদী ছিলেন হযরত মাদানী (রহঃ) এর খাছ দোস্ত। তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়া মাদ্রাসা করার পর যখন দাওরা খুলবেন, তখন মুদাররিস দরকার। তাই হযরত মাদানীকে লিখলেন আমাকে বাংলাদেশী মুদাররিস দেন। হযরত মাদানী সদর সাহেব হুযুরকে ঠিক করেন। তখন সদর সাহেব হুযুর হযরত মাদানী (রহঃ)-কে কিছু বলেননি। যেহেতু ইসলাহী সম্পর্ক ছিল হযরত থানভী (রহঃ) এর সাথে, তাই তাঁকে বললেন-"হযরত মাদানী নে মুঝে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জানে কে লিয়ে কাহা।" হযরত থানভী (রহঃ) বললেন-"উস্তাদ নে যব কাহা, পুছনে কি কিয়া জরুরত হায়? জরুর ওহা যাও।" হুযুর সেখানে গেলেন। ওনাদের তিনজনের মধ্যে একটা প্যাক্ট ছিল (হাফেজ্জী হুযুর ও পীরজী হুযুর) যে, তারা তিনজনে একখানে খেদমত করবেন। তাই সদর সাহেব হুযুরকে তো মাওলানা ইউনুছ সাহেব আনলেন। তিনি এসে ওনাদের দু'জনকে আনলেন।

প্রশ্ন: ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় হুযুর কতদিন ছিলেন?

উত্তর: দিন তারিখ তো মনে নেই। তবে আমি ব্রাহ্মনবাড়িয়ায় পড়েছি তিন বছর। হুযুরের কাছে দুই বছর। আর হুযুর চলে আসার পরে এক বছর। আর আমার ব্রাহ্মণবাড়িয়া আসার আগে তিন চার বছর তিনি সেখানে ছিলেন।

প্রশ্ন: আপনি কি সদর সাহেব হুযুরের কাছে কোন কিতাব পড়েছেন?

উত্তর: আমার প্রথম সবক বেহেশতী জেওর সদর সাহেব হুযুরের কাছে পড়েছি। হুযুর তো বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী পড়াতেন। আমাকে আমার আব্বা যখন হুযুরের কাছে আনলেন, তখন তিনি প্রথমে আমার নাম রাখলেন। তারপর বেহেশতী জেওরের প্রথম সবক আলিফ বা তা ছা পড়ালেন। তখন উর্দূ কায়েদা ছিল না। প্রথম কিছু দিন হুযুর নিজে আমাকে পড়ানোর পর, মাস খানেক হবে তিনি নিজে পড়ালেন, তারপর দাওরার এক ছাত্র মাওলানা সিদ্দীকুর রহমান সাহেবের কাছে হুযুর আমাকে হাওয়ালা করলেন। বললেন- তুমি ওকে একটু পড়িয়ে দিও। মাওলানা সিদ্দীকুর রহমান সাহেবের বাড়ী ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কাছে বাঘাজং স্টেশনের পাশে। ওখানে মাওলানা জিয়াউল ইসলাম সাহেবেরও বাড়ী। মাওলানা জিয়াউল ইসলাম সাহেবকে হুযুর নূরাণী পদ্ধতির মূল উদ্ভাবক কানপুরের এক কারী সাহেবের কাছে পাঠিয়েছিলেন। মাওলানা সিদ্দীকুর রহমান সাহেব হচ্ছেন মালিবাগ মাদ্রাসা মসজিদের ইমাম হাফেয মাওলানা

www.pathagar.com

ইয়াহয়া সাহেবের আব্বা। তিনি এখনও জীবিত আছেন, বয়স একশ বছরের বেশী। ওনার কাছেই হুযুর আমাকে হাওয়ালা করলেন। আমার যতদূর মনে পড়ে হুযুর থাকতে আমি ওনার কাছে এক বছরের কিছু বেশী সময় পড়েছি। প্রথম বছর তো ভাঙ্গা বছর। তারপর এক বছর আমি ওনার কাছে পড়লাম। আর পীরজী হুযুরের কাছে কুরআন শরীফ শেষদিক থেকে মুখস্থ করছিলাম। এরপর তো তাঁরা চলে এলেন। পীরজী হুযুর, হাফেজ্জী হুযুর তাঁরা তিনজনেই তখন একত্রে ব্রাহ্মণবাড়িয়া ছিলেন। তারপর তাঁরা গজালিয়ায় এলেন।

ঘটনা ছিল এই যে, মাওলানা ইউনুস সাহেব মুরীদ করতেন। তিনি হযরত মাদানীর খাছ দোস্ত ও বড় আলেম ছিলেন। এলাকায় ওনার যথেষ্ট প্রভাব ছিল। এদিকে পীরজী হুযুরও মুরীদ করতেন। পীর-মুরীদী নিয়ে দু'জনের মধ্যে একটু মন কষাকষি হলো। তাই তিনি পীরজী হুযুরকে অব্যাহতি দিয়ে দিলেন। মাদ্রাসা থেকে অব্যাহতি দিয়ে তিনি হাজিরা খাতায় পীরজী হুযুরের নাম লালকালি দিয়ে কেটে দিলেন। হযরত সদর সাহেব হুযুর দস্তখত করতে গিয়ে দেখেন পীরজী হুযুরের নামে লাল কালি দেয়া। তিনি তখন নিজের নাম লাল কালি দিয়ে কেটে দিয়ে আসলেন। হাফেজ্জী হুযুর দস্তখত করতে গিয়ে দেখেন ওনাদের দু'জনের নামে লাল কালি। উনি তখন নিজের নামও লাল কালি দিয়ে কেটে রেখে এলেন। তিনজনে একসাথে বের হয়ে এলেন। তারপরে চলে গেলেন গজালিয়ায়। গজালিয়া এলাকাটি হুযুরের শ্বশুর বাড়ীতে আশা যাওয়ার পথে পড়ত। সেখানে তাঁরা গেলেন, অথবা তারা ওনাদের নিয়ে গেলেন। সঙ্গে অনেক ছাত্রও ছিল।

প্রশ্ন: সেখানে কত দিন ছিলেন?

উত্তর: সেখানে পুরো এক বছরও ছিলেন না। বছরের মাঝখানে গিয়েছিলেন। ওই বছরটাই ছিলেন। এরপর তাঁরা গজালিয়া থেকে চলে গেলেন। কেননা সেখানে তাদের স্বাস্থ্য টিকলো না। শারীরিক কারণেই তাঁরা চলে গেলেন সেখান থেকে।

প্রশ্ন: কাটারা মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে কিছু বলুন?

উত্তর: গজালিয়া থেকে তাঁরা চলে এলেন বরিশালের লঞ্চে করে ঢাকায়। নামলেন বাদামতলী ঘাটে। নেমে বাদামতলী মসজিদে গিয়ে সবক পড়ালেন। পীরজী হুযুরের কিছু মুরীদ ছিল মাতুয়াইল। তারা সেখান থেকে খানা পাকিয়ে নিয়ে আসত এবং হুযুরদের ও ছাত্রদের খাওয়াত।

www.pathagar.com

তারাই ঠিক করেছিল যে, গেন্ডারিয়া লোহারপুলের পূর্বপাড়ের মসজিদে হুযুররা থাকবেন। যাতে মাতুয়াইল থেকে অর্ধেক পথ হয়। বেশ অনেকদিন তাঁরা সেখানে ছিলেন এবং ছাত্রদের পড়ালেন। মাতুয়াইলের লোকেরাই খাওয়াতেন। এরপর তারা জায়গার চিন্তা করলেন। তখনই জিনজিরার হাফেয সাহেবের কথা তারা স্মরণ করলেন। লোকেরাও বললো : তিনি খুব দানশীল মানুষ। আপনারা ওনার কাছে যান। ওনার নাম হাফেয মুহাম্মদ হোসাইন। তার নামের কারণেই মাদ্রাসার নাম হয়েছে হোসাইনিয়া আশরাফুল উলুম। ওনার কাছে পীরজী হুযুরকে পাঠানো হলো। হাফেজ্জী হুযুর সঙ্গে গিয়েছিলেন কি না বলতে পারবনা। পীরজী হুযুরকে সদর সাহেব হুযুরই পাঠালেন। তখন এই বড় কাটরা বিল্ডিং এর নীচ তলায় ওনার গোডাউন ছিল। দোতলায় তেমন কিছু ছিলনা। তবে দোতলায় একটা লোক এমনিই থাকত। সে খুব কবুতর পালত। তাই দো'তলা পুরোটা ভরে ছিল কবুতরের পায়খানায়। হাফেয সাহেব বললেন- যান, দেখেন, যদি পাকপরিস্কার করে আপনাদের থাকবার মত হয়, তাহলে থাকেন। তখন পশ্চিমের অংশটা, তাঁরা ছাত্র শিক্ষক মিলে পরিস্কার করে সাজিয়ে গুছিয়ে থাকতে লাগলেন। শুধুমাত্র দোতলাটা ওনাদের দেয়া হলো। তিন তলায় তেমন কিছু ছিলনা। দোতলায়ই তাঁরা মাদ্রাসা শুরু করলেন। এটা ১৩৫২ হিজরীর কথা। রমযানের পরেই তাঁরা বড় কাটারায় আসলেন।

প্রশ্ন: বড়কাটারার শুরুতে কে কে ছিলেন?

উত্তর: তাঁরা তিনজন এবং আরেক জন ছিলেন মাওলানা মুফতী মোহাম্মদ আলী।

প্রশ্ন: মাওলানা মোহাম্মাদ আলী সাহেবের বাড়ী কোথায় ছিল?

উত্তর: তাঁর বাড়ী ব্রাহ্মণ বাড়িয়ার পাশে। তবে গ্রামের নাম আমার জানা নেই। ব্রাহ্মণ বাড়িয়া মাদ্রাসায়ও তিনি ছিলেন। সেখানেও মুফতী ছিলেন।

প্রশ্ন: কাটারায় হুযুর কত বছর ছিলেন?

উত্তর: ৫২হিজরী থেকে বারো বছর আর দশ বছর মোট বাইশ বছর ছিলেন। কাটরায় হুযুর আমাকে মোদাররেসও রেখেছিলেন।

প্রশ্ন: কাটরায় কি আপনি পড়েছেন,পড়লে কত বছর পড়েছেন

উত্তর: হাঁ, কাটরায় দশ বছর পড়েছি, আর দুই বছর বাইরে পড়েছি। আর বাইরে থেকে এসে দশ বছর মোদাররেসী করেছি সেখানে। এই বাইশ বছর হুযুর কাটারায় ছিলেন।

www.pathagar.com

প্রশ্ন: হুযুরের কাছে আপনি কি কি কিতাব পড়েছেন?

উত্তর: আমি ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় কিতাব খানায় ভর্তি হয়ে ছিলাম। এরপর কাটরা মাদ্রাসা শুরু হলে আমি কুরবানীর পরে কাটরায় এসে ভর্তি হলাম। কাটরায় আসার পর হুযুর বছর দুই পড়াতে পেরেছিলেন। এরপর তার হৃদরোগ হয়। তিনি একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে থাকলেন। এখানে পাঞ্জাবের কিছু লোক ছিল। ওরা কন্ট্রাকটরী করত পোশাক সাপ্লাইয়ের। ওরা থাকত বকশীবাজারে। বকশী বাজারে এখন যেখানে কাদিয়ানীদের অফিস, ওখানে একটা লম্বা বিল্ডিং এ ওরা থাকত। ওরা হুযুরের প্রতি খুব বেশী মহব্বত রাখত। খেদমতও করত।

প্রথমে হুযুরের তা'লীমুদ্দীন বই ছাপা হয় তাদের টাকায়। ওরা হুযুরকে চিকিৎসা করানোর জন্য নিয়ে যায় পাঞ্জাবের শিয়ালকোট। সেখানে নিয়ে তারা হুযুরের চিকিৎসা করালো প্রায় মাস ছয়েক। সেখান থেকে হুযুর আসলেন স্বাস্থ্য বেশ ভাল নিয়ে, মাথায় বাবরি নিয়ে। চলাফেরায় হুযুরের কোন কষ্ট হত না। তবে অনর্গল কথা বলা বা বেশীক্ষণ বক্তৃতা দিতে পরতেন না। প্যালপিটেশান শুরু হত। এখানে আমি হুযুরের কাছে ফার্সী পহেলী ও নশরুত্তীব পড়েছিলাম। এই দুই খানা কিতাব হুযুরের অসুস্থ হবার আগে পড়েছিলাম। এরপর তিনি শিয়াল কোট থেকে ফিরে আসার পর আমি যখন মেশকাত শরীফ পড়ি, তখন হুযুর বললেন- আমি তো পড়াতে পারলাম না। তুমি মেশকাত শরীফ খানা আমার সামনে পড়ে শেষ করবে। আমি হুযুরের সামনে পড়ে শেষ করেছি। তিনি মধ্যে মধ্যে সপ্তাহে দুই একটা কথা বলতেন। হুযুর যে কথাগুলো বলেছিলেন- হাদীসের ইলমের ব্যাপারে, সেই কথাগুলোই আমার মূল পুঁজি।

প্রশ্ন: তারপর কি তিনি লালবাগ আসলেন?

উত্তর: তিনি লালবাগ আসলেন বাইশ বছর পর। লালবাগ আসলেন- কারণ ওখানে মতবিরোধ হয়ে গেল পীরজী হুযুরের সঙ্গে সদর সাহেব হুযুরের। সদর সাহেব হুযুর মাদ্রাসা থেকে বের হয়ে গেলেন বেগম বাজারে। বেগম বাজার মসজিদে। ইমামের হুজরায় থাকতেন। তারপর সেখান থেকে আসলেন জিনজিরা বড় মসজিদ। এসময়ের মধ্যে বড় কাটরায় মীমাংসার জন্য বহু বিচার আচার হয়েছে। তিনি দু'চার দিন আসতেন। আবার মতবিরোধ লাগতো। হুযুর আবার আসতেন না। আসলে পীরজী হুযুরের সাথে এমন কিছু মানুষ ছিলেন, যারা চাইছিলেন না হুযুর বড় কাটরা মাদ্রাসায় থাকুন। কারণ হুযুর ছিলেন কড়া মেজাজের। তাঁরা সেখানে মুদাররেস হয়ে হুযুরকে বরদাশত করতে পারছিলেন না। আর পীরজী

www.pathagar.com

হুযুর ছিলেন একেবারে নরম মেজাজের। তারা মনে করল ওনাকে যদি মুহতামিম বানানো যায়, ওনাকে যদি প্রধান বানানো যায়, তবে ভাল হয়। মুহতামিম তিনি ছিলেনই, তবে হুযুর ছিলেন সদর, আর সদরের ক্ষমতা ছিল সব।

হাফেজ্জী হুযুর প্রথমে নিরপেক্ষ ছিলেন। শেষে তিনি সদর সাহেব হুযুরের পক্ষে হয়ে গেলেন। মীমাংসার জন্য খুব চেষ্টা করেন। পোস্তার চামড়া ব্যবসায়ী পাঞ্জাবের হাজী দীন মুহাম্মদ সাহেব। তিনি খুব বড় করে পাগড়ী বাঁধতেন। খুব ভাল লোক ছিলেন। কিন্তু কোন মীমাংসা হয় না কেননা পীরজী হুযুরের সঙ্গে বেশ কয়েকজন মুদাররেস ছিলেন। আ হুযুরের তখন বেদখল হয়ে গেছে। তখন ব্যবসায়ীরা বললো- "আ লালবাগ মাদ্রাসা বানাইয়ে, হাম কোশেশ করেঙ্গে।"

লালবাগে তখন একটা মকতব ছিল। মকতবটা ছিল মসজিদের দক্ষি পাশে, বর্তমানে সেখানে দফতর। তখন তিনি চলে আসলেন। সদর সাহেবের সঙ্গে ছিলেন মাওলানা হেদায়াতুল্লাহ সাহেব, মাওলানা আব্দুল মোয়েজ সাহেব, আর আমি। হাফেজ্জী হুযুর তো ছিলেনই। হাফেজ্জী হুযুর আবার মাঝখান থেকে লালবাগ মসজিদের ইমাম হয়ে গিয়েছিলেন। উনি ইমাম হওয়ায় সুযোগটা বেশী হয়েছে। ব্যবসায়ীরাও অনুমতি দিয়ে দেয়। চামড়ার ব্যবসায়ীরাই মসজিদের হর্তাকর্তা ছিল। ওরা আমাদেরকে নিয়ে আসলো। আমরা মসজিদের মধ্যেই সব ক্লাস করতাম।

প্রশ্ন: কোন জামাত থেকে শুরু হলো?

উত্তর: প্রথম থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত। দাওরা পর্যন্ত। আমরা আসবার সময় কিতাব পত্র নিয়ে আসলাম। আমাদের যার কাছে যা কিতাব ছিল ছাত্রদেরও বলে দিলাম। সবাই যার যার কিতাব নিয়ে চলে এলো। ব্যাস আমাদের তো কিতাব আছেই, আমরা মাদ্রাসা শুরু করলাম।

প্রশ্ন: তখন বোখারী শরীফ কে পড়াতেন?

উত্তর: দাওরার বুখারী শরীফ মাওলানা জাফর আহমদ উছমানী (রহঃ) প্রথ থেকে কিছু অংশ পড়াতেন। বাকী অংশ প্রথম জিলদ হাফেজ্জী হুযুর আ জিলদে ছানী মুফতী দীন মুহাম্মদ সাহেব পড়াতেন। সদর সাহেব হুযু তখন পড়াতেন না। এখানে এসে হুযুর পড়াতে পারেননি। এখানে এ সদর সাহেব হুযুরের সব এখতিয়ার হাসিল হয়।

প্রশ্ন: পাকিস্তান আন্দোলনে তাঁর ভূমিকার বিবরণ দিন।

www.pathagar.com

উত্তর: পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে হুযুরের যথেষ্ট ভূমিকা ছিল। পাকিস্তান হওয়ার পূর্বে যে ইলেকশন হয় ১৯৪৬ সালে, তাতে মুসলিম লীগের পাশ করানোর জন্য তিনি কঠোর পরিশ্রম করেন। কারণ তখন এ এলাকায় মুসলিম লীগের তেমন কোন নেতা ছিলো না। সোহরাওয়ার্দী থাকতেন কোলকাতায়, মাওলানা আকরম খাও কোলকাতায় থাকতেন। এদেশে মুসলিম লীগের পক্ষে ইলেকশানে জয়ের জন্য সবচেয়ে বেশী কাজ করেছেন সদর সাহেব হুযুর। মুসলিম লীগের এখানে পাশ করার পিছনে সদর সাহেবের বিরাট অবদান। এখানে তার মত এত বেশী কাজ আর কেউ করেছে বলে আমার মনে পড়ে না। তখন এটাকে বলা হত পূর্ব বাংলা। পশ্চিম পাকিস্তানেও মুসলিম লীগ পাশ করে। পূর্ব বাংলায় সদর সাহেবের অবদান সবচেয়ে বেশী। কংগ্রেসের তেমন কেউ পাশ করে নাই। মুসলিম লীগ একচেটিয়া পাশ করে।

প্রশ্ন: মুসলিম লীগের নমিনেশন বোর্ডে সদর সাহেব ছিলেন কি?

উত্তর: হ্যাঁ ছিলেন।

প্রশ্ন: নমিনেশন বোর্ডের সভাপতি কে ছিলেন?

উত্তর: সোহরাওয়ার্দী সাহেব ছিলেন।

প্রশ্ন: এরপর আদর্শ প্রস্তাব কখন হয়?

উত্তর: পাকিস্তানতো হলো। আদর্শ প্রস্তাব তো উঠবে। তখন সেটা পাশ করানোর জন্য হুযুর করাচীতে থেকে, যত মেম্বার ছিল সংসদের সেখানে হুযুর মাসের পর মাস পড়ে থাকলেন। এই আদর্শ প্রস্তাব পাশ করানোর জন্য।

প্রশ্ন: আদর্শ প্রস্তাবে কিকি ছিল?

উত্তর: মূল কথা ছিল পাকিস্তানের আইনের উৎস হবে কুরআন হাদীস।

প্রশ্ন: সে প্রস্তাব পাশ হলো না কেন?

উত্তর: পাশ তো হয়েছিল।

প্রশ্ন: কিন্তু কার্যকর হলো না কেন?

উত্তর: এর জন্য সাব কমিটি হলো। প্রধান ছিলেন হযরত মাওলানা শিব্বির আহমদ ওছমানী (রহঃ)। সাব কমিটির কাজ করতে করতে অনেক সময় হয়ে গেল। এরপর কায়েদে আযম মারা গেলেন। তখন নানা রকম কথাবার্তা শুরু হলো।

www.pathagar.com

প্রশ্ন: মুসলিম পারিবারিক আইন সম্পর্কে সদর সাহেব হুযুরের কি ভূমিকা ছিল?

উত্তর: মুসলিম পারিবারিক আইনের অনেক প্রতিবাদ করেছিলেন। কিন্তু আইয়ূব খান তা পাশ করিয়ে নেয়। তখন মার্শাল ল চলছে। এই আইন পাশ হবার কথা শুনে হুযুর শুধু দীর্ঘ শ্বাস ছাড়তেন। রাত্রে ঘুমাতেন না। এরপর আইয়ুব খান ঢাকায় এসে উলামায়ে কেরামের সাথে সাক্ষাত করতে চাইলেন। হুযুর গেলেন এবং তার মুখের উপর প্রতিবাদ করলেন।

প্রশ্ন: হুযুরের সাথে এই প্রতিবাদে আর কে কে ছিলেন?

উত্তর: হুযুরের সাথে আর ছিলেন দীন মুহাম্মদ সাহেব। আরো অনেকে। সেখানে তো আইয়ুব খানের সঙ্গে খুব রাগারাগি হলো। ইতিমধ্যে এলো শর্ষিণার পীর সাহেব। আইয়ূব খান হেসে বললেন– বহুত মোটে হো গেয়ে। পীর সাহেব বললেন- আচ্ছে খিলাতে হেঁ, মোটে কিউ নেহী হোঙ্গা। এভাবে দু'জনের মধ্যে হাসা হাসি চলছিল। হুযুর খুব অসন্তুষ্ট হলেন যে, আইয়ুব কুরআন হাদীসের বিরুদ্ধে আইন করলো, আর উনি তার সাথে হেসে কথা বলছেন? এরপর সেখান থেকে এসে তিনি 'উলামায়ে ছু' বই খানি লিখলেন এবং খুলনাতে সভা করে বইখানা পাঠ করালেন। সেই থেকে শর্ষিণার পীর সাহেবের প্রতি হুযুর খুব অসন্তুষ্ট হলেন। কিন্তু ওনার পিতা সম্পর্কে বলতেন যে, তিনি খুব বড় আলেম ও বুযুর্গ ছিলেন। আবু জাফর সালেহ সাহেবের প্রতি হুযুরের মন এত খারাপ হলো যে, হুযুর যখন খুব অসুস্থ, তখন গওহার ডাংঙ্গায় উনি এসেছিলেন হুযুরকে দেখতে। আমি তখন ছিলাম গওহার ডাংঙ্গায়। আমি মাদ্রাসায় বসা ছিলাম। নদী তখন দূরে ছিল। তিনি লঞ্চ থামিয়ে কিছু ফলফ্রুট নিয়ে দেখলাম সঙ্গে আরো লোকজন ছিল- হুযুরের বাড়ির দিকে যাচ্ছেন লাইন দিয়ে। কিন্তু হুযুর সংবাদ পেয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

প্রশ্ন: দরজা বন্ধ করলেন কেন?

উত্তর: দেখা করবেন না, সাক্ষাত দেবেন না। তিনি খুব অনুনয় বিনয় করেছেন। কিন্তু হুযুর কোন মতেই দেখা দিলেন না।

প্রশ্ন: সিলেট জেলার পাকিস্তান ভূক্তির ব্যাপারে তার অবদান কি ছিল?

উত্তর: এ ব্যাপারে তিনি যথেষ্ট মেহনত করেছিলেন, হযরত মাওলানা জাফর আহমদ উছমানীকে সাথে নিয়ে। ওনাদের চেষ্টার ফলেই সিলেট জিলা পাকিস্তানের সাথে যুক্ত হয়। তাঁরা চাইছিল জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের পক্ষে। পাবলিক ছিল আলেমদের সঙ্গে।

www.pathagar.com

প্রশ্ন: সৈয়দ আবুল আলা মওদুদী সাহেবের সাথে হুযুরের কি সম্পর্ক ছিল? "ভুল সংশোধন" বই লেখার পটভূমি কি ছিল?

উত্তর: হুযুর তাকে ভাল মনে করতেন। করাচী গিয়ে হুযুর তার বাড়ীতে গিয়ে সাক্ষাত করতেন। মহব্বত দোস্তী ছিল। যখন ওনার ভুলগুলো হলো, তখন হুযুর ওনাকে বুঝাতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি যখন সংশোধন করলেন না, তখন তিনি 'ভুল সংশোধন ' বই লিখলেন।

প্রশ্ন: জামাআতের লোকেরা দাবী করে যে, এই বই হুযুরের লেখা নয়।

উত্তর: এ ব্যাপারে আমি আমার বাংলা বোখারী শরীফের সপ্তম খন্ডে আলোচনা করেছি। এই লেখার সাক্ষী ছিলেন যশোরের মাওলানা আবুল হাসান (রহঃ), গোপালগঞ্জের মাওলানা হোসাইন আহমদ (রহঃ), মাওলানা আব্দল মুকতাদের সাহেব ও গওহারডাঙ্গার মরহুম মুহতামিম হযরত মাওলানা আব্দুল আজিজ সাহেব। এ বই লেখার পর গওহারডাঙ্গা মাদ্রাসার সভায় পাঠ করে শোনানো হয় এবং জনসমর্থন নেয়া হয়। পয়সাও তোলা হয়। হুযুর তখন সেটাকে শুয়ে শুয়ে শুনেন। মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক সাহেব তা মাইকে পাঠ করেন। আমি লিখেছি যে সাক্ষীরা এখনও জীবিত আছে (বাংলা বুখারী শরীফ লেখার সময়)। তাদের কাছে গিয়ে যাচাই করে দেখুক জামাতের লোকেরা।

প্রশ্ন: এখন জামাআতের লোকেরা তাদের ভুলগুলো মেনে নিয়ে সংশোধন করেনা কেন?

উত্তর: আসলে তারা মওদুদীর এত ভক্ত যে, মওদুদীর কোন বিকল্প আছে বলে তারা মনে করে না। সংশোধন করবে কি ? আর নিচের কর্মীদের চাপের কারণে নেতৃস্থানীয়রা এ ব্যাপারে কিছু স্বীকারও করতে পারে না।

প্রশ্ন: জাতি গঠনে বাংলা সাহিত্যে সদর সাহেব হুযুরের অবদান কি?

উত্তর: বাংলাভাযায় তো হুযুর বই লিখেছেন। ভাযাতো হুযুর খুব সহজ ব্যবহার করেছেন। আমার মনে আছে, একজন খুব বড় শিক্ষিত লোক একবার বলেছিলেন- হুযুর আপনার বইগুলোর বিযয়বস্তু এত সুন্দর। কিন্তু আপনি তা ময়লা কাপড়ে পেঁচিয়ে রেখেছেন। হুযুর বলেছিলেন- ময়লা হলেও নাপাক না, পাক। আমি ইচ্ছা করেই পান্ডিত্যের ভাযা রাখিনি। নাপাক কাপড় সুন্দর হলেই কি হয়?

www.pathagar.com

প্রশ্ন: জাতির পরিবর্তনের জন্য হুযুর কি চেষ্টা করেছিলেন? স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটির ছাত্রদেরকে ইসলামের দিকে আনবার জন্য কি চেষ্টা করেছিলেন?

উত্তর: ভাষার মধ্যে ইসলামকে ঢুকাতে চেষ্টা করেছেন। পাকিস্তান গভর্ণমেন্টও চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এদেশের আধুনিক শিক্ষিতরা আগাতে দেয়নি। হুযুর যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন। দেখেন না, নজরুল ইসলাম জাতীয় কবি হতে পারলো না কেন (পাকিস্তান আমলে)? কারণ তার কবিতায় আজাদ, ঈমান, আমামা আছে, এগুলো কি অন্যদের কবিতায় আছে? নজরুলের কবিতায় শতকরা প্রায় ষাট শব্দ আরবী ফার্সী ব্যবহার করেছেন। এজন্যই তো নজরুল আগাতে পারলো না।

প্রশ্ন: ইসলামী ও দ্বীনি শিক্ষা সংস্কারে তাঁর অবদান কি ছিল?

উত্তর: এ ব্যাপারে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা ছিল হুযুরের এক বিশেষ পদক্ষেপ। কিছু দিন আমি গিয়েছিলাম মাদারী পুরের শরীয়তপুর। শরীয়তপুর চর অঞ্চল। সেখানকার লোক খুবই ভাল দ্বীনদার। বেশ কয়েকটা মাদ্রাসা দেখলাম। আমার ছাত্ররা সেখানের মুদাররেস। তারা আমার সাথে এসে দেখা করলো। বললো- অমুক মাদ্রাসা, অমুক মাদ্রাসা। সদর সাহেব হুযুরের ছেলে হাফেয ওমরও আমার সাথে ছিল। আমি বললাম- তুমি বলতে পার নাকি এখানে কেমন করে এত মাদ্রাসা হলো?

ওমর বলল যে, লোকেরা বলেছে— হুযুর আমার বাড়ীতে এসেছেন, হুযুর আমার বাড়ীতে এসেছেন কেউ বলে হুযুর আমার বাড়ীতে দু'-তিনবার এসেছেন। এদেশে বহুত এসেছেন। আমি বললাম সে সময়তো আসা যাওয়ার তেমন ব্যবস্থা ছিল না। একজন লোক আমাকে বললো- বরিশাল-ঢাকা স্টীমারের একটি স্টেশন ছিল ঐ চর অঞ্চলে। হুযুর ঐ স্টীমারে আসা যাওয়া করতেন। এক হাজী সাহেবের বাড়ী ছিল স্টেশনের পাশে। তিনি বলেছিলেন- হুযুর আপনি যখন এদেশে আসবেন, যতদিন আপনার মনে চায় আমার মেহমান হয়ে এখানে থাকবেন। এরকম অনেক লোকের সঙ্গে আমার দেখা হলো। এথেকে বুঝা যায়, হুযুর এদেশে বহুত গাশ্‌ত করেছেন। আরেক জনকে বলতে শুনেছি - হুযুর আসতে যেতে এখানে থাকতেন এবং চতুর্দিকে দাওয়াত দিতেন। এভাবে এসমস্ত মাদ্রাসা করেছিলেন।

প্রশ্ন: খৃস্টান মিশনারীদের অপতৎপরতার বিরুদ্ধে তাঁর কি ভূমিকা ছিল?

www.pathagar.com

উত্তর: "খৃস্টানদের গোমর ফাঁক" এই বইই হুযুরের বক্তব্য। এ বিষয় নিয়েও অনেক কথাবার্তা লোকদের সাথে তিনি বলতেন।

প্রশ্ন: ফাদার পায়ার চট্টগ্রাম আসলো, লালবাগ আসলো-এ সম্পর্কে আপনি কি জানেন?

উত্তর: ঐ সম্বন্ধে আমি তেমন কিছু বলতে পারবো না। লালবাগ মাদ্রাসায় এসেছিল মনে পড়ে। কিন্তু হুযুরের সাথে কতটুকু কি হয়েছে তা বলতে পারব না।

সাক্ষাতকার গ্রহণে- দবির উদ্দীন আজাদ

=000=

www.pathagar.com

হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ) সম্পর্কে

মাওলানা আব্দুল মান্নান সাহেবের সাক্ষাতকার

প্রশ্ন: হযরত মাওলানা ফরিদপুরী (রহঃ)-এর কোলকাতার কলেজ জীবনের কোন ঘটনা জানেন কি?

উত্তর: মাওলানা থানভী (রহঃ) একবার কোলকাতা আসেন। তখন স্কুল কলেজ, মাদ্রাসার ছেলেরা এবং অন্যান্য লোকজন মাওলানা থানভীর সাথে দেখা করে দুয়া নেয়। প্রত্যেকে ব্যবসা বাণিজ্য, পড়া-শোনা বিভিন্ন জাগতিক বিষয়ে দুয়া চায় মাওলানা থানভীর নিকটে। কিন্তু মাওলানা শামছুল হক দুয়া চান এই ভাবে যে, আল্লাহ তা'আলা আমার উপরে রাজী হয়ে যান এই জন্য আমি দুয়া চাই। তখন হযরত থানভী (রহঃ) তাঁর চেহারা থেকে নিয়ে পা পর্যন্ত দেখলেন। হযরত থানভী (রহঃ) বললেন- তুমি আমার কাছে এই ব্যাপারে দুয়া চাও। তবে তুমি মাদ্রাসায় দ্বীনি তা'লীম হাছিল করছ না কেন? তখন মাওলানা শামছুল হক সাহেব বললেন, হযরত! আমি তো পড়তে চাই। কিন্তু আমার আব্বা আমাকে পড়তে দেন না। সুতরাং আমি জেনারেল লাইনে পড়তে বাধ্য হচ্ছি। এরপরে মাওলানা থানভী (রহঃ) আফসোস করে বলেছিলেন- "কী যামানা এসে গেল যে, ছেলে এলমে দ্বীন পড়তে চায়, অথচ বাবা মা পড়াতে চায় না!"

এরপরে হযরত থানভীর (রহঃ) সাথে যে সম্পর্ক স্থাপিত হলো এই সম্পর্কের সূত্র ধরেই তিনি যখন মাদ্রাসায় পড়ার জন্য প্রোগ্রাম নিলেন, তখন তিনি হযরত মাওলানা থানভী (রহঃ)-এর সাথে যোগাযোগ করেন এবং কোথায় পড়বেন এ ব্যাপারে পরামর্শ চান। মাওলানা থানভী (রহঃ) বললেন- তুমি প্রথমে সাহারানপুর মাজাহেরে উলূম মাদ্রাসায় পড়। নীচের দিকের পড়াশোনা ঐখানে ভাল হয়। উপরের দিকের পড়াশোনা দারুল উলূম দেওবন্দে পড়। উপরের দিকের পড়াশোনা ওখানে ভাল হয়। কোলকাতা পড়তে যাবার পূর্বে তিনি যখন স্কুলে পড়াশোনা করতেন তখন যে স্কুলেই তিনি ভর্তি হতেন সে স্কুলের পার্শবর্তী এলাকায় যে কোন আলিম বা দ্বীনী ব্যক্তিত্বের সাথে তার সাক্ষাত হত তার সাথে তিনি মাদ্রাসায় পড়াশোনার ব্যাপারে পরামর্শ করতেন এবং দ্বীনী বই-পুস্তক সংগ্রহ করতেন। কিন্তু তাঁর আব্বা যখনই এটা টের পেতেন তখনই তার স্কুল পরিবর্তন করে দিতেন।

প্রশ্ন: অসহযোগ আন্দোলনে তিনি শরীক হয়েছিলেন কি না?

www.pathagar.com

উত্তর: হ্যাঁ, শরীক হয়েছেন। তাঁর পড়াশোনার সময়কার কথা। এক পর্যায়ে পড়াশোনা বাদ দিয়েই তিনি চলে গেলেন দেওবন্দ-সাহারানপুর এর উদ্দেশ্যে এবং যাবার পথে একটা চিঠি লিখে গিয়েছিলেন আব্বার কাছে।

প্রশ্ন: তিনি সাহারানপুর মাদ্রাসায় কি পড়েছেন?

উত্তর: হেদায়া পর্যন্ত পড়েছেন।

প্রশ্ন: হাফেজ্জী হুযুর বলেছেন সাহারানপুরে তার সঙ্গে কাফিয়া জামাতে একসঙ্গে পড়েছেন। একথাটি কি ঠিক?

উত্তর: হ্যাঁ, তা হতে পারে। হাফেজ্জী হুযুর যেহেতু ছিলেন সঙ্গের সাথী, সুতরাং মেশকাত পর্যন্তই ওখানে ছিলেন এবং দাওরা দারুল উলূম দেওবন্দে গিয়ে পড়েন।

প্রশ্ন: এর পরে কি করেন? দেওবন্দে পড়ার সময়ও কি প্রতি সপ্তাহে যেতেন থানভীর দরবারে?

উত্তর: হ্যাঁ, প্রতি সপ্তাহে যেতেন। সব সময় গেছেন।

প্রশ্ন: কত পথ ওখান থেকে?

উত্তর: আঠার মাইলের মত হবে। সাহারান পুর থাকতেও তিনি যেতেন। দেওবন্দ থাকতেও তিনি যেতেন। প্রত্যেক সপ্তাহে এবং রমজানে তিনি থানভীর দরবারে চিল্লা লাগাতেন।

প্রশ্ন: এর পরে থানভী সাহেবের কাছ থেকে চলে আসলেন কোন সালে এবং কিভাবে কত চিল্লা লাগিয়েছেন?

উত্তর: বহুত চিল্লা লাগিয়েছেন। বাইশটার কম তো অবশ্যই হবে না। কারণ পড়বার জামানা থেকে এবং ফারেগ হওয়ার পরে তিনি যে কোন জায়গায় মুদাররেসী করতেন, যে কোন জায়গায় থেকেছেন, তিনি রমজানের বন্ধ হলেই থানভী (রহঃ) এর দরবারে যেতেন। সুতরাং চিল্লা বাইশ বা তার চেয়ে বেশী হবে।

প্রশ্ন: দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে ফারেগ হওয়ার পর তিনি কোথায় গেলেন?

উত্তর: হযরত ফরিদপুরী দারুল উলূম থাকতেই হায়দারাবাদের নিযাম চীপ জাস্টিজের জন্য, দেওবন্দে কোন ভাল আলিম চেয়ে চিঠি দিয়েছিলেন। এ জন্য তাঁর বেতন ধার্য হয়েছিল চারশত টাকা। দারুল উলূম দেওবন্দের সকল আসাতেযায়ে কেরাম চিন্তা করলেন- শামছুল হক তো ভাল পড়াশোনা করেছে। এ কাজের জন্য সেই যোগ্য বেশী। উস্তাদের

www.pathagar.com

মধ্য থেকে কেউ তাকে বললেন যে, ভাই তোমার জন্য তো আমরা এ রকম চিন্তা করেছি, তুমি হায়দারাবাদে যাও। তোমার বেতন এই রকম হবে। আরো বাড়তে থাকবে। তৎকালীন যুগে চারশত টাকা তো বিরাট ব্যাপার। মাওলানা শামছুল হক খুব আফসোস করলেন এবং বললেন হযরত আমি তো লেখাপড়া করেছি দেশে কিছু দ্বীনি খেদমত করব সেই জন্য। চাকুরী করব, টাকা পয়সা উপার্জন করব, শান শওকাত করব এই জন্য তো আমি এত পরিশ্রম করে দ্বীনি শিক্ষা গ্রহণ করিনি।

প্রশ্ন: এ কথা গুলো তিনি কাকে বললেন?

উত্তর: খুব সম্ভব মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী বা তৎকালীন মোহতামিম সাহেবকে।

প্রশ্ন: হুযুর এর পরে কি করলেন?

উত্তর: ব্রাহ্মণ বাড়িয়া মাদ্রাসা থেকে– যে মাদ্রাসা আগে থেকেই প্রতিষ্ঠিত, ওখানে মুদাররিস চাওয়া হল। মাওলানা ইউনুস সাহেব মোহতামিম ছিলেন। তিনি শুধু মাওলানা শামছুল হক সাহেব কে চেয়েছেন তা নয়। কয়েকজন মুদাররিস তিনি নেন। হযরত মাওলানা শামছুল হক সাহেব এবং পীরজী হুযুর, হাফেজ্জী হুযুর, মাওলানা মোহাম্মদ আলী সাহেব, আরো কেউ ছিলেন কি না আমার মনে পড়ে না। মোট কথা এরকম কয়েকজন মুদাররিস তিনি চান। ওখানে গিয়ে– তাঁরা যাওয়ার পর মাদ্রাসা বাড়ল জামাত বেশী হল।

প্রশ্ন: ঐ মাদ্রাসায় তিনি কয় বছর ছিলেন?

উত্তর: আনুমানিক তিন বছর হবে হয়তো। ঐখানকার একটা ঘটনা আমি শুনেছি। আমি যতটুকু শুনেছি গিমাডাঙ্গার বড় হাফেয সাহেব হুযুর থেকে।

প্রশ্ন: গিমাডাঙ্গার বড় হাফেয সাহেব হুযুরের নাম কি?

উত্তর: আবুল কাসেম বা কাসেম সাহেব। তিনি বলেছেন যে, ওখানে যে কঠোর পরিশ্রম তিনি করেছেন, যে কষ্ট করেছেন তার তুলনা নেই। এ প্রসঙ্গে হাফেয কাসেম সাহেব বলেন- হুযুরের ফ্যামিলি অর্থাৎ আমাদের আম্মা সাহেবাও ওখানে ছিলেন। তার ভাগিনা জয়নাল আবেদীন এবং আরো অনেক ছেলে ছিল। এভাবে হুযুর দিন গুজরান করতেন। আম্মাজান কোন কোন সময় চাল-ডাল মিশিয়ে খিচুড়ী পাক করতেন এবং সবাইকে ভাগ করে দিতেন। পেট তো ভরত না সবার। ভাগে যার যা পড়ত খেতেন।

www.pathagar.com

এভাবে তিনি কষ্ট স্বীকার করেছেন মুজাহাদা করেছেন। একবার ইউনুস সাহেবের সাথে মনে হয় মাদ্রাসা পরিচালনার ব্যাপারে মতানৈক্য হল। মতানৈক্য হওয়ার পরে তারা সবাই চিন্তা করলেন যে, ওখানে থাকবেন না। যাবেন কোথায় চিন্তা করতে লাগলেন।

খুলনা জেলার বাগের হাটের মধ্যে গজালিয়া গ্রামের কোন এক বিশিষ্ট মুরব্বী, তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়া যাবার সময় স্টিমারে হুযুরের সঙ্গে দেখা হয়। দেখা হলে উনি বলেছিলেন যে, আমরা তো আমাদের দেশে একটা মাদ্রাসা করতে চাই, লোক পাচ্ছিনা। তখন হুযুর লোকটার ঠিকানা, বাড়ি কোথায়, দেশ কোথায় এগুলো নিয়ে নিলেন। এরপর ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় যখন মতানৈক্য হয়, তখন কোথায় যাবেন এ ব্যাপারে চিন্তা করতে লাগলেন। তখন সদর সাহেব হুযুরের ঐ কথাটা মনে পড়ল যে, বাগের হাটের একজন লোক তো এ রকম বলেছিল– গজালিয়া গ্রামে পরে ঐ লোকের সাথে যোগাযোগ করলে সম্মত হন– ঠিক আছে আমরা এখানে মাদ্রাসা করতে পারি। এরপর হুযুর সবাইকে বললেন গজালিয়ার কথা। পীরজী হুযুর, হাফেজ্জী হুযুর অন্য সবাই রাজী হলেন। বললেন– তাহলে আমরা সেখানেই যাই।

প্রশ্ন: গজালিয়ায় মাদ্রাসা কিভাবে শুরু হল?

উত্তর: সদর সাহেব হুযুর পীরজী হুযুর ও হাফেজ্জী হুযুরকে চিঠি লিখলেন যে, আপনারা গওহারডাঙ্গায় আসেন। এখান থেকে যাওয়া যাবে। গওহারডাঙ্গা কোথায় তাও পীরজী হুযুর ও হাফেজ্জী হুযুর জানেন না। তাঁরা ফরিদপুর আসলেন। ভাবলেন গজালিয়া ফরিদপুর জেলায়। যখন ফরিদপুর এসে জানলেন যে, গওহারডাঙ্গা বা গোপালগঞ্জ তো এ জায়গায় নয়। তাঁরা গোপালগঞ্জ আসলেন নৌকায় করে। বড় পানসী নৌকায় করে গওহারডাঙ্গায় এলেন। তারপরে গওহারডাঙ্গা থেকে গেলেন গজালিয়া। সেখানে মাদ্রাসা আরম্ভ করলেন। সে একেবারে অজপাড়াগাঁ, মানে– যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন, কোন টাউনও কাছে নেই। যাই হোক মাদ্রাসা আরম্ভ করলেন। গ্রামবাসীরা ছাত্র ও মোদাররেসদের খাবার ব্যবস্থা করত। তারা কঠোর পরিশ্রম করতে থাকলেন। ঐ গজালিয়ায় আমাদের গওহারডাঙ্গা মাদ্রাসার মরহুম মেহাতামিম সাহেব, মাওলানা আবদুল আজিজ সাহেব (রহঃ) ও ছিলেন। তিনি সদর সাহেবের সাথে তার আগে থেকে যোগাযোগ রাখতেন এবং অসাধারণ ভক্তি শ্রদ্ধা করতেন। মুরীদও ছিলেন হযরত সদর সাহেবের কাছে।

www.pathagar.com

প্রশ্ন: মাওলানা আব্দুল আজিজ সাহেব কি ঐসময় ছাত্র হিসেবে ছিলেন?

উত্তর: না, মোদাররেসি করতেন। সম্ভবতঃ এখানে হযরত সদর সাহেব (রহঃ) তিরমিযী শরীফ পড়াতেন। তাঁর দরস সমূহে তিনি বেশীর ভাগ সময় থাকতেন। ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় যে মাদ্রাসা তাঁরা করেছিলেন– দাওরায়ে হাদীস পর্যন্ত মাদ্রাসা, সেই মাদ্রাসার উস্তাদ এবং ছাত্ররা চলে আসল গজালিয়ায়। যখন গজালিয়া মাদ্রাসা দাওরায়ে হাদীস মাদ্রাসায় রুপান্তরিত হয়ে গেল। এরপরে তাঁরা অনুভব করলেন যে, গজালিয়া গ্রামে এতবড় মাদ্রাসা চলতে পারে না। সেই জন্য আমাদের এখন ঢাকার দিকে যাওয়া দরকার। তবে এখানে যেহেতু একটা প্রতিষ্ঠান হয়ে গেছে, এজন্য এ মাদ্রাসাটা ধ্বংস হয়ে যাক এটাও তাঁরা চান না। চান না বিধায়, গওহারডাঙ্গা মাদ্রাসার মরহুম মোহতামিম সাহেব যেহেতু পাবলিকের সাথে কথাবার্তা বলা, ওয়াজ নসীহত করা ভাল বুঝতেন, যোগ্য লোক ছিলেন, এই জন্য সদর সাহেব হুযুর পরামর্শ করলেন– আমরা তো এখানে থাকবো না, ঢাকায় চলে যাব, তবে এই মাদ্রাসাটা ধ্বংস না হোক, প্রতিষ্ঠানটা যখন হয়েছে, তখন এটা থাকুক। সেই হিসেবে তাঁকে গজালিয়ায় রেখে আসেন। গজালিয়ায় রেখে আসার পর তাঁরা ঢাকা আসেন। এরপর বড় কাটারায় মাদ্রাসার জন্য জায়গা পান। হাফেয মোহাম্মদ হুসাইন জায়গা দেন। তাঁরা ওখানে মাদ্রাসা আরম্ভ করলেন। তারপর ওখান থেকে পরে হুযুর লালবাগ গেছেন। অন্যান্য উস্তাদও গেছেন। হুযুর ফরিদাবাদ মাদ্রাসাও করেছেন। এই তিনটি মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা এবং সর্বেসর্বা বলতে গেলে হযরত সদর সাহেবই।

প্রশ্ন: ফরিদাবাদ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার কোন তথ্য আছে কি?

উত্তর: ফরিদাবাদ মাদ্রাসা সম্পর্কে আমি প্রত্যক্ষ ভাবে জানি। শাকের মোহাম্মদ নামে এক ব্যক্তি আমার কাছে বলেছেন, আমি সদর সাহেব (রহঃ) এর খাদেম ছিলাম। নিচের দিকে পড়তাম। একদিন একজন লোক এসে সদর সাহেবকে (রহঃ) বলছে যে, ওয়াছেল মোল্লা সাহেবের ছেলে কবীর উদ্দীন মোল্লা ফরিদাবাদে একটা সিনেমা হল করতে যাচ্ছে। ওয়াছেল মোল্লা এতবড় ব্যবসায়ী ছিলেন এবং ব্যবসায় তিনি এত উন্নতি লাভ করেছিলেন যে, কলকাতার হিন্দুরাও তার আগে যেতে পারত না। উল্লেখ্য, ওয়াছেল মোল্লা সাহেব সদর সাহেব (রহঃ)এর বন্ধু ছিলেন। সেই জন্য ওয়াছেল মোল্লা সাহেবের ছেলেরা বাপের বন্ধু হিসেবে চাচাজী চাচাজী করে ডাকত। দেশ বিভাগের পর ওয়াছেল মোল্লার ছেলে কবীর উদ্দীন মোল্লা বিভিন্ন স্থানে জায়গা নেন এবং ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়ে

www.pathagar.com

তুলবার চেষ্টা করেন। কবীর উদ্দীন মোল্লা সদর সাহেবের সাথে গভীর সম্পর্ক রাখতেন।

শাকের মোহাম্মদ একদিন আমাকে বলেন, একজন লোক এসে কবীর উদ্দীন মোল্লার নামে সদর সাহেবের কাছে নালিশ করল যে, কবীর উদ্দীন মোল্লা আপনাকে চাচাজী করে ডাকে আপনি তাকে মহব্বত করেন। অথচ সে ফরিদাবাদে পাঁচ বিঘার মত জায়গা নিয়েছে সিনেমা হল করার জন্য। আরো কিছু করবে হয়তো।

সদর সাহেব হুযুর বললেন যে, কবীর উদ্দীন কে বল আমার সাথে দেখা করতে বল। তিনি জলদি দেখা করবেন বলে সদর সাহেবের ধারণা ছিল। কিন্তু আট-দশ দিন পরে দেখা করল। শাকের মোহাম্মদ বলেন যে, যেহেতু আমি খাদেম ছিলাম সেহেতু আমি হুযুরের কামরায় থাকতাম। কবীর উদ্দীন মোল্লা এসে মোসাফাহা করল এবং আদবের সাথে বসল। হুযুর বললেন, কবীর মিয়া! আমি তো তোমাকে বেশ আগে সংবাদ দিয়েছি আসবার জন্য, কিন্তু তুমি দেরী করেছ কেন? মোল্লা সাহেব বিনীত ভাবে উত্তর দেন এবং একটা ফাইল খুঁজতে থাকেন। অতঃপর বলেন, হুযুর! আমি একটু ঝামেলায় ছিলাম। ফাইল খোলার পরে একটা দলিল হুযুরের হাতে দেয়ার পরে কবীর উদ্দীন মোল্লা বলতে লাগল, আমি আপনার সংবাদ শুনেছি অনেক আগে। সংবাদ শোনার পর আমার দেলটা কেঁপে উঠেছিল। আমি ফরিদাবাদের ঐ জায়গাটা নিয়েছিলাম সিনেমা হলের জন্য। আমি সবার কাছে বলেছিও। হয়ত আপনার কানে এ কথাটা যাবে এবং এ কথাই জিজ্ঞেস করবেন আমার কাছে। তখন আমার দেলের মধ্যে একটা ভয় এসেছে। এখন আমি এই জায়গাটি আপনার নামে রেজিষ্ট্রি করেছি। এতে আমার কিছু সময় লেগেছে। এই নিন দলিলটি। অন্যথায় আমি সময়মত আসতাম। এটা আপনার ব্যক্তিগত সম্পত্তি। পরবর্তীতে হুযুর উক্ত জায়গায় মাদ্রাসা করেন। উল্লেখ্য উক্ত ঘটনা লালবাগ প্রতিষ্ঠিত হবার পরের।

ভাওয়ালের আলাউদ্দীন পন্ডিত হুযুরের একজন খাছ লোক ছিলেন। হুযুরের সঙ্গে তার গভীর সম্পর্ক ছিল। তিনি ফরিদাবাদ মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করতেন। তিনি বলেন, জীবনের শেষ ভাগে হুযুর একবার আমাকে ডেকে বললেন, ফরিদাবাদ মাদ্রাসার জায়গা তো আমার নামে রেজিস্ট্রী করা আছে। আমার ইন্তেকালের পর এ জায়গাটা নিয়ে গোলমাল সৃষ্টি হতে পারে। সুতরাং এ ব্যাপারে কি করা যায় আলাউদ্দীন মিয়া। তিনি বলেন, হুযুরের এ প্রশ্ন শুনে আমি চুপ করে থাকলাম। কি

www.pathagar.com

উত্তর দেব ভেবে পাচ্ছিলাম না। পরে হুযুর সিদ্ধান্ত নিয়ে মাদ্রাসার নামে জমিটি রেজিস্ট্রি করে দিলেন। অবশ্য ওয়াকফ দলিলের মধ্যে লিপিবদ্ধ ছিল। যিনি লালবাগ মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল থাকবেন তিনি ফরিদাবাদ মাদ্রাসার মোতাওয়াল্লী থাকবেন। আর এ কারণেই হযরত সদর সাহেব (রহঃ) এর পরে হযরত মাওলানা হিদায়াত উল্লাহ সাহেব (রহঃ) লালবাগ মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হলে ফরিদাবাদ মাদ্রাসার মুতাওয়াল্লী তিনিই হন।

প্রশ্ন: হযরত যাফর আহমদ উসমানীর সঙ্গে সদর সাহেব হুযুরের কিরূপ সম্পর্ক ছিল?

উত্তর: সদর সাহেব হুযুর তো পড়ার জামানা থেকে মাওলানা থানভী (রহঃ)এর দরবারে যেতেন। আর হযরত যা'ফর আহমদ উসমানী তো থানভী (রহঃ)এর ভাগিনা। তিনি থানভীর সবচেয়ে বড় খলীফা এবং ঘনিষ্ঠ ছিলেন। সেই হিসেবে হযরত মাওলানা যাফর আহমদ উসমানীকে সবাই ছোট হযরত বলত। খলীফাগণ এবং অন্য সবাইও হযরত জাফর আহমদ উসমানীকে ছোট হযরত বলতেন। ওই সময় থেকে তাঁর সঙ্গে সদর সাহেবের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। তিনি ঢাকায় আসলে আশরাফুল উলূম মাদ্রাসায় থাকতেন। এরপর ঢাকায় আসলে এখানে দরসও দিতেন।

প্রশ্ন: সদর সাহেব হুযুর ছোট হযরতের মুরীদ ছিলেন কি না?

উত্তর: তা তো অবশ্যই ছিলেন। থানভী (রহঃ)-এর ইন্তেকালের পরে তিনি ছিলেন দায়িত্বশীল তাই তাঁর সঙ্গে এসলাহী সম্পর্ক ছিল।

প্রশ্ন: সদর সাহেব হুযুর কি উসমানী সাহেবের খলীফা ছিলেন?

উত্তর: জ্বী, আমার যতটুকু জানা তাঁর খলীফা ছিলেন এবং থানভী (রহঃ)-এরও। এ সম্পর্কে আজীব ঘটনা আমি শুনেছি। সদর সাহেবকে (রহঃ) মাওলানা থানভী (রহঃ) খেলাফত দেন। খেলাফত দেয়ার পরে বললেন যে, আমি তো তোমাকে এ দায়িত্ব দিতেছি। মাওলানা ফরিদপুরী (রহঃ) তখন মাওলানা থানভী (রহঃ)-এর পা জড়িয়ে ধরেন। তিনি বলেন যে, হযরত আমি আপনার খেলাফতের অযোগ্য, এত বড় দায়িত্ব আমি নিতে পারব না। গোপালগঞ্জের কাঠি গ্রামের হাফেয মাওলানা নিজাম উদ্দীন সাহেব যিনি খুলনা সোনালী জুট মিলের বড় মসজিদের ইমাম ছিলেন— তাঁর কাছে আমি শুনেছি যে, হযরত সদর সাহেব (রহঃ) যখন ইন্তেকাল করেন তখন কথাটা মাওলানা উসমানী সাহেবের কাছে উঠানো হয় যে, অনেকে বলে মাওলানা শামছুল হক সাহেব থানভী (রহঃ)-এর খলীফা ছিলেন না।

www.pathagar.com

এ সম্পর্কে হযরত আপনি কি জানেন? তখন মাওলানা যা'ফর আহমদ উসমানী সাহেব বলেন, "কোন কাহতা হায় কে শামছুল হক মাওলানা থানভী (রহঃ)কে খলীফা নেহী থে? ওহ্ আজাল্লে খুলাফা মে ছে থে।" অর্থাৎ বড় বড় খলীফা যারা ছিলেন তাদের মধ্যে একজন ছিলেন মাওলানা শামছুল হক (রহঃ)।

আমার যেটা বুঝে আসে সেটা হল এই যে, মাওলানা শামছুল হক (রহঃ) থানভী (রহঃ)এর পায়ে ধরেছেন এবং বলেছেন, হুযুর আমি এটার যোগ্য নই। এটা আপনি প্রকাশ করবেন না। এই ভাবে মনে হয় এর মধ্যে বিরাট একটা রহস্য আছে। যে রহস্যের কারণে খলীফাদের নামের লিস্টের ভিতর তাঁর নাম আসে নাই। তবে থানভী (রহঃ)এর যে সমস্ত খলীফা বাংলাদেশে ছিলেন সম্ভবতঃ তাঁর ঐ আজিযি এনকেছারী বা খোলাফাদের নামের তালিকায় আমার নাম প্রকাশ করবেন না– এই অনুরোধের পরে হযরত থানভী (রহঃ)-এর একটা বিশেষ দুয়া তিনি নিশ্চয় পেয়েছেন। কেননা হযরত থানভী (রহঃ) ভেবেছেন অনেকে তো খলীফা হওয়ার জন্য প্রস্তুত। এমন কথাতো বলেও না যে, আমাকে খলীফা বানাবেন না হুযুর। আর এই নওজোয়ান আলেম, একে আমি খলীফা বানিয়েছি, এটা একটা সুনামেরও ব্যাপার বটে। অথচ সে আমার কাছে কান্নাকাটি করছে আমার পায়ে ধরছে!

কাজেই বিশেষ কোন দুয়া মাওলানা শামছুল হকের ব্যাপারে করেছেন আর সেটা কবুলও হয়েছে এবং এরই পরিপ্রেক্ষিতে আমার মনে হয় যে, হযরত থানভী (রহঃ)এর যে সমস্ত খলীফা ছিলেন এই বাংলাদেশে বা তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানে সব খলীফাদের কাজ একদিকে করলেও হযরত মাওলানা ফরিদপুরী (রহঃ)এর কাজ– মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে, দ্বীনের এশায়াতের ব্যাপারে, ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টির ব্যাপারে হোক অর্থাৎ রাজনৈতিক লাইনে বাতেলের মোকাবেলার ক্ষেত্রে হোক, সামাজিক অবদান রাখার ব্যাপারে হোক, মুসলমানদের স্বার্থের ব্যাপারে হোক যে কোন ব্যাপারে হোক হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী সাহেব যা করেছেন এবং অন্য খলীফারা যা করেছেন সব একত্রিত করলে হযরত মওলানা শামছুল হকের খেদমত অনেক বেশী হয়। অন্য খলীফারা হয়তো এক এক জন এক একটা মাদ্রাসা করেছেন। অথচ তিনি তো ঢাকাতেই তিনটি মাদ্রাসা করেছেন। বড় মাদ্রাসা বলতে এই তিনটিই ছিল।

www.pathagar.com

গওহারডাঙ্গায় এমন মাদ্রাসা করেছেন যে, পদ্মার ওপারে এতবড় প্রতিষ্ঠান আর নেই। যেখানে মাদ্রাসা হওয়া দরকার অথচ মাদ্রাসা নেই সেখানে তিনি মাদ্রাসা করেছেন। ঢাকার নিকটে মোস্তফাগঞ্জ মাদ্রাসাটা হয় এভাবে যে, সদর সাহেব (রহঃ) যখন আশরাফুল উলূম মাদ্রাসায় ছিলেন, সম্ভবতঃ সেই সময়, ওখানকার মাওলানা আজিজুর রহমান সাহেব আশরাফুল উলূম মাদ্রাসার ছাত্র। মাওলানা আজিজুর রহমান সাহেব ভাল বংশের এবং স্বচ্ছল পরিবারের ছিলেন। তিনি একবার হযরত সদর সাহেবকে এবং আরো অনেককে মোস্তফা গঞ্জে জলসা করবার জন্য দাওয়াত করে জলসার খরচের জন্য অনেক টাকা উঠিয়েছেন। খরচ খরচার পরে একশ পঞ্চাশ টাকা হুযুরের খেদমতে এনে হাজির করেন। হুযুর বললেন, না আমার টাকার দরকার নেই। নেব না টাকা আমি। তারা বললেন, হুযুর আপনি হাদিয়া নেবেন না। এতো ফেরত দেওয়াও কঠিন। এটা বেঁচে রয়েছে। বিভিন্ন জনে টাকা পয়সা দিয়েছে। তা থেকে এ টাকা রয়েছে। এটাকা আমরা খাঁটাবো কোথায়? সুতরাং এ টাকা আপনি আশরাফুল উলূম মাদ্রাসার জন্য নিয়ে যান। হুযুর বললেন, ঢাকার মাদ্রাসায় টাকার কোন সমস্যা নেই। এখানে কি কোন মাদ্রাসা আছে? তারা বলল, না এখানে কোন মাদ্রাসা নেই। হুযুর বললেন, আপনারা মাদ্রাসা করেন। এ টাকা আমি সেই মাদ্রাসার জন্য দিয়ে গেলাম। আসলে হয়তো হুযুরের মতলব এটাই ছিল। সে জন্য তিনি টাকা নেওয়ার ব্যাপারে এই রূপ করেন। এই ভাবে তিনি যেখানে গিয়াছেন সেখানে মাদ্রাসা করেছেন। মসজিদ না থাকলে মসজিদ করেছেন। নিজের পকেট থেকে পয়সাও দিয়েছেন।

প্রশ্ন: বায়তুল মোকাররম মসজিদ প্রতিষ্ঠার পিছনে কি সদর সাহেব হুযুরের কোন অবদান ছিল?

উত্তর: আমি এতটুকু শুনেছি যে, এ মসজিদ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারেও তাঁর যথেষ্ট ভূমিকা ছিল। জায়গাটা ছিল উর্দূভাষী ব্যবসায়ীদের। তিনি প্রচেষ্টা চালিয়ে এ মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন।

প্রশ্ন: পাকিস্তান আন্দোলনে সদর সাহেব হুযুরের ভূমিকা কি ছিল?

উত্তর: পাকিস্তান আন্দোলনে সদর সাহেব হুযুরের ভূমিকা ও অবদান ছিল অসাধারণ। বিশেষ করে সীমান্ত প্রদেশের পাকিস্তান ভুক্তিতে তিনি যার পর নাই পরিশ্রম করেন। এ সমস্ত এলাকা সফর করে তিনি জনগণকে পাকিস্তানের পক্ষে রায় দেওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। সীমান্ত প্রদেশের আব্দুল গফ্‌ফার খান অনেক বড় মাপের নেতা ছিলেন। তিনি গান্ধিজীর

www.pathagar.com

সাথে ছিলেন। এদিকে সিলেটে হযরত মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানীর বিশেষ প্রভাব ছিল। তাই এই দুই এলাকার অধিবাসীরা মুসলমান হলেও তারা দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। মাওলানা শামছুল হক (রহঃ) যেহেতু পরিস্থিতির এপিঠ ওপিঠ সব বুঝাতে সক্ষম হতেন। কারণ তিনি দু'দিকেরই শিক্ষিত ছিলেন। ফলে তার বক্তৃতা ও আলোচনার বিরাট প্রভাব পড়ে জনগণের উপর এবং তারা পাকিস্তানের পক্ষে রায় দেয়।

এভাবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় তাঁর যথেষ্ট অবদান ছিল। কারণ উলামায়ে কেরামের সংগঠন জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ এর সর্বশেষ সভাপতি ছিলেন মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী (রহঃ)। তিনি ভারত বিভক্তির পক্ষে ছিলেন না। উলামায়ে কেরাম অধিকাংশই এই মতের পক্ষে ছিলেন। তাই পাকিস্তান আন্দোলনের বা মুসলিম লীগের নেতারা বেকায়দায় ছিলেন। কারণ উলামায়ে কেরামের সমর্থন ছাড়া সাধারণ লোকদের সমর্থন পাওয়া যেত না। জনগণ উলামায়ে কেরামের উপরই আস্থাশীল ছিল। জিন্নাহ সাহেব ও লিয়াকত আলী খান হযরত থানভী (রহঃ)এর সাথে দেখা করলে তিনি পাকিস্তানের পক্ষে মত দেন। কিন্তু তিনি তো ইন্তেকাল করলেন। পরে পাকিস্তানের পক্ষে ওলামায়ে কেরামের একটা বিরাট অংশকে একত্রিত করতে মাওলানা শামছুল হক প্রচেষ্টা চালান।

এ উপলক্ষ্যে কলকাতার মোহাম্মদ আলী পার্কে উলামা কেরামের এক সমাবেশ হয়। এখানে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ এর পাল্টা সংগঠন জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম গঠন করা হয়। হযরত মাওলানা শিব্বীর আহমদ উসমানী (রহঃ) অসুস্থতার কারণে যোগদান করতে পারেননি। তবে তিনি বক্তব্য লিখে পাঠান। তা পাঠ করে শোনানো হয়। তাই বলা যায়, জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম গঠনে সদর সাহেবেরই প্রচেষ্টা ছিল একক। কেননা অন্যরা হয়ত বয়োঃবৃদ্ধ ছিলেন, কিংবা বাংলার বাইরের ছিলেন। তাদের পক্ষে এখানে বেশী পরিশ্রম করা সম্ভব ছিল না।

আপনি কি সদর সাহেব হুযুরের কাছে কোন কিতাব পড়েছেন?

নিয়মতান্ত্রিক কোন কিতাব পড়িনি। তবে আমাদের কুদুরীর বছরে হুযুর কিছুদিন বাড়িতে ছিলেন। সম্ভবতঃ সপ্তাহ খানেক হবে। এ সময় তিনি কুদুরী কিতাবের শেষের দিকের কিছু অংশ পড়িয়েছেন। তিনি আমাদের দ্বারা পড়াতেন, তরজমা করাতেন, এবং নিজে খোলাসা বয়ান করতেন এবং তার বর্তমান পরিভাষা বলে দিতেন। হযরত মাওলানা হুসাইন আহমদ সাহেব (সিংগীপাড়া হুযুর) আমাকে একদিন ডেকে বলেছিলেন যে, সদর সাহেব হুযুর তোমাকে খুব ভাল জানেন। তুমি তার কাছে

www.pathagar.com

আরো বেশী দুয়া নেবার চেষ্টা করবে। এরপর মেশকাত শরীফে কিতাবুল ফিতানের অনেকটা তিনি আমাদের পড়িয়েছেন।

প্রশ্ন: মওদূদী সাহেবের সাথে সদর সাহেবের কি সম্পর্ক ছিল?

উত্তর: মওদূদী সাহেব যেহেতু ইসলামী হুকুমাত প্রতিষ্ঠার কথা বলতেন এজ হযরত সদর সাহেব তাকে ভাল জানতেন। যেমন ভাল জানতেন হযর আবুল হাসান আলী নদবী, মাওলানা মনযুর নোমানী প্রমুখ। তারা জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে যুক্তও ছিলেন। পরে তারা সরে আসেন হযরত সদর সাহেবও মওদুদী সাহেবের ভুল-ভ্রান্তি দেখে শুধু সরে আসেননি তাকে সংশোধনের জন্য ভুল সংশোধন বইও লিখেন। মওদূ সাহেবের চিন্তাধারার সমালোচনায় যে সব বই লেখা হয়েছে এ বই গুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এতে এমন কতিপয় মৌলি কথা লেখা হয়েছে যা অন্যান্য কিতাবে লেখা হয়নি।

প্রশ্ন: এ বই লেখার কারণ কি?

উত্তর: কারণ তো ভুল সংশোধন বইতেই তিনি লিখেছেন। মওদূদী সাহে হযরত উছমান (রাযিঃ) সম্পর্কে কটাক্ষ করেছেন। অথচ তি রাসূলুল্লাহর (সাঃ) চার খলিফার তৃতীয়, জামাতা এবং আশারা মোবাশশারার একজন। তেমনি হযরত তালহা (রাযিঃ) সম্পর্কেও কটা করা হয়েছে মওদুদীর বইতে। তিনিও জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দ জনের একজন। এ কারণেই সদর সাহেব (রহঃ) এ বই লেখেন।

প্রশ্ন: জামাআতে ইসলামীর লোকেরা বলে যে, এ বই হুযুরের লেখা নয়। সম্পর্কে আপনার কি বক্তব্য?

উত্তর: অবাক করার কথা! এ বইয়ের প্রেস কপিতে আমি হুযুরের দস্তখ দেখেছি। হুযুরের জীবদ্দশায়ই এ বই ছাপার কাজ শুরু হয়েছিল। কা বশতঃ তা সম্পন্ন হতে দেরী হয়। তাছাড়া গওহারডাঙ্গার বার্ষিক সভ এ বই পাঠ করে শোনানো হয়েছিল। ছাপার জন্য চাঁদাও উঠা হয়েছিল। হুযুর তখন নেহায়েত অসুস্থ ছিলেন। তাই স্টেজে শোয়ার ম করে হেলান দিয়ে উপস্থিত ছিলেন। বিশিষ্ট ওলামায়ে কেরাম যেম মরহুম মোহতামিম সাহেব, মাওলানা হোসাইন আহমদ সাহেব, মাওলা আবুল হাসান যশোরী হুযুর, মাওলানা মুকতাদের সাহেব প্রমুখ সেখা উপস্থিত ছিলেন। জামাআতে ইসলামীর অধ্যাপক মনিরুজ্জামানও জা যে, হুযুর এ বই লিখেছেন। কেননা হযরত মুআবিয়া (রাযিঃ) সম্পর্কি মওদূদী সাহেবের বক্তব্য খন্ডন করার জন্য এক কিতাবের কিছু তরজ

www.pathagar.com

করে আনার জন্য এই মনিরুজ্জামান সাহেবকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। হযরত মুআবিয়া (রাযিঃ)কে যে সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈন খলীফা হিসেবে মেনে নিয়েছেন। মুকাদ্দামায়ে ইবনে খলদুনের এই অংশটা তাঁকে অনুবাদ করে আনতে দিয়েছিলেন। মনিরুজ্জামান আমার সামনেও স্বীকার করেছেন যে, এ বই হুযুর লিখেছেন।

প্রশ্ন: তিনি কি ইন্তেকালের পূর্বে জামাআতে ইসলামীর সাথে সম্পর্ক রাখাকে খারাপ মনে করেছেন?

উত্তর: অবশ্যই খারাপ মনে করেছেন। হ্যাঁ তিনি তওবার আহবান জানিয়েছেন। নিয়মও বলে দিয়েছেন। যা সাধারণ নীতি অর্থাৎ গোপন ভুলের জন্য গোপনে আর প্রকাশ্য ভুলের জন্য প্রকাশ্য তওবা করতে হয়। মৌখিক ভুলের জন্য মৌখিক তওবা এবং লিখিত ভুলের জন্য লিখিত তওবা।

প্রশ্ন: হুযুরের হক্কানী তাফসীর লেখার ব্যাপারে আপনি কি জানেন?

উত্তর: তিনি এ তাফসীর লিখেছেন দীর্ঘ দিন ধরে। সাধারণতঃ তিনি ফজরের নামাযের পরে মোরাকাবা, মোশাহাদা করতেন। তারপর লেখা শুরু করতেন। এ সময় তাঁর কাছে কারো যাওয়ার অনুমতি থাকত না। তিনি একান্ত মনোযোগের সাথে আল্লাহর রাব্বুল আলামীনের সাথে যোগাযোগ রেখে লিখে যেতেন।

প্রশ্ন: এ তাফসীর এত দিন ছাপা হল না কেন?

উত্তর: এ ব্যাপারে তো আমি অনেক পরিশ্রম করেছি। ঢাকায় আমি দীর্ঘ দিন অবস্থান করে তাফসীরের প্রেস কপি তৈরী ইত্যাদি কাজে ব্যস্ত থেকেছি। যাত্রাবাড়ী যখন পড়াতাম তখন পড়ানোর পরে পুরো সময়টা এ কাজে ব্যয় করেছি। কিন্তু এক খন্ড বের হবার পরে নানা কারণে এটা বন্ধ রয়েছে। বর্তমানে তো আমার চোখের সমস্যা দেখা দিয়েছে। চিকিৎসার জন্য যাচ্ছি। আল্লাহর মেহেরবাণীতে যদি ভাল হয়ে যাই তাহলে আবার আমি এ কাজে সাহায্য করতে পারব এবং করার জন্য প্রস্তুতও রয়েছি। তবে গওহারডাঙ্গা মাদ্রাসার দায়িত্বভার আমার স্কন্ধে আসার কারণে আগের মত একাগ্র চিত্তে কাজ করার সময় পাই না। তবুও আমার পক্ষে যতটুকু সম্ভব তা করতে প্রস্তুত আছি।

প্রশ্ন: হযরত সদর সাহেব হুযুরকে সদর সাহেব বলা হয় কেন?

উত্তর: শুনেছি একবার হজ্জের সময় তখনকার সৌদী বাদশা আবদুল আজিজ ওলামায়ে কেরামের একটি সমাবেশে একটি বিষয়ে শরীয়তের ফয়সালা চান। ওলামায়ে কেরামের অনেকেই এ ব্যাপারে মতামত দেন। কিন্তু

www.pathagar.com

কারো কথায়ই তিনি আশ্বস্ত হচ্ছিলেন না। সদর সাহেব (রহঃ) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বক্তব্য রাখার জন্য অনুমতি চাইলেন। অনুমতি দেওয়া হল। তিনি তখন কোরআন হাদীসের উদ্ধৃতি, সমকালীন জ্ঞান দর্শনের আলোকে বিষয়টি এমন ভাবে ব্যাখ্যা করলেন যে, বাদশা আব্দুল আজিজ খুব তৃপ্ত হয়ে যান এবং তাকে কাছে ডেকে বলেন, "আনতা সদরুল উলামা!" "আনতা সদরুল উলামা!!" এ থেকেই তাঁকে সদর সাহেব বলা হয়।

প্রশ্ন: মুসলিম পারিবারিক আইন সম্পর্কে হুযুরের কি ভূমিকা ছিল?

উত্তর: এ আইন পাশ হলে হুযুর অগ্নিশর্মা হয়ে যান। তিনি সারা দেশে এ আইনের প্রতিবাদে সভা সমাবেশ করেন। এমনকি এ আইন পাশের সময় যে সব সদস্য পার্লামেন্টে হাত উঠিয়েছিল তিনি তাদের জন্য বদদোয়া করেছেন বলে শুনেছি। অনেকেই তার ফল ভোগ করেছে-- এমন প্রসিদ্ধি আছে। ওই মুসলিম পারিবারিক আইনের একটা ধারা ছিল এই যে, কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিলে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সমঝোতা করে দেয়ার চেষ্টা করবেন। তিনি যদি ব্যর্থ হন তাহলে এই সময় থেকে তালাকের ইদ্দত গণনা করা শুরু হবে এবং তা হবে নব্বই দিন। এখানে শরীয়ত বিরোধী কয়েকটি পয়েন্ট আছে সেগুলির মধ্যে ঃ

(১) তিন তালাক হয়ে যাবার পর চেয়ারম্যানের সমঝোতা করে দেয়ার কোন অধিকার থাকতে পারে না। (২) সমঝোতার চেষ্টা ব্যর্থ হবার পর থেকে ইদ্দত গণনা শুরু হবে। ইদ্দত গণনা তো শুরু হবে তালাক দেয়ার পর থেকে। (৩) তালাকের ইদ্দত নব্বই দিন হবে তা নয়। বরং তালাক প্রাপ্তা মহিলা গর্ভবতী হলে সন্তান প্রসব পর্যন্ত আর ঋতুবতী হলে তিন ঋতু কাল। এটা ৩মাসের কমও হতে পারে আবার দু'বছরও হতে পারে।

তখনও আমার বিয়ে হয়নি। রমজানের ছুটি হয়েছে মাদ্রাসায়। আমি মাষ্টার আব্দুর রাজ্জাক সাহেব সহ মোমেনবাড়ী যাব বলে হুযুরের কাছে বিদায় নিতে গেলাম। তিনি আমাকে এ ব্যাপারে কিছু তাহকীক করে লিখে আনতে বললেন। আমি মনে করলাম যে, দু'তিন দিন সময় লাগবে। মাষ্টার আব্দুর রাজ্জাক সাহেবকে আটকে রাখলাম। কিন্তু বিষয়টি ধরে দেখলাম এ ব্যাপারে অনেক কিছুই তাহকীক করবার ও লেখার রয়েছে। তাই তাকে ছেড়ে দিয়ে আমি দিনরাত পরিশ্রম করে তিন তালাক সমস্যা ও তার সমাধান নামে বিরাট একটা রচনা তৈরী করলাম। প্রায় চৌদ্দ দিন লেগে গেল এতে। হুযুরের কাছে নিয়ে গেলে তিনি খুবই খুশী হলেন। এবং আমার লেখা তিনটি খাতা নিজের কাছে রেখে দিলেন

www.pathagar.com

দেখবার জন্য। পরে হুযুর তার তেমন কিছু পরিবর্তন করেননি। সেটি পরে বই আকারে ছাপা হয়।

প্রশ্ন: শিক্ষা সংস্কারের ব্যাপারে সদর সাহেব হুযুরের ভূমিকা কি ছিল?

উত্তর: সদর সাহেব (রহঃ) তো এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা আমূল পরিবর্তন চেয়েছিলেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন শিক্ষা ব্যবস্থাকে ইসলামী ধাঁচে ইসলামী জীবন দর্শনের আলোকে ঢেলে সাজাতে কিন্তু মুসলিম লীগ সরকার তাতে সহযোগিতা করেনি। শেষ পর্যন্ত তিনি বলেছিলেন– প্রাইমারীর নাম বদলে মক্তব রাখা হোক। হুযুর তো বিচক্ষণ ছিলেনই তেমনি যারা ইসলাম বিদ্বেষী, তারাও তাদের চিন্তাধারায় বিচক্ষণ কম ছিল না। তারা বুঝল যে, এটা নিছক নামের পরিবর্তন নয়। বরং এতে করে শিক্ষা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আসবে। তাই তারা তাতে সম্মত হয়নি। তিনি সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া চেষ্টাও করেছেন। কিন্তু সহযোগী পাননি। তার মত চতুর্দিকের জ্ঞান সম্পন্ন ও দূরদর্শী শাগরেদ তাঁর তেমন ছিল না। তাছাড়া এখন তো সারা দেশে তার শিষ্য- ভাবশিষ্য ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু তখন এমন ছিল না। তাই তার চিন্তা ধারারও বাস্তবায়ন তিনি পুরোপুরি দেখে যেতে পারেননি।

প্রশ্ন: খ্রিস্টান মিশনারীদের বিরুদ্ধে তাঁর কি ভূমিকা ছিল?

উত্তর: এ ব্যাপারে তার ভূমিকার কোন তুলনা হয় না। বলা যায় এ ব্যাপারে তাঁরই ভূমিকা ছিল। অন্য কেউ এ ব্যাপারে তেমন এগিয়ে আসেনি। তিনি যদি অগ্রণী ভূমিকা না রাখতেন, তাহলে এদেশের পরিস্থিতি কতদূর গড়াতো তা আল্লাহই জানেন। বেলজিয়ামের পাদরী ফাদার পায়ার যখন চট্টগ্রামে শান্তি দ্বীপ করার জন্য পঞ্চাশ লাখ টাকা নিয়ে আসেন, তখন প্রেসিডেন্ট আইয়ূব খান তাকে আরো পঞ্চাশ লাখ টাকা দেন। চট্টগ্রামে উক্ত পাদরী এলে তাকে দুই মাইল ব্যাপী সংবর্ধনা দেওয়া হয়। হুযুর খুব পেরেশান হলেন। দ্বীন দার ব্যবসায়ী ও ওলামায়ে কেরামকে ডেকে বুঝালেন যে, শান্তির দ্বীপ প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য খ্রিষ্টান ধর্ম ও তাদের কৃষ্টি কালচারের দিকে এদেশের মুসলমানদের আকৃষ্ট করা। তাই তাদের মোকাবেলা করতে হবে। তিনি পাদরীদের গোমর ফাঁক, আল্লাহর প্রেরিত ইঞ্জিল কোথায় ইত্যাদি বই লিখে জনগণকে সচেতন করলেন। আর প্রত্যক্ষভাবে মোকাবেলা বা প্রচারণার জন্য নিযুক্ত করলে তার খাস শাগরেদ ও মুরীদ মাওলানা ফজলুর রহমান সাহেবকে তার প্রচেষ্টার ফলেই ফাদার পায়ার এক সময় তার মিশনে ব্যর্থ হয়ে চলে যেতে বাধ্য হয়।

সাক্ষাতকার গ্রহণে- দবির উদ্দীন আজাদ

=০০০=

www.pathagar.com

হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ) সম্পর্কে

মাওলানা মুতাসিম বিল্লাহ্ সাহেবের সাক্ষাতকার

প্রশ্ন: হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ)এর কিছু স্মৃতি উল্লে করুন।

উত্তর: হযরত মাওলানা ফরিদপুরী (রহঃ)এর সম্পর্কে বাল্যকাল হতে আমা মরহুম ওয়ালেদ আলহাজ্ব মাওলানা কাজী সাখাওয়াত হোসেনের কাে শুনতাম। তিনি যশোর দড়াটানা জামে মসজিদে এক টানা প্রায় ৩৫ বছ ইমাম ছিলেন। তাঁর মুখে বহুবার তাঁর কথা শুনেছি। আব্বা তাঁর প্রত্য মুরীদ বা ছাত্র না হলেও একজন গুণমুগ্ধ ও ভক্ত ছিলেন। তার মুখে বা বার শোনার কারণে হযরতের এলম, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, তাকওয়া ও বুযুর্গ সম্পর্কে আমার কিশোর মনে একটা গভীর রেখাপাত করে।

আমার প্রথম সাক্ষাত:

খুব সম্ভব আমি তখন যশোর লাউড়ি মাদ্রাসায় কাফিয়া, কুদুরী, নফহাতু আরব ইত্যাদি কিতাব পড়ি। সেই সময় যশোর দড়াটানায় একদি যোহরের নামাযের সময় আব্বাজী কোন দ্বীনি কাজে ব্যস্ত থাকায় জামাে উপস্থিত ছিলেন না। ওয়ালেদ সাহেব আমাকে তাঁর কামরার চাবী দিে রেখেছিলেন। নামাযের পর আমি মসজিদের গেটের কাছে আসলাম গেটের উপরেই আমার ওয়ালেদ সাহেবের কামরা ছিল। গিয়ে দেখি এ জন বুযুর্গ এবং তাঁর হাতে একটা লাঠি, পাশে ছোট বেঞ্চের উপরে একা ব্যাগ।

আমি জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকালেই– তিনি নিজের নাম বললেন শামছুল হ ফরিদপুরী। শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমি শশব্যস্ত হয়ে তাঁর ব্যাগটা ঘাে তুলে বললাম, হযরত তাশরীফ আনেন। তিনি দোতলায় আমার ওয়ালে সাহেবের কামরায় উঠে বললেন, আমি নামায পড়তে পারিনি। মনে হ তিনি প্লেনে ঢাকা থেকে গেছেন। আমি ওযু ও নামাযের ব্যবস্থা কে দিয়েই হযরত যখন নামাযে দাঁড়ালেন তখন মসজিদের পাশে আলহাজ বাকাদ্দেস শিকদার নামে এক দানশীল ব্যক্তি থাকে, আমি তাকে মা বলে ডাকতাম। পরবর্তীতে তিনি দড়াটানা মসজিদে সেক্রেটারী হে সম্প্রসারণ এবং প্রভূত উন্নয়ন সাধন করেন; তার বাসায় গিয়ে বললা

www.pathagar.com

যে, হযরত এসেছেন, খানার ব্যবস্থা করতে হবে। তারা খানা রেডি করে দিল। টিফিন ক্যারিয়ারে নিয়ে আসলাম। আমি গিয়ে হুযুরের পাশে বসলাম। হযরতের নামায শেষ হলে খানার এন্তেজাম করা হল। হযরত খানা খেতে লাগলেন। খানা শেষ হলে তিনি ওয়ালেদ সাহেবের বিছানায় হেলান দিয়ে পান চিবাচ্ছেন আর আমার কাছে বিভিন্ন প্রশ্ন করছেন। কি পড় মিয়া? কি কর? আমি কিতাবের নাম বললে তিনি আমার কিতাবের বিভিন্ন মাসআলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। এমনকি ইবারত ও শব্দগুলোর কি অর্থ এগুলোও জিজ্ঞেস করলেন। আমার উত্তর শুনে তিনি যেমন তৃপ্ত হচ্ছেন, আমি অতিশয় বিস্ময় বোধ করছি যে, তিনি এতবড় মুহাদ্দেস এবং আলিম যিনি বহুদিন ধরে বুখারী এবং অন্যান্য হাদীসের কিতাব পড়াচ্ছেন। তিনি কিভাবে দরসিয়াতের অর্থাৎ নিচের দিকের কিতাবের এই সমস্ত ইবারত এবং বিষয়বস্তু সমূহ ইয়াদ রেখেছেন তা আমাকে বিস্ময়ে অভিভূত করেছে।

যাই হোক একেরপর এক তিনি অনেক প্রশ্ন করেছেন। তারপর কাফিয়ার একটা দুর্বোধ্য জায়গা তিনি জিজ্ঞেস করে বসলেন, যা আজো আমার মনে আছে। বললেন যে, ওয়া নাহভু জাওয়ারীন কা কাজিন রাফআন ওয়া জাররান। যেহেতু আলহামদুলিল্লাহ আমি অনেক যোগ্য উস্তাদের কাছে পড়েছিলাম তাই এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে পেরেছিলাম। এর ব্যাখ্যা মূলক অর্থ বললাম। তিনি শুয়ে ছিলেন উঠে বসে আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, হ্যাঁ কাজির ব্যাটা কাজি। একটু পরে আমার আব্বা আসলেন। তিনি আমার সম্পর্কে কিছু উক্তি করলেন। আব্বা শুধু এতটুকু বললেন যে, হুযুর দোয়া করেন। এরপর তাঁর কোথাও সফর ছিল। আমি তাঁকে পৌঁছে দিলাম। এই হল প্রথম সাক্ষাত।

এর পর কিভাবে কোথায় তাঁর সাথে আপনার যোগাযোগ হয়?

তারপর একটা বিশেষ ঘটনা। এটা সাক্ষাত না, তবে আমার জীবনের একটা বড় স্মৃতি। আমি যখন দেওবন্দ পড়ি তখন দাওরার আগের বছর ফনুনাত ও কিছু নির্ভরশীল বিষয় আমাদের সময় জামাত বন্দী ছিল না। কিতাব হিসেবে পড়া হত। ঐ সময় প্রত্যেক ছাত্র জমিয়তের সালানা জলসা হত যেমন মাদ্রাসার সালানা জলসা হয়, খুব জাকজমকের সাথে হত। সেই সালানা জলসা আমার শ্রদ্ধেয় উস্তাদ দারুল উলূম দেওবন্দের যাট বছরের সফল মুহতামিম হাকীমূল ইসলাম হযরত মাওলানা ক্বারী তৈয়্যব সাহেব (রহঃ)-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় দেওবন্দের অনেক উস্তাদ ও সদরে মুফতী হযরত মাহদী হাসান সাহেব

www.pathagar.com

ছিলেন। সেখানে উর্দূতে আমি একটা প্রবন্ধ পড়েছিলাম নিজে লি
"মওজুদাহ সিয়াসী কাশমাকাশ আওর উনকা হল" এ প্রবন্ধ শু
আসাতেজায়ে কেরাম এত খুশি হলেন যে, তাঁরা বিভিন্ন ভাবে আমা
পুরস্কার দিলেন। আমি এই কথাটা আমার আব্বার কাছে লিখেছিলাম
আব্বা আবার লিখলেন যে, প্রবন্ধটা নকল করে পাঠাও। পাঠালাম
আব্বা সেটা যত্ন করে রেখেছিলেন। হযরত সদর সাহেব (রহঃ)
এলাকায় আব্বার কামরা হয়ে যেতেন। তিনি ঐ প্রবন্ধটা সদর সাহেবে
দেখালেন। আব্বার মুখে শোনা, হযরত সদর সাহেব (রহঃ) দুই তি
পৃষ্ঠার প্রবন্ধ মনোযোগের সাথে পুরো পড়ে শুধু এতটুকু মন্তব্য করলে
যে, ইমাম সাহেব এ ছেলেকে আমি নিয়ে নিলাম।

যা হোক, তারপর দেওবন্দ থেকে এসেছি, আসার পরে আর যোগাযো
হয়নি। এর পর আমার শ্রদ্ধেয় সাথী-সঙ্গীদের কারণে ঢাকা বড় কাটা
আশরাফুল উলূম মাদ্রাসায় মুদাররেসীতে যোগ দেই। এটা খুব সম্ভ
১৯৫৯ বা ৬০ সালের কথা তখন সদর সাহেব (রহঃ) থাকতে
লালবাগে। তিনি হাউজের পাশে নিচের তলার কামরায় বসতেন। ওখা
মজলিশ হত আছর থেকে মাগরিব পর্যন্ত। তিনি যখন ঢাকায় থাকতো
(আমার দু'একদিন হয়তো ছুটে যেতে পারে) আমি প্রতিদিন তাঁ
মজলিসে শরীক হতাম।

আসরের নামায সাধারণতঃ লালবাগে গিয়ে পড়তাম। কোন দিন য
একটু দেরী হয়ে যেত বা মজলিস বসে যেত তাহলে তিনি আমার দি
তাকিয়ে বলতেন, আসেন আসেন। তখন আমি লজ্জায় মরে যেতাম। চু
করে বসে যেতাম। তিনি মানতেন না। কাছে ডেকে নিয়ে বসাতেন
এবং দেখেছি মাওলানা ফজলুল হক আমিনী এবং আর একজন ছাত্র না
মনে নেই। তারা হুযুরকে ওষুধ বা অন্য কিছু এনে খাওয়াতেন। এখা
তিনি বিভিন্ন নসীহত, বুযুর্গানের অবস্থা এবং বিভিন্ন লোকের প্রশ্নের উত্ত
দিতেন। এইভাবে চলত মাগরিব পর্যন্ত। এই হল আমার ঘনিষ্ঠ ভা
তার সাথে সাক্ষাত।

প্রশ্ন: ঐ মজলিস কি চলত বিভিন্ন মানুষের প্রশ্নোত্তরের জন্য?

উত্তর: না, প্রকৃত পক্ষে মজলিসে তিনি বিভিন্ন বুযুর্গানে দ্বীনের ঘটনা বলতেন আর কেউ যদি কোন প্রশ্ন করত তবে তার উত্তর দিতেন।

প্রশ্ন: ঐ মজলিসের কোন স্মরণীয় ঘটনা আপনার মনে আছে কি?

www.pathagar.com

উত্তর: সব কথা বিস্মৃতির অতল তলে ডুবে গেছে। এটা হল তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে দেখা সাক্ষাত। বিশেষ একটা স্মরণীয় ঘটনা হল– কোন কারণে গওহারডাঙ্গা মাদ্রাসায় হাদীসের উস্তাদের প্রয়োজন দেখা দেয়। আমি তখন ময়মনসিংহ কাতলাসেন আলিয়া মাদ্রাসায় হেড মুহাদ্দেস হিসেবে বুখারী শরীফ পড়াই। তিনি মাস্টার আব্দুল হক সাহেবকে কাতলাসেন পাঠিয়ে দেন। এই মাস্টার আব্দুল হক সাহেব যখন বিএ পড়তেন তখন আমার মরহুম ওয়ালেদ সাহেবের সাথে তাঁর আলাপ হয়। তিনি দেখলেন যে, তিনি ধর্মের নানা বিষয় সম্বন্ধে সন্দিহান। তখন আব্বাজী তাকে হযরত সদর সাহেব হুযুরের খেদমতে যাবার জন্য পরামর্শ দেন। সবাই জানেন যে, হযরত সদর সাহেব হুযুরের খেদমতে এসে মাস্টার আব্দুল হক সাহেবের জীবনের আমূল পরিবর্তন হয়ে গেল। তিনি কাতলাসেন উপস্থিত হয়ে বললেন, সদর সাহেব আপনাকে যেতে বলেছেন। তার কথা মত রওয়ানা হলাম।

বৃহস্পতিবার দিন গত রাত্রে এলাম। তখন গওহারডাঙ্গা মাদ্রাসায় আমার দেওবন্দের মুরব্বী সাথী। অর্থাৎ আমার উপরের জামাতে পড়তেন। কিন্তু তাঁর সাথে খুব সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক ছিল– মাওলানা আব্দুস সাত্তার (সাতক্ষীরা) তিনি একাত্তরে শাহাদত বরণ করেন। তাঁর কামরায় গেলাম। তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। ঢাকায় আসলেও তিনি বড় কাটারা মাদ্রাসায় আসলে আমার কামরায়ই থাকতেন। ওখানে উঠে খানা দানা খেয়ে রাত একটা-দু'টা পর্যন্ত গল্প করলাম।

পরদিন সকালে নাস্তা করে ঘুমিয়ে আছি। ইতোমধ্যে সদর সাহেব (রহঃ)এর কাছে খবর গেল যে, তিনি এসেছেন। হুযুরের কাছে গিয়ে জুমআর আগে দেখা করলাম। জুমআর পরে তিনি মাদ্রাসার আসাতেযায়ে কেরাম ও ছাত্রদের বসিয়ে আমাকে বললেন, বক্তৃতা কর। আমার বুক তখন দুরুদুরু কাঁপছে যে, এই উলামায়ে কেরামের সামনে আমি ওয়াজ করব। কিন্তু আমার মনে হল তিনি কোন রূহানী তাসাররূফ করেছেন। দাঁড়ানোর পরে আমার আর একটুও ভয় ভীতি থাকল না। আমি ইলম সম্পর্কে "ইন্না আরাদনাল আমানাতা" এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইলম কাকে বলে এর উপর তেজোদীপ্ত ভাষায় কথা বললাম। তখন হযরত সদর সাহেব (রহঃ) বললেন, মা-শাআল্লাহ এই রকম বক্তৃতা ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে হওয়া উচিত ছিল। ইলম কাকে বলে? তাদেরটা ইলম নয় এইটাই ইলম। তা তাদের বুঝিয়ে দেওয়া প্রয়োজন ছিল। তাঁর

www.pathagar.com

বরকতে পরবর্তীকালে আমার ঢাকা ইউনিভার্সিটির ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে এম.এ ক্লাসে অধ্যাপনার সুযোগ হয়েছিল।

প্রশ্ন: মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরীর (রহঃ) কুরআন হাদীসের শিক্ষা প্রসারের জন্য কি কি অবদান ছিল?

উত্তর: এ ব্যাপারে আমার জানা মতে কেউ হয়তো তাঁর সমান হবে না। তাঁর সমসাময়িক যে সমস্ত আলেম ও বুযুর্গ তৎকালীন অবিভক্ত বাংলা বা পূর্বপাকিস্তানে ছিলেন তাঁদের কেউ এ রকম সর্বজন পরিচিত বা সর্বমহলে পরিচিত ছিলেন কি না সন্দেহ। এক জন বুযুর্গ হয়তো তার এলাকার মধ্যে বহু বড় বুযুর্গ বা আলেম হিসেবে খ্যাত ছিলেন। কিন্তু সারা বাংলাদেশের কোণায় কোণায় তাঁর কদর ও নাম ছিল। এ রকম আর দু'একজন ছিলেন কি না সন্দেহ। মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ) ঐ উত্তরের পঞ্চগড় হতে দক্ষিণের কক্সবাজার, বরগুণা, সাতক্ষীরা আর পশ্চিমে যশোর কুষ্টিয়া থেকে নিয়ে পূর্বে সিলেট, কুমিল্লা সব জায়গায় তিনি সমান ভাবে পরিচিত, সমাদৃত, সকলের গ্রহণযোগ্য বুযুর্গ ও আলিম হিসেবে খ্যাত ছিলেন।

তিনি তাঁর সারাটা জীবন ইলমের প্রচার প্রসার ও মসজিদ, মাদ্রাসা, মক্তব কায়েম করার জন্য নিজে এবং তাঁর ভক্ত মুরীদানদের উৎসাহ দিয়েছেন, সক্রিয় ভূমিকা রেখেছেন। তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জামেয়া ইউনুসিয়ায় এক যামানায় পড়িয়েছেন। ওই খানের মাদ্রাসায় তিনি সদর বা প্রধান ছিলেন। লালবাগ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা তিনিই করেছেন। কিন্তু গওহারডাঙ্গার মত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ধরতে গেলে অজপাড়াগাঁ সেখানে একমাত্র তাঁরই প্রচেষ্টায় বাংলাদেশের একটা শীর্ষস্থানীয় মাদ্রাসা গড়ে উঠেছে। এটা তাঁর একটা অবিস্মরণীয় অবদান বলতে হবে। বড় কাটারা, লালবাগ এগুলো সব তাঁরই অবদান। আরো কত মাদ্রাসা যে তিনি করেছেন তার ইয়ত্তা নাই। ফরিদাবাদ মাদ্রাসা তাঁরই নিজস্ব জমিতে। আমাদের ফরিদপুর-যশোর- খুলনায় মাদ্রাসা তাঁর প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায়, তাঁর উৎসাহে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

প্রশ্ন: এই তিনটি মাদ্রাসা ছাড়া আরো মাদ্রাসার নাম বলতে পারবেন কি? যা তার সক্রিয় তত্ত্বাবধানে হয়েছে?

উত্তর: বাহিরদিয়া মাদ্রাসা মনে হয় তার তত্ত্বাবধানে হয়েছে। যার মোহতামিম আব্দুল আজিজ সাহেব ছিলেন। সব কথা আমার মনে নেই। তবে খুলনার দারুল উলূম মনে হয় তাঁরই প্রচেষ্টায় হয়েছে।

প্রশ্ন: খুলনার হেলাতলা মসজিদ সম্পর্কে কিছু জানেন কি না?

www.pathagar.com

উত্তর: এ ব্যাপারে প্রত্যক্ষ ভাবে কিছু জানা নেই। তবে শুনেছি যে, এটা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারেও তাঁর উৎসাহ উদ্দীপনা ও সক্রিয় ভূমিকা ছিল।

প্রশ্ন: হযরত হাফেজ্জী হুযুর (রহঃ) বলতেন তিনি কুরআন হাদীসের অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। এর দলিল প্রমাণ কি?

উত্তর: দলিল চাইলে ফারসী একটি প্রবাদ উল্লেখ করাই যথেষ্ট। "আফতাব আমাদ বর দলিলে আফতাব"– সূর্যের প্রমাণ সূর্যই। তিনি কোরআন হাদীসে গভীর সমুদ্র ছিলেন। যারা তাঁর মজলিসে বসেছে বা তাঁর লিখিত কিতাব পড়েছে তারাই বুঝতে পেরেছে তিনি কত গভীর জ্ঞানের অধিকারী বা পন্ডিত ছিলেন। আমি আরও একটু বলতে চাই। তাঁর কয়েকটি মহৎ গুণের ব্যাপারে যা সচরাচর অন্য আলেমদের মধ্যে কম পাওয়া যায়। সেটা হলো– তিনি যেটাকে হক মনে করেছেন সেটাকে প্রচার এবং প্রতিষ্ঠার জন্য যে কোন রকম ত্যাগ এবং কুরবানী দিতে দ্বিধা বোধ করেননি। কত সৎ সাহস ছিল তা তাঁর একটা ঘটনা থেকে বুঝা যায়। একাধিক ব্যক্তিদের মুখে শোনা।

১৯৪৫ সালের শেষের দিকে যখন পাকিস্তান আন্দোলন তুঙ্গে তখন সিরাজগঞ্জে মুসলিম লীগের একটা সভায় যেখানে মুসলিম লীগের একেবারে শীর্ষ পর্যায়ের নেতারা যেমন– হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মাওলানা ভাসানী, এরা সবাই উপস্থিত ছিলেন। হযরত সদর সাহেব (রহঃ)ও স্টেজের উপরে একটা চেয়ারে বসা ছিলেন। আরো অনেক আলেম এবং মুসলিম লীগের নেতারা উপস্থিত ছিলেন। মুসলিম লীগের ছাত্রনেতা শাহ্ আজিজুর রহমান সর্বজন পরিচিত (জিয়াউর রহমানের প্রধান মন্ত্রী) বক্তৃতার এক পর্যায়ে হযরত মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী (রহঃ) সম্পর্কে কটুক্তি করেন। শাহ্ আজিজুর রহমানের এই কটুক্তির পরে হযরত সদর সাহেব (রহঃ) চেয়ার থেকে লাফ দিয়ে উঠে এসে ডায়াসের সামনে তাঁর কাছ থেকে মাইক টেনে নিয়ে তীব্রভাবে এর প্রতিবাদ করলেন এবং বললেন এই কথা যদি প্রত্যাহার না করা হয় তবে আমরা সকলে এখান থেকে চলে যাব এবং সমর্থন প্রত্যাহার করব।

সোহরাওয়ার্দী যিনি প্রধান অতিথি ছিলেন তিনি শাহ্ আজিজুর রহমানের এ কথা প্রত্যাহার করালেন। তখন সদর সাহেব বললেন, তিনি তাঁর জ্ঞান বিবেক অনুযায়ী পাকিস্তানকে ভারতের মুসলমানদের জন্য ক্ষতিকর মনে করেছেন। আর আমরা জরুরী মনে করে সমর্থন করছি। কিন্তু তাঁর দ্বীনদারী সম্পর্কে, বুযুর্গী সম্পর্কে আমরা নিঃসন্দেহে শ্রদ্ধাশীল। পাকিস্তান

www.pathagar.com

আন্দোলনের পেক্ষাপটে তখন পৃথক নির্বাচন হচ্ছে। মুসলমানদের স্বতন্ত্র এবং হিন্দুদের স্বতন্ত্র।

পাকিস্তান আন্দোলনের বিপক্ষে যে সব উলামায়ে কেরাম ছিলেন তাঁরা সম্মিলিত ভাবে মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী বোর্ড গঠন করেছিলেন জাতীয়তাবাদী ওলামায়ে কেরাম নামে। তাঁর সভাপতি ছিলেন শাইখুল ইসলাম, কুতুবে আলম সাইয়েদ হুসাইন আহমদ মাদানী (রহঃ) যিনি হযরত সদর সাহেব হুযুরের বোখারীর উস্তাদ।

তাঁর সম্পর্কে একটা ঘটনাও মনে পড়ে গেল। ট্রেনে বা প্লেনে উঠিয়ে দেওয়ার জন্য তাঁর সাথে এক রিকসায় যাচ্ছি। তিনি তাঁর ঘটনাটা বললেন যে, তিনি যে বছর দাওরা পড়বেন সে বছরই দেওবন্দ মাদ্রাসার মোহতামিম হযরত মাওলানা মোহাম্মাদ আহমদ সাহেব প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবী (রহঃ)এর সাহেবজাদা এবং সদরে মোহতামিম হযরত মাওলানা হাবীবুর রহমান (রহঃ), হযরত মাওলানা শিব্বীর আহমদ উসমানী এর বড় ভাই এদের সাথে হযরত আনোয়ার শাহ্ কাশমীরী সাহেবের কি নিয়ে যেন মতানৈক্য হল। শেষ পর্যায়ে হযরত শাহ্ সাহেব এবং তার সাথে মাওলানা শিব্বীর আহমদ উসমানীর (রহঃ)মত বড় আলেম এবং দারুল উলূমের আরো উস্তাদ যেমন মাওলানা হিফজুর রহমান সিউহারবী প্রমুখ দেওবন্দ ছেড়ে ডাভেলে চলে যান। এবং বহু ছাত্রও চলে যায়।

ঐ সময় দারুল উলূম দেওবন্দের সেরপরস্ত ছিলেন হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ), তাঁর নির্দেশে মুহতামিম সাহেব হযরত মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানীর (রহঃ) কথা স্মরণ করেন। হযরত মাদানী তখন নিজ উস্তাদ হযরত শায়খুল হিন্দ (রহঃ)এর নির্দেশে সারা ভারতে বৃটিশ বিতাড়ন আন্দোলনের সফর করছেন, সিলেট নয়া সড়ক মসজিদের একটা মাদ্রাসার দারুল হাদীসে তিনি দরস দেন এবং রাজনৈতিক মিটিং করে বেড়ান। হযরত থানভী (রহঃ) বললেন, হযরত শাহ্ সাহেবের এই জায়গা পূরণ করার মত কেউ নেই।

অনেক লম্বা ঘটনা। তিনি বললেন আমি তো হিন্দুস্তানে নয়, মসজিদে নববীতে পড়াচ্ছিলাম। আমি মাল্টা দ্বীপ থেকে ফিরে জেদ্দায় নামতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু শায়খুল হিন্দ নামতে দেননি। বললেন, তুমি ভারতবর্ষে চল, তোমার দ্বারা কাজ নেওয়া হবে। তিনি মৃত্যুর পূর্বে আমাকে বলে গেছেন যে, আমার এ অসম্পূর্ণ কাজ– যতদিন পর্যন্ত ভারতবর্ষ থেকে

www.pathagar.com

বিতাড়িত না হবে---। আমি তো দারুল উলূমের মত একটা ইলমী মারকাজে শায়খুল হাদীস হওয়ার দুঃসাহস আমার নেই। যখন খুব বেশী ধরলেন তখন তিনি শর্ত লাগিয়ে কবুল করলেন। হযরত সদর সদর সাহেব (রহঃ) বলেন, পরে হযরত মাদানী (রহঃ) বলেছিলেন– যে, তিনি মাঝে মাঝে দেওবন্দ যেতেন। আমার বিশ্বাস ছিল যে, দাওরায়ে হাদীসে তখন দেড় শত ছাত্র ছিল। এখন তো সাত আটশ। যদি একটি ছাত্র থাকে সে শামছুল হক ফরিদপুরী থাকবে। এর দ্বারা সদর সাহেব আমাকে বুঝাতে চেয়েছিলেন- উস্তাদের প্রতি তার কত গভীর ভক্তি এবং উস্তাদের তার প্রতি কত গভীর আস্থা ছিল।

প্রশ্ন: জামায়াতে ইসলামী করা এবং তাদের সহযোগিতা করাকে তিনি কিভাবে দেখতেন?

উত্তর: সুন্দর প্রশ্ন করেছেন। জামাতের লোকেরা অপপ্রচার করে যে, জামায়াতের বিরুদ্ধে যে বই লেখা হয়েছে– "ভুল সংশোধন" এটা তার লেখা নয়। আমি একজন প্রত্যক্ষ সাক্ষী। ঐ যে গওহারডাঙ্গা গেলাম শুক্রবার হযরতের বাড়িতে আমি ছিলাম ভাঙ্গা টিনের ঘরে। এত বড় আলেম কিন্তু তাঁর বাড়িতে ছনের ঘর, ভাঙ্গা টিনের ঘর। রাতে সেখানে থাকলাম, খুব সম্ভব তাঁর বাড়ির পূর্ব পাশের মসজিদে ফজরের নামায পড়লাম। সাধারণতঃ তিনি ফজরের নামাযের পরে মোরকাবা ইত্যাদি করতেন। কিন্তু তাঁর খাদেমকে কি একটা জিনিস আনতে বললেন।

দেখলাম একটা কিতাবের পাণ্ডুলিপি। নাস্তা হতে দেরী আছে। তিনি শুধু পাঠক আর আমি একা শ্রোতা। এই ভুল সংশোধন প্রায় দেড় দুই ঘন্টা তিনি পড়ে শোনালেন। কারণ তিনি কিভাবে যেন জেনে ফেলেছেন আমি মওদূদীয়াত সম্পর্কে খুব সোচ্চার কণ্ঠ এবং আমি এ সম্পর্কে পড়াশোনা করেছি। তার কিতাব সম্পর্কে আমি বললাম, হযরত! উম্মতের জন্য আপনি একটা বড় ইহসান করে গেলেন। তিনি প্রথম দিকে মওদূদীর প্রতি সহানুভূতি রাখতেন। এ রকম দেওবন্দের বড় বড় ওলামায়ে কেরাম জামাআতের সমর্থন করেছেন। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তার সমর্থন প্রত্যাহার করেছেন এবং বইও লিখেছেন।

প্রশ্ন: বাংলা সাহিত্যে সদর সাহেবের অবদান কি?

উত্তর: তাঁর আগে অনেকেই বাংলা সাহিত্যে বই-পুস্তক রচনা করে সফল হয়েছেন যেমন– মাওলানা আকরম খাঁ। আরো অনেকে হয়তো লিখেছেন- তবে আমাদের আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের চিন্তা ধারার

www.pathagar.com

সম্পূর্ণ অনুকূলে এরকম লেখা কমই ছিল। হযরত সদর সাহেব (রহঃ)কে আল্লাহ তা'আলা এই একটি সদকায়ে জারিয়া করার সুযোগ দিয়েছিলেন। তিনিই প্রথম বাংলা ভাষায় দ্বীনি কিতাব লেখেন এবং তাঁর ছাত্র ও অনুগামীদের উৎসাহিত করেন। এখানে একটা বড় আশ্চর্যের বিষয় যা তাঁর লিখিত কিতাবে আছে অন্য কোন লেখকের নেই। তিনি যেসব কিতাব লিখেছেন, অনুবাদ করেছেন থানভী(রহঃ)-এর অনেক কিতাবের বিনিময়ে একটা পয়সাও তিনি নিতেন না। সম্পূর্ণ ভাবে আল্লাহর ওয়াস্তে দান করে দিয়েছেন। এ যুগে এ রকম ত্যাগ কুরাবানী দ্বীনের জন্য খুব কম দেখা যায়।

প্রশ্ন: আজাদী আন্দোলনে (পাকিস্তান সৃষ্টিতে)তাঁর ভূমিকা কি ছিল?

উত্তর: পাকিস্তান সৃষ্টিতে তিনি যে পুরোভাগে ছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাঁর সমর্থন না হলে মুসলিম লীগের পক্ষে অবিভক্ত ভারতে এভাবে বিপুল ভাবে জয়লাভ করা, মন্ত্রিসভা গঠন করা সোহরাওয়ার্দীর পক্ষে সম্ভবপর হত না।

প্রশ্ন: সিলেট ডিস্ট্রিক্ট পূর্ব পাকিস্তানে পাওয়ার ব্যাপারে তাঁর অবদান কি?

উত্তর: অন্যান্য উলামায়ে কেরামের সাথে তিনিও সেখানে গিয়ে উলামায়ে কেরাম এবং জনগণকে বুঝিয়েছেন যে, যেহেতু গণভোটের মাধ্যমে সিলেটের ভাগ্য নির্ধারিত হচ্ছে তাই তিনি জনগণকে পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দেবার জন্যে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন।

প্রশ্ন: আপনার দেখা বা শোনা সদর সাহেবের কোন কারামত আছে কি?

উত্তর: আমি তাঁর আখলাকে নববীর যে, পরিচয় পেয়েছি তাকে আমি কারামতের চেয়ে বড় বলি। সবাই জানে ঐ একবার আইউব খানের যামানায় রমজানের ২৯ তারিখের পরে চাঁদ দেখার পরে রোযা ভেঙ্গে ঈদ করা হবে কি না, এনিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। তখন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর ছিলেন আব্দুল মুনয়েম খান। তিনি ছাড়া বহু বড় বড় আলেম ছিলেন। কেউ গভর্ণরের পক্ষে ফতোয়া দিয়েছেন, কেউ আবার নানা অজুহাতে এড়িয়ে গেছেন। কিন্তু তিনি দৃঢ় ভাবে বললেন যে, কাল কোন অবস্থায় ঈদ হতে পারে না। এ জন্য গভর্ণর তাঁকে গভর্ণর হাউজে রাত্রের শেষ প্রহর পর্যন্ত আটকে রেখেছিল। পরে বিভিন্ন চিন্তা করে ছেড়ে দিয়েছিল। তিনি তাঁর কথা থেকে কোন অবস্থাতেই বিচ্যুত হন নাই। এমনকি মুনয়েম খান একথা জিজ্ঞেস করেছিল– এই সব আলেমরা যে বললেন, কাল ঈদ করা যাবে। তারা কিভাবে বললেন? তিনি বললেন, তারা আলেম, তারা

www.pathagar.com

বলেছেন তাদের এলম অনুযায়ী। আমি যতটুকু এলেম কালাম শিখেছি তাতে কোন মতে আগামী কাল ঈদ করা যায় না। এই যে, দৃঢ় চিত্ততা এবং দীনের উপর অটল অবিচল ভাবে থাকা, যে কোন বিপদের সম্মুখীন হতে পারতেন। তারা ইচ্ছা করলে তাঁকে গুলি মেরে ফেলতে পারত। ইচ্ছা করলে তাঁকে জেল দিতে পারত। কিন্তু তিনি তাঁর মত থেকে বিন্দু মাত্রও বিচ্যুত হননি।

প্রশ্ন: পরের দিন কি অন্যান্য আলেমরা ঈদের নামায পড়লেন।

উত্তর: সেটা আমার সঠিক মনেই নেই।

প্রশ্ন: রোযা কাযা করতে হয়েছিল আইয়ূব খানের আমলে?

উত্তর: আমি তখন কিশোরগঞ্জে। কিশোরগঞ্জ তখন সাবডিভিশন ছিল, ডিস্ট্রিক্ট হয়নি। একজন বড় বুযুর্গ তখন অসুস্থ বলে বিছানায় শুয়ে পড়লেন। আমার ওয়ালেদ সাহেব তখন দড়াটানায় ফতোয়া দিয়েছিলেন যে, আজ কোন অবস্থায় রোযা ভাঙ্গা যাবে না। পরের দিন যশোরের ঈদগাহে নামায হল। তিনি অসুস্থ বিধায় তাঁকে কাঁধে করে ঈদগাহে নেওয়া হল। এ কারণে হযরত সদর সাহেব আমার ওয়ালেদ সাহেবকে খুব দোয়া করেছিলেন।

প্রশ্ন: হযরত সদর সাহেব হুযুর আশরাফ আলী থানভী (রহঃ)এর মুরীদ ছিলেন কি না?

উত্তর: এবিষয়ে আমি নিশ্চিত ভাবে জানি না। তবে লোক মুখে শুনেছি তিনি তার মুরীদ ছিলেন এবং খানকায় ইলমে তাসাউফ বিষয়ে মুজাহাদা করতেন। তবে থানভী (রহঃ) এর কাছ থেকে তিনি খেলাফত পেয়েছেন কিনা আমার জানা নেই। আমার মনে হয় তিনি থানভী (রহঃ) এর শীর্ষস্থানীয় খলীফাদের অন্যতম শাহ্ আব্দুল গণীর কাছ থেকে খেলাফত পেয়েছেন।

প্রশ্ন: আপনার দৃষ্টিতে মাওলানা ফরিদপুরী (রহঃ)এর গুণাবলী কি?

উত্তর: এতবড় ব্যক্তিত্বের গুণাবলী বর্ণনা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি কি বর্ণনা করব। তবে আমরা ছোট মানুষ হিসেবে যা দেখেছি– ইলমে কালাম মাপার কোন মাধ্যম নেই। তবে আমার ছোট বেলার ঐ যে ঘটনা অত ছোট কিতাব তিনি কিভাবে ইবারত সহ মুখস্থ রেখেছিলেন। তাঁর গুণাবলী হল গুণের কদর করা, প্রতিভার কদর করা। কোন ছাত্রের মধ্যে যদি প্রতিভা দেখতেন তাহলে তার প্রতিভা কিভাবে বিকাশ পাবে সে জন্য তার বাপ যতটুকু চিন্তা করতেন তার চেয়ে বেশী তিনি ফিকির করতেন তাকে মানুষ করার জন্য। মানুষের প্রতি যে দরদ তাঁর ছিল–

www.pathagar.com

যার কাছে যে গুণ আছে তা বিকাশের চেষ্টা তিনি করেছেন। কোন এলাকার লোক তা তার কাছে দেখার বিষয় ছিল না।

আর একটা গুণ– একটা ঘটনা যা বিশ্বস্ত সূত্রে আমার জানা। মাদ্রাসায় অবস্থান কালে তাঁকে যদি কেউ টাকা পয়সা হাদিয়া দিত তিনি কোন দিন সেটা গ্রহণ করেননি। মাদ্রাসায় দান করে দিয়েছেন। লালবাগে থাকতে একবার এক সওদাগর তখনকার যুগের কয়েক হাজার টাকা তাঁকে হাদিয়া দেন। কিন্তু তিনি সেটা মাদ্রাসায় দিতে বলেন। লোকটি বলল, মাদ্রাসায় আমি টাকা সব সময় দেই। আরো দেব ইনশাআল্লাহ। এটা আপনাকে দিলাম। তিনি বললেন, ঠিক আছে আমাকে দিন আমি এর মালিক, আমি এটা যা ইচ্ছা করতে পারি।

এরপর তিনি পুরা টাকা রশীদ কেটে মাদ্রাসায় দিয়ে দিলেন। তিনি এত বড় আলেম ছিলেন, এত কিতাব লিখেছেন। ইচ্ছা করলে তিনি লাখপতি কেন কোটিপতি হতে পারতেন। অথচ আমি নিজে তাঁর ভাঙ্গা ঘরে শুয়ে এসেছি। আসলে তাঁর মধ্যে কোন পার্থিব লিপ্সা ছিল না। তাঁকে তার উস্তাদ ও পীরের প্রতি যেরূপ ভক্তি-শ্রদ্ধা ও আস্থা রাখতে দেখেছি এরূপ সচরাচর আলেমদের মধ্যে দেখা যায় না। তাঁর একটা বিশেষত্ব হল, অনেক সময় আমরা ছোটখাট ব্যাপারকে ফাঁপিয়ে ফুলিয়ে বড় করে তুলি। কিন্তু তিনি এসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়কে দ্বীনের খাতিরে উপেক্ষা করেছেন। যেমন তাবলীগ জামাআতে অনেক সময় দাড়ি বা পোশাকের ব্যাপারে জোর জবরদস্তি করা হয় না। কারণ মুরব্বীরা জানেন যে, যখন তার মধ্যে আল্লাহর ভয় আসবে তখন সে সব কিছু করবে দাড়িও রাখবে। এরূপ তিনি দ্বীনের স্বার্থে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপার উপেক্ষা করেছেন। কিন্তু তিনি মূল আকীদার ব্যাপারে, মূল আদর্শের ব্যাপারে কোন দিন আপোষ করেননি।

আরেকটি মহৎগুণ ছিল তার। তিনি ছিলেন প্রজ্ঞাবান। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে তিনি শিশু সুলভ সরল মনা ছিল। যে কেউ তাঁকে ফাঁকি দিতে পারত দুনিয়াবি ব্যাপারে। কিন্তু দ্বীনের ব্যাপারে তিনি ছিলেন সজাগ।

সাক্ষাতকার গ্রহণে মোঃ দবীর উদ্দীন আজাদ।

=০০০=

www.pathagar.com

হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ) সম্পর্কে

মাওলানা কারী উবায়দুল্লাহ সাহেবের সাক্ষাতকার

মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ) কে একান্ত কাছে থেকে যারা দেখেছেন, তাঁর মুখ-নিঃসৃত কথা শুনেছেন এবং হযরতের প্রতিটি অমূল্য কর্ম তৎপরতাকে নিজের স্মৃতির এ্যালবামে অতি যত্নের সাথে সাজিয়ে রেখেছেন তাদের মধ্যে হযরত মাওলানা কারী উবায়দুল্লাহ একজন। আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন কারী সাহেবের স্মৃতিপটে আঁকা হযরত সদর সাহেব (রহঃ)-এর সেই কর্মতৎপরতার কিঞ্চিত বিবরণ এখানে প্রশ্নত্তোর আকারে অতি সংক্ষেপে তুলে ধরা হচ্ছে।

প্রশ্ন: আমরা জানি আপনি হযরত সদর সাহেব (রহঃ) কে দেখেছেন। আপনার সেই দেখার শুরু কখন, কোথায় এবং কিভাবে হয়েছিল?

উত্তর: আমি তখন ছোট। বয়স খুব বেশী হলে দশ-বার হবে। আমি চট্টগ্রামের মো'আবিনুল ইসলাম মাদ্রাসায় লেখাপড়া করতাম। আমার আব্বা ঐ মাদ্রাসার মুহাদ্দিস ছিলেন। আমার আব্বা মাওলানা মেহেরুজ্জামান বিরাট বড় আলেম ছিলেন। তিনি পটিয়ার প্রতিষ্ঠাতা মুফতী আজিজুল হক সাহেবের খলিফা ছিলেন। তার সাথে হযরত সদর সাহেব (রহঃ)এর খুব সম্পর্ক ছিল। আমার আব্বাও হযরত সদর সাহেব (রহঃ) এর সাথে সম্পর্ক রাখতেন। একদিন হযরত সদর সাহেব (রহঃ)এর নিকট আব্বা বললেন, এ আমার ছেলে। ওকে অনেক বড় আলেম বানাতে চাই। হুযুর! আমি ওকে কি করতে পারি? হযরত সদর সাহেব (রহঃ) বললেন, আমাকে দিয়ে দেন।

হযরত সদর সাহেব (রহঃ)এর এ আশ্বাস পেয়ে আমার আব্বা আমাকে লালবাগ নিয়ে এলেন। হুযুরের নিকট আমাকে সোপর্দ করে দিয়ে গিয়েছিলেন। তারপর থেকে একটানা কয়টি বছর আমি হুযুরের সোহবতে থেকেছি।

প্রশ্ন: আপনার আব্বা আপনাকে যেহেতু হযরত সদর সাহেব (রহঃ)এর নিকট সোপর্দ করে দিলেন, তাই তার সোহবতে থাকা অবস্থায় হযরত কখনও আপনাকে আদর করেছেন আবার হয়তো কখনও শাসন করেছেন। তার মধ্যে আপনার স্মরণে আছে এমন দু'একটা ঘটনা আমাদের শুনাবেন কি?

www.pathagar.com

উত্তর: আমি তখন ছোট ছিলাম। হুযুর আমাকে অত্যন্ত আদর করতেন। শাস করেছেন কি না মনে নেই। কারণ শাসন বলতে আমরা যে অবস্থাটা বুঁ হযরতের শাসন তেমন ছিল না। কেউ কোন অপরাধ বা ভুল ক ফেললে হযরত সেটা এমন ভাবে শোধরে দিতেন যে, অপরাধী বুঝতে পারতো না যে, হযরত তাকে শাসন করলেন। আমিও কোন দি বুঝিনি। হযরত সদর সাহেব (রহঃ) আমাকে ডেকে কাছে বসাতেন বিভিন্ন কিতাবের সবক সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন। পারলে বাহ দিতেন। না পারলে স্নেহের সাথে বলতেন, এটা এভাবে নয়, এই ভাবে।

প্রশ্ন: আমি বলছিলাম হযরতের সাথে আপনার সরাসরি কোন ঘটনা থাকলে সেটা আমাদের শুনান।

উত্তর: আমি তখন ছোট ছিলাম। হযরতকে খুব ভয় পেতাম। যতটা পারতা দূরে থাকতে পারলেই নিজেকে বিজয়ী মনে করতাম। হুযুর কি করলে না করলেন সে ব্যাপারে আমার কোন মাথা ব্যথা ছিল না। সুযো পেলেই মাদ্রাসার ঐ পুব পার্শ্বের পুকুরে গিয়ে ঝাঁপ পাড়তাম। মোট কথ আমার জগতটাই ছিল তখন ভিন্ন। হুযুরের সাথে সরাসরি তেমন কো ঘটনা আমার স্মরণ নেই।

প্রশ্ন: ছোট বেলায় সাধারণতঃ মানুষের সমাবেশ, সভা, অনুষ্ঠান এসবের প্রা একটা ঝোঁক থাকে। হযরত সদর সাহেব (রহঃ)কে আপনি কোন সভ সমাবেশ কিংবা কোন অনুষ্ঠানে দেখেছেন? দেখে থাকলে সেখানে হযরতের ভূমিকা কি ছিল?

উত্তর: জ্বি, এমন একটা ঘটনা আমার কিছু কিছু মনে পড়ে। হযরত সদর সাহে (রহঃ) আলেম সমাজের মধ্যে ঐক্য আনার জন্য সারা জীবন আপ্রা চেষ্টা করে গেছেন। আমি মিশকাত শরীফ পড়ি। গোফ-দাঁড়ি তখন গজায়নি। আমার মনে আছে। এমন সময় হযরত সদর সাহেব (রহঃ উলামাদের ঐক্যের জন্য দেশের শীর্ষস্থানীয় আলেমদের ডাকেন। সম্ভব ১৯৬১ সালের কথা।

সিলেটের মাওলানা মোশাহেদ, শামসুল ওলামা বেলায়েত হোসেন চিটাগাঙের মাওলানা মুফতী ইউসুফ, মাওলানা সিদ্দীকুর রহমান ও মুফতী আব্দুর রহমান সাহেব সহ দেশের শীর্ষস্থানীয় আলেমগণ একত্রিত হন। এ সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন হয় লালবাগ জামেয়া কুরআনিয়ায়। দ্বিতী অধিবেশন হয় নবাবপুর ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল হলে।

www.pathagar.com

এ সম্মেলনের শুরুতে আমি কিরাত পড়েছিলাম। হযরত সদর সাহেব (রহঃ) আলেম সমাজের ঐক্য কি ভাবে আসতে পারে, সে ব্যাপারে আলোচনা করেন। এর পর শুরু হয় উপস্থিত কিছু সংখ্যক আলেমদের প্রশ্নের বান। প্রশ্ন-পাল্টা প্রশ্ন, তারপর উচ্চস্বরে কথাবার্তা। এক পর্যায়ে হল রুমে এমন চিৎকার শুরু হয় যে, হলের আসপাশের রাস্তার মানুষরা পর্যন্ত জড়ো হতে থাকে কি হয়েছে বা কি হতে যাচ্ছে তা জানার জন্য। আমরাও বাইরে ছিলাম। উচ্চস্বরে কথাবার্তা শুনে হল রুমের কাছে ঘেঁযতে চেষ্টা করি। কিন্তু পারলাম না। কে বা কারা এমন চিল্লা চিল্লি করছে! আওয়াজ শুনে তো দূরের কথা, মুখ দেখেও আমি তাদের কাউকে চিনতাম না। তবে বড়দের কাছে শুনেছি, যিনি সব চেয়ে বেশী ভূমিকা রেখেছেন এ চিল্লাচিল্লিতে তার নাম নাকি মুফতী আবদুর রহমান। ঐক্যের জন্য ডাকা এসব আলেমদের মধ্যে অনৈক্যের মহামারি দেখে হযরত সেদিন বড়ই কষ্ট পেয়েছিলেন। উত্তেজিত সম্মেলনকে হযরত বড় দক্ষতার সাথে নিয়ন্ত্রণে এনেছিলেন।

এ সম্মেলনে অনেক আলোচনার মধ্যে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সংস্কারেরও আলোচনা হয় সহ শিক্ষা তথা সেকুলার শিক্ষা ব্যবস্থা দেশের ধর্মীয় চিন্তা-চেতনার মূলে কুঠারাঘাত হানছে বলে হযরত সদর সাহেব উল্লেখ করেন। ধর্মহীন কর্ম শিক্ষা আর কর্মহীন ধর্ম শিক্ষা এই দুইটির কোনটিকে তিনি পছন্দ করতেন না। আর তাই–

এই সম্মেলনে কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা সিলেবাস সংস্কারেরও আলোচনা হয়েছিল। কারণ হিসাবে পেশ করা হয়েছিল, এ দেশের মাদ্রাসা গুলোতে যে সিলেবাস পড়ানো হয় তার মধ্যে এমন অনেক বিষয় আছে যা এ দেশের ভৌগোলিক পরিবেশ এবং প্রায় সব দিক থেকেই অসঙ্গতিপূর্ণ। এ সব বিষয়ে সম্মুখীন এদেশের জনগণকে হতে হয় না। অপর দিকে এমন অনেক বিষয় আছে যা আমাদের দেশে অত্যন্ত প্রয়োজন। অথচ সে সব বিষয় সম্পর্কে আমাদের ছাত্র সমাজ একেবারে অন্ধকারেই থেকে যায়। তাই এ শিক্ষাক্রমকে পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করার জন্য প্রস্তাব তুলে ছিলেন স্বয়ং সদর সাহেব (রহঃ)। এখানে বলা হয়েছিল যে, শরবত থাকবে হুবহু এইটাই, গ্লাসটা শুধু পরিস্কার করা হবে। কিন্তু এ সম্মেলনের পরে এ নিয়ে আর কোন কথা হয়েছে কি না আমার জানা নেই।

www.pathagar.com

প্রশ্ন: আপনি তো নিশ্চয়ই ছোট থেকে কেরাত চর্চার প্রতি আগ্রহী ছিলেন আপনার এ আগ্রহে হযরত সদর সাহেব (রহঃ)এর প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ কোন অবদান ছিল কি?

উত্তর: জ্বি, আমার মনে আছে। ১৯৬৩ কি '৬৪ সালের দিকে করাচী আন্তর্জাতিক কেরাত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে যোগদানের জন্য হুযুর আমাকে প্রস্তুত হতে বলেন। ওদিকে ঐ সম্মেলনে যোগদানের জন্য যা প্রয়োজন তার সকল বন্দবস্ত হুজুর করেন।

নির্দিষ্ট সময়ে আমি সহ হামদ, নাত ও আযানের প্রতিযোগী আরো ক'জন ছাত্র সহ আমাদেরকে হযরত হাফেজ্জী হুজুর (রহঃ) এর তত্ত্বাবধানে পাঠান হয়। সেই সফরে হযরত আশরাফ আলী থানভী (রহঃ) এর খলিফাদের মধ্যে অন্যতম খলিফা ইউপির মাওলানা আযমগড়ী সাহেব (রহঃ) এর সাথে সাক্ষাৎ করার সৌভাগ্য হয়েছিল। তাঁর লিখিত রেসালা 'মাঈয়তে এলাহীর' মাধ্যমে আমি তাঁকে প্রথম চিনি।

যাই হোক হযরত সদর সাহেব (রহঃ) শুধু আমাদের নয়, তিনি যার মধ্যে যে প্রতিভা লক্ষ্য করতেন– সে প্রতিভাকে সে ভাবেই জাগিয়ে তুলে দ্বীনের কাজে লাগাতেন। এটা ছিল সদর সাহেব (রহঃ) এর একটি বিশেষ গুণ।

প্রশ্ন: হযরত সদর সাহেব (রহঃ) এর দৈনন্দিন কাজের রুটিন কি রকম ছিল বলতে পারবেন কি?

উত্তর: জ্বি না, আমি সে সব লক্ষ্য করতে পারিনি। শুধু এতটুকু দেখেছি, তিনি আসরের পর মসজিদের বারান্দায় বসতেন। হুযুরের মুহিব্বীন তাঁর নিকট আসতেন এবং বিভিন্ন সমস্যা হুযুরকে জানাতেন। হুযুর সে সবের পরামর্শ দিতেন। তাছাড়া প্রায় সময়ই দেখেছি তিনি লিখতেন।

প্রশ্ন: আপনি হযরত সদর সাহেব (রহঃ) কে মুসলিম উম্মাহর বর্তমান সংকট মোকাবেলার জন্য কোন সব বিষয়ের উপর বেশী গুরুত্ব দিতে দেখেছেন?

উত্তর: হযরত সদর সাহেব (রহঃ) মুসলিম উম্মাহর স্বার্থে এই জাতির উত্থানের বিষয় গুলো গভীর ভাবে চিন্তা করতেন। এ জন্য তিনি একটি সংগঠনও গড়ে তোলেন। যা বর্তমানেও খাদেমুল ইসলামের সাইন বোর্ডে কাজ করে যাচ্ছে। আমার মনে আছে। সম্ভবতঃ আমার দাওরার বছর। খৃষ্টান মিশনারীদের বিরুদ্ধে খাদেমুল ইসলামের কর্মসূচী দিয়ে তিনি আমাদের চট্টগ্রামের শিলছড়ি এলাকায় পাঠিয়ে ছিলেন।

www.pathagar.com

সেখানে প্রায় ৬০ একর জমিও নিয়ে ছিলেন। দাতব্য চিকিৎসালয়, মসজিদ, মক্তব গড়ে তোলার জন্যে। তবে সব মিলিয়ে তিনি এসব বিষয়ের প্রতি অধিক গুরুত্ব দিতেন।

(১) মাদরাসা শিক্ষাকে সংস্কারের মাধ্যমে আধুনিক ধর্মীয় করণ

(২) সকল দলীয় মনোভাব বর্জন করে বৃহত্তর উলামা ঐক্য।

(৩) দ্বীনের খাঁটি মুজাহিদ তৈরী এবং

(৪) বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে লেখক-গবেষক তৈরীর প্রতিও অদম্য আগ্রহ আমি তাঁর মধ্যে লক্ষ্য করেছি।

সাক্ষাতকার গ্রহণে– নাকীব আশরাফ

=== ০০ ===

www.pathagar.com

হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ) সম্পর্কে

মাওলানা আবদুল হাই সাহেবের সাক্ষাতকার

হযরত মাওলানা আবদুল হাই। যাঁর জীবনের ১২টা বছর কাটিয়েছেন হযরত মাওলানা শামছুল হক (রহঃ) এর দরবারে। এই দীর্ঘ ১২টি বছর হযরত ফরিদপুরী (রহঃ)এর কত কথা, কত ঘটনা তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন। তাঁর দেখা হযরত সদর সাহেব (রহঃ)এর সেই বর্ণাঢ্য জীবনালেখ্যই ফুটে উঠেছে নিম্নের প্রশ্নোত্তরে।

প্রশ্ন: আপনি দীর্ঘ দিন হযরত মাওলানা ফরিদপুরী (রহঃ) এর দরবারে কাটিয়েছেন। আমরা জানতে চাই হযরত ফরিদপুরী সাহেবের সাথে আপনার প্রথম পরিচয় কি ভাবে?

উত্তর: জ্বি, সে স্মৃতি আজো আমার মনে পড়ে। ১৯৫৫ সালের কথা। লালবাগ জামিয়া কুরআনিয়ার মুদাররিস ছিলেন মাওলানা সালাহুদ্দীন সাহেব সম্পর্কে আমার মামা। আমার অভিভাবকগণ আমাকে মাদরাসায় ভর্তি করতে রাজি ছিলেন না। তিনিই আমার অভিভাবকদের বুঝিয়ে মাদরাসায় ভর্তি করাতে রাজি করান। একদিন সকালে তিনি আমাকে মাদরাসায় নিয়ে যান। আমাকে হযরত সদর সাহেবের কাছে নিয়ে গিয়ে উর্দূতে বলেন, "এহি মেরা ভান্‌জা হ্যায়।" যদিও আমি তখন পর্যন্ত উর্দূ পড়িনি তারপরও বুঝতে পারলাম যে, মামা আমাকে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন এবং এও বুঝলাম যে, মামা আগেই সদর সাহেবের সাথে আমার সম্পর্কে কথা বলেছেন।

যা হোক, সদর সাহেব হুযুর আমাকে কাছে নিলেন। নাস্তার সময় ছিল তাই আমাকে নাস্তা আনার জন্য পাঠালেন। নাস্তার পর আমাকে পান বানিয়ে দিতে বললেন। হুযুরের শুধু খাবারের পর একটু করে পান খাবার অভ্যাস ছিল। অনভ্যস্ত হাতে আমি প্রথম পান বানালাম। পান বানাতে গিয়ে পানের মসৃণ অংশে চুন মাখালাম এবং সুপারী দিয়ে দলা পাকিয়ে হুযুরের সামনে ধরলাম। আমার মামা মাওলানা সালাহুদ্দীন সাহেব ততক্ষণে চলে গিয়েছেন। রুমে আমি একা। সদর সাহেবের রুম তখন বর্তমান মিশকাত শরীফের রুমে ছিল। হুযুর রুমের জানালা বরাবর নীচে হেলান দিয়ে বসেছিলেন। আমার পান বানানো দেখে হুযুর মুচকী একটু হাসি দিয়ে বললেন, "আচ্ছা দেখ দেখি, মানুষ পান খায় কেন? পান খা

www.pathagar.com

ফারাহাতে কল্‌বের (আন্তরিক প্রফুল্লতা) জন্য। তুমি যেভাবে পান বানিয়েছ তাতেতো সেটা হবে না। পানের মসৃণ অংশ তুমি ভেতরে রেখে অমসৃণ অংশটা রেখেছ বাহিরে, এতে পান খাওয়ার উদ্দেশ্য প্রথমেই ব্যাহত হবে। এরপর পানে অনেক পোকা-মাকড় বাসা বাধে, ডিম দেয়। তাদের দ্বারা অনেক জীবাণু পানে শক্তভাবে লেগে থাকতে পারে। অতএব এ পিঠে চুনা মাখালে জীবাণু ধ্বংস করে দেয়।

প্রথম দিনেই হুযুরের এমন দূরদর্শিতা দেখে আমি হুযুরের প্রতি অভিভূত হয়ে পড়ি। এরপর হযরত আমাকে কাপড় ধুতে দিলেন। এই যে শুরু হল খেদমত, একটানা ১২টি বছর আমি এ নেয়ামত হাত ছাড়া হতে দেয়নি। সপ্তাহে একদিন আমি হুযুরের কাপড় কেঁচে দিয়েছি।

প্রশ্ন: দীর্ঘ ১২টি বছর আপনি হযরতের সোহবতে কাটিয়েছেন। এ দীর্ঘ সময়ে হযরত আপনাকে হয়ত আদর করেছেন, স্নেহ করেছেন, আবার রাগ-গোস্বাও করেছেন। তার মধ্যে আপনার কাছে সবচেয়ে স্মরণীয় এমন দু'চারটা ঘটনা আমাদের শুনাবেন কি?

উত্তর: হ্যাঁ, আপনি ঠিক বলেছেন। দীর্ঘ দিনের বহু ঘটনা আমার চোখের সামনে ঘটেছে। অনেক সময় ঘটনার উৎস আমিও হয়েছি। সে বহুদিন আগের কথা। অনেকগুলো আমার স্পষ্ট মনেও নেই।

তবে, আমার কিছু কিছু মনে পড়ে। একদিন হযরত সদর সাহেব (রহঃ) আমাকে চৌরাস্তা থেকে বিস্কুট আনার জন্য আদেশ করলেন। বলার সময় হুযুর কোন কাজে সম্ভবত ব্যস্ত ছিলেন। এমন দ্রুত বললেন যে আমি ভাল করে বুঝতে পারলাম না। আবার জিজ্ঞেস করারও সাহস পেলাম না। দ্রুত চৌরাস্তা গিয়ে এক প্যাকেট বিস্কুট নিয়ে হুযুরের সামনে ধরলাম। হুযুর আমাকে নরম সুরে শাসিয়ে বললেন, "এ বিস্কুট কেন? ভাল বিস্কুট লইয়া আস।"

আমি আবার গিয়ে বিস্কুটের প্যাকেট পাল্টে নিয়ে আসলাম। সেটা দেখেও হুযুর বললেন, এমন বিস্কুট কি খাওয়া যায়? আবার গিয়ে বিস্কুট পাল্টে আনলাম। এভাবে আমাকে তিনি কয়েকবার ঘুরিয়ে ছিলেন এবং রাগও করেছিলেন। এ ব্যাপারটা আমার কাছে দূর্বোদ্ধ ঠেকেছিল। বিস্কুটের নাম বলে দিলেই পারতেন। কিন্তু তা না বলে বার বার আমাকে ঘুরালেন। সত্যিই যেন আমার সেদিন বেখাপ্পা লেগেছিল। আবার হযরতের প্রতি পূর্ণ আস্থা ছিল যে, তিনি অনর্থক কিছু করতে পারেন না। সেদিন এর রহস্য না বুঝলেও আজ কিছুটা বুঝতে পারছি। হয়ত সেদিন

www.pathagar.com

অমন করে আমার মেজাজ ও ধৈর্য শক্তির পরীক্ষা নিয়েছিলেন কিং অনুশীলন করিয়েছিলেন। কেননা, হুযুরের ব্যক্তিগত কাজ নিয়ে জীবনে কারো সাথে কোনদিন রাগ করেননি।

হুযুরের আর একটি ঘটনা আজও আমার স্মৃতিপটে সময় সময় ভে ওঠে। বরিশালের মাওলানা ফজলুল হক সাহেব হুযুরের খেদম করতেন। যতদূর মনে পড়ে তিনি গওহারডাঙ্গা মাদ্রাসা থে এসেছিলেন। লালবাগে তফসীর পড়তেন। তিনি হয়তো মনে করেছিলে যে, হুযুর অসুস্থ। ফল-ফ্রুট তার পথ্য, হয়তো হুযুরের নিকট টাকা-পয় নেই, তাই ফল কিনতে পারছেন না। ফলের দোকানদারতো হুযুর অত্যন্ত ভালবাসেন। যদি তার কাছে বলা যায়, অবশ্যই সে হুযুরকে ফ হাদিয়া দেবে এই ভেবে তার নিকট থেকে ফল এনেছিলেন। হুযু কামরায় ফল দেখে জিজ্ঞেস করলেন, এ ফল কোথা থেকে এনেছ?

তখন ফজলুল হক পুরো ঘটনা বলে দিল। হযরত সদর সাহেব শুে ক্ষোভে, দুঃখে যেন ফেঁটে পড়লেন। মুহূর্তে সদা শান্ত মানুষটি রা অগ্নিশর্মা হয়ে গেলেন। চিৎকার করে মাওলানা সালাহুদ্দীন সাহেবে বললেন, সালাহুদ্দীন! একে ধর, জুতা মার। জুতা মার। মাওলা সালাহুদ্দীন সাহেব এতবড় একজন ছাত্রকে জুতাপেটা করতে দ্বিধা সংকোচ করছিলেন। কিন্তু তিনি হুযুরের পুনঃপুনঃ নির্দেশ দেখে ভাবলে হুযুর এত গোস্বা করেছেন। যা ইতিপূর্বে কেউ দেখেননি। যদি এ নির্দে পালন না করা হয় তাহলে বেচারার অন্য কোন ক্ষতি হয়ে যেতে পা এবং নির্দেশ না পালন করার জন্য তার নিজের জন্যও বেয়াদবী হবে পরে তিনি নিরুপায় হয়ে নির্দেশ পালন করেছিলেন। হুযুরের সেদিনে রাগান্বিত চেহারা আজও আমার মনে পড়ে।

প্রশ্ন: আচ্ছা আপনার স্মরণীয় যে দু'টা ঘটনা আপনি বললেন, তাতে তো বো যায় হযরত সদর সাহেব যথেষ্ট রাগী ছিলেন। আসলেও কি তাই?

উত্তর: না, না, রাগ তো একটা দোষ। কিন্তু এ দু'টা ঘটনাই হযরত সদ সাহেবের অনেকগুলো গুণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দু'টা গুণ। কারণ প্রথমটিতে আমার পরীক্ষা ছিল এবং এ পরীক্ষায় যে কতটা লাভ হয়েছে তা এ মাত্র আমি বুঝি। শুধু তাই নয় সদর সাহেবের এমন নেগরানী বদৌলতেই আজ আমার এতটা উন্নতি।

আর দ্বিতীয়টা সত্যই রাগ ছিল। একজন ফলের দোকানদারের নিক হুযুরের কথা বলে বিনা পয়সায় ফল আনা অতি নিম্ন মানের কাজ

www.pathagar.com

বাহ্যত যদিও এটাতে হুযুরের স্বার্থ ছিল কিন্তু এতে একজন আলেমের শানকে কলঙ্কিত করে তাকে জবাই দেয়া হয়েছিল বলে হুযুর মনে করেছিলেন। হুযুর দ্বীন এবং শরীয়তের বেলায় ছিলেন অতি কঠোর। মুআমালাত, মুয়াশারাত ছিল তার স্বচ্ছ আয়নার মত। আর তাঁর নিজের ব্যাপারে তিনি ছিলেন আকাশের মত উদার। সাদাসিধে একজন মাটির মানুষ। এটা আপনি বুঝতে পারবেন নিম্নের দুইটা ঘটনা থেকে।

হযরত সদর সাহেব (রহঃ)এর শেষ যামানায় চোখের জ্যোতি অনেকটা হ্রাস পেয়েছিল। তিনি তার পরও লেখালেখি ক্ষান্ত করেননি। আমরা দেখেছি তিনি তফসীর লিখতেন সে অবস্থাতেই। লেখাগুলো অনেকের কাছে দূর্বোদ্ধ মনে হতো। কিন্তু মাওলানা ফজলুর রহমান এবং মাষ্টার আব্দুল হক এঁরা যেহেতু হুযুরের লেখালেখিতে সাহায্য করতেন তাই সে লেখা তারাই শুধু বুঝতেন। তফসীরের পান্ডুলিপি এরা দু'জনে মিলে ফ্রেশ করতেন। একদিন তারা দুইজন হুযুরের কাছে বসে পান্ডুলিপি তৈরী করছেন। এমন সময় সদর সাহেব আমাকে ওযুধ দিতে বললেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, হুযুরের একটা অসুখ হয়। সে অসুখের ওযুধ হিসেবে কলার মধ্যে কবজ (তাবিজ) ঢুকিয়ে তা খেয়ে ফেলতেন। এ ওষুধটা আমার কাছে চাইলে, কলাটা ছিলে তার মধ্যে কবজ ঢুকিয়ে পিরিচে করে নিয়ে গেলাম।

অনেক্ষণ পিরিচ হুযুরের সামনে নিয়ে বসে রইলাম। হুযুর লেখার মধ্যে এতই মনোনিবেশ করেছিলেন যে, অনেকক্ষণ পর্যন্ত আমার উপস্থিতি তিনি টেরই পেলেন না। বেশ কিছুক্ষণ পর আমাকে টের পেয়ে, আমার দিকে না তাকিয়েই হাত বাড়িয়ে কলাটা পিরিচ থেকে উঠিয়ে খাতার দিকে তাল রেখে আস্ত কলা মুখে দিয়ে গিলতে চাইলেন। যেহেতু কলার মধ্যে তাবিজ তাই না চিবিয়ে গিলে খেতে হত। অন্যদিন কলার অর্ধেক দিতাম, অন্য অর্ধেক চিবিয়ে খেতেন। কিন্তু সেদিন অর্ধেক করিনি এই ভেবে যে, হুযুরই আস্ত দেখে ভেঙ্গে শুধু তাবিজটুকু গিলবেন। হুযুর টুকরা মাত্র একটা দেখেই হয়ত আস্ত মুখে দিয়ে গিলতে চেষ্টা করলেন। কলাটুকু গলার মধ্যে যেয়ে আটকে পড়ল। বেরিয়েও আসে না গিলতেও পারেন না। চোখ দিয়ে হুযুরের পানি বেরুল। খক খক শব্দ শুনে অনেকে দৌঁড়ে এল।

হুযুরের এ অবস্থা দেখে ভয়ে আমি কাঁপতে শুরু করেছি। অন্যরাও রীতিমত ঘাবড়ে গেলেন। বিশেষ করে হুযুরের কষ্ট দেখে অন্তরটা কেঁপে উঠল। হুযুর আমার দিকে তাকিয়ে জোরে খাক ছেড়ে কলাটা বের করে

www.pathagar.com

হাতে নিলেন। আমার দিকে তাকিয়ে মিষ্টি একটা হাসি দিয়ে শুধু বললেন, একেবারে পুরোটা দিয়েছিলাম তো! পুরোটা এভাবে দেয়ার জন্য আমাকে টু শব্দটা পর্যন্ত করলেন না। উপরোক্ত মিষ্টি একটা হাসি উপহার দিলেন। কিন্তু হুযুরের মোটেও হাসার অবস্থা তখন ছিল না। শুধু আমাকে নিরপরাধী বানিয়ে আশ্বস্ত করার জন্যই ছিল সে হাসি।

আর একটা ঘটনা। হুযুরের হঠাৎ কানে ব্যথা হল। প্রচন্ড ব্যথা। একজন লোক প্রেসক্রিপশন করল যে, শুকনো মরিচের মাথা ভেঙ্গে বিচিগুলো ফেলে দিয়ে তাতে সরিষার তৈল ভরে আগুনে গরম করে কানে ঢাললে কানব্যথা পীড়ার উপশম হয়। হুযুর তাই করতে বললেন। এখানেও আমি, ফজলুর রহমান সাহেব আর মাষ্টার আব্দুল হক সাহেব। আমরা মরিচের বিচিগুলো ফেলে দিয়ে তেল ভরলাম। হুযুরের হারিকেনে গরম করলাম। মরিচ গরম হওয়ার সাথে সাথে দেখা গেল অল্পক্ষণেই তেলও গরম হল। প্রয়োজনের তুলনায় একটু বেশীই গরম হল। আমরা তা হুযুরের কানে ঢেলে দিতেই তিনি আহ্ করে একটা ভীষণ চিৎকার দিয়ে উঠলেন। নরম পর্দায় অতিরিক্ত গরম পেয়ে হুযুর মূর্ছা গেলেন।

সেদিনও হুযুরের কি নিদারুণ কষ্ট হয়েছিল তা আল্লাহই ভাল জানেন। অনেকক্ষণ পরে তিনি চোখ খুললেন এবং আমাদের সাথে এমন ভাবে কথা বললেন, যেন কিছুই হয়নি। এ ক্ষমার কোন তুলনা হয় না।

প্রশ্ন: সত্যই কোন তুলনা হয়না। হুযুরের আত্ম ত্যাগ কেমন ছিল এ ব্যাপারে কিছু বললে খুশি হতাম।

উত্তর: হুযুরের পুরো জীবনটাই ত্যাগের, কুরবানীর। ত্যাগের ক্ষেত্রে হযরত সদর সাহেব (রহঃ)-এর মত দ্বিতীয় কোন লোক আমার জীবনে চোখে খুব কমই দেখেছি। আমি লালবাগে লেখা পড়া শেষ করে করাচী গিয়েছিলাম। করাচী যাওয়ার আগের রমজানের ঘটনা।

হযরত সদর সাহেব (রহঃ) দেশের বাড়ীতে থাকছেন। আমিও গিয়েছি হুযুরের সোহবতে থাকার জন্য। আমি হুযুরকে খানা খাওয়াতাম। শীতের দিন। হুযুর ভাতের সাথে মূলা পছন্দ করতেন। সে বছর গওহার ডাঙ্গা মাদ্রাসার বিশাল ময়দানে শিক্ষক-ছাত্ররা মিলে মূলার চাষ করেছিলেন। এটা মাদ্রাসার খরচের চাষ ছিলনা। তাই সবার জন্য উন্মুক্ত ছিল। খাবার আ'ম এজাজত ছিল সবার জন্য। আমি হুযুরের জন্য একটা মূলা তুলে সুন্দর করে ধুয়ে হুযুরের খানা আনতাম যে বাটিতে সেখানে মূলাটা রাখলাম। খাবার সময় হুযুর বললেন: মূলা কোথায় পাইলা? তখন আমি

www.pathagar.com

বললাম, মাদ্রাসার ক্ষেতের, সাথে এও বললাম যে, এতে আম এজাযত আছে। হুযুর বললেন, যাও দফতরে গিয়ে জিজ্ঞেস করে আস এর মূল্য কত। আমি দফতরে গিয়ে এটা জিজ্ঞাসা করতেই খেতে বসা সব কটা লোক এক সাথে দাঁড়িয়ে ঘটনা জানতে চাইলেন। কেননা তাঁরা জানতেন যে, আমি হুযুরের খাদেম। ঘটনা বলার পর বাশবাড়ী হুযুর নামে পরিচিত যিনি তিনি নিজে ক্ষেতে গিয়ে ভাল কটা মূলা তুলে সুন্দর করে ধুয়ে নিয়ে গিয়ে এত অনুরোধ করার পরও মূল্য নির্ধারণ এমনকি মূল্য পরিশোধ না করে আর খেলেন না। এই ছিল তাঁর আত্মত্যাগ এবং খাদ্যের ব্যাপারে এহতিয়াতের নমুনা।

আরেকটি ঘটনা মনে পড়ে গেল। সম্ভবত আমি তখন জালালাইন শরীফ পড়ি। তখনও লালবাগ মাদ্রাসার সমস্ত উস্তাদের রুমে ফ্যান মাদ্রাসার পক্ষ থেকেই দেয়া হত। ছাত্রদের রুমেও ছিল। তবে ছাত্রদের রুমে ব্যাপক ভাবে ছিল কিনা তা আমার মনে নেই।

হযরত সদর সাহেব (রহঃ)-এর রুমে ফান ছিল না। কখনো ঘর্মাক্ত হলে তিনি তালপাতার পাখা দিয়ে বাতাস করতেন। সমস্ত হুযুর অনেক অনুরোধ করেও ফ্যান কিনতে রাজী করাতে পারছিলেন না। অথচ মাদ্রাসার প্রধান পরিচালক হিসেবে তাঁর রুমে ফ্যান থাকা বিধি মতই সিদ্ধ ছিল।

একদিন বাইরের ক'জন লোক আর মাদ্রাসার বড় বড় ক'জন উস্তাদ হুযুরের রুমে আলোচনা করার এক ফাঁকে বললেন: হুযুর! আমাদের এসি রুমে থেকে অভ্যাস হয়ে গেছে,শরীরটা গরম সহ্য করতে একেবারে অনভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। আপনার রুমে আসলে আমাদের কষ্ট হয়। আপনার জন্য নয়, আমাদের জন্য হলেও একটা ফ্যানের ব্যবস্থা করার অনুমতি দিন। তখন হুযুর বললেন: হাঁ, মেহমানের জন্য হলে আনা যায়। হুযুরের এ সম্মতি পেয়ে সাথে সাথে একজন গিয়ে ভাল একটা ফ্যান নিয়ে এলো। ফ্যান যখন লাগান হয়, তখন হুযুর মাদ্রাসায় ছিলেন না। মাদ্রাসার দফতরী এই সুযোগে ফ্যানটা একদম হুযুরের সীটের উপরে মাঝ বরাবর লাগিয়ে দিল।

হুযুর বাইরে থেকে রুমে এসে ফ্যানের দিকে লক্ষ্য করে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, এখানে ফ্যান কে লাগিয়েছে? আমি বললাম, দফতরী। হুযুর বললেন, ডাক তাকে। আমি তাকে ডেকে আনলাম। হুযুর তাকে বললেন, মেহমানের জন্য ফ্যান আনা হয়েছে, তুমি এখানে লাগিয়েছ কেন? মেহমানরা যেখানে বসেন সেখানে লাগালে আমিও সাথে সাথে

www.pathagar.com

বাতাস পাব। ওটা নামাও। এই খানে লাগাও। হুযুর দাঁড়িয়ে থেকে ফ্যান খুলিয়ে সে ফ্যান মেহমানদের বসার স্থানের সোজা উপরে লাগিয়ে তারপর স্বস্তি পেলেন।

আমি ছিলাম হুযুর যে রূমে থাকতেন, সে রুমের পার্টিশনের অপর পার্শ্বে একদম হুযুরের কাছে। আমি কোন দিন হুযুরকে মেহমানের অনুপস্থিতিতে নিজের প্রয়োজনে ফ্যান ব্যবহার করতে দেখিনি। একদিন হুযুর বাইরে, সম্ভবত গভর্ণর হাউজে মোনয়েম খানের সঙ্গে কি প্রয়োজনে গিয়েছিলেন। ঐ দিন ফিরলেন অত্যন্ত ঘর্মাক্ত শরীর নিয়ে। কাপড় একেবারে চুপসে গেছে। হুযুর এসেই তালের পাখা হাতে নিয়ে বাতাস করতে থাকেন। আমি ফ্যানের সুইচের নিচে বসেই পড়ছিলাম। হুযুরের এ অবস্থা দেখে ভাবলাম, এমন শরীর ঠান্ডা করতে তালের পাখায় বেশ সময় লাগবে এবং কষ্ট হবে।

আমি অনেকটা যন্ত্রচালিতের মতই পড়ার খেয়ালে থেকেই শুধু দাঁড়িয়ে ফ্যানের সুইচটা টিপে দিলাম। সাথে সাথে হুযুর নিজে উঠে গিয়ে ফ্যানের সুইচ অফ করে দিলেন। আর মিস্টি এক ঝিলিক হাসি মুখে এনে আমাকে মৃদু শাসনের সুরে বললেন, বোকা কোথাকার। এ ফ্যান মেহমানের জন্য। সেদিন হুযুরের এ পদক্ষেপে আমার চোখে পানি এসে গিয়েছিল। আমার মন অস্ফুট কণ্ঠে, আমার অজান্তেই বলে উঠেছিল, শায়েখ সালাম, সালাম আপনাকে। আপনার তুলনা শুধু আপনিই। নবীয়ে করিম (সাঃ)এবং সাহাবায়ে কেরামদের আদর্শ আপনার মাঝে জীবন্ত হয়ে বেঁচে রয়েছে।

স্মরণীয় ঘটনার মধ্যে আমার আরো মনে পড়ে হযরত সদর সাহেবের (রহঃ) লালবাগ মাদ্রাসা থেকে বিদায় নেয়ার করুণ দৃশ্যটি। হুযুর চলে যাবেন। সবার মধ্যে হুযুরকে হারাবার অব্যক্ত বেদনা ক্রমেই ঘনীভূত হতে শুরু করেছে। অনেকেই একেবারে মুষড়ে পড়েছেন। সারা মাদ্রাসায় ছাত্র-শিক্ষক এমনকি এলাকার লোকদের মাঝেও কেবল একটা কথা, হযরত সদর সাহেব হুযুর বিদায় নিয়ে চলে যাবেন।

মাদ্রাসার সমস্ত ছাত্র-শিক্ষক, এলাকাবাসী এ দিনটি না আসুক মনে প্রাণে এমন প্রত্যাশা করলেও দিনটি নির্মম ভাবে একদিন উপস্থিত হলই। বিদায় বেলা, ভেঙ্গে পড়া ছাত্র-শিক্ষকদের এবং এলাকাবাসীর সামনে এল আর এক কঠিন মুহূর্ত। বিদায়ের দিন হুযুর সকাল থেকে এক একজন ওস্তাদের কাছে গিয়ে কি এক অপরিচিত ভাষায় ক্ষমা চাইলেন। সে ভাষায় কি স্নেহ-মমতা, ভালবাসার অভিব্যক্তি ছিল তা ব্যক্ত করা

www.pathagar.com

মুশকিল। প্রতিটা কথায় হুযুর সবার হৃদয়ের গভীরে যেন আরো মিশে যেতে থাকলেন। সবার চোখ দিয়ে অব্যক্ত বেদনা অশ্রু হয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল। মনে হয়েছে সে ভাষা মানুষ কখনও শোনেনি। প্রত্যেকে স্তব্ধ-বিস্ময়ে শুধু লক্ষ্য করলেন, এ মহান ব্যক্তি একজন সাধারণ মানুষের তুলনায় নিজেকে কতটা ছোট ভাবতে পারেন। ক্লাস ওয়ারী ভাবে ছাত্রদের কাছে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ঘটনাকে এক এক করে উল্লেখ করে ক্ষমা চাইলেন। অমূল্য উপদেশ দিলেন। মাদ্রাসার বাবুর্চী দফতরীসহ সমস্ত কর্মচারীর কাছে এক এক করে ক্ষমা চাইলেন।

মাদ্রাসার বড় মুফতী আবদুল মুঈজ সাহেব এক বন্ধের পর খোলার দিন সময় মত উপস্থিত হতে পারেন নাই। দু'একদিন পর মাদ্রাসায় এলে হুযুর তাঁকে নিজের রুমে একাকী ডেকে নিয়ে দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হবার উপদেশ দেন। মাদ্রাসার হক নষ্ট হয়েছে দেখে তিনি তাকে কিছুটা শাসিয়ে দিয়েছিলেন। হযরত যখন বিদায় নিবেন তখন সমস্ত মুদাররেস দফতরে মিলিত হন। সেই মিলনায়তনে হযরত সদর সাহেব (রহঃ) মুফতী সাহেবের নিকট সেই ঘটনা উল্লেখ করে বলেন, মুফতী সাহেব আমি মাদ্রাসার খাদেম ছিলাম বিধায় মাদ্রাসার হক আমাকেই দেখতে হয়েছে। আপনাকে সেদিন ধমকিয়ে ছিলাম। আমাকে ক্ষমা করে দিন।

তিনি সেদিন যা বলেছিলেন তা সবার অলক্ষ্যে বলেছিলেন। কিন্তু আজ ক্ষমা চাইলেন সবার সামনে। অথচ এ ঘটনা মুফতী সাহেব ছাড়া আর কেউ জানত না।

বিদায়ের সময় মাদ্রাসার চাবী, যৎসামান্য আসবাব পত্র এক এক করে বুঝিয়ে দিলেন। সাথে হুযুরের নিজস্ব আলমারীটাও। কয়েকজন হুযুর জোর দিয়ে বললেন, হুযুর এটা একেবারে খাস আপানার। যে লোক হাদিয়া দিয়েছিলেন, তিনি দেয়ার সময় আমাদের সামনে স্পষ্ট বলেছিলেন যে, হুযুর! এটা একমাত্র আপনার, আপনিই ব্যবহার করবেন। এটা কিন্তু মাদ্রাসার নয়।"

হুযুর আপনার জিনিস আপনি নেবেন বলে আমরা আশা করি। উল্লেখ্য যে, সে আলমারী তৎকালীন সময়ে যথেষ্ট মূল্যবান ছিল। কিন্তু হুযুর কিছুতেই রাজী হলেন না। বললেন, "আমি এই মাদ্রাসায় আছি বলেইতো তারা আমাকে চিনেছে এবং এটা দিয়েছে। আমি এখানে না থাকলে এই শামছুল হকের বাড়ি গিয়ে কেউ দিয়ে আসত না।" এই সেদিন দেখলাম এখলাসের চরম পরাকাষ্ঠা। এখলাসের এমন দৃষ্টান্ত বর্তমানে আর কোথায়।

www.pathagar.com

প্রশ্ন: হযরত সদর সাহেবকে আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করেন?

উত্তর: হযরতের সোহবতে দীর্ঘ ১২টি বছরে তার মূল্যহীন কোন কাজ আমি দেখিনি। এক কথায় বলতে গেলে তিনি ছিলেন অল-রাউন্ডার। তবে তার একটা গুণ আমার সমস্ত সত্ত্বাকে সারাক্ষণ অভিভূত করে রাখে। সেটি হচ্ছে হযরত কাকে বেশী ভাল বাসতেন সেটা নিরুপণ করা আজও বেশ কঠিন বিষয় হয়ে রয়ে গেছে। এক ওস্তাদ যদি অন্য ওস্তাদের সাথে কথা প্রসঙ্গে বলতেন, হযরত সদর সাহেব আমাকে অত্যন্ত ভালবাসেন। তাহলে তখনই অন্য ওস্তাদ বেশ কটা ঘটনা মুহূর্তে সামনে এনে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিতেন যে, না, তাকেই বেশী মহব্বত করেন। এ অবস্থা ছাত্র, শিক্ষক, দফতরী, বাবুর্চী এবং এলাকার মানুষ সহ প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হত। হুযুর ছোটদেরকে ছেলে এবং বড়দের কে ভাই হিসেবে দেখতেন, এ দেখা একেবারে আন্তরিক।

বর্তমানে অনেক শিক্ষক মুখের কথায় বলেন, ছাত্ররা নিজের ছেলের মত। কিন্তু কাজে সে কথা প্রমাণ করতে পারেন না। হযরত এটা কাজে কর্মে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। সাধারণ মানুষ অবশ্য হুযুরকে এখলাসের দিক দিয়ে বেশী মূল্যায়ন করেন। আবার অনেকে প্রতিভার লালন এবং ছোটকে বড় করে গড়ে তোলার নিরলস প্রচেষ্টাকে নিরুপণ করেন। কেউ তার এলমের গভীরতাকে বড় করে দেখেন। তিনি সারাটি জীবন নিজের মাফাদের জন্য (স্বীয় স্বার্থ) কোন কিছু করেননি।

প্রশ্ন: এ অসময়ে আপনাকে বেশ কষ্ট দিয়ে ফেলেছি। আর একটু কষ্ট করে বলবেন কি, তিনি রমযান মাস কিভাবে কাটাতেন?

উত্তর: প্রথমে সত্যি ভেবেছিলাম এ সময় কষ্ট হবে। কিন্তু এখন আর কোন কষ্ট অনুভব করছি না।

হুযুরকে প্রথম দিকে দেখেছি তিনি রমযানের প্রথম ১৫দিন লালবাগে কাটিয়ে শেষ ১৫দিন গওহারডাঙ্গা কাটাতেন। কিন্তু ইন্তেকালের পূর্বে শেষ কটা বছর পুরো রমযানে তিনি গওহারডাঙ্গা কাটাতেন। আমি রমযানে হুযুরের সোহবত পাবার জন্য গওহারডাঙ্গা চলে যেতাম। ছাত্ররা যারাই যেত তাদের প্রথমেই নেজামুল আওকাত (সময়ের রুটিন) করে দেখাতে বলতেন। আমাকেও বললেন। আমি রুটিন তৈরী করে নিয়ে হুযুরকে দেখাতে গেছি। এতে প্রথমেই ছিল শয্যা ত্যাগ করে ইস্তেঞ্জা ও ওজু। হুযুর এটা দেখে বললেন, প্রথমেই ইস্তেঞ্জার মত এমন একটা কাজ দিয়ে রুটিন শুরু করলে? প্রথমেই ওযু লেখতে। ইস্তেঞ্জা তো একটা

www.pathagar.com

তাবে জিনিস। এটা উল্লেখের প্রয়োজন নাই। পরে আমি সেটা পাল্টিয়ে নতুন করে নেজামুল আওকাত করে দেখালাম।

রমযানে হুযুর আমাদেরকে বিভিন্ন রেসালা পড়তে দিতেন। সেগুলোর মাঝে আশরাফুস সাওয়ানেহ, সাওয়ানেহে কাসেমী, হায়াতে মাদানী বিশেষ ভাবে মনে পড়ে। এসব রেসালায় যে আমার কত উপকার হয়েছে তা আমি বুঝাতে পারছি না। কিতাব মোতালাআয় মন বসানোর জন্য এ সব আকাবিরগণের রেসালার কোনা বিকল্প নেই। এ সব একেবারে যাদুর মত কাজ করে।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে আর একটি কথা বলতে হয়। সম্ভবত আমি যখন শরহে জামি পড়ি, তখন হঠাৎ করেই আমার লেখা পড়ায়, কিতাব মুতালাআয় বিরাট পরিবর্তন দেখা দিল। মোটেই পড়া লেখায় মন বসাতে পারছিলাম না। নিচের ক্লাস গুলোতে মাওলানা ফজলুল হক আমিনী থেকে আমার অনেক বিষয়েই নম্বর বেশী উঠত। তিনি অত্যন্ত জায়্যেদ ছাত্র ছিলেন। কখনও কখনও তিনি নম্বরে আউয়াল আর নয়তো আমি নম্বরে আউয়ালে থাকতাম। কিন্তু এ বছর কিছুতেই পড়ায় মন বসছিল না। পড়তে বসলেই মনে কেমন এক অস্বস্তি এসে সব মনোযোগ চিলের মত ছোঁ মেরে নিয়ে যেত। পরীক্ষা এল। একদিকে পড়তে একদম মন চায় না, অন্যদিকে আবার নম্বরে আউয়াল হবার দূর্বার আকাঙ্ক্ষা। উভয় সংকটের অকুল পাথারে সামান্য মনোবলের ভেলা ভাসিয়ে কয়েকদিন চললাম। সদর সাহেব হুযুর কাছে নেই। বাড়িতে রয়েছেন।

কিছুদিন পর উপায় না দেখে হালাত জানিয়ে চিঠি লিখলাম। উত্তর এল অল্প দিন পরেই। চিঠিতে সদর সাহেব (রহঃ) চমৎকার একটা ওষুধ দিয়ে দিলেন। লিখলেন, "এসব কিছু না। মাঝে মাঝে এমন হইয়া থাকে। তুমি এক কাজ করিও। জোর করিয়া মুতালাআয় মন বসাইতে চেষ্টা কর। এই অবস্থাটা খারাপ নফসের, তাই নফসের বিরুদ্ধে তৎপর হইতে হইবে। যখনই খারাপ লাগিবে তখনই মনে করিবে মুতালা'আর এইটাই সময়। আগে মুতালা'আ করিয়া লই, পরে অন্য কাজ। এমন করিয়া অল্প হইলেও মুতালা'আ করিবা। রাত্রিতে শোয়ার পরও এ অবস্থা হইলে সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া পড়িবা। ওযু করিবা। পারলে দুই রাকাত নামায পড়িবা। ইহার পরে কিতাব লইয়া বসিবা। এমন আমল করিতে থাক। ইনশাআল্লাহ বর্তমান অবস্থা দূর হইয়া যাইবে।"

হযরতের এই পরামর্শ যে আমার মধ্যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে দিয়েছিল, আজো তার পরিবর্তন হয়নি। সারাটা ছাত্র জীবনে আর সে

www.pathagar.com

সমস্যার সম্মুখীন হইনি। লালবাগে পড়াই, সংসার চালাতে হয়, অনেক ঝামেলা। এর পরও আমার মাঝে মুতালা'আর এতটুকু ভাটা পড়েনি। মুতালা'আর দূর্ণিবার আকাঙ্ক্ষা আমার সারাক্ষণ থাকে। অনেক সময় মন চাইলেও পারি না ঝামেলার কারণে। সেটা ভিন্ন কথা। কিন্তু সেই মুতালা'আর প্রতি অমন অনিহা ভাব আর কোন দিন হয়নি।

যা হোক বলছিলাম। রমযানে তিনি আমাদের রুটিন মত কাজ করাতেন। সেখানে তিনি আরেকটা কাজ করাতেন। উর্দূর ব্যাকরণ পড়াতেন। প্রতিদিন তিনি ব্যাকরণ পড়িয়ে দু'তিনটা শব্দ দিয়ে বলে দিতেন এমন করে আরো কয়েকটা বানাইয়া আনিবে। তিনি উর্দূর উপর জোর দিতেন। আবার বাংলা ভাষা ও সাহিত্য মাদ্রাসা শিক্ষিতদের দখলে আনার জন্য আজীবন প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন।

ঐ রমযানে হুযুর আমাকে তফসীরও পড়িয়েছিলেন। মা'আরেফুল কোরআন, ইবনে কাসির সহ আরো কয়েকটা তফসীর গ্রন্থ মাদ্রাসা লাইব্রেরী থেকে তুলিয়ে নিয়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ পড়তে দিতেন। এতে কি বুঝলাম তা তিনি বাংলায় লিখে নিতে বলতেন। কোথাও ভুল হলে শুধরে দিতেন। অনুবাদও শিখিয়ে ছিলেন। আমাকে উর্দূ থেকে বাংলা অনুবাদ লিখে দেখাতে বলতেন। আমি উর্দূ চৌথী নামে এক খানা কিতাব থেকে একটি চ্যাপ্টার অনুবাদ করে নিয়ে হুযুরকে দেখালাম। হুযুর অনেক কাটলেন আর বললেন, সব কাজ সহজ থেকে শুরু করতে হয়। সহজ উর্দূ থেকে অনুবাদ করবে। পরে আমি তালীমুল ইসলাম না উর্দূ তেসরী কিতাব থেকে অনুবাদ করে দেখিয়েছিলাম। হুযুর দু'একটা সংশোধন করে দিয়েছিলেন। হুযুরের হাতের সেই সংশোধিত একটি খাতা আজও আমার হাতে আছে।

প্রশ্ন: আপনার প্রত্যেকটি স্মৃতি আমাকে দারুন ভাবে চমৎকৃত করেছে। আপনার কথাগুলো আমাদের ছাত্রভাইদের জন্য অমূল্য সম্পদ। কিন্তু আপনি মনে হয় ভুলে গেছেন যে, আমি জানতে চেয়েছিলাম, হযরত রমযানটা কিভাবে কাটাতেন? অর্থাৎ রমযান মাসে কি কি আমল করতেন এবং কখন কখন?

উত্তর: রমযানের দিনে তিনি যখন আমাদের পড়াতেন, লেখা দেখতেন আমরা শুধু তখনই হুযুরকে দেখেছি। বাকি সময় তিনি বাড়ির ভেতরে থাকতেন। অতএব হুযুরের ব্যক্তিগত আমল সম্পর্কে তেমন কিছু জানতে পারিনি। কিংবা তখন জেনে থাকলেও এখন মনে পড়ছে না।

www.pathagar.com

একটু আগে আপনি আমার প্রশ্নের উত্তরে বললেন, হুযুর উর্দূ শেখার প্রতি গুরুত্ব দিতেন। আবার তিনি বাংলার জন্য জীবনভর নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন। এই দু'য়ের মধ্যে কোন তা'আরুজ বা বৈপরিত্য আছে? এ ব্যাপারে সদর সাহেবের মতামতটা স্পষ্ট হওয়া দরকার। কারণ এ নিয়ে আমাদের দেশের আলেমদের মধ্যে বিরাট অন্তর্দ্বন্দ্ব চলছে। কেউ বাংলাকে একেবারে সহ্যই করতে পারছেন না। (যদিও এরা নিতান্ত অল্প) আবার বিরাট একটা অংশ উর্দূর বড় কোন প্রয়োজনীয়তাও দেখতে পাচ্ছেন না। সব মিলিয়ে মনে হয়, অচিরেই এ দেশের আলেম সমাজের মধ্যে 'উর্দূ ছাড় বাংলা ধর' এমন একটা শ্লোগান খুব জনপ্রিয়তা লাভ করবে। হযরত সদর সাহেবের আয়নায় এ বিষয়টা আপনি কি ভাবে দেখছেন?

: হ্যাঁ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় সম্পর্কে আপনি প্রশ্ন করেছেন। ধন্যবাদ আপনাাকে। একটা মজার ব্যাপার হল, হযরত সদর সাহেব (রহঃ) আপনার উল্লেখিত দু'দলের কোন দলেই ছিলেন না। বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে, তীব্রভাবে তিনি বাংলাকে ভালবাসতেন। এবং অতিদ্রুত বাংলা ভাষা ও সাহিত্যাঙ্গণে বাংলাদেশের আলেম সমাজকে তিনি দেখতে চাইতেন। উর্দূ, আরবী এবং অন্যান্য ভাষায় লিখিত ধর্মীয় বই পত্র বাংলায় অনুবাদ করে এ দেশের প্রতিটি ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে আমার যতটা জানা আছে এ ব্যাপারে তিনিই সাহসী সৈনিকের মত এগিয়ে আসেন। যার বদৌলতে মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ) এর বেহেশতি জেওর, তালিমুদ্দীন ইত্যাদি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বইগুলো বাংলাদেশের মানুষের ঘরে ঘরে কোটি মানুষের ধর্মীয় অভাব অনেকখানি পুরণ করে চলেছে।

বাংলার চর্চা করার জন্য তিনি ফরিদাবাদে ইদারাতুল মা'আরিফ নামে একটি ব্যতিক্রম ধর্মী প্রতিষ্ঠানের গোড়া পত্তন করেছিলেন। অপর দিকে তিনি মাদ্রাসা শিক্ষাক্রমে উর্দূ ভাষার অনুপস্থিতিকেও মেনে নেননি। কারণ আমাদের পাওয়ার হাউজ হচ্ছে দেওবন্দ। ঐ এলাকার যুগশ্রেষ্ঠ আলেমদের দ্বারা যতগুলো কিতাবাদি প্রণীত ও অনূদিত হয়েছে, তার একাংশও আমাদের বাংলাভাষায় অনূদিত হয়নি। এর জন্য যদিও এদেশের আলেম সমাজই দায়ী তারপরও একটা কথা থেকে যায়। বাংলা আমার মায়ের ভাষা, প্রাণের ভাষা। আমরা ভাষার প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা রেখেই নির্দিধায় বলছি, আরবী, ইংরেজী, উর্দূ আমাদের জানা মতে যতটা সমৃদ্ধ বাংলাভাষা ততটা নয়। আমাদের বাংলাভাষায় ব্যবহৃত মোট ৫৩,৮৫০টি

www.pathagar.com

শব্দের মধ্যে আরবী-ফারসী শব্দই হচ্ছে ২,৫০০এর মত। তৎসম ও অ তৎসম প্রায় ৫০,০০০ এর মত। তাছাড়া তুর্কী, ইংরেজী, পর্তুগিজ স আরো অন্যান্য শব্দ তো আছেই। এতে বুঝা যাচ্ছে বাংলা একক ভাে সমৃদ্ধ নয়। উর্দূ আরবীর কাছাকাছি একটি ভাষা। আরবীর অনুবাদ উদূে করলে আরবীর মাফহুম যতটা আয়ত্ব হয় বাংলায় তা হয় না। কুরআন হাদীসের অর্থ এতটা সেনসিটিভ বা স্পর্শ কাতর যে, এর অনুবাদে যা পুরোপুরি ঐ বিষয়টি প্রকাশ করা না যায় তাহলে কোন না কোন ধর্মী বিরাট ক্ষতি হতে বাধ্য।

মাদ্রাসা শিক্ষা নিরেট ধর্মীয় শিক্ষা হিসেবে এখনও পরিচিত। এবং সত্যং বটে। অতএব, মাদ্রাসা শিক্ষায় সঙ্গত কারণেই আরবী প্রাধান্য পাওয় দরকার। কারণ, কোরআনের ভাষা আরবী, নবীর হাদীসও আরবী কোরআন হাদীসের ব্যাখ্যা অনুবাদ এবং এ সম্পর্কীত কিতাবাদি পূঙ্খানুপুঙ্খ বুঝবার জন্য উর্দূর বিরাট ভূমিকা অনস্বীকার্য। তাই সদ সাহেব (রহঃ) উর্দূর উপর অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন। সদর সাহেবের এ সমন্বিত নীতিই এদেশের আলেম সমাজের হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন: আপনার কষ্টের মাত্রা আমি শুধু বাড়িয়েই চলেছি। এবার হযরতের সাথে আপনার শেষ সাক্ষাতের তাৎপর্যপূর্ণ কিছু থাকলে সংক্ষেপে বলুন।

উত্তর: জ্বি, হুযুরের সাথে আমার শেষ সাক্ষাতটি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। আমি দাওর শেষ করেছি। খুব সম্ভব হুযুর যে বছর ইন্তেকাল করেছেন তার আগের রমযান। আমি হুযুরের নিকট গিয়েছিলাম করাচী যাবার জন্য বিদায় নিতে। বিদায় নিতে গিয়ে শেষ বারের মত মন চাইল না জলদি এসে পড়তে। দু'দিন থাকলাম। আসার সময় হুযুর আমাকে কিছু উপদেশ দিলেন। সেগুলো আমি ডাইরীতে লিখেও রেখেছিলাম, কিন্তু কিভাবে যে হারিয়ে ফেললাম তা বলতে পারছি না। সে উপদেশ গুলির মধ্যে আমার স্মরণ আছে তিনি বলেছিলেন, ছোট ছোট মাছ খাইবা, তাতে খরচ কম ফল বেশী পাইবা। কখনও ফুযুল খরচ করবা না। পান খাইবা না। ইহ "আল-ইলতেযামু মা- লাম ইয়ালযাম" খাইলে প্রয়োজন না খাইলে কিছুই না। একটি অপ্রয়োজনীয় বস্তুকে প্রয়োজনীয় করে নেওয়া। এর পর আমাকে অনেক আদর সোহাগ করে বিদায় দিয়েছিলেন। ঐ রমযানেই হুযুর গ্রামের ছোট বড় সবার নিকট থেকে ডেকে ডেকে ক্ষম চেয়েছিলেন।

www.pathagar.com

আর একটি উপদেশ আমার মনে আছে। হুযুর যার তার বই পড়তে কড়া নিষেধ করে দিয়েছিলেন। ছাত্রদেরকে এর পূর্বেও হুযুরকে না দেখিয়ে কোন বই পড়তে দিতেন না। এমন কি সাধারণ মুসলমানদেরকেও হুযুরের বয়ানে মাঝে মাঝেই ধর্মীয় কোন বই-পত্রের কথা বলে দিতেন। ভাল মুহাক্কেক কোন আলেমকে না দেখিয়ে পড়তে নিষেধ করে দিতেন। কেননা পাঠকের মধ্যে লেখকের ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-চেতনা তার অজান্তেই প্রভাব ফেলে।

এরপর আমি করাচীতে চলে গেলাম। করাচী যাওয়ার এক বছর পর মাওলানা ইউসুফ বিননূরী (রহঃ) এর নিকট টেলিগ্রামের মাধ্যমে খবর গেল যে, হুযুর ইন্তেকাল করেছেন। নূরী সাহেব বাঙ্গালী ছাত্রদের জানিয়ে দিলেন। তখন যে আমার এবং মাওলানা ফজলুল হক আমিনীর অবস্থা এমন হয়েছিল যা ভাষায় প্রকাশ করার মত না। আমরা ঐ দিন আসতেও পারলাম না মনকে প্রবোধ দিতেও পারলাম না। আমরা হায়দারাবাদের টেন্ডুলওয়ায় হযরত মাওলানা যাফর আহমদ উসমানীর (রহঃ) নিকট চলে গেলাম। সেখানে কয়েকদিন কাটালাম। আমাদের দিলী হালত জানালাম। হুযুর আমাদের এমন শান্তনা দিয়েছিলেন যে, হযরত সদর সাহেব (রহঃ) এর ইন্তেকালে আমরা যেরূপ শোকাহত হয়েছিলাম তাঁর শান্তনায় আমাদের সে অবস্থার পরিবর্তন হয়েছিল।

প্রশ্ন : আপনাকে অনেক কষ্ট দিয়ে ফেলেছি। আপনার কাছ থেকে অনেক কিছু জানতে পারলাম বলে আপনাকে আমার এবং মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী স্মারক গ্রন্থের ব্যবস্থাপক মাওলানা সালমান সাহেবের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

উত্তর : আমার হযরতের এ সব স্মৃতি স্মারক গ্রন্থের মাধ্যমে জন সাধারণের মাঝে তুলে ধরার সুযোগ করে দিয়েছেন এ জন্য আমি আন্তরিক শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি মাওলানা সালমান সাহেবের। তাঁকে আমার সালাম। গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের মাধ্যমে আমাকে হযরত সদর সাহেবের প্রয়োজনীয় কথা গুলো স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ। আপনি মনে হয় প্রয়োজন মনে করছেন না বলেই এ বিষয়ে কোন প্রশ্ন করেননি। আমি মনে করি এ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বর্তমানে কিছু কিছু লোক হযরত সদর সাহেবের ভুল সংশোধন বইটি অস্বীকার করছেন। তারা বলছেন এ বই হুযুর লেখেননি। তাদের এ দাবী সম্পূর্ণ ভুল এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত। যাদের ভুল হযরত সদর সাহেব এতে সংশোধন করেছেন তারা সংশোধন হতে চান না এবং এ মন

www.pathagar.com

মানসিকতাই রাখেন না। তারা এমন একটি স্পষ্ট বিষয়কে সম্পূর্ণ অস্বীকার করলে এছাড়া আমরা আর কি বুঝব?

ভুল সংশোধন বইটি হযরত একেবারে আমার এবং আমাদের সামনে লিখেছেন। এমনকি তিনি লিখতে সময় প্রায়ই আমাদের বলতেন, "দেখিয়া লও, মওদূদী সাহেবের এই বক্তব্যের বিরুদ্ধে আমি এই শব্দ ব্যবহার করিলাম। এই খানে এই শব্দ ব্যবহার না করিয়া এই শব্দ ব্যবহার করিতে পারিতাম কিন্তু কেন করিলাম না, এই শব্দই কেন ব্যবহার করিলাম তাহা ভাল করিয়া বুঝিয়া লও। এই লইয়া কথা উঠিতে পারে তখন হয়তো আমি থাকিব না। তোমাদেরই তখন ইহার জবাব দিতে হইবে।" এসব অনেক কথাই বলতেন। এই বই লেখার সময় ছাত্রদের কয়েকজনকে প্রায় সময় ডেকে নিতেন এবং বুঝিয়ে দিতেন। লেখা শেষ হবার পর এই বই দ্রুত প্রকাশের জন্য হুযুর সংশ্লিষ্ট সবাইকে পুনঃপুনঃ তাকিদ দিতেন। হুযুরের এত আকাঙ্ক্ষা লক্ষ্য করে বহু প্রতিকুলতাকে উপেক্ষা করে এই বই প্রকাশের দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া হয়।

পান্ডুলিপি প্রেসে যায়। কিন্তু হুযুর দেখে যেতে পারলেন না এ বইয়ের ছাপা কপি। চির বিদায় নিলেন দুনিয়া থেকে। এ বই প্রকাশের জন্য যারা সক্রিয় উপস্থিত ছিলেন তাদের মধ্যে আমার যতটা মনে হয়, বেফাকুল মাদারিসের মহাসচিব মাওলানা আব্দুল জব্বার সাহেব বর্তমানে ঢাকাতেই আছেন। এমন জাজ্বল্যমান একটা বিষয়কে এভাবে অস্বীকার করা সত্যিই দুঃখজনক এবং সংকীর্ণ মনের পরিচায়ক। আপনি এ বিষয়টিও আপনার স্মারকে উল্লেখ করতে পারেন এবং করলে আমি খুশী হব।

সাক্ষাতকার গ্রহণে- নাকীব আশরাফ

=০০০=

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়

হযরত ফরিদপুরীর (রহঃ) রচনাবলী হতে

www.pathagar.com

সূচীপত্র

{হযরত ফরিদপুরীর (রহঃ) রচনাবলী হতে }

১। তাফসীরে কোরআনুল কারীম হতে
২। হাদীস শরীফ হতে
৩। জীবনের পণ
৪। মসজিদ
৫। শক্তির উৎস কোথায়?
৬। আমপারার ভূমিকা
৭। পাঞ্জসূরার ভূমিকা
৮। বোখারী শরীফের ভূমিকা ও পরিচিতি
৯। মাওলানা নূর মোহাম্মদ আযমী (রহঃ) অনুদিত
মেশকাত শরীফ সম্পর্কে সদর সাহেব (রহঃ)-এর অভিমত
১০। হায়াতে মাদানী গ্রন্থের ভূমিকা
১১। হায়াতুল মুসলিমীন গ্রন্থের ভূমিকা
১২। হায়াতুল মুসলিমীন গ্রন্থের পুর্বাভাষ
১৩। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে নারী গ্রন্থের ভূমিকা
১৪। এলমের ফযীলতের অবতরণিকা

www.pathagar.com

তফসীরে কোরআনুল কারীম হতে

শান্তি কোথায়?

মানুষ যতই অগাধ সম্পত্তির মালিক হউক না কেন, যতই বিশাল রাজ্যের অধিকারী হউক না কেন, যত বড়ই বিদ্বান, যত বড়ই ডিগ্রীধারী হউক না কেন কিন্তু তার জীবনে শান্তি হইবে না যাবৎ না তার অন্তরের অন্তর্নিহিত প্রশ্নাবলীর উত্তর সে না পাইবে, যাবৎ না তার জীবনের মৌলিক প্রধান সমস্যাবলীর সমাধান সে না পাইবে।

মানুষের জীবনের সমস্যা কি?

মানুষের মনে সব সময় এই প্রশ্ন জাগে, সর্বদা তার ভিতর হইতে মনে কামড় মারে যে–

(১) হে মানুষ! তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ? তুমি কি নিজেই নিজের স্বাধীন স্রষ্টা? না তোমার অন্য একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন । যাঁহার অধীনে তুমি আছ এবং তিনি পাঠাইয়াছেন বলিয়াই তুমি এখানে আসিয়াছ।

(২) দ্বিতীয় প্রশ্ন স্বাভাবিক ভাবেই মানুষের মনে জাগে যে, জীবন কি এখানেই শেষ- না এর পরেও কিছু আছে? এটা পথের মধ্য, এটা আসল নয়। আসল বাড়ী আসল ঠিকানা, আসল মন্‌যিলে মকসুদ সামনে আসিতেছে। ইহা যখন দেখা যাইতেছে যে স্থায়ী নয়- অস্থায়ী, ক্ষণস্থায়ী, তখন এর সামনেরটা কি স্থায়ী? সেটা কি চিরস্থায়ী? এখানে যখন শান্তি নাই, এখানকার সব জিনিসই যখন মিশাল, ভেজাল শান্তির সঙ্গে দুঃখ মিশ্রিত, তবে কি অবিমিশ্রিত শান্তি নাই? না আছে? না সে সম্পূর্ণ দায়িত্বহীন। দায়িত্বহীন বলিয়াও তা মনে হয় না, তবে তার সে দায়িত্ব কি এবং কার তরফ হইতে সে দায়িত্ব এবং সে দায়িত্বের বিচার আছে কি না? সে বিচার কে করিবে?

(৩) মানুষের সে দায়িত্ব পালনের জীবন ব্যবস্থা কি সে নিজেই রচনা করিবে? না অন্য কোন মানুষের রচিত জীবন ব্যবস্থা সে গ্রহণ করিবে? না তার যিনি সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা, পালনকর্তা, যাঁহার নিকট তাহার জীবনের হিসাব দিতে হইবে, যিনি সকলের জন্য সহনশীল, দয়ালু, সকলের জন্য একই রকম ন্যায়পরায়ণ, তিনিই দিবেন সেই জীবন ব্যবস্থা। এই তিনটি মৌলিক প্রশ্নের সঠিক উত্তর এবং মানব জীবনের বুনিয়াদি এই তিনটি সমস্যার নির্ভুল সমাধান যে পর্যন্ত মানুষ না পাইবে, সে পর্যন্ত মানুষের মনে শান্তি আসিতে পারে না। সমস্ত কোরআনের এই তিন প্রশ্নেরই উত্তর এবং এই সমস্যারই সম্পূর্ণ

www.pathagar.com

সামঞ্জস্যপূর্ণ ও ভারসাম্য রক্ষাকারী সমাধান অতি সুন্দর ভাষায় বিশদভাবে বর্ণ করা হইয়াছে। কোরআন একটি বিশাল সমুদ্র, কিন্তু সূরা-ফাতেহার মধ্যে তা সব নির্যাস অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করা হইয়াছে। যেমন, ক্ষুদ্র একখানা আয়না ভিতর বিশাল আকৃতি প্রতিবিম্বিত হয়, তদ্রূপ সূরায়ে-ফাতেহার ভিতরও বিশা কোরআন প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। আল্লামা আলুছি তাহার বিশ্ববিখ্যাত "রূহুল মাআনী" নামক তফসীর গ্রন্থে লিখিয়াছেন: সারা কোরআনে যেরূপ চারি প্রকারের এলম বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, সূরা ফাতেহাতেও তদ্রূপ সেই চারি প্রকারের এল্‌মের (জ্ঞানের) দিকে অতি সংক্ষেপে ইঙ্গিত করা হইয়াছে এই জন্যই ইহাকে "উম্মুল কোরআন" বলা হয়। সেই চারি প্রকারের এল্ম এই—

(১) এলমুল আকায়েদ, অর্থাৎ, আল্লাহর যাত ও ছিফাৎ সম্বন্ধে, তৌহীদ রেসালাত ও কিয়ামত সম্বন্ধে সত্য কি, তা স্বয়ং সৃষ্টি কর্তার মুখে জানিয় তদনুযায়ী দেলের একীনী বিশ্বাস ও আকীদা মজবুত করিয়া তাহার উপর রচনা করিতে হইবে সমস্ত জীবনের সৌধকে। সমস্ত কোরআনে এই সত্য কয়টিকে অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে অনেক রকমের যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা বিশদভাবে বুঝান হইয়াছে। "আল-হামদু লিল্লাহি রব্বিল আ'লামিন আর-রহমানির রহীম, মা-লিকি ইয়াওমিদ্দীন," -এর মধ্যে তাওহীদ ও কিয়ামতের বিচারের কথা বর্ণনা করা হইয়াছে। "ছিরাতাল্লাযিনা আন্‌আমতা আলাইহিম" এর মধ্যে রেসালাতের কথা বর্ণনা করা হইয়াছে।

(২) এলমুল ফিকাহ্- অর্থাৎ সত্য ভিত্তি গঠন করিয়া তার উপর জীবন-সৌধকে কিভাবে রচনা করিতে হইবে, গোটা মানব জীবনকে কিভাবে রচিত ও পরিচালিত করিতে হইবে, কিভাবে আল্লাহ্‌র বন্দেগী করিতে হইবে কিভাবে আল্লাহ্‌র দাসত্বের জিন্দেগী (ব্যক্তিগত জিন্দেগী সমাজগত জিন্দেগী পারিবারিক জিন্দেগী) যাপন করিতে হইবে, সে সব বিষয় সমস্তই কোরআন শরীফে বিশদভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। সূরা-ফাতেহার (ইয়া কা না'বুদ)-এর ভিতর এদিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

(৩) এলমুল আখলাক বা চরিত্র নীতি, অর্থাৎ মানুষ এ দুনিয়াতে আসিয়া কার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিবে, কিরূপ ব্যবতহার করিলে তার মানবতার উন্নতি সাধন হইবে, নতুবা সে ইতর প্রাণীর পর্যায় ভুক্ত হইয়া যাইবেঃ এই কথা সারা কোরআনে যা বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে, সূরা ফাতেহায়--"ওয়া ইয়াকা নাস্তায়িনু ইহ্ দিনাস সিরাতাল মুস্তাকীম" এর মধ্যে তার সার নির্যাসের দিকে ইঙ্গিত হইয়াছে। আল্লাহর কাছ হইতে নিতে হইবে তার জীবন বিধান। সেই জীবন-বিধানই হইবে পরম সুন্দর এবং পূর্ণ সঠিক। তাতে যে চরিত্র ও

www.pathagar.com

নীতি থাকিবে সেটা পূর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষাকারী এবং পূর্ণ ভারসাম্য রক্ষাকারী হইবে; এক বিন্দুও এদিক বা ওদিক বুঝান হইবে না।

(৪) এলমূল কসাস বা ইতিহাস শাস্ত্র। মানুষের উত্থান-পতনের ইতিহাস না জানিলে, উত্থান-পতনের কারণ বিশ্লেষণ বুঝেনা আসিলে বা অন্য কথায় কে পথের সাথী? কে পথের দুশমন? তাহা চিনিতে না পারিলে- কাহার অনুকরণ অনুসরণ আমি করিব, কাহার কুসংসর্গ আমি বর্জন করিব, কেন করিব- এই ইতিহাসের তথ্যাবলী এবং ইতিহাস দর্শনের তত্ত্বাবলী যাহারা না জানিবে, তাহারা মানব জীবনে সফলকাম ও উন্নতি করিতে পারিবে না। সেই জন্য কোরআনে বহু ঐতিহাসিক ঘটনাবলী বর্ণনা করা হইয়াছে। কাহারা সৎপথ অবলম্বন করিয়া জীবনকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছে এবং কাহারা অসৎপথ অবলম্বন করিযা জীবনকে বিড়ম্বিত ও অভিশপ্ত করিয়াছে, এসব বহু ঐতিহাসিক ঘটনা কোরআনে বর্ণিত হইয়াছে। অতি সংক্ষেপে সূরা-ফাতেহার মধ্যে সেদিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে- সিরাতাল্লাযিনা আ'নআমতা আলায়হিম গায়রিল মাগ'দূবি আলায়হিম ওয়ালাদ দোয়াল্লিন। অর্থাৎ– তাহাদের পথে চলিতে হইবে আমাদের, যাহারা সৎপথে সঠিক চলিয়া আল্লহর অনুগ্রহ লাভ করিয়া জীবনকে সাফল্য মণ্ডিত করিয়াছেন। তাহাদের পথে নয়, যাহারা ঔদ্ধত্য দেখাইয়া বা অলসতা, অবহেলা করিয়া জীবনকে বিভ্রান্ত, বিফল ও অভিশপ্ত করিয়াছে।

(তফসীরে সূরায়ে ফাতেহা)

হাদীস শরীফ হতে

ঈমানের হাকিকত বা তাৎপর্য

মানুষের মধ্যে শুধু জ্ঞান ও বিবেক রত্নই নহে, বরং কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি রিপুও আছে। যাহারা সাধনা করিয়া, সংযম অভ্যাস করিয়া জ্ঞানের দ্বারা রিপুকে জয় করিতে পারেন, তাহারাই মানুষ হইতে পারেন নতুবা শুধু জ্ঞান অর্জনের দ্বারা মানুষ প্রকৃত মানুষ হইতে পারে না। হেরাক্লিয়াস ইতিপূর্বে আসমানী কিতাবের বা জ্যোতিযশাস্ত্রের প্রমাণ অনুসারে ভাবাবেগ বশতঃ যাহা কিছু মন্তব্য করিয়াছিলেন, তাহার মূলে শুধু তাহার জ্ঞান ও পরিচয় লাভই ছিল। কিন্তু ঈমান রত্ন হাসিলের জন্য শুধু ভাবের উদয় ও জ্ঞানই যথেষ্ট নহে, বরং উদীয়মান ভাব ও জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে সর্ব প্রকার ভয়-ভীতি, মোহ ও লালসা এবং সামাজিক বিধিবন্ধন ও সংস্কার ইত্যাদিকে বিসর্জন দিয়া ত্যাগ স্বীকার করত পূর্ণভাবে আল্লাহ এবং আল্লার রসুলের প্রতি আত্মসমর্পন ও আনুগত্য স্বীকার করা

www.pathagar.com

এবং জীবনের সর্বস্তরে সেই আনুগত্য প্রয়োগের প্রস্তুতি মনে-প্রাণে গ্রহণ করা আবশ্যক। ইহা ব্যতিরেকে ঈমানও হাসিল হয় না, মুক্তিও পাওয়া যায় না। স্বার্থোদ্ধার বা স্বার্থহানির অপচিন্তা কিংবা সামাজিক বিধিবন্ধন ও সংস্কারের মোহ ইত্যাদির সংঘর্ষের সময় নফসের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে পূর্ণ আত্মসমর্পন ও আনুগত্য স্বীকার এবং মনে প্রাণে সেই আনুগত্যের প্রস্তুতি গ্রহণ করা ব্যতিরেকে যে ঈমান হাসিল হয় না, তাহার প্রমাণ কোরান শরীফেই পরিস্কার উল্লেখ রহিয়াছে। -ইয়ারিয়ুনাহু কামা ইয়ারিফুনা আবনা আকুম "ইহুদী ও নাসারাদের মধ্যে এমন বহু লোক আছে, যাহাদের রাসুলুল্লার পরিচয় ও জ্ঞান এরূপ হাসিল রহিয়াছে যেরূপ তাহাদের স্বীয় সন্তান সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট পরিচয় হাসিল আছে।" কিন্তু যেহেতু তাহারা এই পরিচয় ও জ্ঞানের সঙ্গে আত্মসর্মপণ ও পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করে নাই, তাই তাহারা ঈমানদার গণ্য হয় নাই- কাফেরই রহিয়া গিয়াছে।

হেরাক্লিয়াসের জ্ঞান ছিল, ভাবাবেগও অত্যধিক, কিন্তু স্বার্থের লোভ ও রাজত্বের চিন্তা ছিল ততোধিক। যদি তিনি এই স্বার্থের লোভ ও রাজত্বের মোহ সত্যের খাতিরে ত্যাগ করিতে পারিতেন, তবেই তিনি মুক্তি পাইতেন। কিন্তু তিনি তাহা করিতে পারেন নাই। যখন তিনি দেখিলেন যে সত্যকে স্বীকার করিয়া লইলে তাঁহার স্বার্থে আঘাত লাগিবে, রাজত্ব চলিয়া যাইবে, তখই তিনি উদীয়মান ভাবকে প্রতিহত করিতে লাগিলেন এবং কথাবার্তার মধ্যে "যদি আমি বুঝি" ইত্যাদি দুর্বলতা ভাব প্রকাশ করিলেন। অবশেযে স্ব-উদিত ভাব কে সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন দিলেন এবং দেশবাসিকে যে সত্যের ডাক শুনাইয়াছিলেন, উহার বিকৃত অর্থ করিয়া অবিচলিত চিত্তে সত্য ধর্ম গ্রহণ করার মত সৎসাহস হইতে বিরত রহিলেন। কাজেই তিনি ইসলাম ও ঈমান রত্ন হইতে বিরত রহিলেন। কাজেই তিনি ইসলাম ও ঈমান রত্ন হইতে বঞ্চিত থাকিয়া গেলেন। পক্ষান্তরে অবিচলরুপে অকাতরে এবং নির্ভয়ে সত্যকে গ্রহণ করার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হেরাক্লিয়াসের বন্ধুর ঘটনায় সুন্দররূপে উপলব্ধি করা যায়, যাহা ছিল প্রকৃত ঈমান।

জীবনের পণ

মুসলমান কাকে বলে? বা মুসলমান শব্দের অর্থ কি?

আমি আমার সারা জীবন, আমার স্বাস্থ্য, আমার শক্তি, আমার সম্পত্তি, আমার যথাসর্বস্ব সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর আনুগত্যের ভিতর থাকিয়া খরচ করিব। আল্লাহর আনুগত্যের বাহিরে খরচ করিবে না। এই অঙ্গীকার করিয়া যে মুসলমান জাতিভুক্ত হয়, তাহাকে বলে মুসলমান।

www.pathagar.com

এই আনুগত্যের আদর্শ হইবে- একমাত্র মোহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আদর্শ, অন্য কারুর আদর্শ গ্রহণ করিব না এবং উদ্দেশ্য হইবে শুধু ক্ষণস্থায়ী ছোট জীবনের আনন্দ ভোগ নয়। বরং মানুষের দুনিয়া আখেরাতের ব্যাপক জীবনময় শান্তি ও মুক্তি।

সাধনা

(রেয়াজত ও মোজাহাদা)

সাধনা ব্যতিরেকে সিদ্ধিলাভ হয় না, কষ্ট ব্যতিরেকে মিষ্ট পাওয়া যায় না, মোজাহাদা না করিয়া মোশাহাদা হাসেল করা যায় না, এ কথাগুলি সর্ববাদী সম্মত সত্য। এ জন্যই কোরআন পাকের মধ্যে বার বার মানুষকে কষ্টের মধ্যে ঢুকিতে, কষ্ট দেখিয়া পিছপা না হইতে তাকিদ করা হইয়াছে। কিন্তু বিনা উদ্দেশ্যে বিনা আদর্শে কষ্ট করায় কোন ফলই নাই। উদ্দেশ্য আল্লাহকে রাজী করা। আদর্শ নবী-জীবন। কোন কষ্টে ফল আছে? আল্লাহকে রাজী করার উদ্দেশ্যে নবী-জীবনের আদর্শ অনুসারে মনের বিরুদ্ধে সংযম অভ্যাস করিতে (নফসের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে) যে কষ্ট হয়, সেই কষ্টেই মিষ্ট পাওয়া যায়। সেই কষ্টেই ফল লাভ হয় এবং তাহাকেই বলে মোজাহাদা। মোজাহাদা দ্বারাই হাছেল হয় 'মোশাহাদা'। অর্থাৎ আল্লাহর দিদার।

মানুষকে মানুষ হইতে হইলে প্রথমে তাহার (১) দৃঢ় হইতে হইবে। (২) তারপর তাহার নফসে আম্মারার সঙ্গে জিহাদ করিতে হইবে। (৩) মনে যা চায় মনকে সেদিক হইতে ফিরাইয়া রাখিয়া খোদার ভয়ে, খোদার ভক্তিতে খোদার রেজামন্দির কাজে লাগানোর নামই তাকওয়া। তাকওয়া হাসিল করার পথে অতি বড় সহায়ক হয় সৎ সংসর্গ। এবং আল্লাহর যিকির অর্থাৎ আল্লাহর যাবতীয় মহৎ গুণাবলী স্মরণ করিয়া সদাসর্বদা মনে মুখে আল্লাহকে ইয়াদ রাখা। এই তরতীব ও এই নিয়ম অনুসারে কাজ না করিলেই মানুষ পশুর চেয়েও অধম হইয়া যায়।

বায়াতনামা বা জীবনের পণ

বায়াত, অঙ্গীকার, প্রতিজ্ঞা, জীবনের পণ। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। আমি অঙ্গীকার করিতেছি, চুক্তিনামা লিখিয়া দিতেছি, প্রতিজ্ঞা করিতেছি, জীবনের জন্য পণ করিতেছি ঃ-

(১) এক আল্লাহ ছাড়া আমার কোন মাবুদ নাই, অর্থ :- আমি এক আল্লাহর দাসত্ব করিব। তাছাড়া অন্য কারুর (নফসের, শয়তানের, অর্থের, স্বার্থের, স্ত্রী-বিলাসিতার) দাসত্ব করিব না। আল্লাহর হুকুম পালন করিব, আল্লাহর

www.pathagar.com

হুকুমের বিরোধিতা করিব না। আমার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য আল্লাহ, তাছাড়া অন্য কিছুই আমার জীবনের চরম লক্ষ্য নয়।

(২) এই লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য একমাত্র লাইন ও পথ মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর পথ। অতএব আমার জীবনের প্রতিজ্ঞা এই যে, আমি জীবনের সর্বক্ষেত্রে একমাত্র মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর আদর্শ (সুন্নত, তরিকা, পথ, লাইন) গ্রহণ করিব। তাছাড়া অন্য কাহারও আদর্শ, অন্য কাহারও তরিকা জীবনের কোন ক্ষেত্রে গ্রহণ করিব না।

(৩) অতএব আল্লাহর হুকুম এবং রাসূলের আদর্শ আমাকে জানিতেই হইবে। আল্লাহর হুকুম আছে আল্লাহর কোরআনে, রাসূলের আদর্শ ও রাসূলের আজীবন কার্যাবলী রহিয়াছে। অতএব, কোরআনে আজীয এবং রাসূলের পবিত্র হাদীস সম্বন্ধে জ্ঞান আমাকে অর্জন করিতেই হইবে। অন্যথায় আমার আধ্যাত্মিক জীবন, নৈতিক জীবন, রাজনৈতিক জীবন, পারিবারিক জীবন, অর্থনৈতিক জীবন, আন্তজার্তিক জীবন, সামাজিক জীবন, ব্যক্তিগত জীবন কোন কিছুই ঠিক হইবে না।

সব কাজের গোড়ায় অন্তরের অন্তস্থলে অচল অটলভাবে আমার এই বিশ্বাস রাখিতে হইবে যে, আমি আল্লাহর কাছ থেকেই আসিয়াছি এবং আবার তাহার কাছেই ফিরিয়া যাইতে হইবে এবং সারাটি জীবনের হিসাব আল্লাহর কাছেই পলেপলে দিতে হইবে। অস্থায়ী ও ক্ষণস্থায়ী জীবনের ভাল কাজ করিলে তার ভাল ফল অনন্ত অফুরন্ত কাল পর্যন্ত চিরস্থায়ী জীবনে ভোগ করা যাইবে। তার নাম বেহেশত। আর মন্দ কাজ করিলে তার মন্দ ফলও ভোগ করিতে হইবে, তার নাম দোজখ। আল্লাহর হুকুমের এবং রাসূলের তরিকার মৌলিক বুনিয়াদ, ইসলামের মূল ভিত্তির কয়েকটি কাজের জীবন- প্রতিজ্ঞা করিতেছি।

আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে ঃ-

(১) আমি আল্লাহর হুকুমে পাঁচ ওয়াক্ত নামায রীতিমত পড়িব।

(২) আল্লাহর হুকুমে রমজান শরীফের রোজা রাখিব।

(৩) আল্লাহর হুকুমে হালাল রুজি উপার্জন করিবার জন্য মেহনত করিব। হালাল রুজি খাইব, হালাল রুজিতে আল্লাহ বরকত দিলে যাকাত পরিমাণ মাল হইলে আল্লাহর নামে যাকাত দিব।

(৪) মক্কা শরীফে যাতায়াত পরিমাণ মালে বরকত পাইলে আল্লাহর পবিত্র ঘর দর্শন করিয়া হজ্বে রায়তুল্লাহ করিব।

www.pathagar.com

(৫) আল্লাহর দ্বীন, রাসুলের তরিকা, ইসলাম ধর্মের পূর্ণ শরীয়তের এলম, আমল ও প্রচারের জন্য এবং মুসলিম জাতির দ্বীন ও দুনিয়ার উন্নতি ভালাইর জন্য সৎকাজে আদেশ, বদকাজে নিষেধের জন্য, মুসলমান সমাজকে ভাল ও চরিত্রবান করার জন্য জান মাল কোরবান করিয়া যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।

আরও প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে ঃ-

(১) মিথ্যা কথা বলিব না, ওয়াদা খেলাফ করিব না, কাউকে ধোকা দিব না, অঙ্গীকার ভঙ্গ করিব না, পরের ক্ষতি করিব না, চুরি করিব না, আমানতের খেয়ানত করিব না, ঘুষ খাইব না, সুদ খাইব না, জুয়া খেলিব না, নেশা পান করিব না। অপব্যয় করিব না। (চাকুরে হইলে) যে কাজের জন্য বেতন পাই, সে কাজে কোন ক্রটি করিব না। পাবলিকের সঙ্গে বা অধীনস্তদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার, পক্ষপাতিত্ব বা অবিচার অত্যাচার করিব না। মিথ্যা রিপোর্ট লিখিব না। (ব্যবসায়ী হইলে) মাপে কম দিব না, গ্রাহকের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করিব না। (কৃষক হইলে) আইল ভাঙ্গিব না। কাহারও ফসল নষ্ট করিব না। (শ্রমিক হইলে) কাজে ফাঁকি দিব না। (ভোটার হইলে) ধর্মদ্রোহী লোকের শরীয়ত বিরোধী লোকের সমর্থন করিব না। বিধর্মীকে সমর্থন করিব না। (বিচারক হইলে) মিথ্যা সাক্ষীর উপর নির্ভর করিয়া পক্ষপাত মূলক বিচার করিব না, সত্যাসত্য নির্ণয় করিতে চেষ্টার ক্রটি করিব না। (শাসক হইলে) দুষ্টের দমনে শিষ্টের পালনে ক্রটি করিব না। (আইন সংগঠক হইলে) শরীয়তের বিরুদ্ধে, কোরআন-হাদীসের বিরুদ্ধে কোন আইন বা উপধারা প্রণয়ন বা সমর্থন করিব না।

(২) জ্বেনা করিব না, কাম রিপুকে হাতের দ্বারা চোখের দ্বারা, বিশেষ অঙ্গের দ্বারা একমাত্র বিবাহিত স্ত্রী ব্যতীত অন্যত্র কুত্রাপি ব্যবহার করিব না। (স্ত্রীলোক হইলে) সমস্ত শরীর ও সৌন্দর্যকে পর পুরুষের দর্শন হইতে বাঁচাইয়া রাখিব।

(৩) কোন মুসলমানের সঙ্গে দাঙ্গা-হাঙ্গামা, ঝগড়া-ফাসাদ, শক্রতা করিব না, মুসলমানের মধ্যে একতা ভঙ্গ করিব না।

(৪) কোন মুসলমানের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিব না, মিথ্যা মোকদ্দমা করিব না, মিথ্যা তোহমত দিব না, অবিচার করিব না।

(৫) শরীয়তের আদেশ লঙ্ঘন করিব না, শরীয়ত মোতাবেক আমীরের বা কর্মকর্তার আদেশ লঙ্ঘন করিব না, একতা শৃঙ্খলা ভঙ্গ করিব না, এতায়াতে উলিল্ আমরের খেলাফ করিব না। (স্ত্রীলোক হইলে) স্বামীর তাবেদারীর ক্রটি করিব না।

www.pathagar.com

প্রতিজ্ঞা পালন না করিলে, সঙ্কল্প দৃঢ় না করিলে মানুষ কখনও কৃতকার্য হইতে পারে না। সেই জন্য প্রত্যেক মানুষের সঙ্কল্প দৃঢ় করিয়া অন্তত: এই প্রতিজ্ঞাগুলি আল্লাহকে সাক্ষী বানাইয়া এবং আল্লাহর কোন একজন খাস বান্দাকে স্বাক্ষী বানাইয়া তদানুযায়ী জীবন যাপন করা দরকার এবং যথা সম্ভব কুসংসর্গ হইতে দূরে থাকিয়া সৎসংসর্গে থাকিয়া আল্লাহকে সদা স্মরণ রাখিয়া জীবন যাপন করা উচিত। "যে আল্লাহর সঙ্গে অঙ্গীকার করিয়া সেই অঙ্গীকার পূর্ণ করিবে আল্লাহ তাহাকে বহুৎ আজিমুশ্বান পুরস্কার দান করিবেন। (কোরআন)

আম লোকের জন্য উপদেশ :-

(১) পাঁচ ওয়াক্ত নামায সময় মত যথাসাধ্য মসজিদে জামাতের সঙ্গে পড়িবে।

(২) জরুরী কাজের সময়, নফসের বাহানায় অতিরিক্ত নফল পড়িবে না। ফরয ওয়াজিব ও সুন্নতে মোয়াক্কাদাহ ঠিক রাখিয়া বেশীর ভাগ সময় হালাল রুজি উপার্জনে যে সময় লাগে তাহাতে ব্যয় করিয়া অবশিষ্ট সময় লোক সেবার কাজে, লোকের উপকারের কাজে, দ্বীনি উপকার এবং দুনিয়াবী উপকারও যার দ্বারা সম্ভব হয় করিবে। হালাল রুজি উপার্জনে বা লোক সেবার কাজে লজ্জা বোধ বা অপমান বোধ করিবে না, শ্রমের মর্যাদা দিবে, শ্রমে অপমান নাই।

(৩) পরের দোষ না দেখিয়া, তাদের আয়নায় নিজের দোষ দেখিয়া তাহা সংশোধন করিতে অনবরত আজীবন চেষ্টা ও সাধনা করিবে।

(৪) নিচের হাতের চেয়ে উপরের হাত ভাল। নেওয়ার চেয়ে দেওয়া ভাল। পরেরটা খাওয়ার চেয়ে পরকে খাওয়ানো ভাল, এই নিয়ম পালন করিবে।

(৫) ওযু গোসল ঠিকমত করিবে, পাক-নাপাকী বাছিয়া চলিবে, হালাল-হারাম বাছিয়া খাইবে, জায়েয-নাজায়েজ জানিয়া লইবে। দয়া-মায়া, হায়া-শরম, আদব-তমিজ ঠিক রাখিয়া চলিবে। ভুল-চুক হইয়া গেলে বৃথা তাবিল বা জিদ করিবে না, ভুল করিয়া ফেলিলে মাফ চাহিয়া লইবে।

(৬) সকালে কিছু কোরআন শরীফ, কিছু মোনাজাতে মকবুল, ১০০ বার এই দরুদ শরীফ পড়িবে:- **আল্লাহুম্মা ছল্লি আ'লা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদ, ওয়ালা আলি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদ, ওয়াবারিক ওয়া সাল্লিম।**

সময় পাইলে কলেমা সুয়ম ১০০ বার বা ২০ বার বা ১০ বার পড়িবে।

www.pathagar.com

কলেমা সুয়ম এই :- **সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহি ও লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লুহু আকবার ওয়া লা-হাওলা ওলা-কুয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযিম।**

ইস্তেগফার :

এশার নামাযের পর ১০০ বার এই ইস্তেগফার পড়িবে : **আসতাগফিরুল্লাহা রাব্বী মিন কুল্লি যামবিঁউ ওয়াতুবু ইলাইহি।** এবং সারাদিনের হিসাব নফসের কাছ থেকে লইয়া সমস্ত ভুল-চুক, খাতা-কছুরের জন্য আল্লাহর কাছে মাফ চাহিবে। আগামীর জন্য সতর্ক ও আরো শক্ত হইবে। শেষ রাতে তাহাজ্জুদের পর ২০০ বা লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ যিকিরের সঙ্গে আল্লাহকে হাজির জানিয়া অঙ্গীকার করিবে যে, আমি এক আল্লাহকে বিশ্বাস করি। তাহাকে মানিয়া চলিব। আল্লাহর বিরুদ্ধে কাউকে মানিব না। কাউকে ভয় করিব না, কারো কাছে কিছু আশা করিব না।

মাঝে মাঝে মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ বলিয়া আল্লাহকে মানার পথ যে একমাত্র এরই পথ, মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সে কথা স্মরণ করিয়া এবং সেই পথ ধরিয়া সারাজীবন চলিব। জাহের-বাতেনের একজন খাঁটি আলেমকে ওস্তাদ বা পীর বানাইয়া যে বিষয় যখন সন্দেহ হয় বা দরকার পড়ে তাহার কাছে জিজ্ঞাসা করিয়া লইবে। সৎ সংসর্গে থাকিবে, কু-সংসর্গ বর্জন করিবে।

পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পরে পাঁচবার এবং রাত্রে শুইবার সময় বিছানায় বসিয়া একবার এই আমল করিবে- আউযুবিল্লাহ বিছমিল্লাহ বলিয়া আয়াতুল কুরছি একবার, সূরা এখলাস, সূরা ফালাক, সূরা নাছ মনের দিকে লক্ষ্য করিয়া তিনবার না হয় অন্তত: একবার এবং সুবহানাল্লাহ ৩৩বার, আলহামদুলিল্লাহ ৩৩বার এবং আল্লাহু আকবার ৩৪বার পড়িবে।

মসজিদ

প্রত্যেক জিনিসের একটি জীবনী শক্তি থাকে। জীবনী শক্তিহীন হইয়া যায় যে জিনিস, সে জিনিস জীবন হীন হইয়া পড়ে। মসজিদেরও একটি জীবনী শক্তি আছে। মসজিদের সেই জীবনী শক্তি রক্ষিত হয় কোরআনের শিক্ষার দ্বারা। অতএব যে স্থানে কোরআনের শিক্ষা জারী নাই সে স্থান জীবনহীন ও নির্জীব হইয়া পড়িয়াছে। এই জন্যই আগের জামানায় প্রত্যেক মসজিদেই কোরআন শিক্ষা হইত। এক দিল্লীতে দশ হাজার মাদ্রাসা ছিল। ইসলামের শত্রুরা সরাসরি মসজিদে নামায পড়িতে মুসলমানদিগকে নিষেধ করে নাই বা বাধা দেয় নাই

www.pathagar.com

বটে, কিন্তু মুসলমানদের ছেলেমেয়েদিগকে কোরআন শিক্ষা হইতে বঞ্চিত করিয়া ইসলামকে এবং মসজিদগুলিকে জীবনহীন করিয়া দিয়াছে।

সেই জন্যই মসজিদ সমূহের ভক্তি ভাজন ইমাম সাহেবানদের খেদমতে এবং মহামান্য নায়েবে রসূল আলেম সাহেবানদের খেদমতে বিনীত আরজ এই যে, ইসলামের রাজত্ব চলিয়া গিয়াছে, বায়তুলমাল বন্ধ হইয়া গিয়াছে। হযরত মোহাম্মদ রসূলুল্লাহ (দঃ) দোবারা দুনিয়াতে ফিরিয়া আসিবেন না। তিনি যে আমানত কোরআন মজিদ আল্লাহর আরশের উপর থেকে বহন করিয়া আনিয়া উম্মতের নিকট আমানত রাখিয়া গিয়াছেন, সেই আমানতের খেয়ানত হইলে সে উম্মতের ভালাই, কামিয়াবী বা উন্নতি ও মুক্তির আর আশা নাই।

অতএব যাঁহারা যতটুকু কোরআন শিখিয়াছেন, যাঁহার যতটুকু দায়িত্ব জ্ঞান আছে- বিশেষ করে ইমাম সাহেবান এবং আলেম সাহেবান উঠে পড়ে, মরে হয়ে জান-মাল যথাসর্বস্ব কোরবান করে লেগে যান কোরআন শিক্ষা ও কোরআন প্রচারের কাজে-নতুবা মনে রাখেন, শত্রুরা বসে নাই, তারা আপনাদের প্রাণ-প্রিয় মনোরম ইসলাম সৌধের এক এক খানা করিয়া ইট অনবরত খসাইয়া নিতেছে।

যাঁহাদের ডাকে এখনো জন সাধারণ সাড়া দিয়া আল্লাহর ঘরে একত্রিত হইয়া আল্লাহর বন্দেগী করে, যাঁহাদের নেতৃত্বে এখনো হাজার হাজার লোক আল্লাহর দরবারে একত্রিত হয়ে আল্লাহকে সেজদা করে এবং আল্লাহর দরবারে দুনিয়া ও আখেরাতের হাজত পেশ করে, যাহারা এখনো মেহরাবের গদ্দীনেশীন এবং মেম্বরের তখত-নেশীন হইয়া মুসলমান জনসাধারণের নেতৃত্ব করেন, মুসলমান জন সাধারণকে অসত্য হইতে, অন্যায় হইতে, অধর্ম হইতে ফিরাইয়া আনিয়া সত্যের পথে, ন্যায়ের পথে, ধর্মের পথে পরিচালিত করা আপনাদেরই দায়িত্ব, আপনাদেরই কর্তব্য, আপনাদেরই কাজ।

চতুর্দিকে ইসলামের শত্রুরা নানারূপ মিথ্যাবুলি আওড়াইয়া, মিঠাইর লোভ দেখাইয়া, ডাল-ভাতের প্রলোভন দিয়া, চাকরীর মোহে ফেলিয়া মিথ্যা গরীব দরদী সাজিয়া সরলমতি জনসাধারণকে পথভ্রষ্ট করিতেছে, আপনারা সত্যের বাতি হাতে নিয়ে সামনে আসুন। বসিয়া থাকার সময় নয়, আরাম করার জামানা নয়। শক্ত সাধনার দরকার- আজীবন সাধনার দরকার। এক দুইটি জীবনের কঠোর সাধানার ভিতর দিয়ে একেবারে কোরবান করার দরকার। একটা জাতির পরাধীন হতে, পতন হতে সময় লাগে না, সাধনা লাগে না, কিন্তু একটা পতিত জাতিকে, পরাধীনতার অভিশপ্ত একটা জাতিকে উন্নত করিতে বহু সময়, বহু সাধনা, বহু ত্যাগ, বহু কোরবানীর দরকার। আর শুধু তাই নয়, সর্বোপরি সর্বশক্তিমান রহীম রহমান আল্লাহর ঐশী মদদের দরকার।

www.pathagar.com

এমন দারুন সময়ে, এমন দুর্দিনের সময়ে, ঘুমিয়ে থাকলে চলবে না, উঠুন, গুন! শাজরা ওযিফার পরিবর্তে, তাবিজের পরিবর্তে কোরআনের আলো দান রুন। কোরআনের শিক্ষা প্রচার করুন। আলস্য পরিত্যাগ করে কষ্টকে জয় রুন। নির্লোভি, নিস্বার্থভাবে লোকদের স্বীয় কর্তব্য, ন্যায়-অন্যায়, সত্য-মিথ্যা, ক-বাতিল, হারাম-হালাল, পাক-নাপাক, জায়েয-নাজায়েয, মুরব্বী মান্যতা, নুষ্যত্ব, দায়িত্ব, ক্ষণস্থায়ী জীবন-চিরস্থায়ী জীবন ইত্যাদি বিষয়ের জ্ঞান দান রুন।

সর্বোপরি আপনাদের দায়িত্ব- ফুলের কলির ন্যায় কচি কোমলমতি শিশুদের রিত্রহীন ধর্মহীন বানাইয়া দোজখের অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া তাদেরে আল্লাহর কারআনের নির্মল আলো, অমৃত বাণী মধুর ভাষায় দান করিয়া তাদের চরিত্র ঠন করিয়া তাদের ভবিষ্যত জীবনকে উজ্জ্বল করিয়া দিন।

খবরদার! আপনার মহল্লায় আপনার গ্রামে পাঁচ বৎসরের বেশী বার বৎসরের ম কোন বালক বা কোন বালিকা যেন এমন না থাকে যে, তারা আল্লাহর কারআন না পড়িয়া, আল্লাহর আদেশ-নিষেধ, হালাল-হারাম, পাক-নাপাক, যু, নামায, রোজা, ঈমান- ইসলাম সম্পর্কিত মাসআলা না জানিয়া তাদের ভবিষ্যত জীবনকে ধ্বংসের পথে পরিচালিত করিতে উদ্যত হইতে পারে।

আপনার যিম্মায় সবচেয়ে বড় দায়িত্ব, সবচেয়ে বেশী জরুরী, সবচেয়ে বেশী উপকারী, সবচেয়ে বড় ফরয এই যে, ছেলে মেয়েদিগকে অবশ্যই পূর্ণ কোরআন রীফ শুদ্ধ রূপে পড়াবেন, ঈমান, ইসলাম এবং শরীয়তের মাসলা-মাসায়েল শিক্ষা দিবেন। টাকার লোভ করিবেন না। রুজির চিন্তা করিবেন না। কেউ াহায্য করুক বা না করুক। কেউ বেতন দিক বা না দিক। আপনার একমাত্র কার্য এক মাত্র লক্ষ্য, একমাত্র উদ্দেশ্য এই হওয়া চাই যে, আপনি আল্লাহর উদ্দেশ্যে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য আপনার জীবনকে বিলাইয়া দিয়া আল্লাহর কোরআনের এবং আল্লাহর দ্বীনের খেদমতে লাগিয়া যাইবেন।

যদি কেউ কিছু সাহায্য করে, কেউ কিছু খেদমত করে, তবে তাহা আল্লাহর দান মনে করিয়া প্রথমে আল্লাহর শোকর আদায় করিবেন। তারপর যার হাত দিয়া আল্লাহ দান করাইয়াছেন তার শুকরিয়া আদায় করিবেন, তার জন্য দোয়া করিবেন। যদি কেউ কোন কটু কথা বলে বা ঠাট্টা বিদ্রুপ করে বা গরীব বলিয়া ঘৃণা করে, তবে নীরবে সবর করিবেন, কারুর প্রতি কটুক্তি প্রয়োগ করিবেন না বা কাউকে বদদোয়া করিবেন না। আল্লাহ ফল দিবেন। আপনি কি মনে করেন- আল্লাহ আপনাকে না খাওয়াইয়া মারিবেন? বা আপনার বিবি-বাচ্চাকে না খাওয়াইয়া মারিবেন? যারা আল্লাহর শত্রু তাদেরও আল্লাহ খাওয়ায়। আর যারা আল্লাহর দ্বীনের জন্য আল্লাহর বান্দাদের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়া দিবে তাদের

www.pathagar.com

আল্লাহ না খাওয়াইয়া মারিবেন? কিছুতেই নয়। আপনি আল্লাহর হইয়া যা অন্তরের মধ্যে লোভ-লালসা রাখিবেন না। অন্তরের মধ্যে ডামাডোল ভ রাখিবেন না। আল্লাহর বান্দাদের অন্তরের মধ্যেও আল্লাহর ভাব জাগাই দিবেন। তারা আল্লাহর তরফ হইতে আপনার খেদমত করিবে। এভাবে তারা আল্লাহর খাস বান্দা হইয়া যাইবে। আপনি দুশ্চিন্তা অন্তরের মধ্যে আনিবেন না

আল্লাহর রহমতে যখন এই মর্তবা আপনি হাসিল করিবেন, আল্লাহ কোরআনের খেদমত করিবার তৌফিক পাইবেন। তখন আশেপাশের অন্যা মসজিদের ইমাম সাহেবানদের এবং অন্যান্য হাফেজ , কারী, আলেম ভাইদের আপনি অনুরোধ করিবেন এবং উৎসাহ দিবেন। তাঁরাও খালেস নিয়তে আল্লাহ কোরআনের খেদমতের কাজকেই জীবনের প্রধান কাজ বলিয়া মনে করিবেন লোভের বশবর্তী হইলে সে ওয়াজে তাছির হয় না। কিন্তু বিনা স্বার্থে সৎ কং কাউকে বাতাইলে আসা করা যায় যে, সে নছিহত ব্যর্থ হইবে না। হিংসা-বিদ্বে লোভ-লালসা, এবং অহঙ্কার-গুরুরী পরিত্যাগ করিয়া কাজ করুন, দেখিবে কাজে বরকত হইবে। মাদ্রাসা করিবেন রোজগারের নিয়তে করিবেন না। বর দ্বীনের খেদমত এবং জনসাধারণের খেদমতের নিয়তে করিবেন। যেখানে যে পরিমাণ প্রয়োজন সেই পরিমাণ মাদ্রাসা করিবেন। দুই বা ততোধিক মাদ্রাস এক জায়গায় থাকিলে পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ করিবেন না বা চাঁদা লইয় টানাটানি করিবেন না। পরস্পর মাদ্রাসা গুলির মধ্যে একতা ও সৌহার্দ্য ভা রাখিবেন। এবং একটিকে বড় ও কেন্দ্র মান্য করিয়া তাহার অনুগত হইয়া এক নেসাব অনুসারে একই পদ্ধতিতে এবং একই পরীক্ষার অধীন সকলে পড়াইবেন পড়ানোর কাজে সময়ের এবং নিয়মের অধীন চলিবেন। সময়ানুবর্তিতা এব নিয়মানুবর্তিতা ব্যতিরেকে কাজে বরকত হয় না। প্রতিযোগিতা করিয়া এবে অন্যের চেয়ে ভালভাবে শিক্ষাদান এবং দ্বীনের খেদমতের কাজ বেশীর চে বেশী করিতে চেষ্টা করিবেন, কিন্তু খবরদার! একে অন্যকে ডাউন দিতে চে করিবেন না বা চাঁদা লইয়া কামড়াকামড়ি করিয়া নিজের দুনিয়ার সম্মান এব আখেরাতের সওয়াব বরবাদ করিবেন না।

আজকাল ইসলামের শক্রদের প্ররোচনায় মুসলমান নামধারী একদল লো পয়দা হইয়াছে। তারা আপনাদিগকে নানারূপ ঠাট্টা বিদ্রুপ করিবে। তারা বে যে, মোল্লারাই ইসলামের সর্বনাশ করিয়াছে। একথা সত্য। সত্যই আমাদে গাফলতির কারণেই ইসলামের এত অবনতি হইয়াছে। কিন্তু এরূপ বলিবা অধিকার তাদের নাই। এরূপ বলা তাদের অজ্ঞতা এবং নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক কেননা তারা তো ইসলামের জন্য কিছুই করে নাই। ইসলাম ধর্মেরও কিছু শিখে নাই। ইহা কি অমার্জনীয় অপরাধ নয়? আজ কোন সাহসে তা

www.pathagar.com

আলেমদের নিন্দা করিয়া তাহাদের স্থান অধিকার করিতে চায়? তারা হীন স্বার্থের ও দুনিয়ার লোভের বশীভূত হইয়া যে বিদ্যা শিখিয়াছে সে বিদ্যার দ্বারাও তারা যথাযথ রাষ্ট্রের দায়িত্ব পালন করিতেছে না।

মানুষের অন্যের দোষ দেখার আগে নিজের দোষ দেখা উচিৎ। প্রকৃত প্রস্তাবে তারাই নিজেদের দুর্নীতি ও দুর্বলতার কারণে ইসলামকে ডুবাইয়াছে, কিন্তু লজ্জা রাখিবার স্থান পায় না বলিয়া অন্যের উপর দোষ চাপাইয়াছে বা অন্যদেরকে সেইরূপ দুর্বলচেতা ও দুর্নীতিপারায়ণ করিয়া সব একাকার করিয়া ইসলামকে ধ্বংস করিতে চাহিতেছে।

যাহা হউক, দোষাদোষি রেষারেষি ভাল কাজ নয়। তারা যদিও আমাদের মন্দ বলে কিন্তু আমাদের তাদের মন্দ বলা উচিৎ নয়, বরং আদর করিয়া কোলে তুলিয়া নিয়া তাদেরে সৎ পথের দিকে টানিয়া লইতে চেষ্টা করা দরকার, তাদের কটুক্তি বা ব্যঙ্গোক্তিতে বিরক্ত বা রাগান্বিত হইয়া নিজের কর্তব্য কাজে ত্রুটি করা উচিৎ নয়।

আমি আমার গরীব জনসাধারণ ভাইদেরকে বলিতেছি, আল্লাহর ঘর আবাদ করুন। আল্লাহর ঘর বিরান করিবেন না। নিশ্চয় জানিবেন, আল্লাহর ঘর বিরান করলে এককালে আপনার ঘরও বিরান হবে। আপনারা গরীব বলে হতাশ হবেন না, ওয়াক্তের সময় এক এক মুঠ করিয়া চাউল জমা করিয়া হইলেও আল্লাহর ঘর আবাদ করিবার নিয়তে মসজিদে পাঠাইয়া দিবেন এবং ছেলেমেয়েদেরকেও ভোরে সকালে উঠাইয়া আগে কোরআন শরীফ পড়িবার জন্য মসজিদে পাঠাইয়া দিবেন, তারপর অন্য কাজ করাইবেন- আগে কোরআন শরীফ না পড়াইয়া অন্য কোন কাজ করাইবেন না। খোদার ঘর বিরান করিবেন না, আল্লাহর আমানতের খেয়ানত করিবেন না, রসূলের আমানতের খেয়ানত করিবেন না।

আমি আমার ধনী ভাইদেরকে বলিতেছি, খবরদার! শুধু সরকারের দোষ দিবেন না বা সরকারের দিক চাহিয়া থাকিবেন না। আলেমদের ঘৃণা করিবেন না। আলেমদের আপনাদের দ্বারে ভিখারী বানাইবেন না। আপনাদেরে যে খোদা ধন দান করিয়াছেন, মনে রাখিবেন, সে খোদা ছিনিয়েও নিতে পারেন। সেই খোদার ঘর আবাদ করার জন্য যে মহল্লার বা যে গ্রামের লোক গরীব, তারা মাদ্রাসার খরচ চালাইতে পারে না, খুঁজিয়া তালাশ করিয়া আপনারা তাদের সাহায্য করুন।

আমি সর্বশেষে সরকারের কাছেও বিনীত নিবেদন করি, তাঁহারা যেন আল্লাহর মসজিদগুলোকে আল্লাহর কোরআনের শিক্ষার দ্বারা আলোকিত ও শক্তিশালী করেন। এই আলো এবং এই শক্তিই শান্তির, মুক্তির ও উন্নতির একমাত্র পথ।

www.pathagar.com

সমাজ গঠিত হয় ব্যক্তির দ্বারা, সমাজের ব্যক্তিগুলি যদি ভাল হয়, দায়িত্বজ্ঞানশীল, দায়িত্ব পালনকারী হয়, তবে সমাজও হয় দায়িত্বজ্ঞানশীল, দায়িত্ব পালনকারী। সমাজ দ্বারাই গঠিত হয় রাষ্ট্র। সমাজ ভাল হইলে দায়িত্বশীল হইলে, রাষ্ট্রও হয় দায়িত্বশীল। ব্যক্তিগত দায়িত্বের চেয়ে সমাজগত এবং রাষ্ট্রগত দায়িত্বের গুরুত্ব অনেক অধিক। কেননা, ব্যক্তিগত দায়িত্বের জন্য ব্যক্তির জবাবদিহি করিতে হইবে শুধু আল্লাহর কাছে। সমাজগত ও রাষ্ট্রগত দায়িত্বের জন্য সমাজ-নেতা ও রাষ্ট্রনায়কের জবাবদিহি করিতে হইবে দুই জায়গায়, আল্লাহর কাছে এবং সমাজের জনসাধারণের কাছে। কাজেই সমাজগত এবং রাষ্ট্রগত দায়িত্ব অত্যধিক গুরুতর। হুকুকোল এবাদ একজন মানুষের হক নয়, শত শত, হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ মানুষের হক।

একজন মানুষ যদি এক ওয়াক্ত নামায না পড়ে বা দাঁড়ি না রাখে তবে তাহার শুধু আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করিতে হইবে বা রসূলের কাছে শরমেন্দা হইতে হইবে। আবার আল্লাহ মহান, আল্লাহর কাছেই নতিস্বীকার করিয়া মাফ চাহিলে মাফও করিয়া দিতে পারেন। একজন মানুষ যদি একজন লোকের টাকা চুরি করিয়া আনে বা একজন লোকের থেকে সুদ বা ঘুষ খায়, এক্ষেত্রে আল্লাহর কাছে মাফ চাহিয়া ঐ একটি লোকের কাছে মাপ চাহিলেই সে রেহাই পাইতে পারে। কিন্তু যদি একটি রাষ্ট্রনায়ক, কর্মকর্তা দায়িত্ব পালন না করিয়া বসিয়া মাহিনা খায় এবং সে কারণে জনসাধারণ কষ্ট পায় বা একটি অন্যায় আইন জারী করিয়া লোকের অর্থ শোষণ করে বা জীবনে কষ্ট দেয় তবে সে কারণে যে কত শত শত, হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ লোকের কাছে তার জবাবদিহি করিতে হইবে তাহার ইয়ত্তা কে করিবে? শুধু আল্লাহর কাছে তওবা করিলে বা ওজীফা পড়িলে এ পাপ মাফ হইবে না।

রাষ্ট্রের কর্তব্য আইন করিয়া সুনীতি জারী করা এবং দুর্নীতি দমন করা, দুষ্টের দমন করা শিষ্টের পালন করা। সমাজের কর্তব্য একতাবদ্ধভাবে অন্যায় ও দুর্নীতিকে ঘৃণা করা, ন্যায় ও ধর্মকে সমাদর করা। এই উপায়ে রাষ্ট্র ও সমাজ একযোগে একমুখী হইয়া কাজ করিলে, শিক্ষা ও আইন সমাজ জীবনের দৈনন্দিন কাজের সুখ-সুবিধা ও আলো দান করিলে তবেই দেশ ও জাতি সহজে সমৃদ্ধিশালী হইতে পারে। নতুবা সমাজ চায় ধর্ম, রাষ্ট্র চায় অধর্ম, সমাজ চায় এক আদর্শে আস্থাবান হইয়া একতাবদ্ধ শৃংখলাবদ্ধ হইতে, রাষ্ট্র চায় আদর্শহীন উচ্ছৃংখলা, সমাজ চায় সতীত্ব ও সততা রক্ষা করিতে, রাষ্ট্র চায় সতীত্ব ও সততা নষ্ট করিতে, সমাজ চায় জনসাধারণ সকলের খাওয়া-পরা থাকা এবং সুশিক্ষা ও সুস্বাস্থ্যের সুবন্দোবস্ত করিতে, রাষ্ট্র চায় গুটিকয়েক লোককে কোটিপতি বানাইয়া বাকী লোকগুলিকে চরিত্রহীন পথের ভিখারী বানাইতে, এরূপ অবস্থা হইলে

www.pathagar.com

টানা-হেঁচড়ার কারণে সে দেশ ও সে জাতি কখনো উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিতে পারে না।

সমাজের কাজগুলি সুভাবে সমাধান করার জন্যই সমাজ গুটিকয়েক লোককে তাদের প্রতিনিধি করিয়া রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দান করে। তাদের উচিৎ নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থকে ভুলিয়া গিয়া জাতির বৃহত্তর স্বার্থের জন্যই মন, মস্তিষ্ক, অর্থ ও শক্তি ব্যয় করা।

দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখিয়া শিক্ষার ধারা প্রবর্তন করা, সকলের জন্য ধর্ম শিক্ষা, নৈতিক শিক্ষা ও মাতৃভাষার স্বাভাবিক জ্ঞান রাখিয়া যোগ্যতা ও প্রবণতা হিসাবে বিশেষ শিক্ষা জারী করা এবং অর্থ অর্জনের ও অর্থ বন্টনের ভারসাম্য ঠিক রাখিয়া নির্দিষ্ট ভাতায় তৃপ্ত থাকিয়া দেশ ও জাতিকে নৈতিক, দৈহিক, আর্থিক আধ্যাত্মিক ও বৈজ্ঞানিক উন্নতির পথে লইয়া অগ্রসর হওয়ার খেদমত আঞ্জাম দেওয়াই রাষ্ট্রের প্রধান কর্তব্য।

রাষ্ট্র যদি তাদের কর্তব্য পালনে ত্রুটি করে তবে সমাজ দায়মুক্ত হইতে পারিবে না। সমাজ হয় একতাবদ্ধ হইয়া রাষ্ট্রকে বাধ্য করিবে কর্তব্য পালন করিতে, না হয় নিজেরাই একতাবদ্ধ হইয়া তাদের কর্তব্য পালন করিবে।

সমাজের একটি কর্তব্য সম্বন্ধে আমি এখানে এহ্য়াউল উলুম গ্রন্থ, দ্বিতীয় খন্ড, ২৯৯ পৃষ্ঠা হইতে ইমাম গাজ্জালী রাহমাতুল্লাহে আলায়হের একটি বাণী উদ্ধৃত করিতেছি। বলা বাহুল্য যে, ইমাম সাহেব তাঁহার উক্তিটিতে বিস্তৃতভাবে যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত করিয়াছেন। আমি অতি সংক্ষেপে তাঁহার বর্ণনাটি শুধু উদ্ধৃত করিতেছি।

প্রত্যেক মহল্লায় প্রত্যেক পল্লীতে মসজিদ রাখিতে হইবে। প্রত্যেক মসজিদে এমন একজন কোরআন হাদীসের অভিজ্ঞ আলেম উপযুক্ত ভাতা দিয়া রাখিতে হইবে, যিনি নর-নারী সমস্ত লোকদিগকে তাদের ধর্মীয় কর্তব্যাকর্তব্য সম্বন্ধে জ্ঞান দান করিবেন। যাহাতে দুনিয়ার বুকে কোন মূর্খই না থাকে।

প্রত্যেকটি নর-নারীরই ধর্মীয় কর্তব্য সম্বন্ধীয় জ্ঞান অর্জন করা ফরজ। যাহারা ধর্মীয় কর্তব্য সম্বন্ধীয় জ্ঞান অর্জন করার পর জীবিকা উপার্জনের জন্য বা স্টেটের খেদমতের জন্য নিজ নিজ বিভাগীয় কাজের জ্ঞান অর্জন করিয়া শিল্প, ব্যবসায়, চিকিৎসা, কৃষি, যানবাহন, খবর আদান-প্রদান, শান্তি রক্ষা, শাসন ইত্যাদি বিভাগের কাজে যোগদান করিবেন, তাঁহাদিগকে আলেম লকব দেওয়া হইবে না বা আলেমের দায়িত্ব তাঁহাদের ঘাড়ে চাপান হইবে না। আলেমের লকব তাঁহাকে দেওয়া হইবে বা আলেমের দায়িত্বের বোঝা তাঁহার ঘাড়ে চাপান হইবে যিনি ফরজে-আইন আদায় করিয়া ফরজে-কেফায়ার হক আদায় করার

www.pathagar.com

জন্য আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। যাঁহারা ফরজে-আইন এবং ফরজে-কেফায়া পরিমাণ যোগ্যতা হাছেল করিয়া আলেম লকব পাইয়াছেন এবং আলেম শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের উপর ফরজ হইবে সমস্ত লোকদিগকে ধর্মীয় কর্তব্য সম্বন্ধীয় জ্ঞান দান করা। তাঁহারা লোকদিগকে উপদেশ দিবেন, ধর্মীয় কর্তব্য স্মরণ করাইয়া দিবেন, ঐতিহাসিক প্রমাণের দ্বারা, কোরআন হাদীসের দলিলের দ্বারা। যাদের শিক্ষা দিবেন বা উপদেশ দিবেন তাদের থেকে কোন পারিশ্রমিক নিবেন না এমনকি নিজের খাওয়ার ব্যবস্থা নিজেই করিবেন, তাদের উপর এই বোঝাটুকুও চাপাইবেন না, আলেমের জীবিকা নির্বাহপোযোগী ভাতা তাঁহাকে দিবেন সমাজ বা রাষ্ট্র।

আলেম একা যতদূর পারেন ততদূর একা কাজ করিবেন, যেখানে সহকারীর দরকার হয় সেখানে সহকারী নিযুক্ত করিবেন। তাঁহাদের প্রথমে নিজ নিজ পরিবারের মধ্যে ও বাড়ির মধ্যে কাজ করিতে হইবে, তারপর শহরের মহল্লাগুলিতে কাজ করিতে হইবে, তারপর শহরের নিকটবর্তী পল্লীগুলিতে তারপর তার নিকটবর্তী পল্লীগুলিতে, এইরূপে সারা পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িয়া সত্য ধর্ম আল্লাহর দ্বীন, নবীর তরিকা শিক্ষাদান ও প্রচার করিতে হইবে, এমনকি সারা পৃথিবীতে যেন একটি মানুষও বাকী না থাকে যে, তার প্রভুর আদেশ এবং নবীর আদর্শ সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকে, যে তার প্রভুর আদেশ এবং নবীর আদর্শ সম্বন্ধে জ্ঞান না পাইয়াছে। হাটে, মাঠে, বাজারে, দরবারে, কারখানায়, শিক্ষাগারে সর্বত্র প্রচার করিতে হইবে। আলেমগণই নবীর ওয়ারিস। নবীর কর্তব্য ছিল বিনা পারিশ্রমিকে পরম হিতৈষী বন্ধুরূপে সবাইকে সত্য ধর্মের বাণী পৌঁছাইয়া দেওয়া। তদ্রুপ নবীর যাঁরা ওয়ারিস হইতে চায় তাদেরও কর্তব্য হইবে আল্লাহর একটি বাণী একটি হাদীস শিখিয়া থাকিলেও তাহা অন্যকে শিক্ষা দেওয়া, অন্যের কাছে প্রচার করা।

আল্লাহর আদেশগুলি নবীর আদর্শগুলি শিক্ষা করা এবং শিক্ষা দেওয়া উভয়ই ফরজ। এই ফরজ প্রতিপালিত না হইলে সকলেই গোনাহগার হইবেন, যাঁহারা শিক্ষা করেন নাই তাহারা শিক্ষা না করার কারণে এবং যাহারা শিক্ষা করিয়া শিক্ষা দেন নাই তাঁহারা শিক্ষা না দেওয়ার কারণে। ফল কথা এই যে, মসজিদকে কেন্দ্র করিয়া সকলকেই কোরআন হাদীসের শিক্ষা ও প্রচারের জন্য আজীবন প্রাণপণে চেষ্টা করিতে হইবে। কেউ শিক্ষক হইবেন, কেউ শিক্ষার্থী ও শিক্ষিত হইবেন, কেউ এই উভয়ের সঙ্গে মহব্বত রাখিয়া তাদের অভাব-অভিযোগ দেখিবেন। এই হইলেই আমরা আল্লাহর রহমত পাইব, নবীর নেক নজর পাইব, আমাদের ইহকালের উন্নতি হইবে। অন্য পথে নয়।

আল্লাহুম্মা ছাল্লি আ'লা সায়্যিদিনা মুহাম্মাদ ওয়া আ'লা আলি সায়্যিদিনা মুহাম্মাদ ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম। **নাচিজ- শামছুল হক**

www.pathagar.com

শক্তির উৎস কোথায়?

জাতীয় শক্তির উৎস কোথায়– এ সম্পর্কে সত্য নির্ণয় না করিতে পারিলে থ্যা ধারণা জন্মাইয়া, সত্যের অনুসরণ না করিয়া মিথ্যার পিছে দৌড়াইলে াতীয় বিপর্যয় আসার প্রবল আশঙ্কা আছে। কেহ কেহ বলেন, শক্তির উৎস– ক্য, একতা ও সংহতির মধ্যে। কেহ কেহ বলেন, শক্তির উৎস– Knowledge is power" সূত্রে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের মধ্যে। কেহ কেহ বলেন, ক্তির উৎস ধন-বল বা জনবলের মধ্যে অর্থাৎ পুঁজিপতিত্ব বা সাম্যবাদের মধ্যে। কহ কেহ বলেন, শক্তির উৎস স্বদেশ প্রেমের মধ্যে অর্থাৎ স্বদেশ ভিত্তিক াতীয়তাবাদ জাতীয়তা বোধের মধ্যে। কেহ কেহ বলেন, শক্তির উৎস বড় কমের কোন বন্ধুর সহিত মিত্রতা করিতে পারিলে সেই মিত্রতার মধ্যে।

আমাদের কায়েদে আ'যম মরহুম বলিয়া গিয়াছেন যে, "শক্তির উৎস ঈমান একীন), একতা ও শৃঙ্খলার মধ্যে। আমাদের নেতা ফিল্ড মার্শাল জনাব মাহাম্মদ আইয়ূব খান শুধু মুখে বলেন নাই, কার্যক্ষেত্রে দেখাইয়া গিয়াছেন, ুসলমান জাতির শক্তির উৎস– লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ লেমা ভিত্তিক জিহাদের মধ্যে।

আমি দার্শনিক ও যুক্তির ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতে চাই যে, ন্যান্য মনীষীদের মতগুলিকে যদিও আমি মিথ্যা বলিতে চাই না, কিন্তু তবুও দেখাইতে চাই যে, একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, ঐ মতগুলির নেহায়েতই ল্প দৃষ্টিশীলতার উপর (ঝযড়ৎঃ ংরমযঃবফহবংং)। পক্ষান্তরে আমাদের কায়েদে া'যম মরহুমের এবং আমাদের বর্তমান মহান নেতার মতের ভিত্তি আসল াত্যিকারের জ্ঞানের উপর এবং আসল সত্যের উপর। যাহারা বলেন, শক্তির উৎস ঐক্য ও একতার মধ্যে তাহাদের কথা সত্য। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, একতা হবে কোন ভিত্তিতে? ব্যক্তিগত নেতার ভিত্তিতে? না দেশ ও অঞ্চল ভিত্তিতে? না ভাষার ভিত্তিতে? ভাষা ভিত্তিক, ব্যক্তিভিত্তিক, অঞ্চল ভিত্তিক একতার কী মূল্য আছে? ব্যক্তিত্ব অস্থায়ী জিনিস।

ক্ষুদ্র স্বার্থের নেশায় দুষ্ট জিনিসের ভিত্তিতে একতা হওয়া শুধু তাদের দ্বারাই সম্ভব যাহারা খাছ এক ব্যক্তির নিকট কিছু হীন স্বার্থ উদ্ধার করার আশা করে, নতুবা যাহারা সত্যান্বেষী, মানব শান্তি ও মানব মুক্তিকামী, তাহারা ব্যক্তিত্বের পূজারী হইতে পারে না। দেশ বা অঞ্চল বা ভাষাভিত্তিক একতা তো আরও দুর্বল। ভাষায় কি আসে যায়। ভাষার স্থায়িত্ব কোথায়? দেশের মাটির কি মূল্য আছে? কাল যে মাটিতে আমার উপর অত্যাচার ও নির্যাতন হইয়াছে, আজ সেই মাটির উপরই আমি স্বাধীনতা অর্জন করিয়া ন্যায়বিচার জারি করিতেছি। আবার

www.pathagar.com

সেই মাটি কালে কোন অত্যাচারীর কবলে গিয়া নির্যাতনের লীলাভূমিতে পরিণ হইবে। অতএব, দেশের মাটির কি মূল্য আছে? মাটি পূজা ভারতীয় জা করিয়াছে। এখান থেকেই ভারত মাতার মূর্তি গড়াইয়া সেই মূর্তির পূজা তাহা করে, অবশ্য মাটিতে আমাদের খাদ্য পয়দা হয়। কিন্তু খাদ্য পয়দা শুধু মাটি হয় না। মাটির মধ্যে যে উর্বরা শক্তি আছে সেই শক্তির বলে হয় এবং আপ বিপদ থেকে সুরক্ষিত রাখিতে পারিলে তবে হয়। সেই শক্তির মালিক বে তাহার পূজা না করিয়া মাটির পূজা করা বোকামী নয় কি? মাটির শক্তি সৃষ্টিকর্তার প্রশংসার গান না করিয়া মাটির প্রশংসা গীতি করা বোকামী নয় কি?

Knowledge is power সূত্রে জ্ঞান-বিজ্ঞানই শক্তির উৎস একথা সত্য কি যে জ্ঞান আমরা বিশ্বাস করি বা হাসিল করি তার সত্যতার প্রমাণ কি? দেখা বাহিরে কি কিছু নাই? অদৃশ্য জগতের খবর পাওয়ার উপায় কি? এবং সে খবরের সত্যতার প্রমাণ কি? দৃশ্য জগতটাই সবটুকু? নিশ্চয়ই দৃশ্যজগত সবটুকু নয়। তাছাড়া দেখা এবং অনুভব করাও সকলের সব সময়ের একরূ নয়। এখন তো দৃশ্যজগতের বৈজ্ঞানিকগণও অদৃশ্য এক অসীম শক্তির অস্তিত্ব নয় শুধু— তার একত্ব ও একচ্ছত্রত্বের স্বীকার করিতেছেন। বাকী রহিয়াছে শু সেই অসীম শক্তির মালিক ও লিখিত বিধান ও বিধানবাহক প্রেরণ করার শক্তি ও তাহার বাস্তবতার স্বীকার। জ্ঞান শক্তির উৎস বটে কিন্তু মিথ্যা জ্ঞান নয়, সত জ্ঞান। জ্ঞানের সত্যতা নির্ধারণের উপায় বুঝিতে হইবে। অদৃশ্য শক্তির সত্যিকা জ্ঞানই লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলূল্লাহ।

বড় রকমের বন্ধুর মধ্যে, শক্তির উৎস এ কথার সত্যতা অসত্যতা এবার খু প্রমাণ হইয়া গিয়াছে আমেরিকার বন্ধুত্বের ভিতর দিয়ে। যিনি আমাদের বিপদে চেয়ে সহস্র ভাগের এক ভাগও নয় যে বিপদ, সেই বিপদে একটি দেশকে সাহায্য করিবার জন্য তাহার অস্ত্র ভাণ্ডার, রসদ ভাণ্ডার খুলিয়া দিয়াছিলেন। তিনি আমাদের সহস্রাধিক গুণ বেশী বিপদের সময় নীরব দর্শকের ভূমিকা ছাড়া অন কোন ভূমিকা গ্রহণ করেন নাই। অন্য কোন ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন কি না তাহ তিনি জানেন এবং অন্তর্যামী জানেন। আমাদের দেলে জাগে বটে কিন্তু বিন প্রমাণে তাহা বলিতে পারিনা।

বস্তুবাদী সাম্রাজ্যবাদ বা পুঁজিবাদ শক্তির উৎস যে কেন হইতে পারে না তাহা আমার বলার দরকার করে না, কারণ ইতিহাসই তাহা প্রমাণ করিয়াছে। এ সম্পর্কে অনেক বই পুস্তকও লেখা হইয়াছে, সে জন্য সে সব যুক্তি প্রমাণে আমি লিপ্ত হইতে চাই না।

www.pathagar.com

আমি সব চেয়ে বড় পয়েন্ট একতা এবং দেশপ্রেম বা জাতীয়তাবোধ সম্পর্কেই কিছু বলিতে চাই এবং দেখাইতে চাই যে, আমাদের মহান দুই নেতা যেহেতু তাহারা তৌহিদবাদী– বস্তুবাদী, যুক্তিবাদী বা শেরেকবাদী নন। সে জন্য তাহারা কেমন করিয়া সত্যে উপনীত হইয়াছেন এবং তাঁহাদের স্থান জাগতিক অন্যান্য মনীষীগণের চেয়ে কত উর্ধ্বে?

কায়েদে আ'যম মরহুম যে ঈমান ও একীনের কথা বলিয়াছেন, কিসের উপর ঈমান? কিসের উপর একীন? সেই কথাটি কার্যে রূপান্তরিত করিয়াছেন আমাদের বর্তমান মহান নেতা। তিনি পরিস্কার করিয়া ঘোষণা দিয়াছেন যে, লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহই আমাদের আমল, একীন ও ঈমানের বস্তু এবং ইহার মধ্যেই আমাদের শক্তির উৎস এবং এই ভিত্তিতে যে জিহাদ হইবে সেই জিহাদের ভিতর দিয়াই মুসলিম জাতি সঞ্জীবিত হইবে এবং তাহাদের সব সংকীর্ণতা, অনৈক্য, দুর্বলতা ও দুর্নীতি দূর হইয়া তাহাদের মধ্যে ঐক্য, বীরত্ব ও প্রাণ চাঞ্চল্য আসিবে।

আমাদের বর্তমান মহান নেতার কথা এবং ধারণা এখন আর শুধু কথা এবং শুধু ধারণাই নাই, এখন তাহা বাস্তব সত্যে পরিণত হইয়াছে। তিনি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ পড়িয়া এই ঘোষণাই দিয়াছেন যে, আমি প্রভু নই, আমি খোদা নই, আমি শক্তির উৎস নই, আমি একতার মালিক নই, আমি দেশের বা দেশপ্রেমের অর্থাৎ জনগণের দেশের মালিক নই, যিনি সর্ব শক্তির মূল উৎস তিনিই সর্ব শক্তিমান খোদা, সেই এক খোদারই আমরা সকলে পূজা করিব, সেই এক খোদা ছাড়িয়া অন্য কারুর কথাকে, নীতিকে বা হুকুমকে বিনা শর্তে আমরা স্বীকার করিতে পারিব না। শুধু এক খোদার গোলামী আমরা স্বীকার করিতেছি, তাছাড়া অন্য কারুর গোলামী আমরা স্বীকার করি না এবং নিখুঁত নির্ভুল আদর্শ আমরা অন্য কোথাও পাইব না। এক আল্লাহর প্রেরিত শেষ নবীর কাছে ছাড়া। কাজেই যেই সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ মোহাম্মদ (সাঃ)কেই আমরা আমাদের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক আদর্শরূপে গ্রহণ করিতেছি। তাছাড়া অন্য কেহ আমাদের আদর্শ নয়। এই কথা ঘোষণা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আল্লাহর রহমত আসা শুরু হইয়া গিয়াছে, জাতির মধ্যে ঐক্য আসিয়া গিয়াছে। নেতার উপর আস্থা আসিয়া গিয়াছে ও সেনাবাহিনীর মধ্যে দেশ রক্ষার সামনে জীবন রক্ষার কোনই মূল্য নাই– এই প্রেরণা আসিয়া গিয়াছে। আল্লাহর হাতেই দেল, তিনি দেলের মধ্যেই ঐ প্রেরণা জাগাইয়া দিয়াছেন। সে জন্যই তাহারা অতুলনীয় দৃষ্টান্ত দুনিয়াতে কায়েম করিয়াছেন।

অতএব, দেখা গেল চাক্ষুষভাবে বাস্তব ভাবে প্রমাণ হইয়া গেল যে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহই মুসলিম জাতির শক্তির মূল উৎস। এর

www.pathagar.com

দ্বারা জাতীয় ঐক্য আসবে, এর দ্বারা বিজ্ঞানের উন্নতি হবে, এর দ্বারা দেশপ্রেম জাগবে, এর দ্বারাই পুঁজিপতিরা অকাতরে অর্থ দান করতে পারবে, এর দ্বারা মোজাহেদীনরা অকাতরে নির্দ্বিধায় দেশের জন্য, জাতির জন্য জীবন দিতে পারবে নতুবা মাটি পূজা, অর্থ পূজা, পুঁজিপতি পূজা, শক্তি পূজা করে কিছুই হবে না। ইহাই নির্ভুল সত্য, এই সত্যের দ্বার উদঘাটন করিলেন আমাদের বর্তমান মহান নেতা। এই জন্যই পাইয়াছেন তিনি জাতির অবিচ্ছিন্ন ও নিরংকুশ আস্থা ও সমর্থন। কিন্তু তাঁহার স্মৃতিপটে রাখার জন্য এবং জাতির মধ্যেকার চাটুকারদেরে সতর্ক করিয়া দেওয়ার জন্য সত্য কথায় আমি এখানেই বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, ইসলাম কখনো ব্যক্তিপূজা সমর্থন করে না। ইসলামের আদর্শ ও ঈমান যাবৎ আছে তাবৎই ব্যক্তির মর্যাদা, নতুবা ব্যক্তি যদি আদর্শচ্যুত হয় তখন আর সে ব্যক্তির কোনই মূল্য নাই ইসলামে।

(মোছলেম জাতির শক্তির উৎস যে, লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ কলেমা ভিত্তিক জিহাদেরই মধ্যে, এই বিষয়ের ঐতিহাসিক প্রমাণ সম্পর্কে আলোচনা আমি করিতে পারিতেছি না। এ সম্পর্কে ইসলামী ইতিহাসের যুবক ছাত্র বন্ধুদেরে রিসার্চ করিয়া অসংখ্য সত্য ঘটনাবলীর দ্বারা কওমের ভবিষ্যৎ বংশধরগণের খেদমত করিতে আমি অনুরোধ করিতেছি।

(১৮/১০/১৯৬৫ : দৈনিক আজাদে প্রকাশিত)

আমপারার ভূমিকা

দয়াময় আল্লাহর নামে, যিনি অত্যন্ত দয়ালু

কুরআন আল্লাহর বাণী। ইহা কোন মানুষের রচিত পুস্তক নহে। ইহা প্রকৃত সত্য। ইহা কোন কাল্পনিক গল্প নহে। ইহার শুধু ভাব ও অর্থগুলি যে আল্লাহর তরফ হইতে আসিয়াছে, শব্দগুলি ও ভাষা মানুষে রচনা করিয়া নিয়াছে তাহাও নহে; বরং ইহার ভাব ও ভাষা, অর্থ ও শব্দ সবই আল্লাহর তরফ হইতে জিবরাঈল আমীনের মারফতে হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াসাল্লামের উপর অবতীর্ণ হইয়াছে। কাজেই ইহার তফসীর বা ব্যাখ্যা করা যে কত কঠিন তাহা বলাই বাহুল্য। কত হাজার হাজার মোফাচ্ছের ও ব্যাখ্যাকারী তাঁহাদের মূল্যবান জীবন কুরআনের খেদমতে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছেন, আজীবন কুরআনের খেদমতেই লাগিয়া রহিয়াছেন, কত ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কত ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন, কাজে পরিচয় দিয়াছেন তবুও শেষ কথায় তাঁহারা এই বলিয়া গিয়াছেন যে, কুরআনের হক কিছুই আদায় করিতে পারিলাম না। এ ক্ষেত্রে আমার ন্যায় অজ্ঞ, অজ্ঞান ও অবোধ লেখক যদি দাবী করি যে, আমি

www.pathagar.com

কুরআনের তফসীর লিখিতে বসিয়াছি তবে বোধ করি আমার চেয়ে পাগল আর কেহই হইবে না।

সুতরাং আমি বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, আমি কুরআনের তফসীর লিখিবার ক্ষমতা রাখি না। তবে কুরআনের কেন্দ্র হইতে বহুদূরে বাংলাদেশে প্রায় চৌদ্দ শত বৎসর পরে দুনিয়ায় আসিয়াছি। এ দেশীয় লোকের দুর্ভাগ্যবশতঃ এরা মাতৃভাষার দিক দিয়া কুরআনের ভাষা, অক্ষর, আকৃতি ও উচ্চারণ এমনকি ডাইন দিক দিয়া আরম্ভের নেয়ামত হইতেও মাহরুম। এরা কোন্ পাপের ফলে যেন বৈদিক অক্ষরের আকৃতি, উচ্চারণ এবং বাম দিক দিয়া আরম্ভের কু-অভ্যাসে অভ্যস্ত। যখন বাংলা ভাষার অক্ষরের আকৃতি, উচ্চারণ এবং প্রকৃতি পর্যন্ত কুরআনের উল্টা তখন তাহার শব্দগুলি যে কত দূরের তাহাও সহজেই অনুমেয়। কিন্তু কুরআনের ন্যায় আল্লাহর সর্বাপেক্ষা অধিক পেয়ারা ও মূল্যবান নেয়ামত হইতে কোন দেশ কোন ভাষা বা কোন জাতি বঞ্চিত থাকা তাহাদের চরম দুর্ভাগ্যের আলামত।

এই যুগে ছাপাখানা সহজ সুলভ হওয়ার কারণে এবং লোক সমাজের জড়ত্বের দিকে বেশী ঝুকিয়া পড়ার কারণে দুর্ভাগ্যবশতঃ যাহারা কুরআনের তফসীর বুঝা তো দূরের কথা সাধারণ আরবী ভাষায়ও ব্যুৎপত্তি রাখেনা তাহারাও পয়সার লোভে বা আশায় কুরআনের তাফসীর লিখিয়া বাজারে বিক্রয় করতঃ যথেষ্ট পয়সা রোজগার করিতেছে বা লাভ করিতেছে। জানিনা আমি আবার কোন্ শ্রেণীভূক্ত! তবুও মনোবেদনায় না থাকিতে পারিয়া যাহা কিছু বুঝিয়াছি তাহার যৎকিঞ্চিৎ বঙ্গীয় মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দের খেদমতে কথঞ্চিৎ ইসলামের খেদমতের নিয়তে পেশ না করিয়া পারিলাম না।

কুরআনের ভাষা অতি মধুর, অতি হৃদয়গ্রাহী এবং ব্যাপক। কোন ভাষায় বিশেষতঃ বাংলা ভাষায় ইহার পূর্ণ মাধুর্য রক্ষা করা যায় না। অবশ্য বিষয়গুলির কথঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায় বটে। অতএব যদি কেহ বাংলা অনুবাদ পড়িয়া মজা না পান তবে মনে করিবেন না যে, আসল কুরআনের ভাষা মজাদার নহে। নিশ্চয় জানিবেন-- কুরআনের বিষয়বস্তু তো মধুর ও মূল্যবান আছেই, ভাষাও অত্যন্ত মজাদার এবং চিত্তাকর্ষক।

প্রিয় পাঠক! ইহা আল্লাহর কালাম। ভাষা বাংলা বটে, কিন্তু বিষয় তো অনেক উচ্চদরের (লওহে মাহফুজের); কাজেই যদি কোন মোহাক্কেক আলেমের নিকট ছবক লইয়া তরজমা পড়িয়া লওয়া যায় তবে তাহাই অতি উত্তম। অন্ততঃ যদি কোন জায়গায় কোন একটি বাক্য না বুঝিতে পারেন তবে নিজের কল্পনার ঘোড়া না দৌড়াইয়া কোন বিজ্ঞ আলেমের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া লওয়া উচিত। কেননা আল্লাহর কালামের অর্থ যদি কেহ আল্লাহর মতের বিরুদ্ধে গঠন করে,

www.pathagar.com

তবে সে নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে মস্ত বড় অপরাধী সাব্যস্ত হইবে। আর যদি কোন বিজ্ঞ পাঠক আমার তরজমার মধ্যে কোন ভুল-ত্রুটি পান (ভুল-ত্রুটি হওয়ার সম্ভাবনা বিচিত্র নয়; বরং না থাকাই বিচিত্র) দূর হইতে কটুক্তি না করিয়া আমাকে জানাইয়া দিলে আমি কৃতজ্ঞ হইব এবং পরবর্তী সংস্করণে তাহা সংশোধনের চেষ্টা করিব।

এই মহান গ্রন্থে আমি দুইটি জিনিস সন্নিবেশিত করেছি-

(১) কুরআন পাকের প্রথম তফসীর- তফসীরে ইবনে আব্বাস থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত আমাদের ছলফে ছালেহীন বুযুর্গানে দ্বীন মুরব্বীগণ যে সমস্ত তফসীর লিখেছেন আমি এই মহান তফসীরে উহার সার সংক্ষেপ সন্নিবেশিত করেছি।

(২) আধুনিক যুগ জিজ্ঞাসার মোকাবেলায় আমার দীর্ঘ জীবনের সাধানায় কুরআনে পাকের যাহা বুঝে আসিয়াছে উহা অতি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। উভয় ধরণের শিক্ষার সুযোগ আমায় আল্লাহ দান করার কারণে, উভয় শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে আমার মেলামেশার সুযোগ ছিল। এই জন্যই এ লেখা আমার জন্য সহজসাধ্য হয়েছে।

(৩) "এ তফসীরে আমি নিজের থেকে একটি কথাও লিখি নাই। আল্লাহ পাকের দরবারে আমি নিজেকে সম্পূর্ণ সোপর্দ করে দিয়াছি, আল্লাহ পাক আমার দেলে যাহা বুঝ দিয়াছেন উহাই আমি শুধু নকল করেছি মাত্র। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যে কেহ এই কথাগুলি অন্তর দিয়া পড়িবেন, সত্যিকার কুরআন বুঝিয়া তিনি আল্লাহর মহব্বত লাভে সৌভাগ্যশালী হইবেন।"

নাচিজ

শামছুল হক

১৩৮০ হিঃ ১৯৬১ ইং

পাঞ্জ সূরার ভূমিকা

লেখকের আরয- মুখবন্ধ

আমি কেন এই পাঁচটি সূরার তফসীর একত্রে প্রকাশ করিতেছি? ইতিপূর্বে আমার লেখা সূরা-ইয়াসীন, পাঞ্জসূরা প্রকাশিত হইয়াছে। কুরআনের বহু আশেক ও প্রেমিক আমার শুক্‌রিয়া করিতে আসিয়াছে। আমি বলিয়াছি, আল্লাহ্‌র শুক্‌র করুন, কুরআন-সমুদ্রের গভীরে অসংখ্য অগণ্য অমূল্য রত্ন-ভান্ডার মণি-মাণিক্য

www.pathagar.com

হীরা-জওয়াহেরাত লুক্কায়িত আছে, আমি আর কিছুই করি নাই, সরল ভাষায় সেই মণি-মাণিক্যগুলিকে আপনাদের সামনে পেশ করিয়াছি মাত্র। আমার কোন দান নয়- দান আল্লাহ্‌র। শুক্র করুন এবং যাহার দ্বারা সম্ভব হয় মূল আরবী ভাষায় কুরআনের অপার সৌন্দর্য, মাধুর্য, গাম্ভীর্য ও গভীরতা, ব্যাপকতা, সনাতনতা ও শাশ্বততা নিজ চোখে অবলোকন করার জন্য চেষ্টা করুন। পুরা কুরআনের পুরা তফসীর না জানি কবে প্রকাশিত হয় বা আদৌ আমার ভাগ্যে আছে কি না? আপনাদের নিকট দোয়া চাই, পুরা কুরআনের পুরা তফসীর আমি গোনাগারের হাতে লেখাইয়া বাংলাদেশের প্রতিটি সত্যান্বেষী মানুষের হাতে যেন আল্লাহ পৌঁছাইয়া দেন এবং মানুষের দেলের মধ্যে আল্লাহর প্রেম ও ভক্তি এবং আল্লাহ কালামের ও আল্লাহর ভাষার প্রতি যেন আসক্তি ও আযমত জাগিয়া উঠে।

১। সূরা-ফাতিহা "উম্মুল-কুরআন" অর্থাৎ কুরআনের মা। অর্থাৎ, সূরা ফাতিহা যেন আল্লাহর সংক্ষিপ্ত সার নির্ভাব ও মত্ন এবং সারা কুরআন যেন আল্লাহরই নিজের রচিত নিজের বর্ণিত শরাহ ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ। এর মধ্যে আল্লাহর পরিচয় ও প্রশংসা আছে, আল্লাহ কি করিয়াছেন, কি করিবেন তাহাও আছে, মানুষের কি কর্তব্য তাহাও আছে, বান্দার দাসত্বের শপথ ও অঙ্গীকারও আছে, সত্য পথের আকুল প্রার্থনাও আছে, সত্য পথের সন্ধানও আছে, মিথ্যা হইতে সত্যকে পৃথক করিয়া চিনবার উপায়ও আছে।

২। কলেজে ওমর খৈয়ামের প্রবন্ধে আখেরাত নাই শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, এক্ষেত্রে ওমর খৈয়ামের বা যে কোন কবি সাহিত্যিক বা দার্শনিক বৈজ্ঞানিক মানুষের তুলনায় মানুষের স্রষ্টা, বিজ্ঞান দর্শনের স্রষ্টা আল্লাহর সত্য শিক্ষাকেই যে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত, সে সম্পর্কে কাহারও দ্বিমত হইতে পারে বলিয়া আমার ধারণা নাই। অবশ্য স্রষ্টা আল্লাহর বর্ণিত সত্য শিক্ষা কি? তাহা জানার অভাব আছে বলিয়াই হয়ত কেহ সত্যকে বাদ দিয়া মিথ্যার অনুসারী হইয়া যাইতে পারে বটে। তাহা হইলে দেখা গেল যে, সত্য প্রকাশের প্রয়োজন অত্যধিক। এই ধারণার বশবর্তী হইয়াই আমি সংক্ষিপ্ত "সূরা-ক্বাফ্"-এর মর্মার্থব্যঞ্জক অনুবাদ করিতে বাধ্য হই এবং ইহাকে সূরায়ে-ফাতিহার সাথে সংযোজিত করিতে প্রস্তুত হই। পাঠক লক্ষ্য করিবেন, সূরা-ফাতিহার মধ্যে অতি সংক্ষেপে কর্মফল দিবসের উল্লেখ আছে, "সূরা-ক্বাফ"-এ উহারই অতি সংক্ষেপে কিছুটা বিশ্লেষণ করা হইয়াছে, নতুবা কুরআনে আরও অধিক বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। মানুষের মতের মধ্যে দুর্বলতা থাকিতে পারে, দ্বিমত থাকিতে পারে, কিন্তু আল্লাহর প্রদত্ত সত্যের মধ্যে আদৌ দুর্বলতা নাই, আদৌ কোন দ্বিমত বা ইতস্ততা নাই। এখানে শুধু সত্যই সত্য, সুদৃঢ় প্রত্যয়ই প্রত্যয়।

www.pathagar.com

৩। সূরা-ফাতিহার মধ্যে সত্য পথের আকুল আবেদন পেশ করা হইয়াছে। সূরা-হুজুরাতের মধ্যে মুসলিম সভ্যতাও যে ইসলাম ধর্মের একটি বড় অঙ্গ, সে জন্য মুসলিম সমাজের সভ্যতার কিঞ্চিৎ নমুনা সূরা-হুজুরাতের মধ্যে বর্ণনা করা হইয়াছে, বংশ গৌরব আভিজাত্যবাদ ইসলামে নাই, ঠাট্টা-বিদ্রূপ টিটকারি, কেউ কেউকে তুচ্ছ করা অহঙ্কার করা ইসলামে নাই, বড়র প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন, ছোটর প্রতি স্নেহ প্রদর্শন, একতাবদ্ধ জমাআত গঠন করণ, পরনিন্দা বর্জন, বদগোমানি বর্জন মন্দকে মন্দ জানিয়া উহা অপসারণের চেষ্টা এবং ভালকে ভাল জানিয়া উহা প্রবর্তনের চেষ্টাই যে সমাজ বন্ধনের প্রধান উপায় এবং সমাজ বন্ধনই জাতি ও সমাজকে ভাল করার প্রধান উপায় ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয় সূরা-হুজুরাতের মধ্যে অতি সংক্ষেপে অতি জোরদার ভাষায় বর্ণনা করা হইয়াছে এবং সমাজ সভ্যতাকেও ইসলাম ধর্মের অঙ্গীভূত করা হইয়াছে, সমাজ সভ্যতার জন্য অন্য জাতির মুখাপেক্ষী বা অনুসরণ প্রিয় হইতে দেওয়া হয় নাই, Inriority complex বা হেয়তা বোধের বিকট রোগে যাতে মুসলিম জাতিকে স্পর্শ না করিতে পারে, সে ব্যবস্থা করা হইয়াছে, সে জন্য যুগের প্রয়োজন বোধে সূরা-হুজুরাতকেও আমি সূরা-ফাতিহার সঙ্গে সংযোজিত করিয়াছি।

৪। "সূরা-ছফ্"-এর মধ্যে মুসলিম জাতির প্রধান চরিত্র ও প্রধান কর্তব্য সে সত্য এবং সত্যের অনুসরণ সত্যের প্রকাশ ও সত্যের প্রচার একথা অতি পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে

৫। সূরা-জুমআর মধ্যে মুসলিম জাতির প্রধান দায়িত্ব যে দুনিয়ার অর্থ উপার্জন সত্ত্বে আল্লাহর বাণী এবং বাণীবাহক রাসূলের সুন্নত (আদর্শ) ও জামাতের (একতার) সংরক্ষণ একথা অতি গুরুত্ব সহকারে বর্ণনা করা হইয়াছে, এজন্য আমি এই দুইটি সূরাকেও সূরা-ফাতিহার সঙ্গে সংযোজিত করিয়া দিয়াছি। আশা করি, পাঠকগণ কুরআনের সুন্দর মধুর সাহিত্যের আলোকে নিজেদের জীবনকে আলোকিত করিবেন।

নাচিজ শামছুল হক ২৩/১/৬৮

বুখারী শরীফের ভূমিকা ও পরিচিতি

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আলহামদুলিল্লাহি ওয়াহদাহু ওয়াসসালাতু ওয়াস্সালামু আলা রাসূলিহিল্লাজি লা নাবিয়্যা বা'দাহু ওয়া আলা আলিহী ওয়া আস্হাবিহীল্লাযীনা আছারুদ্দীনা আ'লাদ্ দুনিয়া ওয়া আছারুহু বিআইনিহী।

www.pathagar.com

সারা বিশ্বের মানুষ-জাতির শুধু কল্যাণ কামনা নয়, কল্যাণ সাধনের জন্য সৃষ্টি হইয়াছিল মুসলিম জাতির এক জাতি এবং এক ভাষার কর্মসূচী। প্রাথমিক যুগের বীর মুসলিমগণ তাঁহাদের কর্তব্য পালন করিয়া কর্মসূচী অনুযায়ীই কাজ করিয়াছিলেন। সিরিয়া, ফিলিস্তিন, জর্দান, ইরাক, লেবানন, মিসর, তিউনিস, আলজেরিয়া এমনকি স্পেন পর্যন্ত সকলের ভাষা একই ভাষা একই আরবী ভাষা হইয়া গিয়াছিল। সকলেই এক জাতি এবং এক ভাষাভূক্ত হইয়া গিয়াছিল। একটু যখন দুর্বলতা ও শিথিলতা আসিল তখন পারস্য, আফগানিস্তান ও ভারতের অধিকাংশ প্রদেশে ভাষার দুর্বলতা ও শিথিলতা আসিল। তখন পারস্য, আফগানিস্তান ও ভারতের অধিকাংশ প্রদেশে ভাষা দেশীই রহিয়া গিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার অক্ষর একই আরবী অক্ষরে পরিবর্তিত করিয়া লওয়া হইয়াছিল।

কিন্তু হতভাগা আমরা বাঙ্গালী মুসলমান- যাহারা নিজ কর্তব্য ও দায়িত্ব হইতে অনেক পিছনে পড়িয়া রহিয়াছি। আরবী ভাষা তো দূরের কথা, আরবী অক্ষরেও দেশী ভাষাকে লিখিয়া দেশের লোকের নিকট সমাদৃত করিতে পারি নাই। এমনকি বহু আগে যে কাজ করার দরকার ছিল যে, দেশে যে ভাষা বা যে লিখন প্রণালী প্রচলিত আছে তাতেই কোরআন-হাদীছ অনূদিত করিয়া দেশের লোকদের চাহিদা মিটানো হউক এবং আলো দান করা হউক, তাহাও করা হয় নাই। পরম পরিতাপের বিষয় আজও বাংলাভাষায় কোরআনের বা হাদীছের এমন কোন তরজমাকারক নাই বলিলেও চলে যাহাকে সর্বদিক দিয়া বিশ্বস্ত এবং বিশ্বাসযোগ্য বলা যাইতে পারে। বিশ্বস্ত বলা যায় তাকে যার আগে থেকে কোরআনের এবং হাদীছের বিরুদ্ধে মতবাদ না আছে এবং বিশ্বাসযোগ্য বলা যায় তাকে যার সব দিক দিয়া পূর্ণ জ্ঞান যোগ্যতা আছে- যিনি চৌদ্দশ' বছর আগের ভাষায় লিখিত মূল বিষয়টি নিজে হৃদয়ঙ্গম করিয়া বর্তমান যুগের মানুষের ভাষায় অবিকলরূপে যেমনটি তেমন বুঝাইয়া হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিতে পারেন।

প্রায় দশ বৎসর আগে বুখারী শরীফের বাংলা অনুবাদের জন্য একটি ভূমিকা লিখিয়াছিলাম, কিন্তু বুখারী শরীফের তরজমার কাজে হাত দিতে সাহস করি নাই। দেশের ও জাতির চাহিদা অতি বেশী, প্রয়োজন অত্যন্ত অধিক, সে জন্য বারবার মনে ব্যথা পাইয়াছি, কিন্তু সাহস পাই নাই। ক্ষুধার্ত যদি সুখাদ্য না পায়, তবে শেষে অখাদ্য-কুখাদ্য খাইয়াও ক্ষুধা নিবৃত্ত করে। আর দুনিয়াতে একদল লোক যে কুখাদ্য লইয়া বসিয়াও আছে- এই ভাবনায় মনে মনে বহুবার ব্যথিত হইয়াছি, তাহা সত্ত্বেও এত বড় বিশাল সমুদ্র পাড়ি দেওয়ার ন্যায় কাজে হাত দিতে সাহস পাই নাই।

আল্লাহ দর্জা বুলন্দ করিয়া দিন আমার পরম দোস্ত মাওলানা আজিজুল হক সাহেবের যে, তিনি এত বড় বিরাট কাজে হাত দিতে সাহস করিয়াছেন। তিনি জওয়ানে ছালেহ্- তিনি বাস্তবিকই এই কাজের যোগ্যতা রাখেন। যতদূর আমার

www.pathagar.com

জানা আছে- বুখারী শরীফ বর্তমান যুগে বাংলাদেশে তাঁহার চেয়ে অধিক যত্নসহকারে এবং আদ্যোপান্ত বুঝিয়া আর কেহ পড়েন নাই এবং বুখারী শরীফের খেদমতও এতদূর কেহ করেন নাই। তিনি হযরত শায়খুল ইসলাম শাব্বির আহমদ ওসমানী রহমতুল্লাহে আলইহির খালেছ-খাছ শাগরেদ। পড়ার যমানাতেই তিনি ১৮০০ পৃষ্ঠাব্যাপী শরাহ উর্দু ভাষায় লিখিয়াছেন। স্বয়ং হযরত শায়খুল ইসলাম তাঁহার লেখা সঙ্গে সঙ্গে আদ্যোপান্ত দেখিয়াছেন, আনন্দিত হইয়াছেন এবং প্রশংসা করিয়াছেন। (বর্তমানে উহা পাকিস্তানে ছাপা হইয়াছে।) বুখারী শরীফ পড়ার পরও প্রায় এক বৎসর হযরত শায়খুল ইসলামের খেদমতে থাকিয়া এছলাহে-নফস ও তাযকিয়ায়ে বাতেনের কাজে লিপ্ত ছিলেন এবং বুখারী শরীফের শরাহ লিখিয়া তাঁহাকে দেখাইয়াছিলেন। কাজেই তাঁহার যোগ্যতায় এবং বিশ্বস্ততায় কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না।

অতঃপর কয়েকবার বুখারী শরীফ এবং অন্যান্য ছেহাহ্ ছেত্তা হাদীছের কেতাব দরস দেওয়ার পর যখন বাংলাদেশের অভাব মিটানোর জন্য বুখারী শরীফের বাংলা অনুবাদ করা তিনি শুরু করিয়াছিলেন তখন আমার খুশীর আর সীমা রহে নাই।

আল্লাহর শোকর করিয়াছি, মক্কা শরীফে গিয়া হাতীমে, মাতাফে, মাকামে ইব্রাহীমে দোয়া করিয়াছি, মদীনা শরীফের রওজা পাকে দাঁড়াইয়া দোয়া করিয়াছি- এই বিরাট খেদমত আল্লাহ পাক তাঁহার দ্বারা নিন; বাংলার মুসলমানের জরুরত মিটান। মাওলানা আজিজুল হক সাহেব লিখিয়া লিখিয়া আমাকে দেখাইয়াছেন, অনেক জায়গা আমি তাঁহাকে বুঝাইয়া দিয়াছি, অনেক জায়গা দেখিয়া কিছু কিছু সংশোধন তাঁহার দ্বারাই করাইয়াছি। আল্লাহ পাক তাঁহার দর্জা বুলন্দ করুন, কবুল করুন, পাঠকগণকে ইহা হইতে ফয়েজ দান করুন, ইহ-পরকালের ভাল করুন। আমি গোনাগার আল্লাহ পাকের মহান দরবারে করুন সুরে দোয়া করি। আমীন !

নাচিজ শামছুল হক

১০/০৬/১৯৫৭

মাওলানা নূর মোহম্মদ আযমী অনূদিত বাংলা মেশকাত শরীফ সম্পর্কে অভিমত

আল্লাহ তা'আলা তাঁহার নবীকে ওহীর মাধ্যমে যে জ্ঞান দান করিয়াছেন তাহা দুই প্রকার ঃ এক প্রকার জ্ঞান যাহা মৌল। ইহার নাম "কিতাবুল্লাহ" বা "আল কুরআন"। ইহার ভাব ও ভাষা উভয়ই স্বয়ং আল্লাহর। নবী করীম (সাঃ)

www.pathagar.com

ইহাকে আল্লাহর ভাষায়ই প্রকাশ করিয়াছেন। দ্বিতীয় প্রকার জ্ঞান যাহা প্রথম প্রকার জ্ঞানের ভাষ্য। ইহার নাম "সুন্নাহ" বা "আল হাদীস"। ইহার ভাব আল্লাহর। নবী করীম (সাঃ) ইহাকে আপন কথা, কার্য ও সম্মতি অর্থাৎ আপন জীবন দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাও প্রথমটির ন্যায় শরীয়তে মুহাম্মদীর একটি উৎস। অতএব, উম্মতে মুহাম্মদী প্রথম প্রকার ওহীর সংরক্ষণের জন্য যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন এই দ্বিতীয় প্রকার ওহীর সংরক্ষণের জন্যও ঠিক সে সকল ব্যবস্থাই করিয়াছেন অর্থাৎ শিক্ষাকরণ ও হেফ্য (মুখস্ত) করণ, অন্যদের উহা শিক্ষাদান, কিতাবে উহা লিপিবদ্ধ করণ এবং বাস্তবে উহাকে কার্যকরী করণ। আর এই সকল ব্যবস্থা সাহবীগণের যুগ হইতে এ পর্যন্ত বরাবর অব্যাহত রহিয়াছে। কোন যুগেই এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্রও শিথিলতা প্রদর্শিত হয় নাই। (অবশ্য সাহাবা ও তাবেয়িনদের যুগে লিখন অপেক্ষা মুখস্ত করণই প্রধান ছিল)।

এতদ্ব্যতীত আইনবেত্তাগণ (ফকীহগণ) আল কুরআনের ন্যায় ইহার আইনের দিক আলোচনা করিয়াছেন, দার্শনিকগণ (মোতাকাল্লেমীনগণ) ইহার দার্শনিক তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন, সূফীগণ ইহার আধ্যাত্মিক দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন এবং মুহাদ্দেসীনগণ বিশেষ করিয়া জারাহ-তা'দীলকারী ইমামগণ ইহার বিশুদ্ধতা রক্ষার চেষ্টা করিয়াছেন, আর এ ব্যাপারে ইঁহারা এত অধিক দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছেন যাহার নজীর পেশ করিতে দুনিয়া সক্ষম নহে।

মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী সাহেব তাঁহার মেশ্‌কাত-অনুবাদের ভূমিকা "হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস"-এ হাদীস সম্পর্কে উম্মতে মুহাম্মাদীর এ সকল তৎপরতারই বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। অতঃপর তিনি মূল কিতাবের বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ব্যাখ্যায় তিনি দৃঢ়তার সহিত মোতাকাদ্দেমীনদের (পূর্ববর্তীদের) মতেরই অনুসরণ করিয়াছেন। আমার মতে বাংলা ভাষায় মেশ্‌কাত শরীফের সুষ্ঠু ও নির্ভরযোগ্য অনুবাদ ইহাই প্রথম। আর ইহার ভূমিকা অর্থাৎ "হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস"-এর ন্যায় একটি মূল্যবান কিতাব বাংলা ভাষায় কেন উর্দু প্রভৃতি ভাষায় লেখা হইয়াছে বলিয়াও আমার জানা নাই। সত্যই ইহা বাংলা সাহিত্যে এক অনন্য অবদান। প্রকাশক সাহেবের নিকট অনুরোধ, তিনি যেন ইহার উর্দু অনুবাদ প্রকাশের ব্যবস্থা করেন।

নাচিজ- শামছুল হক

২/৯/৬৫ইং

www.pathagar.com

হায়াতে মাদানী গ্রন্থের ভূমিকা

নাহমাদুহু ওয়া নুছাল্লী আলা রাসূলিহিল কারীম

মানুষ এ দুনিয়ার পয়দায়েশ । তার আত্মা উর্ধ্ব জগতের পয়দায়েশ। এই জগতে আসিয়া দেহ ও আত্মার সংমিশ্রণ হয়। মানবত্বের পূর্ণত্ব প্রাপ্তির জন্য তথা কামালাত হাছিলের জন্যই মানুষ এ জগতে আসে। অবশ্য কেহ সেই কামালাত হাছিলের ক্ষেত্রে কামিয়াব হইয়া ফেরেশ্‌তার চাইতেও উর্ধ্ব আসন অধিকার করে আর কেহ না-কামিয়াব হইয়া পশুত্বের স্তরেরও নীচে নামিয়া যায়।

কামালাত হাছিলের তিনটি পর্যায় ঃ ইলম, সাধনা ও কর্মজীবন। অর্থাৎ জ্ঞান ও বিদ্যা অর্জনের পর্যায়ে এবং জ্ঞান ও বিদ্যাকে কার্যে পরিণত করিয়া জীবনকে কার্যকরীভাবে উন্নত করিবার পথে সর্বপ্রকার সংযম,ত্যাগ ও সংগ্রাম করা, তৎপর কর্মক্ষেত্রে নামিয়া ধর্মের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া।

মাওলানা মাদানী (রহঃ) সারা বিশ্বের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন ক্ষণজন্মা মনীষীগণের অন্যতম ছিলেন। তাঁহার জ্ঞান ও গুণ সম্বন্ধে বর্ণনা করা আমার ন্যায় গুণহীন ক্ষুদ্র জ্ঞান বিশিষ্ট লোকের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। কিন্তু মানুষ সাধারণতঃ একটি আদর্শ সম্মুখে না পাইলে এবং জীবন গঠনের তরতীব না পাইলে জীবন গঠন করিতে পারে না। যেসব মানুষ মাওলানা মাদানীর ব্যক্তিত্বের কিছু পরিচয় জানেন, তাঁহারা এক বাক্যে স্বীকার করিবেন যে, দুনিয়াতে আদর্শ মানুষ বলিতে শেষ যুগে যাঁহারা পয়দা হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সেই সিলসিলার শেষ ব্যক্তি ছিলেন মাওলানা মাদানী (রহঃ)। তাঁহার পরে আর সেইরূপ সবদিককার কামেল পুরুষ আমরা দুনিয়াতে দেখিতে পাই না। সেইজন্য তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে কিছু আলোকপাত করা একান্ত জরুরী মনে করিতেছি, যাহাতে ভবিষ্যৎ বংশধরগণ তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইতে পারে। বিশেষ করিয়া দূরের আদর্শকে মানুষ অতিমানবিক বা সত্যযুগীয় আদর্শ মনে করিয়া উহার অনুকরণ অনুসরণকে অসম্ভব মনে করিয়া বসে, আর নিকটের আদর্শকে এই যুগেরই বলিয়া সম্ভব মনে করিয়া তাহার অনুসরণ করিয়া আগে বাড়িতে সাহস পায়, সেইজন্য মাওলানা মাদানীর আদর্শ জীবনের কিয়দংশ আলোচনা করা একান্ত আবশ্যক মনে করিতেছি।

আজকাল জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে মানুষ যাকে তাকে মুহাদ্দিস বলিয়া থাকে। দারুল উলূম দেওবন্দের মুহাদ্দিস্ এবং ছদরে- মুদাররিস্ ও সরপরস্ত যেমন তেমন লোক কখনও হইতে পারে না। এ পর্যন্ত যে কয়জন দারুল উলূম দেওবন্দের ছদ্‌রে মুদাররিস বা সারপরস্ত হইয়াছেন, তাঁহারা ছিলেন জ্ঞানের সমুদ্র, আধ্যাত্মিক জগতের সেরা, মানবত্বের প্রতিচ্ছবি; যথা-

www.pathagar.com

১। মাওলানা মোহাম্মাদ কাসেম নানুতবী (রহঃ)
২। মাওলানা রশীদ আহ্মদ গাঙ্গোহী (রহঃ)
৩। মাওলানা মোহাম্মদ ইয়াকুব নানূতবী(রহঃ)
৪। শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহ্মূদুল হাসান দেওবন্দী(রহঃ)
৫। মাওলানা খলীল আহ্মদ সাহারানপুরী (রহঃ)
৬। মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ)
৭। মাওলানা সৈয়দ আনওয়ার শাহ্ কাশ্মীরী (রহঃ)
৮। মাওলানা সৈয়দ হুসাইন আহ্মদ মাদানী (রহঃ)

ইঁহাদের মধ্যে সর্বশেষ ছিলেন শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা সৈয়দ হুসাইন আহ্মদ মাদানী (রহঃ)। ইঁহারা সকলেই ছিলেন কামেল আদর্শ পুরুষ। কামেল আদর্শ পুরুষের পক্ষে যা কিছু জ্ঞান ও গুণের প্রয়োজন, সে সবই মাওলানা মাদানী অর্জন করিয়াছিলেন।

ইল্ম বা বিদ্যার্জনের পর্যায়ে ইল্মে আদব বা আরবী সাহিত্য জ্ঞান ও উহার যাবতীয় উপকরণ ইত্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া হাদীস, তফসীর, দর্শন, ভূ-গোল, ইতিহাস, দেহতত্ত্ব বিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ব-বিজ্ঞান, ইল্মে সিয়াসত বা রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইলমে কালাম ও তাছাউফ প্রভৃতি ত্রিশ প্রকারের বিদ্যায় এত গভীর জ্ঞান এবং দক্ষতা ও পারদর্শিতা অর্জন করিয়াছিলেন যে, সকল শাস্ত্রের কিতাব সমূহ যদি খোদা-নাখাস্তা নিশ্চিহ্ন করিয়া দেওয়া হইত, তবুও এই সমস্ত শাস্ত্রের কিতাব সমূহ তিনি পুনঃ রচনা করিয়া দিতে পারিতেন। কথাটাকে অনেকেই হয় তো অতিরঞ্জিত মনে করিবেন। কিন্তু আমি তাঁহাকে নিকট হইতে দেখিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি । যাহারা মাওলানা মাদানীকে আমার মত নিকট হইতে দেখার সুযোগ লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই আমার কথার সত্যতা পূর্ণভাবে স্বীকার করিবেন।

আজকাল শুধু মাদ্রাসায় বা কলেজে পড়া এবং কৃতিত্বের সহিত ভাল নম্বরে পাস করাকেই জ্ঞান অর্জনের পর্যায়ের শেষ ও পূর্ণতা মনে করা হয়। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে এখান হইতে জ্ঞান অর্জনের পর্যায় শুরু হয় মাত্র। অতঃপর জ্ঞান বিতরণের মাধ্যমে পাঠ্যবহির্ভূত যাবতীয় কিতাব অধ্যয়ন ও গবেষণা করতঃ কোন বিজ্ঞ প্রজ্ঞাবিশিষ্ট মহাজ্ঞানীর তত্ত্বাবধানে স্বীয় জ্ঞান ও শিক্ষা এবং শিক্ষাদান পদ্ধতি যাচাই করিয়া যে জ্ঞান অর্জিত হয়, প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাই ইলম ও জ্ঞান অর্জনের পূর্ণতা এবং ইহাকেই বলে ট্রেনিং।

বলা বাহুল্য, মাওলানা মাদানী (রহঃ) খোদা-প্রদত্ত অসাধারণ স্মরণশক্তি, ধীশক্তি ও প্রতিভা লইয়া পূর্ণ একাগ্রতা ও গভীর মনোনিবেশ সহকারে জ্ঞান

www.pathagar.com

অর্জনের উভয় পর্যায়ে অসাধারণ কৃতিত্বের সহিত কৃতকার্যতা লাভ করিয়াছিলেন। শুধু বৈষয়িক ট্রেনিংই নয়, বরং উহার সাথে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ট্রেনিংয়েও তিনি অতি কৃতিত্বের সহিত উন্নীত হইয়াছিলেন।

মানুষ শুধু জ্ঞানের দ্বারা মানুষ হয় না, জ্ঞানের পরে সাধনা এবং সংযম ও ত্যাগ ইত্যাদি মহৎ গুণ ব্যতিরেকে প্রকৃত মানুষ হইতে পারে না। মানুষকে সৃষ্টি করা হইয়াছে জড়ত্ব, পশুত্ব, হিংস্রত্ব, শয়তানত্ব ও ফেরেশ্‌তাত্বের সমন্বয়ে মনুষ্যত্ব এই পঞ্চবিধতত্বের উর্ধ্বে।

জীবন গঠনের সাধনার পর্যায়ে মাওলানা মাদানী (রহঃ) যে কঠোর সাধনা করিয়াছেন, তাহার নযীর এ যামানায় নাই। সাধনা কখনও একাকী হয় না; কোন প্রজ্ঞাবিশিষ্ট, মহাজ্ঞানী মুরুব্বির তত্ত্বাবধানে এবং ছোহ্‌বতেই হইয়া থাকে। মাওলানা মাদানী (রহঃ) একে একে তিনজন অদ্বিতীয় শায়খের ছোহ্‌বতে থাকিয়া তাঁহাদের তত্ত্বাবধানে জীবন গঠনের সাধনায়, মনুষ্যত্ব অর্জনের সাধনায় অসাধারণ সাধনা করিয়া কামালিয়াতের উচ্চ শিখরে উন্নীত হইয়াছিলেন। তাঁহারা হইলেন-

(১) হাজী ইমদাদুল্লাহ্ মুহাজিরে মক্কী (রাহঃ)। ইনি তৎকালে আরব ও আজমের অদ্বিতীয় শায়খ ও বোযর্গ ছিলেন এবং ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের আযাদী জেহাদে আমীরুল- মু'মেনীন ছিলেন।

(২) কুতুবে আলম মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহঃ) তৎকালীন অদ্বিতীয় ফকীহ, মুহাদ্দিস, শায়খ ও বোযর্গ এবং ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের আযাদী জেহাদের সিপাহসালার ছিলেন।

(৩) শায়খুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহ্‌মুদুল হাসান (রহঃ), ইনি সেই যুগের অতুলনীয় আলেম, ফকীহ্ মুহাদ্দিস্ ছুফী শায়খ ও বোযর্গ এবং খেলাফত ও পাক ভারত তথা বিশ্ব- মুসলিম জাহানকে একসূত্রে গ্রথিত করিয়া বিশ্বে ইসলাম ও মুসলিমদ্রোহী শক্তি সমূহের সহিত মোকাবেলার প্রচেষ্টায় ইনি প্রধান নেতা ও শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। এই তিন শায়খ ও মনীষীর খেদমতে থাকিয়া মাওলানা মাদানী (রহঃ) বহুকাল যাবৎ কঠোর সাধনা করিয়া সোনায় সোহাগা হইয়া গিয়াছিলেন।

মানুষ শুধু জ্ঞান ও সাধনার দ্বারাই মনুষ্যত্বের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিতে পারে না; বরং জ্ঞান অর্জন, মুজাহাদা, রিয়াযত ও সাধনার পর কর্মক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া সমাজের সহিত মেলা মেশা করিয়া কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য ইত্যাদি রিপুসমূহকে দমন করতঃ তাখাল্লাকু বি- আখলাকিল্লাহি। অর্থাৎ আল্লাহর চরিত্রে চরিত্রবান হওয়ার মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ হইতে হইবে এবং

www.pathagar.com

সর্বক্ষেত্রে সকল অবস্থায় অনাদি অনন্ত, চিরজীবন্ত নিরাকার আলেমুল-গায়েব আল্লাহ্ তাআলার সহিত প্রগাঢ় যোগাযোগ, একীন, মহব্বতের আযমত ও হুযূরীর মকাম হাছিল করিতে হইবে। এই মকামে পৌঁছিয়াই মানুষ প্রকৃত মনুষ্যত্বের আসন বা ফেরেশ্তারও উর্ধ্বে আসন অধিকার করিতে পারে।

মাওলানা মাদানী (রহঃ) যে মহান চরিত্র গুণে এবং মানবতার এই উচ্চতম মকাম অর্জনে বহু উচ্চস্থান লাভ করিয়াছিলেন, তাহা চাক্ষুযদর্শী মাত্রই একবাক্যে স্বীকার করিবে। স্বধর্মী-বিধর্মী, আত্মীয়-অনাত্মীয়, আপন পর শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে তাঁহার আদর্শ অতিথি-সেবা, গরীব আত্মীয়-স্বজন, গরীব পাড়া-প্রতিবেশী, দুঃস্থ, অনাথ ও রোগীদিগকে গোপন দান এবং সাখাওয়াত ও সেবা শুশ্রূষা অতুলনীয়, অনুপমা ও অবর্ণনীয়। হাজার হাজার লোকের ভীড় ও হট্টগোলের মধ্যে প্রত্যহ চা-নাশতা ও খানার সময় অন্ততঃ ৫০/৬০/১০০ মেহমানকে নিজ হাতে পরিবেশন করিয়া খাওয়াইয়া নিজে অবশিষ্ট বাঁচা-খুচা খাইয়া তাহাতেই তৃপ্ত ও সন্তুষ্ট থাকা, ঘুম-নিদ্রা বর্জন করিয়া শত শত লোকের মধ্যে প্রত্যেকের পদমর্যাদা রক্ষা করতঃ বিন্দুমাত্র বিরক্তি প্রকাশ না করিয়া সকলের সহিত হাসিমুখে আলাপ-আলোচনা করা, এত ঝঞ্ঝাট ও হাঙ্গামার মধ্যেও মুহূর্তের জন্যও আল্লাহকে না ভোলা, আল্লাহর হুকুম ও হুদুদ না ভোলা- এই সব মাওলানা মাদানীর অভ্যাসগত স্বভাবে পরিণত হইয়াছিল। তাঁহার কঠোর পরিশ্রম ও অসীম কষ্ট-সহিষ্ণুতা প্রবাদ বাক্যে পরিণত হইয়াছিল। তিনি প্রায়ই বলিতেন ঃ

'দুঃখ-কষ্ট যখন মানুষের অভ্যাসগত হইয়া পড়ে, তখন উহা সহজ হইয়া যায়। আমার উপর দুঃখ- কষ্ট এত অধিক নিপতিত হইয়াছে যে, উহা এখন সহজ হইয়া পড়িয়াছে।'

হাদীসের প্রধান কিতাব বোখারী শরীফে তাঁহার ক্লাসে ছাত্রসংখ্যা দুইশত আড়াইশতের কম হইত না। তিনি শুধু হাদীসের ইবারত পড়িয়া তর্জমা করিয়া দিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন না: সমস্ত দুনিয়ার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও চারিত্রিক ঘটনাবলী এবং জ্ঞান ও বিজ্ঞান সমূহ সম্মুখে রাখিয়া হাদীসের ব্যাখ্যা করিতেন। কখনও জ্ঞান-বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতার আলো দ্বারা তিনি হাদীস ও কোরআনের বিশ্লেষণ করিতেন, আবার কখনও কোরআন ও হাদীসের আলোকে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতার ব্যাখ্যা করিতেন। তৎপর পালা আসিত দুইশত আড়াই শত ছাত্রের প্রশ্নোত্তরের। প্রত্যেক ছাত্রকে তিনি অবাধে সব রকমের প্রশ্ন করিবার সাহস দিয়া রাখিতেন এবং প্রত্যেকটি প্রশ্নের সদুত্তর স্নেহের সহিত প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝাইয়া দিতেন। ইহাতে কখনও তিনি বিন্দুমাত্র বিরক্তি প্রকাশ করিতেন না।

www.pathagar.com

তিনি শুধু কর্মচারী হিসাবে মাদ্রাসার কাজ করিতেন না, বরং আন্তরিক মহব্বতের সহিত কঠোর পরিশ্রম সহকারে প্রত্যেহ ফজরের পর হইতে বারটা পর্যন্ত, আবার যোহরের পর হইতে আছর পর্যন্ত এবং পুনঃ এশার পর হইতে রাত্র বারটা পর্যন্ত অধ্যাপনার কাজ করিতেন। ইহাতে তিনি একটুও ক্লান্তি বোধ করিতেন না, কখনও তাঁহার চেহারায় বিরক্তিভাব প্রকাশ পাইত না। অনেক সময় এমনও দেখা গিয়াছে যে, রাত্র দশটা পর্যন্ত সবক পড়াইয়া সাহারানপুর, দিল্লী ইত্যাদি দূর- দূরান্তে সভা উপলক্ষে চলিয়া যাইতেন এবং রাত্র দুইটা তিনটা পর্যন্ত সভায় বক্তৃতা করার পর ভোর ছয়টায় ক্লাসে প্রথম সময়ে হাজির হইয়া যথারীতি অক্লান্তভাবে ক্লাস করিতেন। আশ্চার্যের বিষয় এই যে, তিনি এত রাজনৈতিক কোলাহলে জড়িত থাকা সত্ত্বেও ক্লাসে বসিয়া এত দীর্ঘ সময়ের অধ্যাপনার ভিতরে কখনও রাজনৈতিক থিওরী বা কোন প্রকার পার্টি -পলিটিক্স ও ভাব-প্রবণতার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেন না, এমনকি সবকের মধ্যে উহার আভাসও প্রকাশ পাইত না।

ইসলাম কর্মকে ধর্ম হইতে অথবা ধর্মকে কর্ম হইতে পৃথক করিয়া দেখে না, এরূপ মতবাদকে সমথর্নও করে না। ইসলামী রাজনীতি আধ্যাত্মিকতা হইতে পৃথক নহে । বরং কর্মক্ষেত্রে ধর্মের পরীক্ষা দেওয়া, সমাজের সেবায়, রাষ্ট্রের সেবায় লিপ্ত থাকিয়া আধ্যাত্মিকতা বজায় রাখা এবং কাম ক্রোধ লোভ মোহ-মাৎসর্য ইত্যাদি জয্বা ও প্রবৃত্তিকে অতিমাত্রায় বর্ধিত ও সঙ্কুচিত না করিয়া প্রবৃত্তিসমূহকে অব্যবহার ও অপব্যবহার হইতে বাঁচাইয়া রাখিয়া প্রত্যেকটির সদ্ব্যবহার ও মধ্যবর্তী পন্থাই ইসলামের নীতি ও বিশেষত্ব।

পীর-ফকীর ও সূফী-দরবেশগণ শুধু তসবীহ্ পড়িতে থাকিবে, মুরীদগণকে তসবীহ্ হাতে দিয়া হুজরায় বসাইয়া রাখিবে ইহা আদৌ ইসলামের শিক্ষা নহে, বরং রাজদরবারে, রাজনীতি ক্ষেত্রে, সমর ক্ষেত্রে, অর্থনীতি ও সমাজনীতি এবং ব্যক্তিগত ও সমাজগত জীবন পদ্ধতির সর্বক্ষেত্রে, আল্লাহর যিকর ও তসবীহের আলোতে যুলুম, শোষণ, ঠকবাজী, ধোকাবাজী ও বিলাস-ব্যসন হইতে নিজেকে ও সমাজকে বাঁচাইয়া রাখিয়া ন্যায়নীতি ও আধ্যাত্মিকতার সুষ্ঠু সিরাতুল-মুস্তাক্বীমে পরিচালিত করাই মূলতঃ সুফী দরবেশের আসল ও প্রধান কাজ এবং ইহাই হইতেছে ইসলামী তাসওউফ ও আধ্যাত্মিকতার বিশেষত্ব। এই বিশেষত্বের যিন্দা নযীর স্থাপন করিয়া গিয়াছেন শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা সৈয়দ হুসাইন আহ্মদ মাদানী রাহ্মাতুল্লাহি আলাইহে।

www.pathagar.com

হায়াতুল মুসলিমীন গ্রন্থের ভূমিকা

আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন। ওয়াস্‌সলাতু ওয়াস্‌সালামু আ'লা সায়্যিদিল মুরসালীন ওয়া আলা আলিহী ওয়া আছহাবিহী আজমায়ীন।

ইসলামের মহান আদর্শ আমাদের সম্মুখে থাকা সত্ত্বেও আমরা অনেক কাজে গায়ের ইসলামী লোকদিগের অনুকরণ করিতে শিখিয়াছি। বিশেষতঃ যাঁহারা বৃটিশ আমলে জন্মগ্রহণ করিয়া পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়াছেন, তাঁহাদের অনেকেই ইসলামের রীতি-নীতি হইতে বহুদূরে সরিয়া পড়িতেছেন। ইসলামের কোন কোন রীতি-নীতি তাঁহাদের নিকট অদ্ভুত ও অসামঞ্জস্য বলিয়াও বোধ হয়।

আল্লাহ্ তাআলার নাম লইয়া ও তাঁহার প্রিয় হাবিবের উপর দরূদ পাঠ করিয়া প্রত্যেক কার্য আরম্ভ করিতে হয়, ইহা ইসলামের একটি সুন্দর পদ্ধতি। আমি যখন ইংরেজী পড়িতাম, তখন এই সুন্দর পদ্ধতিটির মাহাত্ম্য বুঝিতাম না। পরন্তু কাহাকেও এরূপ করিতে দেখিলে তাঁহাকে 'গোঁড়া কাঠমোল্লা' বলিয়া বিদ্রূপ করিতাম। এখন আমি পরম করুণাময় আল্লাহ্ তাআলার শত সহস্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। কারণ, তিনি আমাকে সেই মহাভ্রম হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত করিয়াছেন এবং তাঁহার সহজ সরল পথ প্রদর্শন করিয়াছেন।

প্রত্যেকেই স্বীয় জাতীয় গৌরব বজায় রাখিতে দৃঢ় সংকল্প। কিন্তু অবস্থা দৃষ্টে মনে হয়, আজ যেন আমরা পূর্বপুরুষদের অর্জিত গৌরব নিশ্চিহ্ন ও নির্মূল করিতে তৎপর। আমাদের পূর্বপুরুষগণ সর্বত্র সর্ব বিষয়ে আদর্শস্থানীয় ছিলেন। তাঁহাদের শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শাসন-সংরক্ষণ, আচার-ব্যবহার, পোশাক-পরিচ্ছদ ও তাহ্‌জীব-তামাদ্দুন ইত্যাদি বাস্তবিকই অন্যান্য জাতির অনুসরণীয় ছিল। কিন্তু আমরা সেই উচ্চ ও মহান আদর্শ একবারে ভুলিয়া গিয়া বা আমাদের মূর্খতা ও নির্বুদ্ধিতার দরুন বুঝিতে না পারিয়া অবনতির নিম্নস্তরে নিপতিত হইয়া উৎপীড়িত ও লাঞ্ছিত হইয়াছি।

এই ভীষণ অবনতির কারণ অপনোদনের নিমিত্ত বহু মনীষী নানা উপায়ে চেষ্টাচরিত্র করিয়াছেন ও করিতেছেন সত্য, কিন্তু পবিত্র ক্বোরআন ও হাদীসের নির্দেশিত উপায় অবলম্বন করেন নাই বলিয়া অভীষ্ট কার্যে কৃতকার্যতা লাভ করিতে পারিতেছেন না।

আমাদের আলেমকুল শিরোমণি হাকিমুল-উম্মত, তবীবুল-মিল্লাত, মুহিয়্যুস সুন্নত, কামেয়োল-বিদআত, কুতুবে-দাওরান মরহুম মগফুর হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী সাহেব (রহঃ), যাঁহার কল্যাণে আজ ইসলামের নির্বাপিতপ্রায় প্রদীপটিও উজ্জ্বল প্রতীয়মান হইতেছে, তিনি বর্তমান মুসলমানদের

www.pathagar.com

এবম্বিধ দুরবস্থা দর্শন করিয়া অতীব চিন্তিত হন এবং কি প্রকারে অধঃপতনের কারণগুলির মূলোৎপাটন করিয়া মুসলমানদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উন্নতি ও মুক্তির উপায় উদ্ভাবন করা যাইতে পারে, শুধু তাহাই ভাবিয়া অস্থির হইতে থাকেন। আহার-বিহার, শয়নে-স্বপনে, এমন কি সময় সময় নামাযেও এই চিন্তায় হুযুর অস্থির হইয়া পড়িতেন।

সৌভাগ্যক্রমে হঠাৎ একদিন ফজরের নামাযে হুযুরের পবিত্র অন্তঃকরণে করুণাময় আল্লাহর তরফ হইতে 'এলহাম' হইল কিরূপে কাজ করিলে মুসলমানদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কামিয়াবী ও আজাদী হাসিল হইবে। সেই নির্দেশানুযায়ী হযরত মাওলানা বিশেষ চেষ্টা ও যত্নের সহিত তাহা একখানা কিতাব আকারে সঙ্কলন করেন এবং কিতাবটির নাম **"হায়াতুল মুসলিমীন"** রাখেন। হযরত মাওলানা বলিয়াছেন, "বর্তমান মুসলমানদের ইহকালের উন্নতি এবং পরকালের কামিয়াবী ও নাজাতের জন্য এই কিতাবের অনুসরণই চরম পন্থা। তাই আমি এই কিতাবখানা সংকলন করিয়া পরম শান্তি অনুভব করিতেছি।"

কিতাবখানা বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হইয়া দেশ-বিদেশে বহুল প্রচারিত হয় ইহাই হযরতের আন্তরিক বাসনা ছিল। বাংলার মুসলিম সমাজের খেদমত করিবার উদ্দেশ্যে আমিও পূর্ব হইতে কিতাবখানা বাংলা ভাষায় অনুবাদ করিবার ওয়াদা করিয়াছিলাম। কিন্তু সুযোগ ও সুবিধার অভাবে ওয়াদা পূর্ণ করিতে বিলম্ব হইল।

হযরত মাওলানা জাফর আহামদ ওছমানী ছাহেবের হাজার হাজার শুক্‌রিয়া, যেহেতু তাঁহার নির্দেশে শত বাধাবিঘ্ন ও অসুবিধার ভিতর দিয়া শুধু আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে "হায়াতুল মুসলিমীন"-এর অনুবাদ করিতে প্রয়াস পাইলাম।

অনুবাদকালে এছতেলাহী শব্দগুলি যথাসম্ভব যেমনটি তেমনই রাখিয়া দিয়াছি। কারণ, কোন কোন এছতেলাহী শব্দের অনুবাদ করিলে অর্থের ও ভাবের গাম্ভীর্য থাকে না। এছতেলাহী শব্দগুলি সব ভাষায়ই একরূপ থাকা বাঞ্ছনীয়। কারণ, ইহাতে যেমন সংক্ষিপ্তের মধ্যে বিস্তৃতভাব নিহিত থাকে, তেমনি চিরকাল আদি ভাষার গৌরবও বিদ্যমান থাকে।

আয় আল্লাহ্ ! আমার অন্য কোন সম্বল নাই। এই কিতাবখানা তুমি কবুল কর আর ইহা পাঠে যেন মুসলমান ভাইদের সঞ্জীবনী শক্তির উৎপত্তি হয়। আয় আল্লাহ্ ! ইহা আমার নাজাতে উছিলা বানাইয়া দাও। আমীন !

www.pathagar.com

হায়াতুল মুসলিমীন গ্রন্থের পূর্বাভাষ

আয় আল্লাহ! তোমার শত প্রশংসা। তুমি মুসলমানদিগকে জীবনীশক্তি দান করিয়াছ। তাহা এই ভাবে বর্ণনা করিয়াছ "যাহাকে আমি জীবনীশক্তি দান করিয়াছি এবং আলো দান করিয়াছি যে আলো সঙ্গে করিয়া সে লোকালয়ে বিচরণ করে, আর যে ব্যক্তি অন্ধকার রাশির মধ্যে পড়িয়া আছে এবং সেই অন্ধকার হইতে মুক্তি লাভও করিতে ইচ্ছা করে না, এই দুই ব্যক্তি কি সমান হইতে পারে? না, কিছুতেই পারে না।"

প্রথম ব্যক্তি মোমেনের দৃষ্টান্ত। সে ইসলাম এবং ঈমানের মা'রেফাতের আলো লাভ করিয়া মৃতদেহে জীবনীশক্তি পাইয়াছে এবং ঘোর অন্ধকারময় অন্তকরণে জ্ঞানের আলো জ্বালিয়াছে। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি অমুসলমানের দৃষ্টান্ত। সে একেতো ঘোর অন্ধকারে পড়িয়াই আছে, অধিকন্তু স্বীয় অন্তঃকরণে ঈমানের আলো জ্বালিয়া হৃদয়কে আলোকিত করিতেও চায় না।

হে আল্লাহ! শত দরূদ ও সালাম তোমার সেই প্রিয় নবীর উপর- যাঁহার উচ্চ মর্তবা, মহান গৌরব ও অতুলনীয় মর্যাদা তুমি তোমার স্বীয় কিতাবে এই ভাবে বর্ণনা করিয়াছ "এইরূপে আমি আপনার নিকট আমার ওহী প্রেরণ করিয়া আপনাকে সঞ্জীবনীশক্তি প্রদান করিয়াছি।" অর্থাৎ বিশ্ববাসীর আত্মা মরিয়া গিয়াছিল, উহাদিগকে জীবিত করিবার জন্য আপনাকে সঞ্জীবনীশক্তি প্রদান করিয়াছি।

হে আল্লাহ! আরও তুমি তাঁহার উম্মতদিগকে (অনুসরণ কারীগণকে) সাদর আহবান করিয়াছ এবং তাহাদের ফযীলত ও শ্রেষ্ঠত্ব এই বলিয়া বর্ণনা করিয়াছ "হে ঈমানদারগণ (বিশ্বাসীগণ)! আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল(সাঃ) যখন তোমাদিগকে জীবনীশক্তি প্রদান করিবার জন্য আহবান করেন, তখন তোমরা সেই ডাকে সাড়া দাও।" কারণ, সেই ডাকে তাঁহাদের কোন স্বার্থ নাই, বরং উহাতে একমাত্র তোমাদের স্বার্থ নিহিত আছে। অতএব, সে ডাকে সাড়া দিলে তোমাদের মৃতবৎ আত্মা এমন সজীব, সতেজ, উজ্জ্বল ও শক্তিশালী হইবে যে, সপ্ত আকাশ ভেদ করিয়া আল্লাহর দীদার লাভ এবং আল্লাহর বেহেশত অধিকারের শক্তি তো তোমাদের হইবেই, সঙ্গে সঙ্গে ইহজগতের সমস্ত শক্তিও তোমাদের সম্মুখে মস্তক অবনত করিয়া দিতে বাধ্য হইবে। যেমন, আল্লাহ তাআলা তাহাদের প্রশংসায় পবিত্র কোরআন শরীফে ফরমাইয়াছেন "(যাহারা নবীর ডাকে পূর্ণরূপে সাড়া দিয়াছে) তাঁহাদের হৃদয়পটে আমি ঈমান (একীন, বিশ্বাস) অঙ্কিত করিয়া দিয়াছি এবং নিজ হইতে একটি সঞ্জীবনীশক্তি প্রদান করিয়া তাঁহাদিগকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছি।"

www.pathagar.com

অতঃপর আল্লাহ তাআলা বলিতেছেন "পুরুষ বা স্ত্রী যে কেহই ঈমানের সহিত থাকিয়া সৎকাজ করিবে, আমি তাহাকে (ইহকালে) শান্তিময় জীবন দান করিব এবং তাহারা দুনিয়াতে যেসব নেক (পুণ্য) কাজ করিবে, (পরকালে) তাহার উপযুক্ত পুরস্কার আমি তাহাদিগকে দান করিব।"

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলিতেছেন "যে আমার যিকর হইতে গাফেল থাকিবে, তাহার ইহ জীবন অশান্তিময় হইয়া যাইবে এবং কিয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে সে অন্ধ হইয়া উঠিবে।"

কোরআনের অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন "যে নেহায়েত হতভাগ্য সেই আমার উপদেশ অমান্য করিবে এবং ভীষণ অগ্নিকুন্ডে (দোযখে) প্রবিষ্ট হইবে। তথায় না জীবিত থাকিবে না মৃত্যুমুখে পতিত হইবে।"

এই আয়াতের দ্বারা বুঝা যায় যে, যে জীবনে শান্তি নাই সে জীবন জীবনই নহে। সে জীবন মৃত্যুর চেয়েও বদতর(নিকৃষ্ট)।

এই সমস্ত আয়াতের দ্বারা এবং আরো অন্যান্য বহু আয়াত ও হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, শান্তিময় জীবন খাছ ভাবে তাহাদেরই জন্য, যাহারা আল্লাহর গোলামী (বশ্যতা) স্বীকার করিয়া লইয়াছে।

কিন্তু এতদসত্ত্বেও আমার ভাইদের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হইতেছে না। কেহ কেহ তো ইহাই মনে করিতেছে যে, মুসলমানদের জন্য শুধু আখেরাতের সুখ-শান্তি ও উন্নতি, দুনিয়ার সুখ-শান্তি, রাজত্ব ও উন্নতি মুসলমানদের জন্য নহে। যদিওবা হয় তবুও তাহার উপায় উপকরণ আমাদের ধার করিয়া নিতে হইবে, জগতের অন্যান্য জাতি হইতে। এই জন্যই সারা দুনিয়ার মুসলিম জাতির উপর, বিশেষতঃ উপমহাদেশের মুসলিম জাতির উপর বিপদের উপর বিপদ, লাঞ্ছনার উপর লাঞ্ছনা আসিতেছে।

এতদসত্ত্বেও মুসলিম সমাজের এই অবনতির মূল কারণের প্রতি কাহারও সুদৃষ্টি পড়িতেছে না এবং উহার প্রতিকারের উপায়ও কাহারও লেখনীতে এমনকি মুখেও আসিতেছে না। যদিও কেহ কেহ প্রতিকারের কোন উপায় অবলম্বন করিতেছেন, তাহাও সম্পূর্ণ বে-কায়দা ও অনিয়ম হইতেছে। সহজ ও সুনিয়ন্ত্রিত স্বাভাবিক পথে হইতেছে না। ফলে, অদূরদর্শী ও অনভিজ্ঞ চিকিৎসকের চিকিৎসায় রুগীর যেরূপ পরিণাম ঘটিয়া থাকে এক্ষেত্রেও তদ্রূপ হইতেছে।

প্রিয় ভ্রাতৃবৃন্দ! রোগমুক্ত হইতে হইলে সর্ব প্রথম বহুদর্শী ও শাস্ত্রাভিজ্ঞ উপযুক্ত চিকিৎসকের দ্বারা রোগের হেতু নির্ণয় করা দরকার। অতঃপর উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগে আশা করা যায় যে, শীঘ্রই আরোগ্য লাভ করা যাইতে পারে। এখন আমরা যে বিকট ও দুরারোগ্য রোগে ভুগিতেছি যাহা দূর করিবার কোন

www.pathagar.com

পথই পাইতেছি না। তাহার একমাত্র কারণ এই যে, 'আল্লাহর বাণীর' উপর আমাদের পুর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা নাই। কারণ, আমাদের এই ঘোর অবনতি ও অধঃপতনের মূল কারণ কি তাহা তো আল্লাহর পবিত্র কোরআনের ভিতর সন্নিবেশিত আছে এবং তাহা হইতে উদ্ধার প্রাপ্তির উপায়ও উহাতে স্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে। আজিও সেই কোরআন আমাদের প্রত্যেকের ঘরে ঘরে অক্ষত অপরিবর্তিত ও অবিকৃত অবস্থায় আছে বটে, কিন্তু আমরা কোরআনের উচ্চ ও মহান আদর্শ একেবারে ভুলিয়া গিয়া বা বুঝিতে না পারিয়া বা বুঝিবার চেষ্টা না করিয়া, মূর্খতা, অসভ্যতা ও অবনতির নিম্নস্তরে পতিত হইয়াছি এবং যার-তার নিকট উৎপীড়িত, ঘৃণিত ও লাঞ্ছিত হইতেছি।

যদি তাহাই না হইত, তবে আমরা মুখে বলি যে, আমরা মুসলমান। খোদা, রাসূল ও কিয়ামতের উপর আমাদের অটল বিশ্বাস আছে এবং কোরআন-হাদীসও আমরা বিশ্বাস করি এবং মানি। কিন্তু চিন্তা করিয়া দেখি না যে, ঈমানের অর্থ, মুসলামনের অর্থ কি। আর মানার অর্থ শুধু মতামতগুলি মানা নহে। বরং অক্ষরে অক্ষরে সবগুলি মানিয়া লইয়া তদনুযায়ী কাজ করা। কোনটা মানিলাম, কোনটা মানিলাম না, ইহাকে ইসলাম বলে না। পূর্ববর্তী ইয়াহুদ-নাসারাগণও কতগুলি মানিত আর কতগুলি মানিত না। তাহাদিগকে কোরআনে পাকে এইরূপ ভাবে ধমকি দেওয়া হইয়াছে-

"তবে কি তোমরা কতগুলি মান আর কতগুলি মান না?" এইরূপ মুসলমান হইতে চাও? আল্লাহর জ্ঞান, কোরআন ও রাসূলের শিক্ষাকে অসম্পূর্ণ ও ভুল মনে কর? নাউযু বিল্লাহি মিন যালিকা!

না, না, তা কখনও হইতে পারে না। ভুল আমাদেরই, আমাদের বুঝিবার ভুল, আমাদের কর্মত্রুটি। এই ভুলই আমাদের মারাত্মক রোগ। এই অবিশ্বাস, এই অজ্ঞতা এই কর্মত্রুটি এবং এই অকর্মণ্যতাই আমাদের সব অভিশাপের মূল। অতএব, এই রোগ আমাদের দূর করিতে হইবেই। এই অভিশাপের মূল কারণ যখন জানা গেল; তখন ইহার মূলোচ্ছেদ করিয়া ইহা হইতে মুক্তি লাভের চেষ্টা করিতে হইবে। কারণ, যদি অভিজ্ঞ চিকিৎসক কর্তৃক প্রকৃত রোগ নির্ণয় এবং খাঁটি ঔষধের ব্যবস্থার উপর রোগীর অটল বিশ্বাস থাকে, তবে সহজেই রোগের হেতুগুলি অপসারিত করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিতে পারিবে। এই ভরসায় তাহার পক্ষে দুষ্প্রাপ্য ঔষধাদিও যোগাড় করা সহজসাধ্য হয় এবং তিক্ত ঔষধ ব্যবহারেও সে কোনরূপ দ্বিধাবোধ করে না অধিকন্তু রোগমুক্তির জন্য চিকিৎসকের আশু ব্যবস্থানুযায়ী অতি যত্নের সহিত যাবতীয় ঔষধ-পথ্যাদি যোগাড় করিয়া একান্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত, তিক্ত হইলেও সেগুলি অক্লেশে সেবন করিতে থাকে।

www.pathagar.com

এ কথা অকাট্য দলিল ও যুক্তিসঙ্গত প্রমাণের দ্বারা সর্বসম্মতিক্রমে প্রতীয়মান করা হইয়াছে যে, এই শেষ নবীর যামানায় এই সব রোগের কারণ নির্ণয় এবং ঔষধের ব্যবস্থা একমাত্র হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা আহমাদ মুজতবা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দস্ত মুবারক ছাড়া অন্য কোথাও কাহারও নিকট পাওয়া যাইবে না। মাওলানা রুমী তাঁহার প্রশংসায় বলিয়াছেন, "তিনিই একমাত্র পূর্ণ এবং পবিত্র সেরা মানব, তাঁহার নিকট সর্বরোগের যাবতীয় ঔষধের ভাণ্ডার আছে, তিনিই সুশীতল ছায়া প্রদানকারী এবং তিনি দীপ্তিমান সূর্য"।

"তিনিই প্রকৃত খাঁটি ও পারদর্শী চিকিৎসক। অতএব তাঁহাকে খাঁটি আরোগ্যকারী চিকিৎসক বলিয়া বিশ্বাস কর। তিনি বাস্তবিকই খাঁটি ও সত্যবাদী। অতএব তাহাকে খাঁটি ও সত্যবাদী বলিয়া বিশ্বাস কর।"

"তাঁহার ঔষধ যাদু-মন্ত্রের ন্যায় ক্রিয়া করে। তাহার একমাত্র কারণ এই যে, তাহার ঔষধ নিজস্ব বা মনগড়া ঔষধ নহে। বরং এই ঔষধ স্বয়ং খোদা তাআলার মহিমার নিদর্শন স্বরূপ।"

"তাঁহার পবিত্র চেহারার মধ্যে আল্লাহর নূর চমকিতেছে। শুধু তাঁহার চেহারা মোবারক দর্শন করিলে সব রোগ-শোক ও দুঃখ কষ্ট দূরীভূত হয়।" ছবর, ধৈর্য বা সহিষ্ণুতাই যে পূর্ণ সফলতার মূল কারণ। এই শিক্ষাও আমরা তাঁহার নিকট হইতে পাই।

"শুধু তাহার চেহারা দর্শণেই সব জিজ্ঞাসার উত্তর এবং সব সমস্যার সমাধান হইয়া যায়।"

"তিনিই আমাদের অন্তরের বেদনা হৃদয়ঙ্গম কারী সমবেদনায় ব্যথিত জন। তিনিই কর্দমে পতিত বিপন্নজনের হস্ত ধারণ করিয়া উত্তোলনকারী মহাজন।"

"ধন্যবাদ তোমাকে ওহে মুজতবা, ধন্যবাদ তোমাকে ওহে মুরতাজা! তুমি যদি মুহূর্তের তরেও আমার চক্ষুর অগোচর হও তাহা হইলে পৃথিবী আমার জন্য সঙ্কীর্ণ এবং আমার জীবন বিপন্ন হইয়া পড়ে।"

"তুমি এবং তোমার শিক্ষাই আমাদের একমাত্র আশ্রয়স্থল। যে তাহা চায় না ও মানে না, সে যদি অতি শীঘ্র স্বীয় ভুল ধারণা এবং ভুল বিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া তোমার দিকে প্রত্যাবর্তন না করে, তবে সে নিশ্চয়ই ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে।"

"তিনি যাহা কিছু বলেন তাহা সব কিছু সত্য, তাহাতে বিন্দু মাত্রও সন্দেহের অবকাশ নাই। কেননা, তিনি নিজ হইতে কিছু বলেন না। যাহা কিছু বলেন, একমাত্র খোদার আদেশ অনুযায়ীই বলিয়া থাকেন। অতএব, তাঁহার কথা বোধগম্য হউক বা না-ই হউক তাহা নিশ্চয়ই যথার্থ সত্য এবং পালনীয়।"

www.pathagar.com

"যিনি জীবন দান করেন তিনিই যদি তাহা পুণঃ ফিরাইয়া নেন। তবে তাহাতে আশ্চর্যই বা কি! অন্যায় বা কি ! রাসূল (সাঃ) তাহারই নায়েব। অতএব তাঁহার হাত স্বয়ং খোদারই হাত।"

"ইসমাঈল আলাইহিস সালামের ন্যায় হাস্যমুখে তাঁহার সম্মুখে মাথা পাতিয়া দেওয়া উচিত এবং তাঁহার তরবারীর সম্মুখে জীবনকে উৎসর্গ করে দেওয়া উচিত।"

"তাহা হইলে তোমার জীবন চিরশান্তিময় এবং চির আনন্দময় হইবে। যেমন, আহমদ এর জীবন আহাদ-এর সন্নিধানে চিরশান্তিময় হইয়াছে।"

"তাঁহারা খাঁটি প্রেমিকার প্রকৃত প্রস্তাবে সন্তুষ্ট হয় তখনই, যখন তাহাদের মাশুকই নিজ হাতে তাহাদিগকে বধ করে।"

"যাহাকে এমন শাহানশাহ সম্রাটাধিসম্রাট রাজাধিরাজ স্বয়ং বধ করিবেন সে কত সৌভাগ্যশালী। নিশ্চয় জানিও তিনি বধ করিবেন না। পক্ষান্তরে তিনি দুঃখ-কষ্টের আগার, জ্বালা-যন্ত্রণার কুন্ডলী হইতে অপসারিত করিয়া শাহী দরবারে, রাজ সিংহাসনে এবং উত্তম স্থানে স্থানান্তরিত করিবেন।"

এতবড় ও পারদর্শী, খোদাদত্ত সনদপ্রাপ্ত এবং অদ্বিতীয় অভিজ্ঞ ও হাত-যশের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও আপনপর, দেশী-বিদেশী, বর্তমান-ভবিষ্যত ও জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে জগদ্ব্যাপী সর্বসাধারণের নিকট ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন যে, আমার কাছে এমন অমোঘ ঔষধ আছে, যাহা তোমরা ইচ্ছা করিলে বিনামূল্যে বিনা দায়িত্বে সেবন করিয়া উপকার লাভ করিতে পার।

তবে উপকার দুই প্রকার- এক প্রকার অস্থায়ী বা ক্ষণস্থায়ী ও বাহ্যিক উপকার আর এক প্রকার স্থায়ী বা চিরস্থায়ী এবং প্রকৃত উপকার। যাহারা আমার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া ভক্তি সহকারে আমার বশ্যতা স্বীকার করিয়া ও দলভূক্ত হইয়া আমার ঔষধ সেবন করিবে তাহারা স্থায়ী ফল পাইবে। অর্থাৎ দুনিয়াতে শান্তি ও উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আখেরাতের নাজাত ও শান্তি পাইবে। আর যাহারা আমাকে বিশ্বাস ও ভক্তি করা ছাড়া আমার ঔষধ সেবন করিবে তাহারাও ফল পাইবে বটে, কিন্তু তাহাদের কৃতঘ্নতার কারণে তাহাদের ফল স্থায়ী হইবে না। অর্থাৎ তাহারা দুনিয়ার উন্নতি তো পাইবে বটে, কিন্তু প্রকৃত শান্তি এবং আখেরাতের নাজাত ও মুক্তি হইতে তাহারা বঞ্চিত থাকিবে।

আবার এই ঔষধও দুই প্রকার- কতগুলি ঔষধ এমন আছে যে, ঔষধের সহিত রোগারোগ্যের ফলের সহিত সাক্ষাত সম্বন্ধ সকলেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। অর্থাৎ ঔষধ যে কেন ক্রিয়া করে তাহা সকলেই বুঝিতে পারে। আবার কতকগুলি ঔষধ এমন আছে, যাহার গুণ এবং ক্রিয়া চাক্ষুষ দেখা যায়, কিন্তু

www.pathagar.com

গুণাগুণের এবং ফলাফলের কারণ সর্বসাধারণের বুঝে আসে না। এই উভয়বিধ ঔষধ আবার দুই প্রকার। যেমন- কতকগুলি ঔষধ এমন আছে যে, রোগারোগ্যের সহিত তাহাদের সাক্ষাত সম্বন্ধ রহিয়াছে। আর কতগুলি ঔষধ আছে যে, তাহাদের ক্রিয়া প্রত্যক্ষ দেখা যায় না বটে, কিন্তু পরোক্ষভাবে তাহারা রোগের জীবাণু ধ্বংস করিয়া রোগীর শরীর ক্রমশঃ সুস্থ ও সবল করিয়া তোলে।

এরূপ উদার ও ব্যাপক ঘোষণার পর যাঁহারা তাঁহার উপর পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপন পূর্বক তাঁহার প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা সহকারে তাঁহার যাবতীয় ঔষধগুলি যথাযথ ব্যবহার করিয়াছেন তাঁহারা ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উন্নতির চরম সীমায় উন্নীত হইয়াছেন। (যেমন, প্রথম সত্য যুগের সাহাবা, তাবেয়ীন ও তাবয়ে-তাবেয়ীন যুগের খাঁটি মুসলমানগণ)।

আর শুধু যাহারা মনে মনে ভক্তি এবং মুখে ভালবাসার দাবী করিয়াছে, কিন্তু অবহেলা ও অলসতা করিয়া ঔষধ সেবন করে নাই, তাহারা দুনিয়ার উন্নতি হইতে বঞ্চিত হইয়া পরাধীনতার অভিশপ্ত 'তওক' (শৃঙ্খল) গলায় পরিধান করিয়া বসিয়া রহিয়াছে। এমতাবস্থায় আশা করা যায় যে, আন্তরিক ভক্তি ও ভালবাসাটুকু অনর্থক যাইবে না। লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ভোগ করার পর পরকালে নাজাত পাইবে (যেমন, মধ্য ও বর্তমান যুগের মুসলমানগণ)। আর যাহারা ভক্তি স্থাপন এবং কৃতজ্ঞতা স্বীকার হইতে দূরে সরিয়া থাকিয়া বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে বটে, কিন্তু দলভূক্ত না হইয়া চোরের মত তাঁহার ঔষধগুলি ব্যবহার করিয়াছে, তাহারা দুনিয়ার উন্নতি এবং বাহ্যিক সুখ-শান্তি যথেষ্ট লাভ করিয়াছে সত্য কিন্তু কৃতজ্ঞতার অভিশাপে তাহারা প্রকৃত শান্তি এবং স্থায়ী সুখ অর্থাৎ আখেরাতের মুক্তি হইতে বঞ্চিত থাকিবে (যেমন, আধুনিক উন্নতশীল জাতি সকল)। এই আশু উন্নতি এবং পরিণামে উহার শোচণীয় পরিণতির কথাই কোরআনে পাকে স্পষ্টাক্ষরে ঘোষণা করা হইয়াছে "তাহারা ভক্তিহীন, বিশ্বাসহীন, বে-ঈমান হওয়া সত্ত্বেও যে আমি তাহাদিগকে ধনে জনে এত উন্নতি দিতেছি, তাহাতে তাহারা কি মনে করিতেছে যে, আমি তাহাদিগকে বাস্তবিকই ভালবাসি এবং তাহাদিগকে প্রকৃত ও স্থায়ী মঙ্গল এবং উন্নতি দান করিতেছি? না, না, কিছুতেই নহে, কিন্তু তাহারা বুঝিতেছে না।"

আল্লাহ তাআলা আরও বলিয়াছেন, "ধনে-জনে তাহাদের উন্নতি দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইও না। (অভক্তি ও অবিশ্বাসের শাস্তি স্বরূপ) আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করেন যে, ঐ সব অখাঁটি বা ভেজাল জিনিস লইয়া তাহারা দুনিয়াতেও অশান্তির শাস্তি ভোগ করুক এবং ঐ কাফেরী ও বিস্মৃত অবস্থায়ই তাহাদের মৃত্যু আসুক (এবং পরকালেও তাহারা দারুন শাস্তি ভোগ করিতে থাকুক)।"

www.pathagar.com

যখন চাক্ষুষভাবে এবং যুক্তিযুক্তভাবে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে যে, একমাত্র হযরত খাতেমুন্নাবীয়ীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুগ্রহ ছাড়া আমাদের নিষ্কৃতি লাভের কোন উপায় নাই। তখন মুসলমান ভাইদের এই দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করা একান্ত দরকার এবং অজ্ঞতা বশতঃ বা অবহেলা বশতঃ যাহাকিছু ত্রুটি বিশ্বাসের মধ্যে বা আদেশ পালনের মধ্যে হইয়াছে, সে সব অতি শীঘ্র পরিত্যাগ করিয়া ঈমান ঠিক করিয়া আদেশ পালনে রত হওয়া একান্ত আবশ্যক। বিশেষতঃ এই জন্য যে, মুসলমানের উন্নতি এবং অন্য জাতির উন্নতির ধারা এক নয়, কাজেই চেষ্টার ধারাও এক হইতে পারে না।

একথা সত্য যে, চেষ্টার ফলাফল আল্লাহরই প্রাকৃতিক নিয়ম। কাজেই চাই কাফের চাই মুসলমান হউক যে যেমন চেষ্টা করিবে তাহার ফলও সেইরূপ পাইবে। কিন্তু সাধারণত দেখা যায় যে, মুসলমানের চেষ্টা-তদবীর অমুসলমানের চেষ্টা-তদবীরের চেয়ে কম জোরদার হয়। কাজেই তাহারা তাহাদের তদবীর অনুযায়ী ফল পাইয়া থাকে। কিন্তু মুসলমানের তদবীর কমজোর হওয়া সত্ত্বেও যে পূর্বকালে মুসলমানগণ অমুসলমানগণের উপর জয়লাভ করিত তাহার কারণ এই ছিল যে, মুসলমানগণের ভরসা শুধু তদবীরের উপরই ছিল না।

বরং যথাযথভাবে চেষ্টা-তদবীর করিয়া তাহারা আত্মসমর্পণ করিত সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলার উপর। সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাআলা তাহাদের একান্ত আনুগত্য দেখিয়া বিশেষ করিয়া খাছ সাহায্যের দ্বারা তাহাদের দুর্বল তদবীরেও প্রবল শক্তি দান করিতেন যাহাতে তাহারা জয়ী হইয়া যাইত। আজকালকার মুসলমান (অধিকাংশ মুসলমান) আল্লাহর সঙ্গে সেই বিশেষ বিশেষ সম্পর্কটুকু ছাড়িয়া দিয়াছে। অথচ তদবীরও তাহাদের সবচেয়ে দুর্বল- নাই একতা, নাই সহানুভূতি, নাই নিয়মানুবর্তিতা, নাই আমির বা নেতার আনুগত্য, নাই অর্থবল, নাই ধর্মবল, নাই বিদ্যাবল, নাই বুদ্ধিবল, নাই জনবল, কাজেই তাহারা অকৃতকার্যই থাকিতেছে।

বাহুবল এবং বাহ্যিক চেষ্টা-চরিত্রে যে কোনদিন তাহারা অন্য জাতির চেয়ে সবল হইতে পারিবে এরূপ আশা সুদূর পরাহত। তাহা হয়ও নাই হইবেও না। আর হয়ও না যেন। অবশ্য তাহাদের পূর্ব-পুরুষগণ সেই গায়েবী শক্তি ও ঐশী বল সঞ্চয় করিবার অধিকার তাহাদের সব সময় রহিয়াছে। কাজেই সেই বল ও শক্তি যাহাতে সঞ্চয় করিতে পারা যায় তাহার কতগুলি উপায় উপকরণ আমরা এখানে সংগ্রহ করিয়া দিতেছি। কিন্তু প্রথমে একক দশকের অংক শিখিয়া তাহার পর লক্ষ-কোটির অংক করিতে হয়। অতএব, সেই স্বাভাবিক নিয়মানুসারে যে বিষয়গুলি খুব সহজ এবং পরোক্ষভাবে জাতীয় জীবন পুণর্গঠনের পক্ষে এবং জাতীয় অভাব অভিযোগ এবং বিপদ-আপদ ও অশান্তি হইতে মুক্তি লাভের পথে

www.pathagar.com

সহায়ক, তাহা সর্ব সাধারণের বুঝের এবং আমলের সহজের জন্য অতি সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় এখানে লিখিত হইল ঃ-

১। একীন-বিশ্বাস (দৃঢ় বিশ্বাস) ও আন্তরিক ভক্তি, পূর্ণ স্বীকৃতি ও সম্মতি এবং আল্লাহর উপর আত্ম-সমর্পণের নামই ঈমান ও ইসলাম। সর্ব প্রথমে এই ঈমান ও ইসলামকে দুরুস্ত করিতে হইবে এবং মজবুত করিতে হইবে।

২। ধর্মজ্ঞান উপার্জন করিতে হইবে।

৩। নামাযের জামা'আত কায়েম করিতে হইবে।

৪। সকলের যাকাত রীতিমত আদায় করিতে হইবে।

৫। কোরআন শরীফ উত্তম রূপে পাঠ করিতে এবং উত্তমরূপে বুঝিতে হইবে। আল্লাহর এই রজ্জুর (কোরআনের) সহিত প্রত্যেকেরই দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ থাকিতে হইবে।

৬। প্রত্যেকেরই স্বভাব-চরিত্র ও আচার-ব্যবহার ভাল করিতে হইবে।

৭। কায়-কারবার খাঁটিভাবে ও সৎভাবে করিতে হইবে।

৮। হালাল রুজি উপার্জন করিতে হইবে।

৯। অপব্যয়ী না হইয়া সকলেরই মিতব্যয়ী হইতে হইবে।

১০। আউলিয়াদের আদর্শ জীবনী শুনিয়া ও আলোচনা করিয়া প্রত্যেকের আধ্যাত্মিক শক্তি এবং আল্লাহর সহিত ঘনিষ্ঠতা বাড়াইতে হইবে।

১১। আল্লাহর নিকট প্রত্যেক কাজের সফলতার জন্য এবং প্রত্যেক চেষ্টাকে ফলবতী করার জন্য দোআ করা শিখিতে হইবে। আল্লাহ পাক যে আমাদের কেমন বান্ধব এবং সব চাইতে যে তিনিই আপন এবং সর্ব বিপদে সহায়ক একথা ভালমত শিখিতে হইব।

১২। বিজাতীয় অনুকরণের যে অভিশাপ আমাদের ভিতর ঢুকিয়াছে এবং সেই কারণে আমরা দিন দিন দুর্বল হইতে দুর্বলতর হইয়া যাইতেছি। তাহা আমাদের পরিত্যাগ করিতে হইবে এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রে জাতীয় গৌরব রক্ষার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতে হইবে।

১৩। সমস্ত মুসলমানের একতাবদ্ধ হইতে হইবে এবং একতাবদ্ধ হওয়ার মূলমন্ত্রগুলি অর্থাৎ আমীরের আনুগত্য ও নিয়মানুবর্তিতা সকলের শিক্ষালাভ করিতে হইবে এবং সকলের প্রতি দয়া ও সহানুভূতি এবং সকলের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া কাজ করা আমীরের শিখিতে হইবে এবং সকলকে নিঃস্বার্থভাবে পরামর্শ দিতে এবং সহায়তা করিতে শিক্ষা লাভ করিতে

www.pathagar.com

হইবে। জ্ঞানী ও চিন্তাশীল বৃদ্ধ এবং কর্মী যুবকবৃন্দের একতার বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া রাজনৈতিক খাঁটি নেতৃদলের, আল্লাহর আইনের সামনে এবং রসূলের খাঁটি নায়েব আলেমদের সামনে মস্তক অবনত রাখিতে হইবে এবং আলেমদের ধর্ম প্রচারকে ব্যাপক করিবার জন্য নিঃস্বার্থভাবে, সত্যিকার ভাবে চেষ্টায় লিপ্ত থাকিতে হইবে। একাজে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য ও সহানুভূতি করিতে হইবে।

১৪। আল্লাহর যিকির বেশী করিয়া করতঃ আল্লাহর সহিত সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ হইতে ঘনিষ্ঠতর করিতে হইবে।

১৫। ছবর, শোকর শিখিতে হইবে। বিপদে ছবর ও সম্পদে শোকর শিক্ষা ও অভ্যাস করাই যে কৃতকার্যতার অমোঘ ঔষধ তাহা শিখিতে ও আমল করিতে হইবে।

১৬। রাব্বুল আ'লামীন আহকামুল হাকিমীন সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তাআলা যেসব গোনাহের কারণে আমাদিগ হইতে বিমুখ হইয়া যান সেই গোনাহের কাজ আমাদের পরিত্যাগ করিতে হইবে।

১৭। ক্ষণস্থায়ী সংসারের মায়ার বন্ধনকে ছিন্ন করিয়া এবং নশ্বর জীবনকে তুচ্ছ মনে করিয়া, স্থায়ী, অফুরন্ত জীবনের এবং চিরস্থায়ী সংসারের আকাঙ্খা হৃদয়ে পোষণ করিতে হইবে।

১৮। বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া চরিত্র সংযত ও সংরক্ষণ করতঃ স্বীয় জাতির জনসংখ্যা বর্ধন করিতে হইবে।

১৯। পর্দানীতি পালন করিয়া পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় জীবন-নীতিকে সুনিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে।

২০। মহল্লায় মহল্লায় মসজিদ নির্মাণ করিয়া সেগুলির যথারীতি খেদমত করিয়া তথায় সকলের রীতিমত হাজির হইয়া সেগুলিকে ধর্মালোচনা ও জাতির গঠন নীতির কেন্দ্র করিয়া রাখিতে হইবে।

২১। একতার মূলে যাহাতে কুঠারাঘাত না হয় তজ্জন্য ক্রোধ, লোভ, হিংসা, বিদ্বেষ, ঘৃণা পরিত্যাগ করিয়া সকল মুসলমান ভাইদের খেদমত ও হক আদায় করিতে হইবে।

২২। আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র জীবনী সর্বদা আলোচনা করিতে হইবে।

২৩। আল্লাহর তকদীরে অটল বিশ্বাস এবং সব কাজে চেষ্টা ও অধ্যবসায় থাকা সত্ত্বেও উহার সফলতার জন্য কেবল আল্লাহর উপর ভরসা রাখা ও আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা শিখিতে হইবে।

www.pathagar.com

২৪। ধনীদের হজ্জ করিতে হইবে এবং তদ্দ্বারা রূহানী শক্তি, কষ্ট সহিষ্ণুতা ও জাতি-গঠন-নীতি শিক্ষা লাভ করিতে হইবে।

২৫। যাকাত ছাড়াও অন্যান্য ইসলামী কাজে, দীন-দুঃখীদের সাহায্যের কাজে, জাতির উন্নতি সাধনের কাজে এবং জাতি গঠনের কাজে দান-খয়রাত করার অভ্যাস করিতে হইবে।

২৬। রমযান শরীফের রোযা রাখিয়া তাহা দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য লাভের পথ প্রশস্ত করিতে হইবে এবং উহাতে যে দুনিয়া ও আখেরাত সম্বন্ধীয় মা'রেফাত ও জ্ঞান লাভ হয় তাহাও হাসেল করিতে হইবে।

২৭। সর্বোপরি আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি অটল ভক্তি ও আন্তরিক ভালবাসা জন্মাইতে হইবে।

২৮। নিজের জানের হকও আদায় করিতে হইবে, অর্থাৎ স্বাস্থ্য ও শক্তি রক্ষণ ও বর্ধনের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে, নতুবা সব কাজ পণ্ড হইয়া যাইতে পারে।

২৯। সৎকাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ নীতি এবং ব্যাপক তবলীগ, তালীম-তরবিয়ত নীতি পালন করিতে হইবে।

এই পদগুলি দ্বারা এই অমোঘ ঔষধ তৈয়ার হইবে। দ্রব্যগুণের দিক দিয়া এই ঔষধগুলির মধ্যে মুসলিম সঞ্জীবনী শক্তি নিহিত আছে। কাজেই এই পুস্তকের নাম 'হায়াতুল মুসলিমীন' অর্থাৎ 'মুসলিম সঞ্জীবণী' রাখা হইল।

এই ঔষধগুলি নিয়মিত রূপে জাতিগত ভাবে সেবন করিলে মুসলিম জাতির পুনরুত্থান ও পুনর্জীবন লাভ অনিবার্য। এই ঔষধগুলোর উল্লেখিত ক্রিয়াগুণের আভায মুসান্নেফ রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহি ১৩৪৬ হিজরী, ২০শে জমাদাল উলা ফযরের নামাযের মধ্যে এলহাম যোগে প্রাপ্ত হন।

ঔষধগুলির বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে ক্ষতির আশঙ্কা নাই, শোরগোল ও কোলাহল করার প্রয়োজন নাই। জেলে যাওয়ার, দেশ ত্যাগ করার বা কাহারও সঙ্গে শত্রুতা বা গভর্ণমেন্টের আইন অমান্য করার আদৌ কোন দরকার নাই। নীরবে যোগ্যতা অর্জন করা হউক। তারপর সময় আসিলে যোগ্যতানুযায়ী পদলাভ অনিবার্য। ধরাধামে খেলাফতের অধিকারী মুসলমান যদি মুসলমান হয়; কাফের নয়; তবে মুসলমানের অবহেলা ও ত্রুটির কারণে অমুসলমান বা কাফের দ্বারা মুসলমানের মাথায় জুতা মারা হইতেছে। যেন তাহারা চৈতন্য লাভ করিতে পারে ও জাগ্রত হয়।

www.pathagar.com

মানবদেহে যেমন, বিভিন্ন আত্মার সমাবেশ আছে। যেমন, জীবাত্মা, প্রেতাত্মা, মানবাত্মা ও পরমাত্মা ইত্যাদি, তদ্রুপ এই ঔষধগুলির দ্বারা যেহেতু মুসলিম জাতির জীবন গঠিত হইবে। কাজেই ইহার এক একটি ঔষধের নাম এক একটি রূহ (আত্মা বা প্রাণ) রাখা হইল। মুসান্নেফ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ইহাও বলিয়া গিয়াছেন, " আমি বর্তমান অবস্থার জন্য এই ২৯টি ঔষধই অবস্থার যোগ্য ব্যবস্থা মনে করিতেছি। পরে যদি কেহ এই ধরণের আরো কোন ঔষধ সংযোগ আবশ্যক মনে করেন, তবে কুরআন হাদীসের আলোকে উহার গুণাগুণ দেখিয়া সংযোগ করিয়া লইতে পারেন।"

তিনি ইহাও বলিয়া গিয়াছেন যে, এই ঔষধগুলির শুধু নাম শুনিলে কাম হইবে না। ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত ভাবে উহা সেবন করিতে হইবে এবং করাইতে হইবে। অর্থাৎ ঘরে ঘরে , দ্বারে-দ্বারে গিয়া উহার গুণাগুণ প্রচার এবং সেবনে রত করিতে হইবে। ঔষধগুলির গুণাগুণ সম্বন্ধে তত খুলিয়া বলার আবশ্যক নাই, তবে শুধু প্রত্যেক ঔষধের আবশ্যকতা সম্বন্ধে কুরআন-হাদীসের আলোকে সংক্ষিপ্ত ভাবে কিছু বর্ণনা করিয়া দেবার জন্য এই কিতাবখানা লেখা হইল।

নাচিজ

শামছুল হক

৯ই মহরম, ১৩৬৪হিজরী।

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে নারী গ্রন্থের ভূমিকা

সভ্যতার মাপকাঠি

আল্লাহর বিধান দুই প্রকার। একটি প্রাকৃতিক বিধান; অর্থাৎ যেখানে মানুষের ইচ্ছার বা ক্ষমতার কোন দখল নাই। সে বিধান মানুষ সম্পূর্ণ অনিচ্ছা সত্ত্বে হইলেও মানিতে বাধ্য। যেমন, স্ত্রী হওয়া বা পুরুষ হওয়া, চোখের মধ্যে দর্শন শক্তি থাকা, শ্রবণ শক্তি না থাকা, আগুনের মধ্যে দাহিকা শক্তি থাকা, পুরুষের নারীর প্রতি এবং নারীর পুরুষের প্রতি আভ্যন্তরীণ আকর্ষণ থাকা ইত্যাদি ইত্যাদি। আল্লাহর দ্বিতীয় বিধান শরীয়তের বিধান; অর্থাৎ নবীর মাধ্যমে, ওহীর মাধ্যমে, ভাষা প্রয়োগের মাধ্যমে আল্লাহ মানুষকে যে আদেশ নিষেধ করিয়াছেন। এই আদেশ নিষেধ পালন করিতে মানুষ নৈতিক দিক দিয়া, অধিকারের দিক দিয়া বাধ্য হইলেও ইচ্ছা ও ক্ষমতার দিক দিয়া মানুষ স্বাধীন।

প্রকৃতির উপর যেমন বিধান প্রয়োগকারী এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কেহই নাই, তদ্রূপ মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রণকারী বিধান প্রয়োগকর্তাও এক আল্লাহ

www.pathagar.com

ব্যতীত কেহই নাই। কারণ, মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিও একটি প্রকৃতি প্রদত্ত শক্তি। প্রকৃতি কোন দেবীর নাম নহে, বরং আল্লাহরই একটি শক্তির নাম প্রকৃতি। আল্লাহর মধ্যে অনেক অসংখ্য অগণ্য, অফুরন্ত, অসীম শক্তি আছে তন্মধ্যে প্রকৃতিও একটি শক্তি। কাজেই যেহেতু মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি স্বাধীন বাকশক্তি, স্বাধীন চিন্তাশক্তি, স্বাধীন কর্মশক্তি সবই প্রকৃতি প্রদত্ত শক্তি অথচ মানুষের উপর হুকুম (আদেশ-নিষেধ) জারী করিতে গেলেই তাহার স্বাধীনতাকে খর্ব করা হইবে, সুতরাং মানুষের উপর হুকুম প্রয়োগ কর্তা আর কেহই নাই এক আল্লাহ ছাড়া। যেরূপ প্রকৃতির উপর হুকুম প্রয়োগ কর্তা আর কেহই নাই এক আল্লাহ ছাড়া।

আল্লাহ মানুষকে সামাজিক জীব রূপে সৃষ্টি করিয়া মানুষের জন্য সমাজ ব্যবস্থা এই করিয়াছেন যে, নারী ও পুরুষকে দুইটি পৃথক শ্রেণীতে ভাগ করেন নাই, বরং প্রত্যেকটি পুরুষকে একটি নারী ব্যতিরেকে এবং প্রত্যেকটি নারীকে একটি পুরুষ ব্যতিরেকে অসম্পূর্ণ রাখিয়াছেন। নারী ও পুরুষ উভয়েই উভয়ের মুখাপেক্ষী। কেহই স্বয়ং সম্পূর্ণ নহে। দেহের দিক দিয়া যদিও পৃথক পৃথক দুইটি দেহ, কিন্তু আত্মার দিক দিয়া নারী ও পুরুষ কেহই স্বয়ং সম্পূর্ণ নহে একের ভিতর অন্যের শুধু যে কাজের দিক দিয়া মুখাপেক্ষিতা আছে তাহাই নহে অধিকন্তু একের ভিতর অন্যের জন্য এক অবর্ণনীয় পিপাসা ও আকর্ষণ রহিয়া গিয়াছে। এই অবর্ণনীয় অদমনীয় আকর্ষণ যদি না থাকিত, তবে সৃষ্টির উদ্দেশ্যই হাসিল হইত না। কিন্তু এই আকর্ষণকে যদি শৃঙ্খলাবদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত না করা যায় তবে সৃষ্টির মধ্যে বিরাট এক বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে।

যার কাছে কোটি কোটি টাকা মূল্যের মণি-মাণিক্য আছে, তাহার হেফাযত যদি সে নিজে না করে, তবে চোর-ডাকাত যে উহা লুটিয়া নিবে, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। নারীর সতীত্ব কোটি টাকা মূল্যের মাণিক্যের চেয়েও অধিক মূল্যবান সম্পদ। এই অমূল্য সম্পদকে হেফাযতের জন্য স্বয়ং নারীরই প্রধান দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। তাহাছাড়া এমন একজন অধিকতর শক্তিশালী পুরুষকেও তাহার সাহায্যকারী রূপে সঙ্গে নিতে হইবে, যে নিজের জীবনের মূল্যের চেয়েও স্ত্রীর ইজ্জতের মূল্য বেশী মনে করিবে।

সতীত্বের দ্বারাই যেহেতু মানুষের পিতৃত্ব ঠিক থাকে, আর যে মানুষের পিতৃত্বের ঠিক নাই সে মানুষ যেহেতু সর্ব স্বীকৃত রূপে গোটা সৃষ্টির মধ্যে নিকৃষ্টতম জীব, সে জন্য সৃষ্টিকর্তা মানুষের গর্ভধারিনী জননীকে সৃষ্টিই এমনভাবে করিয়াছেন যে, তাহার কর্মক্ষেত্রই পৃথক করিয়া দিয়াছেন এবং এক স্বামী ব্যতিরেকে ভিন্ন পুরুষের রূপ দেখিতে বা ভিন্ন পুরুষকে নিজের রূপ দেখাইতে হাসিমুখ দেখাইতে, এমনকি কোমল স্বর পর্যন্ত শুনাইতেও কঠোরভাবে নিষেধ করিয়াছেন।

www.pathagar.com

যে বইখানা আপনার হাতে, ইহা কোন সাধারণ লেখকের রচনা নহে। ইহার মূল মিসরের খ্যাতনামা জগদ্বিখ্যাত দার্শনিক, সাহিত্যিক জনাব ফরিদ ওয়াজদী সাহেবের লেখনী প্রসূত। ফরিদ ওয়াজদী সাহেবের তুলনা পাক-ভারতের মধ্যে একমাত্র ডক্টর মোহাম্মদ ইকবালের সঙ্গে হইতে পারে। ফরিদ ওয়াজদী সাহেব আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমুদ্র ছিলেন। ইউরোপের ইতিহাস ও তাহাদের তথাকথিত সভ্যতায় পূর্ণ পারদর্শী ছিলেন। তাঁহার জীবনের প্রধান মূল্যবান কীর্তি এই যে, পাশ্চাত্য সভ্যতার রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকিয়া তিনি ইসলামের মাপকাঠিতে মাপিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন যে, প্রকৃত প্রস্তাবে পাশ্চাত্য সভ্যতা সভ্যতাই নহে, বিশেষতঃ নারী স্বাধীনতার ব্যাপারে- বরং ইহা তাহাদের পূর্ব পুরুষদের অতিরিক্ত গোঁড়ামির ও অতিরিক্ত কঠোরতার প্রতিক্রিয়া বৈ বিজ্ঞান সম্মত কিছুই নহে। তাহাদের পূর্ব পুরুষেরা রোমীয় সভ্যতার নারী জাতির উপর এই কঠোরতা করিয়াছিল যে, তাহাদের মুখে লোহার তালা লাগাইয়া রাখিয়াছিল, তাহাদের জন্য হাসি হারাম করিয়া রাখিয়াছিল। তাহাদের জন্য গোশত ভক্ষণ হারাম করিয়া রাখিয়াছিল, ইত্যাদি ইত্যাদি যেরূপ করিয়াছিল তাহারা পুরুষদের জন্য বিজ্ঞানচর্চা হারাম। এই কঠোরতার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ পুরুষগণ যেমন হিতাহিত জ্ঞানশূণ্য হইয়া নাস্তিক হইয়া গিয়াছে, তদ্রূপ নারীগণও হিতাহিত জ্ঞানশূণ্য হইয়া, নিজেদের মান-মর্যাদার জ্ঞানহারা হইয়া একেবারে স্বেচ্ছাচারিণীরূপে, জাতির অকল্যাণময়ী ডাইনী রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

এই ধরণের কথা আপনারা ফরিদ ওয়াজদী সাহেবের যুক্তিপূর্ণ ভাষায়ই ভাল শুনিবেন। ফরিদ ওয়াজদী সাহেবের রচনা যে সাহিত্যের দিক দিয়া অতুলনীয়, যুক্তির দিক দিয়া অনুপম এবং জ্ঞানের দিক দিয়া অকাট্য, তাহার প্রমাণের জন্য আর কোন যুক্তির প্রয়োজন নাই। এতটুকুই যথেষ্ট যে, মাওলানা আবুল কালাম আযাদের ন্যায় পাক-ভারতের সুবিখ্যাত অদ্বিতীয় দার্শনিক সাহিত্যিক বাগ্মী পুরুষ উহার উর্দূ ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। বাংলা দেশের সৌভাগ্য যে, নব্য যুবক আলেম সাহিত্যিক মাওলানা হাফেয আযীযুল ইসলামের কল্যাণে উহারই বাংলা অনুবাদ আজ আপনারা আপনাদের হাতে পাইতেছেন। আমার ধারণা, একমাত্র চিন্তাহীন নিরেট মূর্খ ব্যতিরেকে সুরুচি সম্পন্ন বিজ্ঞানসম্মত কোন মানুষই ফরিদ ওয়াজদী সাহেবের যুক্তিকে অবনত মস্তকে স্বীকার না করিয়া পারিবে না।

পাকিস্তানের যুবক-যুবতীদের চিন্তাহীন অন্ধ অনুকরণপ্রিয়তা দেখিয়া এবং তাহারা যে হেয়তা বোধের শিকার হইয়া নিজেদের আত্মসত্ত্বাবোধও হারাইয়া ফেলিতেছে, তাহারা যে আপন পালক ছাঁটিয়া ও ময়ূরের পালক আঁটিয়া পরে উভয় কূলহারা কাকের মত সাজিতেছে, তাহারা যে মুসলমানও থাকিতেছে না,

www.pathagar.com

খ্রিষ্টান সমাজেও মিশিতে পারিতেছে না- এতটুকু অনুভূতিও তাহারা যৌবনের প্রবাহে হারাইয়া ফেলিয়াছে, ইহা দেখিয়া আমি অবশ্যই মর্মাহত হইতেছি। কেননা, যে জাতির পিছনে কোন ঐতিহ্য নাই, তাহারা হয় তো পরের অনুকরণের স্রোতে বহিয়া যাইতে পারে। যেমন হিন্দুদের সাপ্তাহিক কোন পবিত্র দিবস ছিল না। তাই তাহারা রবিবারকে সাপ্তাহিক ছুটি দিবসরূপে গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু মুসলমাদের তো সাপ্তাহিক পবিত্র দিবস শুক্রবার রহিয়া গিয়াছে। তাহারা কেমন করিয়া আত্মসত্ত্বা বিসর্জন দিয়া রবিবারকে গ্রহণ করিতে পারে ? আরও যেমন হিন্দুদের কোন সভ্য পোশাক ছিল না। তাহাদের নারীদের জন্যও কোন সভ্যতার মাপকাঠি ছিল না। তাহারা হয় তো হ্যাট-কোট-প্যান্ট, গাউন, নিকাব, চুলকাটা, অর্ধ উলঙ্গভাবে ঘোরাফেরা করা ইত্যাদি গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু যে মুসলমানদের নিজেদের সর্বোত্তম সভ্যতার পোশাক, নারীদের জন্য সর্বোত্তম ব্যবস্থা রহিয়াছে, পুরুষের জন্য শেরওয়ানী-টুপি-পায়জামা এবং নারীদের জন্য পায়জামা-কোর্তা ও ওড়নার দ্বারা আবৃত মনমোহিনী আজানু লম্বা চুলের পর্দার সর্বোত্তম সভ্যতার ব্যবস্থা রহিয়া গিয়াছে, তাহারা কেমন করিয়া সভ্যতার পরে অসভ্যতাকে অবলম্বন করিতে পারে? ইহা যদিও বড়ই মর্মবিদারক নৈরাশ্যব্যঞ্জক ব্যাপার, কিন্তু তবুও আমি নৈরাশ্যবাদী নই, আমি চির আশাবাদী. কেননা, আমি মুসলিম সাইকোলজীর একজন ছাত্র।

আমি প্রত্যেকটি উচ্ছৃঙ্খল মুসলিম যুবক যুবতীর অন্তরাত্মার শিরা ধরিয়া তাহার স্পন্দনের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছি যে, তাহার অন্তরের অন্তঃস্থলে আল্লাহর প্রতি ও আল্লাহর রাসূলের প্রতি অকাট্য বিশ্বাস আর শ্রদ্ধা রহিয়াছে এবং তাহারা কিছুতেই অসভ্যতাকে সভ্যতা বলিয়া স্বীকার করিতে পরিতেছে না। কিন্তু সাময়িক অবস্থায় কতগুলি কারণে তাহারা পরানুকরণে এবং স্বকীয় সভ্যতার দিকে ফিরিয়া না আসিতে বাধ্য হইতেছে। প্রত্যেকটি পুরুষই অন্তর হইতে চায় যে, তাহার স্ত্রী তাহার অনুগত ও বিশ্বস্ত থাকুক। তাহার স্ত্রী অন্য কোন পুরুষকে ভাল না বাসুক। তাহাকে সবচেয়ে বেশী ভালবাসুক। এইরূপে প্রত্যেকটি নারীই চায় যে, সে সুপুত্রের মা হউক। অথচ জগৎ সাক্ষ্য দিতেছে যে, কোন বেপর্দা নারীর গর্ভেই আজ পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য কোন সুসন্তান জন্ম গ্রহণ করে নাই। মুসলিম জাতির মধ্যে মোস্তফা কামালই বেপর্দার প্রথম উদ্যোক্তা, কিন্তু স্বয়ং মোস্তফা কামালই পর্দানশীন মায়ের সন্তান ছিলেন। তিনি বেপর্দা মায়ের অযোগ্য সন্তান ছিলেন না। আজ ৪০ বৎসর অতিবাহিত হইতেছে, তুর্কী জাতি বেপর্দা হইয়াছে। বেপর্দা হইবার পূর্বে সমগ্র ইউরোপ তুর্কী জাতির ভয়ে এইরূপ কম্পমান থাকিত যেরূপ সিংহের ভয়ে শৃগাল কম্পিত থাকে। কিন্তু এই কয় বৎসরের মধ্যে কোন বেপর্দা মেয়েলোকও এমন হয় নাই এবং বেপর্দা মায়ের

www.pathagar.com

গর্ভে এমন কোন পুরুষ সন্তানও জন্ম গ্রহণ করে নাই, যাহাকে ইউরোপ একটি শৃগালের চেয়ে বেশী পরোয়া করে।

জামালুদ্দীন আফগানী পর্দানশীন মায়ের সুসন্তান ছিলেন। মাওলানা মোহাম্মদ আলী ও শওকত আলী পর্দানশীন মায়ের সুসন্তান ছিলেন। ফরিদ ওয়াজদি, মাওলানা থানবী, ডক্টর ইকবাল পর্দানশীন মায়ের সুসন্তান ছিলেন। কায়েদে আযম, লিয়াকত আলী খাঁ পর্দানশীন মায়ের সুসন্তান ছিলেন। এ, কে, ফজলুল হক পর্দনশীন মায়ের সুসন্তান ছিলেন। শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী পর্দানশীন মায়ের সন্তান ছিলেন। আমাদের পাকিস্তানের বর্তমান নেতা মোহাম্মদ আইয়ুব খান সাহেবও পর্দানশীন মায়েরই সন্তান। আমাকে একজন বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, সমাজ-প্রেমিক, সমাজ-সেবক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি কেহ দেখাইয়া দিক, যে বেপর্দা মায়ের গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। প্রকৃত ব্যাপারও এই যে, বেপর্দা মা যেহেতু বিভিন্ন পুরুষের প্রতি নজর রাখে, সেজন্য তাহার ভিতর একাগ্রতা ও স্থিরতা থাকিতে পারে না। সুতরাং তাহার গর্ভে কোন কৃতি সন্তানও জন্মিতে পারে না। পক্ষান্তরে পর্দানশীন মেয়েলোক এক স্বামী ছাড়া অন্য কোন পুরুষের চিন্তা করে না। অন্য কোন পুরুষের ছবিই তাহার ভিতরে ঢুকে না। সুতরাং তাহার মধ্যে সম্পূর্ণ একাগ্রতা ও স্থিরতা থাকে। সে সুসন্তান ও কৃতি সন্তান প্রসব করে।

যৌবনের প্রারম্ভে যেহেতু অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান যুবকদের কম থাকে, সেজন্য তাহাদের চেতনা এমন আসে যখন আর ঘটনা প্রবাহ তাহার হাতের মধ্যে থাকে না। অথচ নির্ভুল জ্ঞানের উৎস কোরআন ও হাদীসের জ্ঞান হইতে তাহাদিগকে রাখা হইয়াছে সম্পূর্ণ অন্ধকারে। তাই আমি এখানে যুবক যুবতীদের জন্য সর্বাপেক্ষা অধিক হিতকামী, সর্বাপেক্ষা অধিক ভবিষ্যতের জ্ঞানী খোদার প্রদত্ত সর্বোত্তম সভ্যতার ব্যবস্থা কোরআন মজীদ হইতে এবং কোরআন মজীদের নির্ভুল ব্যাখ্যা হাদীস শরীফ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি।

আদর্শ কে হইতে পারে ? আল্লাহই মানুষের একমাত্র আরাধ্য, একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। তাহা সত্ত্বেও আল্লাহ হুকুম দিতে পারেন, আদেশ ও নীতি দান করিতে পারেন। কিন্তু আদর্শ হইতে পারেন না। কেননা আদর্শ বলে তাহাকে, যাহাকে মানুষ চোখে দেখিয়া কানে শুনিয়া তাহার চলাফেরা, খাওয়া-পরা, কথা-বার্তা ইত্যাদির অনুরূপ রূপ গ্রহণ করিতে পারে। অথচ আল্লাহকে তো দেখা যায় না। তিনি নিরাকার। তাঁহার কথা আছে বটে, কিন্তু সে কথার আওয়াজ নাই।

মানুষ বিনা শর্তে অনুকরণ-অনুসরণ করিতে পারে, এমন কোন মানুষও নাই। কারণ মানুষ হিসাবে সব মানুষ সমান। তবে আবার একজন মানুষ অন্য একজন মানুষের সামনে নতি স্বীকার করিবে কেন? অবশ্য আল্লাহ যদি কোন মানুষকে বাছিয়া নিয়া তাঁহাকে সনদ দিয়া দেন যে, তিনি নির্ভুল নিষ্পাপ মানুষ,

www.pathagar.com

তবে তাঁহাকে অবশ্য মানুষ আদর্শ বলিয়া স্বীকার করিতে পারে, নতুবা নয়। এরূপ মানুষকেই বলে নবী বা রাসূল। এই জন্যই নবীকে আদর্শ বলিয়া স্বীকার করিতে মানুষ বাধ্য। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, আমরা আমাদের আদর্শরূপে সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বশেষ নবীকে পাইয়াছি। আল্লাহ এহেন নবী সম্পর্কেও তাঁহাকে আদর্শ বানাইবার পূর্বে বলিয়াছেন, " তিনি যদি এক বিন্দু কথাও নিজে রচনা করিয়া উহাকে আমার কথা বলিয়া প্রকাশ করেন, তবে আমি তাঁহাকে ধরিয়া তাঁহার হৃদয়তন্ত্রী কাটিয়া দেই।" অর্থাৎ আল্লাহ সনদ দিতেছেন যে, নবীর সব কথাই আল্লাহর কথা।

অন্য এক জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন, "হে নবী! আপনাকে আমিই সত্যের উপর, হকের উপর দৃঢ়-অটল রাখিয়াছি, নতুবা আমার হেফাযত না থাকিলে আপনি অল্প একটু হইলেও তাদের দিকে ঝুঁকিয়া যাইতেন। যদি তা-ই হইত তবে আমি আপনাকে দ্বিগুণ-চতুর্গুণ শাস্তি দিতাম। এই জীবনেও এবং পরজীবনেও। সে শাস্তি হইতে রক্ষাকারী আপনার কেহই থাকিত না।" এইরূপ নিশ্চয়তা দানের পর আল্লাহ বলিয়াছেন, "আল্লাহর রাসূলই তোমাদের উত্তম আদর্শ।"

আবার যেহেতু কোন কোন ব্যাপারে রাসূলুল্লাহর আদর্শ হওয়া সম্ভব ছিল না। সে জন্য রাসূলুল্লাহ সনদ দিয়া গিয়াছেন খোলাফায়ে রাশেদীনের পক্ষেঃ "তোমরা আমার আদর্শ গ্রহণ কর এবং আমার পরবর্তী খোলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শ গ্রহণ কর।"

এইরূপে যেহেতু সমস্ত ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নারীদের আদর্শ হইতে পারিতেন না, সেজন্য স্বয়ং আল্লাহ রাসূল্লাহর বিবিগণকে নারীদের জন্য আদর্শ হইবার সনদ দিতেছেন। বলিতেছেন, "হে নবীপত্নিগণ! তোমরা সাধারণ নারী নও। (তোমরা গোটা নারী জাতির আদর্শ নারী)। এই জন্যই তোমরা অপরাধ করিলে তোমাদের দ্বিগুণ শাস্তি হইবে। তোমাদের চাল-চলনের, কাজ-কর্মের, লেবাস-পোশাকের, পতিভক্তির অনুকরণ-অনুসরণ গোটা নারী জাতি করিবে। অতএব তোমরা আসল আদর্শ হইতে বিন্দুমাত্রও হেলিও না। এমনকি তোমাদের রূপ-চেহারা এবং চেহারার হাসিরূপ পর পুরুষকে দেখানো তো দূরের কথা, তোমাদের গলার কোমল স্বরও যেন পরপুরুষে না শুনিতে পারে। অতএব দরকার বশতঃ তোমরা যখন কোন পরপুরুষের সঙ্গে কথা কও, তখন কোমল স্বরে কহিও না। বরং কর্কশ ও রুক্ষস্বরে কথা কহিও। অবশ্য কথা হওয়া চাই কাজের কথা, ন্যায় সঙ্গত কথা। যদিও তোমরা উম্মতের সমস্ত পুরুষের মা, যদিও তোমাদের সঙ্গে জীবনে কখনও তাহাদের বিবাহ দুরস্ত নাই, তাহা সত্ত্বেও তোমাদের জন্য এই হুকুম। আর আসল হুকুম এবং মুসলিম সভ্যতার কেন্দ্র বিন্দু

www.pathagar.com

হইতেছে এই যে, নারী জাতির জন্য কর্মক্ষেত্রই ভিন্ন। নারী জাতির জন্য কর্মক্ষেত্র হইতেছে বাড়ীর ভিতর।

অতএব, হে নবীপত্নিগণ! তোমাদের দেখিয়া যেহেতু অন্য নারীরা শিক্ষা গ্রহণ করিবে, তোমরা হইবে তাহাদের আদর্শ। সেই জন্য তোমাদিগকে আদেশ করা হইতেছে, (স্বয়ং খোদার তরফ হইতে আদেশ, নবীর তরফ হইতে বা অন্য কাহারও তরফ হইতে নয়) এই যে, (১) "তোমরা স্বাভাবিকভাবে বাড়ীর ভিতরে থাকিবে, আগের যামানার বর্বর অসভ্য যুগের নারীদের ন্যায় পথে-ঘাটে বা পুরুষদের কর্মক্ষেত্রে সাজসজ্জা করিয়া ঘোরাফেরা করিও না।"

(২) যদি কোন সময় অন্য পুরুষদের দ্বারা কোন জিনিস আনাইতে হয় বা কাজ করাইতে হয়, তবে পুরুষদের কঠোর ভাষায় কাজের কথা বলিবে, কোমল স্বরে বলিবে না। আর যদি পুরুষের নিকট কোন জিনিস চাহিবার দরকার হয় তবে তাহারা পর্দার আড়াল হইতে চাহিবে। আল্লাহ বলিতেছেন– (৩) "হে মুসলমানগণ! তোমরা বিনা অনুমতিতে নবীর বাড়ীর মধ্যে ঢুকিও না।" এবং

(৪) "হে মুসলিম পুরুষগণ! যখন কোন কাজের জিনিস তাহাদের কাছে অর্থাৎ নবী পত্নীদের কাছে তোমাদের চাহিবার দরকার পড়ে, তখন তোমরা পর্দার আড়ালে থাকিয়া তাঁহাদের কাছে চাহিবে, অন্তরের গোপন ভাব আল্লাহ্ জানেন, ইহাই তোমাদের অন্তরের জন্য পবিত্রতম কর্মপন্থা এবং তাহাদের অন্তরের জন্যও।"

ইহার দ্বারা সকল মুসলিম নারীর জন্যই বাড়ীর ভিতরের কাজে থাকার ফরযিয়ত এবং বাড়ীর বাহিরে সাজ-সজ্জা করিয়া ঘুরিয়া বেড়ানোর নিষিদ্ধতা প্রমাণিত হইতেছে। যদি দরকারবশত বাহিরে যাইতে হয় তবে কিভাবে যাইতে হইবে তাহা সামনের আয়াতে বলা হইতেছে। আল্লাহ্ বলিতেছেন-

"হে নবী! আপনি আপনার বিবিগণকে, আপনার মেয়েগণকে এবং সর্ব সাধারণ মুসলমানদের বিবিদিগকে বলিয়া দিন, দরকারবশতঃ বাহিরে যাইতে হইলে তাহারা যেন পর পুরুষকে চেহারা দেখিবার সুযোগ না দেয়, তাহারা যেন বড় চাদর দ্বারা তাহাদের সর্ব শরীর ঢাকিয়া, মাথা ঢাকিয়া মাথার উপর দিয়া কপালের উপর দিয়া চেহারার উপরও যেন কিছুটা চাদর লটকাইয়া রাখে, যাহাতে চেহারা দেখা না যায়।"

পুরা পর্দার ব্যবস্থা আল্লাহ্ তায়ালা কোরআনের ভাষায় এইরূপে করিয়াছেন– (৫) "হে মুসলমানগণ! তোমরা সালাম করিয়া অনুমতি লওয়া ব্যতিরেকে কাহারও বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিও না।" হাজার সতর্কতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও হয় তো কাহারও দ্বারা অসতর্কতা হইয়া যাইতে পারে। অতএব, আল্লাহপাক আরও বলিতেছেন–

www.pathagar.com

(৬) "হে নবী! আপনি মুমিন-মুসলিম পুরুষগণকে বলিয়া দিন, তাহারা যেন তাহাদের চরিত্র পবিত্র রাখে এবং চরিত্র পবিত্র রাখার প্রধান উপায় এই যে, তাহারা যেন তাহাদের নজর (দৃষ্টি) নীচের দিকে রাখে।"

আল্লাহপাক আরও বলিতেছেন–

(৭) "এইরূপে হে আমার নবী, আপনি মু'মিন-মুসলিম নারীদেরকেও বলিয়া দিন, তাহারা যেন তাহাদের সতীত্বকে পূর্ণরূপে রক্ষা করে, সতীত্ব রক্ষা করার উপায় এই যে–

(৮) তাহারা যেন তাহাদের নযরকে নীচের দিকে রাখে;

(৯) তাহারা যেন তাহাদের সৌন্দর্য স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভাই, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভাগিনা, নারী, নাবালেগ ব্যতীত অন্য কোন ভিন্ন পুরুষকে না দেখায়। এই হুকুম অবশ্য পালনীয় হুকুম। অবশ্য যদি বাতাসে বা হাঁটার অসতর্কতাবশত কিছুটা খুলিয়া যায় তবে সেটুকু মাফ। এবং

(১০) তাহারা যেন তাহাদের ওড়না পিঠের পিছনে না ফেলিয়া রাখে বরং উহার দ্বারা মাথা ঢাকিয়া, ঘাড়-গলা ঢাকিয়া উহাকে যেন বুকের উপর জামার কাটা জায়গা ঢাকিবার সময় তাহারা যেন পা জোরে জোরে না মারে। কেননা, তাহা হইলে তাহাদের পর্দার যে উদ্দেশ্য গোপন রাখা, সে গোপন বস্তুই প্রকাশ পাইয়া যাইবে।

পথে হাঁটিবার ব্যাপারও স্বয়ং আল্লাহপাক নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন। ইহারই ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ স্বরূপ হাদীস শরীফে আসিয়াছে, "নারীগণ পথের মাঝখান দিয়া হাঁটিবে না, পথের কিনারায় হাঁটিবে এবং পায়ের পাতাও যাতে না দেখা যায় সেজন্য বোরকা বা বড় চাদর পায়ের নিচে পর্যন্ত লটকাইয়া রাখিবে।

আল্লাহর বাণীর এই সভ্যতা, এই ভদ্রতা অপেক্ষা অন্য কোন সভ্যতা-ভদ্রতাই বড় বা ভাল হইতে পারে না। কারণ, প্রকৃতির মালিক আল্লাহ্ প্রকৃতি অনুসারেই নারী-পুরুষের জন্য তাহাদের উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহারই বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও দার্শনিক তত্ত্ব এই পুস্তকে পাইবেন।

এই জন্যই এই বই খানার বহুল প্রচলন- বিশেষতঃ আধুনিক শিক্ষিত সমাজে আমি আল্লাহর দরবারে কামনা করিতেছি এবং আমি আমার শিক্ষিত বন্ধুগণকে বইখানা একবার পড়িয়া আপন আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যেও বিশেষতঃ অন্দরমহলে প্রচার করিতে অনুরোধ করিতেছি।

নাচিজ

শামছুল হক

www.pathagar.com

এলমের ফজিলত-এর অবতরণিকা

মানুষের মনুষ্যত্ব লাভ করিবার পথে অনেক প্রকার বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া চলিতে হয়। বিশেষত: একজন মানুষ খাটি ঈমানদার এবং প্রকৃত মুসলমান খাঁটি নায়েবে রাসুল আলেম হইতে চাহিলে তাহার শত্রু এবং তাহার পথের কাঁটার তো অন্ত নেই। সাধারণ মানুষের মনুষত্য অর্জনের পথে অনেক যে নফস্ (কু-প্রবৃত্তি) এবং শয়তান (মানব শয়তান এবং জ্বিন শয়তান) নামে দুইজন শত্রু আছে, এই শত্রুদ্বয়ের সহিত তাহাকে আজীবন সংগ্রাম করিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত তাহার জীবনের উন্নতির পথে আরও অনেক শত্রু আছে- বহিঃশত্রু এবং অন্তঃশত্রু। কেহ শত্রুতা করে উন্মুক্ত অসি মস্তকের উপর ধারণ করিয়া, আবার কেহ বা শত্রুতা করে কটু বাক্য ব্যবহার করিয়া, ঠাট্টা-বিদ্রূপ বা ব্যঙ্গ করিয়া।

যে দিন হইতে মুসলিম শাসনের পতন হইয়াছে, সেই দিন হইতে শত্রুরা বকলম নাম দূর করিবার জন্য সাত সমুদ্র তের নদীর অপর পারের একটি অদ্ভুত ভাষা শিক্ষা করার শর্ত লাগাইয়াছে। দেশীয় ভাষায়, জাতীয় ভাষায় বা ধর্মীয় ভাষায় যে যতই অভিজ্ঞ ও পারদর্শী হইয়া জীবনকে উৎসর্গকারী হউক না কেনা, রাজ-দরবারে তাহাকে কোন মান-সম্মানই দেওয়া হয় নাই। এতদ্ব্যতীত অন্য কোন সদুপায়ে ও সম্মানের সহিত জীবিকা নির্বাহের উপায়ও তাহার জন্য রাখা হয় নাই। আদমশুমারীর মানুষ গণনার লিষ্টেও তাহার নাম নিরক্ষরের পর্যায়েই রাখা হইয়াছে। যেসব কাজে ভোটের জন্য শিক্ষিত হওয়ার শর্ত লাগান আছে, সে সব কাজে তাহারা ভোট দেওয়ার অধিকারী হন না। হায়রে যুলম! হায়রে অন্যায়!!

যেদিন হইতে মুসলিম ভাগ্যকাশ ঘোর ঘনঘটাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে, তখন হইতে সে নিবিড় অন্ধকার দূর করি বার জন্য অন্ততঃ আমাদের সতর্ক থাকাও উচিৎ ছিল। কারণ,শত্রু তো শত্রু শত্রুতা করিবেই, শত্রুকে গালি দিযা লাভ নাই। আমাদের উচিৎ ছিল, শত্রুর ফাঁদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য সতর্ক থাকা। কিন্তু আমরা তাহা না করিয়া নিজেদের পায়ে নিজেরা কুঠারাঘাত করিয়াছি। শত্রুর কুমন্ত্রণায়, শত্রুরপ্ররোচনায় আমরাই আমাদের জাতীয় উন্নতিকে অবনতি বলিতেছি। জাতীয় শিক্ষাকে শুধু যে পরিত্যাগ করিয়াছি তাহা নহে; বরং তুচ্ছ ও ঘৃণা করিতেছি। তাই সুশিক্ষাকে কুশিক্ষা এবং কুশিক্ষাকে সুশিক্ষা বলিতেছি।

ইংরেজী ভাষার ভিতরে যে সব জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিষয় আছে, তাহাকে আমরা কুশিক্ষা বলিতেছি না।ইংরেজী পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের জাতীয়তা ভুলিয়া যাওয়া, জাতীয় কৃষ্টি-কালচারকে ভুলিয়া যাওয়া, জাতীয় শিক্ষা, শিক্ষক ও

www.pathagar.com

শিক্ষার্থীগণকে তুচ্ছ করা, জাতীয় লেবাস-পোশাক, আকৃতি-প্রকৃতি, ধর্মনীতি ইত্যাদি ছাড়িয়া দিয়া বিজাতীয় অন্ধ অনুকরণে অভ্যস্ত হওয়া যে বিষ দেশে ও সমাজে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তাহাই কুশিক্ষার পরিচায়ক। ভাষা-বিশেষে পারদর্শিতা লাভ করাকে সুশিক্ষা বলা হয় না। সুশিক্ষা বলে, সুবিষয় পড়িয়া নৈতিক শিক্ষা লাভ করত: নৈতিক চরিত্রের উন্নতির দ্বারা জীবনকে সুগঠিত করাকে। আমাদের পেয়ারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন:"বুয়িছতু লি উতাম্মিমা মাকারিমাল আখলাখ" অর্থাৎ উত্তম স্বভাবগুলিকে পূর্ণাঙ্গ করার উদ্দেশ্যেই, আমি জগতে প্রেরিত হইয়াছি।

এখানে নৈতিক শিক্ষার এবং উত্তম স্বভাবের কতকগুলি নমুনা উল্লেখ করিতেছি, যথা-দয়া, মায়া, হায়া, ক্ষমা, সত্য কথা, দান, খাঁটি কারবার, ওস্তাদ ভক্তি, দায়িত্ব জ্ঞান, পরমত সহিষ্ণুতা, ইমামের তাবে'দারী, মুসলমানের সঙ্গে সাক্ষাত হইলে আস্‌সালামু আলাইকুম বলিয়া হাসিমুখে মিষ্ট কথায় আলাপ করিয়া তাহার সন্তোষ ও সম্মান বর্ধন করা, ক্ষুধার্থকে অন্ন দান করা, তৃষ্ণাতুরকে পানি পান করানো, ক্রোধ সংবরণ করা, অন্যকে কষ্ট না দেওয়া, জন সাধারণের ত্যক্ত-বিরক্তকে অম্লান বদনে সহ্য করা, খাওয়া-পরা, উঠা-বসা ইত্যাদিতে অন্যকে অগ্রগণ্য করিয়া নিজেকে পিছনে রাখা, অন্যে অন্যায় করিলে তাহার প্রতিশোধ না করিয়া নিজের বিচার নিজে করা, পরের উপকার করিলে তাহা মনে না রাখা, অন্যে তোমার বিন্দু মাত্র উপকার করিলেও চিরকাল তাহা মনে রাখা, সম্মানি ও পদস্থ হইলে গরিবকে যথাসাধ্য সাহায্য করা, আত্মীয়-স্বজনের সহিত সদ্ব্যবহার করা, তালেবে ইলমদের প্রতি সদ্ব্যবহার, তাদের উৎসাহ বর্ধন, তাহাদের খেদমত এবং যথাসাধ্য সাহায্য করা, কেহ ওযু বা নামায পূর্ণরূপে আদায় করিতেছে না দেখিলে, নম্রভাবে দেখাইয়া দেওয়া বা শিক্ষা দেওয়া, যেহেতু রাগ করিলে সে চির জীবনই মুর্খ ও গোনাহগার থাকিয়া যাইবে এই ধরণের উত্তম স্বভাবগুলো শিক্ষা করার নামই নৈতিক শিক্ষা, মানব জীবনের উৎকর্ষ সাধন অনেক টাকা বা অনেক ভোগ বিলাসের মাধ্যে হয় না, উহা লাভ হয় সুশিক্ষায় সুশিক্ষিত হইয়া নৈতিক উন্নতি সাধন করায়। আক্ষেপের বিষয় এই যে, এই সুশিক্ষা এবং নৈতিক শিক্ষার মূল উৎস এলমে দ্বীন ও ইসলামী আদব কায়দাকেই লোকে আজকাল ভক্তির চোখে দেখিতেছে না এবং তাহার মূল্য নিরূপণ করিতেছে না এই ব্যথা মনে লইয়া মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দের উপকারার্থে আল্লাহর রসূল (সাঃ)এর দ্বীন জারীর জন্য কয়েকখানা হাদীস সমাজে পেশ করিতেছি। আল্লাহ পাকের দরবারে কবুল হইলে এবং সমাজের কিঞ্চিত উপকার হইলে এ দীন স্বীয় শ্রম সার্থক মনে করিবে। নাচিজ

শামছুল হক

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়

হযরত শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ)এর
অমিয় বাণী

সংকলন– মুহাম্মদ ইদ্রিস আলী ফরিদপুরী

www.pathagar.com

বিজ্ঞান এবং যুক্তির চেয়ে ওহী বড়, কারণ বিজ্ঞান ও যুক্তি মানুষের মস্তিষ্ক প্রসূত জিনিস, আর মানুষ মাত্রই ভুল হইতে পারে; মানুষ যত বড়ই হোক না কেন, মানুষ হিসেবে মানুষ ভুলের উর্ধ্বে নয়; অবশ্য, যে সব মানুষ পয়গম্বর হইয়াছেন তাঁহারা তাঁহাদের পয়গম্বরী কাজের মধ্যে ভুলের উর্ধ্বে। ওহী আল্লাহর জ্ঞানের নাম, আল্লাহর জ্ঞানে কখনো ভুল হইতে পারে না। আল্লাহর জ্ঞান ফেরেশ্‌তাদের হাতে পয়গাম্বরের কাছে আসিয়াছে; পয়গাম্বর সেই জ্ঞান প্রচারে ভুল করেন নাই, আল্লাহই তাঁহাকে ভুলের থেকে রক্ষা করার ভার নিয়াছেন।

মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ)

www.pathagar.com

অমিয় বাণী

তুমি দুনিয়ার সবকিছুই পাইয়াছ কিন্তু আল্লাহকে পাও নাই তবে তুমি কিছুই পাও নাই। আর তুমি দুনিয়ার কোন কিছুই পাও নাই কিন্তু আল্লাহকে পাইয়াছ; তুমি সব কিছুই পাইয়াছ। (সঞ্জীবনী অমর বাণী)

পতিত জাতি ও উন্নত জাতির পার্থক্য এই যে, পতিত জাতি পরের দোষ অন্বেষণ করে, অন্যকে হেয় করার উদ্দেশ্যে তার গুণ দেখে না, কেবল দোষই দেখে। আর উন্নত জাতি পরের দোষ অন্বেষণ করার সময়ই পায় না। ব্যক্তিগত ও জাতীয় উন্নতির চিন্তায় থাকে ব্যতিব্যস্ত।

(সঞ্জীবনী অমর বাণী)

নীচের হাতের চেয়ে উপরের হাত ভাল, নেওয়ার চেয়ে দেওয়া ভাল, পরেরটা খাওয়ার চেয়ে পরকে খাওয়ানো ভাল, এই নিয়ম পালন করিবে। ওযু-গোসল ঠিকমত করিবে, পাক-নাপাক বাছিয়া চলিবে, হালাল-হারাম বাছিয়া খাইবে, জায়েয-নাজায়েয জানিয়া লইবে। দয়া-মায়া, হায়া-শরম, আদব-তমিজ ঠিক রাখিয়া চলিবে। ভুল-চুক হইয়া গেলে বৃথা তাবিল বা জিদ করিবে না। ভুল স্বীকার করিয়া মাফ চাহিয়া লইবে। (প্রথম সবক)

মোমিন বান্দার গতির উদাহরণ ইলিশ মাছের মত। ইলিশ মাছের দেহে প্রাণ থাকিতে সে কোন দিন ভাটিতে চলে না। হামেশা উজান পথে চলে। যখন প্রাণবায়ু নাকের ডগায় আসিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয় তখন চিৎ হইয়া ভাটির দিকে ভাসিতে থাকে। মোমিন বান্দার দেলে তিল পরিমাণ ঈমান থাকিতেও সে কোন দিন দুনিয়ার স্রোতে ভাটি দিতে পারে না।

(সঞ্জীবনী অমর বাণী)

একটা জাতির পরাধীন হতে, পতন হতে সময় লাগে না কিন্তু একটা জাতিকে উন্নত করতে বহু সময়, বহু সাধনা, বহু ত্যাগ, বহু কোরবাণীর দরকার। আর শুধু তাই নয়, সর্বোপরি সর্ব-শক্তিমান রহীম রাহমান আল্লাহর ঐশী মদদের দরকার। (রাসায়েলে হক্কানী)

ঈমান রক্ষার উপায় কি? জিজ্ঞাসা করায় হুযুর বলেন ঃ ঈমান রক্ষার জন্য আগে ঈমানের ক্ষেতে বেড়া দাও, আমের চারা গাছটা বেড়ার ফাঁক দিয়া গরু-ছাগল মুখ ঢুকাইয়া বেড়া ভাঙ্গিয়া পাতা ডাল-পালা খাইয়া নষ্ট করিয়াছে। তদ্রুপই মজবুত না থাকলে শয়তান এবং নফ্‌স সুযোগ পাইলেই ঈমানের গাছ খাইয়া ফেলিবে। হাঁ, বেড়া দিয়া যত্ন করিলে গাছ বড় হইয়া

www.pathagar.com

শক্তিশালী হইয়া গেলে আর খাইতে পারিবে না। ওলিয়ে কামেলে মোকাম্মালের ছোহবতের তরবিয়াত পাইলে ঈমান মজবুত ও শক্তিশালী হইলে শেষে আর নষ্ট করিতে পারিবে না, তখন আর অপরের পানি দেওয়ার যত্নের অপেক্ষায় থাকতে হবে না শিকড় মজবুত হইয়া নিজেই জমির রস টানিয়া বড় হইয়া ঝড়-ঝঞ্ঝা সহ্য করিতে পারিবে। তদ্রুপ আল্লাহর মহব্বতে দেল পরিপূর্ণ উজালা হইলে দেলের জযবা মাওলার মহব্বতের রস টানিয়া সবল ও সজীব থাকিবে।

(সঞ্জীবনী অমর বাণী)

- হে আমার উত্তরাধিকারীগণ! তোমরা জেনে রেখ, তোমরা সাক্ষী থেক, আমি যদি আমার জীবনে দেখে না যেতে পারি, তোমরা এই সত্যকে প্রচার কর এবং ভবিষ্যত বংশধরদের মধ্যে প্রেরণা ও আলোড়ন জাগরিত করিও যে, আমি যে পাকিস্তান আন্দোলনে যোগদান করেছি, তার লক্ষ্য শুধু বর্তমানের এই গায়েরী ইসলামী জীবন ব্যবস্থা পরিচালিত ক্ষুদ্রতম পাকিস্তানের উপর সন্তুষ্ট হইয়া নয়। বরং সারা দুনিয়া ব্যাপী কোরআন ও সুন্নাহের ভিত্তিতে ইসলামের কালেমা বুলন্দ করিবার নিয়তে। জানিনা কবে এ আশা পূরণ হবে। কবে এ স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত হবে। এর জন্য জরুরত মজবুত জামায়াতি জিন্দেগীর। (মাতৃ জাতির মর্যাদা)

- হিজরী ত্রয়োদশ শতাব্দির শেষ ভাগে একজন অতি বড় বুযুর্গ ছিলেন, মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতবী (রহঃ)। তাহার নিকট বেদাতী ফকিরদের একদল লোক মেহমান হইয়াছেন। ফকিরদের সঙ্গে ছিল ডোম, মেথর, যাহারা ফকিরদের খেদমতের জন্য মোতায়েন ছিল। মাওলানা সাহেব ঐসব ডোম-মেথরদের খেদমত নিজ হাতে করিয়াছেন, তাহাতে তিনি একটুও সঙ্কোচ বোধ করেন নাই। তিনি নিজ হাতে শিয়া মুজতাহিদদের হুক্কা সাজাইয়া খাওয়াইয়াছেন। তাহাদের গা ও পা টিপিয়া দিয়া মেহমানের হক আদায় করিয়াছেন। তাহাতে তিনি মাওলানা গিরির মানহানী একটুও বোধ করেন নাই।

- এই ধরণের আখলাক, এই ধরণের খেদমতে খালকের জযবা আবার যেদিন আলেম সমাজে এবং মুসলিম নেতৃ সমাজে জাগিবে, সেই দিন আবার মুসলিম জাতির উন্নতি ও মর্যাদা দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠিত হইবে।

(খেদমতে খালক)

www.pathagar.com

- সদা সত্য কথা বলিবে, আমানতের হেফাজত করিবে। মিথ্যা বলা বড় দোষ। আমানতের খেয়ানত বড় পাপ। পরনিন্দা করিবে না। কাহারও উপর মিথ্যা তোহমত লাগাইবে না। মিথ্যা সাক্ষ্য দিবে না।

(সংক্ষেপে ইসলাম)

- দয়ালু পরোপকারী ও স্নেহশীল হইবে। নির্দয় নিষ্ঠুর হইবে না। বিশেষ করিয়া গরীব-দুঃখী ছোটদের উপর দয়া ও স্নেহ করিবে। কাহাকেও হেকারত বা তুচ্ছ করিবে না। পরের ক্ষতি করিবে না।

(সংক্ষেপে ইসলাম)

- যে তোমাকে দান করে না, তুমি তাহাকে দান কর। যে তোমাকে কাটিয়া ফেলে, তাহাকেও তুমি টানিয়া রাখ। যে তোমার অপকার করে, তারও তুমি উপকার কর। অন্যের দেখাদেখি বখিলি করিও না। অপকার করিও না। আত্মীয়তা বা বন্ধুত্ব নষ্ট করিও না। (সংক্ষেপে ইসলাম)

- খাঁটি অ-খাঁটি চিনিয়া লইও। সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব করিও না। মিথ্যাবাদীর সঙ্গে, স্বার্থপরের সঙ্গে, ভন্ড ছুফির সঙ্গে বন্ধুত্ব করিও না।

(সংক্ষেপে ইসলাম)

- অলসতা ও বিলাসিতা বর্জন কর। সময়ের মর্যাদা বুঝ। নিয়মের অনুবর্তি হও। শ্রমকে ঘৃণা করিও না। কর্মঠ ও কর্মতৎপর হও। দায়িত্ব জ্ঞান অর্জন কর। কাজে অপমান নাই। অপমান চুরিতে আর ভিক্ষায়।

(সংক্ষেপে ইসলাম)

- পেশা শিল্প অমর্যাদার জিনিস নয়। বরং পেশা ও শিল্পকে ঘৃণা করা ভয়ানক গুনাহ। অবশ্য পেশার মধ্যে সততা ও সত্যতা চাই। কৃষি পেশাকারী ও বস্ত্র পেশাকারীর মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধও নিষিদ্ধ নহে বা কৃষি পেশাকারীর ছেলে বস্ত্র পেশাকারী হইতে পারিবে না বা বস্ত্র পেশাকারীর ছেলে রাষ্ট্রপ্রধান হইতে পারিবে না, তাহাও নহে। (সংক্ষেপে ইসলাম)

- ঠকাইয়া, ধোকা দিয়া, মাপে কম দিয়া, ভাল জিনিসে মন্দ জিনিস মিশিয়ে দিয়া, ভাল নমুনা দেখাইয়া ভাল বলিয়া মন্দ জিনিস দিয়া অর্থ উপার্জন করা হারাম। (সংক্ষেপে ইসলাম)

- আইন প্রণয়নের অধিকার একমাত্র আল্লাহর । তাছাড়া অন্য কাহারও নহে। কারণ মানুষ মানুষের অধীন হইতে পারে না। অবশ্য আইনের উপধারা

www.pathagar.com

রচনা করিবার অধিকার দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন বিশ্বস্ত যোগ্য জ্ঞানীদের আছে কিন্তু সে উপধারা সমূহের ব্যাখ্যা হওয়ার জন্য প্রধান শর্ত এই যে কোরআন ও সুন্নাহর খেলাপ যেন না হয়।

(সংক্ষেপে ইসলাম

- সুখের সময় সম্পদ পাইয়া আল্লাহকে ভুলিয়া যাইবে না। আল্লাহর হব আদায় করিবে, শোকর করিবে। মানুষের হকও আদায় করিবে।

(সংক্ষেপে ইসলাম)

- চরিত্রকে, মনকে, চক্ষুকে পবিত্র রাখিবে। চোখের দ্বারা পরস্ত্রী বা পরের আয়েব দর্শন করিবে না। মনের দ্বারা কু-খেয়াল, কু-চিন্তা মনে আনিবে না। কস্মিন কালেও পরস্ত্রী স্পর্শ বা পরদ্বারে গমন করিবে না।

(সংক্ষেপে ইসলাম)

- নম্র স্বভাবের হইবে, উগ্র মেজায বা অহঙ্কারী হইবে না। নম্রতার অর্থ হীনতা বা নীচুতা নয় এবং নিজের কওমী ও জাতীয় আদর্শকে বড় মনে করা অহঙ্কার নয়। নিজের জাতিকে, ধর্মকে নিজের যাবতীয় আদর্শকে সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করিয়া গুণের মর্যাদা দান করিতে হইবে। কিন্তু ব্যবহারের বেলায় অন্য ভাইকে নিজের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া তাকে উচ্চ আসন দান করিবে। নিজে আরও অধিক গুণ অর্জন করার জন্য পিপাসু থাকিবে ও চেষ্টা করিবে। অহঙ্কারই পতনের মূল। অহঙ্কার করিলে মানুষের উন্নতির দ্বার রুদ্ধ হইয়া যায়। (সংক্ষেপে ইসলাম)

- দানে কখনও ধন কমে না, ক্ষমায় কখনও ক্ষমতা কমে না, নম্রতায় কখনও মর্যাদা কমে না। (সংক্ষেপে ইসলাম)

- মা, বাপ, ওস্তাদ-পীর ও মুরব্বীগণের আদব করিবে, বে-আদব হইবে না। (সংক্ষেপে ইসলাম)

- পাড়া প্রতিবেশীর সেবা, অতিথি সেবা এবং বার্ধক্যে মা-বাপের খেদমতকে নিজের উপর ওয়াজিব করিয়া লইবে। তাহাদের কারণে যাহা কিছু কষ্ট হয়, তাহা হাসি মুখে নীরবে সহ্য করিবে। (সংক্ষেপে ইসলাম)

- বড়কে ছোটরা তমিজ করিবে, ছোটকে বড়রা স্নেহ করিবে, আলেমের মর্যাদা রক্ষা করিবে। (সংক্ষেপে ইসলাম)

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মানব মনে রাখিও, নিকৃষ্ট ইতর প্রাণী তুমি নও; কয়েকটি টাকার বিনিময়ে মানবতাকে বিক্রি করিও না। সত্যান্বেষী হও, নিজকে চেন, খোদাকে চেন। সত্য ধর্মকে তালাশ কর, অলস ও বিলাস প্রিয় হইও না। সত্য ধর্ম লিপিবদ্ধ আছে আল্লাহর কুরআনে আল্লাহর রাসূলের পবিত্র মুখ নিসৃত বাণী হাদীসের মধ্যে, একটু কষ্ট স্বীকার কর। মূল ভাষায় তাহা অধ্যয়ন করার কষ্টটুকু, অন্ততঃ স্বীকার কর। (পাদ্রীদের গুমর ফাঁক)

সমাজ ভাল হইবে তিনটি কাজের দ্বারা ঃ

১) খোদার ভয় পয়দা, আখেরাতে ভীষণ দোযখের শাস্তির ভয় পয়দা হয় এমন সুশিক্ষার ব্যবস্থা দেশে চালু করিয়া প্রত্যেকটি ব্যক্তির মধ্যে খোদার ভয় পয়দা করিতে হইবে।

২) অসত্য অন্যায়, অত্যাচার ও দুর্নীতির প্রতি সমাজের ঘৃণা পয়দা করিতে হইবে। সমাজের প্রত্যেকেই যাতে অসত্য, অন্যায়, অত্যাচার ও দূর্নীতির প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করে সেই শিক্ষা সমাজকে দিতে হইবে।

৩) আইনের মর্যাদা সহ আইন করিতে হইবে। অসত্য, অন্যায়, অধর্ম, অত্যাচার ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে শাস্তিবিধান করিতে হইবে। এই তিন উপায়ে সমাজ ভাল হইবে। (চরিত্র গঠন)

ইসলামে সহস্র বৎসরের কুলীন এবং গত কল্যকার মুচি, মেথর, তাঁতী, ডোম ইত্যাদি কালেমা পড়িয়া মুসলমান হওয়া মাত্রই এক বিছানায় বসিয়া খাইতে এবং একই লাইনে গায়ে গায়ে মিলিয়া দাঁড়াইয়া নামায পড়িতে, এমনকি, কন্যা আদান প্রদান করিতে দেখা যায় না কি? আছে কি উদারতার এমন নজির এবং মানবতার এমন দৃষ্টান্ত কোথাও?

(পতিত পাবন)

প্রত্যেক মুজাহিদের মধ্যে জাতীয়তা বোধ থাকা দরকার। অর্থাৎ আল্লাহর ধর্মকে রক্ষা করার জন্য মরণকে বরণ করিতে, জীবনকে তুচ্ছ মনে করিতে একটুও দ্বিধাবোধ করা চাই না এবং কোটি কোটি টাকাকে জাতীয় কল্যাণের সামনে, ইসলামের তরক্কীর সামনে অতি তুচ্ছ মনে করা চাই। (জিহাদের আহবান)

www.pathagar.com

- পীরের সমস্ত কথাই ভক্তির সহিত পালন করিবে এবং জানে-মালে তাঁহার খেদমত করিবে। কেননা, পীরের মহব্বত ব্যতীত কিছুই হাসেল হয় না এবং এইগুলি মহব্বতের আলামত। (পীরের পরিচয়)

- খোদাকে পাইবার ইচ্ছা থাকিলে কামেল পীর তালাশ করিয়া লও। কেননা, কামেল পীরের সাহায্য ব্যতিরেকে জীবন ভরিয়া পরিশ্রম করিলেও রাস্তা পাওয়া যায় না। (পীরের পরিচয়)

- মুজাহাদার অর্থ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আল্লাহর আদেশ পালন করিতে নফসের খেলাপ অর্থাৎ মনের বিরুদ্ধে রুচির বিরুদ্ধে অভিযান করা। বারবার এই রূপ করিতে থাকাকে রিয়াযত বলে। (ফরুউল ঈমান)

- যখন জাতি আল্লাহর কিতাব অনুসারে ন্যায় বিচার না করিতে অভ্যস্ত হইবে তখন তাদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ, আত্মকলহ, একতাভঙ্গ এবং দ্বন্দ্ব শুরু হইবে। (সংক্ষেপে ইসলাম)

- জাতির মধ্যে যখন মাপে ওজন কম দেওয়ার প্রসার হইয়া যাইবে, তখন তাদের মধ্যে অভাব-দুর্ভিক্ষ দেখা যাইবে, ট্যাক্স বেশী ধরা হইবে এবং রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে অবিচার অত্যাচার বেশী হইবে। (সংক্ষেপে ইসলাম)

- হে অবোধ মানব! চিন্তা কর, বুঝ, শুধু তর্ক করিয়া, ঝগড়া করিয়া বা টাকার গরমে, পদের গরমে জিতিতে চাহিও না। একদিন আসিবে যেদিন তোমার সব টাকা সব ক্ষমতার অবসান হইবে। সর্ব শক্তিমানের দরবারে দণ্ডায়মান হইয়া তুমি যে আল্লাহর প্রতিনিধিকে, আল্লাহর দাসকে শয়তানের দাস, পশুর দাস করিয়া রাখিতেছ এর জবাবদিহি করিতে হইবে। (বৃটিশ শাসনের বিষফল)

- আমি তরীকত ও তাসাউফকে মানিয়াছি। কিন্তু শরীয়তের অর্থাৎ কুরআন হাদীসের খেলাফ কোন তরীকতকে আমি মানি নাই। তরীকত অর্থাৎ শরীয়তের আভ্যন্তরীন ও আধ্যাত্মিক দিক এবং আল্লাহর সঙ্গে প্রেম করা কিন্তু সীমার ভিতরে থাকিয়া। (অসিয়ত নামা)

- আমি তাকলীদও মানিয়াছি, ইজতেহাদও মানিয়াছি। তাকলীদ মানিয়াছি কিন্তু অন্ধ বিশ্বাস মানি নাই। তাহকীক করিয়া যাহাকে আল্লাহ ও রাসূলের জ্ঞানে, প্রেমে, বুদ্ধিতে এবং এত্তেবা ও এনাবাতে উপযুক্ত পাইয়াছি তাহার তাকলীদ মানিয়াছি। এবং এজতেহাদকে কিয়ামত পর্যন্ত জারী-জীবন্ত মানিয়াছি। কিন্তু শর্ত এই যে, ইজমায়ে-লাহেক, ইজমায়ে-সাবেকের খেলাফ

www.pathagar.com

না হয়। দলিল, যে আয়াতের দ্বারা ইজমা সাবেত হয় সেই আয়াতই। (অসিয়ত নামা)

চারি ইমামের ফেকাহ এবং চারি তরিকার তাসাওফ কুরআন, হাদীসেরই শাখা ও ব্যাখ্যা এবং চারি ইমামের ফেকাহর মধ্যে এবং চারি তরিকার তাসাউফের মধ্যে কোন বিরুদ্ধ কথা বা বিরোধের কথা নাই।

(শত্রু থেকে হুঁশিয়ার থাক)

পরম পরিতাপের বিষয়! দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে এখনও কুরআনের ভাষাকে বাধ্যতামূলক, শিক্ষণীয় বিষয় করা হইতেছে না। ইহাও আমাদের কর্তৃপক্ষের দুর্বলতা খৃষ্টান শক্তির নিকট তাহাদের ভিক্ষাবৃত্তির পরিণাম ফল। (আল্লাহর প্রেরিত ইঞ্জিল কোথায়)

শয়তানের আত্মা মানুষের বুদ্ধি-বিবেককে বিকৃত ও বিভ্রান্ত করে, সে মানুষকে ঠকাইতে পারিলে, মানুষের ক্ষতি করিতে পারিলে মানুষের রক্ত শোযন করিতে পরিলে অহঙ্কারে আত্মম্ভরিতায় মত্ত হইতে পরিলে সে আনন্দ পায়। এই জন্যই দেখিবেন, এক শ্রেণীর মানুষ তাদের বুদ্ধিমত্তার দ্বারা মানুষকে ঠকাইতে পারিলে, গরীব-দরদীদের ধোঁকা দিয়া গরীবের রক্ত শোযণ করিয়া বড় মানযেতি করিতে পারিলে তাতেই আনন্দ অনুভব করে। (বৃটিশ শাসনের বিষফল)

আমাদের জাতীয় চরিত্র ছিল সর্বপ্রকার আমানতের পুরাপুরি হেফাযত করা। কিন্তু আমরা কেনাবেচার মধ্যে মাপে ওজনে কম দেওয়া শিখিয়াছি, আমানতের খেয়ানত করা শিখিয়াছি ব্যাপকভাবে। আমরা ফাঁক পাইলে আর কাউকে ঠকাইতে, ফাঁকি দিতে ইতস্ততা করি না। দায়িত্ব পালনের খেয়াল করি না। অফিসের কাজে ফাঁকি দিয়া মাইনা পুরা নেই। পাবলিকের কাজ করিয়া দেওয়ার জন্য সরকারের থেকে বেতন নেই, তা সত্ত্বেও পাবলিকের কাজের সময় তাদের থেকে উপরি চাই বা খোশামোদ চাই বা অন্ততঃ তাদের একটু হয়রানি না করিয়া তার কাজ করিয়া দেই না। এই সব দুর্নীতি আমাদের সমাজে ব্যাপকভাবে প্রবেশ করিয়াছে। (চরিত্র গঠন)

ভিক্ষা আর চান্দা এক নহে। ভিক্ষা হয় নিজের পেটের জন্য আর চান্দা হয় সমাজের সেবা ও কওমের খেদমতের জন্য। যার উপার্জন করার যোগ্য স্বাস্থ্য শক্তি আছে, তার ভিক্ষা করা হারাম। প্রবাদ আছে "ভিক্ষুক দুয়ারে আসিলে দিও কিঞ্চিত, না কর বঞ্চিত।" (চরিত্র গঠন)

www.pathagar.com

- নিজ হাতে কৃষি কাজ করাতে, গরু পালাতে, গরুর গোবর নিজ হাতে ফেলিয়া দিয়া গরুকে আরাম দেওয়াতে, ধানের চাউলের, পাটের বোঝা বহন করাতে বা নিজ হাতে কাপড় বোনাতে, মিস্ত্রির কাজ, কর্মকারের কাজ, মিষ্টি তৈয়ার করার কাজ, ঘি-মাখন তৈয়ার করার কাজ নিজহাতে করাতে! মালের বোঝা বহন করে হাটে বাজারে বিক্রয় করাতে আদৌ কোন অপমান নাই। (চরিত্র গঠন)

- কাজে লজ্জা নাই, অপমান নাই। লজ্জা এবং অপমান অন্যের কাছে নিজের জন্য ছওয়াল করাতে এবং অন্যের জিনিস না বলে চুরি করে লওয়াতে অথবা মিথ্যা , ধোকা বা অসদ্ব্যবহার করাতে। (চরিত্র গঠন)

- সমাজ গঠিত হয় ব্যক্তির দ্বারা। সমাজের ব্যক্তিগুলি যদি ভাল হয় দায়িত্বজ্ঞানশীল, দায়িত্বপালনকারী হয় তবে সমাজও হয় দায়িত্বজ্ঞানশীল ও দায়িত্বপালনকারী। সমাজ দ্বারাই গঠিত হয় রাষ্ট্র। সমাজ ভাল হইলে, দায়িত্বশীল হইলে, রাষ্ট্রও হয় দায়িত্বশীল। (মসজিদ)

- সমাজ-সৌধের ভিত্তি হইতেছে মাতৃজাতি। ভিত্তির স্থান মানুষের চোখের আড়ালে-মাটির তলে। একটি সৌধের ভিত্তির ইটগুলি যদি সৌধের তলের থেকে বাহির হইয়া আসিয়া নিজের রূপ দেখাইবার জন্য এদিক ওদিক নড়াচড়া ঘোরাফেরা করে তাহ'লে যেমন সৌধটি আর খাড়া থাকিতে পারেনা, ধ্বংস হইয়া যায় এবং সে সৌধ আর মানুষের দেহকে রোদ, বৃষ্টি ও ঠান্ডা বাতাস হইতে, মানুষের ধনরত্নকে চোর ডাকাত হইতে এবং মানুষের মান ইজ্জতকে গুন্ডা সন্ডার নজর হইতে রক্ষা করিতে পারেনা, ঠিক তদ্রুপ মাতৃজাতি যদি সমাজের গোড়ার থেকে (বাড়ীর ভিতর থেকে) বাহির হইয়া আসিয়া সমাজের আগায় ও মাথায় চড়িয়া হাট-বাজারে, পথে-ঘাটে, কাচারী-দরবারে ঘুরাফেরা করিয়া নিজের রূপ দেখান শুরু করে, তবে সে সমাজও ধ্বংস হইয়া যাইবে এবং মানুষের উন্নতির কোন কাজেই আসিবে না। (মাতৃজাতির মর্যাদা)

- যে মুসলিম শিক্ষক চরিত্রবান নন, ইসলামের আদর্শের প্রতি উদাসীন ও শিক্ষকতাকে ব্রত হিসাবে গ্রহন করেন নাই তাহাকে নিযুক্ত করা যাইবে না। হিন্দু শিক্ষককে তাহার নিজ ধর্মের প্রতি নিষ্ঠাবান থাকা দরকার। (জামায়াতি জিন্দেগী)

- আল্লাহর রাসূলকে সত্য নিস্পাপ এবং তাহার আদর্শকে নিখুঁত নির্মল বিশ্বাস করিবে এবং এ কথা বিশ্বাস করিবে যে, আল্লাহর প্রেরিত রাসূলের আদর্শ

www.pathagar.com

ছাড়া অন্য কোন মানুষের আদর্শে মানুষের মুক্তি বা কল্যাণ হইতে পারে না। (নামাজের অর্থ)

- আত্মিক পবিত্রতা এই যে, আত্মার ভিতর ধ্যানে জ্ঞানে এক আল্লাহকেই স্থান দিতে হইবে। আল্লাহর বিরুদ্ধে অন্য কোন মতবাদের জ্ঞানের বা অন্য কাহারও ধ্যানের স্থান আত্মার ভিতর দেওয়া যাইবে না। এতদ্ব্যতীত কাম, ক্রোধ, লোভ, অহঙ্কার, হিংসা-বিদ্বেষ হইতে আত্মাকে পবিত্র রাখিতে হইবে। (নামাজের অর্থ)
- বাহ্যিক পবিত্রতা এই যে, মানুষের বাক্যের মূল্য আছে, মিথ্যা, পরনিন্দা, ওয়াদা খেলাফি, অঙ্গীকার ভঙ্গ, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ, মিথ্যা দোষারোপ, ঠাট্টা-বিদ্রূপ, টিটকারী, গালি ইত্যাদি হইতে বাহ্যিক পবিত্রতা রাখিতে হইবে। (নামাজের অর্থ)
- বুদ্ধির পবিত্রতা এই যে, বুদ্ধি-বিবেকই মানুষের সর্ব প্রধান সম্বল। এই বুদ্ধিকে বক্রগতি হইতে, কু-চিন্তা হইতে, পরের ক্ষতির চিন্তা হইতে, সঙ্কীর্ণতা ও সংস্কার হইতে, হীন স্বার্থ চিন্তা হইতে মুক্ত করিয়া আল্লাহর চিন্তায় এবং মানব জাতির ও নিজের খাঁটি কল্যাণ চিন্তায় নিয়োগ করিতে হইবে। (নামাজের অর্থ)
- উভয় পার্শ্বে সালাম ফিরানোর পর নামাযের মধ্যের ভুলত্রুটি, অমনোযোগিতা এবং দেলকে পূর্ণ হাজির এবং পূর্ণ ভক্তিপূর্ণ না রাখার অন্যায়ের জন্য আল্লাহর নিকট তিনবার ক্ষমা প্রার্থনা করিবে।

  (নামাজের অর্থ)
- যৌবন কালে যখন কাম রিপুর উত্তেজনায় কু-দৃষ্টি, কু-চিন্তা বা কু-কর্ম করতে মন চায় তখন মনকে দমন করে রাখা এবং চরিত্রকে পবিত্র রাখা সৎ কাজ। (নামাজের অর্থ)
- কু-সংসর্গ, কু-পরিবেশ, কু-সাহিত্য বা কুশিক্ষা দোষে যদি আল্লাহ-রাসূলকে বা বেহেশত-দোযখকে বা আল্লাহর ধর্মের শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও ধর্মের প্রচারককে অবজ্ঞা করতে মন চায় তখন মনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা সৎ কাজ। (নামাজের অর্থ)
- চরম ধৃষ্টতা দেখান হইতেছে, যে রাষ্ট্রের অর্থনীতি এত ইসলাম বিরোধী, যে রাষ্ট্রের সমাজ ব্যবস্থা এত ইসলাম বিরোধী, জাতি ধ্বংসকারী নাচ, গান বিচিত্রানুষ্ঠান, মদ, জুয়া, যে রাষ্ট্রের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকিয়া গিয়াছে, সরকারী কোন অনুষ্ঠানই এছাড়া চলে না । যে রাষ্ট্রে মূর্তিপূজার নূতন আমদানী করা

www.pathagar.com

হইয়াছে, সে রাষ্ট্রকে ইসলামী রাষ্ট্র বলার চেয়ে ডাহা মিথ্যা এবং চরম ধৃষ্টতা যে কি হইতে পারে তাহা যে কোন কোরআন হাদীস অভিজ্ঞ লোকের নিকট আশ্চর্যের বিষয়। আমার ভয় হয় এমন ধৃষ্টতাকারী মিথ্যাচারীদের দেলের উপর গজবের ও লা'নতের মোহর না মারিয়া দেওয়া হয়। (অসৎ আলেম ও পীর ও সতর্কবানী)

- যিনি নেতা হইবেন তাহার উপরস্থের হক এবং সর্বোপরি আল্লাহর হক যাহা তাহার উপর ফরজ (যেমন- নামায, রোযা, যাকাত, হজ্ব ইত্যাদি) তাহা তাহার রীতিমত আদায় করা দরকার। কারণ তিনি যাহার অধীন তাহার হক তিনি আদায় করিলে তাহার অধীনস্থ লোকেরাও তাহার হক আদায় করিবেন। এই উপায়ে সহজে সুশৃঙ্খলা এবং কামিয়াবি লাভ হইবে। (জেহাদের ফযীলত)

- আমি যেহেতু প্রথমে ইংরেজী শিক্ষিত হইয়া পরে কোরআন হাদীসের উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়াছি এই জন্য সাধারণ শিক্ষার ত্রুটি আমি রন্ধ্রে রন্ধ্রে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি। সে জন্যই আমার প্রাণের একান্ত বাসনা এই যে, বাংলার মুসলিম সমাজ বিশেষতঃ সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত ও প্রতিভাবান ব্যক্তিবৃন্দ পরাধীনতার হীনমন্যতা ও হেয়তাবোধ দূর করিয়া ইসলামের সুশিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া আত্মচেতনা বোধ ও জাতীয় গৌরব বোধ সম্পন্ন হোক। (খাদেমুল ইসলাম জামায়াতের পরিচয় ও কার্যাবলী)

- একজন বস্ত্রশিল্পী বা বস্ত্র ধৌতকারীর একটি ছেলেকে বা মেয়েকে, যদি নূরজাহানের ন্যায় একজন রাজমহিষী বা জাহাঙ্গীরের ন্যায় একজন সম্রাটও বধ করেন তবে উক্ত রাজমহিষীর বা সম্রাটের শাস্তির জন্য ইসলামী শরীয়তে শিরচ্ছেদের ব্যবস্থাও রহিয়াছে। ইসলাম ধর্মের বিধান এইরূপ পক্ষপাত শূন্য এবং এইরূপ মনোমুগ্ধকর। (পতিত পাবন)

- আমি, "তাফ্রিক বাইনাল মু'মিনীন" অর্থাৎ মোমেনদের এত্তেহাদ একতা ভঙ্গকরণকে এত বড় হারাম এবং "বিফাক বাইনাল মু'মিনীন" অর্থাৎ মোমেনদের মধ্যের জোড়-মিল মহব্বত রক্ষা করণকে এত বড় মনে করিয়াছি যে, মাশায়েখদের মাছালেক, আছাতেজাদের তাকরীর এমনকি ইমামগণের মাজাহেবকেও আমি এর চেয়ে অনেক নীচে মনে করি। কিন্তু কুরআন হাদীসের খেলাফকে কিছুতেই কোন মূল্যেই বরদাশ্‌ত করিতে পারি না। দুইটি মাজহাব বা দুইজন ইমাম হইলে তাঁহাদের পরস্পর বিরোধিতা করিতেই হইবে, ইহার ক্বায়েল (কথক) আমি নই; এইরূপে দুইজন আলেম

www.pathagar.com

বা দুইজন পীর হইলেই তাঁহাদের পরস্পর বিরুদ্ধবাদী দুইটি দল করিতেই হইবে ইহারও পক্ষপাতী আমি নই।

ইমামগণ, আল্লাহ ও রাসূলের বাণী উদ্ধার করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন তাতে হয়ত কেউ কত দূর, কেউ কত দূর পৌঁছিয়াছেন- সকলেরই মকছুদ একই কিন্তু কেউ ইচ্ছা করিয়া কাহারও বিরোধিতা বা উম্মতের ফেরকাবন্ধী তাঁহারা করিয়া যান নাই বা তাঁহারা প্রেরণা বা অনুমতি দিয়া যান নাই। এইরূপে, যত পীর এবং যত আলেম আছেন, সকলেরই একই মকছুদ হওয়া উচিৎ যে, আমরা কেহই আমার বান্দা বা আমার উম্মত বানাইতেছি না বা আমার একটি বিরোধী দল সাজাইতেছি না। সকলেরই একই মকছুদ যে, মানুষ এক আল্লাহর বান্দা, এক নবীর উম্মত হউক, সব মোমেন-মোসলমান ভাই ভাই হউক। অবশ্যি যাহারা আল্লাহকে, আল্লাহর রাসূলকে, আল্লাহর কুরআন, রাসূলের হাদীস না মানে, সকলে একতাবদ্ধ হইয়া তাহাদের বিরুদ্ধাচারণ করিতে হইবে এবং সেই বিরুদ্ধাচারণও হবে হকের জয়ের জন্য, সত্য ও ন্যায় ধর্মের জয়ের জন্য- নিজের স্বার্থ বা মানুষের নিপীড়ণের জন্য নয়। সুতরাং মানুষের মধ্যে যে যুদ্ধংদেহী বা বিরোধিতার জযবা আছে তাহা ইসলাম বিরোধীদের মোকাবেলায় খরচ হইবে- ইসলাম ভক্তদের মোকাবেলায় নয় এবং ঐ শক্তিও খর্ব হইয়া যাইবে না।

পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদী খৃষ্টান শক্তিবর্গ সুচিন্তিত পরিকল্পনার মাধ্যমে সুপরিকল্পিত পদ্ধতিতে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে মুসলিম জাতিকে তাদের সর্বশক্তির মূল উৎস আল্লাহ প্রেরিত অপরিবর্তিত ও অপরিবর্তনীয় পবিত্র মহাগ্রন্থ আল কোরআনুল আযীমের শিক্ষা হতে আস্তে আস্তে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। এমন কি তাদের শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবী সমাজ কোরআনের শিক্ষা হতে দূরে সরে গিয়ে অজ্ঞতার এক সূচীভেদ্য অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়েছে। (শত্রু থেকে হুশিয়ার থাক)

আসুন মুসলমান ভাইগণ, জেহাদের জন্য প্রস্তুত হইয়া যাই। এ জীবন চিরস্থায়ী নয়। "জন্মিলে এ ভবে, মরিতেই হইবে, তবে কেন পাপ করি ?" (জেহাদের আহ্বান)

মানুষের ঈমান-রত্ন, ধর্ম-মাণিক্য হরণ করিয়া নেওয়া, মিথ্যা কথা ধর্মের নামে চালু করিয়া দেওয়া, অবোধ শিশুদের ফাঁকি দিয়া তাহাদের দ্বারা মূর্তির

www.pathagar.com

সেবা করান, শুকরের ঘৃনিত অপবিত্রতার ঘৃনা তাহাদের অন্তর হইতে দূর করা ইহাই কি মানবতার সেবা ? (পাদ্রীদের গুমর ফাঁক)

- দ্বীন ইসলাম শুধু ভাষা শব্দ এবং তাহার অর্থ শিক্ষার নাম নহে; বরং কোরআন হাদীসের ভাষার অর্থগুলিকে ভিতরে বাহিরে কাজে পরিণত করার নাম। কাজেই যেমন ওস্তাদের দরকার তেমনই পীরেরও দরকার। (পীরের পরিচয় ও মুরীদের কর্তব্য)

- মানুষের মনের মধ্যে, প্রবৃত্তির মধ্যে নূতন নূতন যুগে নূতন নূতন চাহিদা দেখা দিবে। মানুষ যদি তাহার মন-মস্তিস্ক ও বিবেককে আল্লাহর ওহীর রসাল মাটিতে বিলীন করিয়া দিয়া সেই রঙে রঙ্গীন, সেই রসে রসাল, সেই স্বাদে স্বাদযুক্ত না হয়, তবে নিশ্চয়ই তাকে তিত্ করল্লার তিক্ত রসে, তিক্ত স্বাদে তাকে এমন ভাবে ভরিয়া দিবে যে, শেষে আর তার কাছে তিতা তিতা থাকিবে না, এমনকি তিতা আর মিঠার মধ্যেকার ভেদ জ্ঞানও সে হয়ত হারাইয়া ফেলিবে। (বেদআত ও এজতেহাদ)

- নূতন নূতন যামানায় নিত্য নূতন সমস্যার নিত্য-নূতন সমাধান নিশ্চয়ই কোরআন হইতে বাহির করিতে হইবে, কিন্তু দেখার, চিন্তা করার ও বুঝার বিষয় এইটা যে, সেই নূতন সমাধান অপব্যাখ্যা হইবে? না সদ ব্যাখ্যা হইবে? আগাছা, পরগাছা হইবে? না মূল গাছের ডাল-পালা ও শাখা-প্রশাখা হইবে? সুসন্তান হইবে না জারজ সন্তান হইবে?

  (বেদআত ও এজতেহাদ)

- মওদুদী সাহেবের কেতাবের এবারতের উদ্ধৃতি সংক্ষেপ করার এবং ছাট করিয়া সত্যকে গোপন করার অভ্যাস নূতন নয় এবং তিনি যে কথার মাঝখানে উল্টাপাল্টা প্রশ্ন করিয়া আপন মতলব হাছেল করিতে নেহায়েত উস্তাদ তাহা চিন্তাশীল দূরদর্শী ব্যক্তি মাত্রই অবগত আছেন।

  (ভুল সংশোধন)

- মওদুদী সাহেবের মত বুদ্ধিমান লোকের যদি ছিদ্রান্বেষণ করাই একমাত্র উদ্দেশ্য না হইত তবে সোজা সরল মামুলী কথাকে চক্রবক্র করিয়া পবিত্রাত্মা মহাত্মা ছাহাবায়ে কেরামের প্রতি দোষারোপ করিতে তিনি কিছুতেই সাহস পাইতেন না। আমাদের দুঃখ শুধু এই জন্যই না যে, মওদুদী সাহেব কেবল ভুলই করিয়াছেন বরং সবচেয়ে বেশী দুঃখ এই জন্য যে, আরও আরও মহাত্মাগণ যেখানে যে মাযহাবের যে মতের অনুসারী সেইখানে হযরত মোয়াবিয়া সেই মাজহাব অনুসরণ করিয়া কি অপরাধটা

www.pathagar.com

করিলেন? যাহা আলোচনায় আসার কোন প্রয়োজনই ছিল না, তাহা সত্ত্বেও এমন পবিত্রাত্মা মহাত্মার দোষ অন্বেষণ করিতে তাহাকে কে উৎসাহিত করিল তাহা তিনিই ভাল জানেন। (ভুল সংশোধন)

যে সম্প্রদায়ের মধ্যে জেহাদের জযবা ও প্রেরণা নাই সে সম্প্রদায় মোর্দা। দুনিয়ার উপর থাকার তাদের অধিকার নাই। (জামায়াতি জিন্দেগী)

ইংরেজ কাফেরগণ, ইসলাম ও মুসলিম জাতির যত ক্ষতি করিয়াছে এবং করিতেছে তন্মধ্যে সবচেয়ে বড় এবং বুনিয়াদী ক্ষতি এই করিয়াছে যে, তারা 'ধর্মহীন শিক্ষার ধারা' আমাদের দ্বারা গ্রহণ করাইতে পারিয়াছে। ইংরেজ কাফের বলতে আমি আমেরিকা, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, রাশিয়া- সব নাছারা ধর্মহীন এবং ধর্মদ্রোহীদেরে বুঝাইতেছি। কারণ শিক্ষার দ্বারাই মানুষের মন-মস্তিষ্ক তৈরী হয় এবং মানুষের যাবতীয় কার্যকলাপ মন-মস্তিষ্কেরই অনুসারী হয়। ধর্মহীনতার পরিণাম ধর্মদ্রোহীতা। সুতরাং ধর্মহীন শিক্ষা জারী করিয়া বিরাট বিরাট সংখ্যক মুসলিম সন্তানকে বিনা রক্তপাতে তারা শুধু ইসলামহীন, ধর্মহীন করে নাই, ইসলামদ্রোহী, ধর্মদ্রোহী করিয়া লইয়া গিয়াছে। বহু সংখ্যক মুসলিম সন্তানের মন মস্তিষ্ক আজ তাদেরই রঙ্গে রঙ্গীন হইয়া নিজস্ব সত্তা ভুলিয়া গিয়া Inferiority complex এর শিকার হইয়া তাদেরই বুলি বলিতেছে। এই সর্বনাশা রোগের প্রতিকার Direct attact এর দ্বারা অসম্ভব বলিয়া আমি এর পক্ষপাতি নই। তাছাড়া অন্য কোন শিক্ষা ধারার পক্ষপাতী নই। পুরান জামানার একটি শখ্‌ছিয়াতকে হাকীকত মনে করিতেছে। দরছে নেজামীর হাকীকত এই যে, শুধু 'মা'কুলাত' অর্থাৎ যুক্তি ও তর্কশাস্ত্র বা জ্ঞান-বিজ্ঞান বা শুধু 'মানকুলাত' অর্থাৎ কুরআন হাদীস পড়ান উচিৎ নয় বরং মানকুলাত এবং মা'কুলাত একত্রে পড়ান উচিৎ। কারণ "মানকুলাতের উদ্দেশ্য, আল্লাহ্ যা বলিয়াছেন এবং রাসূল যা বলিয়া, করিয়া দেখাইয়া দিয়া গিয়াছেন সেইটাকে ভালমত বুঝিয়া বিশ্বাস ও ভক্তি সহকারে শক্ত করিয়া আঁকড়াইয়া থাকিতে হইবে, মা'কুলাতের অর্থ- এমন সব বিদ্যা পড়িতে, পড়াইতে হইবে, যদ্বারা মানুষের আকল বাড়ে, নতুন নতুন আবিষ্কার করিতে পারে। মানকুলাত, স্থিতিশীল এবং সত্য ভক্তি ও অটল বিশ্বাস ভিত্তিক।

মা'কুলাত প্রগতিশীল এবং যুক্তিভিত্তিক। সত্য-ভক্তি, অটল বিশ্বাস ব্যতিরেকে যেমন, শুধু যুক্তিতে কোন একটি কাজও সাধিত হয় না বরং শুধু যুক্তি অনেক সময় মানুষকে বিপথে লইয়া যায়, তদ্রুপ, যুক্তি না থাকিলেও মানুষ অনেক সময় অন্ধ বিশ্বাসে এবং অসত্য ভক্তিতে পতিত হইয়া

www.pathagar.com

গোমরাহ হয়। কাজেই যুক্তি এবং ভক্তি মানকুলাত ও মা'কুলাত একত্রেই দরকার। অবশ্য লক্ষ্য রাখিতে হইবে, মানকুলতের অর্থ- আল্লাহর কুরআন, রাসূলের হাদীসের সরাসরি অর্থ এবং সূক্ষ্মতত্ত্বের বাইরে নয়। সূক্ষ্মতত্ত্বও যে সব আয়েম্মায়ে এজাম, ছুফিয়ায়ে কেরাম বাহির করিয়াছেন- যা তা মনগড়া বাজে গল্প বিশ্বাস করা যাইবে না, যাকে তাকে ভক্তি করা যাইবে না। মা'কুলাতের কোন সীমা নাই, যামানা যেমন বাড়িতে থাকিবে, মা'কুলাতও তেমন বাড়িতে থাকিবে- যদ্বারা আকল বাড়ে।

তারিখ, ইতিহাস, জিওগ্রাফি, অংক, জ্যামিতি এ্যালজ্যাবরা, বৃক্ষ-বিজ্ঞান, পশু-বিজ্ঞান, শাসন পদ্ধতি, বিচার পদ্ধতি, রাজনৈতিক বিজ্ঞান, অর্থনৈতিক বিজ্ঞান, সমাজনৈতিক বিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ব বিজ্ঞান, আরও না জানি কত বিজ্ঞান আবিষ্কার হয়- এইসব দ্বারাই আকল বাড়ে। যার দ্বারা যতটা সম্ভব শিক্ষা করা দরকার এবং এইসব বিজ্ঞান যেন আল্লাহর মারেফাত বাড়ায়, আল্লাহর সৃষ্টি রহস্যের দ্বার উদঘাটন করে এবং আল্লাহরই অধীনতা স্বীকার করায়, সমস্ত বিজ্ঞানের মুখ সেই দিকেই ফিরাইতে হইবে। খোদামুখী বিজ্ঞানই বিজ্ঞান। নাস্তিকতার বিজ্ঞান, বিজ্ঞান নয়, ধৃষ্টতা ও অন্ধতা বৈ আর কিছুই নয়। কাজেই হাদীস ও কুরআনের আলোর দ্বারা সমস্ত মা'কুলাতকে- যুক্তিতর্কশাস্ত্র, সাধারণ বিজ্ঞানকে আলোকিত করিতে হইবে এবং হাল ধরিয়া রাখিতে হইবে। কাজেই দরছে নেজামীই একমাত্র ঔষধ।

আমি প্রত্যেক মুসলমান ভাইকে, বিশেষ করে যাহারা আমার মাধ্যমে আল্লাহর দ্বীনকে, নবীর তরীকাকে পেয়ে আল্লাহর মুরীদ হয়ে আল্লাহকে পেতে চেয়েছে তাদের আমি অছিয়ত করতেছি- ছেলে-মেয়ে আল্লাহর আমানত। এই আমানতে খেয়ানত করবেন না। ছেলে-মেয়ে হলে প্রথমতঃ ডাইন কানে আজান বাম কানে একামত বলিবেন। তারপর কোন বুযুর্গ আলেমের দ্বারা 'তাহনীক' করাইবেন অর্থাৎ কিছু খোরমা তাঁহার দ্বারা চিবাইয়া তাহার লালা বিসমিল্লাহি বরকত বলিয়া ছেলের মুখে দিবেন।

তারপর জন্মের সপ্তম দিবসে কোন বুযুর্গ আলেমের দ্বারা ভাল নাম রাখিবেন এবং আক্বীকা করিবেন। তারপর স্নেহের সহিত, মমতা ও ভালবাসার সহিত ছেলে লালন-পালন করিবেন। ছেলের স্বাস্থ্যের দিকে এবং চরিত্রের দিকে খুব দৃষ্টি রাখিবেন। ছেলেকে ভালবাসাও একটি নেকী মনে করিবেন। তারপর যখন ছেলে-মেয়েরা কথা বলতে শেখে তখন আল্লাহ, আল্লাহ, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আউজুবিল্লাহ, বিছমিল্লাহ ইত্যাদি মা, নানী, বাপ, ভাই, দাদা-দাদী সবাই তাদেরকে শুনাইয়া শুনাইয়া বার বার যিকির করিবে

www.pathagar.com

তাতেই ছেলে-মেয়েরা বলা শিখিবে এবং তাহাদের মনে গাথিয়া যাইবে। তারপর ছেলে মেয়ে যখন পাঁচ বৎসরের হয় তখন কোন বুযুর্গ আলেমের কাছে দিয়া আলিফ, বা, তা, ছা পড়া ও লেখা শিখাইবে। এই সময় ছেলে মেয়ের খুশীর জন্য এবং দোয়া পাওয়ার জন্য তাওফীক মোতাবেক কিছু মিষ্টি মুখ করিয়া দিবে। পরে কোন নেক চরিত্র মেহেরবান ওস্তাদের কাছে পড়িতে দিবে। ভোর বেলায় ঘুম থেকে উঠে অবশ্য অবশ্য কায়দা, ছেপারা, কুরআন শরীফ লইয়া এক দেড় ঘন্টা মসজিদে-মক্তবে পড়িতে যাইবে। যদি স্কুলে পড়ে তবুও অবশ্য অবশ্য সকালে ফজরবাদ এক দেড় ঘন্টা মসজিদের মক্তবে পড়িবে নিশ্চয়ই। এইরূপে শুদ্ধ করিয়া কুরআন শরীফ পুরা পড়িবে, ওদিকে প্রাইমারী স্কুলে বাংলা, অংক শিখিবে।

কিন্তু খবরদার! যে স্কুলের মাষ্টারদের চরিত্র ভাল নয়, নামায রোজা নাই, নাচ-গান-বাদ্য, থিয়েটার হয় সেই স্কুলে হরগেজ হরগেজ ছেলে-মেয়ে দিবেন না। মেয়ে ৮/৯ বৎসরের হইয়া গেলে আর স্কুলে যাইতে দিবেন না বা কোন যুবক পুরুষের কাছেও পড়িতে যাইতে দিবেন না। আর যদি ছেলেকে হাফেজ বানাইবার ইচ্ছা থাকে, তবে ভাল ওস্তাদের কাছে দিবেন। হাফেজ হওয়ার পর প্রাইমারী বাংলা পড়াইবেন। এইরূপে কুরআন শরীফ পুরা বিশুদ্ধরূপে পড়া হইয়া গেলে এবং প্রাইমারী শেষ হইলে পরে যদি পুরা দরছে-নেজামী না পড়াইতে পারেন তবে অন্ততঃ এই কিতাবগুলো অবশ্য অবশ্য কোন ভাল ওস্তাদের কাছে পড়াইবেন, দরছে নেজামী পড়াইলে তবুও এই কিতাবগুলো আগে অবশ্য অবশ্য কোন ভাল ওস্তাদ দিয়া পড়াইয়া দিবেন। কুরআন শরীফের পর লাহোর আঞ্জুমানে হেমায়েতে ইসলামকৃত উর্দূ পহেলী, দুসরী, তিসরী ও চৌথী তারপর পূর্ণ বেহেশতী জেওর, অন্ততঃ রাহে নাজাত, মেফ্‌তাহুল জান্নাত।

যাহারা উর্দূ না পড়িতে পারে অন্ততঃ বাংলা বেহেশ্‌তী জেওর, তালিমুদ্দিন, হায়াতুল মুসলিমীন, এলেমের ফযিলত, নামাযের ফযিলত, জেকেরের ফযিলত, কছদুচ্ছাবিল পড়িবেন ও পড়াইবেন। তারপর ফার্সী পহেলী, কারিমা, লাতায়েফে ফার্সী, পান্দেনামা-আত্তার, গুলেস্তাঁ, বোস্তা, অবশ্য অবশ্য কোন ভাল ওস্তাদ দিয়া পড়াইবেন। তারপর আরবী আদবের কিতাব- রওজাতুল আদব, মুফিদুত্তালিবীন, কসাসুন্নাবিয়্যিন, ঝা-দূত্ত-লিবীন, কালয়্যুবী; নাফহাতুলয়্যমান, ছরফের কিতাব- ইলমুছ ছরফ ১ম, ২য়, ৩য়; নাহোর কিতাব- নাহোমীর, হেদায়েতুন্নাহো, মোস্তাদ্‌রাক ইত্যাদি পুরা পড়াইয়া, ফিকহুস্‌সুনান, বুলুগুলমারামা, মাশারিকুল আনওয়ার, রিয়াজুচ্ছালিহীন অথবা মেশকাত শরীফের সাদা তরজমা 'তরকিব' ও

www.pathagar.com

সরলার্থ সহ এবং কুরআন শরীফের সাদা তরজমা তরকীব ও সরলার্থ সহ পড়াইয়া দিবে। তারপর ছেলে যেদিকে যাইতে পারে, এই পর্যন্ত হইলে আশা করা যায় যে, ইনশাআল্লাহ ঈমানের হেফাজতের ছামান হইয়া গেল।

কেহ কেহ ধোকা দিতে পারে যে, এই পর্যন্ত ছেলে কেমনে শিখিবে? কিন্তু আমি বহু অভিজ্ঞতার পর বলিতেছি যে, এই পর্যন্ত এতটুকু পড়া কোন ছেলের পক্ষেই কঠিন হইবে না। এই সঙ্গে হাতের কাজ বাংলা, অংক শিখাইতে হইবে। তারপর যদি ছেলে স্কুল-কলেজের আগুনের মধ্যে ঝাপ দেয়ও তবুও আশা করা যায় যে, সে আগুনে তাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। কিন্তু খবরদার! খবরদার! মেয়ে কস্মিনকালেও স্কুল-কলেজে দিবে না। সহ-শিক্ষার স্কুল-কলেজ মেয়েদের জন্য জঘন্য ও বদ্‌তর।

- একদিকে যাদের পেটে ভাত নাই, ছিনায় কোরআনের শিক্ষা নাই; এই ধরনের লক্ষ লক্ষ মুসলমানকে খৃষ্টান মিশনারীরা সেবা, শিক্ষা ও সাহায্যের নামে ধোকা দিয়া বিভিন্ন প্রলোভনে প্রলুব্ধ করিয়া ঈমান হারা করিয়া খৃষ্টান বানাইয়া নিতেছে। অপরাধীকে পীর নামধারী সমাজে কেলেঙ্কারী সৃষ্টিকারী ভন্ড তপস্বীদের ধোকার ফাঁদে পড়িয়া বহু সরল প্রাণ মুসলমান দ্বীন ঈমান হারাইয়া ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত হইতেছে। (সঞ্জীবনী অমর বাণী)

- আমি আমার ওলামা এবং পীর বোজর্গ ভাইদের করজোড়ে অনুরোধ জানাই, তাহারা খাঁটি হউন, অন্ততঃ কোরআনের ভাষায় আদ্যোপান্ত তাহার মানে মতলব হৃদয়ঙ্গম করুন, অন্ততঃ একখানা হাদীসের কেতাব আসল আরবী ভাষায় আদ্যোপান্ত কোন ওস্তাদের কাছে পড়ুন। তারপর জন সাধারণকে আসল শরীয়তের দিকে, আসল তাছাওফ ও মারেফাত, ত'রিকত, হাকীকতের দিকে আকর্ষণ করুন ! খবরদার ! অস্থায়ী দুনিয়ার ক্ষনস্থায়ী কিছু টাকা পয়সা বা মান সম্মানের জন্য চিরস্থয়ী আখেরাতকে ভুলাইবেন না। (সঞ্জীবনী অমর বাণী)

- ঈমান অমূল্য রত্ন। প্রাণের সঙ্গে ইহাকে ভালবাস, প্রাণের উপর কষ্ট আসিতে দাও। তবুও ঈমানের গায়ে একটু চোট লাগিতে দিও না। স্মরণ রাখিও, ঈমান নষ্ট হইলে সব নষ্ট- ইহকাল পরকাল নষ্ট, ধন-ঐশ্বর্য নষ্ট, মান-সম্মান নষ্ট, কান্তি সৌন্দর্য নষ্ট, স্বাস্থ্য-সম্পদ নষ্ট, সবই নষ্ট। (ফরুউল ঈমান)

- আল্লাহ মানুষকে সর্ব শ্রেষ্ঠ জীব করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। নিজের ক্ষুধা এবং যৌন ক্ষুধা নিবারনের চেষ্টা মানুষও করে এবং অন্যান্য পশু-পক্ষী ইতর প্রাণীরাও করে। শুধু তাই নয় নিজের ছেলেমেয়েকে স্নেহও শুধু মানুষই করে

www.pathagar.com

না, অন্যান্য পশু-পক্ষী ও ইতর প্রাণীরাও করে। তবে কেন মানুষ শ্রেষ্ঠ ? মানুষের মধ্যে দুইটি গুণ বেশী আছে। যা কোন ইতর প্রাণীর মধ্যে নাই। এক, বিশ্বমানব কল্যাণ কামনা, দুই বিশ্ব প্রভু আল্লাহর আরাধনা। (জীবন্ত মসজিদ)

- কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাক যখন আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন, কি নিয়া আসছো ? আমি তখন এক হাতে আজিজুল হক আর এক হাতে হেদায়াতুল্লাহকে আল্লাহর সামনে পেশ করে দিব। (মোজাহেদে আজম)

- আফছোছ ! ধর্মহীন কর্ম শিক্ষা ও কর্মহীন ধর্ম শিক্ষা উভয়ই জাতিকে পঙ্গু করিয়া দিয়াছে। এই অভাব মোচনের জন্য বাংলা ভাষায় কোরআন ও হাদীসের জ্ঞান সমুদ্র মন্থন করিয়া উহার গভীরতম তলদেশ পর্যন্ত পৌঁছিয়া মণিমুক্তা কুড়াইয়া সংগ্রহ করিয়া লিখিয়া রাখিয়া গেলাম। তোমরা ইহা মানুষের হাতে পৌছাইয়া দিও, দিশাহারা মানুষের পরম উপকার হবে। (রাসায়েলে হক্কানী)

- আমি আমার গরীব জনসাধারণ ভাইদেরকে বলিতেছি, আল্লাহর ঘর আবাদ করুন। আল্লাহর ঘর বিরান করলে এককালে আপনার ঘরও বিরান হবে। আপনারা গরীব বলে হতাশ হবেন না; এক এক মুঠ করিয়া চাউল জমা করিয়া হইলেও আল্লাহর ঘর আবাদ করিবার নিয়তে মসজিদে পাঠাইয়া দিবেন, তারপর অন্য কাজ করাইবেন আগে কোরআন শরীফ না পড়াইয়া অন্য কোন কাজ করাইবেন না; খোদার ঘর বিরান করিবেন না, আল্লাহর আমানতের খেয়ানত করিবেন না। রাসূলের আমানতের খেয়ানত করিবেন না। (সঞ্জীবনী অমর বাণী)

- যে সমস্ত আলেম পলিটিকেল কোন জামাতেই দাখিল হইবেন না তাহারাও বেকার থাকিবেন না; তাহারা বরং এর চেয়েও বড় এবং অধিক প্রয়োজনীয় কাজে নিজেকে লিপ্ত রাখিবেন। সে বড় কাজ এবং অধিক প্রয়োজনীয় কাজ হচ্ছে সমগ্র মুসলিম সমাজকে এবং সমগ্র মানব সমাজকে জাগ্রত করিয়া আল্লাহর দিকে এবং আল্লাহর সত্য ধর্মের দিকে আহবান করা। (তাবলিগ বা ইসলাম প্রচার)

- যে সমস্ত আলেম দ্বীনের কোন নির্দিষ্ট খেদমতে লিপ্ত আছেন। যেমন- কেহ কেহ মোদাররেছি করেন বা কেহ তফছির করেন, কেতাব, ফৎওয়া লেখেন তাহারাও উঠাবসা চলাফেরার সময় লোকের সহিত সাক্ষাতের সময় আল্লাহর বান্দাদেরে আল্লাহর হুকুম আহকাম পৌছাইয়া দিতে যেন ত্রুটি বা

www.pathagar.com

আলস্য না করেন এবং অবসর সময়ে- যেমন শুক্রবারের ছুটির দিনে এবং অন্যান্য ছুটির সময়ে আল্লাহর বান্দাগণকে আল্লাহর হুকুম পৌঁছাইয়া দেওয়াকে যেন নিজ নিজ যিম্মায় ফরজ বলিয়া মনে করেন। (ইসলাম প্রচার)

- পানি বিনে যেমন প্রাণ বাঁচে না, তেমনই আল্লাহ্ তা'য়ালার যিক্‌র ভিন্ন মানব মনের খোরাক ও সঞ্জীবনী শক্তি আর কিছুতেই নাই।

(জীবন পাথেয়)

- প্রত্যেক মানুষেরই উচিৎ খাঁটি পীর নাকি রোজগারী ধোকাবাজ; তাহা ভালমত ভিতর বাহির পরীক্ষা করিয়া একজন পীর নির্দিষ্ট করিয়া তাহার প্রতি পূর্ণ আস্থা এবং ভক্তি স্থাপন করিয়া চিরস্থায়ী জীবনের অদেখা অচেনা পথের পাথেয় সংগ্রহ করা। (দুছরা ছবক)

- সব কাজের গোড়ায় অন্তরের অন্তঃস্থলে অচল অটলভাবে আমার এই বিশ্বাস রাখিতে হইবে যে, আমি আল্লাহর কাছ থেকেই আসিয়াছি এবং আবার ফিরিয়া আল্লাহর কাছেই যাইতে হইবে এবং সারাটি জীবনের হিসাব আল্লাহর কাছে পলে পলে তিলে তিলে দিতে হইবে। (প্রথম ছবক)

- ভিতরে তিতা বাহিরে মিঠা। সাক্ষাতে সদ্ভাব অসাক্ষাতে অসদ্ভাব-মোমেন বান্দার এইরূপ হওয়া চাইনা, ইহাকে বলে মোনাফেকি। মোমেন লোকের দেল খাঁটি ভিতর বাহির এক হওয়া চাই অবশ্য ভিতরে ভাল ভাব রাখিয়া কোন সৎ উদ্দেশ্য কিছু সময়ের জন্য বাহিরে কিছু অন্য রকম ভাব দেখান মোনাফেকি নহে। (দুছরা ছবক)

- আমি আমার সারা জীবন, আমার স্বাস্থ্য, আমার শক্তি, আমার সম্পত্তি, আমার যথাসর্বস্ব সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর আনুগত্যের ভিতর থাকিয়া খরচ করিব। আল্লাহর আনুগত্যের বাহিরে খরচ করিব না। এই অঙ্গিকার করিয়া যে মুসলমান জাতিভূক্ত হয় তাহাকে বলে মুসলমান। (প্রথম ছবক)

- কেউ আল্লাহর প্রেমে রসূলের এশ্‌কে আল্লাহর শরীয়তের, রসূলের সুন্নতের পায়রবী করে, যাহারা আল্লাহর আশেক, রাসূলের আশেক তাদের কোন কিছুরই ভয় নাই, কোন যুক্তিরই তাদের দরকার নাই- আল্লাহ-রসূলের এশ্‌ক ও ফরমাবরদারি না করাই তাদের দোযখের আগুনের তূল্য অসহনীয় ও কষ্টকর হয়। আয় আল্লাহ্ ! এই মর্তবা আমাকে এবং আমার ভাইদেরকে দান কর। (তাওবা নামা)

www.pathagar.com

কিন্তু বাছনি করিতে হইবে, খাঁটি অখাঁটি বাছনি না করিলে সব বরবাদ হইবে। মাদ্রাসা হউক, পীর হউক, ওয়ায়েজ হউক, জেহাদের জন্য অর্থাৎ হুকুমতে ইসলামীর চেষ্টার জন্য উদ্যোক্তা হউক, সবক্ষেত্রে তাদের গোপন জীবন, চৎরাধঃব খরভব পর্যবেক্ষণ করিয়া বাছনি করিয়া খাঁটিকে ভক্তি ও সাহায্য করিতে হইবে, অখাঁটি ও মিথ্যাকে, ধোকাবাজকে বর্জন, সামাজিক শাসনের দ্বারা হেয় করিতে হইবে, অখাঁটির প্রাচুর্যের কারণেই অখাঁটির প্রতি কড়া নজর, শাসন না থাকার কারণেই শেষে খাঁটির কদর থাকে না, দ্বীনের প্রতি লোকের অশ্রদ্ধা আসিয়া যায়। ইহাকেই বলা হয়েছে মোমেনের ছেফাত শুধু নরম হয়- কঠোরও আরবী- "আশিদ্দাউ আ'লাল কুফ্ফারি রুহামাউ বাইনাহুম" আয়াতের ইহাই তাৎপর্য। খাঁটি ঈমান, আখলাক ও ঈমানদারদের প্রতি কুসুমের ন্যায় কোমল, খোদাদ্রোহীতা, খোদাদ্রোহীতার কার্যকলাপ, আচার-ব্যবহার ও খোদাদ্রোহীদের প্রতি বজ্রের ন্যায় কঠোর।

আমি আমার তরীকতের ভাইদেরে বিশেষ করে অছিয়ত করি- এক ঘেয়ে নরম না হতে বরং তাতে যা কিছু কষ্টের, বিপদের, দুঃখের, যন্ত্রণার, দূর্নামের, দারিদ্রের, জেলের, ফাঁসির মুছিবত আসতে পারে তা হৃষ্টচিত্তে হাসিমুখে সহ্য করিতে- না ঘাবড়াইতে, না ফরিয়াদ করিতে, না শেকওয়া শেকায়েত করিতে এবং না প্রতিশোধের ইচ্ছা বা চেষ্টা করিতে। ইহাই আমার অছিয়ত। ইহাই পালন করিয়াছি আমি সারাজীবন এবং ইহাই পালন করিতে অছিয়ত করি প্রত্যেক মুসলমান ভাইদের।

(সঞ্জিবনী অমর বাণী)

পরের দোষ না দেখিয়া তাদের আয়নায় নিজের দোষ দেখিয়া তাহা সংশোধন করিতে অনবরত আজীবন চেষ্টা ও সাধনা করিবে।

(প্রথম সবক)

নাচিজ-

শামছুল হক

২২-০৮-৬২ইং

www.pathagar.com

মানুষ বিজ্ঞানে যতই উন্নতি করুক না কেন, তার আবিষ্কার শক্তি যতই বাড়ুক না কেন, কিন্তু মানুষের জ্ঞানের, মানুষের অনুভূতির, মানুষের চিন্তার ঊর্ধ্বে এমন একটা মহাজগৎ এবং এমন মহাজ্ঞান সমুদ্র আছে যে, সে অকুল পাথারের অধিকারী একমাত্র এক আল্লাহ; তাছাড়া সে পর্যন্ত পৌঁছিবার, সে জগৎ অধিকার করিবার, সে মহাজ্ঞান, চিন্তা শক্তিকে তীক্ষ্ণ হইতে তীক্ষ্ণতর করিয়া হাছেল করিবার কাহারও ক্ষমতা নাই। সেই মহাজগতের খবর, সেই মহাসমুদ্রের জ্ঞান-বিন্দু মানুষ সমাজ হইতে শুধু তাঁহারাই কিছুটা পাইয়াছেন, যাঁহাদিগকে স্বয়ং আল্লাহ বাছিয়া নিয়াছেন, যাঁহাদিগকে স্বয়ং আল্লাহ পূর্ণ বিশ্বস্থ ও পূর্ণ প্রভু ভক্ত পাইয়াছেন। তাঁহাদিগকেই আল্লাহ সেই মহাজগতের খবর দিয়া, সেই মহাসমুদ্রের জ্ঞান-বিন্দু দান করিয়া, নিজের সবাক বিধান বাণী দিয়া মানব জগতকে অন্ধকার হইতে আলোর দিকে আনিবার জন্য পাঠাইয়াছেন, তাঁহাদিগকেই আরবী ভাষায় বলে নবী বা রাসূল।

চুরি ডাকাতি, আমানতের খেয়ানত, এতীম-বিধবার সম্পত্তি হরণ যেমন না'নতি কাজ, সুদ, ঘুষ, জুয়া, মাপে কম দিয়া বা মালে মিশাল দিয়া লাভ করাও তদ্রুপ লা'নতি কাজ। জোর পূর্বক আইল ভাঙ্গিয়া জমি দখল করা যেরূপ লা'নতি কাজ, জুলুম পূর্বক নিরীহ প্রজাদের উপর আইন করিয়া অতিরিক্ত ট্যাক্স বসাইয়া রাজাদের ভোগ-বিলাস করাও তদ্রুপ লা'নতি কাজ।

মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ)

www.pathagar.com

পঞ্চম অধ্যায়

মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরীর (রহঃ) লিখিত চিঠিপত্র ও আবেদন

www.pathagar.com

দুনিয়ার সুখ-সমৃদ্ধি হাসিল করার দুইটি পথ আছে। একটি পথ যাহা অমুসলমানগণ অবলম্বন করিতে পারে. তার দ্বারা তাদের দুনিয়ার সুখ-সমৃদ্ধি যতটা আল্লাহর ইচ্ছা আছে এবং তাদের চেষ্টা-তদবীর আছে. ততটা তাহাদের হাসিল হইবে। দ্বিতীয় পন্থা মুসলমানদের জন্য, তারা যদি তাদের পথ অবলম্বন না করে, তবে তারা অমুসলমানদের পথ অবলম্বন করিয়া কস্মিনকালেও সুখ-সমৃদ্ধি হাসিল করিতে পারিবে না। যেমন, গরু ঘাস খাইয়া সুখ-সমৃদ্ধি হাসিল করে. কিন্তু মানুষ ঘাস খাইয়া সুখ-সমৃদ্ধি হাসিল করিতে পারে না; বস্তুত: মুসলমান জাতি, যে জন্য তাদের বৈশিষ্ট্য- আল্লাহর এবং আল্লাহর রসূলের ও কোরআন হাদীসের আনুগত্যের জন্যই তাদের বৈশিষ্ট্য সেই বৈশিষ্ট্যের পথ অনুসরণ করিয়া যদি দুনিয়ার উন্নতি করিতে চায়, তবে তাদের সুনিশ্চিত ভাবে আল্লাহ-রাসূলের বাতানো পথই অনুসরণ করিতে হইবে, তাছাড়া তাদের গত্যন্তর নাই। আর সেই পথ অনুসরণ করিলে তাদের দুনিয়ার উন্নতিও অভাবনীয়রূপে হইবে এবং আখেরাতের উন্নতিও অনিবার্যরূপে হইবে। (সূরা হুযুরাত হতে)

মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ)

www.pathagar.com

দেওবন্দ যাবার পথে

পিতার উদ্দেশ্যে লেখা পত্র

দেওবন্দের পথে
১৯২১ সাল ইং ১লা রজব

মাননীয় আব্বাজান,

পত্রে অধমের আন্তরিক সালাম ও অকৃত্রিম শ্রদ্ধা বিজড়িত কদমবুছি গ্রহণ করতে মর্জি হয়। আশা করি করুনাময়ের অশেষ কৃপায় কুশলেই আছেন। আমি দেওবন্দ যাচ্ছি। আমার জন্য আন্তরিক ভাবে দোয়া করবেন, যেন উদ্দেশ্য সাধনে সফলতা লাভ করতে পারি। আপনি আমাকে আরবী পড়ার জন্য কোন টাকা পয়সা না দেন, তাতে আমি দুঃখ পাবনা। শুধু আপনার খেদমতে একান্ত অনুরোধ পাঁচ ওয়াক্ত নামায বাদে আপনি আমার জন্য দোয়া করতে ভুলবেন না। আল্লাহ যেন আমাকে কামিয়াব করেন, আমি যেন জীবনে সাফল্য মন্ডিত হয়ে ফিরতে পারি। এই দোয়াই শুধু আপনার খেদমতে চাই। আপনি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন না। আমার যাতে মঙ্গল হয় করুনা ময়ের দরবারে দোয়াটুকু অবশ্যই করতে ভুলবেন না। আপনি দোয়া করলেই আমি সবচেয়ে বেশী খুশি হব। আমি আমার উদ্দেশ্য সফল না করে দেশে ফিরব না। মাকে আমার ভক্তিপূর্ণ সালাম ও দোয়া করতে বলবেন। ভুল ত্রুটি ও বেয়াদবী মার্জনা করবেন।

ইতি
আপনার দোয়া প্রার্থী পুত্র
শামছুল হক।

থানবী সাহেবের নিকট পত্র

দেওবন্দ মাদ্রাসা হতে
রজব মাস (১৯২২ সাল)

শ্রদ্ধেয় জনাব হুযুর,

রিক্তের সালাম ও শ্রদ্ধা গ্রহণ করুন। আশা করি খোদার রহমতে ভালই আছেন। প্রত্যেক মানুষের চলার পথে একজন অভিভাবক ও পথ প্রদর্শকের প্রয়োজন। আর আমি হুযুরকেই আমার জীবন পথের একমাত্র মুরব্বী এবং সহায়ক বলে নির্বাচন করেছি। আশাকরি অধম ছন্নছাড়া তা থেকে বিফল মনোরথ হবে না। আমি আরো আশা করি এখন থেকে হুযুরের খেদমতে কিছুদিন অবস্থানের অনুমতি প্রদান করে রিক্তকে চির কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ রাখতে মর্জি হয়। ইতি –

আপনারই একান্ত বাধ্যগত
খাদেম , শামছুল হক ফরিদপুরী

www.pathagar.com

বড় সাহেবযাদা মোহাম্মদ ওমর আহমদের কাছে হযরত ফরিদপুরীর (রহঃ) লিখিত চিঠি

Principal Jamea Qurania
Lalbag Shahi Masjid
Dacca-1
Date: 1-5-1966

প্রিয় কলিজার টুকরা ওমর ছাল্লামাহু,

দোয়া পর জানিবা, তোমার পত্র পাইয়াছি। আমার স্বাস্থ্য ভাল থাকে না। শরীরে শক্তি পাই না, সে জন্য সময় মত পত্র লিখিতে পারি না। তুমি তাতে মনে কষ্ট পাইও না বা তুমি পত্র লিখিতে ক্রটি করিও না। আমি বাড়ি আসিতেছি। খুব সম্ভব মে মাসের ৭-৮ তারিখের মধ্যেই বাড়ি পৌঁছব এনশাআল্লাহ। তোমাদের গ্রীষ্মের বন্ধ কবে হবে? বন্ধ হইলে তুমি বাড়ি যাইবা। প্রিয় বৎস! স্বাস্থ্যের দিকে তিক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবা। স্বাস্থ্যের হানিকর কোন কাজ করিবা না, এখনই চরিত্র গঠনের এবং জীবনকে মূল্যবান ও মর্যাদাশালী করার প্রকৃত সময়। কখনও মিথ্যা, পরনিন্দা ইত্যাদি কুকথা জবানে আনিবা না। কু-চিন্তাকে মনের কোনেও স্থান দিবা না। নামায জামাতের পাবন্দ করিবা। ছোটকে স্নেহ বড়কে আদব করিবা। সকালে উঠার অভ্যাস করিবা। ফজরের পরে আগে কোরআন শরীফ না পড়িয়া কোন কাজ করিবা না। দায়িত্ব জ্ঞান নিয়ম শৃংখলা পালন ঠিক রাখবা। আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করি, আল্লাহ তোমাকে মানুয বানান। যে কাজ করিবা ভালভাবে করিবা। হাতের লেখা ভাল করিবা। রচনা প্রবন্ধ ভাল লিখিতে চেষ্টা করিবা।

নাচিজ

শামছুল হক

www.pathagar.com

Phone : ~~6068~~ 50662

PRINCIPAL, JAMEA QURANIAH,
LALBAGH SHAHI MASJID
DACCA-1.

Date......1-5-......1966

[illegible]

www.pathagar.com

জাতির প্রতি মাওলানা শামছুল হকের আবেদন

মুসলিম একতাই পাকিস্তান অর্জন করিয়াছিল। দুর্ধর্ষ হিন্দু কংগ্রেস ও ধূর্ত ইংরেজ জাতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া পাকিস্তান হাসিল করা তথা মুসলিম জাতির স্বাধীনতা অর্জন করা কত বড় কঠিন ব্যাপার ছিল তা ভুক্তভোগী ব্যতীত অন্য কাহার পক্ষে হৃদয়ঙ্গম করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। সেই গোলামীর যুগে মুসলিম একতার নাম দেওয়া হইয়াছিল "মুসলিম লীগ"। আমি মুসলিম লীগের একজন নগণ্য খাদেম। মুসলিম একাতাকে আমি প্রাণের সঙ্গে ভালবাসি। কর্মীদের বা কর্তাদের ভুলের কারণে স্বাধীনতা অর্জন করার পর স্বাধীনতার মর্যাদা রক্ষা করার জন্য যখন মুসলিম কর্তা দরকার ছিল খুব বেশী তখনই আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ জাতি শতধা বিভক্ত হইয়া পড়িল, নানা প্রকার ভূঁইফোড় দল গজাইয়া উঠিয়া স্বাধীনতা অর্জনে যা উদ্দেশ্য ছিল তা একেবারে বানচাল করিয়া দিল!

এখনও আমরা সেই অভিশাপই ভোগ করিতেছি। এখনও যদি আমাদের হুঁশ না আসে, পুনরায় যদি নূতন প্রেরণা এবং নূতন উদ্যম নিয়া আমরা একতাবদ্ধ হইয়া কাজ না করি যদি আমরা বর্তমানের মত শতধা বিচ্ছিন্ন, স্বার্থপর এবং আদর্শহীন থাকি তবে অচিরেই আমাদের পূর্ণ ধ্বংস অনিবার্য। সেই জন্য প্রাণের আবেগে জাতির জন সাধারণ নেতৃবর্গ এবং শ্রদ্ধেয় আলেম সমাজের প্রতি আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ এই যে, এখনও আপনারা যে ওয়াদায় আবদ্ধ হইয়া লক্ষ লক্ষ প্রাণ, কোটি কোটি সম্পদ কোরবান করিয়া পাকিস্তান অর্জন করিয়াছিলেন; তাহাকে যোগ্য মর্যাদা দান করার জন্য পুনরায় একবার সেই নীতি ও সেই আদর্শের উপর পুনর্গঠিত ও শ্রীবৃদ্ধি সম্পন্ন করার জন্য অগ্রসর হউন।

গোলামী যুগের সব কিছুকে সংশোধন তথা বর্জন করিয়া কোরআনে পাকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আল্লাহ তা'আলা সূরা "আল এমরানের" মধ্যে যে ছয় পয়েন্ট সম্বলিত জাতীয় কর্মসূচী এবং সূরা নেসার মধ্যে যে ছয় ধারা সম্বলিত জাতীয় গঠনতন্ত্র প্রদান করিয়াছেন, সেই ভিত্তিতে পাকিস্তানকে আদর্শ পাকিস্তান রূপে গঠন করতে হইবে। ছয় পয়েন্টে সম্বলিত জাতীয় কর্মসূচী সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই– আল্লাহ্ তা'আলা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নির্দেশ দিয়েছনঃ "মুসলিম জাতি! তোমরা যদি কামিয়াবী হাসিল করিতে চাও তবে (১) বিজাতীয় অনুকরণ পরানুকরণ তথা Inferiority Complex পরিত্যাগ কর (২) সকলে খোদা ভীরুতার জীবন যাপন অভ্যাস কর (৩) ইসলামী জীবন যাপনকে সর্ব শ্রেষ্ঠ গৌরব মনে করিয়া

www.pathagar.com

ইসলামী জীবন যাপনে অভ্যস্ত হও (৪) ব্যক্তিগত, দলগত, সর্বস্বার্থ সব জিদ বাদ দিয়া আল্লাহর রজ্জু অর্থাৎ আল্লাহর কোরআনের নীতি এবং আল্লাহর রাসূলের আদর্শের ভিত্তিতে একতাবদ্ধ হও।

(৫) বিচ্ছিন্ন হইওনা, একতা ভঙ্গ করিও না (৬) আল্লার কোরআন ও আল্লাহর রসুলের হাদীসের Text কে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করিয়া, পর প্রভাবান্বিত ব্যাখ্যা তথা ইসলামের নূতন এডিশানকে বাদ দিয়া: রাছুলের সাক্ষ্য প্রদত্ত শত যুগত্রয়ের ব্যাখ্যাকে গ্রহণ করিয়া শিক্ষা ও প্রচারের মাধ্যমে যাবতীয় সুনীতিকে সমাজে চালু করার জন্য একটি দৃঢ় পদ, আস্থাভাজন, সত্যিকার নিঃস্বার্থ আদর্শ দল গঠন কর। ছয় ধারা সম্বলিত জাতির গঠন তন্ত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই ঃ আল্লাহ তা'আলা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নির্দেশ দিতেছেন–

হে মুসলিম জাতি! তোমরা যদি আল্লার পেয়ারা, আল্লার রহমত ভাজন, আখেরাতের মুক্তি পেতে চাও দুনিয়াতে উন্নততম ও সভ্যতম জাতি রূপে যদি প্রমাণিত হইতে চাও তবে (১) আল্লাহর আনুগত্য পূর্ণরূপে স্বীকার করিয়া নেও (২) আল্লার রছুলের আনুগত্য পূর্ণরূপে স্বীকার করিয়া নেও (৩) রাসুলের সমর্থিত উলিল-আমরগণের অর্থাৎ ইসলামী রাষ্ট্রের পরিচালকগণের এবং ইসলামী শরীয়তের সূক্ষ্মদর্শী, পারদর্শী ব্যাখ্যাদাতাগণেরও আনুগত্য স্বীকার করিয়া নেও। (৪) যাবতীয় আমানাতগুলিকে হকদারদের নিকটে বিনা খেয়ানতে পৌছাইয়া দাও (৫) নিরপেক্ষ, নিঃস্বার্থ, নিখুঁত এনসাফ ও সুবিচার কওমের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত কর।

(৬) যদি কোন ক্ষেত্রে কোন বিষয়ে কোন সমস্যা সমাধানে মতভেদ দেখা দেয় তবে আল্লাহর কোরআন এবং রাছুলের হাদিছকে Final Authority স্বীকার করিয়া নিয়া তাহাদের সুযোগ ও সুদক্ষদের মাধ্যমে আল্লার কোরআন ও রছুলের হাদিসের দিকে রুজু কর। ইহা ব্যতিরেকে তোমাদের কামিয়াবী হাসিলের এবং পরমুখাপেক্ষিতার জিল্লতি দূর করার অন্য কোন উপায় নাই। ইহার বিস্তারিত বিবরণ আমি কোরআনের তাফসীরে লিখিয়াছি। এখানে তাহারই সার নিয্যাস উদ্ধৃত করিয়াছি মাত্র।

আমি ছোট বড় দলমত নির্বিশেষে সব ভাইকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছিঃ আসুন, আমরা সকলে একতাবদ্ধ হইয়া গোলামীর জোয়াল স্কন্ধ হইতে দূরে নিক্ষেপ করিয়া জাতীয়তার Definition কে সংকীর্ণ না করিয়া ব্যাপকতর করি। জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাকে নূতন করিয়া সাজাই, বিজাতীয় মধ্যযুগীয় বর্বরতাকে পরিবর্জন করিয়া সত্যিকার ইসলামী গৌরবোজ্জ্বল সভ্যতাকে সাদরে আলিঙ্গন করি। এবং বিজাতীয় ভাষা ও পরিভাষাকে বর্জন

www.pathagar.com

করিয়া নূতন উদ্যমে জাতীয় ভাষা ও পরিভাষাকে উন্নত করি। এই উপায়ে পাকিস্তানকে সত্যিকার সংহতি এবং সত্যিকার উন্নতিশীল করি।

মোট কথা আমি ইসলামের ভিত্তিতে (১) একতাকে (২) ইসলামী আদর্শকে প্রাণের সংগে ভালবাসি! পক্ষান্তরে (১) জাতীয় সম্পদের অপচয়কে (২) আমানতের খেয়ানতকে (৩) অবিচারকে (৪) বিচ্ছিন্নতা ও বিভেদ সৃষ্টি করাকে (৫) Inferiority Complex. কে প্রাণের সংগে ঘৃণা করি।

এই ভিত্তিতে যে কোন প্রচেষ্টা হইবে, যে কোন দল গঠিত হইবে, আমি তাহার সেবক। আমি আপনাদের একজন নগণ্য খাদেম-

(মাওলানা) শামছুল হক
প্রিন্সিপ্যাল, জামেআ-ই-কোরআনিয়া,
লালবাগ, ঢাকা-১

[১০ই আশ্বিন ১৩৭০ বাং মোতাবেক ১৯৬৩ ইং দৈনিক মুসলিম পত্রিকায় প্রকাশিত]

জাতির প্রতি কঠিন সতর্কবাণী

কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি ও হাজার হাজার মা-বোনদের এবং কচি শিশুদের জীবন কোরবানীর বদৌলতে ইসলামী শাসনের প্রতিশ্রুতিতে প্রাপ্ত আমাদের জন্মভূমিতে আজ যৌন উন্মাদনা, সূদ-ঘুষ, অবিচার, জুলুম ও শোষণে-উৎপীড়নে মজলুমের আর্তনাদে আকাশ বিদীর্ণ হইতেছে। আরো কিছুদিন এইরূপ ভাবে নির্বিঘ্নে এই জঘন্য অন্যায়-অত্যাচার ও ফাহেশা কাজ চলিতে থাকিলে এই কওমের ধ্বংস হইবার প্রবল আশংকা আছে। সুতরাং প্রত্যেকটি চিন্তাশীল লোকেরই চিন্তা করা দরকার। দেশ ও জাতিকে সৎপথে পরিচালিত করার আপ্রাণ চেষ্টা করা দরকার। এখনও সময় আছে। পরিস্থিতি আয়ত্বের বাইরে যায় নাই। আয়ত্বের বাইরে গেলে সকলেরই ধ্বংস অনিবার্য।

নাচিজ-
শামছুল হক
২২-০৮-৬২ইং

www.pathagar.com

ষষ্ঠ অধ্যায়

সমসাময়িক বুযুর্গানে দ্বীনের দৃষ্টিতে এবং তৎকালীন পত্র-পত্রিকায় হযরত ফরিদপুরী (রহঃ)

www.pathagar.com

আজকাল যেহেতু সমাজের উপর ইংরেজী শব্দের প্রভাব রয়েছে বেশি; সেই জন্য Religion শব্দটি সম্পর্কেও কিছু বলার প্রয়োজন বোধ হইতেছে। যাহারা ইংরেজী ভাষায় হর্তা-কর্তা তাহাদের ব্যবহারে Religion শব্দের অর্থ অতি সংকির্ণ। অতএব, আমরা আমাদের দ্বীন শব্দের বা ইসলাম শব্দের অনুবাদ Religion করিয়া আমাদের ধর্মের গন্ডিকে সংকুচিত করিতে কিছুতেই রাজি নই। তাহারা Religion বলে শুধু গির্জার গন্ডিকে, গির্জার বাইরে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যাপারে তাহারা আর ধর্মের কোন পরোয়া করে না। অথচ ইসলাম আমাদের বাধ্য যেমন মসজিদে, তেমনি বাজার দরবারে, হাটে-মাঠে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, সামাজিক ব্যাপারে, রাজনৈতিক ব্যাপারে সর্বক্ষেত্রে এক আল্লাহর আনুগত্য স্বীকার করিতে।

ইসলামের বৈশিষ্ট্য যে, 'তৌহিদ বাদ' (একত্ববাদ) তাহার একটি অর্থ ইহাও যে, মানুষকে সর্বক্ষেত্রে গোটা জীবনে এক আল্লাহর আনুগত্য স্বীকার করিতে হইবে। তা ছাড়া কখনো কখনো আল্লাহর আনুগত্য আবার কখনো কখনো নফছের শয়তানের ব্যক্তিগত স্বার্থের, অর্থের, রাজা-বাদশার, কামিনী-কাঞ্চনের, পাদরী-পুরোহিতের আনুগত্য ইসলাম শিক্ষা দেয় না; বরং ইহাকেও একপ্রকার শিরক বলিয়া ইসলাম ঘোষণা করে। কাজেই দ্বীন শব্দের অনুবাদ Religion করা আদৌ সংগত হইবে না।

মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ)

www.pathagar.com

সমসাময়িক বুযুর্গানে দ্বীনের দৃষ্টিতে হযরত ফরিদপুরী (রহঃ)

হযরত মাওলানা ইউসুফ বিন্ নূরী (রহঃ)

হাফেজ্জী হুজুরের সুযোগ্য পুত্র হযরত মাওলানা হামিদুল্লাহ সাহেব একবার বলেছিলেন যে, তৎকালীন পাকিস্তানের বিখ্যাত হাদীস বিশারদ একবার বলেছিলেন: বাংলাদেশের উলামাদের এখলাছ এক পাল্লায় রাখলে আর মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ)-এর এখলাছ এক পাল্লায় রাখলে মাওলানা শামছুল হক সাহেবের পাল্লা ভারী হবে।

হযরত মাওলানা যাফর আহমদ উসমানী (রহঃ)

বিংশ শতাব্দীর কুতুবে জামান, বাতিলের হৃদকম্পন হযরত মাওলানা যাফর আহমদ উসমানী সাহেব (রহঃ) মুজাহিদে আযম আল্লামা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ)-এর ইন্তেকালের সংবাদ শুনে মাটির দিকে মাথা ঝুকিয়ে দিয়ে অনেকক্ষণ পরে মাথা উঠিয়ে বললেন, হায়! বিশ্বের শ্রেষ্ঠ আলেমে দ্বীন দুনিয়া থেকে আল্লাহর দরবারে চলে গেলেন। মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ)-এর মত উদার, তেজস্বী, মানব প্রেমিক, দুনিয়াত্যাগী, কুরবানী করনে ওয়ালা আলেম সারা দুনিয়ায় আর কোথাও পাওয়া যাবে না। তিনি আমার থেকে অনেক অনেক বড় আলেম ও আল্লাহ ওয়ালা ছিলেন।

খতীবে আ'যম হযরত মাওলানা সিদ্দিক আহমদ (রহঃ)

সর্বগুণে গুণান্বিত এ মহান বুযুর্গ সম্পর্কে আমি কি বলবো? আমি যত অধিক সারগর্ভ করেও তাঁর সম্পর্কে যা কিছু বলবো তা ঐ মহান বুযুর্গের তুলনায় কম হবে, মিথ্যা হবে। তবুও শুধু মনের একটা কথা ব্যক্ত করি কথাটা আমার অন্তরের একটা দৃঢ় বিশ্বাস, এ কথাটা আপনারা বিশ্বাস করলে লাভবান হবেন দু'জাহানে, সৌভাগ্যশালী হবেন দুনিয়া ও আখেরাতে। তিনি বললেন, আমার বিশ্বাস যদি এখন কেয়ামত কায়েম হয়ে যায় এবং বাংলার জমিনের সমস্ত মুসলমান যদি আল্লাহপাকের দরবারে হাজির হয়, তখন আল্লাহ পাক যদি বাংলাদেশের সমস্ত মানুষদের জিজ্ঞাসা করেন, বল তোমরা আমার হুকুম ও আমার পেয়ারা নবী (সাঃ)-এর নির্দেশিত তরীকামত কি কাজ করে এসেছো? এবং সর্বপ্রথম একজনের মাধ্যমে একটি নমুনা পেশ করো। অতঃপর খতীবে

www.pathagar.com

আ'যম ছাহেব অত্যন্ত আবেগের সাথে বলেন, আল্লাহ পাকের এই কথায় যদি আমরা হোমরা চোমরা আলেম উলামা পালিয়ে থেকে যদি হযরত সদর সাহেব হুযুরকে খোঁজ করে আল্লাহ পাকের সামনে হাজির করে দেই তবে আমার বিশ্বাস ও ঈমান এই যে, আল্লাহ পাক সদর সাহেব হুযুরকে দেখে বলবেন- এমন সোনার মানুষ তোমাদের মধ্যে আছে, যে ব্যক্তি জীবনে আমার একটি হুকুমও অমান্য করেনি, আমার পেয়ারা রাসূলের একটা সুন্নতও ছাড়েনি, জীবন কুরবান করতে প্রস্তুত ছিল কিন্তু আমার হুকুম ও নবীর তরীকা ছাড়তে প্রস্তুত ছিলনা। তার উপর আমি চরম পরম খুশী হয়ে গেছি। আর এমন খুশী হয়েছি যে, তাঁর খাতিরে আমি বাংলাদেশের সমস্ত মানুষকে মাফ করে বিনা হিসাবে জান্নাতে যাওয়ার হুকুম দিয়ে দিলাম।"

খতীবে আ'যম বলেন, এটাই আমার ঈমান, তাঁর প্রতি আমার এরূপ বিশ্বাস যে, আল্লাহ পাক তাঁর খাতিরে সকলকে মাফ করে দিবেন। কাজেই সে মহাপুরুষ সম্পর্কে আমি যা কিছু বলবো তার মর্যাদা হিসাবে খুব কমই হবে এবং মিথ্যা হবে, কাজেই এ বেয়াদবী করতে আমি চাইনা। একথা বলে তিনি বসে যান, সবাই অবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন।

হযরত মাওলানা মুফতী দ্বীন মুহাম্মদ খান

প্রখ্যাত মুফাসসিরে কোরআন হযরত মাওলানা দ্বীন মোহাম্মদ খান সাহেব (রহঃ) একবার তফসীরের দরসের মধ্যে সাহাবায়ে কেরামের মানাকিব বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, তোমাদের উস্তাদ হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী যে একজন কামেল ওলী এ বিষয়ে আমার কোনই সন্দেহ নাই। ১৪০০ বছর পর সাহাবায়ে কেরামের আদর্শ ও নমুনার উপর কোন লোককে যদি দেখতে চাও, মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরীর দিকে তাকাও। তিনি ইচ্ছা করলে ঢাকা শহরের ধানমন্ডিতে পাঁচতলা বিল্ডিং তৈরী করতে পারতেন। তিনি তা না করে বাংলাদেশের মধ্যে অনেকগুলি মাদ্রাসা ও আলিম তৈরী করেছেন।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

দারুল উলুম মাদ্রাসায় শোক সভা অনুষ্ঠিত

দৈনিক আজাদী, ৩০ শে জানুয়ারী ১৯৬৯, ১৬ই মাঘ ১৩৭৫বাংলা, ১১ই জিলকদ ১৩৮৮হিঃ বৃহস্পতিবার

স্থানীয় দারুল উলুম মাদ্রাসায় গত সোমবার ঢাকার লালবাগ জামেয়া কোরআনিয়ার প্রিন্সিপাল মৌলানা শামছুল হক ফরিদপুরীর ইন্তেকালে এক শোক সভা ও ঈছালে সওয়াব অনুষ্ঠিত হয়। মাদ্রাসা হোস্টেলের সুপারিন্টেডেন্ট মাওলানা আবদুল মোমেন মরহুমের কর্মকৃতিত্ব ও গুণাবলীর কথা উল্লেখ করিয়া এই সভায় বক্তৃতা করেন। অতঃপর কুরআন খানির মাধ্যমে মরহুমের রুহের মাগফিরাত কামনা করা হয়। মাওলানা নওয়াব হোসেন মাগফিরাতে দোয়া পরিচালনা করেন।

মওলানা শামছুল হকের এন্তেকালে শোকসভা

প্রাচীনতম দৈনিক আজাদ, ৯ই মাঘ বৃহস্পতিবার, ১৩৭৫, ৪ঠা জিলকদ, ১৩৮৮, ২৩ জানুয়ারী, ১৯৬৯

ঢাকার লালবাগ জামেয়া কুরআনিয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মওলানা শামছুল হকের এন্তেকালে গতকাল বুধবার পূর্ব্ব পাকিস্তান জমিয়তে এছলাম এমদাদুল উলূম মাদ্রাসা, পূর্ব্ব পাকিস্তান জমিয়তে উলামায়ে এছলাম ও নেজামে এছলাম পার্টিসহ চারিটি স্থানে শোক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত চারিটি শোক সভায় মরহুমের জীবনী আলোচনা করা হয় এবং মরহুমের শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়। পূর্ব্ব পাক জমিয়তে উলামায়ে এছলামের শোক সভায় মওলানার জীবনী লিপিবদ্ধ করিয়া উহা প্রকাশের জন্য আঞ্জুমানে খাদেমুল ইসলামকে অনুরোধ জানানো হয়।

মাওলানা শামছুল হকের এন্তেকালে বিভিন্ন মহলের শোক প্রকাশ

ঢাকা, ২২শে জানুয়ারী '৬৯

গতকাল লালবাগ জামেয়া কোরআনিয়া আরাবিয়ার প্রিন্সিপাল হযরত মওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী ছাহেবের মৃত্যু সংবাদ তারযোগে এখানে আসিয়া পৌঁছিবার সাথে সাথে শোকের ছায়া নামিয়া আসে। অদ্য সকালে খতমে কোরআনের পর একটি শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। লালবাগ শাহী মসজিদের ইমাম মওলানা মোহাম্মদ উল্লাহ ছাহেব সভাপতিত্ব করেন। মাওলানা মুফতী দীন মোহাম্মদ খান ছাহেব, মাওলানা আব্দুর রহমান বেখুদ ছাহেব ও বিশিষ্ট শিল্পপতি জনাব ইয়াহইয়া আহমদ বাওয়ানী প্রমুখ বিশিষ্ট নাগরিক উপস্থিত ছিলেন। সভায় মরহুমের রূহের মাগফিরাত কামনা করিয়া দোয়া করা হয় এবং তাহার শোক

www.pathagar.com

সন্তপ্ত পরিবার পরিজনের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়। অদ্য পোস্তা এলাকায় দোকান পাট মাওলানা ছাহেবের শোকে বন্ধ রাখা হয়।

আঞ্জুমানে এজহারে হক

আঞ্জুমানে এজহারে হকের উদ্যোগে অদ্য বাদ আছর পূর্ব্ব পাকিস্থানের বিখ্যাত আলেম, পাকিস্তান সংগ্রামের অন্যতম সেনানী হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী ছাহেবের মৃত্যুতে ২২, ঢাকেশ্বরী রোডে অবস্থিত আঞ্জুমানের অফিসে একটি শোক সভা অনুষ্ঠিত হয়। মাওলানা জয়নুল আবেদীন ছাহেব সভায় সভাপতিত্ব করেন। আঞ্জুমানের সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আবদুল্লাহ বিন সাঈদ মরহুমের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও অবিভক্ত বাংলার মুছলমান সমাজে তাহার অবদান সম্পর্কে আলোচনা করেন। সভা শেষে মরহুমের আত্মার মাগফিরাত কামনা করিয়া দোয়া করা হয় এবং তাহার শোক সন্তপ্ত পরিবার পরিজনের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়।

সুত্রাপুর নেজামে ইসলাম পার্টির যুগ্ম সম্পাদক সুবিখ্যাত আলেম, পীরে কামেল অভিজ্ঞ ইসলামী চিন্তাবিদ লালবাগ জামেয়া কোরআনিয়া মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা ও প্রিন্সিপাল জনাব হযরত মাওলানা শামছুল হক ছাহেবের এন্তেকালে ঢাকা সুত্রাপুর থানা নেজামে ইসলাম পার্টির যুগ্ম-সম্পাদক জনাব এস, এম, নূরুল আনওয়ার গতকাল এক শোক বাণী প্রেরণ করিয়াছেন।

বাণীতে তারা বলেন, মরহুম শুধু একজন প্রখ্যাত আলেমই ছিলেন না বরং তিনি ছিলেন একাধারে সুসাহিত্যিক, প্রবীণ রাজনীতিবিদ, প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ও বিশিষ্ট সমাজ সংস্কারক।

আমরা মরহুমের এন্তেকালে খুবই মর্মাহত হইয়াছি এবং গভীর শোক প্রকাশ করিতেছি এবং তাহার রূহের মাগফিরাত কামনা ও তাহার শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

মাওলানা ফরিদপুরীর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ
(টাঙ্গাইল ২২শে জানুয়ারী)

করটিয়া সিনিয়র মাদ্রাসার হেড মাওলানা মোহাম্মদ কামাল আজিযী হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী সাহেবের এন্তেকালের সংবাদ পাইয়া এক বিবৃতিতে বলেন, আমি এই সংবাদ পাইয়া বিশেষভাবে মর্মাহত হইয়াছি। তাহার মৃত্যুতে দেশ একজন খ্যাতনামা আলেমকে হারাইল। তিনি বাংলা ভাষায় বহু মূল্যবান পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। তাহার স্থান পুরণ করা যাইবে না।

www.pathagar.com

মাওলানা শামছুল হকের এন্তেকালে শোক সভা
২৫শে জানুয়ারী '৬৯

ঢাকার লালবাগ জামেয়া কোরআনিয়ার অধ্যক্ষ মাওলানা শামছুল হকের এন্তেকালে গত বৃহস্পতিবার ইসলামিয়া হাইস্কুলে এক শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত শোকসভায় মরহুমের সংক্ষিপ্ত জীবনী সম্পর্কে আলোচনা করেন ইসলামিয়া হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক জনাব আব্দুল বারী ও অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ। সভায় মরহুমের রূহের মাগফেরাত কামনা করা হয়।

মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরীর ইন্তেকাল
জাহানে নও ২৬ জানু- ৬৯

প্রদেশের প্রবীণ আলেম ইসলামের অক্লান্ত খাদেম লালবাগ জামেয়া কুরআনিয়ার প্রিন্সিপাল মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী গত ২১ শে জানুয়ারী মঙ্গলবার তার নিজ গ্রাম গওহরডাঙ্গায় ৭২ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ---- রাজেউন)।

মরহুম দীর্ঘদিন যাবত হৃদ রোগে ভুগছিলেন। পূর্ব পাক জামাতে ইসলামীর আমীর মাওলানা আব্দুর রহীম ও সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক গোলাম আযম সহ দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও অসংখ্য প্রতিষ্ঠান তার মৃত্যুতে শোক বাণী প্রেরণ করেছেন।

মাওলানা শামছুল হকের এন্তেকালে
বিভিন্ন মহলের শোক প্রকাশ
প্রাচীনতম দৈনিক আজাদ

১২ই মাঘ রবিবার ১৩৭৫, ৭ই জেলকদ ১৩৮৮, ২৬ জানুয়ারী ১৯৬৯

ঢাকা, ২৩শে জানুয়ারী

অদ্য বাদ মাগরিব ঢাকা শহর শাখা গেন্ডারিয়া হালকা জমিয়তে উলামায়ের উদ্যোগে মাদ্রাসা জামালুল কুরআনে পূর্ব পাকিস্তানের প্রখ্যাত আলেম লালবাগ জামেয়া কোরআনিয়া মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী সাহেবের মৃত্যুতে শোক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় কোরআন পাঠ করিয়া মরহুমের রূহের মাগফেরাত কামনা করা হয়। ঢাকা শহর জমিয়তের বিশিষ্ট কর্মী জনাব ক্বারী আব্দুল খালেক সাহেব মরহুমের সংক্ষিপ্ত জীবনী আলোচনা করেন। সভায় এক প্রস্তাবে মরহুমের শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করা হয়।

www.pathagar.com

ঢাকা, ২২শে জানুয়ারী

গত বৃহস্পতিবার এমদাদিয়া প্রেসের মসজিদে প্রেসের মালিক, ওলামা ও কর্মচারীবৃন্দ, জামেয়া কোরআনিয়ার প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ পীরে কামেল হযরত মাওলানা শামছুল হক সাহেবের এন্তেকালে এক শোক সভায় মিলিত হন। সভায় মরহুমের ধর্মীয় ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও গভীর অনুরাগ, আল্লার প্রতি প্রগাঢ় প্রেমাশক্তি, নিঃস্বার্থ ধর্মীয় ও সমাজসেবা মুজাহেদানা জিন্দেগী, জিহাদী প্রেরণা ও কর্ম মুখর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়া আলোচনা করা হয়। তাহার শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়।

সভা শেষে খতমখানি করতঃ তাহার পবিত্র রূহের মাগফেরাত কামনা করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন কাজী ইউনুস সাহেব।

হাজারীবাগ

গত বৃহস্পতিবার এশার নামাজের বাদ হাজারীবাগের সেরাতুল মুস্তাকিম সাপ্তাহিক তাফসীরুল কোরআনের সভায় কোরআনে মজিদের তাফসীর বয়ান করার পর মুফাচ্ছের মাওলানা আব্দুল ওয়াহাব নওয়াবী তাফসীর কমিটির সদস্যবৃন্দ ও উপস্থিত শ্রোতাবৃন্দ মরহুম মাওলানা শামছুল হক সাহেবের জন্য দোয়া কালাম পাঠ করিয়া তাহার রূহের মাগফেরাত কামনা করেন।

শাহী মসজিদ

গত শুক্রবার জুমার নামাজের পর জগন্নাথ শাহ রোডস্থ আমলাগোলা শাহী মসজিদ প্রাঙ্গনে পাকিস্তানের প্রখ্যাত আলেম সুসাহিত্যিক ও বিশিষ্ট সমাজ সংস্কারক জামেয়া কোরআনিয়া আরাবিয়ার প্রিন্সিপাল হযরত মাওলানা শামছুল হক সাহেবের এন্তেকালে এক শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মসজিদের খতিব ও ইমাম মাওলানা গোলাম মোস্তফা মরহুমের সংক্ষিপ্ত জীবনী আলোচনা ও অবিভক্ত বাংলার মুসলমান সমাজে তাহার অবদান সম্পর্কে আলোচনা করেন। সভা শেষে মরহুমের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া করা হয় এবং তাহার শোক সন্তপ্ত পরিবার পরিজনের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়।

মাওলানা শামছুল হক সাহেবের এন্তেকালে শোকসভা

প্রাচীনতম দৈনিক আজাদ, ২৬শে জানুয়ারী, ৬৯

১২ই মাঘ মঙ্গলবার ১৩৭৫, ৯ই জেলকদ, ১৩৮৮, ২৮শে জানুয়ারী'৬৯

আজ আলীয়া মাদ্রাসার হোষ্টেলে হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরীর এন্তেকালে এক শোক সভা অনুষ্ঠিত হয়। মাওলানা আব্দুল আজীজ জালালাবাদীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় মরহুম মাওলানার চরিত্রের বিভিন্ন দিক লইয়া আলোচনা করা হয় এবং তাহার রূহের মাগফেরাত কামনা করিয়া দোয়া করা হয়।

www.pathagar.com

মাওলানা শামছুল হকের এন্তেকালে শোকসভা

প্রাচীনতম দৈনিক আজাদ, ২৬শে জানুয়ারী, ৬৯

গত শনিবার বেলা ২টায় লালবাগ মাদ্রাসার শাহী মসজিদ প্রাঙ্গনে মরহুম মাওলানা শামছুল হকের এন্তেকালে এক শোক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সান্ধ্য আইন জারী থাকায় অনেক সদস্যই যোগদান করিতে পারেন নাই। বেলা ২টায় মাদ্রাসার সমস্ত ছাত্র-শিক্ষক একত্রিত হইয়া পাক কোরআনে হাকীম তেলাওয়াত শুরু করেন। তিনটার সময় হযরত মাওলানা মোহাম্মদুল্লাহর (হাফেজ্জী হুযুর) সভাপতিত্বে কয়েকজন বিশিষ্ট সমাজ সংস্কারক মরহুম মাওলানা সাহেবের বিভিন্ন গুণাবলী সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া গভীর শোক প্রকাশ করেন। সর্বশেষে জনৈক ছাত্র মরহুম মাওলানা সাহেবকে লক্ষ্য করিয়া একটি নাত পেশ করেন। আছরের নামাজের পর ছাত্র, শিক্ষকগণ ও স্থানীয় জনগণ মরহুম মাওলানা সাহেবের জন্য দোয়া কালাম পাঠ করিয়া তাহার রূহের মাগফিরাত কামনা করেন এবং তাহার শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করেন।

মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ)

(১৪০৫ হিজরীর ইসলামিক ফাউন্ডেশন পুরস্কারপ্রাপ্তদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি হতে)

হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রঃ) স্বীয় যুগের হক্কানী আলিম, কামিল পীর ও মুর্শিদ এবং খাঁটি নায়েবে রসুলগণের অন্যতম ছিলেন। এ মর্দে মুমিন তাঁর মনপ্রাণ যথাসর্বস্ব দ্বীনি শিক্ষা প্রদান, দ্বীনি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা এবং দ্বীনে ইসলামের প্রচার-প্রসারকল্পে আত্মোৎসর্গ করে গেছেন। তিনি ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ থানার অন্তর্গত গওহারডাঙ্গা গ্রামের এক ঐতিহ্যবাহী সংগ্রামী পরিবারে বাংলা ১৩০২ সালের ফাল্গুন মাসের প্রথম শুক্রবার (১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মুন্সি আব্দুল্লাহ এবং মাতার নাম বেগম আমেনা। পিতামহ হযরত সৈয়দ বেরেলভী (রহঃ)-এর সাথে জিহাদে শরীক হয়েছিলেন। গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনান্তে কলকাতা হতে ১৯১৯ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন। ছোটকাল থেকেই ইলমেদ্বীন শিক্ষার প্রতি প্রবল ঝোঁক থাকার কারণে তিনি আধুনিক শিক্ষার পাশাপাশি উর্দু, ফার্সী ও আরবী ভাষা শিখতে থাকেন।

কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়নকালে ১৯২০ সালে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে তিনি উপমহাদেশের বিখ্যাত আলিম হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ)-এর পরামর্শে প্রথমে মাজাহির আল-উলূম সাহরানপুর এবং পরে দারুল উলূম দেওবন্দে শিক্ষা লাভ

www.pathagar.com

করে ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে বিশেষ কৃতিত্বের সাথে ফাযিলে দারুল উলূম সনদ লাভ করেন। শরীয়তি জ্ঞানার্জনের পাশাপাশি তিনি মাওলানা থানবী (রহঃ) এর সংস্পর্শে মারিফাতের জ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়ে ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। এ সময় তিনি হায়দারাবাদের নিজাম স্টেটের প্রধান কাযীর পদ গ্রহণের আমন্ত্রন লাভ করেন। কিন্তু পশ্চাৎপদ জাতির ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক শিক্ষাদানের মানসে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন।

দেশে প্রত্যাবর্তন করে দুই বছরকাল ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ইউনুসিয়া মাদ্রাসায় প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন শেষে তিনি সারা দেশব্যাপী দ্বীনের দাওয়াতী তৎপরতায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় অনেক মাদ্রাসা ও মক্তব প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৩৪-১৯৪৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ঢাকার বড় কাটরা আশরাফুল উলূম মাদ্রাসায় অধ্যাপনা করেন। ১৯৪৯ সনে ঢাকার লালবাগে জামেআ কুরআনিয়া আরাবীয়া প্রতিষ্ঠা করেন। তাছাড়া খুলনা জেলার বাগের হাটে গজালিয়া মাদ্রাসা, ঢাকায় ফরিদাবাদ মাদ্রাসা ও নিজ গ্রামে দারুল উলূম খাদেমুল ইসলাম মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন।

মানব সমাজের সর্বস্তরে ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা ও দ্বীন ইসলামের শিক্ষাকে সার্বজনীন করণার্থে তিনি 'খাদেমুল ইসলাম জামাত' নামে ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে একটি সমাজ সেবা প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। উক্ত প্রতিষ্ঠান বহু মক্তব, ইসলামী পাঠাগার ও দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করে।

তিনি দ্বীন ও কওমের মধ্যে ইসলামের মূল ভাবধারার প্রচার ও প্রসারকল্পে মাতৃভাযা বাংলায় ইসলামের বিভিন্ন বিযয়ের উপর বহু মূলবান গ্রন্থ রচনা ও অনুবাদ করে গেছেন। তাঁর অনূদিত গ্রন্থের মধ্যে বেহেস্তী জেওর বহুল প্রচারিত এবং বালাদেশের ঘরে ঘরে পঠিত হচ্ছে। খাদেমুল ইসলাম জামাত এর প্রকাশনী বিভাগ তাঁর ৭৬ (ছিয়াত্তর)টি গ্রন্থ প্রকাশ করেছে; এর অধিকাংশই অনুবাদ। তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থসমূহের মধ্যে রয়েছে, তাফসীরুল কুরআন, তাফসীরে সুরায়ে ইয়াসীন, বিদআত ও ইজতিহাদ, জীবন্ত মসজিদ, তাসাউফ তত্ব ইত্যাদি। দেশ ও জাতির বিশিষ্ট খাদেম এ মহাপুরুষ ১৯৬৯/ ১৩৮৮ হিঃ মঙ্গলবার ২১শে জানুয়ারী নিজ গ্রামের বাড়িতে ইন্তিকাল করেন। আজীবন দ্বীনের দাওয়াতের জন্য এ সেবকের প্রতি জাতির কৃতজ্ঞতা স্বরূপ ইসলামিক ফাউন্ডেশন ১৪০৫ হিজরী সনে ইসলামিক ফাউন্ডেশন পুরস্কার (মরনোত্তর) প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

www.pathagar.com

...ানা শামছুল ...বদন

...শিষ্ট পরিচয় এই—আল্লাহ
...ানা দ্বন্দ্বহীন ভাষায় নির্দেশ
...য়াছেন : "মুসলিম জাতি!
...মরা যদি কামিয়াবী হাসিল
...তে চাও তবে (১) বিজাতীয়
...করণ পুরানুকরণ তথা
...feriority complex পরিত্যাগ
(২) সকলে খোদা ভীরু-
জীবন যাপন অভ্যাস
(৩) ইসলামী জীবন
...নকে সর্ব শ্রেষ্ঠ গৌরব মনে
...য়া ইসলামী জীবন যাপনে
...স্ত হও (৪) ব্যক্তিগত,
...ত, সর্বস্বার্থ সব জিদ বাদ
আল্লার রজ্জু অর্থাৎ আল্লাহর
...আনের নীতি এবং আল্লার
...নের আদর্শের ভিত্তিতে
...বদ্ধ হও (৫) বিচ্ছিন্ন
...ও না, একতা ভঙ্গ করিও না
আল্লার কোরআন ও
...াহর রসুলের হাদিসের Textকে
...য় শিক্ষা ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত
...া, পর প্রভাবান্বিত ব্যাখ্যা
ইসলামের নূতন এডিশান
বাদ দিয়া ; রসুলের পাক
... শত যুগত্রয়ের ব্যাখ্যাকে
... করিয়া শিক্ষা ও প্রচারের
...নে মানবীয় সুনীতিকে সমাজে

ইত্তেফাক

Monday October 18, 1965 সোমবার, ১লা কার্তিক, ১৩৭২

শক্তির উৎস কোথায় ?

।। মওলানা শামছুল হক ।। (৩)

জাতীয় শক্তির উৎস কোথায়— ! এ সম্পর্কে সঠিক নির্ণয় [illegible] ধারণা [illegible] সংস্কার অনুসরণ না করিয়া নিরাসক্ত দিক হইতে [illegible] আলোচনা বিপর্যয় আসার প্রবল আশংকা আছে। কেহ কেহ বলেন, শক্তির উৎস—ঐক্য একতা ও সংহতির মধ্যে। কেহ কেহ বলেন, শক্তির উৎস knowledge is power সূত্রে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের মধ্যে। কেহ কেহ বলেন, শক্তির উৎস ধনবল বা জনবলের মধ্যে অর্থাৎ পুঁজিপতি বা সাম্যবাদের মধ্যে। কেহ কেহ বলেন, শক্তির উৎস স্বদেশপ্রেমের মধ্যে অর্থাৎ স্বদেশভিত্তিক জাতীয়তাবাদ বা স্বাজাত্যবোধ বাদের মধ্যে। কেহ কেহ বলেন, শক্তির উৎস বড় রকমের কোন বস্তুর সহিত মিত্রতা করিতে পারিলে সেই মিত্রতার মধ্যে।

আমাদের কায়েদে আজম মরহুম বলিয়া গিয়াছেন যে, "শক্তির উৎস ঈমান (একীন) একতা ও শৃংখলার মধ্যে। আমাদের মহান নেতা কিন্তু মার্শাল

ভাষার ভিত্তিতে ? ভাষাভিত্তিক, ব্যক্তিস্বভিত্তিক, অঞ্চল ভিত্তিক [illegible] কি মূল্য আছে ? ব্যক্তি অস্থায়ী জিনিষ, ক্ষুদ্র স্বার্থের নেশায় দুই জিনিষের ভিত্তিতে একতা হওয়া শুধু তাদের দ্বারাই সম্ভব যাহারা শুধু এক ব্যক্তির নিকট কিছু হীন স্বার্থ উদ্ধার করার আশা করে, নতুবা যাহারা সত্যান্বেষী, মানব শান্তি ও মানব মুক্তিকামী, তাহারা ব্যক্তিত্বের পূজারী হইতে পারে না। দেশ বা অঞ্চল বা ভাষাভিত্তিক একতাও আরও দুর্বল। ভাষায় কি আসে যায় ! ভাষার স্থায়িত্ব কোথায় ? দেশের মাটির কি মূল্য আছে ? কাল যে মাটিতে আমার উপর অত্যাচার ও নির্যাতন হইয়াছে, আজ সেই মাটির উপরই আমি স্বাধীনতা অর্জন করিয়া ন্যায়বিচার জারী করিতেছি। আবার সেই মাটি হয়ত কালে কোনো অত্যাচারীর কবলে গিয়া নির্যাতনের লীলাভূমিতে পরিণত হইবে। অতএব

www.pathagar.com

হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরীর (রহঃ) নিজহাতে সংশোধিত মাওলানা আবদুল হাই সাহেবের খাতা

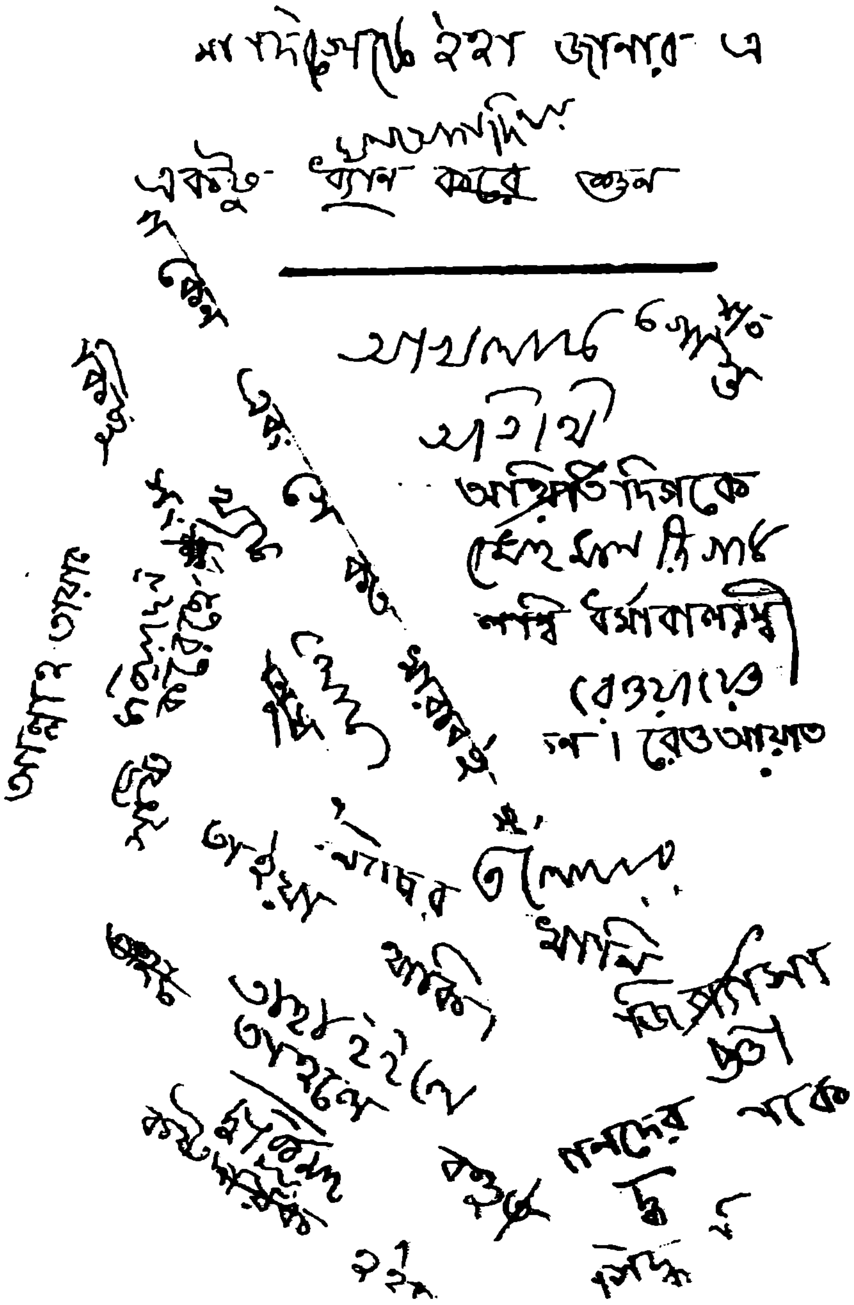

www.pathagar.com

সপ্তম অধ্যায়

হ্‌যরত ফরিদপুরীর (রহঃ) স্মরণে কয়েকটি কবিতা

www.pathagar.com

প্রকৃত ঈমান কি? দিলের খবর কেমন করিয়া হইয়া হইবে? প্রকৃত ঈমানদার তারা যারা খাঁটি ভাবে আল্লাহ্-রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, আল্লাহর নীতি ও রাসূলের আদর্শকে বিশ্বাস করিয়াছে; মানুষের মনগড়া, মানুষের রচিত কোন নীতি ও আদর্শকে বিশ্বাস করে নাই এবং আল্লাহর নীতি, আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের বানী, রাসূলের আদর্শের ভিতর বিন্দু মাত্র সন্দেহ মনে আনে নাই।

মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ)

www.pathagar.com

আলোকময়ের আলো

॥ আখতার ফারুক ॥

আলোকময়ের আলো থেকে
আলো এল বিশ্বলোকে
এ ভূলোকে,
ঝলকানিতে আঁধার গেহে
জ্বললো প্রদীপ দেহে দেহে
সর্বলোকে।
কোথায় সুদূর গহরডাঙ্গা
তার আলোকে জগত রাঙ্গা
সে বাঁধ ভাঙ্গা,
আলোর জোয়ার চলল ছুটে
বাধার আঁধার প্রাচীর টুটে
নিখিল চাঙ্গা।
ব্রাহ্মণবাড়িয়া খুলনা হয়ে
আলোর বন্যা এল ধেয়ে
ফরিদাবাদ,
লালবাগ আর বড় কাটারা
আলোর হল ভাগ-বাটারা
ঢাকা আবাদ।
আলোর থেকে আলো পেয়ে
আলোর দীপে গেল ছেয়ে
সারাটি দেশ,
যেখান থেকে আলো এল
আবার তথায় ফিরে গেল
সব হল শেষ।
ন্যায়ের রবি ডুবল বটে
রবির আলো যায়নি ফেটে
রেশ তো বাকি,
সেই রেশেরই আঁচল ধরে
পথ হারারা পথের পরে
চলতে থাকি।

www.pathagar.com

হযরত ফরিদপুরী (রহঃ) স্মরণে

॥ খন্দকার ওমর আহমাদ ॥

যে জীবনে ছিল মর্ম বেদনা জাতির সেবার লাগি,
আজীবন তাঁকে অশ্রু বহাতে দেখেছি নিশীথে জাগি।
দর্‌দর্‌ ধারে অশ্রু বহায়ে বক্ষ-বসনটিরে,
ভিজায়ে রাখিতে দেখেছি নিয়ত ধীরে সে অতীব ধীরে।
কুরআনের বাণী-নবীর আদর্শ জিন্দা রাখিতে তিনি,
জীবন ভরিয়া সকল স্বার্থ দিয়েছেন কুরবানী।
দেশে কি বিদেশে যেখানে যখন ঘটেছে পদার্পণ,
সেখানেই তিনি করেছেন দ্বীনি কেন্দ্র স্থাপন।
গওহারডাঙ্গা, লালবাগ ছাড়া হাজারো প্রতিষ্ঠান,
তাঁহার হাতের-ই গড়া সে স্মৃতি আজিও বিদ্যমান।
মুসলিম জাতি শির উঁচু করি কেমনে দাঁড়াতে পারে,
তার তরে তিনি শতাধিক বই লিখেছেন একাধারে।
স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত তাঁহার ছাত্র জীবনের আলো,
আজিও সে স্মৃতি বহন করিয়া রহিয়াছে ঝলমলো।
কঠিনের কাছে এমন-ই কঠোর ছিল সে জীবন ধারা,
রাষ্ট্র শক্তি নিয়েও কখনও টলাতে পারেনি তারা।
ছোটদের কাছে অতীব কোমল কমল দেখেছি তাঁকে,
তখন ভেবেছি এমনও মানুষ বিশ্বভুবনে থাকে ?
আমাদের কাছে পেয়েও আমরা চিনতে পারিনি তায়,
চিনেছে তাঁহাকে আরব-আজম-উলামা সম্প্রদায়।
জাতির সামনে যখন যে কোন সমস্যা হলো খাড়া,
সমাধান তার হয়নি কখনো এ মহাপুরুষ ছাড়া।
ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব শাহীও টলাতে পারেনি তাঁরে,
ন্যায় প্রতিষ্ঠায় রয়েছেন তিনি পর্বত সমভারে।
আলিম দেখেছি পীরও দেখেছি নামে বুজর্গ কত,
তাঁহার সামনে আসিলে সকলে হয়ে গেছে অবনত।
তিনি যে কোমল পরশ মানিক কাছে পেয়ে চিনি নাই,
লোহাকে বানায়ে স্বর্ণ মানিক নিজেকে দিলে না ঠাঁই।
অন্ধ নয়নে জ্যোতি করে দান পথ হারা জনতারে,
মহামানবের মহাদরবারে তুলেছেন সবাকারে।
থানভী হইতে এনেছিলে তুমি যে সব রত্ন খনি,
যথা হ'তে আজ জন্ম নিচ্ছে হাজারো মুক্তামণি।
আল্লাহ প্রেমিক, আল্লাহকে পেয়ে পড়েছ তার কালাম,
ভুলোনা মোদেরে হে মহামানব লও মোদের ছালাম।

www.pathagar.com

বিপ্লব সূর্য

॥ যুল হাসানাইন ॥

নীরব নিভৃতে কাঁদে ব্যথাতুর,
দৃষ্টি তার ছায়াপথে- নীল নভে
যাত্রী সে অনন্ত পথের যাবে বহুদূর।
স্বর্ণ ফসলে তার শিখা লেলিহান,
মূঢ়তার অভিশাপে রুদ্ধতার
আত্ম উদ্বোধন, বিস্মৃতির শিকার,
পশ্চাত ধাবনে দেখে চাঁদ দ্বিতীয়ার,
সিরাজাম মুনীরা তাই হয় ম্রিয়মান।

সোনালী স্বপ্ন ছিল, সে হবে অমর,
এ ফসল নিয়ে যাবে তারে দীপ্তিমান সভ্যতার দ্বারে
হায়েনাদের রক্তে হবে লোহিত সাগর।
কিন্তু প্রয়োগ-প্রজ্ঞার দুঃসহ পতন
সিরাজী তত্ত্বে আনে বিপর্যয়,
বিশ্বে হয় হাহাকার, ঘটে অবক্ষয়,
যাত্রী ভাবেঃ কোথা সে রতন?

শোন যাত্রী, শামছুল হক, অব্যর্থ সাধনা তোমার,
সত্যের সূর্য তুমি মুক্ত করা ছিল তাই দ্যুলোকের দ্বার
নিরবে সূচিত করে বিপ্লবের মহা আলোড়ন
মাহবুবের ক্রোড়ে তুমি নিলে অবস্থান
চেয়ে দেখ আজ : তব ফসলের অনুপ্রাণিত যারা
মরেও মরেনি, সম্বিত পেয়েছে আজ
তোমারি সংগ্রামে লভি, রণ সাজ,
ছিনিয়ে বিপ্লব সূর্য আনবেই তারা।

খোদায়ী সভ্যতায় হবে মহা আলোড়ন,
শান্তির রাজ্যে হবে নব জাগরণ।

www.pathagar.com

দানবীর হে শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ)

॥ এম, এ, জলিল ॥

ইহলোক থেকে পরলোকে
সালাম জানাই তোমাকে
বাংলার নববী দূত, পথের দিশারী
হে শামছুল হক।

এ দুনিয়া থেকে তুমি কি গিয়েছ?
যাওনি এখনো
যাবেনা কখনো
কেবল দেহ নিয়ে গেছো।

লক্ষ কোটি ভক্ত অনুরক্ত
মুসলিম মানুষের চিন্তা ও চেতনায়
নীরব তুমি স্থায়ী হয়ে বসে আছো।

তোমার কলমের কালি এত অফুরন্ত
যা কাগজ ও মানুষের হৃদয়ে
লিখে গেছে ধর্মের যত আদি অন্ত।

রূহ জগতের কোকিল কণ্ঠ তুমি
দান করেছ এই বাংলার
মাটি ও মানুষকে অকুণ্ঠ।

তোমার স্মরণে, আলেমকুল শিরোমণি
রাসূলের উম্মত,
গর্বে ভরে উঠে কবি হিম্মত।
তুমি সত্যিকার নায়েবে নবী
তোমার গুণগান করে বাংলার অনেক কবি।
তাই আজি আমিও তোমার স্মরণে
পরলোকে সালাম পাঠাই
দানবীর হে শামছুল হক ফরিদপুরী।

www.pathagar.com

লেখক পরিচিতি

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল করিম

মুহাম্মদ আবদুল করিম, পিতা মোঃ বাহাদুর গাজী সাতক্ষীরা জেলার কালীগঞ্জ থানাধীন নলতা গ্রামে ১৯৬৭ সালের ২০ মে জন্মগ্রহণ করেন।

শিক্ষাজীবন: তিনি ১৯৮৩ সালে নলতা হাই স্কুল থেকে এস.এস.সি পাশ করেন। অতঃপর ১৯৮৭ সালে ঝাউডাঙ্গা সিনিয়র মাদ্রাসা থেকে আলিম এবং ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয় থেকে বিএ অনার্স এমএ প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। ফাযিল ও কামিল (ডবল) মাদ্রাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা এবং মাদ্রাসা দারুর রাশাদ থেকে দাওরায়ে হাদীসের সনদ লাভ করেন।

কর্মজীবন: বিক্রমপুর-টঙ্গীবাড়ীর ধীপুর সিনিয়র মাদ্রাসায় অধ্যাপনার মাধ্যমে তিনি কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। সেখানে ২বছর উপাধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করার পর নবাব গঞ্জের সোনা হাজরা ফাযিল মাদ্রাসায় ২বছর শিক্ষকতা করেন। বর্তমানে তিনি ঢাকার মিরপুর-১ইং সেকশনের হযরত শাহ্ আলী বাগদাদী (রহঃ) ফাযিল মাদ্রাসায় অধ্যাপনার কাজে নিয়োজিত।

রচনাবলী: (১) ইসলামে মাতৃভাষা চর্চার গুরুত্ব (প্রবন্ধ), (২) সমবেদনা (প্রবন্ধ) , (৩) আরবী সাহিত্য সেবক আল্লামা আব্দুর রহমান কাশগরী (রহঃ), (৪) হাদীস সংকলনের পরিভাষা (পুস্তিকা), (৫) মাদ্রাসা শিক্ষা নির্দেশিকা, (৬) হিজবুল আ'জম (অনুবাদ), (৭) সহজ রওজাতুল আদব (অনুঃ) ইত্যাদি।

মাওলানা মোহাম্মাদুল্লাহ হাফেজ্জী হুযুর (রহঃ)

মোহাম্মাদুল্লাহ হাফেজ্জী হুযুর ১৩১৩ হিজরী নোয়াখালী জেলার রায়পুর থানার লুধুয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মুনশী ইদ্রিস আলী।

শিক্ষাজীবন: নিজ এলাকায় প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করার পর লক্ষ্মীপুরের খিলবাইছা মাদ্রাসায় ভর্তি হন। সেখানে ৩ বছর লেখাপড়া করেন। এর পরে এলমে ক্বেরাত শিক্ষার জন্য পানিপথের বিখ্যাত ক্বারী আব্দুস সালাম সাহেবের মাদ্রাসায় ভর্তি হন এবং সেখান থেকে হেফজ শেষ করেন। উক্ত মাদ্রাসায় হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ)এর সাথে তাঁর পরিচয় হয়। তারপর তিনি হযরত থানভী (রহঃ)এর পরামর্শে সাহারানপুর

www.pathagar.com

মাদ্রাসায় ভর্তি হন। সাহারানপুর থেকে দাওরায়ে হাদীস পাশ করার পর তিনি পুনরায় দেওবন্দে দাওরায়ে হাদীস পড়েন। হিন্দুস্তানে থাকা কালীন সময় হযরত থানভী (রহঃ)-এর সাথে তাঁর সব সময় যোগাযোগ ছিল। পরবর্তীতে তিনি হযরত থানভী (রহঃ)-এর আনুষ্ঠানিক খেলাফতও লাভ করেছিলেন।

কর্ম জীবন: দেশে ফিরে তিনি মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ)-এর সাথে ব্রাহ্মণবাড়িয়া, গজালিয়া, বড় কাটারা, লালবাগ প্রভৃতি মাদ্রাসায় দরস তাদরিসের মধ্যে লিপ্ত ছিলেন। বড় কাটারা, ফরিদাবাদ এবং লালবাগ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠায় তিনি হযরত ফরিদপুরী (রহঃ)-এর সাথে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। লালবাগ মাদ্রাসায় থাকা কালীন সময় তিনি কামরাঙ্গীর চরে মাদ্রাসা নূরীয়া নামে একটি বিখ্যাত মাদ্রাসা স্থাপন করেন। হযরত হাফেজ্জী হুযুরের ইচ্ছা ছিল মাদ্রাসায়ে নূরীয়াকে একটি ইসলামী বিশ্ব বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করবেন।

দাওয়াত এবং ইসলাহের কাজে তিনি আজীবন সোচ্চার ছিলেন। মাদ্রাসা নূরীয়ায় তিনি তরবিয়তুল মোদাররেসীন, তরবিয়তুস সালেহীন সহ বিভিন্ন প্রোগ্রাম চালু করেছিলেন। শেষ বয়সে হযরত হাফেজ্জী হুযুর (রহঃ) এদেশের মানুষের মধ্যে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ রূপ কায়েম করার জন্য ১৯৮১ সালে রাজনীতির ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেন। এরপরে তিনি খেলাফত আন্দোলন নামে একটি ইসলামী রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করেন।

হযরত হাফেজ্জী হুযুর (রহঃ) ১৪০৭ হিজরীর ৮ই রমজান ইন্তেকাল করেন।

শায়খুল হাদীস মাওলানা আজিজুল হক

মাওলানা আজিজুল হক ১৯১৩ইং সালের ১লা মার্চ বাংলা ১৩২০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মরহুম হাজী এরশাদ আলী।

শিক্ষাজীবন: তিনি জামেয়া হোসাইনিয়া আশরাফুল উলুম বড় কাটারা থেকে দাওরায়ে হাদীস পাশ করেন। জামেয়া ইসলামিয়া ডাভেল, ভারত এবং জামেয়া ইসলামিয়া দারুল উলুম দেওবন্দ, ভারত থেকে যথাক্রমে হাদীস ও তফসীরে উচ্চ ডিগ্রী লাভ করেন।

কর্মজীবন: সাবেক মুহাদ্দেস জামেয়া হোসাইনিয়া আশরাফুল উলুম বড় কাটারা। সাবেক শাইখুল হাদীস জামেয়া কুরআনিয়া লালবাগ। সাবেক শাইখুল হাদীস মাহমুদীয়া মাদ্রাসা, বরিশাল। সাবেক শাইখুল হাদীস জামেয়া মুহাম্মদিয়া

www.pathagar.com

আরাবিয়া মোহাম্মদপুর। প্রাক্তন অধ্যাপক ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। বর্তমান শাইখ, প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপ্যাল ও শাইখুল হাদীস জামেয়া রহমানিয়া আরাবিয়া, মোহাম্মদপুর, ঢাকা। এছাড়া তিনি সাবেক শায়খুল হাদীস জামেয়া শরইয়্যা মালিবাগ, জামেয়া নুরীয়া টঙ্গী, দারুস সালাম, মিরপুর, জামেউল উলূম মিরপুর মাদ্রাসা সমূহে শাইখুল হাদীস এর দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি আজিমপুর স্টেট জামে মসজিদের খতিব, আমীর বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস এবং ইসলামী ঐক্য জোটের চেয়ারম্যান।

রচনাবলী: পূর্ণাঙ্গ বুখারী শরীফের বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা এবং হাদীসের ছয় কিতাবের অনুবাদ।

হাফেয মাওলানা মুহাম্মদ ওমর

মুহাম্মদ ওমর ১৯৫০ সালে গোপালগঞ্জ জেলার টুংগীপাড়া থানার গওহার ডাংগা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ)।

শিক্ষা জীবনঃ গওহার ডাংগা মাদ্রাসার মক্তব বিভাগে ক্বারী আব্দুস সামাদ সাহেবের কাছে মুহাম্মদ ওমর সাহেবের নাযেরা কোরআন শিক্ষা শুরু হয়। এর পর তিনি গওহার ডাংগা মাদ্রাসার হেফয খানায় জনাব হাফেয আব্দুল হক সাহেবের কাছে হিফয শেষ করেন। হিফয শেষ করার পরে তাঁর পিতা হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ)এর কাছে কিছু প্রাথমিক উর্দূ ও আরবী কিতাব পত্র পড়েন। এরপর ১৯৬৯ সালে তিনি এস.এস.সি পাশ করেন। এরপর লালবাগ মাদ্রাসায় ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। শরহে বেকায়া পর্যন্ত পড়ার পর ১৯৭৭ সালে তিনি করাচী গমন করেন এবং সেখানকার বিভিন্ন মাদ্রাসায় পড়াশোনা করার পর জামেয়া সিদ্দীকীয়া থেকে দাওরায়ে হাদীস পাশ করেন।

কর্মজীবন: ১৯৮৩ সনে তিনি দেশে ফিরে আসেন এবং তাঁর পিতা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত গওহারডাঙ্গা মাদ্রাসা ও খাদেমুল ইসলাম জামাতের একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব হিসাবে খেদমত আঞ্জাম দিয়ে আসছেন। করাচী অবস্থান কালেই তিনি আয়েশা মঞ্জিল, নিউ করাচী ও জিয়াউল হক কলোনীতে মসজিদ মাদ্রাসা স্থাপনে এবং খাদেমুল ইসলাম জামাতের কাজ ত্বরান্বিত করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। করাচী অবস্থান কালে উপমহাদেশের প্রখ্যাত বুযুর্গ হযরত মাওলানা হাকীম মুহাম্মদ আক্তারের সাথে তাঁর আধ্যাত্মিক সম্পর্ক কায়েম হয় এবং হযরত মাওলানা তাঁকে খেলাফতও দান করেন।

www.pathagar.com

হযরত মাওলানা হাফেজ মুহাম্মদ ওমর সাহেব বর্তমানে গওহারডাঙ্গা মাদ্রাসার ও খাদেমুল ইসলাম জামাতের আমীর। জামাতের মিশনকে বাংলাদেশের আনাচে কানাচে প্রচার ও প্রসার করার কাজে ব্যস্ত আছেন। এছাড়া তিনি তাঁর আব্বাজানের লিখিত বই-পত্র প্রকাশনার কাজে তৎপর আছেন।

অধ্যাপক আবদুল গফুর

আবদুল গফুর সাহেব ১৯১৯ সালের ২ ফেব্রুয়ারী রাজবাড়ী জেলার দাদপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ফরিদপুরে কলেজ পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন এবং ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয় থেকে সমাজ কল্যাণ বিষয়ে এম.এ পাশ করেন।

কর্মজীবন ঃ (ক) সাংবাদিকতা- ১। সাবেক সম্পাদক সাপ্তাহিক সৈনিক, ২। সাবেক সহকারী সম্পাদক দৈনিক নাজাত এবং দৈনিক দেশ, ডেইলি পিউপল ৩। সাবেক বার্তা সম্পাদক দৈনিক আজাদ, ৪। ফিচার সম্পাদক দৈনিক ইনকিলাব।

(খ) অধ্যাপনা- ১। রাজেন্দ্র কলেজ ফরিদপুর, ২। আবুজর গিফারী কলেজ, ঢাকা। (গ) অন্যান্য চাকরী- ১। সাবেক সমাজ কল্যাণ অফিসার, পূর্ব পাকিস্তান সরকার। ২। সাবেক প্রকাশনা পরিচালক ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ। ৩। সাধারণ সম্পাদক তামাদ্দুন মজলিশ।

বর্তমানে তিনি দৈনিক ইনকিলাবের ফিচার সম্পাদক।

রচনাবলী ঃ ইসলামী সাহিত্য সাংবাদিকতা বিষয়ক প্রায় ২০খানি পুস্তক একং সমাজ কল্যাণ বিযয়ে ডিগ্রী ও এইচ.এস.সি ক্লাসের বাংলা ওইংরেজী পাঠ্য পুস্তক।

মাওলানা সিদ্দীকুর রহমান

সিদ্দীকুর রহমান ১৯৪৪ সনে বাগের হাট জেলার কুদালিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জামেয়া কুরআনিয়া আরাবিয়া লালবাগ থেকে দাওরায়ে হাদীস এবং জামেয়া আশরাফিয়া লাহোর থেকে আত-তাখাসুসু ফিল-ফিকহ্ সম্পন্ন করেন। তিনি করাচী ইউনিভার্সিটি থেকে অর্থনীতিতে বিএ (অনার্স) এমএ ডিগ্রী লাভ করেন।

কর্মজীবন: তিনি উস্তাজুল হাদীস ও নাযেমে তা'লীমাত হিসেবে দারুল উলুম খাদেমুল ইসলাম গওহারডাঙ্গায় কর্ম জীবন শুরু করেন। অতঃপর গওহারডাঙ্গা মাদ্রাসা কেন্দ্রিক কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের মহাসচিব নিযুক্ত

www.pathagar.com

হন। জামেয়া আরাবিয়া ফরিদাবাদ ও মাদ্রাসা-ই-নূরীয়া আশরাফাবাদ, ঢাকা-এর উস্তাযুল হাদীস হিসেবে অধ্যাপনা করেন। সর্বোচ্চ উলামা পরিষদ বাংলাদেশের সাংগঠনিক সম্পাদক ছিলেন।

বর্তমান অবস্থা: সিনিয়র মুহাদ্দিস মাদ্রাসা দারুর রাশাদ ও জামেয়া সিদ্দীকিয়া দারুস সালাম ঢাকা এবং পরিচালক মাদ্রাসা ইসলামিয়া আরাবিয়া, বলিয়ারপুর, সাভার।

রচনাবলী: ইসলামী পুনর্জাগরণে দারুল উলূম দেওবন্দ, ইসলামের সম্পদ বন্টন ব্যবস্থা, মেশকাত শরীফ (অনুবাদ), জালালাইন শরীফ শেষ পাঁচ পারা (অনুবাদ), আলিম সমাজের বিপ্লবী ঐতিহ্য (অনুবাদ), তাফসীরে মাজহারী ষষ্ঠ খন্ড ও সূরা আনফাল, তফসীরে ইবনে কাসীর ৩য়খন্ড ও ৪র্থখন্ড সূরা ইয়াসীন পর্যন্ত (অনুবাদ), ইসলাহুন নিসওয়ান (অনুবাদ) ইত্যাদি।

মাওলানা তাকী উসমানী

মাওলানা তাকী উসমানী ১৩৬২ হিজরী ৫ই শাওয়াল মোতাবেক ১৯৪৩ সালের অক্টোবর মাসে ভারতের উত্তর প্রদেশের সাহারানপুর জেলার দেওবন্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মাওলানা মুফতী মোহাম্মদ শফী (রহঃ)।

শিক্ষা জীবন: প্রাথমিক শিক্ষা দেওবন্দেই সম্পন্ন করেন। অতঃপর ৭/৮ বছর বয়সে তার পিতার সাথে পাকিস্তানের করাচীতে হিজরত করেন। ১৯৬০ সালে তিনি দারুল উলূম করাচী থেকে দাওরায়ে হাদীস সম্পন্ন করেন। ১৯৫৮ সালে তিনি পাঞ্জাব বোর্ড থেকে আরবী সাহিত্যে কৃতিত্বের সাথে বিশেষ ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৬৪ সালে করাচী ইউনিভার্সিটি থেকে বিএ এবং ১৯৬৭ সালে ঐ একই প্রতিষ্ঠান থেকে এল.এল.বি পাশ করেন। ১৯৭০ সালে পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি থেকে আরবী সাহিত্যে এম.এ ডিগ্রী লাভ করেন।

কর্মজীবন : হাদীস ও ফিকাহ ছাড়াও ১৯৬০ সাল থেকে এ পর্যন্ত দারুল উলূম করাচীতে ইসলামী জ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে অধ্যাপনা করে আসছেন। ১৯৬৭ সাল থেকে মাসিক আল-বালাগ পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছাড়াও ১৯৮৯ সাল থেকে মাসিকইংরেজী আল-বালাগের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদকের দ্বায়িত্ব পালন করে আসছেন। ১৯৭৬ সাল থেকে তিনি দারুল উলূম করাচীর নায়েবে মুহতামিমের দ্বায়িত্ব পালন করে আসছেন। দারুল উলূম করাচীর তাসনীফ ও তা'লীফ বিভাগের বিভাগীয় তত্ত্বাবধায়ক। জজ, শরয়ী আপীল বেন্চ, সুপ্রিমকোর্ট পাকিস্তান। সদস্য, ইসলামী ফেকাহ বোর্ড, জেদ্দা। অর্থনীতি এবং

www.pathagar.com

ব্যাংকিং সেক্টরে উল্লেখযোগ্য খেদমত আঞ্জাম দেওয়ার কারণে ইসলামী বিশ্বের বিভিন্ন ব্যাংকে সুপারভাইজারী বোর্ডের মধ্যে তাঁকে রাখা হয়েছে। তিনি করাচী ইউনিভার্সিটির সিন্ডিকেটেরও সদস্য।

রচনাবলী: উপমহাদেশের স্বনামধন্য ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা তাকী উসমানী একজন বিশিষ্ট লেখক। আরবী উর্দূ এবংইংরেজী ভাষায় তাঁর প্রায় অর্ধ শতাধিক মৌলিক গ্রন্থ রয়েছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলী হচ্ছে– (১) তাকমিলায়ে ফতহুল মুলহীম, (২) দরসে তিরমিযী, (৩) জাহানে দীদা, (৪) ইসলামী মায়ীশাত, (৫) ইসলাহী খুতুবাত ইত্যাদি।

মাওলানা আবদুল লতীফ মাহমুদী

আবদূল লতীফ মাহমুদী বরিশাল জেলার উজিরপুর থানার উজিরপুর গ্রামে ১৫ই জুলাই ১৯৩৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মৌলবী আবদুর রশীদ। তিনি বরিশাল মাহ্মুদিয়া মাদ্রাসার মক্তবে প্রাথমিক বাংলা পড়াশুনা করেন। প্রাথমিক আরবী শিক্ষাও জামেয়া ইসলামিয়া মাহমুদিয়া মাদরাসায় করেন। মাধ্যমিক ২ জামাত বড় কাটারা আশরাফুল উলূম মাদরাসায় অধ্যয়ন করেন। শেযে ৩ বছর লালবাগ জামেয়া কোরআনিয়া মাদরাসায় লেখাপড়া করেন। ১৯৬৬ সনে উক্ত জামেয়া হতে ফারেগ হন।

কর্মজীবন: লেখাপড়া সমাপ্ত করে জামেয়া ইসলামিয়া মাহমুদিয়া মাদরাসার মুদাররিস পদে নিযুক্ত হন। বোখারী শরীফ ২য় খণ্ড, মুসলিম শরীফ ২য় খণ্ড, আবু দাউদ, শামায়েলে তিরমিযী, হেদায়াহ ও অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়ে সুনামের সাথে দরস দিচ্ছেন।

মাসিক মদীনা, সাপ্তাহিক মুসলিম জাহান, দৈনিক ইনকিলাব, বরিশাল হতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক খাদেম, দৈনিক পল্লী অঞ্চল, দৈনিক আজকের বার্তা প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়েছে। তিনি তাফসীরে মাআরিফুল কোরআনের বাংলা অনুবাদের ২য় ও ৪র্থ খণ্ডের অনুবাদে অংশ গ্রহণ করেন।

তিনি মুক্তিযুদ্ধের একজন সংগঠক ছিলেন। সেক্টর কমান্ডার মরহুম এম.এ. জলিল তাঁরর মামা ছিলেন। তিনি কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড গঠনে সক্রিয় সহযোগিতা করেন এবং প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে বোর্ডের একজন পরীক্ষক।

বরিশালে ইসলামী যে কোন আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। বর্তমানে তিনি বরিশাল বিভাগীয় মাদ্রাসা, মসজিদ খানকাহ্ ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক।

www.pathagar.com

মাওলানা মুহাম্মদ আমিনুল ইসলাম

মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম ১৯৩২ সালে কুমিল্লা জিলার বরুরা থানাস্থ বাঘমারা মিয়া বাড়ীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম- আলহাজ্জ মৌলভী মোহাম্মদ আলী মিয়া।

শিক্ষা জীবন: নিজ এলাকা রহমতগঞ্জ মাদ্রাসায় তিনি প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন । ১৯৫৫ সালে ঢাকা আলীয়া মাদ্রাসা থেকে কামিল পরীক্ষায় সম্মিলিত মেধা তালিকায় তিনি পঞ্চম স্থান অধিকার করেন। সরকারী বৃত্তি পেয়ে পরবর্তী দু'বছর তিনি হাদীস শাস্ত্রে গবেষণা করেন।

তফসীর ও হাদীস শরীফে তিনি যাদের নিকট শিক্ষা লাভ করেন, তন্মধ্যে উপমহাদেশের দু'জন বিখ্যাত আলেমের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে– হযরত মাওলানা জাফর আহমদ ওসমানী (রহঃ) এবং হযরত মাওলানা মুফতী আমীমুল এহসান (রহঃ)।

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শেষে তিনি দেশ-বিদেশে ইসলামের প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন এবং অল্প দিনের মধ্যেই আর্ন্তজাতিক খ্যাতি অর্জন করেন। ১৯৬৪ সালে তিনি প্রথম হজ্জ সুসম্পন্ন করেন। ১৯৭৯ সালে বাংলাদেশ সরকারের প্রেরিত উলামা ডেলিগেশনের নেতা হিসেবে তিনি ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়া সফর করেছেন। তিনি ইতিমধ্যে ৪০ খানারও অধিক গ্রন্থ রচনা করেন, তাঁর 'বিশ্ব সভ্যতায় পবিত্র কোরআনের অবদান' শীর্ষক গ্রন্থখানি তিনটি জাতীয় পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে।

বাংলা ভাষায় পবিত্র কোরআনের মৌলিক ও বিস্তারিত তফসীর গ্রন্থ প্রণয়নে তাঁর দীর্ঘ প্রায় দু'যুগের নিরলস সাধনা অবশেষে পূর্ণতা লাভ করেছে। তাঁর রচিত 'তফসীরে নূরুল কোরআন' এর সর্বশেষ (৩০তম) খন্ড সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে।

তিনি বাংলা ভাষায় ইসলামী গ্রন্থ রচনায় যেমন তৎপর রয়েছেন, তেমনি ইসলামের প্রচার-প্রসারেও নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন। বাংলা ভাষা ছাড়াও তিনি উর্দু ও আরবীতে বক্তৃতা করেন। এ ছাড়াও তিনি লালবাগ শাহী মসজিদের ইমাম ও খতীব, মাসিক আল বালাগ পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশিত গ্রন্থ রিভিয়্যু কমিটির চেয়ারম্যান, তফসীরে তাবারী অনুবাদ ও সম্পাদনা কামিটির সভাপতি, বোখারী শরীফ অনুবাদ ও সম্পাদনা কমিটির সভাপতি, আল বারাকা ব্যাংক লিঃ এর শরীয়া বোর্ডের চেয়ারম্যান, আল-নাহিয়ান ট্রাষ্টি বোর্ডের সদস্য সহ বহু মাদ্রাসা, মসজিদ ও সমাজ সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত রয়েছেন।

www.pathagar.com

তিনি রেডিও'র ঢাকা কেন্দ্র থেকে ৪৩ বছর ধরে নিয়মিত পবিত্র কোরআনের তফসীর বর্ণনা করেন। তিনি দ্বীন ইসলামের প্রচারের কর্মসূচী নিয়ে বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন সহ পৃথিবীর বহু দেশ সফর করেছেন। তিনি তাঁর মৌলিক রচনার জন্যে 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ পুরস্কারে' (১৯৮৯) সম্মানিত হয়েছেন।

ইসলামের সেবায় নিবেদিত বিশ্বের যে তেরজন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদকে (১৪১৩হিঃ) ১২ই রবিউল আউয়াল উপলক্ষে আয়োজিত একটি আর্ন্তজাতিক সম্মেলনে মিশরের প্রেসিডেন্ট স্বর্ণ পদক (ফার্ষ্ট গ্রেড) প্রদান করেন, তিনিও ছিলেন তাঁদের অন্যতম।

রচনাবলী: তাফসীরে নূরুল কোরআন (৩০ খন্ডে সমাপ্ত পবিত্র কোরআনের পূর্ণাঙ্গ তাফসীর), (২) পবিত্র কোরআনের দর্পণে মানব জীবন, (৩) বিশ্ব সভ্যতায় পবিত্র কোরআনের অবদান, (৪) বিশ্ব সভ্যতায় মহানবী (সাঃ)এর অবদান, (৫) দালায়েলুল খায়রাত, (৬) আউলিয়ায়ে কেরামের জীবন-ধারা, (৭) যুগ সমস্যার সমাধানে পবিত্র কোরআন, (৮) পবিত্র কোরআনের মর্মকথা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

মুফতী ফজলুল হক আমিনী

মুফতী ফজলুল হক আমিনী ১৯৪৫ইং সনের ১৫ই নভেম্বর ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার আমীনপুর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার আলহাজ্ব মরহুম ওয়ায়েজ উদ্দীন

শিক্ষা জীবন: ব্রাহ্মণবাড়িয়া জামেয়া ইউনুসিয়ায় প্রাথমিক শিক্ষা শেষে তিনি মুন্সীগঞ্জ জেলাধীন বিক্রমপুরের মোস্তফাগঞ্জ মাদ্রাসায় তিন বছর পড়াশোনা করেন। তারপর উচ্চশিক্ষা অর্জনের লক্ষ্যে ১৯৬১ইং সনে রাজধানী ঢাকার ঐতিহ্যবাহী দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান লালবাগ জামেয়ায় চলে আসেন। এখানে তিনি হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ) ও হযরত হাফেজ্জী হুযুর (রহঃ) এর বিশেষ তত্ত্বাবধানে ইসলামী শিক্ষার সর্বোচ্চ স্তর দাওরায়ে হাদীস সনদ লাভ করেন।

১৯৬৯ইং সনে আল্লামা ইউসুফ বিন নূরী (রহঃ) এর কাছে হাদীস ও ফেকাহর উপর উচ্চতর ডিগ্রী অর্জনের উদ্দেশ্যে পাকিস্তান করাচী নিউটাউন মাদ্রাসায় গমন করেন। এখানে তিনি ইসলামী শিক্ষার উপর বিশেষ ডিগ্রী অর্জন করে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

www.pathagar.com

কর্মজীবন: ১৯৭০ইং সনে মাদ্রাসা-ই-নূরীয়া কামরাঙ্গীরচরের শিক্ষক হিসেবে যোগদান করে দ্বীনি খেদমত শুরু করেন। এ বছরই তিনি হাফেজ্জী হুযুর (রহঃ)-এর কন্যার সাথে বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হন। ১৯৭২ইং সনে মাত্র ৯ মাসে তিনি সম্পূর্ণ কালামে পাক হেফয করেন। এ সময় তিনি ঢাকার আলু বাজারে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। একই সাথে আলু বাজার মসজিদের খতিবের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৫ইং সনে তিনি জামেয়া কোরআনিয়া আরাবিয়া লালবাগ মাদ্রাসার উস্তাদ ও সহকারী মুফতী হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৮৬ সনে তিনি লালবাগ মাদ্রাসার ভাইস প্রিন্সিপাল ও প্রধান মুফতীর দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। ১৯৮৭ সনে হাফেজ্জী হুযুর (রহঃ)-এর ইন্তেকালের পর থেকে তিনি লালবাগ জামেয়ার প্রিন্সিপাল ও শাইখুল হাদীসের মহান দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে আসছেন।

মুফতী আমিনী হযরত হাফেজ্জী হুযুর (রহঃ)-এর 'মুজাযে সুহবত' এবং পরবর্তীতে তাকে হযরত হাফেজ্জী হুযুর (রহঃ)-এর অন্যতম খলীফা হযরত মাওলানা আব্দুল কবীর সাহেব সহ হাফেজ্জী হুযুরের আরো কয়েকজন বিশিষ্ট খলীফা বাইয়াত করার অনুমতি প্রদান করেন।

রাজনীতিতে রয়েছে মুফতী আমিনীর সরব পদচারনা। ১৯৮১সালে খেলাফত আন্দোলন গঠিত হলে তিনি মনোনীত হন এ সংগঠনের অন্যতম নায়েবে আমীর এবং সেক্রেটারী জেনারেল। হাফেজ্জী হুযুরের ইন্তেকালের পর তিনি দেশে অধিকাংশ ইসলামী আন্দোলনের নেতৃপুরুষের ভূমিকা পালন করে আসছেন। বাবরী মসজিদ লংমার্চ সহ নাস্তিক-মুরতাদ বিরোধী সকল আন্দোলনের তিনি ছিলেন অন্যতম সংগঠক। বর্তমানে তিনি উলামা কমিটি বাংলাদেশের চেয়ারম্যান, ইসলামী মোর্চা বাংলাদেশ ও ইসলামী ঐক্যজোটের মহাসচিব।

বেশ কয়েকবার হজ্জ-ওমরা পালন সহ তিনি লন্ডন, সিরিয়া, ভারত, কুয়েত ও পাকিস্তান সফর করেছেন। ইরাক-ইরান ভ্রাতৃঘাতি যুদ্ধ বন্ধে ১৯৮৪ইং সনে তিনি হযরত হাফেজ্জী হুযুরের শান্তি মিশনের অন্যতম সদস্য ছিলেন।

রচনাবলী: (১) ফাতাওয়ায়ে জামেয়া, (২) দরসুল বুখারী ফি সালাফিনাল আকাবির, (৩) সালফ ও আকাবির কা তরীকে মোতালায়া, (৪) কারবালার শিক্ষা, (৫) উলামায়ে দেওবন্দের জিহাদী ভূমিকা, (৬) আমর বিল মারূফ নাহী আনিল মুনকার, (৭) ইসলামী আইন বনাম মানব রচিত আইন।

www.pathagar.com

মাওলানা কাজী মুতাসিম বিল্লাহ

কাজী মুতাসিম বিল্লাহ ১৯৩৩ সালের ১লা আগষ্ট মোতাবেক ১৩৪০ সনের ১৬ই শ্রাবণ যশোর জেলার জমজমপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আলহাজ্জ্ব কাজী সাখাওয়াত হোসেন। দাদা মাওলানা কাজী আব্দুল ওয়াহেদ ফুরফুরার একজন খলীফা ছিলেন। মাগুরার বিখ্যাত পীর শাহসুফী খন্দকার আব্দুল হামীদ (রহঃ) এর ৩য় কন্যা মোসাম্মাত খাদিজা খাতুনের সঙ্গে তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।

শিক্ষা জীবন: প্রাথমিক শিক্ষা নিজ গ্রামের মক্তবে ও প্রাথমিক স্কুলে পড়াশোনা করেন। এর পর দাখেল আলেম পড়েন নাই। ফাযিল যশোর লাউড়ি মাদ্রাসা থেকে ফাযিল পাশ করেন। অতঃপর দারুল উলুম দেওবন্দে ৪বছর পড়াশোনা করেন। এখান থেকে তিনি দাওরায়ে হাদীসের ডিগ্রী হাসেল করেন। হযরত কুতবুল আলম শায়খুল ইসলাম মাদানী (রহঃ) এর খানকায় অবস্থান করেন।

কর্মজীবন: দুই বছর লাউড়ি মাদ্রাসায়, দুই বছর আশরাফুল উলুম বড় কাটারায়, পাঁচ বছর জামেয়া ইমদাদিয়া কিশোরগঞ্জ– শেষ দু'বছর সেখানে বোখারী শরীফ পাঠদান করেন। তিনি দারুল উলুম মাদানিয়া যাত্রাবাড়ীর মুহতামিম ছিলেন ৭ বছর। জামেয়া হোসাইনিয়া আরজাবাদ মিরপুরে ১বছর। জামেয়া শরীয়া মালিবাগ মাদ্রাসায় ১১ বছর মোহতামিম ছিলেন। সেখানে ৯ বছর বোখারী শরীফের দরস দেন। ২ বছর ঢাকা ইউনিভার্সিটির ইসলামিক স্টাডিজের এম.এ ক্লাসে প্রভাষক ছিলেন। ২ বছর জামেয়া ইসলামিয়া দড়াটানা দরসে বোখারী দেন। ৪ বছর জামেয়া ইসলামিয়া ইসলামপুর শায়খুল হাদীস কাম মোহতামিম ছিলেন। বিগত দু'বছর হতে তিনি মালিবাগ জামেয়া শরইয়্যার মোহতামিম হিসেবে কর্মরত আছেন।

এছাড়া জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের কেন্দ্রীয় সদস্য। ইসলামী বিশ্বকোষের সম্পাদনা পরিষদের সদস্য।

রচনা কর্ম: কিতাবুল আখলাক, মসজিদের মর্মবাণী, মেশকাত শরীফের কিতাবুন নিকাহ, হিদায়া ৪র্থ খন্ডের অনুবাদ, এছাড়া বহু প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় ছাপা হয়েছে।

www.pathagar.com

আব্দুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী আল-আযহারী

আব্দুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী ১৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৯সালে সিলেটের টুকের গাঁও-এ জন্মগ্রহণ করেন।

শিক্ষা জীবনঃ গ্রামের স্কুলে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। ১৩৫৮ সালে তিনি প্রাথমিক বৃত্তি লাভ করেন। ১৯৫৮-৬৮ইং সাল পর্যন্ত তিনি সিলেট ও ঢাকাতে দাখিল, আলিম ফাযিল পাস করেন। ঢাকা আলীয়া থেকে তিনি আদবে কামিল ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি ১৯৮৭ সালে মিশর থেকে আর্ন্তজাতিক ইমাম প্রশিক্ষণ কোর্সেও ডিগ্রী লাভ করেন।

কর্মজীবনঃ তিনি ১৯৬২-৬৩ইং সালের জমিয়তে তোলাবা আরবীয়ার নির্বাহী সভাপতি ছিলেন। '৬৯ সালে ইসলামী সংগ্রাম পরিষদ এবং '৭২সালে জমিয়তুল মুদার্রেসীনকে সংগঠিত করেন। মাসিক ইসলাহ দৈনিক আজাদ, দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক বাংলা, দৈনিক জেহাদ, মাসিক মোহাম্মাদী, মাসিক মদীনা, ইসলামী ফাউন্ডেশন পত্রিকা, সাপ্তাহিক আরাফাত, সাপ্তাহিক শিহাব (উর্দু), করাচীর দৈনিক হুররিয়াত প্রভৃতি পত্রিকায় তার বহু লেখা প্রাকাশিত হয়। সরকারী ও উচ্চ পর্যায়ের ধর্মীয় প্রতিনিধিদলের সদস্যরূপে তিনি ১৯৮০ সালে ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ১৯৮১ সালে সৌদি আরব, ৮৪ সালে গণচীন ও '৮৬-৮৭ সালে মিশর সফর করেন।

রচনাবলীঃ তার লিখিত/অনূদিত/ সম্পাদিত গ্রন্থ সমূহের মধ্যে জীবন্ত মসজিদ সংগঠন, ইসলামের ডাক, ইসলাম ও রাজনীতি, নবী চিরন্তন, জীবন সন্ধ্যায় মানবতা, মিশকাত শরীফ (৫ম খণ্ড), বুস্তানুল মুহাদ্দিসীন, মহানবী স্মরণিকা, হযরত আয়েশা সিদ্দিকা, ইসলাম শিক্ষার পয়লা কিতাব, Holy Prophets Mission to Contemporary Rulers প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

বর্তমান অবস্থাঃ তিনি গণভবন সরকারী মসজিদের ইমাম ও খতীব। বাংলাদেশ ইমাম সমিতি ও মহানবী স্মরণিকা পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এবং শিক্ষাপ্রচার মিশনের অন্যতম সহ সভাপতি। তিনি বাংলা একাডেমীর লেখক - সদস্য। বাংলাদেশ বেতারের বিভিন্ন কথিকা লেখক।

মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুল মতীন বিন হুসাইন

মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুল মতীন বিন হুসাইন ১৯৫৫ইং সালে ভোলা জেলার তারাগঞ্জ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শৈশব কালে গ্রামের বাড়ীর

www.pathagar.com

নিকটস্থ কওমী মাদ্রাসায় নাযেরা হতে হেদায়েতুন্নাহব পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। ১৯৭৩-'৭৫ইং পর্যন্ত বরিশাল মাহমুদিয়া মাদ্রাসায় কাফিয়া থেকে শরহে বেকায়া পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। ১৯৭৬-'৮০ইং পর্যন্ত জামেয়া কোরআনিয়া আরাবিয়া লালবাগ মাদ্রাসায় শরহে বেকায় থেকে দাওরায়ে হাদীস পর্যন্ত পড়াশোনা করেন।

কর্মজীবনঃ ১৯৮১-৮২ সাল পর্যন্ত হযরত মাওলানা হেদায়েতুল্লাহ সাহেব (রহঃ) ও হযরত মাওলানা সালাহুদ্দীন সাহেব (রহঃ) এর নির্দেশে তিনি জামেয়া আশরাফিয়া মোমেনশাহীতে হাদীসের অধ্যাপনার মাধ্যমে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৮৩-'৮৪ইং জামেয়া ইসলামিয়া মোমেনশাহীতে হাদীসের অধ্যাপনা করেন। ১৯৮৫ থেকে বর্তমান পর্যন্ত গেন্ডারিয়ার ঢালকা নগর বায়তুল হক জামে মসজিদের ইমাম ও খতীবের দায়িত্ব পালন করে আসছেন। উল্লেখ্য ১৯৯৩-৯৪ ঢাকার দারুল উলুম মাদানিয়া মাদ্রাসার শিক্ষক ছিলেন। ১৯৯৫ থেকে বর্তমান পর্যন্ত করাচীর আরেফ বিল্লাহ হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আক্তার সাহেব দামাত বারকাতুহুম কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ঢালকা নগর বায়তুল উলুম মাদ্রাসায় তিনি শিক্ষকতা করে আসছেন। তিনি হযরত মাওলানা শাহ হাকীম মুহাম্মাদ আখতার সাহেবের (দাঃবাঃ) একজন বিশিষ্ট খলিফা।

রচনাবলী: শওকে ওয়াতন (অনুবাদ), রাহাতুল কুলুব (অনুবাদ), তরীকুল কলন্দর (অনুবাদ), ইমাম আব্দুল ওয়াহ্হাব শা'রানী (রহঃ) এর তাম্বিহুল মুগতার্‌রিন এর উর্দূতে অনূদিত 'আখলাকে সলফ' এর 'সিরাতে আউলিয়া' নামে বঙ্গানুবাদ। তাছাড়া আরিফ বিল্লাহ হযরত মাওলানা শাহ হাকীম মুহাম্মদ আক্তার সাহেব (দা:বা:) এর গ্রন্থগুলির অনুবাদ যেমন- তাআল্লুক মা'আল্লাহ, ক্রোধ দমন, অহঙ্কার ও প্রতিকার, তরীকে বেলায়েত, ইসলামের দৃষ্টিতে স্বামী-স্ত্রীর সুখের জীবন, মানাযেলে সুলুক, কু-দৃষ্টি ও অসৎ সম্পর্কের ধ্বংস লীলা ও প্রতিকার, তওবার ফযীলত, এস্তেগফারের ফযীলত, কু-ধারণা ও প্রতিকার, আত্মার ব্যাধি ও প্রতিকার, কোরআন ও হাদীসের অমূল্য রত্ন (ওযিফা) প্রভৃতি।

হযরত মাওলানা শামছুদ্দীন কাসেমী (রহঃ)

মাওলানা শামছুদদীন কাসেমী (রহঃ) ১৯৩৩ইং সনে সন্দীপে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সন্দীপস্থ হরিশপুর রশিদিয়া আহমদীয়া সিনিয়র মাদ্রাসা হতে দাখিল, আলিম ও ফাযিল পরীক্ষায় ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। তিনি ১৯৫৫-'৫৭ইং পর্যন্ত বিশ্ব বিখ্যাত দারুল উলুম দেওবন্দে অধ্যয়ন করেন। '৫৮সালে তিনি

www.pathagar.com

জামেয়া আশরাফিয়া লাহোর থেকে উচ্চতর ফনুনাত ফেকাহ, হাদীস, তাফসীর প্রভৃতি শাস্ত্রে সনদ লাভ করেন। ১৯৬০-'৬১ সালে উপমহাদেশের প্রখ্যাত তাফসীর বিশারদ মুজাহিদে ইসলাম হযরত মাওলানা আহমদ আলী লাহোরী (রহঃ)-এর কাছ থেকে তাফসীর শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন।

কর্মজীবন: তিনি ১৯৬১-'৬৩ইং পর্যন্ত মোমেনশাহী সোহাগী মাদ্রাসা ও বড় কাটারা মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করেন। অতঃপর ঢাকার ফরিদাবাদ মাদ্রাসায় দীর্ঘ ৮ বছর শিক্ষকতা করেন। ১৯৭০ সালে তিনি যাত্রাবাড়ী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠায় অন্যতম ভূমিকা রাখেন এবং অবৈতনিক শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। অতঃপর কিছুদিন চট্টগ্রাম শোলকপুর মাদ্রাসায় এহতেমামের দায়িত্ব পালন করেন। ঢাকাস্থ জামেয়া হোসাইনিয়া ইসলামিয়া আরজাবাদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং ইন্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত মোহতামিম ছিলেন।

রাজনীতি: ১৯৬৬-'৯০ইং পর্যন্ত জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম এর সেক্রেটারী জেনারেল ছিলেন। তাছাড়া খতমে নবুয়ত আন্দোলন পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি ছিলেন। খেলাফত আন্দোলনের সাংগঠনিক সম্পাদক এবং ইসলামি ঐক্য জোটের ভাইস চেয়ারম্যান।

রচনাবলী: (১) বায়তুল মোকাদ্দাস ও মসজিদে আকসা, (২) পাকিস্তানে খ্রীষ্টান মিশনারী উৎপাত, (৩) রমজানের সওগাত, (৪) ইসলাম বনাম কমিউনিজম, (৫) ধর্মনিরপেক্ষতা, (৬) শিয়া কাফের, (৭) কাদিয়ানী ধর্মমত, তাছাড়া সাপ্তাহিক জমিয়ত এর প্রকাশক ও সম্পাদক এবং মাসিক পয়গামে হক এর প্রতিষ্ঠাতা ও প্রকাশক ছিলেন।

ইন্তেকাল: তিনি ১৯৯৬ সালের ১৯শে অক্টোবর ইন্তেকাল করেন।

মাওলানা মুহিউদ্দীন খান

মাওলানা মুহিউদ্দীন খান ১৯৩৪ সালে ১৯শে এপ্রিল মোতাবেক বাংলা ১৩৪১ সালের ৭ই বৈশাখ গফরগাঁও জেলার শাঁখচুড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বর্তমানে তিনি মদীনা ভবন, বাংলাবাজার ঢাকা অবস্থান করছেন।

শিক্ষাজীবন: গফরগাঁও আলিয়া মাদ্রাসা থেকে প্রাথমিক শিক্ষা থেকে শুরু করে আলিম পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। ঢাকা আলিয়া থেকে ফাযিল, মুমতাজুল মুহাদ্দেসীন ও মুমতাজুল ফুকাহা ডিগ্রী লাভ করেন।

www.pathagar.com

কর্মজীবন: সাংবাদিকতা দিয়ে তিনি কর্ম জীবনের গোড়া পত্তন করেন। সাপ্তাহিক 'আজ' ও 'নয়া জামানা' তাঁর তদানিন্তন ইসলামিক একাডেমির মাসিক মুখপাত্র। দিশারী সম্পাদনার দায়িত্বপালন ছাড়াও ১৯৬১ সালের মার্চ থেকে নিজ সম্পাদনায় মাসিক মদীনা প্রকাশনা শুরু করেন। বর্তমানে তিনি মাসিক মদীনায় সম্পাদনা, লেখালেখি ও বহুমখী দাওয়াতী কাজে ব্যস্ত।

রচনাবলী: মৌলিক ও অনুবাদ মিলিয়ে তিনি ৪০টি গ্রন্থের রচয়িতা। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে বিপ্লবী সাহাবা হযরত আবু জর গিফারী, ইমাম জয়নূল আবেদীন, মানবতার রূপ (মূল: মাওলানা আবুল কালাম আজাদ), আল-ফারুক (মূল: শিবলী নো'মানী), কুড়ানো মাণিক (বাণী সংকলন), আজাদী আন্দোলন ১৮৫৭, মালফুজাতে হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহঃ), ইমাম গাজ্জালী, দরবারে আওলিয়া, চেরাগে মুহাম্মদ (অনুবাদ) উল্লেখ যোগ্য।

হযরত মাওলানা মুফতী শফী (রহঃ) রচিত ৮খন্ডে মা'আরেফুল কোরআন এর বাংলা অনুবাদ তাঁর রচনাবলীর বিশেষ কৃতিত্বের স্বাক্ষর।

গোলাম মোস্তফা

গোলাম মোস্তফা পিতা মরহুম মৌলভী কফিলুদ্দীন ১৯৫৭ সালের ২৩ মার্চ গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া থানাধীন বান্ধাবাড়ী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রাথমিক শিক্ষা স্থানীয় বিদ্যালয়ে শেষ করার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএ (অনার্স) পাশ করেন।

কর্মজীবন: সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি, খাদেমুল ইসলাম ছাত্র পরিষদ। কওমী পাবলিকেশন্স এর মাধ্যমে মুজাহেদে আ'যম হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ)এর লিখিত বইপত্র, বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশের পাঠ্যপুস্তক এবং অন্যান্য সৃজনশীল গ্রন্থ ও পাঠ্যপুস্তকের লেখক ও প্রকাশক। বর্তমানে তিনি পুস্তক প্রকাশক, পত্রিকা সম্পাদক ও বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে জড়িত আছেন।

রচনাবলী: তাবলীগের ইতিহাস, ব্যথার দান, নীরবকান্না, ব্যথিত বিজয় সহ বিভিন্ন সৃজনশীল পাঠ্য পুস্তক।

www.pathagar.com

গোলাম সোবহান সিদ্দীকী

গোলাম সোবহান সিদ্দীকী ১৯৩৮/৩৯ইং মোতাবেক ১৩৫৭ হিজরী সালে নোয়াখালী জেলার কোম্পানীগঞ্জ থানাধীন চরকাকড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৬৫ সালে ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসা হতে হাদীস শরীফে কামিল, ১৯৬৯ সালে ফিকহ শাস্ত্রে কামিল এবং '৭২ সালে আদবে কামিল পাশ করেন। জনাব সিদ্দীকী ১৯৭৪ সালে ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয় থেকে আরবী সাহিত্যে এম.এ ডিগ্রী লাভ করেন।

কর্মজীবনঃ জনাব গোলাম সোবহান সিদ্দীকীর কর্মজীবন মূলত সাহিত্য ও সাংবাদিকতাকে ঘিরে। তিনি দৈনিক সংগ্রাম, দৈনিক আজাদ, দৈনিক মিল্লাত সহ বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় সাংবাদিক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। বর্তমানে তিনি বিভিন্ন অনুবাদের কাজে লিপ্ত আছেন।

রচনাবলীঃ ইবতিদায়ী ফিক্‌হ ও আকাইদ, মহিলা সাহাবী (অনুবাদ), খেলাফত ও রাজতন্ত্র, কুরআনের চারটি মৌলিক পরিভাষা, হাসানুল বান্নার ডায়েরী, হাসানুল বান্না ও সমকালীন মিশর।

মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুল জব্বার

মোহাম্মদ আব্দুল জব্বার পিতা মরহুম শেখ নাসিম উদ্দীন ১৯৩৭ সালে বাগের হাট জেলার সহবতকাঠী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৬১সালে মাদ্রাসা আশরাফুল উলূম বড় কাটারা থেকে দাওরায়ে হাদীস সম্পন্ন করেন। শৈশব থেকেই হযরত মাওলানা শামছুল হক (রহঃ) তার মুরব্বী ছিলেন।

কর্মজীবন: ১৯৬২ইং সন থেকে বড় কাটারা, ১৯৬৪-'৬৯পর্যন্ত ফরিদাবাদ, ১৯৬৯-'৭০-এর মার্চ পর্যন্ত যাত্রাবাড়ী দারুল উলূম মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করেন। ১৯৭২-'৭৬ পর্যন্ত বাগেরহাটের সম্মানকাঠী মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৬-'৭৮এর এপ্রিল পর্যন্ত পুনঃরায় যাত্রাবাড়ী মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করেন। ১৯৯২ সালের মে হতে অদ্যাবধি বাংলাদেশ বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়ার মহাসচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক

মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক ফরিদপুরী ১৯৩৮ সালের ৫ই আগষ্ট গোপাল গঞ্জ জেলার পশ্চিম নিজড়া নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৫৫ সালে তিনি হযরত

www.pathagar.com

সদর সাহেবের সোহবতে আসেন এবং ইন্তেকাল পর্যন্ত একান্ত সান্নিধ্যে থাকেন। তিনি হযরত সদর সাহেবের প্রাইভেট সেক্রেটারী হিসেবে কাজ করতেন। তিনি ১৯৭৫ সালে দাওরায়ে হাদীস পাশ করেন। জেনারেল লাইনে বি.এ পাশ।

কর্মজীবনঃ ১৯৯৮ইং গওহারডাঙ্গা মাদ্রাসার শিক্ষক এবং খাদেমুল ইসলাম জামায়াতের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে কাজ শুরু করেন। বর্তমানে জামেয়া মোহাম্মদীয়া মাদ্রাসায় কর্মরত আছেন এবং খাদেমুল ইসলাম জামাতের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বে আছেন।

রচনাবলীঃ হযরত মাওলানা আব্দুল আজিজ সাহেবের জীবনী (মোহতামিম গওহারডাঙ্গা মাদ্রাসা), আল্লামা শামছুল হক সাহেবের জীবনী প্রভৃতি।

মাওলানা আজীমুদ্দীন

আজীমুদ্দীন পিতা মরহুম শেখ আব্দুর রাজ্জাক। তিনি ১৯৫১ সালের ৩রা মে গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গীপাড়া থানাধীন পাকুড়তিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

শিক্ষাজীবন: জামেয়া ইসলামিয়া দারুল উলূম খাদেমুল ইসলাম গওহারডাঙ্গা থেকে ১৯৭২ইং সনে দাওরায়ে হাদীস অতঃপর দ্বিতীয় বার ১৯৭৩ইং সনে জামেয়া কোরআনিয়া আরাবিয়া লালবাগ থেকে দাওরায়ে হাদীস পাশ করেন।

কর্মজীবন: ওলীকুল শিরোমণি আমীরে শরীয়ত রাহবারে তরীকত, হযরত হাফেজ্জী হুযুর (রহঃ) এর ঐতিহ্যবাহী ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান মাদ্রাসায়ে নুরীয়ায় তালীমি খেদমত এবং হাফেজ্জী হুযুর (রহঃ)এর শফকত ও বরকতময় সোহবতে দীর্ঘ ১ যুগ ছিলেন। জামেয়া মুহাম্মদীয়া আরাবিয়া মোহাম্মদপুরের নায়েবে মুহতামিমের দায়িত্ব ও হাদীসের খেদমত করেছেন। মাদ্রাসা দারুল উলূম মিরপুরে ১৯৯৫ইং থেকে নাযেমে তালিমাত ৩বছর এবং মুহতামিমের দায়িত্ব ১ বছর পালন করেছেন।

বর্তমানে তিনি মাদ্রাসায়ে দারুল উলূম মীরপুর এ হাদীসের খেদমতে রত ও জামেয়া ইমদাদিয়া আরাবিয়া উত্তরা ঢাকা এর প্রিন্সিপাল এবং আর-রাহমাতুল্লাহ ইসলামিক ফাউন্ডেশন (একটি বহুমুখী সেবামূলক প্রতিষ্ঠান) এর প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি।

রচনাবলীঃ (১) রওহাতুল আদব শরহে রওজাতুল আদব, (২) তাসহিলুল মুবতাদি (বাংলাভাষায় ফার্সী ব্যকরণ), (৩) তাসহিলু উর্দূ কায়দা, (৪) জামেউন

www.pathagar.com

নুকুশ, (৫) ফাযায়েলে মেসওয়াক (অনুবাদ), (৬) তাহাজ্জুদ, (৭) আল্লাহর প্রেম (অনুবাদ), (৮) ইশকে ইলাহী (যন্ত্রস্থ), (৯) ঈদ ও কোরবানী, (১০) প্রেমলীলা (ইসলামী উপন্যাস)

মাওলানা মোস্তফা আজাদ

মোস্তফা আজাদ ১৯৫৩সালের ১০ই মে গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী থানার সাধুহাটি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মরহুম মুহাম্মদ বাদশা মিয়া।

শিক্ষাজীবন: তিনি দারুল উলুম খাদেমুল ইসলাম, গওহরডাঙ্গা থেকে ১৯৭১ইং সনে দাওরায়ে হাদীস এবং ১৯৭৫ সনে স্থানীয় কলেজ থেকে এইচ, এস, সি পাশ করেন।

কর্ম জীবন: ১৯৭২ইং হতে ১৯৭৬ইং পর্যন্ত ফলসী দারুস-সুন্নাহ সালেহীয়া মাদ্রাসার সুপারিন্টেন্ডেন্ট পদে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৭-'৮৮ইং পর্যন্ত জামেয়া হোসাইনিয়া ইসলামিয়া আরজাবাদ, মিরপুর, ঢাকা এর উস্তাদ হিসেবে এবং ১৯৮৯-'৯৬ইং পর্যন্ত উক্ত প্রতিষ্ঠানের নায়েবে মুহতামিম এর দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯৬ থেকে মুহতামিম হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। এছাড়াও তিনি জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম, বাংলাদেশ-এর সহসভাপতি, খতিব, মসজিদুল আমান, পল্লবী, মিরপুর এবং সম্পাদক- মাসিক পয়গামে হক।

রচনাবলী: মহিলাদের মসজিদ গমন ও পর্দার বিধান, শানে সাহাবা (অনুবাদ) প্রভৃতি।

মাওলানা আব্দুল জলীল

আব্দুল জলীল ১৯৬২ সালের ১লা জুন খুলনা জেলার বটিয়াঘাটা থানাধীন লক্ষ্মীখোলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

শিক্ষা: দাওরায়ে হাদীস ১ম শ্রেণী, লালবাগ মাদ্রাসা ঢাকা। এম.এম. (১ম শ্রেণী) বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড। বিএ অনার্স ১ম শ্রেণীতে দ্বিতীয়, ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়। এম.এ ১ম শ্রেণীতে ১ম, ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়। পি.এইচ.ডি গবেষক, ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়।

কর্মজীবনঃ বর্তমানে তিনি ইসলামিক ফাউন্ডেশনের গবেষণা কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

www.pathagar.com

রচনাবলীঃ মৌলিক-কবি ও কবিতা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.) ও সাহাবীদের মনোভাব। ইফাবা প্রকাশিত ইসলামী বিশ্বকোষ ও অন্যান্য পত্র পত্রিকায় প্রায় দুই শতাধিক মৌলিক নিবন্ধ প্রকাশিত।

অনুবাদ-

(ক) হাদীসঃ বোখারী, মুসলিম, ইবনে মাজাহ (আংশিক), ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত।

(খ) তাফসীর: তাফসীরে তাবারি ও তাফসীরে ইবনে আব্বাস (রাযি:) আংশিক, ইফাবা থেকে প্রকাশিত।

(গ) সিরাতঃ সিরাতে সাইয়েদ আহমদ শহীদ (রহঃ) ১ম ও ২য় খণ্ড (আংশিক) ইফাবা থেকে প্রকাশিত।

(ঘ) নবী ভাস্কর ১৯৮৬ইং প্রকাশিত। এছাড়াও প্রায় দেড় শতাধিক নিবন্ধ অনূদিত ও ইসলামী বিশ্বকোষে প্রকাশিত।

মাওলানা আবদুস সাত্তার

আবদুস্ সাত্তার ১৯৬৫ সালের ৭ই জানুয়ারী কিশোরগঞ্জ জেলার তাড়াইল থানাধীন বোরগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বারুইগ্রাম থেকে হিফযুল কোরআন সম্পন্ন করতঃ যাত্রাবাড়ী ও হাট হাজারী থেকে যথাক্রমে দাওরায়ে হাদীস ও ফাতাওয়া বিভাগে উত্তীর্ণ হন।

কর্মজীবন: প্রচলিত শিক্ষা জীবন সমাপ্ত করে ১৯৯১ সালে চট্টগ্রামের অন্তর্গত আনোয়ারা থানাধীন ঐতিহ্যবাহী জামেয়া আরাবিয়া 'হাইল ধরে' মাদ্রাসায় শিক্ষকতার মাধ্যমে তিনি তার কর্মজীবন শুরু করেন। অতঃপর ঢাকার উত্তরা থানাধীন রানাভোলা মাদ্রাসায় কিছুদিন থাকার পর পুনরায় চট্টগ্রামের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত হালিশহর মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করেন। বর্তমানে তিনি ঢাকার ঐতিহ্যবাহী মিরপুর ১২/ত মহিলা মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করছেন।

রচনাবলী: (১) ইসলামের দৃষ্টিতে মাতৃভাষার গুরুত্ব, (২) আল্লামা উন্দুলুসী (রহঃ) এর উপদেশ মূলক ঘটনা, (৩) চরিত্র গঠন প্রণালী, (৪) পকেট মুনশাইব, (৫) দেওয়ানে ইলমী, (৬) টিভি ও ভিসিআর এর আহকাম। এছাড়াও বহু পাণ্ডুলিপি প্রকাশের পথে।

www.pathagar.com

মাওলানা মোহাম্মদ আবু সাঈদ

মোহাম্মদ আবু সাঈদ গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী থানাধীন ভাট্টাইধোবা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি গওহার ডাঙ্গা মাদ্রাসায় হিফয সমাপ্ত করে সেখানেই কিতাব বিভাগে ভর্তি হন। অতঃপর লালবাগ মাদ্রাসায় অধ্যয়ন করত: দারুল উলুম দেওবন্দ গমন করেন। তথা হতে ১ম বিভাগে দাওরায়ে হাদীস পাশ করেন।

কর্মজীবন: খুলনা শামছুল উলূম মাদ্রাসায় তিনি অধ্যাপনার মাধ্যমে কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। সেখানে এক বছর শিক্ষকতার পর যশোরের বাকড়া মাদ্রাসায় ৫ বছর এহতেমামের দায়িত্ব পালন করেন। অতঃপর সেখান থেকে তিনি মাদ্রাসা বাইতুল উলূমে চলে আসেন। দীর্ঘ ৮বছর যাবত এখানেই অধ্যাপনা করছেন।

রচনাবলী: উর্দূ তেছরীর অনুবাদ (শব্দার্থ সহ), মাজালিছে মুহিউস্‌সুন্নাহ (অনুবাদ), বেরেলি ছে বালাকোট (অনুবাদ)।

মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাঈল

মুহাম্মদ ইসমাঈল ১৯৫০ সালে ঝালকাঠী জেলার চারাখালী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। গ্রামের মাদ্রাসা ও স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করতঃ জামেয়া কুরআনিয়া আরাবিয়া লালবাগে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। এছাড়া তিনি গওহার ডাঙ্গা এবং পটিয়া মাদ্রাসায়ও লেখাপড়া করেন। জামেয়া মাহমুদিয়া থেকে ১৯৭৪সালে দাওরায়ে হাদীস এবং লালবাগ থেকে ১৯৭৫সালে পূন: দাওরায়ে হাদীস সম্পন্ন করেন। একই বছর তিনি মাওলানা দ্বীন মোহাম্মদ খান (রহঃ) এর নিকট তাফসীরে কোরআন অধ্যয়ন করেন।

কর্মজীবন: ১৯৭৫-'৭৬ খিলগাও তালতলা পাকা মসজিদ সংলগ্ন মাদ্রাসায়, '৭৭-'৭৯ আমিনবাজার মাদ্রাসায়, '৭৯ - '৯২ জামিয়া নূরীয়ায়, অতঃপর ১৯৯২-৯৮পর্যন্ত মাদ্রাসাতুল মদীনায় শিক্ষকতা করেন। তিনি অধুনা লুপ্ত মাসিক রহমতের সম্পাদক ছিলেন। বর্তমানে তিনি দারুল উলূম দেওভোগে শিক্ষকতার দায়িত্বসহ ১৯৯২ সন থেকে কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন।

রচনাবলী: ইসলামিক ফাউন্ডেশন এর অনুবাদ বিভাগের বিভিন্ন হাদীস ও তাফসীর সংকলন ও অন্যান্য অনুবাদ। বিশ্বকোষ, অনুবাদ ও মৌলিক রচনা। ফাতাওয়া ও মাসায়েল, (বেদআত ও নাওয়াফেল)

www.pathagar.com

মৌলিক রচনা: উর্দূর প্রাথমিক পাঠ ও নাহব-সরফ প্রাথমিক পাঠ (বাংলাভাষা) পত্র-পত্রিকায় সমসাময়িক বিষয়াবলীর উপর প্রবন্ধ।

অধ্যাপক আখতার ফারুক

অধ্যাপক আখতার ফারুক সাহেব ১৯৩৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাসস্থান ১১/৭/এইচ, ফ্রি স্কুল স্ট্রীট। তিনি শর্ষিণা আলিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষা জীবন শুরু করেন। এখানেই ফাযিল পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। অতঃপর ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসা থেকে এম.এম পাশ করেন এবং ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয় থেকে বাংলায় এম.এ পাশ করেন।

কর্মজীবন: সোহরাওয়ার্দী কলেজে ১৯৬১-'৭০ইং পর্যন্ত বাংলা বিষয়ে অধ্যাপনা করেন। এর পর তিনি ১৯৭১-'৭৮ পর্যন্ত দৈনিক সংগ্রাম পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। উল্লেখ্য তিনি এ পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা। ১৯৭০-'৭১ পর্যন্ত তিনি রেডিও টিভিতে নাটক লিখতেন এবং টিভির বিভিন্ন অনুষ্ঠানের উপদেষ্টা ছিলেন।

রচনাবলীঃ মৌলিক রচনার মধ্যে বাঙ্গালীর ইতিকথা, মরণ মিছিল, জাহান্নামের আগুনে বসিয়া, দাঙ্গা, মধ্যপ্রাচ্যে হাফেজ্জী হুযুর, পুঁজিবাদ সমাজবাদ, খালেদ ইবনে অলিদ উল্লেখযোগ্য। তার অনুবাদ গ্রন্থগুলি হল তফসীরে ইবনে কাসির, যাদুল মা'আদ, হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা, ইসলাহে ইনকিলাবে উম্মত, ফাতহু রব্বানী, আসহাবে কাহাফ, হযরত ইউসুফ (আঃ), আল-মামুন, ফয়জুল কাবীর, কওলে ফায়সাল, আস-সানায়ে হিজবু বিসাল প্রভৃতি।

বর্তমানে তিনি বিভিন্ন প্রকার লেখালেখি ও দাওয়াতি কাজে রত।

হযরত মাওলানা আবদুল মান্নান

মাওলানা আবদুল মান্নান সাহেব আনুমানিক ১৯৩৫ইং সনে গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী থানাধীন ভাট্টাইধোবা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

শিক্ষা জীবন: তিনি দারুল উলূম খাদেমুল ইসলাম গওহরডাঙ্গা থেকে দাওরায়ে হাদীস পাশ করেন। এর পরে উচ্চ শিক্ষার্থে ভারতের বিখ্যাত দেওবন্দ মাদ্রাসায় গমণ করেন। পাকিস্তানে অবস্থিত জামেয়া ইসলামিয়া নিউ টাউন করাচী থেকে তাখাসসুস ফিল হাদীস করেন। এস.এস.সি।

www.pathagar.com

কর্মজীবন: শায়খুল হাদীস দারুল উলূম গওহরডাঙ্গা গোপালগঞ্জ। শায়খুল হাদীস জামেয়া ইসলামিয়া যাত্রাবাড়ী, ঢাকা। মুহাদ্দিস জামেয়া কুরআনিয়া আরাবিয়া লালবাগ, ঢাকা। সাধারণ সম্পাদক সর্বোচ্চ উলামা পরিষদ বাংলাদেশ ও আমীরে বাংলাদেশ খাদেমুল ইসলাম জামাআত।

বর্তমানে তিনি প্রিন্সিপাল ও শায়খুল হাদীস জামেয়া ইসলামিয়া দারুল উলূম খাদেমুল ইসলাম গওহরডাঙ্গা, ফরিদপুর ও নায়েমে আ'লা বিফাকুল মাদারিসিল কওমিয়া (গওহরডাঙ্গা মাদ্রাসা কেন্দ্রীক আঞ্চলিক কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড)

মাওলানা শাহ্ আবদুল হক আব্বাসী

শাহ্ আবদুল হক আব্বাসী বাংলা ১৩৪৮ সনে বর্তমান চাঁদপুর জেলার অন্তর্গত কচুয়া থানাধীন তুলপাই নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম শাহ্ আবদুল লতিফ আব্বাসী ও পিতামহের নাম মুন্সী মোহাম্মদ আব্বাস। মাতার নাম আমেনা খাতুন। তাঁর দাদার নামানুসারে নামের শেষাংশে আব্বাসী ব্যবহার করিয়া থকেন।

শিক্ষা জীবন: প্রাথমিক শিক্ষা নিজ পিতার নিকট সমাপ্তির পর উচ্চমাধ্যমিক স্কুল শিক্ষা সমাপ্ত করে বাংলাদেশের সুপ্রসিদ্ধ আরবী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জামেয়া ইসলামিয়া ইব্রাহীমিয়া উজানীনগর কুমিল্লা হতে মেশকাত শরীফ পর্যন্ত লেখাপড়া করে আল জামেয়া কোরআনিয়া আরাবিয়া লালবাগ হতে দাওরায়ে হাদীস ও তাফসীর বিভাগে পড়াশোনা করে ছাত্র জীবন শেষ করেন। মুজাহেদে আ'যম মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ), মাওলানা মোহাম্মাদুল্লাহ হাফেজ্জী হুযুর (রহঃ), মাওলানা হেদায়েত উল্লাহ (রহঃ), শায়খুল হাদীস মাওলানা আজিজুল হক (মাদ্দাঃ) প্রমুখ যুগ শ্রেষ্ঠ ওলামা হযরত তাঁর হাদীস শাস্ত্রের উস্তাদ এবং রইসুল মুফাসসেরীন হযরত মাওলানা দীন মোহাম্মদ (রহঃ) তাঁর তাফসীরের উস্তাদ ছিলেন।

কর্মজীবন: তিনি বাংলাদেশের দক্ষিণ অঞ্চলের প্রখ্যাত পীর মরহুম হযরত মাওলানা শাহ্ সূফী সৈয়দ আবদুর রশীদ চিশতী, চলাভাঙ্গা দরবার হতে চিশতীয়া ও মোহাম্মাদীয়া তরীকা মোতাবেক খেলাফত ও বয়াতের ইজাজত লাভ করেন। রাজবাড়ী জেলার গোয়ালন্দ থানা সদরে তাঁর পিতার কর্মস্থলে একটি আধ্যাত্মিক খানকাহ্ শরীফ ও মাদ্রাসা স্থাপন করেছেন। বর্তমানে তিনি গোয়ালন্দের পীর সাহেব বলে সমগ্র দেশে পরিচিত।

www.pathagar.com

রচনাবলী: তাঁর রচিত "সীরাযাম মুনিরা" রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর জন্ম হতে হিজরত পর্যন্ত ও "আদর্শ সেনাপতি" হিজরত হতে ইন্তেকাল পর্যন্ত দু'টি সীরাত গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। এছাড়া তাঁর লিখিত গ্রন্থ হল:- (১) সূক্ষ্ম সংবাদ, (২) আজব সংবাদ, (৩) মাওয়ায়েজে আব্বাসীয়া, (৪) আমরা যাদের অনুসারী, (৫) বাংলাদেশের উজ্জ্বল প্রদীপ উল্লেখযোগ্য।

মাওলানা উবাইদুল হক

উবাইদুল হক ১৯২৮ইং সনে সিলেট জেলার অন্তর্গত জকিগঞ্জ থানাধীন বারঠাকুরী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মরহুম হাফেয মাওলানা জহুরুল হক। তিনি পিতার নিকট প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে ১৯৪৭-৪৮ সনে দারুল উলূম দেওবন্দ হতে দাওরায়ে হাদীস পাশ করেন। এবং ১৯৪৮-৪৯ সনে তাফসীরের শেষ সনদ লাভ করেন। মাওলানা সাইয়েদ হুসাইন আহমদ মাদানী, মাওলানা ইব্রাহীম বলিয়াবী, শায়খুল আদব মাওলানা এ'জাজ আলী ও শায়খুত তাফসীর মাওলানা মোহাম্মদ ইদ্রিস কান্দলবী (রহঃ) প্রমুখ মনীষীগণ তাঁর ওস্তাদ ছিলেন।

কর্মজীবন: তিনি ১৯৫০-৫৩ সন পর্যন্ত ঢাকা আশরাফুল উলূমে শিক্ষকতা করেন এবং ১৯৫৩ সনের শেষের দিকে করাচী নানকওয়াড়া মাদ্রাসায় পোষ্ট গ্রাজুয়েট কোর্সে এক বছরের জন্য শিক্ষক হিসেবে নিয়োজিত হন এবং হাদীস শিক্ষা দেন।

১৯৫৪ সালে তিনি ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসার অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং দীর্ঘ একত্রিশ বছর অধ্যাপনার পর ১৯৮৫ সনে চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করেন। বর্তমানে তিনি জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররম এর খতীবের দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি আন্তর্জার্তিক তাহাফফুজে খতমে নবুয়ত বাংলাদেশের সভাপতি। তিনি সিলেট দরগাহ মাদ্রাসা ও ঢাকা ফয়জুল উলূম মাদ্রাসায় অনারারী ভাবে হাদীসের ক্লাস নেন। বিভিন্ন মাদ্রাসার পৃষ্ঠপোষক, বিশেষ করে আজিমপুর ফয়জুল উলূম মাদ্রাসার মুহতামিমের দায়িত্ব তাঁর উপর অর্পিত রয়েছে।

রচনাবলী: (১) সীরাতে মোস্তফা, (২) নশরুল ফাওয়ায়েদ, (৩) শরহে শেকওয়াহ্ ওয়া জাওয়াবে শেকওয়াহ্, (৪) কুরআনে উলা মে ইসলামী হুকমরানী কে নমুনা, (৫) তাসহীলুল কাফিয়াহ্, (৬) কোরআন বুঝিবার পথ ইত্যাদি।

www.pathagar.com

অধ্যাপক গোলাম আযম

অধ্যাপক গোলাম আযম ১৯২২ সালের ৭ নভেম্বর মঙ্গলবার,ঢাকা শহরের লক্ষ্মীবাজারস্থ শাহ্‌ সাহেব বাড়ী তাঁর মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মাওলানা গোলাম কবির। তাঁদের আদি নিবাস ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবী নগর উপজেলার বীরগাঁও গ্রামে। ১৯৪৮ সালে তাঁর পিতা মগবাজার এলাকায় এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন।

শিক্ষা: তিনি এস.এস.সি পরীক্ষায় মেধাতালিকায় ত্রয়োদশ স্থান লাভ করেন। ১৯৪৪ সালে ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ থেকে ঢাকা বোর্ডে মেধা তালিকায় দশম স্থান লাভ করেন। ১৯৫০ সালে ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয় থেকে এম.এ পাস করেন।

কর্মজীবন: ১৯৫০ সালে ৩রা ডিসেম্বর রংপুর কারমাইকেল কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রভাষক হিসেবে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। তিনি ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত এ পদে নিয়োজিত থাকেন।

১৯৫০ সালে তাবলীগ জামাআতের সাথে যুক্ত হন। ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত তাবলীগ জামাআতের রংপুরের আমীরের দায়িত্বে ছিলেন। এ সময় তিনি তমুদ্দন মজলিসের রংপুর জেলার প্রধান হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৫৪ সালে তিনি জামাআতে ইসলামীর সহযোগী হিসেবে কাজ করেন। ১৯৫৫ সালের জুন মাসে জামাআতে ইসলামীর রাজশাহী বিভাগীয় সেক্রেটারী ও আমীরের দায়িত্ব পান। ১৯৫৭ সালে তাঁকে তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তান জামাআতের জেনারেল সেক্রেটারী নিযুক্ত করা হয়।

১৯৬৯ সালে আমীরের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। ১৯৭১ সাল পর্যন্ত এ দায়িত্বে বহাল থাকেন।

১৯৫৮ সালে তিনি দৈনিক ইত্তেহাদ পত্রিকার সম্পাদনা বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন এবং নিয়মিত কলামে সম্পাদকীয় লিখতেন। বর্তমানে তিনি জামাআতে ইসলামী বাংলাদেশের আমীরের দায়িত্ব পালন করছেন।

রচনাবলী: তিনি আন্দোলন ও সাংগঠনিক প্রয়োজনেই ৪০টি বই লিখেন। তার রচনাবলীর মধ্যে 'আমার দেশ বাংলাদেশ', 'পলাশী থেকে বাংলাদেশ', 'বাংলাদেশের রাজনীতি' বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

www.pathagar.com

খন্দকার ওমর আহমদ

ওমর আহমদ ১৯৩৬ সালে গোপালগঞ্জ জেলার সাতাইশা গ্রামে এক ধার্মিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন । তাহার পিতা মরহূম খন্দকার মাওলাদ আলী ধর্ম ভীরু সৎ ও পরহেজগার লোক ছিলেন। তিনি বাগেরহাটের মোল্লাহাট থানাধীন আস্তাইল গ্রামে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন এবং সেখানে স্থায়ী ভাবে বসবাস করা শুরু করেন।

শিক্ষা: ঘরোয়া পরিবেশে তাহার লেখাপড়ার হাতে খড়ি হয়। আনুমানিক ১৯৪১ সালে স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে ৫বছরে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। পরে পাকিস্তান আমলে মোল্লাহাট স্কুলে ভর্তি হন। ১৯৫৩ সালে এই স্কুল থেকে কৃতিত্বের সাথে এস.এস.সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অতঃপর তিনি মোল্লাহাট কলেজে ভর্তি হন।

সদর সাহেব হুযুরের সাহচর্য: কলেজ জীবনের এক পর্যায়ে তিনি সদর সাহেব হুযুরের সাক্ষাৎ ও দোয়া লাভে ধন্য হন। ফলে,ইংরেজী শিক্ষার প্রতি নিরুৎসাহিত হন এবং এক পর্যায়ে কলেজ ত্যাগ করে হুযুরের পরামর্শ ক্রমে গোবরা ও কাজুলিয়া মাদ্রাসায় কাফিয়া পর্যন্ত লেখাপড়া করেন। তবে হুযুরের সংস্পর্শে নিজেকে আল্লাহভীরু পরহেজগার ও দ্বীনদার হিসেবে গড়ে তোলেন।

কর্ম জীবন: সদর সাহেব (রহঃ) পরবর্তী সময় তাঁকে গওহারডাঙ্গা মাদ্রাসার হিসাব শাখার দায়িত্বে নিযুক্ত করেন। তিনি অত্যন্ত যোগ্যতা ও দক্ষতার সাথে মাদ্রাসার যাবতীয় হিসাব পরিচালনার পাশাপাশি মাদ্রাসার লাইনে আরো পড়াশোনা করার জন্য সদর সাহেবের কাছে আবদার করলে সদর সাহেব (রহঃ) কলাখালী হুযুরকে তাকে মিশকাত পর্যন্ত খাসভাবে পড়াবার জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ করেছিলেন। তিনি প্রখর মেধাবী ও তুখড় ছাত্র ছিলেন। পাঠ সংক্রান্ত জটিল প্রশ্ন করে উস্তাদগণকে তাক লাগিয়ে দিতেন। তিনি সদর সাহেবের প্রিয়পাত্র ছিলেন। তাঁর খেদমত করতেন। আশেক ছিলেন। বহু বছর যাবত হযরত ফরিদপুরী বাড়িতে অবস্থান কালে শেষ রাতে খানকায় আসলে তিনি তাহাজ্জুদের ওযু করাতেন এবং বিভিন্ন ভাবে খেদমত করতেন। তাঁর খোদাভীরুতা, মামুলাতের প্রতি একনিষ্ঠতা ইত্যাদি আকর্ষণীয় ছিল। তিনি ছাত্রদের খুব আদর করতেন। বড় হওয়ার উৎসাহ দিতেন। হিম্মত যোগাতেন। তিনি দীর্ঘ ৪০ বৎসর যাবত গওহারডাঙ্গা মাদ্রাসায় খেদমত করেছেন। মাদ্রাসার উন্নতির জন্য কঠোর পরিশ্রম করতেন। যোগাযোগ, কালেকশন তথা মাদ্রাসার যে কোন কাজে যখনই মরহুম মোহতামিম সাহেব যেখানে যেতে বলতেন তিনি

www.pathagar.com

তৎক্ষণাত বেরিয়ে পড়তেন। এসব কাজে তিনি ঢাকা খুলনা বরিশাল রাজশাহী তথা দেশের আনাচে কানাচে ছুটে বেড়াতেন।

রচনা: এত কিছু খেদমত আঞ্জাম দেওয়ার পরও তিনি কাব্য সাহিত্য সাধনা অব্যাহত রাখেন। সাধনা করে লিখতে লিখতে তিনি "সত্যের দিশারী" নামে একটি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। তার বড় জামাতা মাওলানা মুহাম্মদ সালমান সাহেবের উদ্যোগে বইটি প্রকাশিত হয়েছে। বইটির বিষয় বস্তু ইসলামী ভাবধারায় ভরপুর।

হযরত মাওলানা কারী উবায়দুল্লাহ

কারী উবায়দুল্লাহ ১৯৪৫ সালে চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুনিয়া থানাধীন কোদালা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মাওলানা মেহেরুজ্জামান।

শিক্ষা জীবন: প্রাথমিক শিক্ষা গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শুরু হয়। এরপর চট্টগ্রামের মু'য়াবিনুল ইসলাম মাদ্রাসায় মেশকাত শরীফ পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। ১৯৬০ সালে তিনি লালবাগ মাদ্রাসা হতে দাওরায়ে হাদীস সমাপ্ত করেন। ১৯৬৪-'৬৫ সালে তিনি মুফতী দীন মুহাম্মদ সাহেবের কাছে তাফসীর বিষয়ে পড়াশোনা করেন। এরপর উপমহাদেশের বিখ্যাত আলেম যাফর আহমদ উসমানী (রহঃ)এর নিকটও মসনুবিয়ে রুমী, হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা সহ আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ কিতাব অধ্যয়ন করেন।

তার কিরাত শিক্ষা শুরু হয় কাসেমুল উলূম মাদ্রাসা কোদালা থেকে। এরপর মোয়াবিনুল ইসলাম মাদ্রাসা, শরফ ভাটা মাদ্রাসা, রাঙ্গুনিয়া সহ আরব এবং মিশরের বিভিন্ন কারীদের কাছে তিনি কিরাত শিক্ষা গ্রহণ করেন।

কর্মজীবন: তিনি রাজধানী সহ বিভিন্ন মাদ্রাসায় শিক্ষকতা শুরু করেন। এর মধ্যে ইসলামিয়া মাদ্রাসা কোতয়ালী, দেওবুক নারায়ণগঞ্জ, কারকুন বাড়ী মাদ্রাসা নবাবপুর, কাওরাণবাজার মাদ্রাসা, মোহাম্মদ পুর আলিয়া মাদ্রাসা, কামরাঙ্গির চর মাদ্রাসা, দারুস সালাম মাদ্রাসা, খিলক্ষেত মাদ্রাসা, কাপাসিয়া সহ আরো বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করেন। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব দক্ষতার সাথে আঞ্জাম দিয়ে চলেছেন। তার মধ্যে জামেয়া তাজবিদুল কোরআন, বাংলাদেশ কারী সমিতি, বাংলাদেশ ইমাম সমিতি, বাংলাদেশ হাদীস প্রচার কমিটি, বাংলাদেশ সত্য সন্ধানী স্পন্দন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী সহ আরো বহু বহু গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।

www.pathagar.com

বর্তমানে তিনি চকবাজার শাহী মসজিদের খতীব ও বাংলাদেশ বেতার, টিভিতে পবিত্র কোরআনের দরস দেন।

রচনাবলী: ইলমে তাজবীদ, তাজবীদুল কোরআন, শবে মেরাজ সহ আরো কয়েকটি কিতাব তিনি রচনা করেন।

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল হাই

মুহাম্মদ আবদুল হাই বাংলা ১৩৪৮ সনে ভোলা জেলার লালমোহন থানার গাইমরা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম আবদুল আজিজ। তিনি নোয়াখালী কারী মোখলেসুর রহমানের কাছে লেখাপড়া শুরু করেন। নিজ এলাকায় বিশ্বাসেরপাড় প্রাইমারী স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। এর পর তিনি লালবাগে দাওরায়ে হাদীস পর্যন্ত পড়েন। অতঃপর করাচীতে দাওরা ও তাখাসসুস ফিল হাদীসে ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি মুফতী দীন মোহাম্মদ সাহেবের কাছে তাফসীর পড়াশোনা করেন।

কর্মজীবন: ১৯৬৯ সালে লালবাগে শিক্ষকতা শুরু করেন। দারুত তারবিয়তের দায়িত্বে ৯ বছর খেদমতে আঞ্জাম দেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর দুই বছর মাদ্রাসা বন্ধ থাকে। এ সময় সালাহুদ্দিন সাহেবের অনুরোধে ভোলার মির্জা কালু হোসাইনিয়া মাদ্রাসায় এক বছর এর পর আবার মাওলানা হেদায়েতুল্লাহ ও মাওলানা আজিজুল হক সাহেবের নির্দেশে লালবাগে আসেন।

বর্তমানে তিনি হাজী বাল্লু রোড রহমতগঞ্জ মসজিদের খতীব, চক বাজার শাহী মসজিদে সপ্তাহে দু'দিন, লালবাগ শাহী মসজিদে সোমবার জনগণের দর্শন দিয়ে ধন্য করেন।

রচনাবলী: হিসনে হাসিন (অনুবাদ), মাসায়েলে হজ্জ উমরা ও জিয়ারত, ইখতেলাফে উম্মত আরও সিরাতে মুস্তাকিম ইত্যাদি।

মাওলানা মুহাম্মদ সালমান

মুহাম্মদ সালমান ১৯৫০ইং সালে সাতক্ষীরা জেলার কালিগঞ্জ থানাধীন নলতা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মরহুম বাহাদুর গাজী।

শিক্ষাজীবন: তিনি ১৯৬৮ইং সালে এস.এস.সি পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। ১৯৬৯ইং সালে আই.কম পড়া কালে ইলমে দ্বীন হাসিল করার এক অদম্য পিপাসা নিয়ে হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ) প্রতিষ্ঠিত

www.pathagar.com

ঐতিহ্যবাহী গওহারডাঙ্গা মাদ্রাসায় আগমন করেন। এখানে অবস্থান কালে তৎকালীন মুহতামিম মরহুম মাওলানা অব্দুল আজিজ সাহেব এবং মাদ্রাসার হিসাব রক্ষক সদর সাহেবের খাছ সাগরেদ জনাব খন্দকার ওমর আহমাদ সাহেবের তত্ত্বাবধানে কঠোর মুজাহাদার সাথে নিজের জীবনের জাহের ও বাতেনের ইসলাহ করতে থাকেন। পরবর্তীতে ১৯৭৮ সালে ভারতের সাহারানপুর জেলার গঙ্গুহ মাদ্রাসায় ১বছর পড়াশোনা করেন। অতঃপর বিশ্বখ্যাত দারুল উলূম দেওবন্দে মেশকাত শরীফ এবং ১৯৮০ সালে দাওরায়ে হাদীস সমাপ্ত করেন। গঙ্গুহ মাদ্রাসায় পড়াশোনার সময়ই তিনি উপমহাদেশের স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভীর সঙ্গে নূতন করে ইসলাহী সম্পর্ক কায়েম করেন এবং অদ্যাবধি সে সম্পর্ক কায়েম রেখেছেন।

কর্মজীবন: দেশে ফিরে ১৯৮০ সালে প্রথমে খুলনার খালিশপুরে অবস্থিত দারুল মোকাররম মাদ্রাসায় ২ বছর এবং দৌলতপুরের যাকারিয়া সেনহাটি মাদ্রাসায় ২বছর দরস তাদরিসের কাজে লিপ্ত থাকেন। অতঃপর ১৯৮৪ সালে ঢাকার মিরপুরস্থ জামেয়া হুসাইনিয়া আরজাবাদের শিক্ষক নিযুক্ত হন। ১বছর পর অর্থাৎ ১৯৮৫ সালের ১লা জুলাই তিনি প্রতিষ্ঠা করেন জেনারেল লাইনে শিক্ষিত ছেলেদের জন্য ৫বছর মেয়াদী কোর্স সম্বলিত এক ব্যতিক্রম ধর্মী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মাদ্রাসা দারুর রাশাদ। বর্তমানে তিনি মাদ্রাসা দারুর রাশাদের প্রিন্সিপ্যাল হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

রচনাবলী: গওহারডাঙ্গা মাদ্রাসায় অধ্যয়ন কালেই তিনি বাংলাভাষা ও সাহিত্যের ময়দানে নেমে আসেন। তখন হতেই তিনি মাদ্রাসার বার্ষিকী আল-গওহার, খুলনার দৈনিক জন্মভূমি, দৈনিক আজাদ, দৈনিক সংগ্রাম, দৈনিক ইনকিলাব, মাসিক মদীনা, মাসিক আল-জামেয়া সহ বিভিন্ন পত্রিকায় লিখতেন। তার রচনাবলীর মধ্যে 'হায়াতে শায়খুল হাদীস, মহাপুরুষের জীবন কাহিনী, কোরবানীর ইতিহাস, তাকমীলুল ঈমান (অনুবাদ) অন্যতম।

মাওলানা লিয়াকত আলী

মাওলানা লিয়াকত আলী ১৯৬২ সালের জানুয়ারী মাসে সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর থানার গুমানতলী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আব্দুস সবুর সরদার।

শিক্ষা জীবন: হাফেজ শহরআলী (রহঃ) এর কাছে তাঁর কায়েদায়ে বাগদাদী বিসমিল্লাহ করা হয়। অতঃপর কারী নূরুল ইসলাম সাহেবের নিকট

www.pathagar.com

আমপারা, কুরআন শরীফ ও বুনিয়াদী শিক্ষা গ্রহণ করেন। ফকীর বরকন্দাজ সাহেবের পাঠশালায় বাংলা প্রথমভাগ পড়ার পর গুমানতলী প্রাথমিক স্কুলে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়েন। ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম শ্রেণী শেষ করেন ঈশ্বরীপুর এ সোবহান হাই স্কুলে। নবম ও দশম শ্রেণী তুজলপুর হাইস্কুলে এবং উক্ত স্কুল থেকে ১৯৮৩ সালে মানবিক বিভাগে মেধা তালিকায় ৬ষ্ট স্থান অধিকার করে তিনি এস.এস.সি পাশ করেন।

অতঃপর এইচ.এস.সিতে ১৯৮৫ সালে ঢাকা কলেজ থেকে ঢাকা বোর্ডের মানবিক বিভাগের মেধা তালিকায় ৭ম স্থান অধিকার করেন। ১৯৮৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় বিএ অনার্স এবং ১৯৯১ সালে এম.এ পাশ করেন।

তিনি ১৯৭৭ইং সালের শেষ দিকে স্কুল জীবন ছেড়ে গোপালগঞ্জ জেলার গওহারডাঙ্গা মাদ্রাসায় ভর্তি হন। সেখানে হেদায়েতুন্নাহু পর্যন্ত অতঃপর বাশবাড়ীয়া মাদ্রাসায় জালালাইন শরীফ পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। লালবাগ মাদ্রাসায় মেশকাত ও দাওরায়ে হাদীস পড়েন এবং মেধাতালিকায় ১ম স্থান অধিকার করেন। মাওলানা হেদায়েতুল্লাহ (রহঃ)এর নিকট মেশকাত আউয়াল ও তিরমিযী এবং মাওলানা আজিজুল হক সাহেবের নিকট মেশকাত ছানী ও বুখারী পড়েন।

কর্মজীবন: ১৯৮৯ সালের জানুয়ারী থেকে অদ্যাবধী তিনি মাদ্রাসা দারুর রাশাদ মিরপুর-১২ এর মুহাদ্দিস ও শিক্ষা সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। এছাড়া তিনি ১৯৯৪ সালের ১লা সেপ্টেম্বর হতে তিনি দৈনিক আল মুজাদ্দেদের সহসম্পাদক হিসেবে কর্মরত আছেন।

রচনাবলী: তিনি ছাত্র জীবন হতেই বাংলাভাষা এবং সাহিত্যের ময়দানে পদচারণা শুরু করেন। তাঁর প্রথম লেখা ১৯৮৪ সালের ২৬মে দৈনিক আজাদে "দারিদ্র বিমোচনে ইসলাম" নামে প্রকাশিত হয়। তিনি ইসলামী বিশ্বকোষে প্রায় দেড় শতাধিক প্রবন্ধ লিখেছেন। এছাড়া দৈনিক আল-মুজাদ্দেদের ইসলাম ও ঐতিহ্য বিভাগে তার প্রায় দুই শতাধিক প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে।

তাঁর লিখিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে– ফেকহুল হাদীস, বুস্তানুল আরেফীন, খেলাফতে রাশেদা, জাযাউল আ'মাল, ধর্ম ও কৃষ্টি, নুখবাতুল ফিকার, সময়ের মূল্য, দুর্বার অভিযান, তাম্বিহুল গাফেলীন, মরনকালে শয়তানের ধোকা ইত্যাদি। এছাড়া বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়ার তৃতীয় শ্রেণীর ইতিহাস ও চতুর্থ শ্রেণীর সমাজ তিনি রচনা করেছেন।

www.pathagar.com

মাওলানা আতাউর রহমান খান

মাওলানা আতাউর রহমান খান ১৯৪৪ সালে কিশোরগঞ্জ জেলার ইটনা থানাধীন হাতকবীলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মাওলানা আহমদ আলী খান ছিলেন কিশোরগঞ্জ জামেয়া এমদাদিয়ার আজীবন প্রিন্সিপাল।

শিক্ষাজীবন: নিজ মহল্লার মক্তবে ও পাঠশালায় তাঁর গৌরবময় শিক্ষাজীবনের যাত্রা শুরু হয়। এরপর তিনি নিজ পিতার প্রতিষ্ঠান জামেয়া এমদাদিয়ায় চলে যান এবং সেখান থেকেই দাওরা হাদীস পাশ করেন। বিভিন্ন ফনের উপর উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করেন এখানেই। তিনি মাওলানা আতহার আলী (রহঃ) এর নিকট থেকে আধ্যাত্মিক শিক্ষা লাভ করেন। শুধু তাই নয়, তিনি ছোট বেলা থেকেই মুজাহিদে মিল্লাত হযরত মাওলানা আতহার আলী (রহঃ)এর কর্মময় জীবনের প্রত্যক্ষদর্শী, তার ব্যক্তিগত মুখপাত্র ও রাজনৈতিক ভাষ্যকার ছিলেন।

কর্মজীবন: ধারাবাহিক শিক্ষাজীবন শেষ হওয়ার পর তিনি জামেয়া এমদাদিয়াতেই ভাইস প্রিন্সিপালের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বর্তমানেও তিনি দক্ষতার সাথে এ দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে চলেছেন। ১৯৯১ সালে তিনি কিশোরগঞ্জ থেকে জাতীয় সংসদের সদস্য নিবার্চিত হন এবং এলাকার প্রভূত উন্নতি সাধন করেন।

রচনাবলী: তিনি বিপর্যস্ত দেশ ও মুসলিম উম্মাহর উত্তরণের জন্য বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে দেশবাসীকে মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে থাকেন। বিভিন্ন বিষয়ের উপর তিনি বইপত্র রচনা করেছেন। তার মধ্যে 'মাওলানা আতহার আলীর স্মৃতি' নামক স্মৃতিচারন মূলক বইটি লিখে বিদগ্ধ মহলে বিশেষভাবে আলোচিত হন।

মাওলানা ফজলুর রহমান (রহঃ)

মাওলানা ফজলুর রহমান মাদারীপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মাওলানা খলিলুর রহমান। সাহারানপুর জেলার মাজাহেরুল উলূম মাদ্রাসার বিখ্যাত আলেম হযরত মাওলানা খলিল আহমদ সাহারানপুরী তাঁর পিতার উস্তাদ এবং পীর ছিলেন। সেখানে অধ্যয়ন কালে হযরত মাওলানা ফরিদপুরীর (রহঃ) সহিত তাঁর আব্বার পরিচয় হয়। এরপর তিনি জেনারেল লাইনে পড়াশোনা করেন।

www.pathagar.com

১৯৪৮ সাল হইতে তিনি সদর সাহেবের সোহবতে আসা যাওয়া করতেন এবং তাঁরই পরামর্শ ক্রমে উর্দূ ডিপ্লোমা পড়েন। অতঃপর বিক্রমপুরের বজ্রযোগিনী স্কুলে চাকরী পান। তারপর হতে প্রতি বৃহস্পতি বারে লোকজনদের নিয়ে লালবাগে হুযুরের নিকট যেতেন। তাঁর আব্বা মাওলানা খলীলুর রহমান সাহেব একদিন তাকে বলেছিলেন, দেখ ফজলুর রহমান! আমি যে দৌলত মাওলানা খলীল আহমদ সাহারানপুরী থেকে পেয়েছি তিনি তা হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গঙ্গুহী (রহঃ) থেকে ও হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী থেকে লাভ করেছিলেন তা আমি তোমাকে দিয়ে দিয়ে যেতে পারলাম না। কারণ, তোমার দিল এখনো উপযুক্ত হয় নাই। আমার অবর্তমানে তুমি এই তরীকতের ছিলছিলা এমদাদিয়ার দৌলত মাওলানা শামছুল হকের নিকট হতে অর্জন করিও।

আব্বার নির্দেশ মত তিনি হযরত ফরিদপুরীর সাথে এসলাহী তাআল্লুক কায়েম করে তারই প্রতিষ্ঠিত খাদেমুল ইসলাম জামাআত প্রচার প্রসারে জীবনকে ক্ষয় করেছিলেন। খৃষ্টান মিশনারীদের তৎপরতার বিরুদ্ধে তিনি চট্টগ্রামের পাহাড়ী অঞ্চলের বহু কাজ করেছিলেন। হযরত ফরিদপুরীর বাতেলের মোকাবেলায় লিখিত কিতাব পত্র তিনি প্রকাশ করে তা ব্যাপক ভাবে জনগণের মধ্যে বিলি করেন।

হযরত ফরিদপুরী (রহঃ)এর ইন্তেকালের পর হযরত থানভী (রহঃ)এর বিখ্যাত খলীফা হযরত মাওলানা আবরারুল হক সাহেব (দাঃবাঃ)এর সাথে ইসলাহী তাআল্লুক কায়েম করেন এবং খেলাফত লাভ করেন। ঢালকা নগরের (ফরিদাবাদ) মরহুম হাজী কোরবান আলী সাহেবের সাথে তাঁর গভীর সম্পর্ক ছিল।

১৯৮২ সনে তিনি প্রথম ভারতের হারদুয়ী সফর করেন। দেশে ফিরে থানা ভবনের নকশায় খানকাহ্ এবং রওজাতুল উলূম নামে মাদ্রাসা কায়েম করেন।

করাচীর আরেফ বিল্লাহ হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার সাহেব (দাঃবাঃ) এর সঙ্গেও তার সম্পর্ক ছিল। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি হারদূয়ী হযরতের তত্ত্বধানে দাওয়াতুল হকের কাজে লিপ্ত ছিলেন। সাথে সাথে খাদেমুল ইসলাম জামাতের কাজও করতেন। কয়েক বছর পূর্বে মাদারীপুরের নিজ বাড়িতে হঠাৎ করেই তাঁর ইন্তেকাল হয়ে যায়।

www.pathagar.com

মাওলানা খলীলুর রহমান (ছোটফা হুযুর)

মাওলানা খলীলুর রহমান গোপালগঞ্জ জেলার মোকসুদপুরে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাথমিক শিক্ষা নিজ এলাকায় শেষ করার পর তিনি চট্টগ্রামের জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়ায় ভর্তি হন এবং সেখান থেকে দাওরায়ে হাদীস সম্পন্ন করেন। ছোট কাল থেকে তিনি বুযুর্গদের কাছ থেকে নিজের জাহের এবং বাতেনের এসলাহ্ করানোর জন্য সচেষ্ট থাকতেন। পটিয়ার হযরত মুফতী আজিজুল হক সাহেবের সাথে তিনি এসলাহী তাআল্লুক কায়েম করেন এবং খেলাফত লাভ করেন।

হযরত মুফতী সাহেব ইন্তেকাল করার পর নানুপুরের বিখ্যাত বুযুর্গ হযরত মাওলানা সুলতান আহমদ (রহঃ)এর সাথে তিনি এসলাহী সম্পর্ক কায়েম করেন এবং খেলাফত লাভ করেন। পরবর্তীতে গোপালগঞ্জের ছোটফা নামক স্থানে মাদ্রাসা কায়েম করেন এবং অদ্যাবধী তিনি উক্ত মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মুহতামিম হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন।

হযরত মাওলানা খলীলুর রহমান সাহেব একজন বুযুর্গ আলেম। উম্মতের এসলাহের ফিকির নিয়ে বছরের বেশীর ভাগ সময় তিনি বাংলাদেশের আনাচে কানাচে সফর করেন এবং ওয়াজ নসীহতের মাধ্যমে আল্লাহ ভোলা মানুষদেরকে আল্লাহ পাকের মা'রেফাত লাভ করার সহজ এবং সরল রাস্তা বাতলে দেন। বাতেলের মোকাবেলায় তিনি বজ্র কঠোর। হযরত সদর সাহেবের সাথে তার গভীর সম্পর্ক ছিল। তিনি হযরত ফরিদপুরীর (রহঃ) একজন খাঁটি আশেক।

মাষ্টার আবদুল হক

মাষ্টার আবদুল হক সাহেব ১৯২৩ সালে নড়াইল জেলার কালিয়া থানাধীন বাঐসোনা গ্রামে হাজীবাড়ীর সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

শিক্ষাজীবন: নিজগ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করত ১৯৩৮ সালে কলাবাড়িয়া হাই স্কুল থেকে মেট্রিক পাশ করেন। এর পর নড়াইল ভিক্টোরিয়া কলেজে ভর্তি হন এবং ন্যাশনাল মুসলিম গার্ড ছাত্র সংগঠনের জিএস হন। সেখান থেকে আইএ পাশ করার পরে তিনি বাগের হাট কলেজে ভর্তি হন। সেখান থেকে বৃটিশ খেদাও আন্দোলনে অংশ গ্রহণের জন্য কলিকাতা ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি হন। এরপর তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন।

www.pathagar.com

১৯৪৭ সালের পাকিস্তান বিভক্তির পর খুলনার পাকিস্তানী পতাকা তিনিই উত্তোলন করেন।

১৯৪৫ সালে গওহারডাঙ্গায় সদর সাহেবের সাথে তার প্রথম সাক্ষাত হয়।

১৯৪৭ সালে পুরোপুরি ভাবে হুযুরের সোহবতে আসেন। সদর সাহেবের নিকট নাহু সরফ পড়ার পর তিনি উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য মাজাহেরে উলূম সাহারান পুর মাদ্রাসায় পড়াশোন করেন।

কর্মজীবন: তিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সদর সাহেব (রহঃ)এর মিশনকে বাংলাদেশের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয়ার জন্য কঠোর পরিশ্রম করেন।

১৯৯১ সালের ১৭ই অক্টোবর তিনি ইন্তেকাল করেন।

=== ০০০ ===

www.pathagar.com

জাতি গঠনে
হযরত ফরিদপুরীর (রহঃ) বিপ্লবী চিন্তাধারা

* এই কওমের মঙ্গলের জন্য চেষ্টার ত্রুটি করি নাই। আমার ঈমানী গায়রতের কারণে সরকারের কোপানলে পড়িয়া কাজে বহু বাধা প্রাপ্ত হইয়াছি। মুসলিম কওমের দিক নির্দেশনার জন্য আমার মস্কিষ্কে আল্লাহপাক যে জ্ঞান দিয়াছেন তাহা আমি বাস্তবায়িত করিতে পারিতেছি না। আমাদের এ দেশে হাসাদ অত্যন্ত বেশী। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বাংলার মানুষ প্রকৃত মানুষের যোগ্যতার ও প্রতিভার কদর করিতে জানে না।

* আমি যদি ইউ,পি, বা সি,পিতে (ইন্ডিয়া) জন্মগ্রহণ করিতাম এবং আমার এই খেদমত তাহারা পাইত তাহা হইলে সেখানকার মুসলমানরা আমার জাগ্রত মস্তিষ্কের কদর করিত। আগামীতে আদর্শ ব্যক্তি কেন্দ্রিক কোন শক্তি পাইবে না। ইসলামী হুকুমাত ইহাদের দ্বারা কায়েম হওয়ার আশা নাই। এখন ব্যক্তি গঠন ও সমাজ সংশোধনের কাজই তোমাদের প্রধান দায়িত্ব।

* আমার অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি যেন মিটিয়া না যায়, তোমাদের কলমে নকল করিয়া রাখিও। আমি যাহা কোরআন হাদীসের ব্যাখ্যা লিখিয়াছি, উহার রদবদল করিও না, উহার একটা কথাও আল্লাহ পাকের ইশারা না পাইয়া লিখি নাই। কোন কথা ছুটিয়া গেলে জীবন ভর চেষ্টা করিয়াও আর পাইবা না। মানুষের মধ্যে চেতনা আসার মানব কল্যাণ কামনায় নিঃস্বার্থ এই একটি পথই এখন প্রশস্ত রহিয়াছে। অন্য সব পথে স্বার্থ জড়িত থাকায় সুষ্ঠুভাবে কাজ হইতেছে না।"

* আমার প্রাণের একান্ত বাসনা এই যে, বাংলার মুসলিম সমাজ বিশেষতঃ সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত ও প্রতিভাবান ব্যক্তিবর্গ পরাধীনতার হীনমন্যতা ও হেয়তাবোধ দূর করিয়া ইসলামের শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া আত্মচেতনাবোধ ও জাতীয় গৌরববোধ সম্পন্ন হউক। তাহাদের জন্য আমার বড় মায়া লাগে, প্রাণ পোড়ে, তাহারা কোরআন হাদীসের শিক্ষার বাস্তব আলো পায় নাই. তাহাদিগকে বঞ্চিত করা হইয়াছে, এইজন্য তাহাদের মস্তিষ্কের সৃজনী শক্তি নিষ্ক্রিয় রহিতেছে। আল্লাহর মারেফাতের নূরে হৃদয়পদ্ম বিকশিত হইতেছে না। ধর্মহীন কর্মশিক্ষা ও কর্মহীন ধর্মশিক্ষার দ্বারা জাতিকে পঙ্গু করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই অভাব মোচনের জন্য কোরআন হাদীসের জ্ঞান সমুদ্র মন্থন করিয়া উহার গভীরতম তলদেশ পর্যন্ত পৌঁছিয়া মণিমুক্তা কুড়াইয়া সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া গেলাম। তোমরা ইহা মানুষের গলার হার বানাইয়া পরাইয়া দিও। দিশাহারা মানুষের পরম উপকার হইবে।"

www.pathagar.com

* আরো কিছু সংখ্যক কেতবাড়ী বলদ অর্থাৎ ভুলাভালা কর্মী সংগ্রহ কর, পাহাড় টলিবে তো তাঁহারা টলিবে না। আমি কিছু শিক্ষা দিয়া যাইব। ইনশাআল্লাহ! সেই শিক্ষায় কওম ও মিল্লাতের সঠিক দিক নির্দেশনা হইবে। বেশী বড় আলিম ও ডিগ্রীধারীদের দ্বারা কাজ করান যায়না। নিজের রায় ফানা করিতে পারেনা। কানয,হেদায়া পর্যন্ত পড়া কিছু আলিম এবং আন্ডার গ্রাজুয়েট কতিপয় যুবক ধরিয়া আন। আমার লেখা বইগুলির ব্যাপক প্রচার কর।

* এই দেশে ইসলামী হুকুমাতের জন্য যে সমস্ত রাজনৈতিক দল কাজ করিতেছে,তাহাদের দ্বারা ইসলামী হুকুমাতের আশা বর্তমানে নাই। ব্যক্তি গঠন করিতে থাক, ব্যক্তির দ্বারা সমাজের ব্যক্তিগুলি ভাল হইলেই সমাজ ভাল হইবে। আল্লাহর ভয়ের শিক্ষা, আইনের যথাযথ কঠোরতা ও পাপের প্রতি ঘৃণা এই তিনটি কাজ সমাজের সর্বস্তরে জারী করিতে না পারিলে দেশ ভাল হইবে না।

* বাস্তবিকই তাঁহার লেখা যে কোন পুস্তক পাঠ করিলেই চিন্তাশীল লোকের চিন্তা জগতে নতুন প্রবাহের সৃষ্টি করে। মনের সুপ্ত কোণে আঘাত দিয়া চেতনা ও দায়িত্ব জ্ঞান সৃষ্টি করে। ইহা তাঁহার কারামতও বটে।

* শিক্ষা ব্যবস্থা সংস্কারে বাস্তব পদক্ষেপের জন্য পাকিস্তান অর্জনের সাথে সাথেই তিনি সরকারকে এবং সমাজকে সদা সর্বদা সতর্ক করিয়াছেন, পরামর্শ দিয়াছেন। আদর্শ চরিত্রবান ধর্মপরায়ণ আমলা-অফিসার সৃষ্টি ব্যতিরেকে ইসলামী রাষ্ট্র চলিতে পারে না, টিকিয়াও থাকিতে পারে না। সুতরাং শিক্ষার সর্বস্তরে ধর্ম শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার জন্য তৎকালীন পাক সরকারের উপর তিনি চাপ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। শিক্ষার একটি পরিকল্পনা এবং পাঠ্যসূচীও তৈয়ার করিয়া সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু সরকার হযরত মাওলানা শামছুল হক সাহেবকে বরদাশত করিতে পারেন নাই।

* তিনি তৎকালীন সরকারের শরীয়ত বিরোধী পারিবারিক আইন পাশ করার পর ও ইসলামী শাসনের প্রতিশ্রুতিতে প্রাপ্ত পাকিস্তানে আধুনিকতা ও প্রগতির নামে চরিত্র বিধ্বংসী সহশিক্ষা, বেপর্দা, অশ্লীল নাচ-গান, উলঙ্গপনা, ব্যভিচার ইত্যাদির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াইয়াছিলেন। দুর্বার আন্দোলন ও বলিষ্ঠ প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। সতর্কবাণী নামক একটি পুস্তক লিখিয়া সকলকে হুঁশিয়ার করিয়াছিলেন যে, এই সকল গর্হিত কাজ বন্ধ না করিলে ভবিষ্যত বংশধররা অমানুষ হইবে। কুলের কুলাঙ্গার হইবে। জাতি ধ্বংস হইবে। দেশ ধ্বংস হইবে। কিন্তু সরকারের চৈতন্য উদয় হইল না। বই বাজেয়াপ্ত করা হইল।

www.pathagar.com

ছবির ডান পাশে হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরীর (রহঃ) গবেষণা কক্ষ। জাতির কল্যাণে নিবেদিত এই মুজাহিদে আ'যমের কলমী যুদ্ধ এখান থেকেই পরিচালিত হতো। এখানে তিনি বিশ্রাম করতেন। বাম পাশে শিলালিপিতে দৃশ্যমান হযরতের মৃত্যু তাং ২১শে ফেব্রুয়ারীর স্থলে ২১শে জানুয়ারী হবে

www.pathagar.com

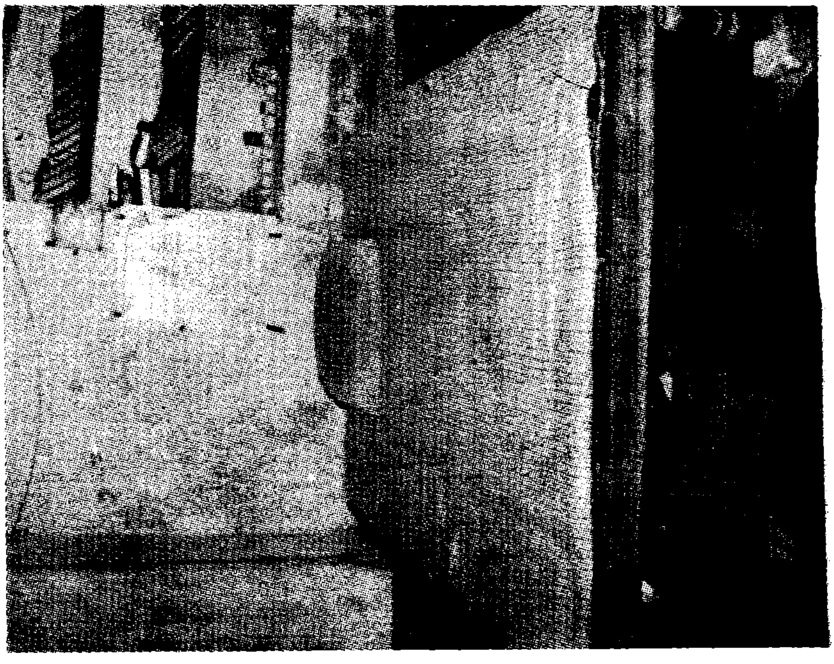

উপরে: বেগম বাজার মসজিদে সদর সাহেব হুযুরের বিশ্রাম কক্ষ
এই জানালার পাশে বসে তিনি লেখালেখির কাজ করতেন
বামে : জিনজিরায় হযরত ফরিদপুরীর (রহঃ) শোবার খাট

www.pathagar.com

দূর থেকে দৃশ্যমান সদর সাহেবের (রহঃ) খানকা ও গওহারডাঙ্গা মাদ্রাসা মসজিদের একাংশ।

এখানেই চিরনিদ্রায় শুয়ে রয়েছেন মুজাহিদে মিল্লাত হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ)

www.pathagar.com

হযরত সদর সাহেব (রহঃ) ও হযরত হাফেজ্জী হুজুর (রহঃ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কালের সাক্ষি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ঐতিহাসিক লালবাগ জামেয়ার মূল ভবন

www.pathagar.com

হযরত সদর সাহেবের (রহঃ) দু'টি স্বপ্ন

মাদ্রাসা দারুর রাশাদ ও ইদারাতুল মা'আরিফ

সরকারের দ্বারা দেশে ইসলামী শাসন কায়েম ও ইসলামী শিক্ষা জারী করার চেষ্টায় ব্যর্থ হইয়া অবশেষে তিনি জাতির নিকট আবাসিক কিন্ডার গার্টেন, ইসলামিয়া হাই স্কুল স্থাপন করার পরামর্শ দিলেন। কারণ যে সকল মুসলিম যুবক ভবিষ্যতের আশা আকাঙ্ক্ষার ফল, ক্রিম অব দ্য ন্যাশন অর্থাৎ মস্তিষ্ক সম্পন্ন প্রতিভাবান, সাহসী, এরা মাদ্রাসায় খুব কমই আসে। অতএব জাতির এই অভাব মোচনের জন্য এই স্কুলের মাধ্যমে যাহাতে সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত দেশপ্রেমিক রাষ্ট্র পরিচালক সৃষ্টি করা যাইতে পারে এই জন্য সরকারের নিকট জমি বরাদ্দের আবেদন করিয়াছিলেন। পরিকল্পনা দিয়াছিলেন। কিন্তু জীনে ধরা রোগীর ন্যায় বিদেশী পরামর্শে পরিচালিত পাক সরকার এই আবেদন মঞ্জুর করেন নাই।

মার্শাল-ল'র সময় যখন সরকারের বিরুদ্ধে কাহারও কোন কথা বলার অধিকার ছিলনা, তখন সরকারের আশা বাদ দিয়া বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে জাগ্রত মস্তিষ্কের বেশ কিছু সংখ্যক গ্রাজুয়েট সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এই গ্রাজুয়েটদের ট্রেনিং দিয়া তিন বৎসরের সংক্ষিপ্ত কোর্সের মাধ্যমে আরবী ভাষায় কোরআন হাদীসের শিক্ষা দিয়া তাহাদের দ্বারা ভবিষ্যতে ইসলামী চিন্তাধারায় জাতি গঠন ও পরিচালনার স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন। যেখানে সর্ব স্বার্থ জলাঞ্জলি দেওয়া জীবন, কোন প্রকার ভোগ বিলাস নাই, আছে শুধু চরম কৃচ্ছ্রসাধন ও মোজাহাদা, স্থূল দৃষ্টিতে যেখানে কোন ভবিষ্যত নাই, সেখানে শুধু দূরদর্শী অন্তরদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিগণই রহিলেন।

আফ্‌সোস বাংলার হতভাগ্য কপাল, এই মহান কার্য বাস্তবে রূপায়িত হওয়ার সূচনা লগ্নেই একদিকে দেশে চরম জুলুম-বিশৃঙ্খলা আরম্ভ হইল অপরদিকে এই মহামনীষীর হায়াত শেষ হইয়া গেল। তাই তাঁহার বাসনা বাস্তবে রূপায়িত হইতে দেখিয়া যাইতে পারিলেন না। *মাওলানা ফজলুর রহমান (রহঃ)*

মাদ্রাসা দারুর রাশাদ হযরত ফরিদপুরীর (রহঃ) সেই স্বপ্নেরই বাস্তব রূপ। তাঁর ইন্তেকালের ১৬ বছর পর ১৯৮৫ সালের ১লা জুলাই মিরপুরের ১২নং সেকশনে এ প্রতিষ্ঠান শুরু হয়।

বিজাতীয় সাহিত্যের বিযাক্ত ছোবল থেকে শিক্ষিত শ্রেণীকে রক্ষার জন্য একটি ইসলামী সাহিত্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান খোলা ছিল তাঁর মনের আর একটি লালিত স্বপ্ন। ফরিদাবাদ মাদ্রাসায় তিনি 'ইদারাতুল মা'আরিফ' নামে এধরণের একটি প্রতিষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন কিন্তু নানা কারণে তাঁর ইন্তেকালের পর প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ হয়ে যায়। আল্লাহ পাকের মেহেরবাণীতে মাদ্রাসা দারুর রাশাদে ১৯৯৮ সালের ১লা মার্চ থেকে 'ইদারাতুল মা'আরিফ' (সাহিত্য সাংবাদিকতা ও গবেষণা একাডেমী) বিভাগের কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

www.pathagar.com

মাদ্রাসা দারুর রাশাদের একাংশ

মাদ্রাসা দারুর রাশাদের একাংশ

www.pathagar.com

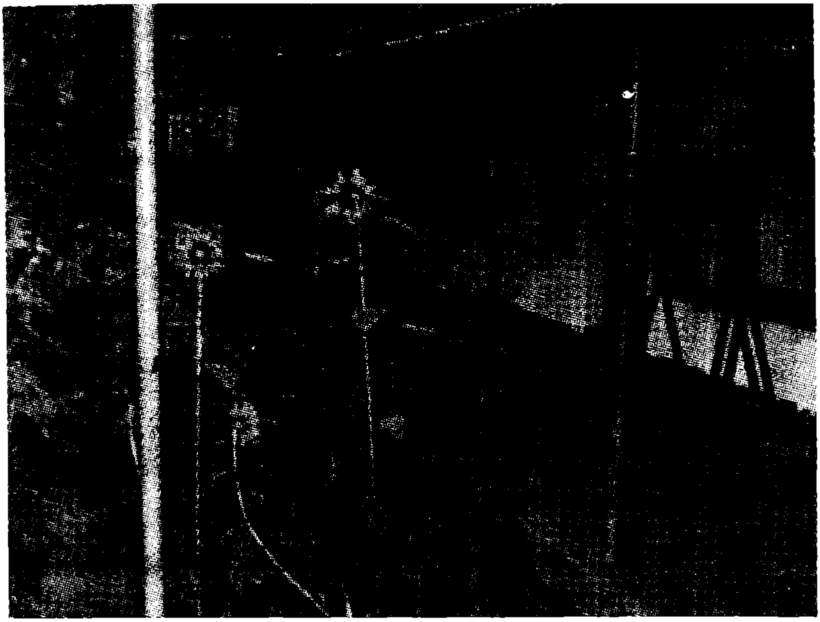

মাদ্রাসা দারুর রাশাদের একাংশ

মাদ্রাসা দারুর রাশাদের একাংশ

www.pathagar.com

ইদারাতুল মা'আরিফ- সাহিত্য সাংবাদিকতা ও গবেষণা একাডেমীর কম্পিউটার "হযরত ফরিদপুরী (রহঃ) স্মারক গ্রন্থ" লেখাটুকু প্রদর্শন করছে।

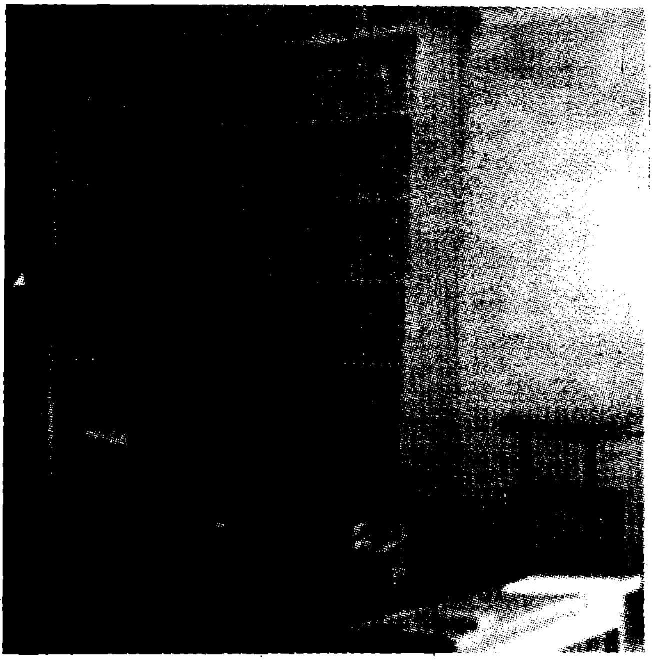

দৃশ্যমান হযরত সদর সাহেবের (রহঃ) লালিত স্বপ্ন ইদারাতুল মা'আরিফ; মাদরাসা ছাত্রদের সামনে গবেষণার এক নতুন দিগন্ত।

www.pathagar.com